প্রথম সংস্করণ . মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক . ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট : কলকাতা ৬

অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণ : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স : ৫৭ এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন : কলকাতা ৬

সম্পাদকের কথা

সব্যসাচী সুবোধ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যের পাঠকের আজ আর অজানা নেই, কীভাবে আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত ছোটগল্পে সুবোধ ঘোষের দ্যুতিময় আবির্ভাব ঘটেছিল, কীভাবে রবীন্দ্র-শরতের এবং খ্যাতিমান কল্লোলীয় ও তাঁদের সমসময়ের ধ্রুপদী লেখকদের এক লহমায় পিছনে ফেলে উপকরণে ও প্রকরণে সুবোধ ঘোষ বাঙালি পাঠকদের হৃদয় জয় করেছিলেন। তাঁর শিল্পিসত্তার অমোঘ আকর্ষণ ছোটগল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রায় চারদশক ধরে বাঙালির হৃদয়রাজ্যে অন্যতম অধীশ্বর বানিয়ে রেখেছিল বলেই তাঁর রচনার মন্ত্রমুগ্ধ পাঠকেরা তাঁর ভিন্নতর রচনা-পাঠে ততটা আসক্তি বোধ করেননি। তাঁরা অনেকেই জানতে পারেননি, কথাশিল্পী হিসেবে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হলেও এরই পাশাপাশি নেপথ্যে প্রায়-সমান্তরালভাবে চলতে থাকে তাঁর বিচিত্র ও বিভিন্ন অনুসন্ধিৎসাভিত্তিক নানাবিধ গবেষণাধর্মী সৃষ্টিকর্ম, যেগুলো 'সুবোধকুমার ঘোষ', 'সুবোধচন্দ্র ঘোষ', 'ভবানী পাঠক', 'কালপুরুষ' ইত্যাদি বিভিন্ন নামে তিনি লিখেছেন মূলত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকায়। এই বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের নজির এই মূল্যবান সংকলন।

বিশ্বের বিচিত্র বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অধ্যয়ন এবং সেই অধীত বিদ্যাকে কেন্দ্র করে তাঁর মনীষাদীপ্ত রচনাবলীতে বিস্মিত হতে হয়. কারণ সুবোধ ঘোষের জীবনে বৈদ্যালয়িক সংসক্তির কোন যাদুকরী অভিজ্ঞান নেই, হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের এই দারিদ্র্য-প্রপীড়িত যুবককে কলেজের পাঠ শিকেয় তুলে রেখে অনতিকালের মধ্যেই বিচিত্র ধরনের পেশায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল এবং জীবনকে বাজি রেখে তিনি নিছক বেঁচে থাকার সংগ্রাম শুরু করতে বিদেশের মাটিতেও পা রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিকে শুধু জীবনধারণের প্রশ্নে মৃত্যুকল্প জীবিকাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকা, অন্যদিকে প্রখ্যাত দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের দরজা এই জিজ্ঞাসু যুবকটির জন্য উন্মুক্ত হয়ে-যাওয়া-অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের দ্বিমুখী অভিঘাত মাত্র কয়েকবছর পরেই সুবোধ ঘোষকে দিয়ে লিখিয়ে নিল 'অযান্ত্রিক' নামক একটি চিরায়ত গল্প ও 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড' নামক মনস্তত্ত্বমূলক বই। তখন থেকেই আপ্রয়াণ তাঁর দ্বৈতসত্তার অভিযাত্রা চলেছে। তবে কথাশিল্পী হিসেবে তিনি স্বয়ংসম্রাট বা দ্বিতীয় বিধাতার মর্যাদা পেয়েছেন। যাবতীয় মৌলিকতা, মনীষাপ্রদীপ্ত বিচারবোধ এবং মননশীল অনুসন্ধিৎসা সত্ত্বেও একথা বলতেই হবে তাঁর এই ভিন্নতর রচনাবলী নানা কারণে পাঠকের কাছে ততটা পৌঁছতে পারেনি। তাই তাঁর নানা বিষয়ের উপর রচিত বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠকদের কাছে অপরিচিত থেকে যায় এবং প্রচারের আলোয় আলোকিত না হওয়ার দরুন বেশ কিছু গ্রন্থ বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। আমাদের সৌভাগ্য, সুবোধ ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তম তাঁর পিতার যাবতীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ একত্রে সংগ্রহ করে সম্পাদনা করে প্রকাশ করতে উৎসাহী হন এবং এই ব্যাপারে আমাকে পূর্ণ দায়িত্ব দেন।

সুবোধ ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গি যে সমাজের কতদিকে সম্প্রসারিত হয়েছিল তা জানলে সত্যিই বিস্মিত হতে হয়। 'বাংলার চড়ক উৎসব'-এর সঙ্গে অল্পবিস্তর আমাদের সকলেরই পরিচয়

আছে। কিন্তু সুবোধ ঘোষ এই উৎসবকে আখ্যা দিয়েছেন 'বাংলার প্রকৃত গণ উৎসব' বলে এবং তাঁর এই অভিধা-প্রদানের সমর্থনে এই উৎসবের রীতি-প্রকৃতি, বৌদ্ধতন্ত্রবাদের সঙ্গে সাদৃশ্য এবং সন্ন্যাসীদের নানাধরনের বিভাজন ও রীত-প্রকরণ সম্পর্কে বহু তথ্যাদি জানিয়েছেন। 'এরা আমাদেরই লোক' শীর্ষক রচনায় সাঁওতালদের বিভিন্ন সামাজিক প্রথার ইতিহাস রচনা করে তিনি সমাজের এই অবহেলিত শ্রেণীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন—নৃতত্ত্বের আসরে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষেরা গ্রানাইটের মতো গুরুত্বস্থানীয়। সাঁওতাল দম্পতি আদর্শ যৌনজীবনের সুচারু শিল্পময় প্রতীক। 'বৈধব্য প্রথা' যে এদেশে অশেষ কুসংস্কার ও নারী-নিগ্রহের এক চূড়ান্ত অমানবিক প্রথা—তা আমরা জানি। কিন্তু সুবোধ ঘোষ এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর গবেষণামূলক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিধবাদের সামাজিক অবস্থার বিচিত্রধর্মী বিচরণে—আমেরিকার ইঙ্কা সভ্যতা, ফিজি দ্বীপ, মধ্য অস্ট্রেলিয়ার আরুন্টা জাতি, ইয়োরুবা নারী, পাপুয়া, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে মিনা নামক প্রাচীন সম্প্রদায় ও টাকুনি জাতি, পর্তুগীজ, পূর্ব আফ্রিকা, মেলানেসিয়া, আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশ, টোগোল্যাণ্ড, লোয়ানগো দেশের আদিম বাসিন্দা, চীন, নিগ্রোদের মধ্যে মাসাই জাতি, ফরমোজা দ্বীপ, আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চল এবং ফরমোজা প্রভৃতি অঞ্চলের বিধবাদের প্রতি অশেষ নৃশংস ঘটনার তথ্যভিত্তিক ইতিহাস আমরা পেয়ে যাই।

সুবোধ ঘোষ খুঁজেছেন কেন বাংলা কাব্যে প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব নেই তার ভৌগোলিক তথ্য, মানুষের সঙ্গে কুকুরের হার্দিক সম্পর্কের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস, ঐতিহাসিক পুরাকীর্তিগুলোর যাদুকরী মোহসঞ্চারী আবেশ ও আবেদন। শব্দের মাধুর্য ও ধ্বনিগত উপভোগযোগ্যতা থাকলে শিল্পের রসগুণে পাঠকেরা আকৃষ্ট হন—এটা সুবোধ ঘোষের দৃঢ় বিশ্বাস। আবার, রোমান্সের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন বাস্তব আর রোমান্সের সম্পর্ক হল 'খোঁপা আর এলোচুলের মতো'। ক্লোরোফিল যেমন উদ্ভিদের হরিৎপ্রাণ সুষমা, ভাইটামিন যেমন খাদ্যের পুষ্টিপ্রেরণার আধার, রোমান্স তেমনই বস্তুর কল্পনারূপ। এই নিবন্ধের উপসংহারে লেখক একটি চমকপ্রদ সত্যের আবিষ্কার করেছেন 'চাষার আবেগ বৈজ্ঞানিক রোমান্সের একটি নমুনা।'

মানুষের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানাবিধ কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা লেখককে নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে—যে জন্মান্ধ সে গোস্বামীর মুখে বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়নমনোহর রূপবর্ণনা শুনে আনন্দে অশ্রুপ্লাবিত হয় কেন? তা হলে রূপ-সৌন্দর্যের আস্বাদনের প্রশ্নে চোখই কি একমাত্র ইন্দ্রিয় নয়? তিনি অনেক অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছেন, রুচি জিনিসটার কোন সনাতন সংজ্ঞা নেই। এজন্য রূপেরও কোন সনাতন সংজ্ঞা নেই। রুচি অনুযায়ী রূপের সংজ্ঞা তৈরি হয় দেশ-কাল-সংস্কৃতির তারতম্য অনুসারে।

'যন্ত্র দানব নয়' রচনাটি লেখকের একটি ব্যতিক্রমী ভাবনার অসাধারণ ফসল। এ দেশের মানুষ সাধারণভাবে যন্ত্রবিমুখ। যন্ত্রের দ্বারা সমাজ পরিচালিত হলে ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যায় আক্রান্ত এই দেশের মানুষেরা কর্মহীন হয়ে পড়বে না তো? মূলত এই আশঙ্কায় তাড়িত হয়ে এ দেশের মানুষ সাধারণত যন্ত্রকে কখনও ভালভাবে মেনে নেয়নি। মাদ্রাজে প্রথম রেলপথ স্থাপিত হলে কয়েকজন কৌতূহলী ব্রাহ্মণ সেই লৌহবর্ত্ম দেখতে গেলে সামাজিক অনাচারের দায়ে তাদের জাতিচ্যুত করা হয়। একালেও মানুষের যন্ত্রবিমুখতা

রয়েছে। সভ্যতার বিবর্তনে যন্ত্রের বিশাল ভূমিকা থাকলেও এখনও সভ্যতাগর্বী মানুষ 'যন্ত্রদানব' বলে। অথচ, প্রথম পালতোলা নৌকো, প্রথম হাড়ের বাঁশি তো যন্ত্র সভ্যতারই দান এবং মানুষ সেই আবিষ্কারে খুশি হয়েছে। তবু আমাদের মনে যন্ত্রের প্রতি একটা সামগ্রিক বিরূপতা রয়েছে। একটা সাধারণ অটোমোবিলের বেগৈশ্বর্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অশ্বটির বেগবত্তার তুলনায় কি অসুন্দর? বিরাট একটা বয়লারের দৃপ্ত চেহারা একটা হাতির চেহারার তুলনায় হীনতর নয়, গ্রামোফোনে একটি লোহার পিন যে সংগীত-সমারোহ সৃষ্টি করে সেটা কোকিল-শ্যামা-দোয়েলের কাকলি ঝংকারের তুলনায় ঘৃণ্য নয়। যে-কোন চলন্ত মেশিনের সুচিক্কন নিরেট রূপের স্ফূর্তি—ভ্যালভ পিস্টন গিয়ার নাট বোল্টের ঝকঝকে আভরণ আর স্বচ্ছন্দ বিঘূর্ণনের মধ্যেও শ্রী আছে। সুবোধ ঘোষ তাই যন্ত্রকে 'জ্ঞান-লক্ষ্মীর সন্তান' আখ্যা দিয়েছেন। কখনও-কখনও মানুষের অসৎ মন তাকে অসৎ কাজে নিয়োজিত করেছে। এই দায়িত্ব মানুষেরই। যন্ত্র অন্যান্য জন্তুর মতো কাউকে নিজে থেকে সর্বনাশ করতে দৌড়য় না। যন্ত্রের মতো এত বাধ্য সেবক মানুষের দ্বিতীয় কেউ নেই। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের একাত্মতা নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকেরা ততটা না ভাবলেও যারা যন্ত্রজীবী বা যন্ত্রশ্রমিক তারা কিন্তু যন্ত্রকে ভালোবাসতে আরম্ভ করেছে, কারণ যন্ত্র যে মানুষের নিজের জ্ঞানজ সন্তান। তাই, লেখক তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক'-এ বিমলের মতো চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

সুবোধ ঘোষের 'মৃত্যুং তীর্ত্বা' রচনাটি রবি-প্রয়াণের পর বত্রিশে শ্রাবণ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে প্রেরিত তাঁর শ্রাদ্ধ-বাসরের প্রতিবেদন। আশ্রমের বাতাসের আর্ত আলোড়ন, বৃষ্টির শব্দ, জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ, বৈতালিক দলের সুস্বর—সবকিছুতেই লেখকের মনে হয়েছে, এক মহাকবি মর্তের বন্ধন ক্ষয় করে কালের যাত্রায় বিদায় নিয়েছেন। '৩রা মার্চ' নিবন্ধটি গান্ধীজির অনশন ব্রতের সমাপ্তিতে লেখকের স্বস্তিদায়ক অনুভূতির প্রকাশ এবং ভারত-ইতিহাসে গান্ধীজির অবদান সম্পর্কে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-নিবেদন।

বিভিন্ন ছোট-বড় ঘটনা লেখকের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে, তাই নিয়েও তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে। একজন মহিলা দারিদ্র্য, নিঃসঙ্গতা, আশ্রয়হীনতা, অবহেলা, অত্যাচার ও অপমান সত্ত্বেও তার পুঁটলিতে সযত্নে সঞ্চয় করে রেখেছিল এক টুকরো ইঁট। বস্তুবিশেষের প্রতি এই অকারণ মমতাকে মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন 'ফেটিশ'। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, মানুষের এত গর্বের স্নেহ বাৎসল্য সতীত্ব ভক্তি প্রীতি ও নিষ্ঠার প্রতি অকারণ মোহও কি এক ধরনের 'ফেটিশ'? একালে রোগে বা অপঘাতে অঙ্গহানি ঘটলে কত সুশ্রী ও সুন্দর মানুষকে চিরকাল বীভৎস দেহের অবমাননার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় না, দুঃখকে দুরপনেয় মনে করে এবং দুরদৃষ্টকে দুরপহার্য মনে করে জীবনের ধিক্কার নিয়ে পড়ে থাকতে হয় না, কারণ এখন প্লাস্টিক সার্জারির যুগ এসে গেছে। অথচ ওড়িশার ললিতগিরি ও খণ্ডগিরিতে কালাপাহাড়দের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পাথরের মূর্তিগুলো আধুনিক ভাস্করেরা পুনর্নির্মিত করতে পারেননি কেন? এমনিভাবেই লেখক ভেবেছেন, মানুষের অহংবোধে একটা সংগ্রাম করার গর্ব থাকলেও সে কিন্তু সত্যিই কোনদিন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেনি। যিনি ধানের বীজ পুঁতে পৃথিবীতে শস্যের প্রথম আবিষ্কার করলেন তিনি সেনাপতি নন, তিনি সভ্যতার প্রথম আচার্য। এমনিভাবেই লেখক 'মুক্তা ফলের লোভে' নিবন্ধে আমাদের অবহিত করেন জলগর্ভের বিচিত্র বিস্ময়কর পরিচয় এবং ডুবুরীদের দুঃসাহসী ও রোমান্টিক নেশার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য;

তিনি লক্ষ্য করেছেন তক্ষশীলা উজ্জয়িনী পাটলিপুত্র ও ওদন্তপুরী স্থানগুলো যাবতীয় ঐতিহাসিকতা নিয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেলেও শত-শত যুগের চিন্তা আশা আনন্দ ও সৃষ্টি বারাণসীতে এখনও সক্রিয়ভাবে কাজ করে চলেছে। তিনি চেয়েছেন, আমাদের যুগের আনন্দ বেদনা সংসার সংগ্রাম শুধু ভাষা ও ছন্দের জোরে মুখর হবে না, শুধু ভারের ভারে ঋদ্ধ হবে না, শুধু জ্ঞানঘন হবে না, তাকে রূপময় হতে হবে।

সুবোধ ঘোষ বিস্ময়ের সঙ্গে আক্ষেপ করেছেন, সিন্ধুনদের সমগ্র উপত্যকা জুড়ে যে সভ্যতার বিস্তার ছিল, যে মানুষেরা দূর ব্যবিলন ও মিশরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রাখত, যাদের শিল্পরুচি এত উন্নত ছিল, যারা এত উন্নত নগর পত্তন করার মতো পূর্ততত্ত্ব আয়ত্ত করেছিল, তাদের নামধাম আচার-ব্যবহার ভাষা পরিচ্ছদ—কোন কিছুরই বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না। নাচের ছবি বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন, যে বস্তুর প্রাণ গতি, তা ফটোতে বোঝানো সম্ভব নয়। যে লাস্য অঙ্গহার রেচক ও মুদ্রার ছন্দোময় গতিহিল্লোলে নৃত্যের রূপ সৃষ্টি হয়, সে জিনিস ফটোতে তুলে ধরা অসম্ভব। বাঙালি কোন্ জাতি—এই প্রশ্নে আলোড়িত হয়ে লেখক অনুধাবন করেছেন, বাঙালির করোটিতে খুব বড় রকমের একটা বর্ণসাঙ্কর্যের ইতিহাস লেখা আছে। নেগ্রিটা আলপাইন, প্রোটো-অস্ট্রোলয়েড কিছুই বাদ পড়েনি। কিন্তু এই বদনের কারণ নাকি একেবারে বদলে যাবে একবার যাদুঘরে গিয়ে বাঁকুড়ার অনেক খাঁটী ব্রাহ্মণের মুণ্ড দেখলে। ওই চাক্ষুষ প্রমাণের পর বলা যাবে না আমরা বাঙালিরা অনার্য। তিনি কখনও বাংলাভাষায় অসংখ্য কাব্যময় শব্দের সন্ধান করেছেন, কখনও নারী যে একদা কোন অর্থেই 'অবলা' ছিল না তার ইতিহাসনিষ্ঠ তথ্য আবিষ্কার করেছেন। গভীর বেদনার সঙ্গে শ্লেষমিশ্রিত নৈপুণ্যে তিনি বুড়ো ভিখারী রাধু বৈরাগী ও নিঃস্ব পাগল রহমানকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিহত হতে দেখে মন্তব্য করেছেন ওরা নিহত হয়ে জীবনে এই প্রথম অর্জন করল হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব। তিনি জড় ও প্রাণের আবির্ভাব-রহস্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, জড়ই প্রাণের জনক। যেহেতু জড় থেকে জীব উদ্ভূত, সেই হেতু জীবের ধর্ম হল পুনরায় জড়ে পরিণত হওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মৃত্যু না হলে জড় হওয়া যায় না। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র জীব তার সকল রক্ত স্নায়ু পেশী অস্থি শ্বাস-প্রশ্বাসের আচরণে মৃত্যুকেই একান্ত মনে খোঁজে—যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চায়।

'মধুসূদনের দান' রচনাটি লেখকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে মধুসূদন-সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ করে বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের সঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পর্ক নিয়ে ঝড় তুলেছিলেন।

মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগরের স্মৃতিমন্দিরের প্রবেশ-উৎসবে রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠ করেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নতুন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্ব-শক্তি সত্ত্বেও সেগুলো তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃত রূপেই রয়ে গেল, বাংলাভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃত হল না। অথচ বিদ্যাসাগরের দান বাংলাভাষার প্রাণপদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে মিশে গেছে কিছুই ব্যর্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে সুবোধ ঘোষ লিখেছেন, মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের তুলনা অর্থহীন। একজন লিখেছেন কাব্য ও নাটক, অন্যজনের প্রসিদ্ধি প্রবন্ধ ও আখ্যায়িকা-রচনায়। এটা ঠিকই যে মধুসূদনের ইরম্মদ, মদকল, কাকোদর, প্রক্ষেড়ন, তৈঁই, হায়রে, যেমতি, হর্যাক্ষ, কর্বুর ইত্যাদি শব্দগুলো পরবর্তীকালে

বাংলাসাহিত্যে ঠাঁই পায়নি, তেমনি বিদ্যাসাগরের খড়কী, নবোঢ়াচেষ্টিত সমুদয়, অহো! হা হতোস্মি, নিবেদিল, জিজ্ঞাসিল, বিচেতন ইত্যাদি শব্দসমূহ বাংলাভাষায় পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়নি। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর প্রথম পাতায় ব্যবহৃত যেমতি, তেমতি, উর শব্দগুলো যেমন বাংলাভাষা পরবর্তীকালে গ্রহণ করেনি, তেমনি 'সীতার বনবাস'-এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রার্থয়িতব্য, ভূয়োভূয়ঃ, অনিষ্টাপাত, ত্বরায়, যাদৃশ, তাদৃশ শব্দগুলোও পরবর্তীকালে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন শব্দের টেকনিক, ভাষার কারুকলা, সমাসগঠনের বৈচিত্র্য ও শব্দচয়নের যে আদর্শ প্রথম প্রবর্তন করেন তা তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিত হয়নি। মাইকেল-প্রতিভার সমগ্রগ্রাহিতার উদাহরণস্বরূপ তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের কয়েকটি উদ্ধৃতির পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় অভিশাপ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক দুই কবির রচনারীতির সাদৃশ্য দেখিয়েছেন এবং নাটকের ক্ষেত্রে মাইকেলের অসাধারণ কীর্তি হিসেবে তাঁর ব্যবহৃত চলতি ভাষা ও উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বহু নাট্যকারের রচনারীতিতে সেই প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

আমরা লক্ষ্য করেছি, সুবোধ ঘোষ তাঁর নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনের নানা প্রান্ত স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তাঁর 'রুশে জার্মানে' রচনাটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ফিনল্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনর শত মাইল ফ্রন্টে দুই শক্তিধর দেশ আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত ছিল যে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে, তার একটি প্রতিবেদন ; জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিশেষত অসংখ্য ঘটনা থেকে নেকড়ে ও মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ে লেখক একটি গবেষণাধর্মী নিবন্ধ উপহার দিয়েছেন 'পশুপালিত মানুষ' নিবন্ধে ; রবীন্দ্রনাথ যে আইনস্টাইনের চতুর্থ আয়তন অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ ছাড়াও কাল আবিষ্কারের ছপ্পান্ন বছর আগে ১২৯১ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকায় এই ধরনের একটি তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বৈজ্ঞানিক মতামতের অভিমত প্রকাশ করেন—এটা সুবোধ ঘোষের পরিশ্রমলব্ধ আবিষ্কার।

'ফিরে চল' নিবন্ধে সুবোধ ঘোষ তাঁর ভারত-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রকৃতি-প্রেম এক অসামান্য অনুরাগে প্রকাশ করেছেন। এই রচনায় তাঁর ভূমিকা ভারত-প্রেমিকের। বিংশ শতাব্দীর নরমেধের আসর থেকে তিনি পুরোনো সময়ের কাছে, পুরোনো সভ্যতার সান্নিধ্যে ফিরে যেতে বলেছেন। বর্তমান সভ্যতার ভাণ্ডারে জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই আছে, কিন্তু সব কিছুই মারণ-উত্তেজনার উৎসাহে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই, মানবতাবাদী লেখক এই বারুদের ধোঁয়া মাইন টর্পেডো বোমা ট্যাঙ্ক মেশিনগান ও বিস্ফোরকে আচ্ছন্ন বিকৃত ক্ষাত্রবীর্যের তাণ্ডব থেকে পিছনের পথ ধরে চলতে বলেছেন নৃত্য-গীত-রোমাঞ্চ পরিবৃত শাহীবাগে অথবা পুরোনো দিনে দশার্ণ জনপদের চৈত্যবৃক্ষের পাশ দিয়ে রেবা শিপ্রা নির্বিন্ধ্যা ও বেত্রবতীর জলে জবাকুসুমসন্নিভ সন্ধ্যারাগের ছটা দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে বলেছেন অথবা আরও পিছনে ব্যাধি-জরা-মৃত্যুকণ্টকিত এই সংসারের প্রপঞ্চ পিছনে ফেলে শুধু তথাগতের বাণীকে পাথেয় করে বৈশালীর পথ ধরে হাঁটিতে পরামর্শ দিয়েছেন। অথবা পিছিয়ে যেতে হবে আরও পুরোনো কালে যখন উদ্গাতার কণ্ঠে ঋকমন্ত্রের অনুষ্টুপ সুমন্দ্রে উৎসারিত হত এবং ছয় ঋতু ধরিত্রীর সাজবদল করলে বিস্মিত ঋষিরা পরমশ্রদ্ধায় আহ্বান করতেন—সবিতৃ, পূষণ, পর্জন্য, স্বাহা—প্রসন্ন হও। হে বিচিত্র, তুমি প্রকাশিত হও। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' এমন কী, আদিম সমাজের সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু উৎসব আনন্দে ভরা আরণ্যক জীবনের মাঝখানে গিয়েও উপস্থিত হওয়া চলে। সভ্য সাধনার সকল ব্যর্থতার

ধিক্কার নিয়ে পুরাকল্পের পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে আদিম মানবের আত্মীয় হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করতে লেখক পরামর্শ দিয়েছেন কারণ এখনও ওখানে 'ফিলসফি ও পলিটিক্স' সৃষ্টি হয়নি।

একটি ছোট্ট ঘটনাই সুবোধ ঘোষের শিল্পচেতনায় অনেক সময় একটা নতুন মাত্রা যোগ করত। দারোয়ান চৌবেজীর কপালে রক্তচন্দনের তিলক দেখে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নরমাংসাশী মানুষের ইতিহাস খুঁজেছেন ;মানসকুট অর্থাৎ কমপ্লেক্সের কথা বলতে গিয়ে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য উদাহরণ সহযোগে কমপ্লেক্সের শ্রেণীবিভাজন করেছেন—সুপিরিয়রিটি, ইনফিরিয়রিটি, স্যাডিজম বা নিগ্রহামোদ, ট্রান্সভেস্টিজম, পিগম্যালিয়ানিজম, সাদীয়, মাসখীয় কমপ্লেক্স। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের শবদাহের বিচিত্র প্রথা লেখককে দিয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস তৈরি করিয়ে নিয়েছে, ডাইনদের সামাজিক গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন বর্তমান যুগের বহু নিন্দিত ডাইনরাই ছিল একদিন মানুষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, সমাজের পরমপূজনীয় অধিকর্তা ও শুভাশুভের বিধাতা ;স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের 'ফুলরেণু' কাব্যগ্রন্থের ভাষার মধ্যে লিরিক সৌন্দর্যের সন্ধান পেয়েছেন। লেখক একটি নিবন্ধে জানিয়েছেন, দিব্যানুভূতি শুধু যোগী-সাধকের সাধনালব্ধ কোন আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার নয়—এক একজন মানুষের জীবনেও এটা একটা আকস্মিক বিস্ময়কর ব্যাপারও হয়ে উঠতে পারে—যেমন, বাল্মীকির মনে 'রামায়ণ'-এর জন্ম, জীবনের অনিত্যতাবোধে তাড়িত হয়ে লালাবাবুর বিবাগী হয়ে যাওয়া এবং একটি আপেল-পতন দেখে নিউটনের প্রতিক্রিয়া। এইরকম তিনটি অভিজ্ঞতা লেখকেরও হয়েছিল।

সুবোধ ঘোষের মননে অসংখ্য প্রথাবিরোধী চেতনা ধরা পড়ত। আমরা যখন বাবিলনের শূন্য প্রাসাদ, মিশরের পিরামিড, হেলেনিক গ্রীসের অ্যাম্ফিথিয়েটার ও পার্থেনন, গথিক প্রাসাদের কারুময় বিরাটত্ব, চীনের প্রাচীর, বোরোবুদুর, কোণারক ও তাঞ্জোর মন্দিরের প্রশান্ত পাষাণে সুগঠিত স্থাপত্যকীর্তিকে পরম বিস্ময়ে শ্রদ্ধা জানাই, তখন সুবোধ ঘোষ নির্দ্বিধায় জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিকতা প্রচারে আধুনিক স্থাপত্যকীর্তি যতখানি কাজ করেছে, কোন শিল্প মানব-সমাজের ততটা উপকার করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর নতুন শিল্পী হলেন আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার।

নৃতত্ত্ব যদিও একটি বিজ্ঞান কিন্তু সুবোধ ঘোষ স্তরবিন্যাস করে দেখিয়েছেন মানুষের অলৌকিক ও অবাস্তব কল্পনা কীভাবে উপকথা রূপকথা পুরাণ ও কিংবদন্তী মিশিয়ে বিচিত্র ধরনের নৃতত্ত্বের পত্তন করেছে। তিনি আবিষ্কার করেছেন ভারতের বিভিন্ন স্থানে কীভাবে বিভিন্ন শ্রেণী ও মানুষেরা ধর্মীয় বাধা অতিক্রম করে সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবনযাত্রানির্বাহের ব্যাপারে একটা শান্তির বাতাবরণ তৈরি করতে পেরেছে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে তিনি এক দুঃসহ অপরাহ্ণের ছবি এঁকেছেন ; তিনি শুনতে পেয়েছেন এক কাব্যতীর্থের হৃদয়ের স্বপ্ন আর প্রার্থনা যিনি বিয়াল্লিশের স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের এক গ্রামে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ('একটি নমস্কারে' উপন্যাসের অংশ) ; 'কিংবদন্তীর দেশে'-র কথা বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, গল্প সৃষ্টি করা যেমন মানুষের অন্তরের স্বভাবধর্ম, তেমনি গল্প শোনাও অন্তরের স্বভাবজাত ক্ষুধাবিশেষ এবং মানুষ বহু কাহিনী সৃষ্টি করে স্থানিক ঘটনা, স্থানিক দীঘি নদী অরণ্য পাহাড় জলকুণ্ড বটবৃক্ষ শ্মশানভূমি এবং প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে।

'ময়নাঘরের বিস্ময়' নিবন্ধে আমরা পাই মানব-জীবন সম্পর্কে সুবোধ ঘোষের আর এক অনির্বচনীয় কৌতূহলের সুস্পষ্ট নিদর্শন। লাশকাটা ঘরে কুৎসিত এক ভিখারিণী তুলসীর শব-ব্যবচ্ছেদ করছিলেন কৈলাস ডাক্তার। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপোপজীবিনী নটীর লাশ তাঁর হাত দিয়ে পার হয়েছে কিন্তু তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। কৈলাস ডাক্তার দেখতে থাকেন তার প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মতো বরাঙ্গের প্রকট রূপ, নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মতো উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মতো শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। ছুরির ফলার আঘাতে পাকস্থলী দু'ভাগ করা হলে কৈলাস ডাক্তার খুঁজে পেলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্রোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ, পাঁউরুটি, আর···বেলেডোনা। মার্ডার! তিনি তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদন করে ধীরে ধীরে টেনে তুললেন—পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা, মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসলা ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, যেন বিষিয়ে নীল হয়ে রয়েছে এক শিশু এশিয়া। এই অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাই সুবোধ ঘোষকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে তাঁর চিরায়ত গল্প 'সুন্দরম্'। প্রকৃতপক্ষে, এই নিবন্ধ উক্ত গল্পেরই অনবদ্য অংশবিশেষ।

এই পর্যায়ের প্রতিটি রচনাই যেন লেখকের অনেক উল্লেখ্য গল্পের পটভূমি। 'পাতালপুরীর চাকরি'তে সামান্য পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরি করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষতে-কষতে দিনেশ যখন অতল খাদে পৌঁছে যায় তখন সেই পাতালপুরীতে তার জন্য অপেক্ষারতা বিলাসীকে দেখতে পায় সে। ধুলোয় ঢাকা রুক্ষ চুলের উপর অজস্র অভ্রের কুচি চিকচিক করছে যেন একটা চুমকির জালি দিয়ে ঘেরা। কালো রঙে ছোপানো একটা ছেঁড়া শাড়ি, যেন রসাতলের এক তপস্বিনীর সাজ! ওরা হাড় দিয়ে পাথর ভাঙে। মর্ত্যনারীর মতো ওদের দেহ লালিত্যে লতিয়ে ওঠেনি। ধরিত্রীর এই তমসাবৃত জঠরলোকে ওদের অয়স্কান্তি আর কঠিন লাবণ্য কত নয়নাভিরাম, তা এখানে না এসে দেখলে কেউ বুঝবে না। এই পাষাণের ছন্দে ওদের যৌবন বাঁধা। এখানে ওই যুবতীর কাছে ক্লিওপেট্রাকেও কুৎসিত প্রেতিনীর মতো মনে হবে ('উচলে চড়িনু' গল্পের অংশ)। লেখকের 'জাদুঘরের জাদু' রচনাটির গর্ভেও রয়েছে একটি চিরায়ত গল্পের অস্তিত্ব। মহারাজপুরের জাদুঘরে ইতিহাসের গবেষক কুশল কাজ করতে এসে এক-একটা গ্যালারির আর তাকের নম্বর দিয়ে মূর্তি আর সামগ্রীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও স্তরে সাজিয়ে রাখতে থাকে। জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি, গোটা দশেক পোড়া মাটির বৃক্ষ, চুণাপাথরের একটা বিরাটকায় সিংহ, বৃক্ষ স্বস্তিকা বা গরুড়ের মূর্তি আঁকা মুদ্রা, শঙ্খের বেদিকা, অস্থিভস্মের আধার, গজদন্তের মঞ্জুষা, ধাতুর দীপাধার, কজ্জ্বল-শলাকা, স্খলিত নূপুর, বিলাসবতীর একটি দর্পণের ভগ্নাংশ ইত্যাদি ছাড়াও ছিল সুতনুকা তরুণীর লাক্ষার কর্ণপুর এবং অনেকগুলো দ্বিভঙ্গ নায়িকামূর্তি। কিন্তু একটি ব্রোঞ্জের দেবিকামূর্তি পেয়ে কুশল কিছুতেই সেটিকে মঞ্চের উপরে দাঁড় করাতে পারে না। মূর্তিটির অবয়ব-সৌষ্ঠবে ছিল একটা ছন্দ, মূর্তির চোখে ও শরীরে কল্লোলিত ছিল লাবণ্যময় কান্তি, অঙ্গ আবৃত ছিল অদ্ভুত পাথুরে পরিচ্ছদে, কটিমেখলার সঙ্গে গ্রথিত, যেন ঢেউ দিয়ে তৈরি একটি আচ্ছাদক, তার মাঝে মাঝে জলবেণীর কুঞ্চন, কিন্তু মূর্তিটি যেন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে জানে না, দাঁড় করাতে গেলেই হেলে পড়তে চায়। অনুসন্ধিৎসু কুশল পরে এর রহস্য জানতে পারে চৌধুরী সাহেবের রিপোর্ট পড়ে। এই গঙ্গা-মূর্তিটি হল যুগলমূর্তির একটি। মনে হয় এই মূর্তির পাশেই ছিল শিব গঙ্গাধর—যার

প্রসারিত বাহুতে গ্রীবার ভর সঁপে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গা। ('ত্রিযামা' উপন্যাসের অংশ।)

'লালকি নদীর বাঁধে' (গল্প 'ভাট তিলক রায়') সুবোধ ঘোষ খুঁজেছেন জড় ও জীবনের মিতালি, 'অতীত রূপ ও রূপাতীত'-এর মধ্যে তিনি পেয়েছেন সৌন্দর্যের চিরন্তন রূপ, 'রসিদ খলিফার মামাবাড়ি'তে ('বৈরনির্যাতন' গল্পের অংশ) তিনি দেখেছেন এক পার্থিব মমতার আবেশ। তিনি লক্ষ্য করেছেন টেথিস সমুদ্র-সম্ভূত হিমালয়ের জন্ম হয়েছিল পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের কয়েক কোটি বছর পরে। তিনি ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ ও সমগ্র পৃথিবীর দ্বীপগুলোর মধ্যে আকারে ও আয়তনে চতুর্থ দ্বীপ মাদাগাস্কারের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন 'সুন্দর মাদাগাস্কার'-এ। 'তিলাঞ্জলি'র লেখক সুবোধ ঘোষ চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন বাম-বিরোধী লেখক হিসেবে, 'অভ্যুদয়'-এর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিককে তাঁর স্বদেশের এক শ্রেণীর মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবেই গণ্য করত। তা ছাড়া, তাঁর রচনা ও চেতনায় গান্ধীজির প্রতি অসামান্য শ্রদ্ধা 'অমৃতপথযাত্রী'র লেখককে তারা বুর্জোয়া লেখক বলতেও দ্বিধাবোধ করেনি। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা জানতেন না তিনি 'উত্তর মেরুতে রুশ সভ্যতা' শীর্ষক একটি রচনায় কী লিখেছিলেন। মুক্তমনের মানুষ না হলে তিনি লিখতে পারতেন না—সচরাচর আর্থনীতিক কারণে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করা হলেও সোভিয়েট রাশিয়া উত্তর মেরুর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতিদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নয়ন ও আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সমান্তরালভাবে তাদের জীবনযাত্রার ধারা অত্যন্ত আধুনিক করে গড়ে তুলেছে। রাশিয়ার প্রতি লেখকের এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা কি চোখে দেখবেন?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নানাবিধ উদ্ভট মানসিকতার কাহিনী তিনি শুনিয়েছেন 'বিচিত্র ছলনাজালে' নিবন্ধে ; 'কী কথা বলে সমাধি' শীর্ষক রচনায় লেখক বিভিন্ন সমাধিগাত্রে মৃত ব্যক্তির অথবা অন্য কারও উৎকীর্ণ লিপি দেখে ভেবেছেন, সমাধির সাহিত্য যেন সাধারণ সংসারের সাধারণ বন্ধন থেকে বিমুক্ত একটি স্বতন্ত্র প্রাণের সাহিত্য। 'কাগজের নৌকা' একটি অভিশপ্ত বাল্যপ্রণয়ের গল্প। এর বিশেষত্বই একে প্রবন্ধাবলীতে ঠাঁই দিয়েছে।

সুবোধ ঘোষ আদিবাসী-সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন। 'আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সমস্যা' নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আদিবাসীদের ভাষা হল শুধু কথিত ভাষা, এদের ভাষাকে লিপিবদ্ধ করে রূপ দেবার মতো কোন অক্ষর আবিষ্কৃত হয়নি। আদিবাসীরা ভারতের প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলোর মাধ্যমে কাজকর্মের প্রয়োজনে ওই ভাষা শিখেছে। তিনি বলেছেন, হিন্দী ভাষার সাহায্যেই সুন্দর ও বিরাট 'সাঁওতালী সাহিত্য' রচিত হতে পারে। বাংলা ভাষার সাহায্যেও বিশেষ একটি 'পাহাড়িয়া সাহিত্য' রচিত হতে পারে। আদিবাসী উপজাতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য এবং বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জীবনের পরীক্ষায় যোগ্য হবার জন্যই তাদের পক্ষে একটি উন্নত ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করা উচিত। 'উপজাতীয় সমাজ-সংস্কৃতি' রচনাটিতে লেখক দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ সরকারের বন-নীতি সাধারণ ভারতীয় গ্রামবাসী ও উপজাতীয় আদিবাসী উভয়েরই অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। বনের উন্নতি আদিবাসী সমাজেরই উন্নতি। টাটানগরের ইস্পাত কারখানায়, কয়লার খনিতে, চা-বাগানে এবং পূর্ত দপ্তরের সড়ক তৈরির জন্য পাথর বিছোনোর কাজে ও ক্ষেতমজুর হিসেবে আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোককে কাজে তো লাগানো হয়-ই, ভূমিদাসপ্রথা চালু করে এদের অনেককে বংশানুক্রমে ভূস্বামী ও সমাজের উঁচুস্তরের

মানুষেরা ক্রীতদাস বানিয়ে রাখেন এবং ওই পরিবারগুলোর মেয়েদের ভোগ করেন। শুধু আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকই নয়, এই মধ্যযুগীয় প্রথার শিকার একালের অনেক দরিদ্র পরিবারও। জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারলে তারা ভূমিদাস হয়ে যায়। ছোটনাগপুরে এর নাম কামিয়ৌতি, ওড়িশায় বলে গোঠি। ভূস্বামী, মহাজন এবং সরকারী কর্মচারী—এই তিনের উদ্যোগেই দাসমজুর প্রথা চলছে।

'কংগ্রেস ও আদিবাসী' নামক তথ্যভিত্তিক নিবন্ধে আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কী কী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে, লেখক তা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন সংস্কারে আদিবাসী অঞ্চলগুলোকে যেভাবে 'বহির্ভূত' করা হল, কংগ্রেস সেই ব্রিটিশ কূটনীতির তাৎপর্য বুঝে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিল। 'বহির্ভূত' অঞ্চল সম্পর্কে ভারতে যখন ক্ষোভ দানা বাঁধছে তখন দাম্ভিক চার্চিল ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঘোষণা করেন, তিনি গোটা ভারতবর্ষকেই 'বহির্ভূত' অঞ্চল হিসেবে ঘোষণার পক্ষপাতী। এই প্রসঙ্গে লেখক আরও দু'টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমটি হল, দেশ-সেবকেব জন্য গান্ধীজি যে আঠারো দফা গঠনমূলক কর্মবিধি প্রণয়ন করেছিলেন, তার ষোলো নম্বরের নির্দেশটি ছিল আদিবাসী-সেবা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গান্ধীজির এই নীতি কংগ্রেসকর্মীরা কাজে পরিণত করেননি। দ্বিতীয়টি হল ছেচল্লিশ সালে মুসলীম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হলে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার উনিশ লক্ষ আদিবাসীর উন্নতিসাধনের জন্য তাঁরা কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

'আদিবাসী সমস্যা ও বিশেষজ্ঞেব অভিমত' শীর্ষক নিবন্ধে সুবোধ ঘোষ বলেছেন ভূমি-ঋণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ আইন ও ব্যবস্থা ভারতের চাষী সমাজকে বেশি বিপর্যস্ত ও শোষিত করেছে কারণ আদিবাসীরাই বিশেষভাবে অজ্ঞ, নিরক্ষর ও দরিদ্র একটি সমাজ। ডাঃ হাটন, মিঃ গুবার্ট, শরৎচন্দ্র রায়, ডাঃ ডি এন. মজুমদার, ভাই অমৃতলাল ঠক্কর, মিঃ ভেরিয়ের এলুইন, ডাঃ জি. এস. ঘুরে প্রমুখ বিশেষজ্ঞেব অভিমত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে লেখক ওঁদের দু'রকমের দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিমত পেয়েছেন। একদল বিশেষজ্ঞকে উনি 'স্বাতন্ত্র্যবাদী' বলে অভিহিত করেছেন। এঁরা মনে করেন, ভারতের সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং আদিবাসী সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে থাকবার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। আর একদল বিশেষজ্ঞকে উনি বলেছেন 'সাযুজ্যবাদী'। এঁরা মনে করেন, সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের উন্নতি হয়েছে এবং যাতে আদিবাসী এই সভ্যসমাজের সজীব অঙ্গ হিসেবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তিলাভ করে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষ করে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক, সমাজ-সংস্কারক ও কংগ্রেসের জাতীয় নীতি এই অভিমতের সমর্থক।

ভারতের বিস্তৃত পটভূমি ছেড়ে সুবোধ ঘোষ স্বতন্ত্রভাবে 'বাংলার আদিবাসী'দের নিয়ে চিন্তা করেছেন এই শিরোনামাঙ্কিত নিবন্ধে। অবিভক্ত বাংলা যখন বিভক্ত হয়ে দুই বাংলায় রূপান্তরিত হল তখন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের আদিবাসীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে তেরো লক্ষ আটাশি হাজার সাতশো আশি এবং দু'লক্ষ সাতাশি হাজার দু'শো সতেরো জন। এই সংখ্যার মধ্যে উপজাতীয়দেরও ধরা হয়েছে। বাংলার প্রকৃত আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যার হিসেব নিতে গেলে শুধু ভাষাগত বিচার করলেই চলবে না। লেখক বলেছেন—ভাষা যাই হোক না কেন, সামাজিকভাবে যারা উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করছে, তাদের আদিবাসী বা উপজাতীয় বলেই গ্রহণ করা উচিত। বাংলার আদিবাসী সমাজের কুলজী বিচার করে

তিনটি পর্যায়ে দাঁড় করানো যেতে পারে—১. বংশে হিসেবে আদিবাসী, যাদের ভাষা উপজাতীয়, সমাজও উপজাতীয় অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ ; ২. বংশে হিসেবে আদিবাসী, যাদের ভাষা প্রাদেশিক অথচ সমাজ উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ স্তরেই আবদ্ধ আছে ; ৩. বংশে হিসেবে আদিবাসী, যারা প্রাদেশিক হিন্দুর ভাষা এবং হিন্দুর সমাজ গ্রহণ করে একটা 'জাত' হয়ে গেছে। অর্থাৎ, আদিবাসী হয়েও যাদের ভাষা উপজাতীয় নয়, সমাজও উপজাতীয় গোষ্ঠী-বদ্ধতার মধ্যে আর নেই। ধর্মের দ্বারা ঠিক উপজাতীয়ত্ব বা আদিবাসিত্ব নির্ণয় করা যায় না। বহু আদিবাসী আছে যাদের ভাষা ও সমাজ দু'টি খাঁটি উপজাতীয় স্বরূপে রয়েছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা করে না।

'শিল্পীর স্বাধীনতা' ভারত-চীন সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে লেখা প্রবন্ধ। সুবোধ ঘোষ এই রচনাটি তৈরি করার দু'দশক আগে থেকেই এদেশে ভারত-প্রেমিক জাতীয়তাবাদী মার্ক্সবাদ-বিরোধী লেখক হিসেবে চিহ্নিত। এই কারণে আমরা সহজেই বুঝতে পারি তিনি শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে নিজের মতবাদকে জোরালো হিসেবে ও উপলব্ধির স্বাধীনতাকে বাইরের কোন ইচ্ছা, নির্দেশ, অভিরুচি অথবা প্রভুত্বের সন্তুষ্টির জন্য খর্ব করে দিতে পারেন না। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের সাময়িক কোন কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে আত্মসংযমের মাত্রা স্বীকৃত। কারও ধর্মবিশ্বাসের উপর রূঢ় আঘাত, সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্ররোচনা, শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা লঙ্ঘন ইত্যাদিতে শিল্পীর নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা নেই। একনায়কের দেশে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট একনায়কের দেশে এমন ট্র্যাজেডি ঘটেছে। মাননীয় ক্রুশ্চেফ নিজেই বলেছেন, তাঁর কালের এক হাজার সোভিয়েট লেখক বস্তুত এক হাজার 'ডেড সোল' বা মৃত আত্মা। সুবোধ ঘোষ বলেছেন, 'আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট সাহিত্য নিতান্ত একটি কপট সৃষ্টি, সেটা বস্তুত দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতক প্রচেষ্টার নিদর্শন।' অতঃপর তিনি আরও আক্রমণাত্মক হয়েছেন। তাঁর মতে মার্ক্সের অভিমত আজকের পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার কাছে নিতান্ত সেকেলে একটি আবেদনমাত্র। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের পক্ষে মার্ক্সীয় অভিমতের দাবি বস্তুত জীর্ণ অতীতের দাবি। মার্ক্সের তত্ত্ব ও লেনিনের নাম নিয়ে এদেশে সেকালের কেতাবী ধর্মোন্মাদনার মতো একটি রাজনৈতিক মতবাদের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। সুবোধ ঘোষের মতে, এই মতবাদ শিল্পীর চিন্তা ও কল্পনার স্বাধীন প্রকাশ সহ্য করতে চায় না। অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে ইউরোপ কয়েক শতক ধরে চরম সত্য বলে মেনে নিয়েছিল বলেই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আজকের পৃথিবীর মানুষের পক্ষেও সন্দেহ ও ভয় করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, মার্ক্সীয় অভিমতকে একটি চরম রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক সত্য বলে মেনে নিয়ে কম্যুনিজমও স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার অভিব্যক্তি স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। লেখক হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ কোন দেশের শিল্প ও সাহিত্যের উপর ফতোয়া জারি করেনি কিন্তু কম্যুনিজমই একমাত্র মতবাদ যা একটি বিশেষ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থের নির্দেশে ও ইচ্ছায় অন্য দেশেরও সাহিত্য-জীবনের উপর একটা শাসন জাহির করতে চেষ্টা করছে। তিনি গভীর বেদনা ও বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, আমাদের দেশের কম্যুনিজমের প্রচারের একটি প্রধান লক্ষ্য হল শিল্পীর চিত্তের সহজ দেশপ্রেমের আগ্রহটির বিনাশ সাধন করা। এমনকী, গঙ্গা ও হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনাও নাকি শিল্পীমনের অধোগতি 'এবং স্টালিনকে কবিতায় মা বলাই প্রগতি।'

দুই

জীবনে ও সাহিত্যে সুবোধ ঘোষ অনেক বিষয়েই ব্যতিক্রমী। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী অথচ তাঁর প্রথম রচনা কোন গল্প বা উপন্যাস নয়। আমাদের সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই সাহিত্য জীবনের সূত্রপাতে কবিতা লিখেছেন কিন্তু আমাদের আলোচ্য লেখক কবিতা লেখার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করেননি। তিনি কলেজে মনস্তত্ত্বের ছাত্র ছিলেন না। অথচ তাঁর জীবনে ওই বিষয়টির প্রতি অনুসন্ধিৎসা তাঁকে দিয়ে 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড' গ্রন্থটি লিখিয়ে নিল।

তাঁর লেখা এই প্রথম বইটিতে মোট বারোটি অধ্যায় আছে—মনের রথী ও সারথি, মন ও মনসিজ, মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব, বাতিক ও সাইকো-অ্যানালিসিস, ভুল করি কেন, অকাজের কাজ, স্বপ্নাধ্যায়, স্বপ্ন-গঠনে কারিগরী, আসক্তি ও আসঙ্গ, রঙ্গভরা মন, টোটেম ও ট্যাবু, মনস্তত্ত্বের শেষ কথা।

প্রথম অধ্যায়ে ফ্রয়েডকে অবলম্বন করে লেখক মনের তিনটি স্তরভেদ দেখিয়েছেন—চেতনতা, অচেতনতা ও অর্ধচেতনতা। অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানের দুরূহতা হল, মনই মনের মহিমা খুঁজে বের করে। ইদ, ইগো ও বিবেকের ক্রমবিকাশের ধারা কীভাবে মানব-জীবনে ধাপে ধাপে ফুটে ওঠে, ফ্রয়েডের সেই আবিষ্কার লেখক এই অধ্যায়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ফ্রয়েডের সূত্র ধরে লেখক জানিয়েছেন, কামনার ফুল শুধু যৌবন-জলতরঙ্গের টানেই ভেসে বেড়ায় না। শুধু যৌবনধন্য নরনারী নয়, অতি অপোগণ্ড মনুজ সন্তানের মন কামরহিত নয়। তিনি বলেছেন, মানুষের অন্তর্চেতনা জুড়ে এক শক্তিরূপী কামবৃত্তি বিরাজ করছে। সকল প্রণয় কলার প্রধান লক্ষ্য হল, কাম-তৃপ্তি। তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, যোগশাস্ত্রে ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে মন সম্বন্ধে প্রাচীনদের গবেষণার উৎসাহ থাকলেও অধ্যাত্মবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ প্রভৃতি ধর্মানুষঙ্গিক চিন্তার চাপে এই আগ্রহ ও উৎসাহ আধুনিক বিজ্ঞানের সীমার বাইরে পড়েছিল। বিংশ শতকে এসে মাত্র চল্লিশ বছরের গবেষণার মধ্যেই মনস্তত্ত্বের গভীর গবেষণায় সাইকো-অ্যানালিসিস বিষয়টি আবিষ্কৃত হল যার বাংলা প্রতিশব্দ হল মনোবিকলন, মনোবিশ্লেষণ বা মনঃসমীক্ষণ।

চতুর্থ অধ্যায়ে ফ্রয়েডের সূত্র ধরে সুবোধ ঘোষ জানিয়েছেন, সাইকো-অ্যানালিসিসের সঙ্গে বাতিকের সম্পর্ক হল ওঝার সঙ্গে মনের বিষের সম্পর্কের মতো। যাকে দমিত ইচ্ছাবৃত্তি বলা হচ্ছে সেটা নিশ্চয়ই কামজীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত। পঞ্চম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে আমাদের মনে কীভাবে ভ্রমের সৃষ্টি হয়। আমাদের অন্তর্লোক জুড়ে শত-শত বাসনার কণা ক্রীড়াচঞ্চল সফরীর মতো নিয়ত ছুটে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলেই সজ্ঞানকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করে, নিত্যকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, বিকৃত করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা জানতে পারি, অকাজের কাজ, স্খলন পতন ত্রুটি, এগুলোকে ফ্রয়েড গুণকর্ম অনুসারে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—ভ্রমাত্মক কর্ম ও বিলক্ষণ কর্ম। সপ্তম অধ্যায়ের অনুসরণে আমরা জানতে পারি, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতা। স্বপ্ন মানুষের জীবনে সত্যই এক বিচিত্র কুহক। অযুত বাসনার রেণুজাল দিয়ে তৈরি মনের অতলে এক দ্বিতীয় বরুণালয়, বোধব্যাপ্ত অথচ বস্তুকায়াহীন। পরবর্তী অধ্যায়ের বিষয় স্বপ্ন-গঠনে কারিগরী। স্বপ্ন-বিশ্লেষণের জন্য একটা সুনির্দিষ্ট কাঁটা ছাঁটা পদ্ধতি ডাক্তার ফ্রয়েড দিতে পারেননি। তিনি বলেছেন, স্বপ্নের স্বাভাবিক পরিণতিকে বিকৃত করে দেয় সেন্সর। স্বপ্নের সংক্ষেপণ ও

অপসারণ—এই দুই ক্রিয়ার কর্তা হলেন সেন্সর। লেখক পরশুরামের একটি স্বপ্নকে অবলম্বন করে সেন্সর-প্রথার ব্যাখ্যা করেছেন। আর একটি ব্যাপার হল, জাগ্রত চিন্তায় স্বপ্নের স্মৃতি আদ্যোপান্ত চিত্রিত করা যায় না। স্বপ্নের অনেক দৃশ্য ও ঘটনা জাগ্রত চিন্তায় স্মরণ-সাধনায় উহ্য থেকে যায়।

নবম অধ্যায়ে মনের আসক্তি ও আসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন সুবোধ ঘোষ। ফ্রয়েড বলেছেন, কামালেগ বা যৌনপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য একটা আস্বাদ দরকার। কিন্তু তার জন্য জাত-কুজাতের বিচার তো নেই-ই—ইতর প্রাণী, জড় বস্তু অথবা নিজের দেহ, এগুলোর মধ্যে যে কোন একটি তার রমণ বিষয় হয়ে উঠতে পারে। মানসিকতা বুঝে যে কোন বস্তু লোকের কামাস্পদের স্থান গ্রহণ করতে পারে। কামাবেগ একটি আস্পদ-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি। কাম এক স্বপ্রধান প্রবৃত্তিবান সত্তা। কোন নীল শাড়ির মধ্যে এমন কোন শক্তি লুকিয়ে থাকে না, যা দেখামাত্র মনকে নিঙাড়ি নিগাড়ি চলে যাবে। 'দক্ষস্মৃতি'তে অষ্টবিধ মৈথুনের তালিকা দেওয়া হয়েছে : 'স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সংকল্পোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥' ইন্দ্রিয়ের কীর্তির ফলে একই ধরনের প্রসন্নতা অনেক অপচারী লাভ করে থাকে। ইদিপাস ও ইলেকট্রার কমপ্লেক্স-এর মধ্যে প্রথমটির জন্ম হয় পুত্র ও মাতার সম্পর্কের মধ্যে। থিবস্-এর রাজা লাইয়াসকে হত্যা করে তার পুত্র ইদিপাস মাতা জোকাস্টাকে বিবাহ করে এবং জোকাস্টার গর্ভে দুটি পুত্র ও দুটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়টি হল পিতা ও কন্যার সম্পর্ক। পত্নীর হাতে আগামেমনন নিহত হলে মেয়ে ইলেকট্রা তার ভাই ওরেস্টিসকে দিয়ে মাতা ক্লাইটিমনেস্ট্রাকে হত্যা করায়।

দশম অধ্যায়ে হাস্যতত্ত্বের মধ্যে ফ্রয়েড মনস্তত্ত্বের যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক নির্ণয় খুঁজে পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে ভাষা, শব্দগত ভাব এবং অর্থের প্রত্যয় তো আছেই, আবার বহু রঙ্গবিষয়ের মধ্যে একটা গূঢ়ার্থ প্রবণতাও আছে। ক্যারিকেচার, হরবোলা, বিদঘুটে, মুখোশ পরা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ধাঁধাঁর উত্তর, ভাঁড়ামি, ইয়ার্কি প্রভৃতি যতরকম হাসবার আয়োজন আছে, ফ্রয়েড তার মধ্যে গুণ অনুসারে প্রধান তিনটি রঙ্গ-বিষয়ের বিভাগ করেছেন—উইট, কমিক এবং হিউমার।

একাদশ অধ্যায়ে সুবোধ ঘোষ ফ্রয়েডকে অবলম্বন করে 'টোটেম ও ট্যাবু'-র বিশ্লেষণ করেছেন। 'টোটেম' শব্দটি রেড ইন্ডিয়ানদের ভাষা থেকে এসেছে। সাধারণত কোন জন্তুকে বা গাছকে বংশের টোটেম রূপে কল্পনা করে নেওয়া হয়। টোটেম হলেন বংশের কল্পিত আদিপুরুষ বা আদিজীব বা আদিপিতা। অসভ্য জাতিদের মধ্যে বংশ ও গোষ্ঠীর নামকরণ হয় টোটেমের নামানুসারে। টোটেমকে বংশদেবতার মতো মানা করা হয়। অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের মধ্যে গোষ্ঠীগুলির টোটেম হল ক্যাঙ্গারু, এমু ইত্যাদি। টোটেম জীব পরম শ্রদ্ধাস্পদ জীব। তাকে হত্যা করা নিষেধ। আদিম মানুষের কল্পনায় টোটেমের আবির্ভাব প্রথম সমাজ-গঠনের সূচনা করেছিল। এক টোটেম এক গোষ্ঠী—এই নামে আদিম মানুষের গোত্র-পরিচয় তৈরি হল, আদিম মানুষ সামাজিকতার সাধনায় প্রথম ধাপে পা দিল, বর্বর যুগের আরম্ভ হল। টোটেম তন্ত্রের দ্বিতীয় বিধান—স্বগোত্র বিবাহ নিষেধ। এক গোষ্ঠীর মধ্যে যৌনসংসর্গ দূষণীয় অপরাধ। এক শোণিত বিবাহ নিষিদ্ধ হল। টোটেম জীবহত্যা ও এক শোণিত বিবাহ নিষিদ্ধকরণের নামই ট্যাবু। এই 'ট্যাবু' শব্দটি পলিনেশীয় অসভ্যদের ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। শোনা যায়, ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলোর মধ্যে ও অথর্ববেদে 'ট্যাবু'

কথাটি আছে। ট্যাবুর তাৎপর্য হল 'সভয় শ্রদ্ধা'—এটা বর্বর সমাজের পেনাল কোড। নবজাত শিশু, রজস্বলা নারী, মৃত স্বজনের শব ইত্যাদি বিষয়ে ট্যাবু-জনিত অশৌচ পালনের রীতি বর্বর যুগ থেকে চলে আসছে। পরিবারের পিতা, সর্দার, রাজা, ধর্মগুরু, ভগবান—এরা সবাই যেন এক-একটি সভ্যতার টোটেম। ধর্মাচারের যতসব যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা, নীতিতত্ত্ব, শাস্তিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, পশুবলি, কৃচ্ছ্রাচার, দানাদি পুণ্যকর্ম—সবার গোড়ার কথা টোটেম ও টোটেমের নামে দিব্যি দেওয়া যত সব ট্যাবুর বিধান।

'মনস্তত্ত্বের শেষকথা' শীর্ষক দ্বাদশ অধ্যায়ে সুবোধ ঘোষ বলেছেন, ফ্রয়েড তাঁর মনস্তত্ত্ব শেষ করেছেন একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। সেটি হল, ইরোস বনাম টানাতোস অর্থাৎ বাঁচার প্রয়াস ও মরার আকাঙ্ক্ষা—মূল প্রবৃত্তিরূপী এই দুই প্রয়াসের দ্বন্দ্ব মানুষের মনের ভিতর দিয়ে কাজ করে সভ্যতাকে তৈরি করেছে ও টেনে নিয়ে চলেছে। উনচল্লিশ সালে ফ্রয়েড ইংলন্ডে মারা গিয়েছেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক শুদ্ধতা সম্বন্ধে বহু সংশয়ের অবকাশ রয়ে গেছে। তাঁর সতীর্থ এডলার ও ইয়ুং ফ্রয়েডের কোন কোন অভিমতকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। পাভলভ ঘরাণার কাঠামোটাই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। আমেরিকার ওয়াটসন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বাকতেরফ মনস্তত্ত্বকে এক নতুন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তিন

এই অধ্যায়টি চিত্রকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, এমনকী আল্পনা-শিল্পের উপর সুবোধ-ঘোষের পড়াশোনা ও উপলব্ধির এক আশ্চর্য সংকলন। 'রঙ্গবল্লী' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন, প্রাক-ইতিহাসের গুহার ছবি মানুষেরই হৃদয়ের ছবি। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীযুগে পাই আর এক শ্রেণীর গুহাচিত্র—অজন্তা, বাঘ, ইলোরা, কাঞ্জিভরম্ প্রভৃতি। যুগব্যাপী একটা সুস্থ সংস্কৃতির জীবন না গড়ে উঠলে শিল্পরীতির এই উৎকর্ষ কখনও গড়ে উঠত না। তিনি বলেছেন ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে ব্যর্থতার যুগ হল ইংরেজ যুগ। আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্যে কোন ঐতিহ্যগত প্রয়াস নেই, একে সর্বতোভাবে গ্রাস করে ফেলেছে পশ্চিমী ইঞ্জিনিয়ারিং-বিদ্যা।

সুবোধ ঘোষ বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, আধুনিক ভারতীয়ের অক্ষম শিল্পরুচি ও অরসিকতার প্রমাণ হল, আধুনিক শিল্পের কোন সাহিত্য আজও রচিত হয়নি। 'রঙ্গবল্লী' নামক এক শ্রেণীর চিত্রকর্মের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যেত যার শব্দগত অর্থ হল রঙের লতা। এটা আমাদের অতিপরিচিত রঙের মতো একটা ব্যাপার। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে এবং 'তিলকমঞ্জরী' গ্রন্থে রঙ-তুলি নিয়ে চিত্রবিদ্যার চর্চা করার প্রসঙ্গ আছে। 'শিল্পরত্ন'-এর উপদেশে শিল্পীকে একটি বিষয়ে বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ছবি আঁকবার সময় শুধু তুলি আর রঙ নয়। শিল্পীকে তার দৃষ্টি ও ভাবনাকে সমান কুশলতায় সংযতরূপে চালনা করতে হবে। লেখক বলেছেন, একমাত্র গ্রীক সাহিত্য ছাড়া 'তিলকমঞ্জরী'র মতো চিত্রসমালোচনার সাহিত্য পৃথিবীর কোন প্রাচীন সাহিত্যে নেই।

'প্রস্তরযুগের চিত্রকলা' নিবন্ধটিতে লেখক গভীর অনুরাগের সঙ্গে বলেছেন, জীবন-সংগ্রামের অনিশ্চিত মুহূর্তগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে প্রস্তরযুগের বর্বর শিল্পীকুল শত-শত রূপললিত আলেখ্য রচনা করত প্রস্তরফলকের সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে, হাড়ের তুলি-

চালনায়, রঙিন মাটির প্রলেপে। স্পেনের বিস্কে উপসাগরের তটবর্তী পাহাড়গুলোর গায়ে, ফ্রান্সে বহু গুহার ভিতরে, আল্টামিরা গুহায় এবং দোর্দোনে উপত্যকার পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায় বিচিত্রসুন্দর সব আলেখ্য পাওয়া যায়, যেগুলোতে পাখির ছবি না থাকায় প্রমাণিত হয় এই চিত্রগুলোর সৃষ্টি হয়েছিল তীরধনুক আবিষ্কারের পূর্বযুগে। সুবোধ ঘোষের সূত্রেই আমরা জানতে পারি, মানুষের অঙ্কিত প্রাচীনতম চিত্র হল, স্যার এডউইন রে ল্যাঙ্কেস্টার-কর্তৃক ফরাসী পিরিনিজ পর্বতমালার লোর্তে নামক গুহায় আবিষ্কৃত সেই চিত্রটি, যেটিতে দাঁড়িয়ে আছে একদল চিত্রা হরিণের পাল আর তাদের পায়ের কাছে এক ঝাঁক স্যামন মাছ।

যামিনী রায়ের শিল্পকীর্তি প্রসঙ্গে সুবোধ ঘোষ একটি রচনায় প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, যামিনী রায়ের চিত্রশিল্পের প্রাণবস্তু হল অনাড়ম্বরতা। টেকনিকেও যেমন আড়ম্বরের প্রয়াস কোথাও নেই, তেমনি তাঁর শিল্পোপকরণে রয়েছে সুচারু প্রাঞ্জলতা। সুসংযত ঐশ্বর্যে অলংকৃত তাঁর চিত্রশিল্প। প্রত্যেকটি আঁচড়, প্রত্যেকটি রেখাপাত এবং বর্ণাবলেপ নিখুঁতভাবে মাত্রাধীন। এখানে তুলিকাবিলাসের কোন অবকাশ নেই। তপশ্চর্যার মতো নিরন্তর সাধনা ও অপরিসীম নিষ্ঠার বলে তিনি এই শৈল্পিক শ্রীকুশলতা লাভ করেছেন। তিনি কোন নির্দিষ্ট রীতির উপাসক ছিলেন না। কোন বৈয়াকরণিক সূত্রনিষ্ঠা নিয়ে তিনি রচনার সৌষ্ঠব বিধান করেননি। প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রতিভাসম্পন্ন সত্যিকারের গুণীর এটাই একমাত্র পরিচয়।

'য়ুরোপীয় আর্টের প্রগতি' শীর্ষক আলোচনায় ইউরোপীয় চিত্রকলার ধারাবাহিক বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে ভ্যান গগ, র‍্যাফেল, গগাঁ এবং পাবলো পিকাসোর চিত্রধারার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, আধুনিক কবিতার মতো আধুনিক চিত্রকেও দুর্বোধ্যতার অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই দুর্বোধ্যতার জন্য শিল্পী বা কবি কেউ দোষী নন।

অতঃপর লেখক 'য়ুরোপীয় ভাস্কর্যে প্রগতি'র সন্ধান করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, ইউরোপের সংগীতে চিত্রাঙ্কনে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে একই সময়ে বিংশ শতাব্দীর জটিল চিন্তাবর্তের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে এক সাধনা ক্রমশ সার্থকতার দিকে চলেছে। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে পুনরভ্যুত্থানের আভাসই বেশি। যে অজন্তা ইলোরা সাঁচী গান্ধার ও কাংড়াকে আমরা হারিয়েছি, জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় তাকে ফিরে পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পসাধনার বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে বর্তমান ইউরোপে এখন কোন পুরোনো রীতির সশ্রদ্ধ পুনরভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নেই। আছে নতুন পথে মোড় ফেরাবার প্রয়াস। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের পর সুবোধ ঘোষ ইউরোপীয় সংগীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইউরোপীয় সংগীতবিদ্যার গত তিনশো বছরের ইতিহাস রূপ-সৃষ্টিপ্রবণ মানুষের অত্যদ্ভুত ও অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস। তবে তিনি বলেছেন, আধুনিক ইউরোপীয় সংগীত অন্যান্য যুগের তুলনায় মাত্র একদিক দিয়ে একটু নেমে গেছে। মেলোডির সুললিত হিল্লোল যা এককালে ইউরোপীয় সংগীতের অন্যতম উৎকর্ষের প্রমাণ ছিল তা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে তার সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে হার্মনির রূপায়তন—নৃত্যপরা স্রোতস্বতীর মতো সংগীতের সুরবিভঙ্গ ও মন্দ্রোল্লাস। বীটোফেন, মোৎসার্ট, শুবার্ট এবং সোনাটার স্রষ্টা হেড়ন-এর প্রতিভার মৌলিকতা অনুসন্ধান করে লেখক জার্মানীর সংগীতশিল্পী শুম্যান ও ব্রাম্‌স্‌ এবং ফ্রান্সের বের্লিয়ো ও শঁপ্যার সংগীতরীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। অতঃপর তিনি জার্মানীর ভাগনার ও স্ট্রাউস, ফিনল্যান্ডের সিবেলিয়াস এবং ইংলন্ডের রাল্‌ফ

উইলিয়ামসের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করে আশা প্রকাশ করেছেন, এবার বিজ্ঞানই সংগীতকে নতুন একটি সাজে সজ্জিত করে মানুষের সাংস্কৃতিক আসরে প্রতিষ্ঠা করবে।

কলকাতায় 'আর্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি' প্রদর্শনী দেখে সুবোধ ঘোষের মনে কতকগুলো প্রশ্ন জাগে। ওই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল, কাজের জিনিস সৃষ্টিতে আর্ট কতখানি প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে, তা দেখানোর। লেখকের মনে হয়েছে, শিল্পের ইতিহাসে ভারতীয় শিল্পীর আর্ট নিষ্ঠার যে পরিচয় আমরা পাই, পৃথিবীর কোন দেশে তার সমতুল্য নিষ্ঠা ও সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গোটা এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র চীন ও ইরাণ ভারতের সমকক্ষতার দাবি করতে পারে। কিন্তু ভারতীয় কারুশিল্পের কতকগুলি বিশেষ গৌরব ও গুণ আছে যা অন্য কোন দেশে নেই। বর্তমান ও আগামীকালের ইন্ডাস্ট্রির ভাগ্যলিপি মেশিনের হাতে। এর জন্য অবশ্য আফসোস করার কিছুই নেই। লেখক আশ্বস্ত করে বলেছেন, বর্তমানের মানুষ মেশিনকেও বশ করে একটু শিল্পসম্মত, একটু শৌখীন ও একটু রসিক করে তুলতে পারবে না কেন?

'আলপনা' প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক প্রথমেই আমাদের একটি প্রচলিত ভুল ভেঙে দিয়েছেন। এই শিল্পটি কিন্তু একান্তভাবে বাংলার লোকশিল্প নয়, ভারতের নানা প্রদেশে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন আছে। তাছাড়া, এই শিল্প শুধু ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। ভারতের বাইরে সভ্য-অসভ্য জাতির মধ্যে এই শিল্পরীতির প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। আলপনা চিত্রশিল্পকে লোকশিল্প বলা হয়। কিন্তু লেখকের মতে একে আটপৌরে শিল্প বলা উচিত। আদিম বাঙালির ধর্মোৎসবের সঙ্গে যুক্ত বাংলার ব্রত পার্বণের সঙ্গে আলপনা চিত্র একাত্মভাবে মিশে আছে। তাই দেখা যায়, বাংলার আলপনায় নানা দেব-দেবীর ভিড়। আলপনা-শিল্পীরা সকলেই প্রায় নারী। এতটা লোকময় শিল্প বাংলায় দ্বিতীয় আর নেই। লেখকের আবেদন, আজ শিল্পীকে গ্রহণ করতে হবে নানা রঙের তুলিকা। তাকে নতুন দৃশ্যবস্তুর অবতারণা করতে হবে, আধুনিক মানুষের কল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে।

'চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনায় লেখক বলেছেন, চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ সবরকম ঐতিহ্যের আনুগত্য সোজাসুজি এড়িয়ে গেছেন। ছবিগুলো এমন সব বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত যা চোখে দেখার কৌতূহলকে টেনে নিয়ে দূর মনোলোকে পৌঁছে দেয়। এত সহজ ও সরল বলে বোধ হয় তা এত বেগবান। কেননা, নিয়মের ব্যতিক্রমে যার জন্ম, তার পরিচয় ও পরিমাপ নিয়মের মাপকাঠিতে সম্ভব নয়।

'স্থাপত্যের শিল্পতত্ত্ব' শীর্ষক রচনায় সুবোধ ঘোষ অত্যন্ত জোরালোভাবে একালের ইঞ্জিনিয়ারদের শিল্পী আখ্যায় ভূষিত করেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, স্থাপত্য শিল্পরীতিতে আধুনিক শিল্পীরা পিছিয়ে পড়ছে। অনেকে আফসোস করেন, বাবিলনের শূন্যোদ্যান, মিশরের মহামহিম পিরামিড, গ্রীসের সেই অ্যাম্ফিথিয়েটার ও পার্থেনন, গথিক প্রাসাদের কারুময় বিরাটত্ব, চীনের প্রাচীর, বোরোবুদুর, কোণারক বা তাঞ্জোর মন্দিরের প্রশান্ত পাষাণে সুগঠিত স্থাপত্য-কীর্তিকে অতিক্রম করে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানে পুষ্ট মানুষের প্রতিভা বেশি মহনীয় কিছু সৃষ্টি করতে পারছে না। লেখক তাঁর আলোচ্য এই রচনায় এই অভিযোগ ও রাসেল সাহেবের মন্তব্যকে সত্য ও যথার্থ বলে স্বীকার করতে চাননি।

'ভারতের ভাস্কর্য' নিবন্ধে লেখক ভারতীয় ভাস্কর্যের ভিন্ন একটা জাগতিক সত্তার সন্ধান পেয়েছেন এর সূক্ষ্মতা ব্যাপকতা রম্যতা ও বাস্তবতা, এর উত্থান পতন ও আহরণ, এর

বৈপ্লবিক পরিবর্তন, ঐতিহাসিক তাৎপর্য, এর সাংস্কৃতিক প্রসার ইত্যাদির মধ্যে। লেখক আক্ষেপ করে বলেছেন, ঐতিহ্য-পরম্পরার সূত্রে এদেশের ভাস্কর্য ক্রমবিকাশের পথ ধরে সুরক্ষিত হয়ে আসেনি। তার ঐশ্বর্য মহাকালের স্রোতে হারিয়ে গেছে। ভারতীয় ভাস্কর্যের এই চরম লুপ্তি, ভারতীয় সংস্কৃতির অধঃপতনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। লেখক বিভিন্ন যুগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাস্কর্যের ধ্রুপদী কতকগুলো নিদর্শন দিয়ে অবশেষে একটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। 'প্রতিমা লক্ষণম' নামে আমাদের একটি ভাস্কর্যবিদ্যার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আছে। মূর্তি প্রকরণের সময় ভাস্করদের এই গ্রন্থে নির্ধারিত লক্ষণ অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করতে হত। এখন প্রশ্ন আসে, এই মূর্তিগুলো কি ভাস্করদেরই কল্পনায় প্রথম জন্মলাভ করে? ভাস্করেরা কি কবি-কল্পনার মূর্তিগুলোকে রূপ দিয়েছিলেন, না কবিরা ভাস্করের সৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে স্তবে ও স্তোত্রে অভিনন্দন রচনা করেছিলেন? প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যের ইতিহাসের রীতিনীতি লক্ষ্য করে লেখকের মনে হয়েছে, এই উভয় রীতিই সত্য।

'সোমনাথ' রচনাটি বিখ্যাত সোমনাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটেছে তার আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা করেছেন লেখক। প্রথমে এই মন্দিরটি কালের প্রভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে দ্বিতীয়বার মন্দিরটি নির্মিত হল বল্লভী রাজবংশের শাসনকালে। এটিও কালক্রমে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে তৃতীয়বার এটি পুনর্নির্মিত হলে এর চাকচিক্যে লুব্ধ হয়ে গজনীর লুণ্ঠক মাহমুদ মন্দির আক্রমণ করে পঞ্চাশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করেন এবং সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য রত্ন ও মন্দিরের হীরকখচিত দ্বারটি লুঠ করে নিয়ে যাবার আগে মন্দিরটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়ে যান। ওই ধ্বংসস্তূপের উপর চতুর্থবার মন্দিরটি নির্মাণ করলেন মালবরাজ ভোজ ও গুজরাটরাজ ভীম এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে গুজরাটরাজ কুমারপাল এটিকে আরও সুন্দর করে সংস্কার করেন। কিন্তু পরবর্তী শতাব্দীতে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলজি আবার ওই মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করেন। কয়েকবছর পরে গুজরাটরাজ মহীপাল দেব মন্দিরভবনের সংস্কারসাধন করলে পঞ্চাশ বছর পরে আবার গুজরাটের সুলতান ওই বিগ্রহ অপসারিত করলেন। এরপর হিন্দু প্রজারা নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে কয়েক বছর পরে গুজরাটের সুলতান আমেদ শা মন্দিরের কিছুটা ক্ষতি সাধন করলেন এবং বিগ্রহ অপসারিত করলেন। অতঃপর হিন্দু প্রজারা আবার মন্দিরের সংস্কারসাধন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করল কিন্তু গুজরাটের সুলতান বেগদা বিগ্রহ অপসারণ করে ওখানে মসজিদের প্রতিষ্ঠা করলেন। হিন্দু প্রজারা সংস্কারসাধন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করলে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে বিগ্রহসহ মন্দির পুড়িয়ে ফেলা হয়। ওঁর নির্দেশ সত্ত্বেও নির্মাণকাজের অসুবিধার জন্য ওখানে মসজিদ গড়ে তোলা যায়নি।

চার

রাষ্ট্রভাবনা-প্রসঙ্গে ষোলোটি নিবন্ধে সুবোধ ঘোষ ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্বাধীন ভারতের প্রাথমিক সম্ভাবনা ইত্যাদির পর্যালোচনা করেছেন। ভারতে মোট দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ছিল পাঁচশো বাষট্টি। এই দেশীয় রাজ্যগুলোর মোট আয়তন পাঁচ লক্ষ আটানব্বই হাজার একশো আটত্রিশ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা সাত কোটি উনননব্বই লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার আটশো চুয়ান্ন। জনসংখ্যা ও আয়তনের বিচারে মাত্র কুড়িটি রাজ্য শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ দখল করে আছে। মোট রাজস্বের

পরিমাণ পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা, এর মধ্যে মাত্র তেইশটি রাজ্যের রাজস্বের মোট পরিমাণ পঁয়ত্রিশ কোটি টাকার চেয়ে বেশি। হায়দ্রাবাদের জনসংখ্যা ছিল এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আবার বিলবারী রাজ্যের জনসংখ্যা হল ২৭, বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ মাত্র আশি টাকা। সামন্ততন্ত্রের বিচারে কতকগুলো ছিল হিন্দুস্থানের রাজ্য, কতকগুলো মোগল-পাঠান যুগের রাজ্য, কতকগুলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগের রাজ্য। বেনারস ছিল একটিমাত্র খাস সম্রাটশাসিত যুগের রাজ্য। দেশীয় রাজ্যগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করে সুবোধ ঘোষ বলেছেন, ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষে তার প্রতিপত্তি দৃঢ়মূল করার জন্য কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখলের পরিকল্পনা করেই অগ্রসর হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলো ব্রিটিশের প্রতি ভারতের দাসত্বের এক-একটি পকেট। লেখক ঐতিহাসিক কুলপঞ্জী হিসেবে দেশীয় রাজ্যগুলোর বিভাগ নির্ণয়ও করেছেন। পাঁচটি যুগে এই রাজ্যগুলোর উৎপত্তি হয়েছিল—হিন্দুযুগ, পাঠান ও মোগল যুগ, শিখ রাজ্য, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুগ, খাস পার্লামেন্টী শাসনের যুগ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে লেখক 'সমাজ বিপ্লবের সঙ্কেত' লক্ষ্য করেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যাবতীয় অস্পষ্টতা কাটিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যে গণমুখী, উৎপাদনভিত্তিক, জনজীবনের সাধারণ মানের উন্নয়ন সাধন করার প্রয়াস ইত্যাদি রূপায়ণে সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে লেখক আনন্দ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উন্নয়নমুখী কর্মসূচী হাতে নিলেও শেষ পর্যন্ত ওই পরিকল্পনা যে সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়িত হতে পারেনি, তার জটিল ব্যাধির কারণগুলোও লেখক লক্ষ্য করেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়ে গেলেও ভেজাল নিরোধক আইন প্রবর্তিত হয়নি। সরকারী বিভাগে দুর্নীতি, বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে উৎকোচের প্রতাপ, এক শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রিয় আমলা গোষ্ঠীর আবির্ভাব, সাহিত্য সংগীত নাট্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর প্রচ্ছন্ন আধিপত্য ইত্যাদিকে লেখক এদেশের সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মুহূর্তে লেখক আনন্দপ্রকাশ করে বলেছেন, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সুপ্রাচীন ধারা মিশর বা গ্রীসের মতো লুপ্ত হয়ে যায়নি। ইউরোপ ও এশিয়ার সভ্যতার মেলবন্ধন ঘটাবে ভারত। এর কমনওয়েলথে যোগদান খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইউরোপীয় সভ্যতায় যে বর্ণবৈষম্য চোখে পড়ে গৌতম বুদ্ধ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর দেশে তার কোন অস্তিত্ব নেই।

'ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর' শীর্ষক রচনাটি স্বাধীন ভারতবর্ষের সামরিক বাহিনীর প্রতি সুবোধ ঘোষের আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদন। তিনি বলেছেন, দেশের কোন সরকারী বিভাগ, কোন রাজনৈতিক দল, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন সমাজ—এমন কোন নতুন কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন না যার জোরে বলতে পারা যায় যে তাঁরা ১৫ আগস্টের পর সত্যিই বদলে গেছেন, জাতির নতুন ইতিহাসে নতুন ঘটনা দিয়ে তাঁদের নতুন চেতনাকে কীর্তিত করতে পেরেছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম, ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর। যারা দু'শো বছর ধরে ভারতবর্ষের মানুষকে অশেষ নিগ্রহ ও নিপীড়ন করেছে, যাদের প্রতি এদেশের মানুষের অসীম ঘৃণা ছিল, স্বাধীনতার লগ্নে দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা উপদ্রব ও অশান্তির মধ্যে ওই সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তন ও পুনর্গঠন অত্যন্ত শান্তভাবে নিষ্পন্ন হয়। জাতীয় পরিবর্তনের পরে ভাতা হ্রাস পেলেও ভারতীয় ফৌজ পরিবর্তনের অতি সঙ্কটময় মুহূর্তে বেতনবৃদ্ধির দাবি করে ধর্মঘট করেনি। তাদের মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হল, নিরাপদে দুই পঞ্জাবের নাগরিকদের বদল করা। দ্বিতীয় প্রমাণ, কাশ্মীর

রক্ষার যুদ্ধে শৌর্য ও আত্মদান, বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধে দায়িত্বপালন। এদের চারিত্র্যে মুগ্ধ হয়ে লেখক আরও বলেছেন, এদের আচরণে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা নেই, নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের হানাহানি দেখা দেয়নি। যারা ছিল মনে প্রাণে, রূপে ও গঠনে, ব্রিটিশের সামরিক বাহিনী, তারাই মাত্র ক'দিনের মধ্যে ভারতের জাতীয় দেশরক্ষা বাহিনীতে পরিণত হয়ে গেল। ভারতবর্ষে এর চেয়ে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তুলনা আর নেই।

তিলাইয়া কোনার পাঞ্চেৎ মাইথন দুর্গাপুর বোকারো সিন্ধ্রী ও চিত্তরঞ্জন—স্বাধীন ভারতের এই আটটি মহামহিম কীর্তিকে 'মহাস্থান' বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন সুবোধ ঘোষ। তিনি এগুলোকে বলেছেন, বিরাট বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, বিরাট কল্যাণের স্থাপত্য।

'কৃষক মজুর ও শ্রেণীতত্ত্ব' শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে বা অর্থনৈতিক প্রকৃতি বিচারে রাজনৈতিক নেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা কৃষক ও মজুরের সংজ্ঞা পরিষ্কারভাবে বুঝে নেননি। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কায়িক শ্রমের যোগাযোগ বা সম্বন্ধটা কি ধরনের, সেই দিক দিয়ে পার্থক্য নির্ণয় করে তাঁরা কৃষক ও মজুরকে বিচার করেননি। উচিত ছিল, মজুর সম্প্রদায় এবং কৃষক সম্প্রদায়কে একই সমাবেশের মধ্যে সংযুক্ত করা। জীবিকা হিসেবে এবং সম্প্রদায় হিসেবে সংগঠন করতে গিয়ে গুরুতর গলদ রয়ে গেছে বলে লেখক মনে করেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, এই ধরনের সংগঠন 'এক লক্ষ্য' বা 'এক স্বার্থ' প্রণোদিত হতে পারে না।

'প্রজাতন্ত্র ভারতের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য' কী সেকথা বলতে গিয়ে সুবোধ ঘোষ বলেছেন, দুই মহাযুদ্ধের উৎপীড়নে জর্জরিত বিংশ শতকের প্রথমার্ধ তার অস্তিত্বে বিশ্ব-রাজনীতিতে বোধ হয় এই একটি মাত্র মাঙ্গলিক উপহার রেখে বিদায় নিয়েছে—ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা। প্রাচীনতম সভ্যতারই একটি দেশ এবং ছত্রিশ কোটি মানুষ তার চার হাজারেরও বেশি প্রাচীন কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেও আধুনিকতম গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। ভারতের ঐতিহাসিক গৌরব এই যে, এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম এই রাষ্ট্রিক আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সুবোধ ঘোষকে মার্ক্সবাদ-বিরোধী বলে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী চিহ্নিত করার যে অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন, সুবোধ ঘোষের অনেক লেখাতেই ফুটে উঠেছে এই মনোভাবের প্রতিবাদ। 'সমাজবাদের পথে' এমনই একটি রচনা। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেফের রিপোর্ট এই উপলব্ধির স্বীকৃতি বহন করে যে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ পন্থাতেও সম্ভব। এই একই অভিমত চৌ এন লাই ও মার্শাল টিটোর। তিনি আশা করেছেন, নেহরুর নেতৃত্বে সমাজবাদী সংগঠন তৈরি করে নতুন ভারতবর্ষের সামাজিক রূপান্তর সম্ভব হবে প্রগতিশীলতার পথে।

'এ যুগের ভারতবর্ষ' শীর্ষক রচনায় তিনি কতকগুলো ঘটনাকে 'ঐতিহাসিক' আখ্যা দিয়েছেন। অহিংসপন্থায় সংগ্রাম দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন, শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর, ইতিহাসে ব্রিটিশের বৃহত্তম গৌরবের অধ্যায় হিসেবে বিশ্বে বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব এবং ভারত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে কমনওয়েলথে স্থান দিয়ে ওই সংগঠনটির শ্বেতাঙ্গত্ব বদল—এসব ঘটনাকে সুবোধ ঘোষ ঐতিহাসিক অভিধায় ভূষিত করেছেন।

'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির শিল্প' নিবন্ধে লেখক গান্ধীজি কর্তৃক লিখিত শ্রীমননারায়ণ আগরওয়ালার বই এবং ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিল থেকে দেখিয়েছেন, গান্ধী-পরিকল্পনায় কুটির শিল্পের জন্য অনেক বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং লেখক ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটির শিল্পকে খুবই অল্প টাকা দিয়ে অবজ্ঞা করা হয়েছে। লেখক তুলনামূলক সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন গান্ধী-পরিকল্পনায় ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি, বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্পের ব্যয়ের শতকরা হার যথাক্রমে ছিল ২৭.৮, ২৮.৭ ও ১০.০ এবং ৪৩.০, ৫.৩, ১.০। 'গণতন্ত্রের জিজ্ঞাসা' রচনাটিতে সুবোধ ঘোষের সংবেদনশীল মন স্বাধীনতা প্রাপ্তির ন'বছর পরেও দেশের বাঞ্ছিত উন্নয়ন না দেখতে পেয়ে যেন ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, সাধারণ মানুষের যেন গীতোক্ত কর্মযোগের মতো এক ধরনের দার্শনিকতা মেনে নিতে হচ্ছে—শুধু কর্মেই অধিকার, মা ফলেষু কদাচন। ভারতের ন'বছরের গণতন্ত্রে জনজীবনের উন্নয়নের সুযোগ-রচনার ক্ষেত্রে সর্বতোভদ্র রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। যেখানে সুযোগ-প্রদানের প্রশ্ন, সেখানে এখনও বিশেষ-বিশেষ শ্রেণীর জন্য প্রবেশপথ মুক্ত, সাধারণের জন্য নয়। এ ছাড়া চলেছিল খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল, দুর্নীতির ভয়ঙ্কর প্রকোপ। আদালতের সাহায্যে সুবিচার পাওয়া সাধারণ মানুষের কাছে অগ্নিমূল্য দাবি করে। জনসাধারণের জন্য সরকারী ঋণদান নীতির কোন সামঞ্জস্য নেই। কোন যোগ্য বিরোধীদল সুসংহত রূপ নিয়ে এবং গঠনকর্মকুশল মনোভাব, দায়িত্ববোধ ও আগ্রহ নিয়ে দেখা দিল না।

'মৈত্রীভাবনা' নিবন্ধে লেখক বলেছেন ধর্ম, রাজনীতি, বিশেষত কমিউনিজম, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি আধিপত্যবাদ ভারতীয় মৈত্রীভাবনার অন্তরায়। রাজনীতি ও ইতিহাস নিয়ে মন্তব্য করতে গেলে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করাই শ্রেয় কিন্তু সুবোধ ঘোষের গান্ধীজি ও নেহরুর প্রতি অপ্রমেয় শ্রদ্ধা তাঁর কিছু কিছু মন্তব্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি শুধুই অহিংস পথে এসেছে? ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে শুধু শান্তিপূর্ণ আলোচনায় কি ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে? গান্ধীজির রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কি কোন বিচ্যুতি ছিল না? নবভারত গড়ার ক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকা কি বিতর্কের ঊর্ধ্বে ছিল? একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কোন বাঙালি লেখক সুবোধ ঘোষের মতো সমগ্র ভারত নিয়ে এত ভাবেননি, এত বিচিত্র বিষয়ে ব্যাপক লেখালিখি করেননি। মননশীলতা ও মনীষাদীপ্ত বিচারবোধ সত্ত্বেও এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র হয়েও গান্ধী-নেহরুর বিপরীত ধারার বিশ্বখ্যাত রাজনৈতিক নেতাকে কেন তিনি জীবনে একবারও স্মরণ করার যোগ্য বলে মনে করলেন না, এটা আমাদের বোধগম্য নয়। তবু কৌতূহলের বিষয়, ১৯৬৩ সালে মার্চে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি স্বীকার করেছেন—'আমি মার্ক্সীয় দর্শনের একজন একনিষ্ঠ পাঠক।' যিনি আদিবাসী ও উপজাতীয়দের নিয়ে গবেষণাধর্মী রচনার স্রষ্টা, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বীরসা মুণ্ডা, সিধু-কানু আন্দোলন ও সাঁওতাল-বিদ্রোহের রক্তাক্ত কাহিনী তাঁর নিশ্চয় অচর্চিত ছিল না। 'ভারতের আদিবাসী' শীর্ষক একটি গ্রন্থে তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগ্রামকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। তবু অস্বীকার করা যায় না প্রবন্ধকার সুবোধ ঘোষের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই ছিল। তাই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে আজও এদেশের মানুষ রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নেহরু-নীতির ভ্রান্তির ফল ভোগ করছে, অথচ তাঁকেই তিনি অভিনন্দিত করেছেন ভারতের সমাজবাদী চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রচারক

বলে। এটা আতিশয্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, অন্তত বর্তমান পরিস্থিতিতে। অবশ্য 'সংস্কৃতির অগ্রগতি' নিবন্ধে লেখক স্বীকার করেছেন, বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাস জাতির জীবনকে এক নতুন পরিণামের দিকে যতদূর টেনে নিয়ে গেছে, সাহিত্যের ও রম্যকলার অগ্রগতি তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি, অনেকখানি পিছিয়েই ছিল। এই ব্যাপারে নেহরু তাঁর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, কারণ ভারতীয় রাজনীতিতে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ।

পাঁচ

সুবোধ ঘোষ রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পিসত্তাকে সুষমামণ্ডিত করেছে। 'বিজ্ঞানী কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তিনি রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগামিতার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন, রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোকে প্রাঞ্জল ভাষায় অপূর্ব স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ করেছেন। তিনি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পূর্বে যেসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কবিতার চেয়েও এমন মধুর ও মনোজ্ঞ করে লিখে গেছেন, তা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। যে সব নতুন দুরূহ বৈজ্ঞানিক মতবাদ অল্পদিন আগে সুধীমহলে গোচরীভূত ও গ্রাহ্য হয়েছে, অনাবিল গদ্যে ও পদ্যে তারই পূর্বপ্রকাশ রবীন্দ্রসাহিত্যের এক-একটি অধ্যায়কে জ্যোতির্লিপ্ত করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন প্রবন্ধ'-এর মধ্যে দেখা যায় ফ্রয়েড-তত্ত্ব আবিষ্কারের সাতচল্লিশ বছর আগে তিনি নিজেই অজ্ঞাত মনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা দিয়েছেন, আবার আইনস্টাইন-তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রায় সাতান্ন বছর আগে রবীন্দ্রনাথের লেখায় আমরা এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেরই সন্ধান পাই যার সমর্থন তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ ও 'ছিন্নপত্র'তেও আছে। 'রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ' শীর্ষক আলোচনায় লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য ভারতের দ্বিতীয় 'মহাভারত'। রবীন্দ্র সাহিত্যের অজস্র বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি মহাসঙ্গীতেরই সুর রয়েছে—অনন্তসন্ধানী মানুষের বিশ্বৈকবোধের সুর। 'ভারততীর্থ' নিবন্ধেও লেখক বলেছেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা ভারতের সত্তার অন্তরতম বাণীর পরিচয় পাই। 'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'—এটাই হল ভারতের মর্মবাণী। ভারতবর্ষ খণ্ডের প্রতীক নয়, সমগ্রতার প্রতীক। বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে সে এক—এই সুর রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধ্বনিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সুবোধ ঘোষ তাঁকে আধুনিক যুগের বাংলাদেশের একমাত্র 'আপন ঘরের কথাশিল্পী' বলেছেন। শরৎচন্দ্রই প্রথম আমাদের দাবি পূর্ণ করেছেন সত্যিকারের ঘরের গল্প শুনিয়ে। জীবনের আঙিনায় এসে তিনি সবার আগে কাহিনীকেই দেখতে পেয়েছেন এবং আইডিয়া পরে। শিল্পসৃষ্টির সরল ও স্বাভাবিক পদ্ধতি শরৎচন্দ্রের মধ্যে যতখানি সফল হয়েছিল, আধুনিক কালের কোন লেখকের মধ্যে ততটা হয়নি। শরৎ-সাহিত্য বিশ্লেষণ করে লেখক বলেছেন—আগে আইডিয়া পরে কাহিনী, আগে তত্ত্ব পরে তার রূপ, আগে চিন্তা পরে তার অনুষঙ্গ সৃষ্টি—এই ধরনের উল্টোপথে শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন কখনও চালিত হয়নি। সুবোধ ঘোষ পুনরায় 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক আর একটি নিবন্ধে বলেছেন, শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তিতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু একজন আদর্শোচিত 'দরদী' কথাশিল্পী নন, তিনি তাঁর ভাবে অনুভবে কল্পনায় ও উপলব্ধিতে একজন এবং সম্ভবত একমাত্র, আত্মপ্রতিভায় আশ্রিত

এবং স্ব-মহিমান্বিত সাহিত্যিক। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদেরই ঘরের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঘরোয়া হৃদয়ের সহস্র বর্ণ-সুষমা দিয়ে সরল ও প্রাঞ্জল যে কাহিনী-সাহিত্য রচনা করেছেন সেটা ভারতীয় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নগর-নির্মাণের আদর্শোচিত স্থাপত্যের মতো রূপে ও গুণে সর্বতোভদ্র, বাংলার সমাজ-জীবনের সুখ-দুঃখ প্রতিফলিত করেও বিশ্বজনীন আবেদনে চিরপ্রসন্ন।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র তারিখে লেখা 'কবি অতুলপ্রসাদ' শীর্ষক একটি রচনায় অতুলপ্রসাদের প্রতি সুবোধ ঘোষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, অতুলপ্রসাদের কাব্য-আত্মার মধ্যে তিনি ভারত-আত্মার সন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে চিরন্তন ঐক্য ও সমন্বয়ের সুর রয়েছে, অতুলপ্রসাদের সৃষ্টিতেও রয়েছে সেই ধারা।

ভারত-ইতিহাসের একনিষ্ঠ ছাত্র, সুবোধ ঘোষ বর্তমানকালে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সুহৃদ হিসেবে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন স্যার অরেলস্টাইন-এর প্রতি। ভূতত্ত্ব উদ্ভিদতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব নৃতত্ত্ব ভাস্কর্য ও স্থাপত্য, বহুবিধ শাসন শিলালেখ ও মুদ্রালিপির পাঠোদ্ধার পুরোনো পুঁথি আবিষ্কার ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন—প্রত্যেকটি বিষয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের গবেষণার ফলে আজ ভারতের ইতিহাসকে নতুন করে লেখার যে প্রচুর উপকরণ আমাদের হাতের কাছে জমে উঠেছে, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে অরেলস্টাইনের দান রয়েছে। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু প্রচলিত সিদ্ধান্তকে তাঁর আবিষ্কার উলটে-পালটে দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসের ভিতর দিয়ে তিনি সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে বেড়িয়েছেন। ভারতের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর আবিষ্কার ও দান গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

কর্মজীবনে সুবোধ ঘোষ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত থাকার সূত্রে তিনি আনন্দবাজার গোষ্ঠীর অন্যতম প্রাণপুরুষ সুরেশচন্দ্র মজুমদারকে খুব কাছের থেকে দেখেছেন। সুরেশচন্দ্রের সাংগঠনিক ক্ষমতা, বিনয়নম্র অথচ দৃঢ় আচরণ, চরিত্রবত্তা, মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা, বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রের সাংবাদিকতার প্রতি বৈষম্যহীনতা, মননশীল বাঙালি পাঠকদের জন্য 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশ, 'আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী'র প্রতিষ্ঠা করে উন্নতমানের রুচিশীল গ্রন্থের প্রকাশ, বাংলাভাষাকে অধিকতর উন্নত করার জন্য নিরলস প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কারাবরণ—এইসব ঘটনার স্মৃতিচারণার সূত্রে লেখক সুরেশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

ব্যক্তিজীবনে সুবোধ ঘোষ ঈশ্বর-সম্পর্কে মোটামুটিভাবে নিরপেক্ষ ছিলেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসেও আস্তিক্যবাদের তেমন কোন উচ্ছ্বাস বা কৌতূহল নেই। কিন্তু তিনি যেহেতু ভারতপ্রেমিক, তাই ভারতধর্ম অনুসন্ধান করতে গিয়ে যেমন বৌদ্ধধর্ম নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন, তেমনি শাক্ত ও শৈবধর্ম সম্পর্কেও বিস্তৃত অনুসন্ধান করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল বৈষ্ণবধর্মের প্রতি। তিনি বৈষ্ণবতত্ত্ব ও সাধনা নিয়ে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধও রচনা করেছিলেন—'চৈতন্যের ভাবধর্ম', 'বৈষ্ণবীয় ভাবনার দান' এবং 'ভারতপথিক শ্রীচৈতন্য'।

'জনজীবনে মহৎ ভাবনা সঞ্চারিত করবার যোগ্যতায় ও নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যের তুলনায় রামমোহন রায়ের মতো একজন বিরাট কৃতিত্বের মানুষও বস্তুত একজন পিগ্‌মি (ক্ষুদ্র খর্বকায় মানুষ), আমি তো কোন ছার!'—এই মন্তব্য করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। ওঁর এই মন্তব্যে রবীন্দ্রনাথ খুবই অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর মতে, গান্ধীজির এই উক্তি রাজা রামমোহনের

প্রতি অশ্রদ্ধার আঘাত। গান্ধীজি তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যে রামমোহন-সম্বন্ধে তাঁর অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার উল্লেখ করে তাঁর অভিমতের সরল ব্যাখ্যা করেছিলেন—রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের মহত্ত্বকে একটুও ছোট করে দেখাবার মনোবৃত্তি তাঁর নেই। 'আমি শুধু দুই নেতৃত্বের দুই প্রকৃতির কথা বলেছি।' বাংলা সমাজ-জীবনের ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্তের বহু বিষয়ে গবেষণালব্ধ তথ্যে জানা গেছে, বাংলার কামার-কুমার-তাঁতী প্রভৃতি বিভিন্ন কারুশ্রমিক সমাজের প্রায় সমুদয় অংশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষিত। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আরও দেখিয়েছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত সেদিনের হিন্দু-সমাজের অন্তর্গত এই কারু-শ্রমিক সমাজকে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে। এই জনসমাজের কোন বৃহৎ অংশ খ্রিস্টান হয়ে যায়নি, যদিও হিন্দু-সমাজের অন্য অনেক অংশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। ঐতিহাসিক ড. যদুনাথ সরকার তাঁর লিখিত 'শ্রীচৈতন্য অ্যান্ড হিজ টাইম্‌স্‌' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভাব ও প্রভাবের কিছু তথ্য সমাহার করে অনুরূপ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন। চৈতন্য-যুগের কাল ফুরিয়ে যেতে পারে কিন্তু, লেখক নির্দ্বিধায় বলেছেন, চৈতন্যযুগের প্রেরণা কখনও ফুরিয়ে যেতে পারে না। খ্রিস্টীয় ধর্মমতের প্রচার ভারতের উপজাতীয় আদিবাসী সমাজের এবং হরিজন সমাজের মধ্যে সফল হতে পেরেছে বটে, কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও বিশ্বাসে দীক্ষিত জনসমাজের মধ্যে সামান্য সফলতাও লাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধ, অর্ধ-বৌদ্ধ এবং অ-বৈষ্ণব হিন্দুর নিম্ন সাধারণ শ্রেণীর বেশির ভাগই ইসলামের কাছে বস্তুত খুবই সহজে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তার নিজের কর্মবিশ্বাসে অবিচল নিষ্ঠা রক্ষা করে তার সামাজিক সংহতিকেও অটুট রেখেছিল। গান্ধীজি উপলব্ধি করেছিলেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের কাজ হবে সকলের কল্যাণ-সাধনা, নিতান্ত সর্বাধিক সংখ্যকের কল্যাণ-সাধনা নয়। তাঁর সর্বোদয়-আদর্শ এই নীতি থেকে উদ্ভূত। সুবোধ ঘোষ মনে করেন, বৈষ্ণবের 'জীবে দয়া' আদর্শ এই সর্বোদয় তথা সর্বহিত আদর্শের প্রথম ঘোষণা। আধুনিক গণতন্ত্রের প্রতি বিনীত হয়ে আজ বৈষ্ণবের আদর্শ থেকে প্রকৃত সমাজহিতের পদ্ধতিটিকে চিনে নেবার ও বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে বলে লেখক উপলব্ধি করেছেন। শ্রীচৈতন্যের অনুভব ও উপলব্ধির কাছে প্রতীত হয়েছিল যে, ভারতের বিশেষ একটি সাত্ত্বিক রূপ আছে। ভারত একটি তত্ত্ব। তাঁর আগে শ্রীশঙ্করাচার্যের চিন্তায় ভারতবোধের নব সংগঠনের কিছু স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই ভারতবোধ প্রথম যেদিন নিদারুণ আঘাতে বিপন্ন ম্রিয়মান ও লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, সেদিন সেই ভারতবোধের জাগৃতি সম্ভব করবার জন্য প্রথম চেষ্টা যিনি করেছিলেন, তিনি বঙ্গভূমির শ্রীচৈতন্যদেব। তাই, সুবোধ ঘোষ তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন, 'প্রথম ভারত-পথিক' বলে।

ছয়

'সেদিনের আলোছায়া' রচনাটি 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া। এই লেখাটিতে তিনি তাঁর জীবনের কিছু উপাদান পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। যেগুলো জানলে বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের বিস্ময়কর আবির্ভাব এবং পরবর্তী জীবনে লেখক হিসেবে তাঁর বিচিত্রসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির তথ্যনিষ্ঠ উপকরণ পাওয়া যাবে।

লেখক হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার জন্য সুবোধ ঘোষের জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিন ছিল না। প্রথম বই 'সিগমুন্ড ফ্রয়েড', দ্বিতীয় লেখা বাংলা সাহিত্যের একটি চিরায়ত

ছোট গল্প 'অযান্ত্রিক' এবং তৃতীয় রচনাটি আর এক ধ্রুপদী গল্প 'ফসিল'। এই গল্প দুটি যথাক্রমে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র বার্ষিক সংখ্যায় এবং মাসিক পত্রিকা 'অগ্রণী'তে প্রকাশিত হয়। গণনাট্যে ব্রতী তরুণদল 'ফসিল'-এর নাট্যরূপ প্রচার করে এবং 'অঞ্জনগড়' নামে এই গল্পটি অভিনীত হয়।

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথনাথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, সাগরময় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য গল্প লেখার জগতে ওঁকে টেনে আনলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন 'অনামী সঙ্ঘ'-এর সদস্য এবং স্বরচিত রচনা পাঠ ছাড়াও ওই সভার একটি আকর্ষণীয় কার্যক্রম ছিল আসরের শেষে ভোজনের আয়োজন। মূলত ওই ভোজনানন্দই তখন ছিল সুবোধ ঘোষের পরম ও চরম প্রাপ্তি। কিন্তু স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের অনুরোধে ও অভিযোগের চাপে লেখককে কলম ধরতেই হল এবং দু'দিনের আসরের আগে দু'টি দুপুর বেলায় ওই গল্প দু'টির জন্ম হয়েছিল। অতঃপর 'অনামী'-বন্ধুদের সুপ্রীত চিত্তের হর্ষধ্বনি, তাঁদের দু'চোখের উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির দৃষ্টি লেখকের স্মৃতিতে একটি উজ্জ্বল দ্যুতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। তিনি মনে করেন, ওঁদের আনন্দের প্রকাশ ও উৎসাহবাণী লেখকের সাহিত্যিক কৃতার্থতার প্রথম মাঙ্গলিক ধান-দূর্বা।

তবে, সুবোধ ঘোষ অকপটে স্বীকার করেছেন, ওঁর গল্প লেখার কৃতিত্বটা কিন্তু বিশুদ্ধ আকস্মিকতার ইন্দ্রজাল নয়। ভাবনা কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন-বৈচিত্র্যের যে-ছবি আগেই রূপায়িত হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় সাহিত্যবিভাগের কর্মী হিসেবে গল্প বাছাইয়ের দায়িত্ব, অখ্যাত গল্পলেখকের গল্পের মাজা-ঘষা, নতুন বর্ণনা ও নতুন সংলাপ যোগ, লেখকের ও পাঠকের প্রশংসাসূচক চিঠি—এসবই লেখক সুবোধ ঘোষের প্রাথমিক জীবনের পাথেয় ছিল। ওঁর পিতামহের বন্ধু, ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত ওঁর কাছে নদী পাহাড় সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার-মজার গল্প বলতেন, বড়-বড় প্রাণীর হাড় পাথর-চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়। এইভাবেই সুবোধ ঘোষের শিল্পিসত্তায় 'ফসিল' গল্পের উপকরণ ধরা পড়ে। মহিলা-কবি কামিনী রায় ওঁদের বাড়িতে আসতেন। তিনি ওঁকে তাঁর বই 'গুঞ্জন' ও 'অশোক সঙ্গীত' উপহার দিয়েছিলেন। বইগুলোর অর্থ ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও কবিতার কথা মনের মধ্যে ঝংকার তুলত, মাধুর্য অনুভব করতে অসুবিধে হত না। পিতামহের টেবিলের উপর রাখা একখণ্ড 'ব্রহ্মসঙ্গীত' তিনি বারবার আদ্যোপান্ত পাঠ করতেন। সংগীতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য না বুঝলেও আচার্যদের প্রার্থনার ভাষা ও ব্রহ্মসংগীতের ভাষা কিশোর মনের মধ্যে সুষ্ঠু ভাষার সম্বল তৈরি করে দেয়।

পরবর্তীকালে তাঁর নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার বড় সহায় হল দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরি, বেশি ঝোঁক দেখা দিল ইতিহাস দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়ার দিকে। হাজারিবাগে সেন্ট কলম্বাস কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকার সময় সহপাঠী হিসেবে পেলেন রমেশকে, যে ছিল রাঁচী-নিবাসী বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে। রমেশের মুখ থেকে ওর বাবার গবেষণা ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের পরিচয় শুনে কৃতী নৃতাত্ত্বিক হবার একটি আকাঙ্ক্ষার আবেদনময় সংকেত ওঁকে আলোড়িত করে। নৃতাত্ত্বিক ভূ-তাত্ত্বিক বা সংগীত-রচয়িতা না হতে পারলেও ওঁর সেই সব আবেগ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঞ্চয় গল্প ও উপন্যাস লেখার প্রয়াসেরই একটি সহায়ক সম্বলে পরিণত হয়েছিল। তিনি বলেছেন,

বিশেষ একটি জিজ্ঞাসার প্রেরণা ছাড়া গল্প লেখা সম্ভব নয়। গল্পের গুণাগুণ নির্ণয় করবার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল পদ্ধতি হিসেবে উনি মনে করেন, পাঠকের দেওয়া অজস্র চিঠির অভিমত। একবার একটানা পুরো চার বছর এবং একবার একটানা পুরো দু'বছর উনি একটি গল্পও লেখেননি। তিনি কোনদিন নিজের ইচ্ছের তাগিদে কোন পত্রিকা-সম্পাদকের কাছে লেখা পাঠাননি। স্বরচিত গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করার আগ্রহে কোন প্রকাশকের দ্বারস্থ হননি। তিনি মনে করেন, এটা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের একটি বিশেষ সৌভাগ্য।

নির্দল ও অপক্ষভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে তিনি কখনও কখনও অন্যের কঠোর সমালোচনা ও ক্ষতি করার মুখোমুখি হয়েও নির্লিপ্ত থেকেছেন, কারণ জীবনে তিনি কোনদিন কারও ক্ষতি করেননি। তাই ক্ষতিচারী কোন ক্ষমতাবানকেও তাঁকে কোনদিন ভয় করতে হয়নি।

'ফসিল' গল্পটি পাঠকমহলে সমাদৃত হলেও কোন প্রকাশক 'ফসিল' ও অন্যান্য কয়েকটি গল্পকে বই করে ছাপতে ও প্রকাশ করতে আগ্রহবোধ করেননি। তাঁদের অনাগ্রহের যুক্তি, গল্পের বই বিকোয় না। 'ফসিল' গল্পগ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন একজন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, বন্ধু ক্ষেত্রনাথ রায়ের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ পাল। অবশ্য এই বইটির প্রথম সংস্করণ দু'তিন মাসের মধ্যেই নিঃশেষ হয়েছিল। ওঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ অবস্থার একটি দুর্বার প্রয়োজনের তাগিদে লেখা। এই বইটিকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল 'বিকট নিন্দা ও বিপুল প্রশস্তি।' আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা গেল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি তাঁর 'হ্যাংলা' গল্পটি লিখেছিলেন সুবোধ ঘোষের 'নতুন শালিক' গল্পটি লেখার প্রতিবাদে। আমরা সত্যাসত্য জানি না, কিন্তু লেখকের ক্ষোভ অতি পরিষ্কার। তিনি বহুবার ব্যথিত হয়েছেন, কিন্তু 'বিদ্বিষ্ট' হননি।

সুবোধ ঘোষ এক হিসেবে স্বীকার করেছেন, লোকে কোন কোন সময়ে তাকে 'অহংকারী' ভেবেছে—এবং সেটা সঠিক নয়। তাঁর 'নিরীহ নির্লেপ'কে দাম্ভিকতা বলে অপবাদিত করায় লেখকের প্রচ্ছন্ন অভিমান ব্যক্ত হয়েছে। তবে তিনি নিজেই 'ভিড় থেকে সরে থাকার' পক্ষপাতী ছিলেন। 'কিন্তু এহেন অপক্ষভুক্ত লোককে সকলেই অপছন্দ করে'—এটাই তাঁর অভিজ্ঞতা। তার 'গল্পসমগ্র'-এর জীবনী-অংশে প্রকাশক গোষ্ঠীর মন্তব্যে আছে : 'আপাত রাশভারী'। কিন্তু ঘনিষ্ঠমহলে অন্য চেহারা, 'দিলখোলা', 'মজলিশী'। একথা সাগরময় ঘোষের লেখাতেও উল্লিখিত রয়েছে। 'আত্মকথা' জাতীয় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে তাই এগুলো বলা প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলি প্রাবন্ধিকের বিভিন্ন সময়ে রচিত, তাই ভাষা এবং বানানও ভিন্ন। আমরা তার সমতা আনার চেষ্টা করিনি। প্রবন্ধগুলির প্রকাশকাল যতটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি তা গ্রন্থশেষে পরিশিষ্ট-এ দেওয়া হ'ল।

বক্ষ্যমান এই গ্রন্থে সুবোধ ঘোষের লেখা মোট একশো আটত্রিশটি রচনা সংকলিত হল। গল্প-উপন্যাস রচয়িতা হিসেবে সুবোধ ঘোষের সৃষ্টিশীলতা এবং সেগুলোর নান্দনিক মাধুর্য সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের পাঠকেরা যথেষ্টমাত্রায় ওয়াকিবহাল। কিন্তু তাঁর এই বিচিত্রধর্মী বিপুল রচনাবলী সম্পর্কে অনেক পাঠক সম্পূর্ণ অবহিত নন। তাই লেখকের জ্যেষ্ঠপুত্র উত্তমের আনুকূল্যে, আগ্রহে ও সহযোগিতায় 'সাহিত্যলোক' সুবোধ ঘোষের এই রচনাগুলো একত্রে সংকলিত করে পাঠকসমাজের হাতে তুলে দিতে পারলেন, এজন্য ওই প্রতিষ্ঠান আমাদের সকলের পক্ষে ধন্যবাদার্হ।

নিতাই বসু

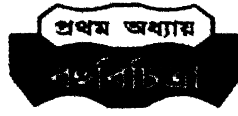
সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : বহুবিচিত্রা

দ্বিতীয় অধ্যায় : মনোবিজ্ঞান

তৃতীয় অধ্যায় : চারুকলা

চতুর্থ অধ্যায় : আদিবাসী



বাংলার চড়ক উৎসব

ছয় ঋতু ও বার মাসের বিচিত্র পূজা পার্ব্বণ ও উৎসবের সূচী নিঃশেষ করিয়া বৎসর যেই দিন ক্লান্ত হয় সেই দিন চৈত্র সংক্রান্তি। বাংলা দেশের প্রতি জনপথ ও পল্লীর আকাশ প্রকম্পিত করিয়া ঢাক ঢোল কাঁসরের বাদ্য বাজিয়া ওঠে। সাধারণ ভাষায় বলা হয় ঢাকে চড়কের কাঠি পড়িয়াছে। এই চড়ক উৎসবের ভিতর দিয়াই বাংলা দেশে পুরাতন বৎসর বিদায় গ্রহণ করে। প্রতি দেশে নববর্ষেই উৎসবের সমারোহটা যেন কিছু বেশী, কিন্তু বাংলা দেশে বর্ষ-বিদায় উৎসবের চাঞ্চল্য কিছু কম নহে। চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক ও গাজন তাহার প্রমাণ।

চড়ক-উৎসবে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উহা বাংলার প্রকৃত গণ উৎসব। তথাকথিত নিম্নজাতীয় জনসাধারণ এই উৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহশীল উদ্‌যাপক। এই উৎসবের ধর্ম্মাচরণ আনুষঙ্গিক বহুবিধ ক্রিয়াকলাপ যদিও ব্রাহ্মণ প্রভাবমুক্ত নহে, কিন্তু এই প্রভাব অতি অকিঞ্চিৎকর। ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে মন্ত্রার্চ্চনা করিতে আহ্বান করা হয় অবশ্য, কেন না এই উৎসব বর্ত্তমানে শৈবতন্ত্রমূলক বলিয়া প্রচলিত। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণোক্ত শিবের মহিমা, শিবভক্তি ও শিবতুষ্টির বহুবিধ ব্রতাচার চড়ক-উৎসবের সঙ্গে অঙ্গীভূত। এই কারণে উৎসবের আরম্ভেই ব্রাহ্মণ পুরোহিত আসিয়া 'শিবের পাট' পূজা করিয়া যান। তিন চারি হাত লম্বা একখানি সিন্দুরলিপ্ত তক্তাকে 'শিবের পাট' বলা হয়। 'শিবের পাট' পূজা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় ব্রতবিধি ভক্ত ও উৎসব-অনুরক্ত নরনারীর নিজ নিজ পালনীয়।

শৈব প্রধান বাণরাজা চৈত্র সংক্রান্তির দিনে স্বীয় রুধিরপাতে ও নানা কৃচ্ছ্রসাধনা এবং সেই সঙ্গে নৃত্য-গীত-বাদ্যের দ্বারা শিবভজনা করিয়া সফলকাম হন। এই পৌরাণিক প্রবাদের কীর্ত্তি ও প্রভাব চড়ক উৎসবের মধ্যে খুবই প্রকট। একদিকে যেমন নৃত্য গীত বাদ্য ও ভোজনের বাহুল্য, অপর দিকে তেমনি উপবাস, শরীর-নিগ্রহ প্রভৃতি নানা কষ্টকর আচরণ, চড়ক উৎসবের মধ্যে একাধারে এই দুই বিপরীত সাধনার সমন্বয় হইয়াছে।

চড়কের উৎসবে দীক্ষিত ভক্তদের 'সন্ন্যাসী' বলা হয়। যে কোন লোকেই উৎসবের কয়েকটি দিনের জন্য সন্ন্যাসী হইতে পারে। ব্রাহ্মণের কিন্তু সন্ন্যাসী হইবার অধিকার নাই। সন্ন্যাসীরা সদলবলে পথে বাহির হয় ; গীত-বাদ্যের সহিত শিবের পাট বহন করা হয়। সম্মিলিত কণ্ঠে শিবের গান করে। দলের দুইজনকে হর ও গৌরী সাজাইয়া গ্রামের পথে পথে শোভাযাত্রা বাহির করে।

ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশসমূহে চড়ক বা গাজনের কোন অস্তিত্ব নাই। এই উৎসবের লোকময়তা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতেই সমধিক। দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় এই উৎসব 'চেড্ডুল' নামে বিখ্যাত।

ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী হইতে আমরা জানিতে পারি যে, রানী রঞ্জাবতী 'ধর্ম্ম'কে তুষ্ট করিবার জন্য গাজন করেন।

"গাজন লইয়া এল ময়না মণ্ডলে
শিরে ধর্ম্ম- পাদুকা সোনার চতুর্দ্দোলে"

এই ধর্ম্ম-ঠাকুরের পূজা ও তৎসঙ্গে গাজন পালনের বিধি হইতে মনে হয় যে, এই উৎসব মূলতঃ অহিন্দু (?) উৎসব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ও যাজ্ঞিক উৎসব রীতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। বরং বৌদ্ধতন্ত্রবাদের সহিত ইহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। আরোও বেশী তলাইয়া দেখিলে বোঝা যায় যে—চড়ক উৎসবের মধ্যে শুধু বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা কেন, দূরাতীত অনার্য্য ঐতিহ্য ও ইহার আড়ালে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। উৎসবাদি ব্যাপারে নিদারুণ শরীর নিগ্রহের যেসব প্রথা আজিও বর্ত্তিয়া আছে, বিশেষ করিয়া চড়ক-গাজন প্রভৃতি পর্ব্বের মধ্যে তাহা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে উৎসবের প্রাগৈতিহাসিকতাটুকু ধরাইয়া দেয়।

চড়কের উৎসব পালনে সাময়িকভাবে দীক্ষিত ভক্তবৃন্দ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগকে কঠোর ব্রত পালন করিতে হয়। কয়টি দিনের জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। ইহারা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যায় শিবের নামে ধূনা পোড়ায়। সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন রাত্রে খিচুড়ী ও দগ্ধ গজাল মাছের উপাচারে শিবের পূজা হয়। অর্দ্ধ রাত্রে সন্ন্যাসীরা ভাষামন্ত্রের সহিত ধূনা পোড়াইয়া শিবের আরাধনা করে। এই আরাধনার সময় এক একজন সন্ন্যাসী উৎকট প্রমত্ততা দেখায়। প্রবলভাবে মাথা ঘুরাইয়া মন্ত্র পাঠ ও আরাধনা করিতে করিতে অবশেষে সন্ন্যাসীকে প্রায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতে হয়। অবশ্য ভক্তের নিকট ইহা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার—দেবতার ভর বা আবেশ। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে সন্ন্যাসীদিগেব কেহ কেহ নিরন্তর কথা বলিয়া যায়। প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরও দেয় এবং এইসব উত্তর দেববাণীর মত অনেকে বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করে।

সন্ন্যাসীদিগের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইল তাহাদের নিষ্ঠা ও ভক্তি প্রমাণিত করা। ভক্তি প্রমাণ দর্শাইবার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসীদিগের রোমহর্ষক 'ঝাঁপ' দেখাইতে হয়। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহ শলাকা বা ধারালো বঁটীর উপর ঝাঁপাইয়া লাফ দিয়া পড়া, শরীর ক্ষতবিক্ষত ও শোণিত স্রাবে জর্জ্জরিত করা প্রথম শ্রেণীর ঝাঁপ। ইহা ব্যতীত 'ঝল ঝাঁপ' ও 'কাঁটা ঝাঁপ' আছে এবং নিষ্ঠুরতায় কোনটিই কম যায় না।

চড়কের সন্ন্যাসীদিগের সন্ন্যাসেরও বহুবিভাগ আছে। রামায়ণোক্ত হনুমান কর্ত্তৃক গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় বহন করিয়া আনার এক প্রকার অভিনয় সন্ন্যাসীদিগকে করিতে হয়। ইহা গিরিসন্ন্যাস নামে অভিহিত। আবার একদল সন্ন্যাসী একটা আম গাছের ফলসমেত শাখা ভাঙ্গিয়া আনে ও নীলবষ্ঠীর পূজা করে। এই সংগে 'বাণফোঁড়া' ব্রতও অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে 'বানর-সন্ন্যাস' বলা হয়। 'বাণসন্ন্যাস' অতি ভীষণদর্শন ব্যাপার। আড়াই হাত হইতে চার পাঁচ হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটি সূচ্যগ্র বাণ বা লৌহ শলাকা দ্বারা জিহ্বা বিদ্ধ করা হয় এবং রক্তাক্ত বদনে উন্মত্ত নৃত্য, গীত, বাদ্যে বিভোর হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে জিহ্বা হইতে বাণটি নিষ্কাসিত করিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কখনো বা গাত্রের উভয় পার্শ্বের চর্ম্মবেধ করিয়া তাহাতে সূত্র অথবা একটি ক্ষুদ্র সরু বেত ভরিয়া দেওয়া হয়। ইহাদের সূত্র-সন্ন্যাসী অথবা বেত্র-সন্ন্যাসী বলা হয়।

কিন্তু সকল সন্ন্যাসের বীভৎসতাকে টেক্কা দিয়া উঠিয়াছে বড়শী-সন্ন্যাস। বড়শী-সন্ন্যাসের পরিণতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণান্তে পৌঁছিয়া যায়। বড়শী-সন্ন্যাসের জন্য প্রথমে প্রয়োজন 'চড়ক গাছ', একটি স্তম্ভ—স্তম্ভের শীর্ষে সছিদ্র একটি কাঠের আল। উক্ত আল হইতে

লম্ববান দড়িতে বাঁধা সূচীমুখ বৃহদাকার একটি বড়শী বাঁধা থাকে। সন্ন্যাসী উক্ত বড়শীটিতে আপন পৃষ্ঠদণ্ড বা শিরদাঁড়া বিদ্ধ করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া চরকীর মত ঘুরপাক খায়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আইন প্রবর্ত্তন করিয়া এই নিষ্ঠুর উৎসব রীতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

চড়ক ও গাজন উৎসবের উল্লিখিত উগ্রতা আধুনিক কালে অনেকখানি কমিয়া আসিয়াছে। শহরগুলিতে গাজনের প্রতিষ্ঠা এক রকম নাই বলিলেও চলে। কিন্তু পল্লীর বাৎসরিক পর্ব্বগুলির মধ্যে চড়ক ও গাজন দোল দুর্গোৎসবের মতই অক্ষুণ্ণ মহিমা আজিও বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

ফরিদপুর জেলার কোটালীপাড়ার চড়কের প্রসিদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত। শোনা যায় যে, সেখানে এখনও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী উগ্র নিষ্ঠার সহিত চড়ক ব্রত পালিত হয়। সব রকম ঝাঁপ ও সন্ন্যাস—এমন কি 'বাণফোঁড়' ও 'বড়শী সন্ন্যাস'ও সেখানে পরিবর্জিত বা পরিত্যক্ত হয় নাই। যথাযথ পূর্ব্ব নিয়মে পূজার্চ্চনা ও উৎসব নিষ্পন্ন হয়। সাধারণতঃ ধোপা ও চণ্ডাল শ্রেণীর লোকদিগকের মধ্যে নিষ্ঠার আধিক্য দেখা যায় এবং উৎসবকে পূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিহীন করিবার উদ্দেশ্যে ধোপা ও চণ্ডাল সন্ন্যাসীরা কোন বিভীষিকাকেই গ্রাহ্য করে না। শান্ত উপেক্ষার সহিত তাহারা নিষ্ঠুর শরীর নিগ্রহ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া উৎসবের উদ্বোধন ও সমাপ্তি করে। এই কৃচ্ছ্র সাধনের পরোক্ষ উদ্দেশ্যও আছে। যে সব ভক্ত গৃহস্থদের দেবতার অনুগ্রহ, সৌভাগ্য সঞ্চার প্রভৃতি কোন মানসিক থাকে তাহারাও চড়কের সন্ন্যাসে দীক্ষা গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বক্ষেত্রেই পূজাপার্ব্বণের ব্রতীগণ এইরূপ এক একটি 'মানসিক' প্রণোদিত। কিন্তু চড়কের ব্রতীগণের নিষ্ঠার তুলনায় অন্য কোন ব্রতীর নিষ্ঠা দাঁড়াইতে পারে না। অবিচলিত বিশ্বাসের প্রেরণা পিছনে না থাকিলে এই সুকঠোর সাধনাকে বরণ করিতে কেহ সহজে প্রলুব্ধ হইতে পারে না।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত প্রচুর তথ্য চড়ক উৎসবের স্তরে স্তরে সঞ্চিত রহিয়াছে। অনার্য্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য প্রত্যেক ধর্ম্মনীতি ও আচরণের প্রক্ষিপ্ত কতকগুলি রক্ত মাংস যেন চড়কের ভিতর এক দেহে লীন হইয়া রহিয়াছে। কে ইহার প্রবর্ত্তক, কবে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা অবগত হওয়ার সম্ভাবনা নির্ভর করে ঐতিহাসিকের গবেষণার উপর। এই গবেষণার প্রয়োজনও রহিয়াছে কারণ জাতির ইতিহাস ও উৎসবের ইতিহাস পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা নিঃসম্পর্কিত নহে।

এরা আমাদেরই লোক

জীবন যাদের উৎসব, আর উৎসবই জীবন, এই ধরনের মানুষ হ'ল সাঁওতালেরা। একজন সাঁওতালকে দেখে নাগরিক মানুষের মন স্বত অভিনন্দনে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে—প্রকৃতির দুলাল! পার্থক্যটা এইখানে। নাগরিক জীবনের বিড়ম্বনায় মানুষ যে জিনিসটা হারিয়ে বসেছে, সেইটা আজও অটুট হ'য়ে রয়েছে এই সাঁওতালদের সহজ জীবনধারায়।

সাঁওতালরা দরিদ্র অথচ সুখী। কিন্তু তাই ব'লে এ ধারণা করা উচিত নয় যে, দারিদ্র্য তাদের গায়ে বাজে না। কলকাতার রাস্তার ভিখিরীরাও দরিদ্র, ফুটপাথে বসে তারাও সাঁওতালদের মত গলা ছেড়ে গান গায়। কিন্তু ভিখিরীদের তো প্রকৃতির দুলাল ব'লে মনে হয় না। সুতরাং পার্থক্যটা অন্যখানে।

নিজের প্রকৃতির গুণেই সাঁওতালেরা দুলাল হ'তে পেরেছে। জঙ্গল, পাহাড় ও ঝর্ণার কোন বিশেষ প্রসাদে এটা সম্ভব হয় নি। নাগরিক মানুষ নিজের প্রকৃতির মধ্যেই সহস্র রূঢ় ও জটিল মানসকূটের সৃষ্টি ক'রে নিজেকে বায়োলজির বিকৃত অপভ্রংশে ক'রে ছেড়েছে। সাঁওতালদের জীবনে সকল কর্মপ্রবাহের পেছনে আছে নিছক আনন্দসাধনার প্রেরণা। আনন্দের ক্ষেত্রে তাদের বাছ-বিচার, ট্যাবু-বালাই খুবই কম। অপরদিকে নাগরিক মানুষ কেশীর ভাগ অবদমন ও সাদীয় মনোবৃত্তির আওতায় প'ড়ে সহজ স্বতঃপ্রাপ্ত আনন্দকে দুর্লভ ক'রে রেখেছে। পার্থক্যটা এইখানে। দোষ নগরের নয় বা গুণ পাহাড়-জঙ্গলের নয়। শহর বাজারে থেকেও সাঁওতালেরা তাদের সুস্থ জীবনের আনন্দময় প্রশান্তিকে ব্যতিব্যস্ত করে নি।

সাঁওতালদের যদি বন্য বলা হয়, তবে সে বন্যতাকেই সব চেয়ে বড় সম্পদ বলতে হবে। সহস্র নিষেধের প্রকোপে সঙ্কুচিত নাগরিক মানুষ যদি এই প্রাকৃতিক বন্যতাকে নূতন ক'রে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তবে সমাজের শ্রী বোধ হয় সত্যই নূতনভাবে বিকাশ লাভ করবে।

বন্য, বর্বর ও আদিম প্রভৃতি কতগুলি কথা আছে, যাকে বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানে বহু কদর্থ করা হয়েছে। এগুলি নিন্দোক্তি হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। সাঁওতালদেরও বর্বর বলা না হোক, তাদের আদিম ও বন্য বলতে অনেকে কুণ্ঠিত হন না। সাঁওতালদের জীবনের যে normality, সেটা শহুরে সভ্য (?) মানুষের মধ্যে দুর্লভ। কাজেই টক-আঙুরের ওপর শেয়ালের ধিক্কারের মত সেই normality-কেই primitive আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাঁওতালদের primitive জীবনকেই আমরা বিচার ক'রে দেখব, সেটা রুচি, রস, শিল্পবোধ, সাবলীলতা ও সৌন্দর্যে অন্যের তুলনায় নিকৃষ্ট না অপকৃষ্ট।

নৃতত্ত্বের দিক থেকে বিচার করলে সাঁওতালদের কৌলিন্য আরও বেশী ক'রে চোখে পড়ে। মানবসমাজের একটি বনিয়াদী ঘর এই সাঁওতালেরা। লক্ষ বৎসরের সূর্যকরের সেবায় পরিপুষ্ট কৃষ্ণকান্তি এই প্রবীণ মানবগোষ্ঠী। নৃতত্ত্বের আসরে তারা গ্রানিটের মত গুরুস্থানীয়।

মহুয়া ভরা শালের ছায়ায় বিশ্রম্ভালাপে রত সাঁওতাল দম্পতিকে আদর্শ যৌন জীবনের সুচারু শিল্পময় প্রতীক ব'লেই মনে হয়। পীড়ন ও প্রগল্‌ভতায় বিকৃত তথাকথিত সভ্যতর মানুষের দাম্পত্য, সে দৃশ্য দেখে হিংসায় আতুর হ'য়ে উঠবে।

দৈহিক সৌন্দর্যের কথাই তোলা যাক্। অবশ্য নীল চোখ, কটা চামড়া বা পিংগল কেশ, যদি শারীর সৌন্দর্যের সনাতন মাপকাঠি হয়, তবে সাঁওতালরা হয়তো কুরূপ। কিন্তু যদি পরিপুষ্ট পেশীর সুছন্দায়িত সজ্জা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন, symmetry ও কমনীয়তা—চলা-বলা, হাসি স্ফূর্তির সজীবতা ও স্বাস্থ্যকে রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড ধরা হয়, তবে সাঁওতালরাই হয়তো কোন পরম আর্যের চেয়ে কম সুন্দর নয়।

Aesthetics-এর ক্ষেত্রে এসেও বিচার করা হোক্। সৌন্দর্যবোধে এই 'আদিম' মানবেরা কার চেয়ে কম? খালি পেটে সমস্ত দুপুর গাছের ছায়ায় ব'সে বাঁশি বাজাতে পারে, এতখানি সঙ্গীতপ্রাণতা শহুরে মানুষের মধ্যে কতটুকু পাওয়া যায়? শিকার, বিবাহ, শস্যরোপণ, লড়াই, মৃতের সংস্কার সব কিছুকেই এরা গানে গানে ভরে রেখেছে। সভ্যতাগর্বী অর্বাচীন মানুষেরা এতটা রসৈশ্বর্যের অধিকারী আজও হ'তে পারে নি।

পূর্ণিমায় পলাশের কুঞ্জে কুঞ্জে সাঁওতাল নরনারীর উদ্বেল নৃত্যে যে ছবি ফুটে ওঠে, তাকে উপভোগ্যতায় ছাড়িয়ে উঠতে পারে, এমন কোন নাচ তো চোখে পড়ে না। সভ্য মানুষের নৃত্যকলায় বুঝবার, উপভোগ করবার অনেক কিছু আছে সত্য, কিন্তু তার মধ্যে সার্কাসী কেরামতিই যেন বেশী। নৃত্যের প্রাণ যে অঙ্গহার, তার সব চেয়ে বড় পরিস্ফূর্তি সাঁওতালী নৃত্যের অনাবিল ছন্দোমত্ততায় ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য, সাঁওতালী নৃত্যের ঐ অনাড়ম্বরতার মধ্যে যতখানি আবেগ সৃষ্টি করা হয়, অন্য কোন নাচে তার এক-তৃতীয়াংশও হয় কি না সন্দেহ।

সেকালের কবিরা যুবতীর কবরীর স্তুতি ক'রে গেছেন। কালিদাসের আমলে কুরুবকের চূড়ায় কবরী গৌরব বৃদ্ধি করত। তার পরেও কবিরা মুগ্ধ হয়েছেন দেখে—'কানাড়া ছান্দে কবরী বান্ধে নব মল্লিকার মালে'। শুধু ভারতীয় বা বাঙালী সমাজ নয়, প্রায় সব সমাজেই কবরী ও ফুলের এই যুক্তবিন্যাসের আর্ট আজ লুপ্ত হয়েছে। সাঁওতালদের মেয়েদের কবরী রচনার রীতি সভ্যসমাজের যে কোন গর্বিতা বেণীনিকে লজ্জা দেবে। পারিপাট্য ও কারুতার কথা ছেড়ে দিলে, সামান্য ঐ খোঁপার ফুল ব্যবহারের প্রথাটি বহু যুগের সাধনামার্জিত একটি রুচি।

সাঁওতালদের পরিচ্ছদ লক্ষ্য করার বিষয়। নর ও নারীর উভয়ের পরিচ্ছদের অনাড়ম্বরতা অথচ decorum কত সুদৃশ, তা আর্টিস্টের চোখেই ভাল ক'রে ধরা পড়ে। পোষাকের বাহুল্য দু'জাতের মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এক অতি বর্বর মানুষ—শূয়োরের দাঁত, পালক, রোঁয়া ও পশুচর্মের আভরণে ভারাক্রান্ত দেহ। আর আধুনিক সভ্যসমাজের মানুষ। সাঁওতালরা এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ। পরিচ্ছদের ব্যাপারে এরা পাশব উলঙ্গতার চর্চা করে না। আবার আড়ম্বর ও আতিশয্যেরও কোন ধার ধারে না। এদের পরিচ্ছদ-রুচি সত্যই প্রশংসনীয়। এদের পরিচ্ছদ পদ্ধতিতে অঙ্গ -প্রত্যঙ্গের মহিমা চাপা না প'ড়ে বরং তা আরও বেশী আবেদনশীল হ'য়ে দেখা দেয়।

এদের সমাজব্যবস্থা থেকে এখনও তাদের সাবেকী tribal সমানাধিকার উচ্ছিন্ন হয় নি। কাজেই সমাজসুখ এরা যতটা উপলব্ধি করে, বৈষম্যে বিষাক্ত সভ্যসমাজে তার আস্বাদ পাবার সৌভাগ্য কারও নেই। নানা নূতন অর্থনীতিক বৈগুণ্যে এদের আজ পাহাড় বনের আশ্রয় ছেড়ে সমতলে নামতে হয়েছে, শহরে খনি মজুরের পেশা ধরতে হয়েছে। তারপর চলেছে ধর্মপ্রচারকদের অভিযান। বাপের কেলে 'বোঙ্গা'কে শিকেয় তুলে দলে দলে নূতন দেবতার কাছে দীক্ষা নিয়েছে। চাকুরী নামে একটা অভিনব উপার্জন পন্থার পরিচয় পেয়েছে। কাজেই এদের primitive সমাজব্যবস্থার অটলতায় আজ আঘাত পড়েছে খুব জোরে।

এ সব সত্ত্বেও সাঁওতালেরা একটা গুণে আজ সাঁওতালত্ব হারাতে পারছে না। সেটা তাদের ঐ যুগ যুগ সাধনালব্ধ সম্পদ আনন্দ সাধনার প্রেরণা। উৎসবকে এরা ছাড়তে পারে না। পান, ভোজন, দাম্পত্য, শিকার, নৃত্য-সংগীত—সবের মধ্যে ষোল আনা আনন্দের খোরাক যুগিয়ে রেখেছে এরা।

রুচি সুন্দর হ'লে জীবন কত সুন্দর হয়, সাঁওতালদের জীবনে তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে। এত যে মহুয়া মদের মাতামাতি, নৃত্যের উদ্দামতা ও গীত-বাদ্যের আনন্দমুখরতা, তবুও তাতে এদের প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রগল্‌ভতা প্রবেশ করে নি। এদের সাহস, শক্তি

ও বীর্য অলস হয়ে পড়ে নি। সুরুচি কত শক্তিপ্রবণ, তা সাঁওতাল চরিত্রের মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

সামাজিক জীবনে বৈষম্যের অনাচার না থাকলে, সহস্র অভাব বিপত্তি সত্ত্বেও মানুষ কতখানি আনন্দের অধিকারী হ'তে পারে, সাঁওতালদের জীবনে এই সমাজবিজ্ঞানগত তথ্য ছড়িয়ে রয়েছে। জ্ঞানবিজ্ঞানও যদি বৈষম্যদোষে দুষ্ট থাকে, তবে সেটা মানুষের জীবনকে কোন মতেই শ্রীমণ্ডিত করতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার ট্র্যাজেডি এইখানে। সহজ সংস্কৃতিবান এই সাঁওতাল জাতির সামাজিকতার ভেতরে এই শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি।

বৈধব্য প্রথা

আধুনিক সমাজকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ; যে সমাজে পিতৃতান্ত্রিক আধিপত্য প্রখর সে সমাজে পুরুষের দাবীর দিকে পক্ষপাতিত্ব স্বাভাবিক। পৃথিবীর ইতিহাসে অবশ্য মাতৃতন্ত্রের অভাব নেই। সুপ্রাচীন কালে তো ছিলই, আধুনিক কালেও নানা বর্ব্বর সমাজে মাতৃতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা রয়েছে। সে সমাজে নারীই ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সংসারের পরিচালক। এ সমাজে নারীর অধিকার ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা পুরুষের তুলনায় স্বভাবতঃই অনেক বেশী।

কিন্তু মোটামুটি পৃথিবীতে পুরুষ সভ্যতাই প্রবল। আধুনিক সভ্যতায় নারীর কীর্ত্তি ও দান নেই বললেও চলে। সুতরাং এ সভ্যতায় নারীর প্রতিষ্ঠা পুরুষের তুলনায় অনেক লঘু।

যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যেখানে আমোদ-প্রমোদ ও উপভোগের ব্যাপার সেখানে পুরুষের দাবীর পরিধি সুবিস্তৃত। অন্যদিকে ট্যাবু বা যে কোন সংস্কার অথবা ঐতিহ্যগত কোন কৃচ্ছ্র সামাজিক কর্ত্তব্য পালনের দরকার সেখানে নারীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে সকল দায়। সহনশীলতায় নারী আজও কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে এগিয়ে যায় সেটা বোধ হয় তার যুগব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনার ফল। নারীর ওপর সবচেয়ে বেশী অনুদারতা করা হয় জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি কোন সংস্কারগত সামাজিক অশৌচের ব্যাপারে।

স্বামীর মৃত্যুতে নারীকে কতগুলি কষ্টকর ব্রত পালনে নিয়োজিত করা কমবেশী প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে দেখা যায়, সভ্য বা অসভ্য কেউ এই অনুশাসন থেকে মুক্ত নয়।

তবে যুক্তি ও বুদ্ধির যুগে এই বিংশ শতাব্দীতে যারা সংস্কৃতিবান জাতি, তারা এই অপচারের হাত থেকে নিজেকে অনেকখানিই মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। বিধবার জীবনকে দুর্ব্বহ নির্য্যাতনে কণ্টকাক্ত করে তোলার দুষ্ট ধর্ম্ম শ্রবণবাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তারা সাধারণতঃ অসভ্য আদিম বর্ব্বর সম্প্রদায়। শুধু বাংলাদেশ এ বিষয়ে বর্ব্বরদের সংগেও টেক্কা দিতে পারে। বিধবাকে পুড়িয়ে মারার প্রথা এই সেদিনও বাংলাদেশে ধর্ম্মানুমোদিত লোক-সমর্থিত ও প্রচলিত ছিলো। আজ যদিও পুড়িয়ে মারা হয় না, তবুও অন্যবিধ যে সব সামাজিক নির্যাতনের ব্যবস্থা আছে, তা নিষ্ঠুরতায় কঙ্গো, নিউগিনি এবং পূর্ব্বভারত দ্বীপবাসী উলঙ্গ নরমাংসভুক অরণ্যচারী মানুষদের রীতিনীতির সংগে তুলনীয়।

এই বৈধব্য প্রথা জাতিতে জাতিতে যেমন বিভিন্ন তেমন বিচিত্র।

স্যার লিওনার্ড উলি যখন উর দেশের ভূস্তর খনন করে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন একদিন মাটির গভীর স্তরের ২৭ ফুট লম্বা আর ২৫ ফুট চওড়া একটা প্রকোষ্ঠ পাওয়া যায়। এই ঘরটিতে সারি সারি শোয়ানো ৭৪টি মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া যায়। এর মধ্যে ছ'টি পুরুষের আর ৬৮টি নারীর কঙ্কাল।

সেই দূর অতীতে, যার কোন আখ্যায়িকা আজ কোন পুঁথির পাতায় লেখা নেই, যে সব মানুষের সুখদুঃখের শেষ স্মৃতিটাও পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে উবে গেছে, তাদের বিষয় সঠিক কিছু ধারণা করা আজ আমাদেব পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, শুধু অবাক হয়ে ভাবতে হয়—কি এমন ব্যাপার ঘটে ছিল যার জন্যে ৬৮টি নারীকে এমনভাবে হত্যা করে কয়েকটি পুরুষের শবদেহের সঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

স্যার লিওনার্ড বলেন, এটি একটি প্রাচীন সতী সমাধির নিদর্শন। সম্ভবতঃ কোন সমাজের প্রভু, নরপাল বা শক্তিমান সর্দ্দারের মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হয়েছিল এইখানে। কিন্তু পরলোকে প্রভু একা থাককেন কি করে? কে তাকে সেবা করবে? কাজেই ইহলোকের সব সঙ্গিনীদের যেতে হয়েছিল তাঁর সঙ্গে, ভবপারের যাত্রায় সঙ্গী হয়ে। এই প্রকোষ্ঠটী এই রকমের কোন রাজা এবং তাঁর সহমৃতা পত্নীগোষ্ঠীর কবর।

আমেরিকার ইঙ্কা সভ্যতায়ও মৃতস্বামীর স্ত্রীদেরও বেঁচে থাকার কোন অধিকার ছিল না। একটি ইঙ্কা মারা গেলে, তার সমাধির মধ্যে কয়েকশত নারী ও বিবাহিতা স্ত্রী বা বাঁদী জ্যান্ত কবর বরণ করে নিত।

ফিজি দ্বীপে বিধবাদের ফাঁসি দিয়ে বা জীবন্ত পুঁতে ফেলাই নিয়ম ছিল। চীন ও আফ্রিকাতেও বিধবার আত্মোৎসর্গের নিয়ম ছিল। এবং এখনও কিছু কিছু আছে।

ইহজগতে আয়ু শেষ হয়ে গেলেই মৃত্যুর পর আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না, এটি প্রাচীন বর্ব্বর মানুষের বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তারা সত্যিই পরলোকে যাত্রা করতো এবং সঙ্গে তার এতদিনের পরিশ্রমে পুষ্ট সংসার আর গেরস্থালী, তার আত্মীয়স্বজন, ভালবাসার ভাজন আর জীবনসঙ্গিনীদের নিয়ে যেত। পতিপ্রাণা নারীকে সেদিন পর্য্যন্ত স্বামীর সঙ্গে চিতায় উঠতে হয়েছে। তাদের কথা আজও আমরা স্মরণ করি ও তাদের হতভাগ্যের জন্য অনুশোচনা করি। কিন্তু স্মরণ করা উচিৎ যে, শুধু বিবাহিতা স্ত্রী নয়, কত সেবাপরায়ণ প্রভুভক্ত চাকরকেও মালিকের সঙ্গে সহমরণে যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সহমরণের পেছনে এইটিই একমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহজন্মে যারা সেবাদাস ও সেবাদাসী, তাদের সঙ্গে না নিয়ে প্রভু ভবপারে যেতে পারেন না। স্ত্রীই সত্যিকারের সেবাদাসী। তাই স্ত্রীকেই সহমৃতা হবার অনুশাসন।

কবরে চাপা পড়ে বা চিতায় পুড়ে যে সব বিধবারা ল্যাঠা চুকিয়ে দিত, তাদের বিষয়ে সমাজের আর কোন অনুশাসন সৃষ্টি করার কারণ ঘটতো না। কিন্তু বিধবার বেঁচে থাকার দাবী সমাজ মেনে নিল, তখনো কিন্তু সমাজ তাদের জন্য এমন সব বিধান সৃষ্টি করলো যা প্রকারান্তরে মৃত্যুরই সামিল অর্থাৎ জীবন্মৃত্যু। এর মূলে রয়েছে আদিম মানুষের এবং আদিমতাপ্রবণ আধুনিক মানুষের মনের কতগুলি ট্যাবু বা সংস্কার। কেউ মরলেই আত্মীয় স্বজনের ওপর অশৌচ বর্ত্তায় অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনের শুচিতার হানি হয়। সাধারণের কাছে তারা তখন প্রায় অস্পৃশ্য। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীই সর্ব্বাপেক্ষা অশুচি বলে গণ্য করা হয়। কারণ স্বামীর জীবিতকালে সেই ছিল তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ। সুতরাং মৃতের প্রেতাত্মা স্ত্রীকেই আশ্রয় করবার জন্য সতত উন্মুখ হয়ে থাকে, সাধারণতঃ এই বিশ্বাস।

অশুচিতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় সম্বন্ধে নানা মত আছে। কোন ক্ষেত্রে কটা দিন, মাস বা বছর কেটে গেলেই অশুচিতার প্রকোপ আর থাকে না। কোন ক্ষেত্রে উপবাস, আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্র কষ্টক্লিষ্ট ব্রত ইত্যাদি দ্বারা এই অশুচিতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। সব ব্যাপারের মূলে রয়েছে মৃতব্যক্তির প্রতি একটা আতঙ্কের ভাব। এই আতঙ্কের মধ্যে কিছু শ্রদ্ধাও মিশিয়ে আছে; কেননা মৃতের শক্তিমত্তায়, ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতায় জীবিত আত্মীয় আত্মীয়াদের প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকে।

মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার আরুন্টা জাতির বিধবাদের পালনীয় কর্ত্তব্যগুলি বড় অদ্ভুত। মৃতব্যক্তির বিধবা পত্নীরা মুখ, মাথার চুল আর বুকে কাদা মেখে নির্ব্বাক মৌনব্রত পালন করে মাস মাস বছর বছর কাটিয়ে দেয়। এই সময়ের জন্য বিধবাদের পক্ষে যেহেতু কথা বলা নিষিদ্ধ সেই হেতু তাদের যা কিছু মনের কথা হাবভাব হাত পা নেড়ে বোঝাতে হয়। এক আধদিন নয়, বছর ধরে চলে এই মূকব্রতের অভিনয়, এ যে কত কষ্টকর তা সহজেই অনুমেয়।

ইয়োরুবা মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর তিন মাস যাবৎ চুল আঁচড়ায় না, স্নান করে না এবং এক পরিচ্ছদে এই সুদীর্ঘ কাল কাটিয়ে দিতে হয়। বিধবাদের মাটিতে একটি মাদুর পেতে শুয়ে থাকতে হয়। দিবাভাগে ঘরের বার হওয়া তার পক্ষে নিষিদ্ধ। রাত্রির অন্ধকারে এক আধবার বাইরে যাবার অনুমতি কপালে জোটে।

পাপুয়া দেশের বিধবাকে ঘরে থাকাও চলে না। তাকে তিন মাস ধরে স্বামীর সমাধির পাশে বিছানা পেতে শুয়ে থাকতে হয় ও অবিরাম শোকবিলাপের সাধনা করতে হয়। অবশ্য একটা মাদুর পেতে ও মাথার ওপর ছাউনী তুলে এই ব্যবস্থা করে নেওয়া হয়। এতখানি সহৃদয়তা সমাজ থেকে করা হয়।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে মিনা নামক প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এই প্রথা আরও নিষ্ঠা সহকারে পালিত হয়। বিধবাকে স্বামীর সমাধির ওপরেই একটা পর্ণকুটীর রচনা করে নিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামীর শবদেহটি মাটি চাপা না দিয়েই ওপরেই পড়ে থাকে; বিধবা স্ত্রী তাকে দিনের পর দিন কাছে থেকে পাহারা দেয়। যতদিন না মৃত স্বামীর গায়ের মাংস গলে পচে নিঃশেষ হয়ে গিয়ে শুধু হাড়গুলো পড়ে থাকে। আমাদের পুরাণ কথিত সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যান এই প্রসঙ্গে স্মরণ হয়। তবে পুরাণের সাবিত্রী আর মিনা সাবিত্রীদের সঙ্গে পার্থক্য এইখানে। মিনা সাবিত্রীদের ঐকান্তিক পতিপ্রাণতায় তুষ্ট হয়ে কোন যমদেব তাদের বরদান করতে আবির্ভূত হন না।

টাকুনি জাতিদের বিধবাকে মৃত স্বামীর চিতার ওপর একসঙ্গে খানিকক্ষণ শুয়ে থাকতে হয়। অগ্নিসংযোগের পর ধীরে ধীরে চিতা ধূমায়িত হতে থাকে। তবু সতী ধীর স্থির নির্বিকারভাবে শুয়ে থাকেন চিতার ওপর। যখন আগুনের তাপ ও জ্বালা নিতান্ত অসহনীয় হয়ে ওঠে তখনই সতী ঝলসানো দেহটি নিয়ে চিতা থেকে নেমে আসেন। এখানেই বিধবার কর্ত্তব্য শেষ হয় না। স্বামীর চিতাভস্ম একটা ঝুড়িতে ভরে নিয়ে বিধবা ঘরে ফিরে যায়। পুরো তিনটি বছর বিধবা এই চিতাভস্মের ঝুড়ি অহরহ মাথায় বয়ে বেড়ায়। বৈধব্য ব্রতের এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পর সে মুক্ত। তারপর তার অন্য পুরুষকে বিবাহ করার অধিকার হয়।

পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব আফ্রিকার বিধবার প্রথম আচরণীয় ব্রত হল—স্বেদস্নান। শুকনো ঘাস খড় কুটো জ্বালিয়ে তার সমস্ত ধোঁয়া ঘন্টার পর ঘন্টা গায়ে মেখে বিধবারা তাদের শরীর

থেকে দরবিগলিত ঘামের স্রোত ছুটিয়ে ছাড়ে। তারপর নলের একটা ঘাঘ্‌রা কোমরে জড়িয়ে বিধবা মৃত স্বামীর কুটীরের ওপর হামা দিয়ে বেড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে থাকে। এই অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর কুটীরটি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলা হয়।

মেলানেসিয়ার বিধবারা গায়ে কাদা মেখে, ঘাসের পরিচ্ছদ ধারণ করে বেড়ায়। কঙ্গোর কোন কোন প্রদেশে কাদার বদলে দুধে মাটি গুলে বিধবারা গায়ে মাখে। টোরেস প্রণালী সংলগ্ন স্থানের অধিবাসী মেয়েরা সাধারণতঃ খুব বড় বড় চাকচিক্যময় পেটিকোট পরিধান করে থাকে। কিন্তু বিধবা হওয়া মাত্র এ অধিকার আর থাকে না। তখন তারা শুধু একটা কলাপাতার আবরণ কোমরে ঝুলিয়ে রাখে।

বাংলাদেশও কিছু কম যায়না। বিধবার মাথা নেড়া করতে হয়, পোষাক পরিচ্ছদের কোন বালাই আর থাকে না—যা ব্যবহার করা হয় তা থানকাপড়ের একটুকু গাত্রাবাস মাত্র। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও বিধবাদের ওপর অজস্র বাধা ও অনুদার নিষেধের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

আশ্চর্য্যের বিষয় প্রত্যেক দেশেই এই যে বিধবা নির্যাতনের সামাজিক বিধান রয়েছে, তার বিরুদ্ধে বিধবা সম্প্রদায় থেকে কোন প্রতিবাদ বলতে গেলে হয়ই না। যুগ যুগ ধরে এই ঐতিহ্যে তাদের মন ও চিন্তা লালিত হয়ে আজ এটা তাদের কাছে বিবেকের মতই সত্য ধর্ম্মে দাঁড়িয়ে গেছে।

মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা জীবিত পত্নীর আশে পাশে ঘুরে বেড়ায়—তার সঙ্গ ছাড়তে সহজে চায় না, এ ধারণা প্রত্যেক জাতির মধ্যে অল্পবিস্তর বর্ত্তমান।

স্যার ওয়াল্টার স্কটের কোন উপন্যাসের ভূমিকায় একটি সত্য কাহিনীর উল্লেখ আছে। ইংলণ্ডের ওর্কনি প্রদেশের একটি মেয়ে এক যুবকের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত হয় এবং তাকে বিবাহেরও প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু যুবকটি ছিল বোম্বেটে ; ধরা পড়ে তার ফাঁসির হুকুম হয়। মেয়েটি তার প্রণয়ীর সঙ্গে শেষ দেখার জন্যে লণ্ডনে আসে। কিন্তু তার পৌঁছবার আগেই যুবকটির ফাঁসি হয়ে যায়। মেয়েটি এসে প্রণয়ীর মৃতদেহ একবার স্পর্শ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করে। সে মৃত প্রণয়ীর হাত নিজের হাতে একবার তুলে চলে যায়। ব্যাপারটা এই—এই সব মেয়ে যে যার সঙ্গে একদিন পাণিমিলনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলো, সেটা না হওয়া পর্য্যন্ত সে মুক্ত হতে পারে না। প্রতিশ্রুতি মত এই কর্ত্তব্য না করে সে যদি অন্য কাউকে বিয়ে করে, তবে মৃতের প্রেতাত্মা তাকে আস্ত রাখবে না।

আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এই সংস্কার খুব বেশী প্রচলিত। এই ক' বছর আগে এক ভদ্রলোক একজন বিধবাকে বিবাহ করেছিল। কিছুদিন পরে ভদ্রলোক বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে দরখাস্ত করে। তার বক্তব্য ছিল যে তার স্ত্রীর প্রথম স্বামীর প্রেতাত্মা তার জীবন দুঃসহ করে তুলেছে।

টোগোল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে অদ্ভুত এক বিশ্বাস প্রচলিত। তারা মনে করে মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা সব সময় বিধবা পত্নীর সঙ্গে মিলনের চেষ্টায় উৎসুক হয়ে আছে। সুবিধা পেলেই এ মিলন সম্ভবও হয়। এর ফলে বিধবা স্ত্রীর মৃত্যু অবধারিত। সুতরাং স্বামীর প্রেতাত্মাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে বিধবারও চেষ্টার অন্ত নেই। যাতে প্রেতাত্মা প্রলুব্ধ না হয় তার জন্যে বিধবা সমস্ত গায়ের অলঙ্কার পরিচ্ছদ খুলে ফেলে নিজেকে কুরূপ করে রাখে। ছয় সপ্তাহ ধরে বিধবাকে এমনিভাবে নিরাভরণ ও উলঙ্গ অবস্থায় মৃতস্বামীর কবরের

ওপর পড়ে থাকতে হয়। বিধবা সদা সর্ব্বদা একটা লাঠি সঙ্গে রাখে—প্রেতাত্মাকে শাসাবার জন্যে। লাঠির ওপরই বিছানা করে সে ঘুমোয়। খাবারের সঙ্গে ছাই মিশিয়ে, জলের সঙ্গে ধুলো মিশিয়ে বিস্বাদ করে নিয়ে তবে বিধবা তা গ্রহণ করে ; পাছে মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা তার খাদ্য পানীয় এঁটো করে দেয়। রাত্রে ঘুমোবার সময় ঘরের মধ্যে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় পদার্থ সব ছড়িয়ে রাখে যাতে প্রেতাত্মা এমুখো না হতে পারে।

লোয়াদাগো দেশের আদিম বাসিন্দা বর্ব্বরদের মধ্যে স্ত্রীকে স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নিজের কুটীরের সমস্ত ফাঁক মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হয়। পুরোহিত একটা মন্ত্রপূত দড়ি দিয়ে যান ; তাই দিয়ে ঘরের কপাট শক্ত করে বেঁধে রাখা হয় ; যেন কোন মতেই মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা ঘরে প্রবেশ পথ পেয়ে বিধবাকে বিড়ম্বিত বা প্রাণহরণ না করতে পারে।

বিধবা যদি স্বভাবতঃ ভীরু প্রকৃতির হয়, তা হলে সে নতুন একটা জুতো পায়ে দিয়ে নেয়। তা হলে পায়ের দাগ চিনে চিনে মৃত স্বামীর প্রেতাত্মা তার পশ্চাদ্ধাবন করতে পারবে না। এতেও যদি কোন ফল না হয়, তাহলে গ্রামের পুরোহিত বড় রকম একটা প্রেতাত্মা তাড়ন যজ্ঞের ব্যবস্থা করে। প্রেতাত্মাকে খেদিয়ে খেদিয়ে তাকে তার কবরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর পরেও যদি প্রেতাত্মার উৎপাত না কমে, তবে বিধবা এবং তার সঙ্গে সমস্ত গ্রামই অন্যত্র উঠে চলে যায়।

পৃথিবীর অনেক স্থানে বিধবার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক অনুশাসন রয়েছে। ভারতবর্ষের হিন্দুদের মধ্যে এ অনুশাসন খুবই প্রতিষ্ঠিত। চীনাদের মধ্যেও একটা প্রবাদ আছে—সতী স্ত্রী কখনও দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে না। নিগ্রোদের মধ্যে মাসাই জাতির বিধবারা পুনর্বিবাহ করতে পারে না। কিন্তু পরপুরুষের সঙ্গ সমাজের চোখে দোষণীয় নয়। ফরমোজা দ্বীপেও এই ধরণের নিয়ম প্রচলিত। কিন্তু অধিকাংশ দেশ ও জাতির মধ্যেই স্বামীর মৃত্যুর পর একটা নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পর বিধবার পক্ষে অন্য পুরুষ বিবাহের প্রথা বর্তমান।

আরুন্টা বিধবাদের বৈধব্যব্রতের শেষ দিনের অনুষ্ঠানটা বড় বিচিত্র। প্রথমে বিধবা সর্বাঙ্গে কাদা মেখে নেয়, হাড়, পালক ও রোঁয়ার তৈরী পোষাক গায়ে জড়িয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় যে ঘরে তার স্বামী মারা গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সব জোয়ান পুরুষ লাঠি বল্লম হাতে আসতে থাকে। সেখান থেকে এক দৌড়ে সকলে চীৎকার করে মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর গিয়ে লাফিয়ে পড়ে। বিধবা একটা লাঠি নিয়ে বাতাসে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মৃত স্বামীর প্রেতাত্মাকে তাড়াতে থাকে। তারপর বিধবা পুরুষদের কবর থেকে ঠেলে দুটো দল করে সরিয়ে দেয়। দু দলে সাংঘাতিক লড়াই চলতে থাকে যতক্ষণ না রক্তপাত হয়ে কবরের মাটি ভিজে যায়। এরপর বিধবা তার গায়ের পরিচ্ছদ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কবরের ওপর একটা গর্ত্ত করে পুঁতে ফেলে। শেষে গায়ের কাদা ধুয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়।

পর্তুগীজ পশ্চিম আফ্রিকার বিধবাদের শেষ দিনের অনুষ্ঠান এমনি বিচিত্র। বিধবা মৃত স্বামীর বিছানা একটা স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে পেতে তার ওপর বসে থাকে। তারপর গ্রামের বৈদ্য এসে বিধবাকে স্রোতের জলে তিনবার চুবিয়ে ছেড়ে দেয়। মৃতের বিছানাটা তখন স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিধবা তীরে উঠে এলে তাকে একটি কাঁচা ডিম

খাওয়ানো হয়। একটা ব্যাঙ মেরে তার রক্তও বিধবার ঠোঁটে মাখিয়ে দেওয়া হয়।

আফ্রিকার কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে বিধবাকে দীর্ঘদিন অবিবাহিত রাখা হয় না। বৈধব্য ব্রতের শেষ দিনটাতেই বিধবাকে নতুন স্বামী গ্রহণ করতে হয়। ইয়োরুবা বিধবা শেষ অনুষ্ঠানের দিন বুক চাপড়ে কাঁদতে কাঁদতে জলের ধারে গিয়ে বসে। আত্মীয় স্বজনেরা সঙ্গে সঙ্গে এসে বিলাপ করে। তারপর সেখানে স্নান সেরে নিয়ে বিধবা সটান গিয়ে পৌঁছয় নতুন বিবাহের আসরে। আগে থেকেই ব্যবস্থা সব ঠিক থাকে। অবিলম্বে বিবাহ হয়ে যায়।

ফরমোজা দ্বীপে মৃত স্বামীর দেহকে বিধবা অল্প আগুনে শুকিয়ে শুকিয়ে শুটকী করে নেয়। তারপর একটা চঙের উপর তুলে শবদেহটি শুইয়ে রাখা হয়। দু-তিন বছর পর যখন চঙের উপর শুধু কটী হাড় পড়ে থাকে তখন তাকে সমারোহের সঙ্গে কবরস্থ করা হয়। এরপর বিধবা নতুন স্বামী গ্রহণ করে।

অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত বৈধব্য ব্রতগুলি যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিচিত্র ও নিষ্ঠুর। কিন্তু সভ্য দেশেও বৈধব্য ব্রতের হাঙ্গামা কিছু কম যায় না। সভ্য ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে এর নিদর্শন প্রচুর। যে কোন রবিবারে সমাধিক্ষেত্রের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায় সর্বাঙ্গ কাল পোষাকে শরীর জড়িয়ে—কখনো বা ঘোমটা দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল পল্লব নিয়ে বিধবার দল মৃতস্বামীর কবর দর্শনে আসছেন।

পুরুষশাসিত সভ্যতায় সামাজিক অনুদারতার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবে বৈধব্য ব্রতের নিদর্শন কম বেশী প্রত্যেক দেশে আজও বর্তমান।

এত কাল পরে

নাতির কাঁধে হাত রেখে পল্লীর এক বৃদ্ধ চাষী ক্ষেতের আল ধরে ধীরে ধীরে আসছিলেন। এক দরিদ্র বৃদ্ধ চাষী, অনেক দিন আগেই দু'চোখের দৃষ্টি হারিয়েছেন।

প্রশ্ন করলাম, কোথায় গিয়েছিলেন?

বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, ভোট দিয়ে এলাম।

বয়স সত্তরের ওপর, চোখে দৃষ্টি শক্তি নেই, শরীরও অক্ষম। তাঁর উপর দারিদ্র নামে জীবনের অতি দুঃসহ এক আঘাতের সাক্ষ্য একখানি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়ানো। এ হেন মানুষের মনে ভোট দেবার জন্য এত আগ্রহ আসে কোথা থেকে? কেন কি আশা ক'রে এবং কিসের জন্য ভোট দিয়ে এলেন এই বৃদ্ধ ও অন্ধ চাষী?

প্রশ্ন করলাম, কেন ভোট দিলেন? ভোট দিয়ে কি লাভ হলো?

বৃদ্ধ বললেন, এত কাল পরে দেশ যে আবার উঠেছে।

এতকাল পর দেশ যে আবার উঠেছে, এ সত্য আজ অন্ধও উপলব্ধি করেছে, দুঃখাক্রান্ত এই বৃদ্ধ চাষীর জীবনে এখন সায়াহ্নের ছায়া দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার জন্য কোন বিষণ্ণতা নেই তার মনে। অন্ধ তার হৃদয়ের সহজ অনুভবের চক্ষু দিয়ে দেখতে পেয়েছে এক সূর্যোদয়ের ছবি। দেশ যে আবার উঠেছে। তাই বৃদ্ধ চাষীর মুখে ভারত ইতিহাসেরই এক প্রভাতবেলার বন্দনাবাণী ধ্বনিত হলো। এতকাল পরে দেশের এক অভ্যুত্থানেরই দৃশ্য সে দেখতে পেয়েছে।

সত্যিই তো, এতকাল পরে ভারত ইতিহাসের তোরণ দ্বারে নতুন তূর্যনাদ শোনা গেল। আরম্ভ হলো নব ভারতের অভিযাত্রা। সাধারণ নির্বাচন, কোটি কোটি সাধারণ মানুষের ইচ্ছা

ও আগ্রহে রচিত এক অভিনব রাজ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠার উৎসব। এ নির্বাচন ভারত জীবনে প্রকৃত গণাধীশের অভিষেক অনুষ্ঠান। প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রথম গণ-নির্বাচনে ভারতের ইতিহাসেই এই প্রথম সবার-পরশে-পবিত্র-করা রাষ্ট্রকল্যাণের বেদিকা রচিত হলো।

আধুনিকতম গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে সুপ্রাচীন ভারত। বর্তমান বিশ্বেই এই ঘটনা নিতান্ত অভিনব, এই ভারতভূমিতে আজও ছয় হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ভারত গ্রীস হয়ে যায়নি। ইতিহাসকে কখনো অস্বীকার করেনি ভারত। এখানেই গ্রীস, মিশর ও বাবিলন ইত্যাদি প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলির সঙ্গে ভারতের একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। মিশর এবং বাবিলনের মত ভারত তার সভ্যতাকে মরুভূমিতে পরিণত করেনি। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস কতগুলি পাষাণ-স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ মাত্র নয়। ভারতের পাষাণ আজও কথা বলে এবং সে কথা ভারতীয় মানুষের প্রতিদিনের জীবনে প্রতিধ্বনিত হয়। ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের এই সম্পর্ক আজও অনাহত। পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন মন্ত্র ও স্তোত্র আজও ভারতের মন্দিরে ধ্বনিত হয়। ভারতের অতীত শ্মশান হয়ে যায়নি। তীর্থ-পথিকের মত ভারতের মন সহস্র বৎসরের ইতিহাসের পথ ধরে চলেছে।

ভারতীয় মনের এই ঐতিহাসিকতাই তার সজীবতা। এবং এই সজীবতাটুকু আছে বলেই নতুনকে গ্রহণ করতে ভারতের কোন বাধা হয় না। নতুনকে গ্রহণ করার অনেক পথ আছে। ভুল পথ আছে, নির্ভুল পথও আছে, নির্ভুলভাবে নতুনকে গ্রহণ করাই জাতির জীবনের ও চিন্তার বলিষ্ঠতার লক্ষণ। ভারত ইতিহাসের এই এক বৈশিষ্ট্য যে, ভারত চিরকাল নতুনকে গ্রহণ করেছে এবং কিভাবে নতুনকে গ্রহণ করতে হয় তারও একটা সার্থক নিয়ম ভারতই আবিষ্কার করেছে।

এ পথ সমন্বয়ের ও আহরণের পথ। নতুনকে আহরণ করবার শক্তি সেই জাতির ও সমাজেরই থাকে, যে জাতি ও সমাজ তার নিজের ঐতিহ্যে বলিষ্ঠ। অতীতের প্রত্যেক সংস্কারকে উপাসনা করাই ঐতিহ্য রক্ষা নয়। কালের নিয়মে অতীতের বহু সংস্কার প্রয়োজন হারায়। সেই নিষ্প্রয়োজনকে শ্রদ্ধা করার অর্থ জড়োপাসনা মাত্র ; যার ফলে জাতির প্রাণধর্মের মৃত্যু ঘটে। আচারের শুষ্ক বালুরাশি জীবন প্রবাহের স্বাচ্ছন্দ্য গ্রাস করে ফেলে, এটাও ইতিহাসের সত্য। ভারত-জীবনেও এরকম দুর্ভাগ্য অনেকবার ঘটেছে। ইতিহাসকে ভুল বোঝবার কারণে, অতীতের নিষ্প্রয়োজনীয় জীর্ণতাকে আঁকড়ে ধরে থাকার কারণে, এবং জাতির ঐতিহ্যগত সত্যকে অস্বীকার করার জন্য ভারতকে এক একবার অগৌরবের পথে নেমে যেতেও হয়েছে। ভারতের এই ভুল তার রাজনৈতিক পরাধীনতার একটা বড় কারণ।

অতীতকে অস্বীকার করা যায় না, নতুনকেও অস্বীকার করা যায় না। পুরাতনে ও নতুনে সমন্বয়ই এগিয়ে যাবার পথ। তেমনি অতীতের সব কিছুকে স্বীকার করাও সম্ভব নয় এবং নতুনের সব কিছুকেও স্বীকার করলে ভুল হয়। মন্থিত কালসমুদ্রে অমৃত ও হলাহল উভয়েরই উদ্ভব হয়, এটা জাগতিক রীতি, ইতিহাসের নিয়ম।

সুপ্রাচীন ভারতকেও আজ বিংশ শতাব্দীর নতুনের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সুতরাং ভারতকে তার ইতিহাসের সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের এক সংবিধান গ্রহণ করতে হয়েছে। দুটি মতবাদের উপহার দু'হাতে নিয়ে বিংশ

শতাব্দীর যুগলক্ষ্মী ভারতের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। একটি গণতন্ত্র এবং অপরটি কর্তৃতন্ত্র। একটি সকলের স্বেচ্ছায় ও সহযোগিতার আদর্শে জাতীয় জীবনে গড়ে তুলবার নীতি। অপরটি ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর ইচ্ছায় সর্বতোভাবে বাধ্য হয়ে চলবার নীতি। একটিতে জনসাধারণের ইচ্ছার অবাধ অধিকার স্বীকৃত, অপরটিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের ইচ্ছাই সর্বমান্য। উভয় মতবাদই বলে যে—সর্বসাধারণের কল্যাণ চাই। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পন্থার একটা বৃহৎ পার্থক্য বর্তমান। গণতন্ত্র চায়, সর্বসাধারণের ইচ্ছার ও বিবেচনার অধিকারের কোন বাধা থাকবে না। অপরপক্ষে কর্তৃতন্ত্র চায়, সর্বসাধারণের ইচ্ছা কর্তার ইচ্ছাতেই চালিত হবে। এই দুই তন্ত্রের মধ্যে একটি বেছে নেবার প্রয়োজন হয়েছে ভারতের। ভারত বেছে নিয়েছে গণতন্ত্রকে।

এখানে ভারত তার ঐতিহ্যের এবং ইতিহাসেরই মর্যাদা রক্ষা করেছে। ভারত জানে নিকৃষ্ট পন্থায় উৎকৃষ্টকে লাভ করা যায় না। লক্ষ্য ও পন্থার মধ্যে নীতির সামঞ্জস্য চাই। খারাপ উপায়ে ভালকে পাওয়া যায় না। ভারতের ঐতিহ্যগত মনীষা এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে যুগে যুগে উপলব্ধি করেছে। অশোকের শিলা-শাসনের বাণী থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীর বাণীতে এই মানবিক সত্যেরই স্বীকৃতি দেখতে পাই। কল্যাণ লাভের প্রয়াসও কল্যাণকর পন্থায় পরিচালিত হওয়া চাই। সৎ লক্ষ্যের জন্য সৎ পথেরই প্রয়োজন। এ শুধু আধ্যাত্মিক সত্য নয়, সমাজ বিজ্ঞানেরই সত্য। ব্যক্তি মানবের চিন্তার সহজ বিকাশ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাধীনতা, কর্তৃত্বের প্রভাবে চেপে দিয়ে কর্তার পরিকল্পনা অনুযায়ী যে 'গণতন্ত্র' রচিত হবে, সেটা গণতন্ত্রই নয়। তাই ভারতের আঠার কোটি নরনারীর ইচ্ছাকেই কর্তৃত্বের গৌরব দান করে ভারত পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের জীবনে সার্থক গণতন্ত্রের উদ্বোধন করেছে। এ ঘটনাকে ভারতজীবনেরই এক কল্যাণের অভ্যুত্থান বলে অভিনন্দন জানাই।

যে দেশে ধর্ম এক, ভাষা এক, পরিচ্ছদ, আচার, সংস্কার, শিল্প সাহিত্য, উৎসব ও রুচি এক, সে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা খুবই সহজ কাজ। কিন্তু ভারতে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রেই এক নতুন দুঃসাহসিক পরীক্ষার প্রয়াস। ধর্ম, ভাষা, বর্ণ, রুচি এবং জীবনযাত্রার বহুবিচিত্র পদ্ধতিতে এ ভারতই বস্তুতঃ একটি পৃথিবী। বৈচিত্র্যকে কখনই 'প্রভেদ' বলে স্বীকার করেনি ভারতের মনীষা। যে ভারতের কবি, কোবিদ, ঋষি ও সাধক বহুর মধ্যে পরম একের অস্তিত্ব অনুভব করেছেন, সে ভারতের ঐতিহ্যে গণতন্ত্রের ধর্ম সহজেই সম্মান লাভ করবে, এটা স্বাভাবিক। শুধু মানুষে মানুষে সমত্ব ও ঐক্য নয়, এই বিশ্বচরাচরের প্রাণেও জড়ের মধ্যেও ঐক্য অনুভব করেছেন ভারতের সুধী। দুঃখের বিষয়, এই উপলব্ধি সত্ত্বেও ভারত ভুল করে অনেকবার প্রভেদ ও অনৈক্যের প্রতি মোহ প্রকাশ করে মানবতার প্রতিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ করেছে। কিন্তু এই উচ্চ-নীচ ভেদবাদের বিরুদ্ধে ভারতেরই আত্মা বার বার বিদ্রোহ করেছে এবং আবাহন করেছে মৈত্রীর, সাম্যের, সহযোগিতার এবং সমানাধিকারের আদর্শকে। বিংশ শতাব্দীর ভারত আজ এই গর্ব করতে পারে যে, সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকারে সর্বসাধারণের সমান সুযোগের প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক ভারত অতীতের ভারতকেও মর্যাদায় অতিক্রম করে গেছে।

এতকাল পরে ভারতের সেই সাধারণ মানুষ অধিকার লাভ করেছে যাদের মধ্যে ভারতের শিব ভিখারীর রূপে ঘুরছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যাদের প্রতিষ্ঠার ও অভ্যুদয়ের

স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারাই প্রজাতন্ত্র ভারতের গণ-নির্বাচনে প্রথম অধিকারের গৌরব অনুভব করেছে। তাই বৃদ্ধ চাষীর হৃদয়ের বিশ্বাসকেই অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতে পারি, এতকাল পরে দেশ উঠেছে, বিশ্বাস করতে পারি অতীতের তুলনায় এ ভারতের ভবিষ্যৎ আরও বেশী গৌরবের অধিকারী হবে।

ভবিষ্যৎ গড়বার অধিকারের কথাই মনে পড়েছে। নির্বাচন শেষ হলো, দেশের গবর্ণমেন্টও গঠিত হবে। তারপর?

তারপর জাতির দায়িত্বের ও কর্তব্যের আর এক পরীক্ষা, সমৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য পাঁচবছরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা বস্তুতঃ জাতির সম্মুখে এক বিরাট গঠনকর্মের উদ্যোগে আত্মনিয়োগ করা। এখানেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠিত দেশবাসীর সম্মুখে আর এক প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকৃত গণতন্ত্রে 'অধিকারই' সব চেয়ে বড় বা একমাত্র বড় কথা নয়। এর মধ্যে কর্তব্য নামেও একটা বিষয় আছে। যেমন সবার অধিকারে, তেমনি সবার কর্তব্যবোধে ও পালনে গণতন্ত্র সার্থক হয়। সবার পরশে পবিত্র হয়েছে ভারতের নির্বাচন, তেমনি সবার পরশে ভারতের জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনাকে পবিত্র হতে হবে। অধিকারবাদ মানবীয় জীবনের একটা অংশ মাত্র, জীবন পরিপূর্ণ হয় কর্তব্যবাদে। এ সত্য ভারতীয় মনীষারই ঐতিহ্যের দান। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী আধুনিক ভারতের কাছে মানবধর্মের এই বিশেষ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করে গেছেন। গণতন্ত্র সহজ স্বচ্ছন্দ ও সার্থক হতে পারে না, যদি কর্তব্য পালনের ব্যাপারকেও একটা অবশ্য পালনীয় নীতি বলে সমাজের মানুষ মনে না করে। নিছক অধিকারবাদ মানুষকে মমতাহীন করে ; এমন মতবাদের হাতে মানুষের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়। বৌদ্ধ প্রার্থনায় আছে—নিকটে বা দূরে, অতীতে বা বর্তমানে এবং যারা ভবিষ্যতে আসবেন—ভূতো সম্ভবেসী বা, সকলেই সুখী হউক। ইতিহাসের প্রাণের ভাষা যে মানুষ উপলব্ধি করেছে, তার মন এক মহৎ ইচ্ছার পিপাসায় নিরন্তর ছটফট করে—ভবিষ্যতের কল্যাণ হোক্। ভারতচন্দ্রের কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীকে অন্নপূর্ণা বলছিলেন—কি বর চাও? দরিদ্র ঈশ্বরী পাটনী বলেছিলেন—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। ঈশ্বরী পাটনীর প্রার্থনায় মানবের সামাজিক ধর্মের এক পরম সত্যের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে। ভবিষ্যতের মানুষ, উত্তরবংশীয়, আগামীকালের মানুষ যেন সুখে থাকে। সুতরাং প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা বর্তমান জাতির কাছে সব চেয়ে বড় কর্তব্যের সংকেত এনে দিয়েছে। সর্বসাধারণের সহযোগিতায় এ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হবে। গণতান্ত্রিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভারতের কাছে এই গণতান্ত্রিক দায়িত্বও উপস্থাপিত হয়েছে। আজ এই দায়িত্ববোধেরও উদ্বোধন চাই, নচেৎ নিছক অধিকারবাদী কল্যাণের পথ অবারিত হবে না।

কিন্তু এমন সন্দেহ করবার অথবা নিরাশ হবার কি কোন কারণ আছে? এতকাল পরে দেশ যে আবার উঠেছে, অন্ধ চাষীর এই উপলব্ধির মধ্যে কোন ত্রুটি আছে বলে তো মনে হয় না। সারা দেশে, পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনে কর্তব্যের ও গঠনকর্মের উদ্বোধন দুরূহ হলেও অসাধ্য নয়। এতবড় গণচেতনার সঞ্চার দুরূহ বৈকি, কিন্তু যা সত্য তাই তো দুরূহ এবং দুরূহকেই সফল করে তুলতে সব চেয়ে বেশী আনন্দ। স্বাধীনতা লাভ করা খুবই দুরূহ ছিল, তাই তো স্বাধীনতার আগ্রহ দেশবাসীর চিত্তে ত্যাগ দুঃখ ও শ্রম স্বীকারের শক্তি উদ্বোধিত করেছিল। দেশে সমৃদ্ধি সৃষ্টির পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও দেশবাসীর চিত্তে নতুন

চেতনার উদ্দীপনা জাগ্রত করবে, এ বিশ্বাস যুক্তিহীন নয়। শুনেছি ময়ূরাক্ষীর বাঁধ নির্মাণের কাজে যে সব ইঞ্জিনিয়র ও কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন, তাদের আন্তরিকতা এবং পরিশ্রম করবার আগ্রহ দেখে বিস্মিত হতে হয়। নেহাৎ চাকুরী করার আগ্রহ নিয়ে নয়, দেশের কল্যাণের একটি ভিত্তি স্থাপন করছেন তাঁরা, কল্যাণকৃত সেবকের এই আগ্রহ নিয়ে তাঁরা রোদ-জলে কাজ করছেন। দেশের জন্য কিছু করবার আগ্রহ দেশের লক্ষ লক্ষ যুবকের মনে রয়েছে। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী—দেশের অধিকাংশ মানুষেরই মনে এ আগ্রহ আছে। রাজনৈতিক প্রচারকার্যের ফলে দেশের লোকের মনে এই গঠনকর্মের উৎসাহ সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়েছে মাত্র। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভারতীয় মনীষা হতে উদ্ভূত আরও একটি সত্য বাণীই বার বার মনে পড়ে এবং নৈরাশ্যের কোন কারণ আর থাকে না। সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়। সত্যই আপনি আপনার শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, মিথ্যার আধিপত্য সাময়িক মাত্র। সুতরাং, এ বিরাট ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর জীবন সত্যপথ চিনতে ভুল করবে, এ নৈরাশ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পথ ভুল করিয়ে দেবার চেষ্টাও মিথ্যা হবে। সত্য হয়ে থাকবে শুধু প্রজাতন্ত্র ভারতের বৃদ্ধ চাষীর উক্তি—এতকাল পরে দেশ আবার উঠেছে।

ক্ষুধা-হরণের ব্রত

কথা উঠেছে, দেশে খাদ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে হবে। কথা হিসাবে এটা নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর সব দেশেই মানুষের সংখ্যা কমবেশি বেড়েই চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনও কমবেশি বেড়ে চলেছে। মানুষের ইতিহাসে কখনো এমন কোন দিন দেখা দেয়নি, যখন একথা মনে হয়েছে যে, এইবার খাদ্যের উৎপাদন কমিয়ে দিলেই চলবে, অথবা কমিয়ে দেওয়া উচিত। তবে একথা সত্য যে, দেশ বিশেষে সময়-সময় এমন অবস্থা দেখা দিয়েছে, যখন খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন কম তীব্র হয়েছে। এইমাত্র। কিন্তু খাদ্য বৃদ্ধির প্রয়োজন কখনো মিটে যায়নি। কৃষিবলে বলীয়ান জাতি, অথবা প্রকৃতির অনুগ্রহ ও প্রসন্নতায় ধন্য কোন দেশ হয়তো সময়-সময় শস্যের প্রাচুর্যে সুসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কারণে সে দেশের জন-জীবনে এমন আশ্বাসের মোহ কখনো সত্য হয়ে ওঠেনি যে, অন্নসৃষ্টির উদ্যম এইবার কিছুটা শিথিল করা যেতে পারে। মানুষের শ্রমের স্বেদজলেই শস্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়। অন্নসৃষ্টির উদ্যম মানুষের ইতিহাসেরই এক নিত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এ-উদ্যমে কখনো ছেদ পড়েনি, ছেদ পড়তে পারে না। এ-যজ্ঞের বিরাম নেই। এ-উদ্যমের সমাপ্তি বলে কিছু নেই। নিরন্তর শ্রান্তির এই সাধনায় মানুষকে হাঁফ ছেড়ে জিরিয়ে নেবার কোন সুযোগ দেননি বিশ্বসৃষ্টির নিয়ম অথবা নিয়ামক। বাইবেলের সেই বাণী মানবীয় জীবনেরই এক সুচির সত্যের বাণী—'ললাটের স্বেদজলের সাহায্যেই তোমাকে রুটি অর্জন করতে হবে'।

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতা'। 'দেবতাগণ যজ্ঞ দ্বারা আরাধিত হয়ে তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করবেন। খাদ্য নামক প্রাণধারণের বস্তুকে মানুষ বিনা চেষ্টায় কখনো লাভ করতে পারে না। সচেতন কর্ম প্রয়াসের যজ্ঞের দ্বারা ভূমি ও প্রকৃতিকে আরাধিত করে, তবেই ভোগ করার মত ইষ্ট অর্জিত হয়, নচেৎ নয়। মানবীয় সভ্যতার সূচনাই হয়েছিল কৃষির মধ্যে। যে মানুষ এক

শস্যের বীজ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে নিহিত করে প্রথম শস্য 'উৎপাদন' করেছিল, সেই তো পৃথিবীর প্রথম সভ্য মানুষ। আদিম মানবের সেই প্রথম কৃষিই পৃথিবীতে মানবীয় সভ্যতার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত করেছিল।

তাই আজ নতুন করে এই সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়োজন হয়েছে যে, খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কথাটি শুধু একটা কথা নয়, বস্তুতঃ মানবীয় জীবনেরই একটা গূঢ় অথচ সহজ সত্যের প্রতিধ্বনি। এ-আহ্বান জাতির নিত্যকালের ইতিহাসের আহ্বান। আজ এ-আহ্বানের মর্যাদা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, কারণ আজ এ-আহ্বানের মধ্যে বস্তুতঃ জাতির প্রাণরক্ষারই আবেদনের একটি সুর ধ্বনিত হয়েছে। খাদ্যের অভাব ঘটেছে, বোধ হয় এমন ধরনের বিরাট অভাব ভারতের অতীত জীবনে কখনো দেখা দেয়নি।

এই ভারতীয় মানুষের সভ্যতাগত সংস্কারে ভূমির সেবার মর্যাদা তো যথেষ্ট মর্যাদাই লাভ করেছে। এই ভারতের মানুষই তো অন্নপূর্ণার পূজা করে। এই ভারতের লক্ষ লক্ষ পল্লীর জীবনে শত শত ব্রত ও উৎসবে শস্যের পূজাও তো বস্তুতঃ একটা লোক-সংস্কৃতি রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

পল্লী-বাংলার মেয়েরাই তো চৈত্রের ভোরে আল্পনা এঁকে ভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য 'পৃথিবী ব্রত' করে :

"এস ধরিত্রী, বস পদ্মপাতে।
শঙ্খ-চক্র ধরি হাতে॥"

খর গ্রীষ্মে যখন 'গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই,' তখন শস্যক্ষেত্রের জন্য বৃষ্টির করুণা আহ্বান করে এই পল্লীবাংলারই সুব্রতা মেয়েরা 'বসুধারা ব্রত'।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই ভারতেই আজ অন্নাভাবে মানুষের সংসার বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে। নিশ্চয় ভুল হয়েছে কোথাও। সে ভুল হয়তো আজকের কিংবা বিগত শত বৎসরের ভুল মাত্র নয়। হয়তো আরও অতীতকাল থেকেই মানবীয় জীবনের সেই সহজ সত্যটিকেই বিস্মৃত হবার ভুল আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। কায়িক শ্রমের মর্যাদা বিস্মৃত হবার ভুল। শ্রমরূপ যজ্ঞের দ্বারাই সকলকে অন্ন উৎপাদন করতে হবে—এই বাস্তব সত্যটি বিস্মৃত হবার ভুল। এই ভুল দীর্ঘকাল ধরেই সমাজে এক 'নিষ্কর্মা শ্রেণী' (Leisure Class) সৃষ্টি করে এসেছে। শ্রমের ক্ষেত্রে কৌলীন্যের রীতি প্রচলিত হয়েছে। কায়িক শ্রমের দায়িত্বে ও কর্তব্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ-বৈষম্য প্রকৃতির নিয়মেরই ওপর এক রূঢ় আঘাত এবং তার ফল যা হবার, তাই হয়েছে। প্রতিশোধ নিয়েছেন প্রকৃতি। শ্রমকুণ্ঠার অনিবার্য পরিণামরূপে দেখা দিয়েছে অন্নের অভাব।

এই শ্রম কুণ্ঠার এবং শ্রম হ্রাসের অনেক কারণ অবশ্য ছিল এবং আজও রয়েছে। কায়িক শ্রমের দ্বারা ভূমিসেবা করার প্রথম মানবিক দায়িত্বটি বর্জন করে অজস্র সংখ্যক মানুষ অ-কায়িক শ্রমে অথবা নিছক শ্রমহীনতার মধ্যে সরে গিয়েছে। সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মের এই অন্যথায় অন্নসৃষ্টির স্বাভাবিক উদ্যমের সৌষ্ঠবই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কৃষিজীবী নামে যে সমাজ শুধু ভূমির সেবার ভার নিয়ে পড়ে রইল, তাদের জীবনেও বহুবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য, অবহেলা ও বিপর্যয়ের প্রকোপ অন্নসৃষ্টির সমগ্র উদ্যোগকেই বহুদিন থেকেই ক্ষুণ্ণ করে এসেছে। দারিদ্র্য হোক, অজ্ঞতা হোক, আলস্য হোক, সামাজিক বৈষম্য হোক অথবা কায়িক শ্রম সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মর্যাদা দানের

চেতনার অভাবই হোক—সব মিলিয়ে দেশের শ্রমশক্তিকেই কুণ্ঠিত করেছে।

তাই আজকের খাদ্য উৎপাদনের আহ্বান বস্তুতঃ জাতির জীবনে শ্রমশক্তির অভ্যুদয় সাধনেরই আহ্বান। এ-আহ্বান জাতির পক্ষে তার সভ্যতার এক ঐতিহাসিক স্বভাবকেই ফিরে পাওয়ার আহ্বান। কায়িক শ্রমই পুণ্যশ্রম এবং ভূমিসেবার দ্বারা অন্নসৃষ্টির উৎপাদনই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞকর্ম ও শিল্পকর্ম। আজ তাই নতুন করে প্রাচীন ঋষির বাণীকে বিশ্বাস করতে হবে যে—'ন ঋতে শ্রান্তস্য সখ্যায় দেবাঃ', বিনা শ্রমে দেবতাদের বন্ধুত্ব পাওয়া যায় না।

'অধিক ফসল ফলাও'—কর্মব্রতের এই নীতি নিতান্ত কৃষক সমাজের পালনীয় নীতি বলে মনে করলে ভুল হবে। সমাজ বিশেষের দায়িত্ব নয়, সমগ্র জাতির এবং প্রত্যেকের শ্রম ও প্রতিভা এই ব্রতে নিয়োজিত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কৃষকের কাজও তো শিল্পীর কাজ এবং সে-শিল্পী প্রত্যেক মানুষের মানসিক সংস্কারের মধ্যেই রয়েছে। শস্যশীর্ষে ধরার অঞ্চল যখন শিহরিত হয়, তখন বুঝা যায় কৃষকের কাজ কত বড় শিল্পীর কাজ। এই রূপরম্য কৃষিকলাই আবার জাতির প্রাণরক্ষার শিল্প। এহেন কাজে কোন শ্রেণীভেদ বা অধিকারভেদ থাকার কোন অর্থ নেই। ভূমিসেবার আয়োজন যদি ছত্রিশ কোটি মানুষের করস্পর্শ লাভ করে, তবে সে দেশের ঘরে ঘরে অন্নপূর্ণা বিরাজ করবেন। এর মধ্যে কোন অত্যুক্তি নেই।

তবে একথা সত্য যে, আজ গ্রামের ও শহরের জীবনে এ সুযোগের একটা তারতম্যও রয়েছে। কিছু সংখ্যক মানুষ শহরে থাকবেনই এবং তাঁদের পক্ষে ভূমি সেবার সুযোগ কম। কিন্তু সেই কম সুযোগেরও যথোচিত সদ্ব্যবহারের সুযোগ আছে। যদি না থাকে, তবে করে নিতে হবে। আঙিনার এক কোণে, বেড়ার ধারে, প্রাচীরের পার্শ্বে, যেখানে 'ধরণী একমুঠো ধূলির'ও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে, সেখানেই গৃহী তাঁর শিল্পীর ধর্ম পালন করতে পারেন। এই এক ফালি মাটিকেও শস্যপ্রসূ করার শিল্পে যে আনন্দ আছে, সে আনন্দ থেকে কেন নিজেকে বঞ্চিত করবেন ভারতের শহরবাসী মানুষ? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যান্ত্রিক ইন্ডাস্ট্রির দেশের শহরে মানুষও তো এ ভুল করে না। সৌখীন প্যারিস শহরের 'কিচেন গার্ডেন' নামে গৃহস্থের রান্নাঘরের সংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র উদ্যানে যে সব্জী উৎপাদিত হয়, তাই দিয়ে প্যারিসের সব্জি বাজারের অর্ধেক চাহিদা মিটে যায়।

গ্রামের মানুষের সুযোগ বেশি এবং তাঁদের পক্ষেই এ উদ্যমে ব্রতী হবার দায়িত্ব অবশ্যই সব চেয়ে বেশি। সুতরাং ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের মানুষেরই ওপর সারা ভারতের অন্নভাণ্ডার রচনার যে দায় পড়েছে, সে সম্বন্ধে শহরবাসীর দিক থেকে সহযোগিতারও একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। শহরের মানুষ কি কোনভাবেই এবং কোন পদ্ধতিতে গ্রাম জীবনের এই বিরাট কর্মের উদ্যোগে সাহায্য দান করতে পারেন না?

শহরের এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়, যাঁরা কিছুটা সময় গ্রাম সেবারই কাজে নিযুক্ত করতে পারেন। শহরের যাঁরা কায়িক শ্রমের কাজ করেন না, তাঁদেরই পক্ষে এই দায়িত্ব সব চেয়ে বেশি এবং এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ছাত্র সমাজের দায়িত্বের কথা। অবসর সময়ে এবং ছুটির সময়ে গ্রামসেবার কোন না কোন কাজে যদি তাঁরা আত্মনিয়োগ করতে পারেন, তবে সে কাজে পরোক্ষভাবে জাতির জন্য অন্নসৃষ্টির মহৎ উদ্যমেই সহায়তা করা হবে। শহর ও গ্রামের জীবনের মধ্যে রুচি ও চেতনার একটা পার্থক্য বর্তমানের জাতীয় জীবনের গভীরেই যে একটি অনৈক্য সৃষ্টি করে রেখেছে, সে অনৈক্য জাতীয় সংহতিরই এক ভয়ানক

অন্তরায়। গ্রাম ও শহরের চিত্তের এই ব্যবধান জাতপাতের ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি বৈষম্যগুলির চেয়ে কম হানিকর ব্যবধান নয়। লক্ষ্য করার এবং বুঝবার বিষয় এই যে, আজ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির মহান আয়োজনের ভেতর দিয়ে ভারতের গণজীবনে এক সুন্দর সামাজিকতা ও সাম্য সৃষ্টির সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ আমরা উপেক্ষা করতে পারি কি?

খাদ্য বৃদ্ধির এ অভিযান দেশরক্ষারই অভিযান। বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত দেশের প্রতি নাগরিক যেমন দেশরক্ষার জন্য নিজেকে সৈনিকরূপে প্রস্তুত করে, সেই রকমেরই প্রস্তুতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। খাদ্যাভাবরূপী এই শত্রুর রূঢ় আঘাতের মর্মন্তুদ সাক্ষ্য প্রতি ব্যক্তি তাঁর আশে পাশেই দেখতে পাচ্ছেন। ঐ যে শিশুর দল জীর্ণ-শীর্ণ ও অপুষ্ট দেহ নিয়ে গরীবের ঘরের আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাকে বাঁচিয়ে তোলার উপায় কি? ঐ যে শ্রমিকের দেহ সামান্য রেশনে অপরিতৃপ্ত এবং দুর্বল হয়ে রয়েছে, তাকে দিয়ে জাতির ইন্ডাস্ট্রি গঠনের কাজ কতটা করানো যেতে পারে? বুদ্ধিজীবী গবেষক, কালজয়ী শিল্পী, অধ্যয়নরত ছাত্র—খাদ্যচিন্তায় প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হবার দুর্ভাগ্য থেকে যদি এরা মুক্ত না হয়, তবে জাতির মেধা মনীষা এবং প্রতিভারও উৎকর্ষ কতটুকু হতে পারে? ঠিক কথা, এই সবই অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দারিদ্র্যের, দ্রব্যমূল্যের, জীবিকার সংস্থানের সমস্যা ও প্রশ্ন। মূলে ঐ একই প্রশ্ন, খাদ্যের অভাব। ভূমি যদি সুফলা না হয়, শস্যক্ষেত্র যদি সুপ্রসূ না হয় এবং বৃক্ষ যদি ফলবান না হয়, তবে সামাজিক ব্যাপারে কোন বিপ্লব বা রূপান্তর, কোন বলিষ্ঠ আইনের আড়ম্বর এবং কোন আবেদনই জাতিকে এক সর্বজনীন রিক্ততার গ্রাস থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

বিশেষজ্ঞদের বর্ণিত সংখ্যাতত্ত্ব হতে জানা যায় যে, জীব-জন্তু এবং কীট-পতঙ্গের দ্বারা যে পরিমাণ খাদ্যবস্তু বিনষ্ট হয়, মাত্র সেটুকুই রক্ষা করতে পারলে দেশের খাদ্যের অভাব আর থাকবে না। কিন্তু সে জন্য কীট-পতঙ্গ বিনাশের কাজকেই খাদ্যসমস্যা সমাধানের একমাত্র কাজ বলা যায় না। এটা হলো খাদ্য-সংরক্ষণের কাজ এবং শুধু বর্তমানের উৎপাদিত খাদ্যকে কীট-পতঙ্গের অথবা পচন ও অপচয় ইত্যাদি অন্যান্য বিনাশের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেই খাদ্যের প্রাচুর্য দেখা দেবে না। দেশ চায়, খাদ্যের প্রাচুর্য। দেশের জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, খাদ্যের উৎপাদনেরও ক্রমবৃদ্ধি এবং নিরন্তর বৃদ্ধি চাই। জাতীয় শ্রমের নব উদ্বোধন চাই। জাতীয় শ্রমকে এক সৃষ্টিকর উদ্যমে নিযুক্ত করা চাই। ভূমি সেবার ধর্মকে সমাজজীবনে সুপ্রতিষ্ঠ করা চাই। প্রকৃতির সঙ্গে সহজ যোগাযোগে মানুষের স্বভাব নিহিত সৃষ্টিপ্রবণ সংস্কার এবং সংগঠনী প্রতিভার অভিব্যক্তি চাই। খাদ্য উৎপাদনের এই গঠনমূলক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে জাতি তার আত্মশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের সম্পদই অর্জন করবে, যে সম্পদ তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে সব চেয়ে বৃহৎ, মহৎ এবং মূল্যবান পাথেয়।

খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান, দেশের ক্ষুধাহরণের ব্রত উদ্‌যাপনের আহ্বান। অন্নই স্বাস্থ্য, অন্নই পরমায়ু এবং অন্নই জীবনের প্রসন্নতার দেবতা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একবার বলেছিলেন যে, আজকাল একটা কলাগাছের ফুল (মোচা) আমার চক্ষে অন্য ফুলের চেয়ে বেশি সুন্দর বোধ হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গী ক্ষুধা ক্লিষ্ট দেশবাসীর জন্য অন্তরের এক প্রবল মমতা হতেই উদ্ভূত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধীও বলেছিলেন

যে, ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে রুটি এগিয়ে দেওয়াই 'গীতা' এগিয়ে দেওয়ার কাজ। বস্তু হিসাবে রুটি ও গীতা নিশ্চয় এক জিনিষ নয়। কিন্তু অবস্থা বিশেষে রুটিই 'গীতা'। সেই জন্যই মনে হয়, আজ যাঁরা দেশের মানুষকে সংস্কৃতি দান করতে চান, তাঁরা খাদ্য উৎপাদনের এই ব্রতে যদি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন তবে সেটাও একরকমের গীতার বাণী প্রচারেরই কাজ হবে।

দেশে কৃষি-সাহিত্যেরও অভাব আছে, কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা ব্যবস্থারও অভাব আছে। ভূমিসেবা এবং কৃষির কাজে যাঁরা আগ্রহ অনুভব করেছেন, তাঁদের এ আগ্রহ অনেকখানিই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে উপযুক্ত কৃষিসাহিত্য এবং কৃষি-শিক্ষাব্যবস্থার অভাবে। অথচ আজকের প্রয়োজন হলো, ঘরের পঞ্জিকার মতই প্রতি গৃহস্থের ঘরে নানাবিধ কৃষি সাহিত্যের। কৃষি সম্বন্ধে যার যেটুকু জানবার প্রয়োজন, সে যেন সে তথ্য সহজেই জেনে নেবার সুযোগ পায়, তার জন্য শত শত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়েছে। যৌথ আবাদ এবং সমবায় প্রথা ইত্যাদি উৎপাদনের ও বণ্টনের পদ্ধতি শিক্ষা প্রচলনের জন্যও ব্যাপক ব্যবস্থা চাই।

উন্নত সার, উন্নত বীজ, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, উন্নত কৃষিপদ্ধতির শিক্ষা—এসব যাতে সহজলভ্য হয়, সে দায়িত্ব নিয়েছেন সরকার। এদিক দিয়ে আয়োজনও ক্রমেই ব্যাপক হয়ে উঠছে। কিন্তু এ আয়োজনের সকল সার্থকতা নির্ভর করছে সাধারণের আগ্রহ এবং সহযোগিতার ওপর। সুতরাং সবার ওপর এই আগ্রহই সত্য। জনচিত্তে এই আগ্রহের উদ্বোধন আজ জাতীয় চেতনারই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলে, অন্নপূর্ণার থালা ভরে উঠতে কতক্ষণ?

তাই মনে হয়, খাদ্যের সঙ্কট জাতির জীবনে পরোক্ষে এক কল্যাণেরই জাগৃতির সূচনা নিয়ে দেখা দিয়েছে। নিজের শক্তিকে স্মরণ করবার এবং জাগ্রত করবার লগ্ন এসে গেছে। সঙ্কটও জাতির পক্ষে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে ওঠে, যদি জাতি সঙ্কটকে পরাভূত করবার চেতনা জাগ্রত করতে পারে। এই বিশ্বাস আছে, সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার রাজনৈতিক বন্ধন ক্ষয় করতে পেরেছে যে জাতি, সে জাতি তার সংসারের অভ্যন্তরের এই অভাবের বন্ধনও ক্ষয় করতে পারবে। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আহ্বান জাতির জীবনে নূতন এক প্রতিজ্ঞার ঘোষণা। সুতরাং এই ঐতিহাসিক ব্রতে কোন ব্যক্তিই পিছিয়ে থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়। যার যেটুকু সাধ্য, যার যেমন সুযোগ, যার যতখানি সংস্থান—সবই কাজে লাগাতে হবে এই ব্রতের উদ্‌যাপনে। যিনি আজ একটি ফলবান বৃক্ষের চারা রোপণ করেছেন, তিনি জাতির ভবিষ্যতের জন্যই তাঁর শ্রদ্ধার ও মমতার উপহার রেখে যাচ্ছেন। যে মানুষ আজ একখণ্ড পতিত জমিকে তাঁর সেবার ও শ্রমের স্পর্শে উর্বর ও সুপ্রসূ করে তুলবেন, তাঁর দান যে ভবিষ্যতের সহস্র বৎসরের উত্তরাধিকার হয়ে রয়ে গেল। আজ দেশের শত শত উপত্যকার, অধিত্যকার ও সমতল প্রান্তরের যে ভূমিতে সহজে ক্ষেত্র রচনা করে শস্যের শ্যামল শোভার সমারোহ সৃষ্টি করছি, সে ভূমির রুক্ষ মাটির ঢেলা প্রথম ভেঙেছিলেন কত শত অথবা কত হাজার বছর আগে আমাদেরই পূর্বপুরুষ গৃহস্থ-পিতা। সন্তানের জন্য জনকের স্নেহের ও আগ্রহের এক ঐতিহাসিক স্পর্শ অলক্ষ্যে মিশে রয়েছে শস্যপ্রসূ এই ভূমিক্ষেত্রের প্রতি ধূলিকণার গায়ে। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা নিতান্তই আজকের অভাব মিটিয়ে ফেলার প্রচেষ্টা নয়, ভবিষ্যৎকেই সম্পন্ন করে রেখে যাবার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা থেকে কেউ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারেন না, করলে মানবীয়

জীবনের একটি নীতি এবং অঙ্গীকারকেই ক্ষুণ্ণ করা হবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, যেখানে একদিন শোভাময় হরিৎ শস্যক্ষেত্রের সমারোহ ছিল, সেখানে আজ মরুভূমি। কিন্তু মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞান আজ এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যে, সে আজ মরুভূমিকেই শস্যের সবুজ বন্যায় প্লাবিত করে দিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানও ব্যর্থ হয় যদি সে জ্ঞানের প্রয়োগে আলস্য থাকে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমাদের ভারতে জ্ঞানের অভাব এবং কর্মের অভাব উভয়ই দেশের ভূমিকে রিক্ত করেছে। যে কারণেই হোক, ভূমিসেবায় দেশের মানুষের কর্মশক্তি ততখানি প্রযুক্ত হচ্ছে না, যতখানি প্রযুক্ত হওয়া উচিত। তাই একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না যে, খাদ্যবৃদ্ধির এই আন্দোলন বস্তুতঃ জাতীয় আলস্য বর্জনের আন্দোলন। অন্নসৃষ্টির উদ্যমের মধ্যে আজ আলস্য বর্জনের যে সুযোগ এসেছে, সে সুযোগ যদি গ্রহণ করা হয়, তবে ভারতীয় প্রতিভা এবং শ্রমশক্তির বিপুল প্রবাহ মাত্র কৃষির উন্নয়নের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে না। সে বিপুল শক্তি জাতীয় জীবনের অন্যান্য সহস্র আয়োজনে সার্থক হবে এবং সার্থক হবার উপযোগী হয়ে উঠবে।

পতিত জমির উদ্ধার, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ভূমিক্ষয় নিবারণ, বন-সংরক্ষণ, বৃক্ষের সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, সেচ ব্যবস্থার প্রসার, কৃষি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষিযন্ত্রপাতির উৎকর্ষ সাধন, চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন,—কত কাজই না আছে। পশুপক্ষী পালন, মৎস্যের চাষ এবং ফলবান বৃক্ষের রোপণ বৃদ্ধি—এসব খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিরই ব্যাপার এবং সবই একই পরিকল্পনার বিভিন্ন উদ্যোগ। এর মধ্যে প্রত্যেকেই কাজ খুঁজে নিতে পারেন। এমন কোন ব্যক্তি নেই যিনি এর মধ্যে একটা না একটা কাজে পূর্ণ শ্রম অথবা আংশিক শ্রম উৎসর্গ না করতে পারেন।

খাদ্য উৎপাদনের এই ব্রতকে এক বিরাট শিক্ষার আন্দোলনও বলা যায়। এ শিক্ষা মানব জীবনেরই কয়েকটি মূল প্রকৃতির গঠন এবং উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষা। প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের যোগ স্থাপন করার এবং সৃষ্টিশীল কাজের উপযোগী প্রতিভা স্ফূরণের ও গঠনের সুযোগ ভূমি সেবার কাজে যেমন করে এবং যত সহজে পাওয়া যায়, অন্য কাজে তা পাওয়া যায় না। একটি বৃক্ষ শিশুকে পরিচর্যা করে এবং জল ছিটিয়ে একটি বীজকে অঙ্কুরিত করে মানুষ যে শিক্ষা অতি সহজভাবেই পেয়ে যায়, সে শিক্ষাই তার চরিত্রে মমতার মাধুর্য সৃষ্টি করে। এমন মানুষই সহজে আদর্শ সামাজিক মানুষের চরিত্র লাভ করে। গান্ধীজি তাঁর উদ্ভাবিত বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতিতে এই কারণেই চরকা এবং কৃষিকার্যকেই ছাত্রের 'পাঠ্যপুস্তক' রূপে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির এই ব্রত বস্তুতঃ জাতির সংস্কৃতিগত জীবনেরও সার্থকতা সাধনের ব্রত।

'উপসর্প মাতরং ভূমিম্'—মাতৃরূপিণী ভূমির সেবা কর।

'সুশস্যাঃ কৃষীস্কৃধিঃ'—ভাল শস্যের জন্য কৃষি কর। ভারতের প্রাচীন জ্ঞানীর এই অনুরোধ নবীন ভারতের জীবনে আরও বেশী সত্যি হয়ে উঠুক।

এ নহে কাহিনী

প্রীতিভাজনেষু, বন্ধু, এই প্রবাস-জীবন সত্যিই ভাল লাগছে। কবির ভাষায় বলতে পারি—এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে। মাঝে মাঝে, বিশেষ করে রাতের বেলায় যখন কুয়াশা ঘনিয়ে

ওঠে, তখন এই লণ্ডন শহরকে রূপকথার একটি মায়াপুরী বলে মনে হয়। ঝলমলে চোখ ধাঁধানো আলোর উপর যেন নিবিড় এক রহস্যের প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ে। ব্যস্ত জীবনের যত হাঁক-ডাক, সবই এক অবাস্তব জগতের বেলুন বলে মনে হয়। ছুটোছুটির যত কায়া যেন কল্পলোকের যত ছায়া। লণ্ডন, আধুনিক জীবনের এই কঠিন কর্মঠ শহরের প্রাণের রূপটাও কত কোমল হয়ে যায়।

এ দেশ লেগেছে ভাল নয়নে। দেখে এসেছি রিজেন্ট পার্কের ফুল। বেগুণী রঙের হাইডরেঞ্জিয়া, কী তার আকার আর শোভা। দেখে মুগ্ধ হতে হয়েছে। কত যত্নে ও সেবায় সুন্দর হয়ে ফুটে রয়েছে এক একটি স্তবকিত সৌন্দর্য। এ ফুলের আশে পাশে কত পরিচ্ছন্নতা, কত স্নেহ।

দেখে এসেছি হাইড পার্কের তরু-বীথিকার শোভা। উড়ছে পাখি, রবিন রেডব্রেষ্ট। কালো পাখি, বুকে ছোট্ট একটু রক্তিমতার ছোপ। পথিকেরা বিস্ময়ের চক্ষু তুলে রবিন পাখির ছটফটে আনন্দের খেলা দেখছে।

গিয়েছিলাম একদিন উইণ্ডসর। পথের দু'পাশে সে কী পরিচ্ছন্ন শ্যামলতা। যেন কেউ সবুজ ঘাসের আসন পেতে রেখেছে। সকাল বেলার রোদ সে ঘাসের সবুজের সঙ্গে মিষ্টি সোনালী আভা মিশিয়ে দিয়েছে।

গিয়েছিলাম একদিন এসেক্সের এক নিরিবিলি গ্রামের কাছে, যেখানে সেকেলে এক কাস্‌লের কাছে ছোট একটি ডোবা ; জললিলির পাতা ভাসছে সেই ডোবার জলে। আর সোয়ালো পাখির একটা ঝাঁক উড়ে উড়ে সেই ডোবার কাছে উইলো গাছের কুঞ্জের উপর লুটিয়ে পড়ছে।

একদিন দেখতে পেয়েছি, চমৎকার একটি অন্ধকার। আলিবার্ণি স্ট্রীটের হোটেলের ঘরে মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙ্গে গেল, তখন জানালা দিয়ে তাকাতেই চোখে পড়লো, পিছনের বাগানে বেশ ঘন অন্ধকার, তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় একটি পপলার গাছ। অন্ধকারে জড়ানো সেই পপলার যেন এক স্তব্ধ নিশাচরের ভয়াল চেহারা। দেখলে ভয়-ভয় করে। তবু বার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

লণ্ডনের আকাশের মেঘও দেখতে ভাল। সে মেঘের ডাকও শুনেছি। দেখেছি, সে মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিকও ফুটে উঠছে। আর, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টিও ঝরে পড়ছে। সবচেয়ে ভাল লেগেছিল দেখতে হ্যামস্টেড হীথ বেড়াতে গিয়ে রাতের বেলাতে যেদিন দেখতে পেলাম, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে সুন্দর একটি টুকরো-চাঁদ দেখা দিল। লণ্ডনের যত গির্জার চূড়াও যেন মর্ত্য প্রাণের আকুলতার ছবি, আকাশপানে তাকিয়ে সেই টুকরো-চাঁদের আলোক পান করতে চাইছে। দেখতে ভাল লাগে ; আরও দেখতে ইচ্ছে করে।

আজও শুনতে ইচ্ছে করে, লণ্ডনের ভোরবেলার পথিক জনতার কলরব। কান পেতে রই, কখন্ রিজেন্ট স্ট্রীটের গির্জাঘরের প্রার্থনার সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যাবে। টেমসের জলে রাজবাড়ির কালো রাজহাঁস ঢেউয়ের বুকে ভেসে বেড়ায়। দেখতে ভাল লাগে, প্যাডিংটন স্টেশনে যখন ট্রেন এসে থামে, আর কাজের মানুষের অফুরান ভিড় স্রোতের মত পথের উপর ছড়িয়ে পড়ে। বৈভবের শহর ; ঐশ্বর্যের পুরী যুগজীবনের প্রবল কর্মব্যস্ততার জনপদ এই লণ্ডন আমার মত প্রবাসীর চোখে সত্যিই এক বিস্ময়ের আস্পদ।

কিন্তু, একটা অদ্ভুত সত্যেরও পরিচয় পেয়ে গিয়েছি। বিশ্বাস কর বন্ধু, মনে হয়েছে,

সব সময়ে আর প্রতি মুহূর্তে মনে হয়েছে, কোথায় যেন আর একটা ঠাঁই আছে, কবির ভাষায় যাকে বলতে পারা যায়—স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।

সত্যিই তো তাকে চোখে দেখতে পাচ্ছি না। তবু সে যেন সব সময়েই মনের কাছে রয়েছে। কল্পনার কৈলাস নয়, কবির এল ডোরাডো নয় ; সে এক অদ্ভুত ঠাঁই। সেখানে ধুলো আছে, কাদা আছে, কাঁটা আছে। অবহেলা উপেক্ষা আর অযত্নে ব্যথিত ও পীড়িত একটি ঠাঁই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তবু যেন সে মধুতে মাখা। লণ্ডনের এই প্রবাসজীবনের প্রতি ক্ষণে তাকেই মনে পড়ে।

সেদিনের একটা ঘটনার কথা শুনলে তুমি বোধ হয় খুব আশ্চর্য হবে। রয়্যাল ফেস্টিভ্যাল হলে অপেরা শুনতে গিয়ে হঠাৎ সেদিন আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম ; আর, শুনতে পেয়েছিলাম, কোথায় যেন কোকিল ডেকে উঠেছে।

না, এই লণ্ডন শহরের কোন কোকিলের ডাক নয়। লণ্ডন শহরের সেই সৌভাগ্য নেই যে, তার কোন পার্কের গাছে এই রাতের বেলায় কোকিল ডেকে উঠবে।

বুঝতে পেরেছিলাম, এই কোকিল ডাকছে সুদূরের কোন নিভৃতে। স্বপ্ন দিয়ে তৈরী আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা একটি ঠাঁই, যার ছবি আমারই মনের ভাবনার সঙ্গে মিশে আছে। সেখানে ফাল্গুনের বাতাস ক্ষণে ক্ষণে এসে নিমের কচি পাতার গায়ে নিঃশ্বাস বুলিয়ে দিয়ে চলে যায়. সেখানে বারমাস রক্তকরবী ফোটে। সেখানে কাঁচা ড্রেনের পাশে কনকধুতুরা ফোটে, যার রূপ রিজেন্ট পার্কের হাইডরেঞ্জিয়ার চেয়ে কম সুন্দর নয়। সেখানে ডোবার জলে সাদা শালুকের ছায়া ভাসে। রঙীন মাছরাঙা উড়ে বেড়ায়। তালগাছের গায়ে ঠোঁট ঠুকে ঠুকে যে কাঠঠোকরা ক্লান্ত হয় না, তার চেহারার গৌরবের কাছে রবিন রেডব্রেস্টের চেহারা একটা সামান্যতা মাত্র।

সেখানে সন্ধ্যায় শঙ্খের শব্দ রাতের বেলায় দেবারতির ঘণ্টাধ্বনি। সেখানে বুনো ঝোপের বুকে রঙীন প্রজাপতির মেলা। সেখানে শুক্লা রাতের দেহ হাসনাহানার সৌরভ ছড়ায়। শ্রাবণের ধারা যখন ঝরে পড়ে, তখন দেখতে হয়, ছোট পুকুর আর খালের জলে মাছের খেলা কত দুরন্ত হয়ে ওঠে। সেখানে অমারাত্রির অন্ধকারে কী ভয়াল নিবিড়তা। কিন্তু রাতের তাল গাছের মাথায় যখন জোনাকী জ্বলে, তখন মনে হয়, রূপকথার রাজপুত্রের হারিয়ে যাওয়া মণিমুকুট কেউ তুলে নিয়ে গাছের মাথায় পরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। ঝড় আসে, নারকেলের পাতার ঝালর দুলেদুলে মর্মর রোল ছড়িয়ে দেয়। আঙিনার কোলে রক্তজবার কুঁড়ি ঝরে পড়ে। আর, বৈশাখের বাতাস যখন তপ্ত হয়ে ওঠে, তখনো মাচানের কুমড়ো ফুলের উপর অলস মৌমাছি তার পিপাসার মধু খুঁজে বেড়ায়। ভোরের আকাশ যখন রাঙা হয়ে ওঠে, তখন মাঠের ঘাসের উপর শিশিরের ছোট কণাটিও আলোর আশায় টলমল করে।

বিলেত দেশটাও মাটির। তাকে চোখে দেখতে ভালও লেগেছে। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে মনের নিভৃতে যে একটি অদ্ভুত ঠাঁই তার রূপের সব মায়া ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে, তাকে আজ সত্যিই যে কল্পলোকের একটি অপরূপ ঠাঁই বলে মনে হয়।

তুমি কি ধারণা করবে, বন্ধু, জানি না। তুমি হয়তো মনে করবে যে, আমি সত্যিই একটা মনগড়া কাহিনীর কথা বলছি। তুমি প্রশ্ন করতে পার, লণ্ডনের মত ঝলমলে ঐশ্বর্যের জনপদে একটি হোটেল ঘরের নিভৃতে বসে থাকলেও বার বার মনের নিভৃতে যার রূপের

ছবি এত মায়াময় হয়ে ফুটে ওঠে, কে সে? কোথায় আছে এমন ঠাঁই? তুমি বোধ হয় সন্দেহ করবে বন্ধু, আমি আমাদের পাতিপুকুরের কথা বলছি।

জীবন-নদীর এপারে

সমস্যাটা হলো জীবন নদীর এপারেরই সমস্যা। যতদিন দেহ আছে, ততদিন দেহের রোগগ্রস্ত হবার আশঙ্কাও আছে। ওপারে যাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এই আশঙ্কার সঙ্গেই বসবাস করে মানুষ। ওপারে যাবার ব্যাপারটাও হলো দেহাশ্রিত প্রাণের অন্তর্ধান, সেই অন্তর্ধান দেহকে কোন না কোন প্রকারের পীড়ায় ব্যথিত জীর্ণ ও বিকল না করে সম্পন্ন হয় না। যোগীদের ইচ্ছামৃত্যু বরণের কাহিনী শুনেছি। জানি না, ইচ্ছামৃত্যুর সাধকের দেহ হতে প্রাণের অন্তর্ধানের পূর্বে তাঁর দেহ পীড়িত হয় কি না। কিন্তু সংসারের সাধারণ দেহীর জীবনের উপর এই একটা অমোঘ নিয়মের শাসন সত্য হয়ে আছে যে, রোগ নামক একটি বেদনায় তার ত্বগস্থিমাংস স্নায়ু ও শোণিতকে ব্যথিত এবং স্তব্ধ করে তবেই প্রাণ বিদায় নেয়। রোগে মৃত্যু হতে পারে, এই কারণে মানুষ রোগকে ভয় করে—এই তত্ত্ব যেমন সত্য, এর বিপরীতটাও তেমনই সত্য। রোগে মৃত্যু হয় বলেই মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে। বিনা রোগে মৃত্যু হবার নিয়ম থাকলে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে অনেক কম ভয় করতো মানুষ। মৃত্যুকে ভয় করে না, কিন্তু রোগকে ভয় করে, সাধারণ সংসারী মানুষের মনের মধ্যেই এই বিচার দেখা যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষের কথা বলছি না। তাঁরা সুখে-দুঃখে অবিকার। রোগ ও শোকের আঘাতকে জীবন দেবতারই পুরস্কার বলে মনে করছেন, এমন মনের জোর এবং উপলব্ধির মানুষও আছে; কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কোটিতে গুটিক। পুরাণকারের কল্পনাতে বৈতরণী নদী হলো শোণিতজলা। রোগভয় নামে ভয়টাই বোধ হয় ঐ বৈতরণী নামে বিষণ্ণ এক কল্পনাকে সৃষ্টি করেছে। দেহী মানুষের চিন্তার মধ্যে উদ্বেগ তরঙ্গিত করে তোলে অদৃশ্য এক বৈতরণীর ভয়, সে ভয় হলো রোগভয়।

রোগের সহচর বলেই মৃত্যুকে এত ভয়াল বলে মনে হয়; নইলে মৃত্যুর মধ্যে সাধারণ মানুষও বোধ হয় এক সুন্দর অভ্যর্থনার আনন্দ দেখতে পেত। মহাভারতের এক কাহিনীতে সত্য সত্যই মৃত্যুকে সুন্দর বলা হয়েছে। মৃত্যু হলো প্রজাপতি ব্রহ্মার শান্ত তেজঃ হতে উদ্ভূতা এক কন্যা—পিঙ্গলবসনা কৃষ্ণনয়না, কমলমাল্যধারিণী ও দিব্যাভরণভূষিতা এক সুন্দরী। জীবসমুদয়ের জন্ম ও বিলোপের নিয়ম সংস্থাপন করতে চান ব্রহ্মা। মৃত্যুকে আহ্বান করে নির্দেশ দিলেন—তুমি প্রজা সমুদয়কে সংহার কর। কিন্তু এই নিষ্ঠুর আদেশ শুনে সুন্দরী মৃত্যুর চক্ষু হতে নির্ঝরের মত অশ্রুধারা ঝরে পড়লো। মৃত্যু তার নয়নবিগলিত সেই অশ্রুধারা অঞ্জলিপুটে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রইলেন; কিন্তু ব্রহ্মা বিচলিত হলেন না। বললেন—তোমার ঐ বেদনার্ত নয়নের অশ্রুই ব্যাধিরূপে পরিণত হয়ে মানুষকে বিনাশ করুক। ব্রহ্মার শাপভয়ে ভীতা হয়েই মৃত্যু ব্যাধির দ্বারা জীবের প্রাণ বিনাশ করবার কঠোর ব্রত গ্রহণ করলেন।

সুন্দরী মৃত্যুর অশ্রুজল হলো ব্যাধি। মহাভারতোক্ত কাহিনীর মৃত্যুও করুণায় সুন্দর, কিন্তু ব্যাধি নিষ্ঠুর। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারই নির্দেশে মৃত্যুর এত মমতায় ভরা অশ্রু ব্যাধিতে পরিণত হলো। মৃত্যুর পূর্বে রোগ নামে এক ভয়ালের অসুন্দর ও কঠোর স্পর্শ দেহকে

পীড়িত করবে, জীবের সৃষ্টিনীতির মধ্যেই এই বাস্তব নিয়মটি নিহিত রয়েছে।

কিন্তু ঐ রোগভয়কে পরাভূত করার প্রয়াসও জীবনের স্বাভাবিক ধর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ব্যাধিকে দূর করা এবং নীরোগ হয়ে থাকা, এই দুই আগ্রহের প্রেরণা থেকেই চিকিৎসা নামে বিজ্ঞানের উৎপত্তি। জীবন-নদীর এপারে দেহীদের কাছে আয়ু, স্বাস্থ্য ও শক্তির উপহার নিয়ে দেখা দিয়েছে এক বিজ্ঞান এবং সেই বিজ্ঞানের ধারক, বাহক ও রক্ষকরূপে বিদ্যমান রয়েছেন এক সমাজ। ঠিক সেবক সমাজ নয় ; পেশাদার সেবক সমাজ, অর্থাৎ ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিম। চিকিৎসা নামে মানবসেবার একটি কাজকেই এঁরা জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে, এঁদের জীবিকা মহৎ।

সমাজের সঙ্গে পেশাদার চিকিৎসক শ্রেণীর একটা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, সমাজের কাছে এঁরা সেবা বিক্রয় করেন। এটা নিশ্চয়ই অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। জীবিকারূপে গৃহীত বর্তমানের কোন 'সার্ভিস' সত্যই সার্ভিস নয় ; সবই শ্রম দক্ষতা, জ্ঞান ও পণ্য বিক্রয়ের ব্যাপার। তাই এই বাস্তব সত্যও স্বীকার করে নিতে হয় যে, প্রত্যেক জীবিকাগত সার্ভিসের মত চিকিৎসকের জীবিকাগত ব্রতের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সমাজে স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু এটা সত্য নয় যে, যেহেতু চিকিৎসকেরা চিকিৎসা নামে অত্যাচ্চ এক সেবাব্রত ও রোগের নিরাময় সাধনের বিজ্ঞানকে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন, সেই হেতু চিকিৎসকেরা অন্য কোন জ্ঞানোপজীবী শ্রেণীর তুলনায় সমাজের মনের কাছে বেশি শ্রদ্ধার আস্পদ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু কে অস্বীকার করবে যে, চিকিৎসক শ্রেণীর প্রতি সমাজের মনে মর্যাদার স্থান উচ্চতর হওয়াই উচিত ছিল? কে অস্বীকার করবে, ঠিক যে রীতিতে আর সব শ্রম, দক্ষতা, বিদ্যা ও জ্ঞানের পেশা চলে ঠিক সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসকের পেশা চালিত হওয়া উচিত নয়? এক ফরাসী মনীষী, বোধ হয় ভিক্টর হুগোই বলেছিলেন যে, মৃত্যুর সময় আমার চোখের সম্মুখে শুধু একজন ভাল ডাক্তারের সান্ত্বনাপূর্ণ দুটি চক্ষু যদি দেখতে পাই, তাহলেই আমি মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করতে পারবো। সেই ফরাসী মনীষীর মতে চিকিৎসকেরাই তো জীবন-দেবতার দূত।

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, কবির দাবী হলো দুটি। 'ভাল ডাক্তার' এবং তাঁর 'সান্ত্বনাপূর্ণ দুটি চক্ষু।' ব্যাধির বেদনায় পীড়িত মানুষের কাছে কাম্য হলো এবং প্রয়োজনও হলো 'ভাল ডাক্তার', শুধু ডাক্তার হলেই চলে না। জীবিকাসর্বস্ব অর্থকর আগ্রহের মূর্তি মাত্র নয়, দুটি সান্ত্বনাপূর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত মূর্তি, যে দৃষ্টি তাঁর সেবাব্যাকুল অন্তঃকরণেরই পরিচয়।

দেশের জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন সম্পর্কে যে সব আলোচনা, চিন্তা ও প্রস্তাব দেখা যায়, তার মধ্যে একটি কথার প্রাবল্য লক্ষ্য করা যায়। দেশে ডাক্তারের অভাব আছে। কথাটা খুবই সত্য। ছত্রিশ কোটি নরনারীর জীবনকে রোগের প্রকোপ থেকে মুক্ত রাখার জন্য যত জন চিকিৎসকের চেষ্টা ও তৎপরতা প্রয়োজন, তত জন চিকিৎসক দেশে নেই। কিন্তু চিকিৎসকদের এই সংখ্যাগত অল্পতা দূর হয়ে গেলেই কি সমস্যার সমাধান হয়ে যায়? নিশ্চয়ই নয়। ডাক্তারের অভাব আছে, এটাই একমাত্র সমস্যা নয়। 'ভাল ডাক্তার'-এর অভাব আছে এবং প্রকৃত চিকিৎসকোচিত অন্তঃকরণেরও অভাব আছে। তা না হলে দেশের সাধারণ মানুষ আজও কেন হাসপাতালকে ভয় করে? রোগের ভয়ে এবং রোগে পীড়িত মানুষ হাসপাতাল নামে রোগ নিরাময়েরই ব্যবস্থাটাকে ভয় করে। এর কারণ

দেশের বর্তমান চিকিৎসা পেশা, হাসপাতাল নামে চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং চিকিৎসকের আচরণের রীতিনীতির মধ্যে দেশের মানুষ ভীত হবার মত অনেক কিছু দেখতে পায়।

হাসপাতালগুলির রীতি-নীতির কথাই ধরা যাক্। দেশের গরীব সাধারণের জন্যই সরকারী অর্থে এবং বেসরকারী সাহায্যেও হাসপাতালগুলি স্থাপিত হয়েছে ; কিন্তু গরীব রোগীর পক্ষে হাসপাতালের একটি 'ফ্রী বেড' লাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কে না জানে, ফ্রী বেডেরও একটা গোপন মূল্য আছে এবং এক গোপনতার চক্রকে কিছু অর্থদানে তুষ্ট না করলে গরীব রোগীকে হাসপাতালের দ্বার থেকে ফিরে যেতে হয়। এর ব্যতিক্রমও অবশ্যই আছে। গরীব রোগী সত্যই হাসপাতালের বিনামূল্যের বেড লাভ করতে পেরেছে, এরকম ন্যায়োচিত ঘটনা নিতান্ত বিরল নয়। কিন্তু সাধারণ পরিবেশই নানা সূক্ষ্ম ও স্থূল অন্যায়ের জালে অপরিচ্ছন্ন।

কোন হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে বাড়িতে একবার দক্ষিণাযুক্ত আহ্বান জানানো সেই হাসপাতালের ওয়ার্ডে বিনামূল্যের বিছানা লাভ করার একটা পন্থা। কিন্তু এই রীতি যে গরীব রোগীকে প্রাপ্য ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রীতি। মানুষের হিতসাধনের কাজটাও গণতন্ত্রসম্মত পন্থায় সিদ্ধ হবে, দেশের মানুষ এইটুকু চায়। যে রীতির অনুগ্রহে রাষ্ট্রের কোন বিনামূল্য কল্যাণ-ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা বিত্তবান মানুষে লাভ করতে পারে এবং বিত্তহীনেরা পারে না, সেই রীতি রাষ্ট্রদেহ এবং সমাজদেহেরই ব্যাধিবিশেষ।

সাধু এবং সৎ চিকিৎসক যথেষ্ট সংখ্যায় আছেন এবং তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে, পরিশ্রম স্বীকার ক'রে এবং আন্তরিকতা নিয়ে রোগীর চিকিৎসা করেন। 'নিজের শ্রমের অন্ন খাই সুখী হয়ে'— সাধু শ্রমের এই আদর্শ তাঁদের জীবনে সত্য। জীবিকানিষ্ঠ এই ধরণের চিকিৎসকের সংখ্যা কম নয়। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই অর্থের প্রয়োজন আছে, কারণ তাঁরাও সংসারের নানা দায়ের নিগড়ে বাঁধা মানুষ, তাঁরা সন্ন্যাসী নন। সমাজের আর সব শ্রেণীর মানুষের মত প্রচুর অর্থ উপার্জনের আগ্রহ ব্যবসায়ী চিকিৎসকের চিন্তাতেও থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু চিকিৎসকের অর্থকর আকাঙ্ক্ষা যদি উপার্জন-পন্থার নীতিগত সৌষ্ঠব ও মাত্রা অস্বীকার করে, তবে সমাজের পক্ষে সেই চিকিৎসক বিশেষ ভয়ের ও ক্ষতির আস্পদ। কারণ, চিকিৎসকের পেশা প্রত্যক্ষভাবে মানুষের প্রাণের পরিণামের সঙ্গে সম্পর্কিত। চিকিৎসকের অর্থস্পৃহা যে ক্ষেত্রে প্রবল সে ক্ষেত্রে চিকিৎসক রোগীকে প্রধানত তাঁর অর্থকরী সিদ্ধিলাভের উপকরণ ব'লে মনে করতে বাধ্য এবং এ-ক্ষেত্রে রোগীর প্রতি চিকিৎসকের প্রত্যেক কর্তব্য অর্থ আহরণের অভিলাষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেও বাধ্য। এই অবস্থা যেখানে সত্য, সেখানে চিকিৎসা পেশার মহত্ত্ব লুপ্ত হয়েছে বলে মনে করতে হবে।

আমাদের দেশে বর্তমানে এই অবস্থা সাধারণভাবে সত্য না হলেও, কতগুলি রীতির স্বচ্ছন্দ উদ্ভব হতে দেখে মনে হয় যে, অবস্থা এই রকমই একটা অবাঞ্ছিত পরিণামের টানের মধ্যে রয়েছে। দৃষ্টান্ত, বিখ্যাত চিকিৎসকের দক্ষিণার পরিমাণ। কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দক্ষিণার পরিমাণ যদি এক শত টাকা অথবা চৌষট্টি টাকা হয়, তবে এই অভিযোগ কখনই মিথ্যা বলে মনে হবে না যে, সেই চিকিৎসকের কর্তব্যের প্রধান প্রেরণা হলো অর্থ। এক শত টাকা দক্ষিণা ধার্য করার অর্থ সমাজের সাধারণের সেবার ক্ষেত্র হতে সরে গিয়ে এক আভিজাত্যিক উচ্চতায় সমাসীন হয়ে থাকা। এমন গুরুমূল্যে মূল্যবান চিকিৎসকের সেবা

ও পেশার লক্ষ্য দেশের রোগী নয়, দেশের ধনী রোগী।

জৈমিনি দর্শনে একটি গল্প আছে। মহর্ষি জৈমিনি তাঁর আশ্রমে বসে আছেন, এমন সময় নিকটের এক বৃক্ষের শাখান্তরাল থেকে একটি পাখি হঠাৎ প্রশ্ন করলো—কোহরুক? অর্থাৎ, অরোগী কে? মহর্ষি জৈমিনি উত্তর দিলেন—মিতভুক্। অর্থাৎ, যে মিতাহারী। আহার্য তত্ত্বের এই সত্যকে সুচিকিৎসকের জীবিকার সম্বন্ধেও উত্থাপন করা যায়। সুচিকিৎসক কে? যিনি মিতগ্রাহী, পরিমিত দক্ষিণায় যিনি সন্তুষ্ট। দুঃখের বিষয়, বিখ্যাত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের অমিতগ্রাহিতা বর্তমানে দেশের জনজীবনে একটি শোচনীয় সমস্যা রূপেই রয়েছে। কোন চিকিৎসকের দক্ষিণামূল্য এক শত টাকা এবং কারও বা দু' টাকা। একই পেশাদারী বিদ্যার ক্ষেত্রে কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিভার এতখানি উত্তমাধম ব্যবধান বস্তুত সত্য নয়। তবুও প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই ব্যবধান দেখা যায়। একজন সাধারণ প্রতিভার চিকিৎসকও তাঁর পেশাকে বাণিজ্যিক সৌকর্যে, বিজ্ঞাপনী চমৎকারিতায় এবং প্রচার কুশলতার গুণে মূল্যগৌরবে গরীয়ান ক'রে তুলতে সমর্থ হন এবং যথার্থ উচ্চ প্রতিভার চিকিৎসকও শুধু তাঁর বাণিজ্যিক বুদ্ধির অভাবে এবং অন্যবিধ অক্ষমতার কারণে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার নাগাল পান না। বর্তমানের চিকিৎসা পেশা সম্পূর্ণভাবে বাণিজ্যিক রীতিতে গঠিত রয়েছে বলেই চিকিৎসকের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ঠিক গুণ-নির্ভর হয়ে উঠতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনী আড়ম্বরই হলো খ্যাতিলাভের সোপান।

'When pain and anguish
wring the brow,
A ministering angel thou'

স্কটের কাব্যের নায়িকার কাছে কাব্যের নায়ক যা আশা করে, সমাজের মধ্যে একমাত্র চিকিৎসকের কাছেই মানুষ প্রায় তাই আশা করে। সন্তাপিত মন এবং বেদনাপীড়িত দেহ যখন ছট্‌ফট করে, তখন দেবদূতের মত মমতাময় হস্তের স্পর্শ ও স্নিগ্ধ সান্নিধ্য নিয়ে রোগীর কাছে দেখা দিতে পারেন শুধু একজন, তিনি হলেন চিকিৎসক। কিন্তু দেখা দিয়ে থাকেন কি? অল্পসংখ্যক কোমলচিত্ত ও হিতবাদী চিকিৎসকের কথা ছেড়ে দিই। সাধারণ মানুষ হাসপাতালের আউটডোরে আর ইনডোরে পরিদর্শক চিকিৎসককে যে রূপে ও আচরণে দেখতে পেয়ে থাকেন, সেই রূপ ও আচরণের মধ্যে স্নিগ্ধতা ও মমতার পরিচয় কতটুকু থাকে? যেন অপরাধীদের শাস্তি বিধান করছেন, এমনই এক রূঢ় তুচ্ছতা নিয়ে চিকিৎসক রোগীকে ধমক-ধামক দিয়ে পরীক্ষা করছেন এবং সহযোগীর সঙ্গে সিনেমা বা স্পোর্টের গল্প করতে করতে প্রেসক্রিপশন লিখছেন, এই দৃশ্য বিরল নয়। ওয়ার্ডের বিছানার দুই সারির ভিতর দিয়ে ব্যস্ততার সঙ্গে পরিদর্শক চিকিৎসক রোগীদের মুখের দিকে মাত্র নেত্রসম্পাত ক'রে চলে যান এবং এই হলো পরিদর্শন। রোগী সম্বন্ধে প্রশ্ন ও পরীক্ষার ব্যাপার যতটুকু হয়, সেটুকু আবার এত দ্রুত ও ক্ষিপ্র যে, তাতে কোন ধন্বন্তরীর পক্ষেও রোগীর রোগ সম্বন্ধে সঠিক বিচার ও নির্ণয় সাধ্যসাপেক্ষ নয়। বিখ্যাত চিকিৎসকের 'কল'-এর বিরাম নেই। বিপুলসংখ্যক রোগীর দেহ ও প্রাণের পরিমাণের দায় একই সঙ্গে গ্রহণ করলে রোগীর প্রতি সুবিচার করা বস্তুত সম্ভব হয় কি? এটা পেশাদারী বিপুলতা মাত্র, সুচিকিৎসার বিপুলতা নয় এবং একজন চিকিৎসকের পক্ষে একই সঙ্গে এই রকম বিপুলসংখ্যক রোগীর চিকিৎসা বিধানের পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

চিকিৎসা-পেশা বর্তমানে বাণিজ্যিক রীতিতে গঠিত, তাই এর মধ্যে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব আছে এবং সেই প্রতিযোগিতা এমন সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন নয় যে, ঠিক "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" নীতি সত্য হয়ে উঠতে পারে। যোগ্য দারিদ্র্যে দিনাতিপাত ক'রে থাকেন। এমন চিকিৎসকও আছেন, যিনি গরীব রোগীর কাছ থেকে ফী দাবী করতে লজ্জা বোধ করেন, রোগীর অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে বিচলিত হন এবং মৃত রোগীর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে শোকার্তের মতই কান্নাকাটি ক'রে ঘরে ফিরে আসেন। তিনি ফী চাইতে পারেন না, তাঁকে ফী দিতেও লোকে ভুলে যায়। এমন চিকিৎসকের অবস্থা কল্পনা করতে পারি। এক্ষেত্রে চিকিৎসকেরই প্রতি সমাজের সুবিচার হচ্ছে না। চিকিৎসকের হৃদয়বত্তার সুযোগ নিয়ে তাঁকে তাঁর প্রাপ্য হতে বঞ্চিত করাও সমাজবিরোধী ক্রিয়া।

রোগীর চিকিৎসায় অনেক সময় ভুল হয়ে থাকে। বিখ্যাত সুবিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরও ভুল হয়ে থাকে এবং তার ফলও মারাত্মক হয়ে থাকে। কিন্তু এই ভুলের জন্য চিকিৎসকের প্রতি কোপ ও অভিযোগ পোষণ করাও ভুল। পৃথিবীর কোন বিদ্বানের বিদ্যা এবং সুদক্ষের কাজ ভুল-প্রুফ নয়। চিকিৎসকেরা ভুল ক'রে থাকেন, এই কারণে সমাজের পক্ষে উদ্বিগ্ন হওয়া অযৌক্তিক। ভুল নয়, ভয়ের বিষয় হলো ভেজাল। চিকিৎসকের নিষ্ঠায় ভেজাল এবং ঔষধের ভেজাল। আর একটি ভয়ের বিষয় আছে, ঔষধের ডিসপেনসিং ব্যবসায়ীদের সততায় ভেজাল। প্রেসক্রিপশনে বিহিত বিভিন্ন ভেষজ-উপাদানের মধ্যে দু' একটি উপাদানকে বাদ দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, এমন ভৈষজিকের বিবেকও ভেজালে কলুষিত এবং সে বিবেক সমাজের পক্ষে ভয়ের বিষয়।

চিকিৎসককে 'কল' দেওয়া এবং প্রতি 'কল'-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণের ফী প্রদান করা, এই প্রথা ছাড়া কি অন্য কোন প্রথায় চিকিৎসকের সাহায্য ক্রয়ের ব্যবস্থা হতে পারে না? পৃথিবীতে সর্বত্রই কি এইরকম 'ভিজিট' প্রথা বিদ্যমান? মনে হয়, এই প্রথার চেয়ে উন্নততর প্রথা পরিকল্পিত হতে পারে। কনট্রাক্ট তথা চুক্তি প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতি ভিজিটের জন্য দক্ষিণা গ্রহণের পরিবর্তে চিকিৎসক 'কেস' প্রতি দক্ষিণার একটি সাকুল্য পরিমাণ নির্দিষ্ট করতে পারেন। এই রকম চুক্তিবদ্ধ প্রথার মধ্যেও জটিলতা এবং অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ থাকতে পারে। প্রশ্ন হলো, এই অতি পুরাতন ভিজিট প্রথার পরিবর্তে চিকিৎসার জন্য দক্ষিণা গ্রহণের সুষ্ঠুতর কোন রীতি প্রচলিত হতে পারে কিনা?

চিকিৎসক নামক বিজ্ঞানী সমাজের কাছ থেকে উপকার গ্রহণের আর একটি যে বিশেষ প্রয়োজনের দিক আছে, সে বিষয়ে আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে এখনো কোন আগ্রহ জাগ্রত হয় নি। চিকিৎসককে শুধু রোগ নিরাময়ের জন্য আহ্বান করার রীতিই আমাদের জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থ হলে ও রোগার্ত হলে তবেই, চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জনসাধারণের এই অভ্যস্ত সংস্কারের সঙ্কীর্ণতা চিকিৎসকের জীবিকার এবং কর্তব্যের ক্ষেত্রও সঙ্কুচিত ক'রে রেখেছে। শুধু অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে কেন, সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও চিকিৎসকের সাহায্য প্রয়োজন। রোগের সম্ভাবনার হেতু পরিহার করে চলাই সুস্থতা রক্ষার রীতি। কয়েক লক্ষ চিকিৎসক কয়েক কোটি রোগীকে সুস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন, এই অবস্থাটা কোন জাতির পক্ষে একটা কাম্য স্বাস্থ্যাদর্শ নয়। দেশের কোটি কোটি সুস্থ মানুষ চিকিৎসকদের কাছ থেকে সাহায্য ও পরামর্শ উপযুক্ত মূল্যে গ্রহণ ক'রে সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখছেন এবং রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা হতে নিরাপত্তা

লাভ করছেন, এটাই হলো কাম্য অবস্থা। শুধু রোগ নিরাময়ের জন্য লক্ষ লক্ষ চিকিৎসককে নিযুক্ত করা হবে, এমন পরিকল্পনা ঠিক উন্নয়নী পরিকল্পনা নয়। কারণ এই নীতিতে রোগের প্রকোপ হ্রাস হওয়ার অর্থ চিকিৎসকের কর্মাভাব ও জীবিকাচ্যুতি। সুস্থ সাধারণেও যদি চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণের অভ্যাস লাভ না করেন, তবে চিকিৎসক সমাজের দক্ষতা প্রতিভা ও উপকারিতার অর্ধেক ক্ষেত্র পতিত ক'রে রাখা হয়।

ভেষজের প্রতি আসক্তির প্রাবল্যও দেখা যায়। চিকিৎসার ব্যাপারে ভেষজ অপরিহার্য, এই সংস্কার একটা প্রত্যয়ের মতই জনসমাজের ধারণা গ্রাস ক'রে রয়েছে। বিনা ভেষজে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কতগুলি বিধিনিষেধের শারীর পরিচর্যার দ্বারাই যে সুস্থতা রক্ষা করা যায় এবং রোগ হতে মুক্তিলাভ করা যায় ;সমাজে এই ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করেনি এবং চিকিৎসকেরাও এই ধারণার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণে ও প্রচারে তেমন সাহায্য করেন না। ভেষজের প্রতি লোকের মাত্রাধিক আসক্তি দেখেই এক শতাব্দী পূর্বে চিকিৎসাবিজ্ঞানী মনীষী ডঃ হোমস মাত্রাধিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—'আমার বিশ্বাস, মেটেরিয়া মেডিকা'কে যদি তুলে নিয়ে সমুদ্রের জলের গভীরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, তবে মানুষজাতির ভালই হবে, যদিও বেচারা সমুদ্রের ক্ষতি হবে।' ঔষধ না দিয়ে শরীর পরিচর্যা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিধিনিষেধ পালনের পরামর্শ দান করবেন যে ডাক্তার, তাঁকে রোগী সত্যিই ডাক্তার বলে মনে করতে পারবেন না, এই এক সমস্যা।

প্রাচীন গ্রীসের মনীষী হিপোক্রাটিস চিকিৎসা-পেশাকেই একটি 'পবিত্র পৌরোহিত্য' রূপে প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন এবং তার জন্য চিকিৎসকের অনুসরণীয় কতগুলি নীতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই 'হিপোক্রাটীয় শপথ' আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবসায়ীও গ্রহণ ক'রে থাকেন। কিন্তু ঐ শপথের মর্যাদা আধুনিক পেশাদারী পদ্ধতির মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব কি না, এটাও একটা প্রশ্ন। মনে হয় পেশাদারিতা রেখেও আধুনিক পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব এবং সংস্কারও প্রয়োজন।

বৃহামি তে! অথর্ববেদের এই মন্ত্র চিকিৎসক-সমাজেরই কর্মাদর্শের মন্ত্র। বৃহামি তে, আমি তোমাকে ব্যাধি হতে মুক্ত করবো। যক্ষ্মং শীর্ষণ্যং মস্তিষ্কা জিহ্বায়া বি বৃহামি তে। এই সুন্দর প্রতিজ্ঞা, এই আশ্বাস ও সান্ত্বনার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে যে চিকিৎসক রোগার্তের কাছে এসে দাঁড়াবেন, তাঁকে জীবনদেবতার দূত বলে মনে হবে, তা'তে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

জাত-পুরাণ-জাতিতত্ত্ব

সংস্কৃত ভাষায় 'কায়স্থ' শব্দটির সৃষ্টি বেশীদিন হয় নি। তৃতীয় খৃষ্টাব্দের আগে এই শব্দের কোন প্রচলন দেখা যায় না। পাণিনি এবং পাতঞ্জলিতে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং মৌর্য্যরাজনীতি সম্পর্কে অশোকের শিলালিপিগুলির মধ্যেও কায়স্থ শব্দ পাওয়া যায় না। প্রাচীনার স্মৃতিগুলি থেকে সুরু করে মনু পর্য্যন্ত সকল স্মৃতিতে জাতি হিসাবে বা রাজকর্ম্মচারী হিসাবে কোন 'কায়স্থ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাজ্ঞবল্ক-সংহিতায় এই শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাও একবার মাত্র। পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত অমরের শব্দকোষেও কায়স্থ শব্দ অনুল্লিখিত।

পণ্ডিতেরা কায়স্থ শব্দের অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেন, কায় শব্দ থেকে

এর উৎপত্তি। ব্রহ্মার চারি অঙ্গ থেকে চারিটি বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক ব্যাখ্যা আছে। এই পদ্ধতি ধরে কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন—ব্রহ্মা তাঁর 'কায়' থেকে একটি নূতন বর্ণ কায়স্থের সৃষ্টি করেন (পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ড)। আর একটি খণ্ড আছে। জামদগ্ন্য রাম যখন ক্ষত্রিয় সংহারে ব্যস্ত তখন তিনি এক ক্ষত্রিয় রাণীকে প্রাণসংহার না করে ছেড়ে দেন। কিন্তু সর্ত্ত এই ছিল যে সেই ক্ষত্রিয় রাণীর গর্ভজাত পুত্রসন্তানেরা ক্ষাত্রধর্ম চর্চ্চা করবে না (স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যম্)। সেই রাণীর পুত্রেরাই নাকি আদি কায়স্থ।

পুরাণকারেরা কায়স্থের উৎপত্তি এবং জাতি পরিচয় নিয়ে নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেছে। কোন কোন পুরাণকার অত্যন্ত কায়স্থবিদ্বেষী ছিল।

কায়স্থের উপর সবচেয়ে চটা গরুড় পুরাণ। গরুড় পুরাণের জাতিতত্ত্বের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে—ধরাতলে নরাধম খল আছে যত, তারাও কায়স্থের চেয়ে ভাল। "জননী জঠরে অবস্থানকালে শুধু দাঁতের অভাবেই হিংস্র কায়স্থেরা জননীর মাংস ছিঁড়িয়া খায় না। নতুবা ইহারা কি না করিতে পারে।" গরুড় পুরাণের এই বিদ্‌ঘুটে এনথ্রোপলজি এবং কায়স্থের বিরুদ্ধে রোষের কি কারণ, তা বেশ বোঝা যায় না। তবে জ্ঞানে গুণে উন্নত কায়স্থের ওপর যে এককালে ব্রাহ্মণদের ভয়ানক ঈর্ষা ছিল, গরুড় পুরাণের এই উক্তি তার প্রমাণ। স্যার রমেশচন্দ্র দত্ত যখন ঋগ্বেদ অনুবাদ করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ (কায়স্থ) যখন বেদান্ত প্রচার এবং ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণ করেন, তখনও এই ধরণের ঈর্ষাপাতের প্রতিবাদ উঠেছিল।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতেও এক নিঃশ্বাসে প্রজাপালক রাজাকে অনুরোধ করা হয়েছে যে—চোর, দস্যু, নরহন্তা এবং কায়স্থের উপদ্রব থেকে রাজা যেন প্রজাকে রক্ষা করেন। রাজতরঙ্গিনী রচয়িতা কাশ্মীরী ঐতিহাসিক কলহনও কায়স্থের উপর খড়্গহস্ত। কি কারণে কায়স্থের ওপর দ্বিজপাতিত সমাজ এত ক্ষুব্ধ ছিল তা জানা যায় না। মাত্র গুপ্তযুগের শিলালিপিতে এসে দেখতে পাই এই বিদ্বেষের সুর পালটে গেছে, কায়স্থকে সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। য়ুরোপের মধ্যযুগের ইহুদীর (বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীর ইহুদী) মতই বোধ হয় সে সময় কায়স্থের অবস্থা ছিল। অবশ্য ভারতে ঠিক ইহুদীদের মত অবস্থা হলো শাকদ্বিপী ব্রাহ্মণদের। এদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নগণ্য। তার কারণ এরা বিদেশী বংশোদ্ভূত।

সুতরাং অনেকের সন্দেহ হয় কায়স্থেরাও শাকদ্বিপী ব্রাহ্মণের (এবং ইহুদীর মত) মত ভারতে আগত বিদেশী জাতির বংশধর। অভারতীয় হওয়াতেই গুপ্তযুগের আগে পর্য্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে কায়স্থেরা কোন মর্য্যাদা পায় নি, যদিও তারা শিক্ষা-দীক্ষায় অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তখনও অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। কায়স্থ নামের উল্লেখ খুব বেশী পাওয়া যায় গুপ্তযুগে। কিন্তু দেখা যায় তার আগে দুশো বছর ধরে ভারতে বিদেশী অভিযান চলছে। মৌর্য রাজত্বের পতন হয়, উত্তর ভারতের অনেকখানিই গ্রীক শক পার্থিয়ান এবং কুষাণ রাজাদের দ্বারা শাসিত হয়। অর্থাৎ উত্তর ভারতে গ্রীক-ইরাণীয় সংস্কৃতির প্রকোপ চলতে থাকে। এই সময় হয়তো রাজকার্যের জন্য বহু সংখ্যক সুশিক্ষিত বিদেশীয় কর্মচারী (গ্রীক ও ইরাণীয়) নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রাচীন পারসীক অর্থাৎ ইরাণীয় ভাষায় এই সব রাজকর্মচারীদের বলা হতো 'কয়াথিয়া'। এই শব্দটিই হয়তো সংস্কৃতে কায়স্থ রূপ গ্রহণ করেছে। শক এবং যবন বা গ্রীক শাসকেরা ভারতে অবস্থানের সময় আচারে ব্যবহারে ও ভাষায় দ্রুত ভারতীয় রূপ গ্রহণ করেছিল। শক নামগুলি যেভাবে সংস্কৃত নামে পরিবর্তিত

হয়েছে, তাতেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। এইভাবে গ্রীক ও ইরাণী সামন্ত রাজা এবং সৈনিকেরা ভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজের সঙ্গে দ্রুত মিশে যেতে লাগলো। অপরদিকে গ্রীক ও ইরাণীয় রাজকর্মচারী সম্প্রদায় 'ভারতীয়' হয়ে গিয়ে 'কায়স্থ' জাতিতে পরিণত হলো।

উত্তর ভারতে আজও 'শকসেনা' উপাধিধারী একটি কায়স্থ সম্প্রদায় আছে। মোহনলাল শকসেনার নাম কংগ্রেসী মহলে পরিচিত। এই নামটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় এই সম্প্রদায়টি বিদেশী (শক) বংশোদ্ভূত। অন্যান্য কায়স্থ সম্প্রদায়ও বিদেশী রাজকর্মচারীদের বংশ থেকে এসেছে, এই উদাহরণ থেকে সে অনুমান আরও নিঃসংশয় হয়। তার সঙ্গে কিছু কিছু খাঁটি ভারতীয় রক্তও মিশেছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরাও বিদেশী (গ্রীক শক ইরাণী) রাজাদের অধীনে সরকারী কাজ গ্রহণ করতো। তারাও এক সঙ্গে মিশে গিয়ে পরে একটি বিশিষ্ট কায়স্থ সমাজ তৈরী করে। দক্ষিণ ভারতে গ্রীক ও ইরাণী আধিপত্য পৌঁছতে পারে নি। সেই কারণে সেখানে কোন 'কায়স্থ' সমাজ বা 'জাতির' নিদর্শন পাওয়া যায় না। কবি ভারতবর্ষকে মহামানবের পুণ্যতীর্থ বলেছেন। এখানে একদিন আর্য অনার্য দ্রাবিড় চীন এক দেহে লীন হয়েছিল। নৃতত্ত্বের দিক থেকে একথা খুবই সত্য। ভারতের কোন জাতি সমাজ বা সম্প্রদায় নৃতত্ত্বের বিচারে অমিশ্র নয়। রসের ভেজাল খুবই বেশী। কায়স্থেরাও যে শুধু বিদেশী গ্রীক ও ইরাণী রক্ত নিয়ে বেঁচে রয়েছে তা নয়। তাদের সমাজে আরও নানা ভারতীয় আর্য, অনার্য এবং বিদেশী রক্ত আমদানি হয়েছে। ডঃ সাভারকর বলেছেন, কায়স্থেরা তিব্বতের মানস হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চল হতে আগত 'লাখর' নামক জাতির বংশধর।

কায়স্থদের জীবিকা কি ছিল? বর্তমানে সিভিল সার্ভিস বলতে যা বোঝায়, তার অধিকাংশই কায়স্থদের হাতে ন্যস্ত ছিল। রাজস্ব সংগ্রাহক, জমির জরীপ, কেরাণীগিরি, হিসাব রক্ষক ও পরীক্ষক এবং সন্ধিবিগ্রহে প্রতিনিধিত্ব দেবত্ব ও মন্ত্রীত্ব করাই কায়স্থদের জীবিকা ছিল। রাজশাসনের এতখানি ক্ষমতা ও দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল তাদের ওপর জনসাধারণের একটি ভীতির ভাবও ছিল। বর্তমানেও এই মনোবৃত্তি পুরাপুরি বজায় আছে। (আগের মত সমাজ ব্যবস্থা থাকলে 'পুলিশ' হয়তো একটি জাতিতে পরিণত হয়ে যেত)। মৃচ্ছকটিক নাটকে পাওয়া যায়—বিচারের দৃশ্যে একজন কায়স্থ বিচার বিবরণ লিপিবদ্ধ করছে। রাজতরঙ্গিণীতে দেখা যায় কায়স্থেরা সেনাপতি পদেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান সেনাপতি, প্রবীণ বিচারপতি হিসাবে কায়স্থদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রথমে 'কায়স্থ' একটি রাজকার্যের বিভাগ ছিল মাত্র। ততদিন পর্যন্ত দলে দলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং অনার্যেরা পর্যন্ত সুবিধা পেলেই নিজেদের বর্ণগত জীবিকা ছেড়ে দিয়ে এই সরকারী চাকুরীর জীবিকা গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এই জীবিকাগত সম্প্রদায় একটি জাতিতে পরিণত হয়ে গেল, তখন নতুন রিক্রুট একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। প্রথম প্রথম 'কায়স্থেরা' জীবিকা গ্রহণ করেও নিজের নিজের জাত বাঁচিয়ে রাখতে পারতো। কিন্তু তারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় থাকলেও জীবিকার জন্য স্বসমাজে একটু নিন্দনীয় হতো। বর্তমানেও 'অশূদ্র প্রতিগ্রাহী' বলে অনেক ব্রাহ্মণ দম্ভ করে থাকেন এবং নিম্নজাতির পৌরোহিত্য করার কারণে সে ব্রাহ্মণ বৃহত্তর ব্রাহ্মণ সমাজের কাছে সম্মান পায় না (যেমন চাঁড়াল-বামুন)। জ্যোতিষ আয়ুর্বেদ এবং অস্ত্রবিদ্যা গ্রহণ করলে সে ব্রাহ্মণকে সভেদ নিমন্ত্রণ বন্ধ করার বিধান সৌরপুরাণে দেওয়া হয়েছে। কায়স্থ সমাজ জাতিতে পরিণত হবার পর নতুন ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয়-এর ভেতর এসেছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের জাত ছেড়ে দিয়ে নতুন জাত নিতে হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মার সময় বাঙলাদেশে রাজস্ব ও হিসাব কার্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের নাম পাওয়া যায়। পুণা, নাসিক এবং সাতারা জেলায় এখনও এক শ্রেণীর কায়স্থ আছে যারা আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মণ। তারা তাদের কায়স্থ-ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়।

ভারতীয় কায়স্থরা মূলে যে জাতিই হোক, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের একটা মিলিত সংস্কৃতি কায়স্থ সমাজের মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং দলে দলে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা এই সমাজে প্রবেশ করে এসঙ্গে আচার অনুশীলন সংস্কৃতির ব্যাপারে রূপান্তরিত করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—গোত্রান্তরে বিবাহ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের মত কায়স্থেরও স্বগোত্রে বিবাহ হয় না, কিন্তু নবশাখ প্রভৃতি অন্যান্য জাতির ব্রাহ্মণ্য গোত্র থাকা সত্ত্বেও স্বগোত্রে বিবাহ চলে, বাঙালী কায়স্থদের সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য।

মাথার খুলি ও নাকের গঠন তুলনা করলে বঙ্গীয় কায়স্থ ও উত্তর ভারতের কায়স্থদের মধ্যে সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। বাঙলার ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বরং বাঙলার কায়স্থদের আবয়বিক সাদৃশ্য বেশী।

কায়স্থশাসিত দেশ যদি বলতে হয়, তবে সবচেয়ে আগে বাঙলা দেশের কথাই উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশ স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন কায়স্থ ভূইয়াঁদের দ্বারা শাসিত হতো। মোগলশক্তি কায়স্থের এই আধিপত্য বিনষ্ট করে অপেক্ষাকৃত সুবাধ্য এবং ভালমানুষ ব্রাহ্মণদের হাতে শাসনকার্যের ভার তুলে দেন। তার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। আকবরের দরবারী ঐতিহাসিক আবুল ফজলের অভিমত এই যে, কায়স্থেরাই প্রায় দু'হাজার বছর ধরে বাঙলা দেশ শাসন করে আসছে। এই উক্তি কিছুটা অতিরঞ্জিত। যেন পাল, গুপ্ত এবং বর্মা প্রভৃতি এক-একটি বিরাট সাম্রাজ্যক্রমের কথা মনে করেই আবুল ফজল সম্ভবত ওকথা লিখেছিলেন।

গল্প আছে যে, দশম শতাব্দীর শেষ দিকে আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আমদানি করেন। কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বাঙলায় কায়স্থদের উল্লেখ পাওয়া যায় (ঘোষ, দত্ত, মিত্র ইত্যাদি)। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে নিজের নিজের পর্যায়ের যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তাতে তাদের একই সময় আগমনের কথা ভুয়ো প্রমাণিত হয়। একাদশ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর এমন সব বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের নাম তাম্রলেখ বা শাসনগুলিতে পাওয়া যায়—যারা ঐ কান্যকুব্জের পাঁচটি ব্রাহ্মণদের কারো বংশধর নয়। বাঙলাদেশে অবশ্য উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আমদানী হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাস ঐ কল্পিত বংশবৃক্ষের কাহিনীকে সমর্থন করে না।

কায়স্থদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার আবির্ভাবও এক রহস্য। এটা যেন রাজাদের কীর্তি বলে মনে হয়। পাল রাজাদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করার জন্য সেনেরা কায়স্থদের হাত করতে চেয়েছিল। ব্রাহ্মণসুলভ এই আভিজাত্যের (আধুনিক খেতাবের পেছনে এই ধরণের মনস্তত্ত্ব হয়তো রয়েছে) আকর্ষণে কিছু কায়স্থ সেন রাজাদের দিকে ভিড়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে সেন আধিপত্য নষ্ট হবার পর (মুসলমান আগমন) কায়স্থেরা পাইকারীভাবে কুলীন হয়ে যায়, অর্থাৎ তারা নিজেদের কুলীন বলে ঘোষণা করে এবং তাতে বাধা দেবার মত রাজশক্তি তখন ছিল না। কিন্তু সেন রাজারা পূর্ববঙ্গে আরও কিছুকাল শাসন চালায় এবং সেখানে

কুলীন হবার অবাধ অধিকার ছিল না। তাই পূর্ববঙ্গে কুলীন কায়স্থের সংখ্যা কম। পূর্ববঙ্গে ঘোষ মিত্র প্রভৃতি কুলীন উপাধিধারী অনেক বংশ আছে যারা কুলীন নয়। উত্তরবঙ্গে সেন রাজাদের প্রতিপত্তি ছিল না, তাই সেখানে কায়স্থের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা আমদানি হতে পারে নি।

বাঙলায় সামাজিক ইতিহাসে কায়স্থেরাই দিক্‌পাল। সেই সেন রাজারা আজ নেই, রাজনীতিক কারণে সেই কৌলীন্য খেতাবের প্রয়োজনও আজ নেই। কিন্তু কায়স্থ সমাজ বাঙলা দেশে সমাজের নায়ক হিসাবে বাঙলার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এ ঐতিহ্য আজকের নয়। গ্রীক আগমনের সময় হতে প্রগত সমাজনীতির সঙ্গে বুদ্ধির চর্চা, কর্মোদ্যম ও মনীষা ভারতের যে সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করে এসেছে, তারাই কালক্রমে কায়স্থ জাতিতে পরিণত। বাঙলাদেশে কায়স্থের অভ্যুদয় বিস্ময়কর। রঘুনন্দনের বিধান এবং স্মৃতিকর্তাদের নানা বিধি নিষেধের শাসন কায়স্থ অভ্যুদয়কে আটকে রাখতে পারে নি। শাস্ত্রে কায়স্থকে যে স্থানই দেওয়া হোক্, কাজের বেলায় কায়স্থ সমাজকে পরিচালনা করেছে, শাস্ত্র গড়েছে, যুদ্ধ করেছে, সর্ববিধ intellectual সাধনায় তৎপর হয়েছে। ইংরাজ আগমনের পরেও সমাজ সাহিত্য শিক্ষা রাজনীতি আইন এবং শিল্প বিজ্ঞান ও ব্যবসায়ে কায়স্থ একাধারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রতিভাকে আত্মস্থ করে সমাজের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছে। কায়স্থেরাই আজ আইন গড়ছে—প্রতিবিধান দিচ্ছে। কিন্তু গরুড় পুরাণের ক্ষোভ এখনও একেবারে শান্ত হয় নি। বাঙলায় বিংশ শতাব্দীর শাস্ত্রকার ও স্মৃতিকার যে কায়স্থ, তারাই নাকি শূদ্র। হাজার বছর আগের স্মৃতিকারের পোকাপড়া পুঁথির লেখার জোরে এই ফতোয়া বাঙলাদেশে জাহির করা হয়েছে। ···পুরাণের বিকৃত বিবরণ নিয়ে কোন কোন ব্রাহ্মণপ্রবর অবশ্য বাঙলার কায়স্থকে শূদ্র আখ্যা দিয়েছে। কিন্তু জনসমাজে প্রচলিত 'বামুন-কায়েত' কথাটির মধ্যেই উভয় সম্প্রদায়কে পাশাপাশি স্থান দেওয়া হয়েছে। বাঙলার কায়স্থ যে মর্যাদা পেয়েছে, ব্রাহ্মণ তার চেয়ে বেশী কিছু পায় নি।

আর একটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয় হলো যে—বাঙলা দেশে ক্ষত্রিয় নেই। কেন নেই? ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার অন্যতম ক্ষেত্র বাঙলা দেশ, যেখানে বর্ণাশ্রম থাকার কথা, সেখানে ক্ষত্রিয় নেই কেন? এর কয়েকটি কারণ আছে। উত্তর ভারত থেকে বাঙলা দেশে কোন ক্ষত্রিয় অভিযান সফল হতে পারে নি। বাঙলার আদিবাসীরা আর্য ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে লড়বার মত যথেষ্ট শক্তি রাখতো। তারপর হূণ আক্রমণ শেষ হয়ে যাবার পর যখন উত্তর ভারতে রাজপুত অভ্যুত্থান হলো, তখনো সেই নব ক্ষাত্রবীর্যের ঢেউ বাঙলা দেশকে প্লাবিত করতে পারে নি, কারণ বাঙলা দেশের মাটীতেই তখন পাল শৌর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পাল রাজারা প্রধানত বৌদ্ধ ছিলেন। বাঙলাদেশ বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বড় আড্ডা ছিল। কাজেই রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বাঙলা দেশে হতে পারে নি।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলা ও তাম্রলিপিগুলি হতে জানা যায় যে, সে সময় বাঙলার কায়স্থরা যথেষ্ট প্রতিপত্তিশীল ছিল, রাজকর্মচারীরা অধিকাংশই কায়স্থ ছিল, ভূমির স্বত্ব প্রভৃতি নির্ণয়, বিচার এবং বিলি তাদেরই ওপর নির্ভর করতো। এই সব লিপিগুলি থেকে সেকালের কায়স্থদের নাম পাওয়া যায়—মতি দত্ত, জয় নন্দী, গুণ চন্দ্র, সোম ঘোষ, বীর পাল, বন্ধু মিত্র প্রভৃতি। উপাধিগুলি থেকেই প্রমাণিত হয় না যে, সে সময় বাঙলা দেশে কায়স্থ নামে একটি জাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কেননা এই উপাধিধারী ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের

নামও পাওয়া গেছে। এগুলি পরিবারগত উপাধি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে কায়স্থেরা জাতিগঠন করে এবং ঐ উপাধিগুলি জাতিগত হয়ে পড়ে। ফলে যে জাতিরই ঐ উপাধি ছিল, তারাই কায়স্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

উত্তর ভারতে ঠিক যে পদ্ধতিতে অনার্য প্রভৃতি সম্প্রদায় হতেও ক্ষত্রিয় সমাজে লোক আমদানী হয়েছে, বাঙলা দেশেও কায়স্থ সমাজ সে পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে। তবে পুরোদস্তুর গুণকর্মের মর্যাদা রেখে এই রিক্রুটমেন্ট চলেছিল। 'জাত হারালেই কায়েথ' কথাটা কেউ হয়তো রাগের মাথায় সৃষ্টি করেছে নিন্দের জন্যে। কিন্তু কথাটা ঐতিহাসিক সত্য এবং প্রশংসার বিষয়। শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান হয়েই সবশ্রেণীর লোক কায়স্থ সমাজে 'উত্তীর্ণ' হয়ে মিশে যেত। তাই একে ঠিক জাত হারানো বলা যায় না, সু-'জাত' লাভ করা বলা চলে।

রঙ্গিণী প্রতিধ্বনি

'ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে'—কথাটা কিন্তু আংশিকভাবে সত্য। প্রতিধ্বনিকে শুধু ব্যঙ্গবিলাসী বললে তার ওপর অহেতুক অপবাদ আরোপ করা হয়। কবির কথা কেড়ে নিয়ে প্রতিধ্বনি বরং সগর্বে বলতে পারে—'আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশী করি দান, আমি গাই গান।'

গ্রীক পুরাণে প্রতিধ্বনির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সুন্দর দুটি উপাখ্যান আছে। এক তরুণী তার প্রেমাস্পদ নার্সিসাসের বিরহে দিন দিন তনুক্ষীণ হয়ে অবশেষে কর্পূরের মত উবে যায়—পৃথিবীতে পড়ে থাকে সমস্ত আকুলতা নিয়ে শুধু তার কণ্ঠস্বর। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি এই।—তরুণীটি প্যানের প্রেমনিবেদন উপেক্ষা করে, ফলে রাখালেরা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে মাটিতে পুঁতে দেয় ; কিন্তু ধরিত্রী তাকে তার গান গাইবার ক্ষমতাটুকু ফিরিয়ে দেয় তাই সে অশরীরী, কিন্তু অস্বরী নয়।

* * *

আধুনিক যুগের দুই-একটি রচনা ছাড়া বাঙলা কাব্যে প্রতিধ্বনির উল্লেখ বিরল। বাঙলা কাব্যে পাই নদীর জোয়ার ভাঁটা আর বান ; ঈশানী মেঘ, কালবৈশাখী, গোধূলী আর শুকতারা ; কিন্তু প্রতিধ্বনির অস্তিত্ব নেই বললেও চলে। এর কারণস্বরূপ বলতে পারা যায় বাঙলার মাটির গঠন বা ভৌগোলিক চরিত্র। বাঙলার অবারিত মাঠ আর ডাঙ্গায়, আর আলবাঁধা সুসমতল ধানের খেতে প্রতিধ্বনির সে সুযোগ নেই যে সে বিচিত্ররূপিণী হয়ে উঠতে পারে। শুধু পদ্মার মাঝীরাই কিছু কিছু জানে তার ভাটিয়ালির শেষ কলিটিকে প্রতিধ্বনি কেমন করে অপূর্ব মূর্চ্ছনায় বাতাসে জাগিয়ে রাখে।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রতিধ্বনিকে প্রকৃতির রেডিও স্টেশন নামে অভিহিত করেছেন। আমাদের কবি মাইকেল প্রতিধ্বনির বন্দনায় বলেছেন—

বুঝিলাম এতক্ষণে কে তুমি ডাকিছ
আকাশনন্দিনী
পর্বত গহন বনে বাস তব বরাননে
সদা রঙ্গ রসে তুমি রত হে রঙ্গিণী।

এখানে কবির সঙ্গে সায় দিয়ে বলতে দ্বিধা নেই যে, প্রতিধ্বনির কীর্তি ব্যঙ্গ নয় ; রসই প্রতিধ্বনির প্রাণতন্ত্রী, আর এতে বিজ্ঞানেরও পূর্ণ অনুমোদন আছে।

• • •

সুপ্রাচীন দিনের অরণ্যচারী বর্বর মানুষ প্রতিধ্বনির ভিতর মূঢ় বিস্ময় নিয়ে শুনত অজ্ঞাত লোকের আহ্বান, কখনও বা শঙ্কাতুর হয়ে উঠত তাদের অত্যাত্মপরায়ণ মন ; বিবিধ পূজার্চনায় ও যাদুমন্ত্রে তাকে প্রসন্ন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত।

নিখিলের কবি ও কোবিদ সমাজের চিন্তা ও কল্পনাকে প্রতিধ্বনি চিরকাল উজ্জীবিত করে এসেছে, কখনও বা করেছে অভিভূত। প্রতিধ্বনির মধ্যে সত্যই এমন একটা দূর রহস্যের বার্তা নিহিত আছে যা স্বভাবত প্রত্যেককেই বিমুগ্ধ করে। কে যেন আমাদের গানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেক কলিটিকেই সুর মিড় মূর্চ্ছনা সমেত সে ফিরিয়ে দিচ্ছে একে একে। কবি মাইকেল এই কারণে প্রতিধ্বনিকে 'নিরাকারা ভারতী' বলে সম্বোধন করেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতায় আমরা পড়েছি—'শচীমাতা ডাকে নিমাই নিমাই, প্রতিধ্বনি বলে নাই নাই নাই'। বিচিত্র-কীর্তি প্রতিধ্বনি সত্যই সময় সময় এমনি অঘটন ঘটিয়ে ছাড়ে , 'নিমাই'কে 'নাই' ক'রে দেওয়া তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।

• • •

'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নায়কের মুখে আমরা শুনেছি—'আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম—ঝর ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কী সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না , কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জন, কোথাও বা নূপুরের নিক্কন, কখনও বা বৃহৎ তাম্র ঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ , অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুন ঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচায় বুলবুলির গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।'

পরিত্যক্ত নির্জন পাষাণপুরীর হর্ম্যোদরে এই ধরনের একটা মায়াবী প্রতিধ্বনি লুকিয়ে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ব্রজাঙ্গনার বিলাপ, প্রতিধ্বনিকে মিনতি ক'রে বলছে—

কহিও গোকুল কাঁদে, হারাইয়া শ্যাম চাঁদে
রাধার রোদন ধ্বনি দিও তার গায়ে।

মানুষের কল্পনার ও প্রতিধ্বনির এই মিতালী আজকের নয়, এ বহু যুগের বন্ধন।

কৌকুর্য

চাণক্য কুকুরের প্রশংসা করেছেন। মানুষের পিছু পিছু চলে কুকুর স্বর্গ পর্যন্ত পৌঁছেছে। আকাশের কোন কোন নক্ষত্র-ঋষিও কুকুরকে সঙ্গী করে মহাশূন্যে বিচরণ করে থাকেন। বুঝতে পারছি, স্বর্গে, মর্ত্যে ও মহাব্যোমে, যেখানেই মানুষ অগ্রসর হয়েছে, কুকুর তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। মানুষের গা ঘেঁষে থাকবার এত বড় নিষ্ঠা দ্বিতীয় কোন জীবের নেই। মনে হয়, ইতিহাসের অতিদূর বিস্মৃত দিবসে, যেদিন বনবাসী মানুষ প্রথম বন ছেড়ে নদীতটে এসে বাসা বাঁধল, এই কুকুরও তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। আজও পৃথিবীতে বন্য কুকুরের চেয়ে বোধ হয় বন্য মানুষ সংখ্যায় বেশী। মানুষের সেই আদিম পর্ণকুটীর আজ কালক্রমে অট্টালিকায় রূপান্তরিত হয়েছে, মানুষ স্বয়ং কত বদলে গিয়েছে, কিন্তু যে প্রীতি-পুলক ও বিশ্বস্ততা নিয়ে কুকুর বর্বর মানুষের আঙিনার দরজায় ঘুমিয়েছে, আজও তার পরিবর্তন হয়

নি। আজিকার মর্মর প্রাসাদের স্তম্ভ ও প্রাচীরের ছায়ায় লক্ষ বছরের প্রহরীর ধর্ম নিয়ে আজও সেই কুকুর ঘুমিয়ে থাকে। মানুষের সংসারের শত সহস্র বিপ্লব, পরিবর্তন ও উন্নতির সাক্ষী হয়েও বেচারা কুকুর স্বয়ং দীন হয়ে রয়েছে।

* * *

নিমন্ত্রণবাড়ীতে আলো জ্বলে উঠেছে। অতিথি সমাগমে, চাঞ্চল্যে ও কলরবে গৃহাবাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। সঙ্গীত ও বাদ্যের সুনিনাদ শোনা যায়। ভোজ্যদ্রব্যের সুরভি বাতাসে ছুটাছুটি করে। অতিথিদের রসনা লালায়িত হয়। লক্ষ্য করে দেখুন, এই প্রমোদবিহ্বল জনতার সীমানার ঠিক বহিঃপার্শ্বে আপনার বহু যুগের সঙ্গী নীরব প্রতীক্ষায় বসে আছে। আপনার কুকুর, আপনার উৎসবের সকল উপভোগ্যগুলির উপর সে ভাগ বসাতে আসে নি। আপনি যখন উদরপূর্তি করে ঢেঁকুর তুলে ভোজনের আসর হতে উঠে যাবেন, তখন আপনার প্রসাদটুকু পেয়ে পরম পরিতৃপ্ত হবার জন্য যে এগিয়ে আসবে, সে একটি কুকুর।

* * *

দূরতীর্থে মেলায় বা মন্দিরে দেবদর্শনে যেতে হবে, কেউ সাথী নেই, একা একা ধূলি-ধূসরিত রৌদ্রতপ্ত পথে পথিক চলেছে। পথিপার্শ্বের বৃক্ষে পাখীর দল হয়তো কচিৎ ডেকে ওঠে, ক্ষুদ্র একটি বাতাসের হিল্লোল অকস্মাৎ পল্লবকুঞ্জ হতে বের হয়ে আপনার দেহ স্পর্শ করে চলে যায়, কিন্তু কেউই একান্তভাবে আপনার আত্মীয় হয়ে দেখা দেয় না, তারা মুখোমুখি একটা সাড়া দিয়ে যায় মাত্র। কিছুক্ষণ পরেই দেখবেন, আপনার পিছু পিছু একটি জীব হেঁটে আসছে, আপনার সঙ্গ নিয়েছে। কোন উপহারের সে প্রত্যাশা করে না। কোন প্রাক্তন কৃতজ্ঞতার বন্ধনও ছিল না, তবু সে নিতান্ত আপনার একাকিত্বের বিষাদ মুছে দেবার জন্য উপস্থিত হয়েছে। সে একটি কুকুর।

* * *

গভীর শীতের রাত্রি। কোন প্রিয়জনের শব স্কন্ধে বহন করে চলেছেন। পথে বাতি নেই, পথ দেখিয়ে দেবার জন্য কোন গাইড নেই। নিশীথের অন্ধকার আপনার শোকার্ত মনের মতই ঘনিয়ে রয়েছে। সেই ভয়াবহ নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনি নীরবে পথ অতিক্রম করছেন। হঠাৎ দেখবেন, আপনার পাশে পাশে একটি ক্ষুদ্রকায় জীব লাঙ্গুল দুলিয়ে চলেছে। কান খাড়া করে অন্ধকারের যত অবান্তর শব্দকে শুনছে এবং পরমুহূর্তে ছুটে চারিদিক তদারক করে আসছে; একে আপনি পূর্বে কখনও দেখেন নি। মৃত ব্যক্তিও এই শ্মশানবন্ধুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে জীবনে কখন ভাবেন নি। তবু সে এসেছে, সে একটি কুকুর।

* * *

এক জনশূন্য পরিত্যক্ত গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন। এক উজাড় গ্রাম। কুটীরগুলি গলে গিয়েছে, জঙ্গলে চারিদিক আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। যেখানে প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেখানে ইষ্টকের স্তূপ ও কন্টকবন। কোন মানুষ নেই, কোন সাড়া নেই, পুকুরের ঘাটে জলকলরব, বা কাঁকন ধ্বনিও নেই। লক্ষ্য করে দেখুন, একটি জীব উৎসাহের সঙ্গে এই ধ্বংসাবশেষের ভিতর হতে বের হয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে আসছে। গ্রামের মানুষ চলে গিয়েছে, কিন্তু গ্রামের এক বিদেহী আত্মাকে পাহারা দেবার জন্য যে আজও রয়ে গিয়েছে, সে একটি কুকুর।

• • •

জঙ্গলের পথে সাহসী সাঁওতাল শিকারী একা একা তীরধনুক হাতে নিয়ে চলেছে। সাথী কেউ নেই। অরণ্যের প্রতিটি শব্দের প্রতি লক্ষ্য রেখে সম্মুখে পশ্চাতে সাবধানী দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাঁওতাল চলেছে। কোথায় কোন্ ঝোপের আড়াল হতে লোলুপ বাঘের এক জোড়া কপিশ চক্ষুর হিংস্র দৃষ্টি সাঁওতাল শিকারীর শোণিতের আস্বাদ গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে, কে জানে! কে চিনিয়ে দেবে, কে এই প্রচ্ছন্ন মৃত্যুর ছদ্মবেশ ধরিয়ে দেবে? পার্শ্বরক্ষীর মত চীৎকার করে কে ডেকে ওঠে? কার সতর্কতায় সাঁওতাল শিকারী সতর্ক হয়? সে একটি কুকুর।

• • •

দীনহীন দুর্দশাগ্রস্ত ভিখারী পথের এক পার্শ্বে ঘুমিয়ে রয়েছে, শূন্য থলিটি পড়ে আছে। ঘুমন্ত ভিখারী স্বপ্নের মাদকতায় ক্ষুধার জ্বালা ভুলে থাকে। তার জীবনে লক্ষ্য নেই, বেঁচে থাকবার প্রয়োজন নেই। শুধু বাঁচবার জন্যই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছে। যে কোন গাড়ী ঘোড়া বা মানুষের বুটজুতা, ওকে মাড়িয়ে মেরে ফেললেই বা ক্ষতি কি? ঠিক সময় বুঝে ঐ ভিখারীর পার্শ্বে আর একটি জীব ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। অসাবধানী হঠচারী পথিক ও গাড়ী ঘোড়াকে শাসিয়ে ধমক দেয়। ভিখারীর শূন্য থালায় একটিও অন্নকণা নেই, তবু বিনা লোভে, বিনা প্রতিদানের আশায় মাত্র নিজের প্রেরণাতেই সে এসেছে, নগণ্য ভিখারীর দুঃখিত জীবনকে আগলে রাখছে। সে একটি কুকুর।

• • •

মানুষের মধ্যেই যে মানুষ অভাজন ও অবজ্ঞেয় হয়ে রয়েছে, কুকুর তাকেও শ্রদ্ধা করে। ঐ যে একটি উলঙ্গ বদ্ধ পাগল পথ দিয়ে দৌড়ে চলেছে, জনতা হাসছে, হাততালি দিচ্ছে, কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ে পাগলকে আতঙ্কিত করছে। এই সময় সকলের চেয়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে চীৎকার করে সমগ্র নিষ্ঠুর জনতার আচরণের বিরুদ্ধে একটিমাত্র জীব প্রতিবাদ করে উঠবে, পাগলের সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে থাকবে। হাজার হাজার বছর ধরে কুকুর নামে এই জীবটিই, মানুষের সভ্যতা ও বর্বরতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, কখনো ত্যাগ করে যায় নি।

প্রাচীনের রূপ

ইন্দ্রপ্রস্থের মাঠে যে কেউ কোন নির্জন জ্যোৎস্নার রাত্রে একা ঘুরে বেড়িয়েছে, সেই জানে পুরনো ইট পাথরে, ভাঙ্গা প্রাচীরে, বিগলিত লুণ্ঠিত হর্ম্যের চূর্ণাস্থির মধ্যে কি প্রগাঢ় হিপ্নোটিক মোহ লুকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, কোন রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যদিনে পুরনো কবরের ছায়ায় যে কেউ কিছুক্ষণ বসেছে সেও অনুভব করেছে একরকমের আবেশ—ইতিহাসের আবেশ। ভগ্নস্তূপের রূপ নেই যাঁরা বলেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেন না। কোনারক, সাঁচী, এলোরা, অজন্তার সেই প্রাক্তন পরিপাট্য হয়তো এখন আর নেই। গোয়ালিয়র দুর্গের দিকে তাকালে মনে হয় ইতিহাসের একটা মণিময় উষ্ণীষ সেখানে ছেঁড়া ছেঁড়া হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! তার শ্রী বা গৌরব এক তিলও অপহৃত হয় নি। বটের চারা-গজান ফাটা গম্বুজ, হেলে পড়া মিনার, বাদুড় চামচিকার উৎপাতে বিরক্ত অতি প্রাচীন চৈত্য গুম্ফা আর সঙ্ঘারাম, অথবা কোন ভগ্ন দেবমন্দিরের ধূলিশায়ী আমলক, এ সবই

একরকমের প্রশান্ত সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন! পুরাতন জলুস হয়তো তার নেই, কিন্তু পুরাতন গরিমা নিশ্চয় আছে। বরং মনে হয় এই ভগ্নদশা তাকে আরও সমৃদ্ধ করেছে; নতুন এক গৌরবের প্রলেপ পড়েছে তার গায়ে। মানুষের ইতিহাসে যে কথা বলার ভার নিয়ে এইসব পুরাকীর্তি একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে বাণী এখনও স্তব্ধ হয় নি। কাল শুধু ক্ষয় করেছে তার চাপল্য, তার চটুলতা; আরও জ্ঞানঘন হয়েছে তার বাণী।

* * *

এখানেই আসল রহস্য—পুরাকীর্তি বিনষ্ট হতে পারে, নিশ্চিহ্ন হতে পারে—কিন্তু যতই গলে পচে পড়ুক না কেন, কদর্য্য কখনই হয় না। কি এমন শক্তি আছে এর ভেতরে যে জরাগ্রস্ত হয়েও এর গৌরব বা সৌন্দর্য্যের হ্রাস হয় না?

পুরাকীর্তিগুলি আসলে হলো অতীত সভ্যতার ভাববেদনার সন্তানের মত। সেকালের হৃদয়ের পরিচয় এই সব পুরাকীর্তির মধ্যেই সুরক্ষিত রয়েছে। কিসের আবেদনে, কোন্ শুভ সঙ্কল্পের তাড়নায় সেযুগের মানুষ ইট পাথরে তার প্রতিভাকে সমুৎকীর্ণ রেখে গেছে, তার অকপট পরিচয় পাওয়া যায় এর মধ্যে। এখানে এসে অতীতকে আমরা মুখোমুখি দেখতে পাই, অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য অনুভব করি। কানের কাছে সহস্র বৎসরের কীর্তি-স্মৃতি-কথার গুঞ্জরণ শুনতে পাই; ইতিহাসের আবেশে অভিভূত হই।

আজ যদি দেখতাম কোনারকের একটি পাথর খসে নি, কালের আঁচড় লাগে নি তার গায়ে, তাহলে কি হতো? কোনারকের গরিমা কি এক তিল বেশী উপলব্ধি হতো? অতীতের যে ভাবময় অধ্যায়টি কোনারকের স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে প্রতিমূর্ত হয়েছিল, তার পরিচয় লাভ কি সহজতর হতো? বরং উল্টো কথাই মনে হয়। আজ তাহলে দেখতাম শঙ্খঘণ্টারোলের উদ্দামতায়, ফুল চন্দন নৈবেদ্যের ঘটায়, পাণ্ডা পুন্যার্থী আর প্রসাদান্নলোভীর ভীড়ে ইতিহাসের সে বাণী কোথায় চাপা পড়ে গেছে। অতীতের সে শ্রদ্ধেয় রূপের পরিচয় আর খুঁজে পাওয়া যেত না। কোনারকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে যুগের সে বৈভব আর চোখের সুমুখে প্রকট হয়ে উঠতো না; চোখে পড়তো শুধু কোন মোহন্তের গদির খাঁটি সোনার মোটা মোটা পায়া।

* * *

কল্পনা করা যাক্, তাজমহলে কালের ঘুণ ধরেছে। এর 'সৌন্দর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে' ফাটল ধরেছে। বসরাই গোলাপের বাগ নিশ্চিহ্ন হয়ে জেগে উঠেছে কাঁটা গুল্মের আরণ্য সমারোহ। আগ্রা শহর আর নেই—জনতা আর জনপদ সরে গেছে বহুদূরে।

তাজমহলের এই ভগ্নস্তূপের কাছে এমনি এক পূর্ণিমা রাত্রে এসে বসা যাক্। কেমন দেখাবে এ তাজমহলকে? কুৎসিত না সুন্দর? জোর করেই বলা যায়, সেইদিনই তাজমহলের হৃদয়কে আমরা অনুভব করতে পারবো। তার রূপের গরিমা সেইদিনই ধরা দেবে বিচিত্র ব্যঞ্জনায়। শাজাহান আর তাজবিবি, ইতিহাস আর কিম্বদন্তী রূপকথার মত মধুর হয়ে দেখা দেবে সেদিন। সম্রাটের বেদনা বা প্রেমিকতার স্বরূপ সেদিনই লালিত্যে কারুণ্যে সমগ্র হয়ে ধরা দেবে। কিন্তু আজকের অটুট তাজমহলের প্রখর পাষাণের গাঁথুনিতে সম্রাটের হৃদয়ের ছাপ বড় হয়ে চোখে পড়ে না। আজ আমরা প্রথমেই দেখি এর শ্বেতমর্মর, পোখরাজ-নীলা-ফিরোজা-গুলনর খচিত পাষাণের বেদী আর জাফরি। অবাক হয়ে এর বাজার দর যাচাই করি।

* * *

ইন্দ্রপ্রস্থের মাঠে দাঁড়িয়ে সেই কথাই মনে হয়েছিল। মৃত নিকটজনকে স্বচক্ষে দেখার মত একটা মোহময় আনন্দ রয়েছে এই ভগ্নস্তূপের ভেতর—ইতিহাসের আত্মীয়তা অনুভব করার মত। তাই আজকের নয়াদিল্লীর সুরম্য হর্ম্যাবলীর মধ্যে ঐশ্বর্যের কেরামতি দেখে বিস্মিত হই, কিন্তু এর ঐতিহাসিক রূপ আজ ঠিক চোখে দেখে উপলব্ধি করা যায় না। ভবিষ্যতের কোন পথচারীর চোখে একদিন হয়তো নয়াদিল্লীর ভগ্নস্তূপ এমনি হিপ্নোটিক আবেদন নিয়ে দেখা দেবে। জীর্ণ এসেমব্লি ভবনের ইষ্টকস্তূপের মধ্যে, ভূলুণ্ঠিত স্তম্ভের শায়িত ছায়ার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর ভারতের সুখ দুঃখ বেদনার বিচিত্র এক মায়াঘন ছবি বোধ হয় সেদিন পথিকের অনুভবে মূর্ত হয়ে উঠবে।

হাভাতের সার্কাস

ডাল্টনগঞ্জের ধর্মশালা। নীচের তলায় একটা কুঠুরীতে শুয়ে ঘুমের জন্য শরীর আর মস্তিষ্কের কসরৎ করছিলাম। কিন্তু ওপর তলার এক ভদ্রলোকের কীর্তন গানের ঠেলায় ঘুমানো দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। রাত দুপুর পর্যান্ত ভদ্রলোকের সাঙ্গীতিক ব্যায়াম থামলো না দেখে বাধ্য হয়ে বাধা দিলাম।

—কে মশায় আপনি?

—আমায় চেনেন না?

—না।

—সে কি মশাই, আজ সাতদিন হলো এখানে ক্যাম্প করেছি।

—আপনি কি করেন?

—আগে থিয়েটারে ছিলাম। প্লুরিসি হবার পর থেকে ফিজিকাল ফীট দেখাই।

ভদ্রলোক কথা শেষ করে ভাঙা গলায় আর একটি রামপ্রসাদী ভেঁজে চুপ করলেন।

* * *

পরদিন সার্কাস দেখে এলাম। ভদ্রলোক পাগল নয়, মিথ্যাবাদীও নয়। সার্কাসে রকমারি খেলা দেখায়। মাটির দিকে মাথা ঝুলিয়ে, দড়িতে পা ফাঁসিয়ে নিয়ে লাউডগা সাপের মত দোলা খায়, আর একটা ভারি পিপেকে দাঁতে কামড়ে শূন্যে তুলে ধরে। শিরাল শুকনো ঘাড়টা সাপের ফণার ভঙ্গীতে মোচড় দিয়ে ওঠে। দাঁতে চাপা পিপেটা অজগরের ভোজ্য একটা মরা জানোয়ারের মত দেখায়। ভদ্রলোকের চোখ দুটো সেসময় লব্ধশিকার সাপের চোখের মতই কৃতার্থতায় চক্ চক্ করতে থাকে। দর্শকদের করতালির শব্দে সার্কাসের জীর্ণ তাঁবুটার তালিগুলি ফেটে যাবার উপক্রম হয়।

দৈবী কৃপা থাকলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে। কিন্তু অতি সহজ সরলভাবে কত বড় বড় মিরাকেল সুসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্লুরিসি রোগীকে ব্যায়ামবীর করে ছাড়ছে! কি সেই ভেল্কি, যার জোরে এরকম অঘটনও ঘটে যায়? যাদের শিব হওয়া উচিত ছিল, তারা বাঁদর হয়ে যায়?

বেশী সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন নেই। ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেই নিঃসংশয়ে বোঝা যাবে, এর মূলে রয়েছে মানবিক সভ্যতার সেই পরম দুঃখের কথা—অন্ন চিন্তা বা বেকার সমস্যা। শ্রম বিত্ত আর ভোগের এই অবিচারে উচ্ছন্ন সমাজে যোগ্যতা

অযোগ্যতা, প্রতিভা ও মূঢ়তার বাস্তুবিস্তার কোথায়? সেই আদিম ঔদরিক তাড়নায় দিশাহারা মানুষ ভেল্কি দেখাতে দেখাতে বোধ হয় একদিন নিউটনের নিয়ম উল্টে দেবে—মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ছিঁড়ে দিয়ে আকাশে ভেসে বেড়াবে পেটের ভাতের ভরসায়।

* * *

ছেলেদের উপকথার এক বইয়ে পড়েছিলাম বিচিত্র এক দেশের কথা। সেখানে সবই উল্টো। লোকগুলি দিনে ঘুমায়, রাত্রিতে কাজ করে। সূর্য জ্যোৎস্না দেয়, চাঁদের রোদে গা ঝলসে যায়।

সেই উল্টোপুরীর দু'একটা দৃশ্য কলকাতার রাজপথেই দেখা যায়। খোঁড়া রিক্সাকুলি অনেকে দেখে থাকবেন। যাকে যে কর্ম সাজে না, তাকেই সে করতে হয়, বেঁচে থাকার আনন্দটুকু বলি দিয়ে। এমন বাঙালী ভদ্রযুবক বিরল নয়—যাঁকে আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ শেষ করে ভেটেরিনারী স্কুলে ঢুকতে হয়েছে এবং সেখানে পাশ করে বের হবার পর সে হয়েছে ইন্সিওরেন্সের দালাল।

তবু আমরা শিশুকাল থেকে পড়ছি, শুনে আসছি—উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করে, পরিশ্রমের ফল আছে, অন্যায়ের প্রতিকার আছে। পুরুষকার আর অধ্যবসায়ের গ্যারাণ্টিড সাক্‌সেস্ অনেক শুনেছি। স্তোকবাক্য তৈরী আছে—from log cabin to whitehouse। যেদিন সে মোহ ভাঙে, তখন প্লুরিসি ধরে আর পেটের দায়ে দেখাতে হয় ফিজিকাল ফীট।

আমি চিনতাম ভজাকে। সংসার-যুদ্ধে অনেক বড় বড় বীরের কথা শোনা গেছে। ভজা তাদেরই একজন, যদিও সে বিখ্যাত নয়। আট বছর ধরে ভজা চাকরীর জন্য দরখাস্ত আর ইণ্টারভিউয়ের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে তার ভাগ্যের ভেলা ঠেলে নিয়ে চলেছে। তবু কোন কূলকিনারা হয় নি। তবে ভজাকে দেখেও সুখ হয়, আজ পর্যন্ত ওর উৎসাহে মন্দা এল না এতটুকুও। ভেতো ভদ্র বাঙালীরও এরকম ইস্পাতের মেরুদণ্ড থাকে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিশ্বাস ছিল ভজা কিছু একটা করবেই।

বছর তিনেক পরে আবার দেখলাম ভজাকে। এইবার দেখলাম ম্যাজিক।

মল্লিকবাজারের কাছে ফুটপাতের এক পাশে কালো সুট পরে ভজা ম্যাজিক দেখাচ্ছে। একটা খুব বড় ভীড় জমে উঠেছে। ভজার মুখে যেন বাল্মীকি ভর করেছে—কত ছড়া বুকনি আর ভাষার তোড়! ভজার হাতে ভানুমতীর কৃপা ঝরে পড়ছে যেন। তাস ওড়াচ্ছে, টাকা গিলছে, শুক্‌নো আমের আঁটিতে দুমিনিটে চারা গজিয়ে পাকা আম ফলিয়ে দিচ্ছে। ভজার হাতের মংকি স্কাল আর ম্যাজিক স্টিক সকল বাস্তবতাকে উড়িয়ে দিচ্ছে ইন্দ্রজালের ঝড়ে। সমস্ত দর্শকের মন উধাও হয়ে গেছে এক অসম্ভবের রাজ্যে।

কড়কড়ে একটা দশ টাকার নোট কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে সরা চাপা দিয়ে রাখলো ভজা। সিদ্ধ সাধকের মত দুর্ধর শক্তির প্রেরণায় ভজা আবেগপ্লুত স্বরে বললো—দাঁড়িয়ে দেখুন, একটি জ্যান্ত নীল পায়রা আস্ত নোটটি মুখে করে বেরুবে ঐ সরা থেকে। কিন্তু তার আগে…।

* * *

ভজা থলি থেকে বের করলো দাঁতের মাজন—এক আনা প্যাকেট।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি, ভজা হাঁকছে—এক আনা প্যাকেট দাঁতের মাজন।

মুহূর্তের মধ্যে অমন জমাট ভীড়টা ভেঙে কেয়োর মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে ভজার আবেদন তাদের আর আটকে রাখতে পারছে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে আসর খালি হয়ে গেল।

দাঁতের মাজনের প্যাটেকগুলি থলিতে ভরে নিয়ে একটা তৃপ্তির শ্বাস ফেলে ভজা বিড়ি ধরালো। যাদুকরা নোটের কুচিগুলো তখনো সরাচাপা রয়েছে। ভজা চুপ করে দাঁড়িয়ে সরাটার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলো ; ঐ সরা ঠেলে কোন নীল পারাবত তার সৌভাগ্যলিপি চঞ্চুপুটে তুলে ধরে যদি সত্যই এসে যায়। ভজা বোধ হয় তাই দেখছিল।

ভাষাগুণ

অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ছে। স্কুলে পণ্ডিত মশায় উদাহরণ তুলে বোঝাচ্ছিলেন, গুরুচণ্ডালী ভাষা কাকে বলে। পণ্ডিত মশায় পুরাতন একটি বাংলা কবিতা উদ্ধৃত করলেন—

'ঈশাক্ষের উযর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার॥'

এই অর্থ বুঝতে বেশী কষ্ট পেতে হয় না। কাছে একটা অভিধান থাকলেই হলো। তা হ'লেই বোঝা যাবে এর অর্থ ; অর্থাৎ হরকোপানলে মদনদেব পুড়ে গেলেন, এদিকে স্বর্গেতে দেবতাদের মধ্যে হাহাকার জেগে উঠলো। পণ্ডিত মশায় ছাত্রদের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন—এর অর্থ আছে, তবু এটা কবিতা নয়। এ ভাষা গুরুচণ্ডালীর চেয়েও অধম। এ হলো খাঁটি চণ্ডালী ভাষা।

* * *

সেই থেকে মনে একটা প্রশ্নের দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। কবিতার সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক কি? সাহিত্যের ভাষার রূপ কি রকম? দুর্বোধ্যতা বা অবোধ্যতা থাকলেই কি সেটা আর কবিতা হলো না?

প্রাচীন বাংলার কোন অজ্ঞাতনামা কবি অভিধান ঘেঁটে কতকগুলি অপ্রচলিত (সুতরাং দুর্বোধ্য) শব্দ দিয়ে যে ভাষা বুনেছেন, তাকে পণ্ডিত মশাই বললেন চণ্ডালী ভাষা। কেন? এদিকে দেখি, মাইকেল মধুসূদনও সেই কাজটি করেছেন—

'পরিল বক্ষে কবচ সুমতি তারাময়। সারসনে ঝল ঝল ঝলে ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে। রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে ফলক ; দ্বিরদ-রদ-নির্মিত, কাঞ্চনে জড়িত, তাহার সঙ্গে নিষঙ্গ দুলিল শরপূর্ণ।'

এখানেও দেখছি অনেকগুলি অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার। কিন্তু একে চণ্ডালী ভাষা বলতে পারে কে? পাঠক একে আবৃত্তি করে এর মাধুর্য্য সহজে উপভোগও করে। এমন কি, এর অর্থ বুঝতেও তাকে বেগ পেতে হয় না।

* * *

তারপর আরও জানা গেল। অর্থহীন হ'লেই অকবিতা হয় না, উদাহরণস্বরূপ ধরা যেতে পারে বাংলার ছেলে ভুলানো ছড়াগুলিকে। শব্দ ও পদবিন্যাসের ধরণ বিবেচনা করলে এগুলিকে অর্থহীন বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়ার ভাষা ও রীতি আলোচনা করে বলেছেন—'ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই। সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে।'

একটি নমুনা ধরা যাক্—

'যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে
কাজি ফুল কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা
হাত-ঝুমঝুম পা-ঝুমঝুম সীতারামের খেলা।
নাচতো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে—
আলো চাল দেব টাপাল ভরিয়ে।'

সত্যি কথা, এর মধ্যে অর্থ নেই, ভাবের সঙ্গতি নেই ; নিতান্ত খাপছাড়া কতকগুলি ইমেজারির যোজনা। এর ছন্দের পুলকটুকু বাদ দিয়েও শুধু শব্দগুলির ঐশ্বর্য্য লক্ষ্য করার বিষয়। একে নিংড়ে অর্থ বের করবার জন্য কেউ মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করেন না। পদ ও পংক্তিগুলির মধ্যে পর পর কোন অর্থগত গাঁথুনির বালাই নেই। কিন্তু আবৃত্তি মাত্র একসঙ্গে শ্রুতিসুখের উদ্ভব ও মানসলোকে মেঘরৌদ্রের মায়াঘটার মত বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্যের সঞ্চার হয়। এই ছড়ার মধ্যে যদি কেউ ভাব খোঁজেন, তিনি তাও হয়তো পাবেন না। থাকলেও সেগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে।

আর একটি উদাহরণ দিতে পারা যায়। নিরক্ষর চাষা বা ছোট ছেলে সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রের আবৃত্তি মুগ্ধমনে উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে। সে এই মন্ত্রের কোন শব্দটিরই অর্থ বোঝে না। কিন্তু এই 'অর্থহীনতা' মন্ত্রের উপভোগ্যতার পথে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। কেন এটা হয়?

উত্তরে বলা যায় ছন্দ ও ধ্বনির গুণ। ছন্দের চমৎকারিতা না থাকলেও ধ্বনিগুণেই শব্দ অনেকখানি হৃদয় অধিকার করে, একথা সত্য।

* * *

ভাষার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারের ক্রম ধরে বিশ্লেষণ ক'রে এসে দাঁড়ালো—ধ্বনি। কিন্তু ধ্বনিকে কি শুধু শ্রুতিসুখের বাহন বা বাধা বলবো? এর কি অন্য কোন কীর্ত্তি নেই?

ধ্বনিকে ভাব ও অর্থের বাহন বলতে পারা যায়—নিঃসংশয়ে বলতে পারা যায়। ফিরিওয়ালাদের হাঁকের কথাই ধরা যাক্। এরা যে ভাষায় হাঁক দেয়, তার সব সময় কোন অর্থ থাকে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা উচ্চ স্বরগ্রামে একটি শব্দ ছাড়ে মাত্র। কিন্তু পণ্যের পার্থক্য অনুসারে হাঁকেরও তারতম্য হ'য়ে থাকে। ঘুঁটে ও লিচুর ফিরি ধ্বনির কোনটিরই অর্থ নেই ; কিন্তু ধ্বনির তারতম্য আছে। ধ্বনির তাল, লয়, বিস্তার থেকেই বোঝা যায়—কি জাতীয় জিনিস ফিরি হচ্ছে। সরবৎ ফিরি ক'রে বেচতে হ'লে হুঙ্কার দিয়ে হাঁক ছাড়বে, এমন বেরসিক ফিরিওয়ালা খুবই বিরল।

সাহিত্যগত ভাষার যে রসগুণকে আমরা কাম্য বলে মনে করি, তার ভিত্তি রয়েছে ব্যবহৃত শব্দ ও তার ধ্বনিগুণের ওপর। ভাব ও অর্থ পরের কথা। ভাষার রূপই হলো সবচেয়ে বড় ও আদি প্রয়োজন! এখানেই যদি ত্রুটি থেকে যায়, তবে তাকে আর সাহিত্যের আসরে স্থান পেতে হবে না। কবি লিখেছেন—'তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে।' এর মধ্যে অর্থ কোথায়? তিমির যে কি করে কাঁপে, তা বোঝা মুস্কিল এবং আলোর রবই বা কি রকম? কিন্তু কেউ কি বলতে চান, ঐ পংক্তিটির মধ্যে কবিত্ব নেই। এর আবৃত্তি মাত্র কি কোন ইমেজারি সৃষ্টি হয় না? সে ইমেজারি কি মনোজ্ঞ নয়? কিন্তু সকলেই বোঝেন,

ঐ নিরর্থকতা সত্ত্বেও পংক্তিটি কবিত্বে মণ্ডিত। অথচ পূর্বে উদ্ধৃত অর্থপূর্ণ পংক্তি দুটি (ঈশাক্কের ইত্যাদি) মনে বিরক্তি ছাড়া আর কিছু সৃষ্টি করে না।

* * *

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'সীতার বনবাস' কেমন হয়েছে—সেই সময়কার কোন বিখ্যাত পণ্ডিতকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—ও কিছুই হয় নি ; ওর সবই বোঝা যায়।

পণ্ডিত মশায়ের এই মন্তব্য থেকে কি সিদ্ধান্ত করতে পারি? এমন একটা সময় এসেছিল, যখন ভাষাকে প্রকাশকুশল করবার, তার দ্বারা রূপ সৃষ্টি করবার, তাকে আর্টের বাহন হিসাবে ব্যবহার করবার আদর্শ পণ্ডিত সমাজে অনাদৃত ছিল। দুর্বোধ্যতাই একটা অলঙ্কার হ'য়ে উঠেছিল। এ দুর্বোধ্যতা ক্রমে সত্যিকারের বীভৎস রসে ও বিরক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। একেই প্রকৃত রুচিবিকার বলা যেতে পারে ; নইলে শুধু দুর্বোধ্যতার জন্যেই যে আর্টের হানি হয় না, তা পূর্বে বলা হয়েছে।

কাশীরাম দাসের সাহিত্য প্রতিভাকে অভিনন্দন জানিয়ে মাইকেল একটি চতুর্দ্দশপদী কবিতায় লিখেছিলেন যে, গৌড়ের তৃষ্ণা মেটাবার জন্য পুণ্যবান কবীশ ভাষাপথ স্ববলে খনন করে সংস্কৃত হ্রদ থেকে ভারতরসের বিমল স্রোত এনেছিলেন। মাইকেল স্বয়ং এই পুণ্যকার্য করে গেছেন। কিন্তু এমন 'আধুনিক' বাংলা গদ্যের নমুনা দেওয়া যেতে পারে, যার মধ্যে সংস্কৃত হ্রদ থেকে যত শ্যাওলার আবর্জনা, জলো মাকড়সা আর পচা গুগলি শামুক আমদানি করা হয়েছে। টুলো পণ্ডিতের পোষা টিয়ার মুখে বেদান্তসূত্রের বিকৃত আবৃত্তির মত এই ভাষা শ্রুতিপীড়ক ও দুঃসহ।

রবীন্দ্রনাথের 'গল্পসল্প'-এর বাচস্পতি মশায় কি এমন খারাপ কাজ করেছেন? বাচস্পতি মশায়ও এমনি একটি গদ্যকর্তা ছিলেন। তাঁর মুখের সাধু ভাষার 'সধ্বংসৃণিত হার্দিক্যে বুদবুধিদের মন তিংতিড়ি তিংতিড়ি করে উঠেছিল।'

* * *

শুধু কি গদ্যের কপালেই এই দুর্ভাগ্য? পদ্যও বাদ যায় নি। কত রকমের কবিতা তো শুনে আসছি। ছেলে ভুলানো ছড়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও কবিতার অর্থ বুঝে খুশি হতে চাই না ; কিন্তু শুনে খুশি হতে চাই। শুনতে গিয়েই যদি মাথা জ্বলে যায়, তবে কবিতাকে ভয় না করে উপায় নেই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পের নায়ক রবিঠাকুরের মত নোবেল প্রাইজ পাবার আশায় অভিনব কবিতা লেখেন :

'ঘট্টে ঘট্টে দিক্করীগণ
ঘসিছে ঘৃষ্টগাত্রী—
জলজিধৃক্ষু পূর্ণিছে কেহ
পলঙ্করক পাত্রী॥'

একে কবিতা বলবেন কেউ? জানি সকলেই বলবেন, এটা প্রলাপ, যদিও বাংলা ভাষায় লেখা। কিন্তু কোন কোন আধুনিক বাঙালী কবির ভাষা থেকে ঠিক এইরকম তেরেকেটে ভাষার প্যারালেল প্যাসেজ উদ্ধৃত করা যায়।

রোমাণ্টিক

'খোঁপা আর এলোচুলে বাধিল বচসা।' ভাবের বাজারে রোমাণ্টিকে আর বাস্তবিকে যখন ঝগড়া বাধে, তখন কতকটা খোঁপা আর এলোচুলের বচসার কথা মনে পড়ে। বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের কি কোন সম্পর্ক নেই? অথবা, রোমান্স কি অবাস্তব? সমালোচকেরা রোমান্সের নিন্দা করেন। তাঁদের অভিযোগ, রোমান্স হলো বৈজ্ঞানিক মনোদৃষ্টির অন্তরায় ও বিরোধী। বুঝে ওঠা মুস্কিল, কিভাবে বিচার করে তাঁরা এই কথা বলেন। আমাদের তো মনে হয়, বস্তুকে বাদ দিয়ে রোমান্স হতে পারে না। রোমান্স বস্তুর অন্যতম অলঙ্কার। ক্লোরোফিল যেমন উদ্ভিদের হরিৎপ্রাণ সুষমা, ভাইটামিন যেমন খাদ্যের পুষ্টিপ্রেরণার আধার, রোমান্স তেমনই বস্তুর কল্পনা-রূপ। এই রোমান্সের হিরণ্ময় পাত্রের আবরণে সকল সত্যের মুখ অপিহিত। রোমান্স আগে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা উচিত, রোমান্সেরও প্রকৃতিভেদ আছে। স্থূল সূক্ষ্ম জটিল কঠিন ও রসাল—সকল শ্রেণীর রোমান্স আছে। জীবনের প্রত্যেক অনুভবের মধ্যে রোমান্সের লুকাঞ্জন মাখা। তবে, আমাদের কাম্য হ'ল বুদ্ধিমার্জিত রোমান্স। প্রত্যেক আর্টিস্টকে শুধু এইটুকু অবহিত হলেই চলবে।

* * *

বাস্তব বিজ্ঞান যেমন সত্য, 'অবাস্তব' রোমান্সও তেমনি সত্য। দুইই সম্ভব এবং আর্ট হিসাবে উপভোগ্য। কিন্তু আবেগের অবলম্বন না পেলে জীবনের সকল উপলব্ধি শুধু তথ্য ও প্রজ্ঞা মাত্র হয়ে পড়ে থাকে। আবেগের আশ্রয়ে কল্পনা সঞ্চারিণী বিদ্যুতের মত তথ্য ও তত্ত্বের অণুপরমাণুতে রূপের বৈভব প্রতিষ্ঠা করে। সত্যের রূপের উপর রোমান্সের কনকাঞ্চল আবরণ পড়ে। সত্যকে রূপে রূপে অভিনব করে দেখার এই রীতিকেই রোমান্স বলা যেতে পারে। এর সার্থকতা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই।

* * *

ইতিহাসের কাহিনী তথ্যের বিবৃতি মাত্র। কিন্তু ইতিহাসে রোমান্স আছে। সংবাদপত্রের ঘটনা যেদিন অতীত হয়ে ইতিহাসের পাতায় প্রবেশ করে, সেই দিন থেকে এক নূতন রূপের প্রলেপ পড়ে তার গায়ে। স্মৃতি ও বিস্মৃতির ভীড়ের মধ্যে ঘটনা রহস্যের কুয়াসা মেখে লুকিয়ে থাকে। কল্পনা নববধূর গুণ্ঠনের মত সেই আবরণ সরিয়ে নিজের দৃষ্টি প্রসারিত করে। সত্য রোমান্সে বিমূর্ত হয়ে ওঠে।

'কুমারসম্ভব'-এর কৃষ্ণসার মৃগ ঈষন্নিমিলিত নেত্রে সহচরীর গায়ে গ্রীবা ঘর্ষণ করে। কবির চোখে ভাবময় প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে। আমরা বলি, এ কবি রোমাণ্টিক। কিন্তু এর মধ্যে অবৈজ্ঞানিকতার কি আছে বুঝি না। কবি বলেছেন—'মোর উত্তরীয়ে, রঙ লাগায়েছি প্রিয়ে' শুধু কি এই কারণেই বাস্তবিকেরা কবিকে রোমাণ্টিক বলবেন?

খুব বেশী ব্যাখ্যা গবেষণা না করেও বলতে পারা যায়, রোমান্স মানুষের জীবনে অকাম্য নয়। এর মধ্যে অবৈজ্ঞানিকতা নেই ;সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর কোন প্রশ্ন আসে না। সাহিত্যে শিল্পে বিজ্ঞানে রোমান্স অবশ্য চাই। সমস্ত শিল্প সাধনার পেছনে রয়েছে সেই রোমান্সের তাগিদ, সত্যকে বিচিত্র রূপের পরিবেশের মধ্যে দেখা। রোমান্স মিথ্যার ছলনা নয়, সত্যের ছলনা।

কবিদের দ্রষ্টা বলা হয়। তারা না কি বনমর্মর, পাখীর কাকলি ও নদীর কলস্বনের ভাষা বোঝেন। সুতরাং কবি ও ভাবুকেরা প্রাকৃত সাধারণের চেয়ে এক ডিগ্রী বেশী রোমান্টিক। এ সিদ্ধান্ত সত্য নয়।

চাষীদের কথাই ধরা যাক্। বীজ শুকানো থেকে সুরু করে ফসল তোলার শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তারা লক্ষ উদ্ভিদ শিশুর লালন পালনে জল মাটি নিয়ে যে সাধনার পরিচয় দেয় তার মধ্যে আমরা শ্রেষ্ঠ রোমান্সের পরিচয় পাই। এ বিষয়ে মানব সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে চাষীদের চেয়ে বড় শিল্পী বোধ হয় আর কেউ নেই। খাঁটি বৈজ্ঞানিক রীতিতে পঞ্চভূতের আইন কানুনে বাঁধা তাদের ফসল ফলানোর ব্রত। প্রত্যেকটি ধানের চারা চাষার আপত্যে পুষ্ট শক্ত ও পরিণত হয়। মাঠভরা ধানের সবুজ চাষার দুচোখ নূতন স্নিগ্ধতায় কমনীয় করে তোলে। এ চাষাড়ে রোমান্স যে কোন কবিকল্পনার চেয়ে কম মহনীয় নয়। চাষার আবেগ বৈজ্ঞানিক রোমান্সের একটি নমুনা। এর মধ্যে কষ্টকল্পনার কটুতা নেই।

* * *

একটা ঘটনা মনে পড়ে, মধ্য কলকাতারই কোন একটা বিদ্যুতের স্টেশন। রাত্রিবেলা ফটকের কাছে দাঁড়ালে ভেতরটা দেখতে পাওয়া যায়—তেজী নীল আলোক সমস্ত মেশিন ঘরে ভিন্ চাঁদের জ্যোৎস্নার মত ফুটে রয়েছে। পালিশ করা প্রত্যেকটি মেশিনের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রচণ্ড সৃষ্টির পুলকে ঝক্ ঝক্ শব্দে অবিরাম কাজ করে চলেছে। তার মধ্যে কোথাও ছন্দোভঙ্গ নেই। সৃষ্টি তৎপর এই মেশিনের বিঘূর্ণন দেখবার মত।

মেশিন ঘরে কোথাও আড়ালে এক কোণে একটি লোক বসে ছিল। লোকটি গলা খুলে আলাপ করছিল বাগশ্রী। মেশিনের শব্দে গানের ভাষা বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু সমস্ত কারখানাঘর ছাপিয়ে এমন এক অপূর্ব মন্দ্রোল্লাস জেগে উঠলো যা কানে না শুনলে ধারণা করা যায় না। নীল আলোতে সুচিক্কণ চলৎ যন্ত্রের শব্দের সঙ্গে গায়কের বাগশ্রীর অদ্ভুত এক গীতিময় সংমিশ্রণ, যেন আগামী যুগের গায়ত্রী রূপ। সত্যিকারের 'যন্ত্রসঙ্গীত'-এর কিঞ্চিৎ পরিচয় পেলাম।

দুটি সামান্য ঘটনার সংমিশ্রণ—পাওয়ার হাউসের কলকব্জার শব্দ আর একজন শ্রমিকের বাগশ্রী আলাপ। মাত্র এই দুটি বস্তুর সমন্বয়ে যে রোমান্স সৃষ্টি হলো তার নমুনা সচরাচর পাওয়া যায় না। কিন্তু রোমান্সের সাধনা থামবে না। নতুন যুগে নতুন রোমান্স চাই।

জন্মাষ্টের বিষ্ণুপ্রিয়া

কনকদামিনী যিনি অঙ্গের বরণ
শতকোটী চাঁদ শোভে সুচারু বদন।
বেণী ভুজঙ্গিণী শোভে নিতম্ব উপরে
গ্রন্থিত কনকঝাঁপ বকুলের হারে।
কুটিল কুন্তল যেন ভ্রমরের পাতি
দুই গণ্ড ঝল ঝল মুকুরের ভাতি।
মৃগমদ বিন্দু শোভে চিবুক উপরে
সুরঙ্গ অধরে মৃদু হাস মনোহরে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই রূপ বর্ণনা গোস্বামী মশায় পড়ছেন সুললিত স্বরে। শত শত মুগ্ধ শ্রোতা

দু'কান ভরে সে আবৃত্তির মধু আহরণ করছে। হঠাৎ শুনলাম কে একজন বলে উঠলো—আহা কী সুন্দর!

কথাটা বলেছে শ্রীপতি বৈরাগী। এই শ্রীপতি বৈরাগীকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি। খঞ্জনী বাজিয়ে, গান গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভিক্ষে করে বেড়ায়। শ্রীপতি হ'লো জন্মান্ধ। মুদিত চক্ষু নিয়েই সে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পৃথিবীর এত রং, এত আলোছায়ার খেলা—জল বায়ু ওষধি গুল্মলতার বিচিত্র বর্ণ ও ছন্দের বিভঙ্গ কখনো তার চোখে ধরা পড়ে নি। সেই জন্যেই শ্রীপতির কথায় আশ্চর্য হলাম সব চেয়ে বেশী। এই জন্মান্ধ, তার মুখে 'আহা কি সুন্দর?' কি করে সে এই কথা বলে? সুন্দর অসুন্দরের ভেদ বিচার তার দ্বারা কি করে সম্ভব? বিষ্ণুপ্রিয়া যে এত সুন্দর, সেটা তার অনুভবে ধরা দিল কি করে?

এই প্রশ্ন থেকেই সৌন্দর্যতত্ত্বের কথা এসে পড়ে। রূপ কি? সৌন্দর্য কাকে বলে? কেন সুন্দর জিনিস দেখে দেহে মনে পুলকের আবেশ হয়? কোন্ ইন্দ্রিয় দিয়ে রূপের অনুভব সম্ভব হয়?

জন্মান্ধ শ্রীপতি বৈরাগীর ঐ উচ্ছ্বসিত উক্তি একটা শুধু কথার কথা, এ আমি বিশ্বাস করি না। কনকদামিনী, মৃগমদ বা বকুলের হার কি জিনিস, শ্রীপতি জীবনে তা কখনও উপলব্ধি করে নি। কিন্তু তা হলে হবে কি? চক্ষুষ্মান শ্রোতাদের মনে বিষ্ণুপ্রিয়া যে রূপে মূর্ত হয়েছে, শ্রীপতির মনের বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ ঠিক সেরকম হয়তো নয়। কিন্তু সেও একটা মূর্তি এবং সে মূর্তি সত্যই সুন্দর।

এ কি করে সম্ভব? রবীন্দ্রনাথের সুরদাসের প্রার্থনার কথা আমরা জানি—'ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূরতি পশেছে জীবন মূলে।' সুরদাসের এই কথার মধ্যে আমাদের প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যায়। রূপ কি অথবা সৌন্দর্য কি তা জানতে হলে চক্ষুই একমাত্র ইন্দ্রিয় নয়। প্রত্যেক বোধ এক একটা মূর্তির বাহন। শুধু চক্ষু নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধপ্রবাহ দিয়ে মনের মধ্যে নিমেষে নিমেষে চকিত পটক্ষেপের মত মূর্তির উত্থান লয় চলেছে। যখন বাতাসে অন্ধকারে বিলীন দূর বনভূমির অন্তর থেকে ফুলের গন্ধ ভেসে আসে, সে ফুলের নাম হয়তো আমরা জানি না, তাকে পূর্বে কখনো দেখি নি। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ঐ সুঘ্রাণেই মনের মধ্যে চকিতে একটি পুষ্পের রূপ জেগে ওঠে ; সত্যিকারের সে ফুলের সঙ্গে হয়তো তা মিলবে না। কিন্তু তবু সেটি মনের সকল অনুভব দিয়ে গড়া একটি ফুল এবং সে ফুল সুন্দর।

এমন কল্পনা করা যেতে পারে, জন্মান্ধ শ্রীপতি বৈরাগীর জগৎটি কিরূপ। বহিঃপ্রকৃতি তো তার কাছে একটি চিরতমসাবৃত রহস্য। কিন্তু শ্রীপতির নিজের একটি জগৎ আছে, সেও এমনি রূপে রসে উচ্ছল। সে চক্ষুধনে বঞ্চিত হতে পারে, কিন্তু গন্ধ স্পর্শ ও শব্দ তার কাছে অলব্ধ নয়। গন্ধস্পর্শশব্দের বিচিত্র অনুভব আস্বাদ ও ব্যঞ্জনায় গড়ে উঠেছে এই জন্মান্ধের মহামহিম জগৎ। সেখানেও আলো-ছায়ার খেলা আছে, হাসি-অশ্রুর রূপ আছে—সুন্দর-অসুন্দর আছে। কথকের প্রত্যেকটি উচ্চারিত শব্দে, ধ্বনির গুঞ্জরণে ও ছন্দের উল্লাসে শ্রীপতির মনের তন্ত্রীতে যে অনুভবের সুর ধরিয়ে দিয়েছে, তারই জালে সে ধরে ফেলেছে মূর্তিমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে।

* * *

রবীন্দ্রনাথ "মেঘদূত" প্রবন্ধে লিখেছেন—"আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে

আপনার মানস-সরোবরের অগম্য তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোন পথ নাই।"

দর্শনের কথা ছেড়ে দিয়েও সৌন্দর্যতত্ত্বের বিচারে এসে আমরা এই কথার যথার্থ বুঝতে পারি। রূপরসগন্ধস্পর্শে অভিষিক্ত যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেটা আমাদের অনুভবের জগৎ। প্রত্যেক অনুভব এক একটি কল্পনার তড়িৎ প্রবাহ উজ্জীবিত করে এবং তার ফলে মনোজগৎ যে বিচিত্র কল্পছবিতে ভরে ওঠে, সেইটাই আমাদের জগৎ। কোন বস্তুই আমাদের কাছে সুন্দর বা অসুন্দর নয়। বস্তু হতে বিচ্ছুরিত এই কল্পছবিগুলিই সুন্দর বা অসুন্দর।

আর একদিক দিয়ে এ কথাটা প্রমাণ করতে পারা যায়। যেমন, একজনের চোখে হয়তো কেউ সুন্দর, কিন্তু অপরের চোখে সে কুৎসিত। এ কি করে হয়? বস্তু তো একই। এখানেও সেই ইমেজারির সৃষ্টি হতে পারে। মৈমনসিং গীতিকার দুটি পংক্তি মনে পড়ে :

সোনার তরুয়া বন্ধু একবার পেখ
আমার নয়ন লইয়া তুমি নয়ন ভইর‍্যা দেখ।

'আমার নয়ন' অর্থ এখানে সেই অনুভবে গড়া নয়ন। নায়িকা যে নয়নে দেখেছে, সেই নয়নে দেখতে হবে। তবেই দ্রষ্টার চোখে সত্যিকারের সোনার তরুয়ার ইমেজারি ধরা পড়বে।

* * *

সকল সৌন্দর্যের মূলে রয়েছে অনুভূতি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় এর ব্যাখ্যা করেছেন— 'অনুভূতির বৈচিত্র্যপরম্পরা লইয়া চৈতন্য বা চিৎপ্রবাহ পঞ্চাশ রকম বিভিন্ন শব্দস্পর্শ-গন্ধের সমবায়ে জগতের যে দৃশ্যপট, তাহা ক্ষণে ক্ষণে বদলাইয়া নতুন নতুন শব্দ, নতুন নতুন স্পর্শ, নতুন নতুন গন্ধ সম্মুখে আনিতেছে; তাহাতেই চৈতন্যের ধারাবাহিক স্রোত এক টানে চলিয়াছে। চৈতন্যের অস্তিত্বের সঙ্গে অনুভব বৈচিত্র্যের এরূপ সম্বন্ধ; সুতরাং যেখানে চৈতন্য আছে, সেখানে এই বৈচিত্র্যও আছে। যেখানে বৈচিত্র্য পরিস্ফুট, চৈতন্যও সেখানে সম্যক বিকশিত; সেইখানেই রূপ ও সেইখানেই সৌন্দর্য।'

ত্রিবেদী মশায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা রূপতত্ত্বের কথা। এটা মনোবিজ্ঞানের দিক থেকেও সঙ্গত। এখন আমরা বুঝতে পারি, জন্মান্ধ শ্রীপতি বৈরাগীর সৌন্দর্যবোধের ভিত্তি কোথায়। যতক্ষণ অনুভূতি ও চৈতন্য আছে, ততক্ষণ সৌন্দর্যবোধ থাকবে। ইন্দ্রিয় এখানে শুধু গৌণ কাজ করে থাকে।

কেন সে সুন্দর?

সৌন্দর্য কাকে বলে, অল্প কথায় তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, সৌন্দর্য কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে শারীর সৌন্দর্য কি, সে বিষয়ে রূপতত্ত্বের দিক দিয়ে এবং বিজ্ঞানের দিক দিয়েও একটা উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে।

শারীর সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে নর ও নারীর পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা আসে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নরনারীর নিজ নিজ শারীর সৌন্দর্যের স্ট্যাণ্ডার্ড গড়ে উঠেছে পরস্পরের পছন্দ ও অপছন্দের ওপর ভিত্তি করে। নরের যেমন চেহারা হলে নারী তাকে পছন্দ করে, সেই চেহারাই নরের কাম্য; সেটাই তার কাছে রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড। নারীদের রূপের সম্বন্ধেও

একথা প্রযোজ্য। এই সম্বন্ধের ওপর মানুষের রূপতত্ত্ব নির্ভর করে বলেই উভয়ের মানসলোকে নানা বিচিত্র কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া পড়েছে শিল্প নৃত্য গীত প্রভৃতি শিল্পকলার ক্ষেত্রে। পুরুষের রুচি নারীর রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড সৃষ্টি করেছে আর নারীর রুচি পুরুষের।

* * *

আবার প্রশ্ন আসে, কোন্ চেহারা নরনারীর পরস্পর রুচিসম্মত। কাব্য আখ্যায়িকা ও উপন্যাস থেকে মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে ভুরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কাব্যে উল্লেখ আছে—তন্বী শ্যামা শিখরদশনা··· মধ্যক্ষীণা প্রভৃতি আদর্শ নারীদেহের সংজ্ঞা। সংস্কৃতকবির এ ব্যাখ্যানে সন্দেহ করার কিছু নেই। কিন্তু আদর্শ পুরুষদেহের বর্ণনা সংস্কৃত কাব্যে যা পাই তাকে বর্ণে বর্ণে সত্য বলে মেনে নিতে পারা যায় না। কারণ সেটা পুরুষ কবিরই লেখা। কোন নারীকবির লেখায় ক্লাসিক পুরুষদেহের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই পুরুষ কবির লেখা 'শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক' এ সংজ্ঞাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না। এটা ঠিক নারীরুচিসঙ্গত কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যেমন রুচি জিনিসটার কোন সনাতন সংজ্ঞা নেই, তেমনি রূপেরও কোন সনাতন সংজ্ঞা নেই। যুগে যুগে, দেশে দেশে তা বিভিন্ন ও বিচিত্র। একজন হটেনটট ও একজন বাঙালী যুবকের কাছে নারীরূপের আদর্শ এক নয়। তেমনি আজকের কোন বাঙালীর অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ যে উল্কিচিহ্নিতা নথবিড়ম্বিতা তরুণীকে সুন্দরী মনে করতেন তা অতিতরুণ প্রপৌত্রেরা আর করে না।

তবুও নরনারীর শারীর রূপের একটা মূলসূত্র আছে, যেটা সমস্ত রুচির পেছনে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। এটা হলো বায়লজির কথা। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বা সমাজগত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কারণে ছোটখাট রুচিভেদ থাকতে পারে, কিন্তু বায়লজির মূল সত্যটির কোন হানি হয় না।

* * *

সেই নরই নারীর কাছে সুন্দর যে নৃ-জাতিকভাবে সুন্দর। অর্থাৎ জাতিগত দৈহিক বিশিষ্টতা যার দেহে যতটা পরিস্ফুট, সেই ততটা সুন্দর। জাতিগত দৈহিক বিশিষ্টতার মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ সহজে আশ্রয় করতে পারে। বলতে গেলে প্রসাধন কলার উৎপত্তি এই রুচি থেকেই। ভারত ও মধ্যএশিয়ার মেয়েদের চোখ প্রায়ই টানা টানা হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরুষের চোখে তাই আয়তলোচনা নারী সুন্দর। নারীও কাজলরেখার টানে তার চোখ আরও আয়ত করে। এই খানে রূপচর্চার উৎপত্তি।

জাপানের আইনু নামে যে প্রাচীন জাতি আছে তাদের পুরুষেরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রোমশ মানুষ। আইনু তরুণীর কাছে সেই পুরুষই সবচেয়ে সুন্দর যে সবচেয়ে বেশী রোমশ। এখানে কুরূপের নমুনা হলো রোমহীনতা।

বাংলা কাব্য ও অলঙ্কার আলোচনা করে নর ও নারীদেহের একটি কোন স্ট্যাণ্ডার্ড পাওয়া যায় না। তন্ত্র, বৈষ্ণব কাব্য, মঙ্গল কাব্য, লোকগীতিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কাব্যক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপের স্ট্যাণ্ডার্ড পাওয়া যায়। এর কারণ বাঙালী এক নৃ-জাতিক নয়, ভিন্ন ভিন্ন নৃ-জাতির সমবায় মাত্র।

যন্ত্র দানব নয়

মাদ্রাজে যখন প্রথম রেললাইন স্থাপিত হয় তখন কয়েকজন ব্রাহ্মণ কৌতূহলী হয়ে সেই লৌহবর্ত্ম দেখতে গিয়েছিল। সমাজ কিন্তু এ অনাচারের প্রশ্রয় দেয় নি। স্বচক্ষে রেললাইন দেখার অপরাধে তাদের জাতিচ্যুত করা হয়।

এ ঘটনার কথা শুনে আজ অনেকে হাসবেন। তাদের গোঁড়ামিকে ধিক্কার দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন, সে গোঁড়ামি বা কুসংস্কারের প্রকোপ থেকে কি আধুনিক সমাজের মানুষ মুক্ত হতে পেরেছে?

বাঙলা সাহিত্যে 'যন্ত্রদানব' নামে একটা কথার খুবই চলন হয়েছে। কোন্ মনীষী প্রথম এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন জানি না।

যন্ত্র দানব হলো কিসে? কোন কোন দার্শনিক আধুনিক সভ্যতাকে 'লৌহময়ী' বলে গালি দেন। এই সব অভিযোগের কি সত্যই কোন ভিত্তি আছে? সভ্যতা যে লৌহময়ী হয়েছে সেটা গর্বের বিষয়, না অপমানের বিষয়? লৌহময়ী না হয়ে কাষ্ঠময়ী বা প্রস্তরময়ী হয়ে থাকাটাই কি মানব সভ্যতার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হতো?

• • •

মানুষ প্রথম যেদিন পালতোলা নৌকা গড়েছিল, সেইদিন সেটা যন্ত্রই ছিল। পাহাড়িয়া মানুষ যেদিন প্রথম হাড়ের বাঁশী তৈরী করে, সেদিন তা যন্ত্রই ছিল। মানুষ তার আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। কাউকে দানব বলে অবজ্ঞা ও সঙ্গে সঙ্গে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে সে চায় নি।

জন্তু ও যন্ত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে গুণগরিমায় কে বেশী? একটি সাধারণ অটোমোবিলের বেগৈশ্বর্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অশ্বটির বেগবত্তার তুলনায় কি অসুন্দর? বিরাট একটা বয়লারের দৃপ্ত চেহারা একটা হাতীর চেহারার তুলনায় দীনতর নয়।

গ্রামোফোনের একটি লোহার পিন যে সঙ্গীত সমারোহ সৃষ্টি করে সেটা কি কোকিল শ্যামা দোয়েলের কাকলি ঝংকারের তুলনায় ঘৃণ্য? যে কোন চলন্ত মেশিনের সুচিক্কন নিরেট রূপের স্ফূর্তি— ভালভ, পিস্টন, গিয়ার, নাট, বোল্টের ঝকঝকে আভরণ আর স্বচ্ছন্দ বিঘূর্ণন, এর মধ্যে কি শ্রী নেই? যন্ত্রশ্রী কথাটা কি ভুল?

যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ, যন্ত্র না কি মানুষের সংহারের কাজে খুব সাহায্য করেছে। কথাটা সত্য। কিন্তু যন্ত্রের দোষটা কোথায়? আজ ট্যাঙ্কে চড়ে নরবাহিনী যে হত্যালীলা করে বেড়ায়, হাজার হাজার বছর আগে ঘোড়ায় চড়ে মানুষ সে কাজ করেছে। কিন্তু ঘোড়াদানব কথাটা তো কাউকে বলতে শুনি নি। জ্ঞানলক্ষ্মীর সন্তান এই যন্ত্র। মানুষের হিংস্র মন তাকে অসৎ কার্যে নিয়োজিত করেছে। এর দায়িত্ব মানুষেরই। যন্ত্র কাউকে যেচে, নিজে থেকে সর্বনাশ করতে দৌড়ায় না। বরং গরু ঘোড়া গায়ে পড়ে মানুষকে কখনো কখনো গুঁতো লাথি মারে। যন্ত্রের মত এত বাধ্য সেবক মানুষের দ্বিতীয় কেউ নেই।

• • •

কবি ও দার্শনিকেরা জন্তু জানোয়ারের মধ্যে অদ্ভুত মায়া মমতা স্নেহ ও প্রভুভক্তির প্রমাণ পেয়ে থাকেন আর তার জন্য সাহিত্যে জন্তু জানোয়ারকে কম স্তুতি খ্যাতি করা হয় নি।

বাছুরের ওপর গাভীর মাতৃস্নেহ, কুকুরের প্রভুভক্তি এসবের অনেক উপাখ্যান আছে।

মানুষ সত্য সত্যই জন্তু জানোয়ারের ব্যথায় ব্যথী। সাহিত্যে এর প্রমাণ আছে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্প অনেকেই পড়েছেন। হেলে বলদের দুঃখে মুসলমান চাষীর মর্মান্তিক দুঃখ একটি করুণ গল্পে খুবই সজীব হয়ে ফুটে উঠেছে। এটা হওয়া স্বাভাবিক। মানুষই হোক বা জন্তুই হোক, যেখানে সেবা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক সেখানে এরকম আবেগময় সম্পর্ক স্থাপিত হবেই। কিন্তু এই পর্যন্তই। মানুষের মায়িকতা আজ পর্যন্ত সঙ্কীর্ণ পরিধির বাইরে যেতে পারে নি। আজীবন সাথী কোন যন্ত্রের জন্য মানুষ ঠিক 'মহেশ' গল্পের চাষার মত কাঁদে না।

কিন্তু একথাটাও সত্য নয়। আধুনিক সাহিত্যিক কাঁদে না, যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মাধুর্য আধুনিক সাহিত্যিকের অনুভবের বাইরে। যারা যন্ত্রজীবী বা যন্ত্রশ্রমিক তারা কিন্তু যন্ত্রকে এর মধ্যে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে।

পশু পক্ষীর যতই গুণগরিমা থাক তবুও সে পর। তারা মানুষের প্রতিবেশী। মানুষ তাকে সৃষ্টি করে নি। অপর দিকে যন্ত্র মানুষের নিজের জ্ঞানজ সন্তান। বিংশ শতাব্দীতে এত বড় একটি মহান্ সৃষ্টির গৌরব একান্তভাবে মানুষের নিজস্ব। এই যন্ত্রসন্তানের সেবার মূল উপলব্ধি করে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বিংশ শতাব্দীর ফিলসফি নতুন একটি মর‍্যাল সৃষ্টি করতে পারে না কি?

স্নেহের পুঁটলি

আমরা তার নাম দিয়েছিলাম ভারতমাতা। এই পাগলী ভারতমাতা নামেই সারা শহরে পরিচিত ছিল। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, পরিধানে নোংরা একটা কাঁথা। সব সময় দু'গাল ভরে পান খেত, কথা বড় বেশী বলতো না। মাঝে মা: হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে অদৃশ্য কোন শত্রুর সঙ্গে হাতপা ছুঁড়ে ঝগড়া আর গালাগালি করতো।

তার এই নামকরণের পেছনে ছোট একটু ইতিহাস ছিল। স্বরাজ আন্দোলনের সময়ে এক জনসভায় কোন দেশনেতা বক্তৃতা করছিলেন ভারতের দুঃখ দুর্দশার প্রসঙ্গ নিয়ে। সোনার ভারত কী ছিল আর কী হয়েছে! ভারতমাতার মুখের সে হাসি কোথায় আজ মিলিয়ে গেছে। সে ছিল সর্ব আভরণে ভূষিতা, আজ তার গায়ে ছেঁড়া কাঁথা।

এই বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ কোথা থেকে সভামঞ্চের ওপর এসে দাঁড়ালো পাগলী। দু'কষ বেয়ে পানের পিক গড়িয়ে পড়ছে। দু'হাত দিয়ে সস্নেহে জড়িয়ে ধরে রেখেছে বেশ বড় একটা নোংরা ন্যাকড়ার পোঁটলা।

ঘটনা দেখে সভার অনেকে হাসি চাপতে পারে নি। সেই থেকে পাগলীর নামও মুখে মুখে রটে গেল—ভারতমাতা।

ভারতমাতা থাকতো বাজারে, একটা শিমূল গাছের তলায় এক কুঁড়ে ঘরে। পাগলীর কাজ ছিল প্রত্যেক দোকান থেকে ডাল, নুন, তেল তরকারী এক এক মুঠো তুলে নেওয়া। এর জন্য সে দোকানীর অনুমতির অপেক্ষা রাখতো না। এইভাবে সওদা সেরে পাগলী খুব পরিপাটী করে রান্না করতে বসতো। এ বিষয়ে তার রুচিজ্ঞান ছিল অনন্যসাধারণ। গেরস্থ ঘরের চেয়েও রান্নার ব্যাপারে তার পরিচ্ছন্নতা ছিল বেশী।

• • •

পাগলীর উপদ্রবে দোকানীরা এক সঙ্গে সল্লা করে তাকে বাধা দিল। জিনিসপত্র বেপরোয়া তুলতে আর দিত না।

দেখা গেল পাগলীর উৎসাহ তাতে কিছু কমলো না। প্রতিদিন সকালবেলা শহর ছেড়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতো আর কুড়িয়ে আনতো নানা বিচিত্র ও বিদঘুটে সব সামগ্রী। কোন দিন একটা মরা বক, কোন দিন কিলখানার নালা থেকে পচা নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসতো, কখনো এক-আধটা কুকুর বিড়ালের মরা বাচ্চা নিয়ে রাঁধতো তেমনই পরিপাটী করে—ঘর নিকিয়ে, নতুন মাটীর উনুন তৈরী করে। প্রত্যেকটি পদ জিরে মসলা ফোড়ন দিয়ে খাঁটি রাঁধুনীর মত রাঁধা হতো। স্কুলের ছেলের দল সময় ভুলে পাগলীর কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে যেতো অবাক হয়ে।

• • •

পরিপাটী করে রান্না এই সুখাদ্য পরিপাটী করেই পাগলী খেতো। লোকে আরও অবাক হলো, যখন দেখা গেল যে পাগলীর তাতে মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানির কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না। এই অনৈসর্গিক ব্যাপারে ভারতমাতার মহিমা এমনি ছড়িয়ে পড়লো যে, লোকে তখন তাকে পাগলী বলে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, কোন যোগসিদ্ধা মহীয়সী সাধিকা বলেই মেনে নিল। পাগলীর সম্পর্কে দোকানীদের নিষেধ উঠে গেল।

• • •

সুখেই ছিল ভারতমাতা। রান্না আর খাওয়া সেরে ভারতমাতা একবার পথে বার হতো। কোলের ওপর থাকতো সেই ন্যাকড়ার পোঁটলাটা। অনেক ভক্ত সসম্ভ্রমে এক খিলি পান, আনা দুয়েক পয়সা ভারতমাতাকে এনে উপহার দিয়ে ধন্য হতো। মোট কথা, রকম সকম দেখে মনে হতো, ভারতমাতার দুঃখ ঘুচে সুদিন বুঝি বা আবার ফিরে আসে।

কিন্তু বাদ সাধলো শহরের চ্যাংড়া ছেলের দল। তাদের যত কৌতূহল ভারতমাতার বক্ষোলগ্ন ঐ স্নেহের পুঁটলিটার প্রতি। আচম্কা ছোঁ মেরে পাগলীর পুঁটলিটা কেড়ে নেবার জন্য ছেলেদের সাধাসাধনার অন্ত থাকতো না। নানা কৌশলে, আড়ালে অন্ধকারে তারা সে চেষ্টা করেছে; কিন্তু কখনো সফল হতে পারে নি। এইভাবে বিব্রত হয়ে পাগলীও ঢিল হাতে তাড়া করতো ছেলেদের। ছেলেরা পালিয়ে বাঁচতো।

• • •

সকলেই জানলো—ভারতমাতার নোংরা ন্যাকড়ার পুঁটলিটা একটি সম্পদ বিশেষ। কোন সাম্রাজ্যের বিনিময়েও সে তা হারাতে রাজী নয়। কেউ লোভ দেখিয়েছে দু'টাকা, কেউ দশ টাকা ; কেউ একটা নতুন কাপড়ের পোঁটলা দিতে চেয়েছে। পাগলী হেসে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে—না, না, না।

এর প্রতিক্রিয়া নানাভাবে দেখা দিল। কেউ বললো, ঐ পুঁটলির ভেতর অপার্থিব কিছু আছে। কেউ বললো—এক অজগরের মাথার মণি চুরি করেছে পাগলী, সেই অজগর ওকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই ক্রুদ্ধ মণিহারা ফণীর ভয়েই পাগলী সর্বদা শঙ্কিত। তাই নোংরা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে সেই মণি জড়িয়ে রেখেছে, যেন স্বয়ং অজগরও চিনে ফেলতে না পারে।

কেউ বলেছে—পাগলী খুব বড়ঘরের শিক্ষিত মেয়ে। রাজগীরের মাটী থেকে হীরের চোখ বসানো একটা ছোট মূর্তি পেয়েছিল। চোখ থেকে হীরে খুলে নিয়ে সে সরে পড়ে।

তারপর থেকেই সে পাগল। এক অশরীরী পিশাচ সব সময় ঘুরছে তার পেছু—ঐ হীরের চোখ জোড়া কেড়ে নেবার জন্য।

শান্ত সজ্জনেরা অনেক গবেষণা করেছে, চ্যাংড়া ছেলেরা অনেক টানা হ্যাঁচড়া উপদ্রব করেছে। কিন্তু ভারতমাতার পুঁটলিটার রহস্যভেদ আর হলো না। এভাবে চললো তিন বছর। তার পরের একটা ঘটনা।

• • •

মাঘমাসের রাত্রি। তার ওপর উদ্দাম ঝড় আর বৃষ্টি। কনকনে শীতের হল্কা উড়ে যাচ্ছিল রাত্রির আকাশের হাড় কাঁপিয়ে। পথে লোক ছিল না। সন্ধ্যে হতেই দোরে দোরে খিল পড়ে গেছে।

কপালের ফেরে স্টেশন থেকে ফিরতে হচ্ছিল এমন সময়, এই নিদারুণ রাত্রিতে। পথের দূরত্ব কম করার জন্য বাজারের ভেতর দিয়ে চললাম। হঠাৎ থমকে যেতে হলো। ভূত জন্তু জানোয়ার বা অন্য কোন বিভীষিকা নয়।

সেই শীতের রাত্রে ঝড়ের সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে করুণ ও সুতীব্র এক কান্নার আওয়াজ। কান্না কত বুকফাটা হতে পারে, তা এই কান্না শোনার আগে কখনো ধারণা হয় নি। এ কান্নায় সারা অন্ধকার যেন চোখের জলে গলে পড়ছিল।

কে কাঁদে? বাতাসের দাপাদাপিতে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, কোন্ দিক থেকে আওয়াজ আসছে। অগত্যা চকে এসে এক পাহারাওয়ালাকে ধরা গেল, খুঁজে দেখতে হবে এমন করে কাঁদছে কে?

আরও কজন লোক যোগাড় করে লাঠিলণ্ঠন নিয়ে বাজার তল্লাসী আরম্ভ হলো। কাপড় পটি, সব্জী পটি থেকে সুরু করে মাংসের স্টলগুলি পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করে হতাশ হয়ে পড়লো সবাই, কান্নাটা যেন চারদিকে দৌড়াদৌড়ি করছে, তারপর হঠাৎ থেমে গেল।

ভৌতিক ব্যাপার? সকলেই ঘরে ফেরবার উপক্রম করলো। ঠিক এই সময়ে খুব স্পষ্ট হয়ে প্রায় কানের কাছে ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো কান্নার স্বর, ভারতমাতার কুঁড়ের ভেতর থেকে।

• • •

সত্যিই পাগলী কাঁদছে। সকলে কত অনুরোধ ও আদর করে প্রশ্ন করলো—কি হয়েছে তোর ভারতমাতা? কি হয়েছে বল?

পাগলী মাটীতে মুখ গুঁজে পড়েছিল। চোখের জলে মাটী প্রায় কাদা হয়ে গেছে। খিদে পেয়েছে? পয়সা নিবি? শীত করছে? কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাগলী তেমনি মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

পাগলীর জন্য কষ্ট হচ্ছিল সবার। হলোই বা পাগল, বিগত বা বর্তমান কোন্ দুঃখের প্রচ্ছন্ন আঘাতে এ-হেন মানুষকে আজ এত উতলা করে তুলেছে কে জানে!

সকলে মিলে পাগলীকে বললো—বলতেই হবে তোকে, নইলে আমরা এখান থেকে উঠবো না। সাড়া দিল পাগলী। মুখ তুলে একবার তাকালো। তার পরেই আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল—বাইরের শিমুলতলায় কাদার উপরে কি একটা বস্তু পড়ে আছে।

—ঐ দেখ, আমার কী সর্বনাশ হয়েছে!

পাগলীর বুকফাটা চিৎকার আবার রাত্রির অন্ধকারকে বেদনায় নিংড়ে দিল।

সকলে দেখলো—শিমূলতলায় পড়ে আছে পাগলীর সেই নোংরা পুটলিটা। একটা কুকুর সেটাকে টেনে নিয়ে ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দিয়েছে ; আর তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে ছোট্ট একটা ইট— পুটলির ভেতর এতদিন হৃদ্‌পিণ্ডের মত লুকিয়ে ছিল।

পাগলী কাঁদছে। মনোবিজ্ঞানী বললেন—এরকম হয়েই থাকে। একে বলে ফেটিশ। বস্তু বিশেষের প্রতি অকারণ মোহ। তবে আর একটু ভাল করে জেনে রাখা দরকার—মানুষের এত গর্বের স্নেহ অপত্য সতীত্ব ভক্তি-প্রীতি ও নিষ্ঠার মূলে ভারতমাতার পুটলিটার মতই অকারণ (?) এক মোহ আছে—আর তার মধ্যে আছে এক অভ্যাস-বিপর্যয়ের ইতিহাস। এই ফেটিশের প্রকোপে পড়েই মানুষের মনে অকারণ পুলক লাগে, চোখে না দেখেই ভালবেসে ফেলে, আর্টের জন্য আর্ট করে—ডাকতে ভাল লাগে বলেই ডাকে। আরও বিস্ময়ের বিষয় হলো এই যে, যতকিছু অকারণের বোঝাকে মানুষ তার নীতিতন্ত্রে বড়াই করে এসেছে। যত ভালবাসার কাহিনী ও মহাকাব্যকে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, তার মধ্যে নিরর্থকতা অপ্রয়োজনীয়তা ও জীবন-নিরপেক্ষতাই বেশী। ফেটিশ যেখানে যত বড় হয়েছে, মানুষ সেখানে খুশী হয়েছে তত বেশী।

৩রা মার্চ

গান্ধীজির অনশনব্রত আজ শেষ হলো। এই ভারতভূমির এক কারাগারের গুপ্তগৃহকোণে বিপ্লবী প্রাণের কাছে মৃত্যু পরাভূত হয়েছে। মানবতার শক্তি হিমগিরির মত মহিমময় হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের সুকঠোর পথে এই পবিত্র মুহূর্তে সরে গেছে সব সংশয়ের জঞ্জাল, ভরসায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে আগামী দিনের দিগ্বলয়। বিশ্বচিত্ত নবজন্ম লাভ করেছে।

ভারতের গান্ধী! তুমি মৃত্যুকে অতিক্রম করেছ। তুমি ধূপ নহ, তুমি সৌরভ। তাই তোমার ক্ষয় হতে পারে না। কারাগারের বন্ধন তোমার কঠিনের বিপ্লবী সত্তাকে জীর্ণ করতে পারে না। আজ আমরা শোক করি না, অভিভূত হই না। আজ আমরা পেয়েছি মানবতার ক্লান্তিহীন অভ্যুত্থানের প্রতীকস্বরূপ তোমাকে— এক মহত্তো মহীয়ান পরিণামের বীজের মত তুমি ভারতের ধূলিতে মিশে রইলে।

• • •

তুমি এসেছ, সভ্যতার সঙ্কটে শান্তি মমতা অনসূয়া ও প্রেমের বাণী নিয়ে। আজ হতে প্রায় উনিশ শত বর্ষ পূর্বে তোমারি মত এক মানবপুত্র আত্মদানের মূল্যে কল্যাণের প্রবাহ এনেছিলেন ; সকল দুর্বিনীত মূঢ়তা ও লোভের কলঙ্ক থেকে বিশ্বজনের মুক্তির বাণী শুনিয়েছিলেন। সেই সত্য শতাব্দীর খাত ধরে সভ্যতার পঞ্জরে পঞ্জরে উৎসারিত হয়ে এসেছে। তুমি স্বয়ং সেই শক্তিধর ইতিহাস। যারা বোঝে না, চিন্তা করে না, বিচার করে না—আত্মপ্রতাপের দাবদাহে যাদের বুদ্ধি উত্তপ্ত, যাদের প্রত্যয় কল্যাণকে অস্বীকার করে— ভবিতব্য তাদের মার্জনা করে না।

তুমি আমাদের মধ্যে মানুষ হয়েও মানবোত্তর। তুমি অভীক্— পরস্বগ্রাহী রাজনীতির পুঞ্জীভূত কালিমার মধ্যে তুমি একাকী শুদ্ধ পাবক। তোমাকে যারা গ্রাস করতে যাবে, তারাই স্বয়ং গ্রস্ত হবে। আজ তোমার উপবাস-খিন্ন সত্তা মৃত্যুতীর্থের প্রান্তিক পরিক্রমা করে ফিরে এসেছে—তুমি যুগের রেণুতে রেণুতে সংগ্রামের বিদ্যুৎরূপে ভবিষ্যৎ বংশের আশাময় উত্তরাধিকার হয়ে রইলে।

* * *

হবে জয়, তুমি শুনিয়েছ এই বাণী। পরাজয়ের বিভীষিকা সরে গেছে। এক দুর্জয় আশাবাদিতায় সমুজ্জ্বল তোমার জীবনবাদ। সত্যের আগ্রহে তুমি সত্তাবান। পরাক্রমের রূঢ় কটাক্ষ এই স্ফুরৎ শক্তির কাছে অন্ধ হয়ে যায়। তোমার আশ্বাসে দুর্বল মহাবলবান হয়েছে। অবনত জাতি অভ্যুত্থানের নাগাল পেয়েছে।

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'—তথাগতের এই ঐতিহাসিক প্রতিজ্ঞা আজ তোমার মধ্যে আবার নতুন করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভ্রান্তির তিমিরদ্বার খুলে যাক্, মুক্তির পথ প্রকাশিত হোক্ ; নচেৎ এই শরীর শেষ হয়ে যাক্। সার্ধ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্বে ভারতের এক রাজার দুলাল এই সত্যের সন্ধানে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। ভারতের জনগণের দুলাল, ভারতের পরমার্তির মোচনে উৎসর্গিতপ্রাণ গান্ধীজীর সঙ্কল্পও সার্থক হবে। তাঁর বাণী, তাঁর কর্ম ও তাঁর পরিণাম তাঁকে সিদ্ধার্থ করেছে।

* * *

যিনি মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করেন না তিনিই সংগ্রামী ; যিনি অবস্থা বন্ধন স্বীকার করেন না, তিনি যোদ্ধা। যাঁর কাছে স্বার্থ ও পরার্থ এক হয়ে গেছে—তিনিই প্রেমিক। ভারতের গান্ধীর এই কর্মযোগ সভ্যতাকে সম্মানিত পুষ্ট ও শক্তিময় করেছে।

ভারতের আকাশে আগামী দিনে আবার অরুণোদয় হবে—কাননে কান্তারে জনপদে কোটি কোটি মুক্তিকাম নরনারীর হৃদয়স্পন্দন আবার জেগে উঠবে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি—আমাদের পুরাতন সূর্য ক্রান্তিপথের সীমায় এসে দেখবে, ভারতের বিপুল চিত্তপ্রবাহের রূপান্তর হয়ে গেছে। আগের দিন আর এই দিনে অনেক প্রভেদ। ভারতের জীবন চরম বেদনায় স্নান করে নবতর বিপ্লবের উন্মেষে শিউরে উঠেছে। আমরা মৃত্যুকে জয় করবো, মুক্তি লাভ করবো। সমস্ত পৃথিবীর নরনারীর সঙ্গে আমরা ভাবীকালের এই অদৃশ্য বিজয়স্তম্ভের নিকট শির নত করি—যার পীঠমৃত্তিকা গান্ধীজীর আত্মদানের অস্থি আশ্রয় করে রয়েছে।

ভাস্কর সার্জন

উড়িষ্যার ললিতগিরি ও উদয়গিরি পাহাড়ের গায়ে উৎকীর্ণ চিত্রার্ধগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা দুঃখিত হয়েছেন সেই শিলাময় দেবতাদের দুর্দশা দেখে। শুধু দেবতা নয়, বহু বৌদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা ও জাতকের আখ্যায়িকা প্রাচীন ভাস্করের সুনিপুণ বাটালির কারুক্রিয়ায় গিরিগুম্ফার গায়ে মূর্ত হয়ে আছে। কিন্তু অধিকাংশ চিত্রার্দ্ধগুলির নাক ভাঙা, কতগুলি মূর্তির হাত নেই, কেউ বা খঞ্জ। প্রকাণ্ড একটা হাতীর পাথুরে মূর্তি ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। দেখে মনে হয়, হাতীটা যেন আহত হয়ে পড়ে আছে কারণ হাতীর শুণ্ডটি নেই ; কোন নিষ্ঠুর বন্য শিকারীর কীর্তি বলে মনে হয়।

স্বভাবত সন্দেহ হতে পারে, মূর্তিগুলি এ রকম হাত-পা-নাক-কান ভাঙা অবস্থায় কেন? দেখে মনে হয় প্রাকৃতিক কারণে বা শুধু কালের প্রকোপে মূর্তিগুলির এরকম পঙ্গু অবস্থা হয় নি। গাইডের কাছে জিজ্ঞেস করলে সে যা উত্তর দেয় তা একেবারে অবিশ্বাস্য নয়। গাইডের বক্তব্য হলো, হিন্দুদ্বেষী কালাপাহাড় না কি ক্ষেপে গিয়ে এই সব মূর্তির নাক কান ভেঙে দিয়ে গেছে।

কিন্তু সব দেশেই ও সব যুগেই কালাপাহাড় থাকে। রোমের সৌন্দর্য নষ্ট করেছিল ভাণ্ডালের দল। কিন্তু শিল্পের শত্রুরা জয়ী হতে পারে না, যদি শিল্পী সজীব থাকে। ললিতগিরির শিল্পী সজীব ছিল না। সেই শিল্পের ঐতিহ্যও বেঁচে ছিল না, নইলে ব্যাপার অন্য রকম হতো। অর্থাৎ তাহলে কালাপাহাড় স্বয়ং ক'বছর পরে ফিরে এসেই দেখতো, আবার ললিতগিরির মূর্তিরা তাদের হৃত অবয়ব ফিরে পেয়েছে। পাথুরে হাতীটা আবার শুঁড় তুলে উৎফুল্ল হয়ে বসে আছে। এ ব্যাপার দেখে কালাপাহাড় ব্যর্থ রোষে আপসোস করতো নিশ্চয়। কিন্তু এটাই নিয়ম, চিরকাল শিল্পী ও কালাপাহাড়দের সঙ্গে এই সংগ্রাম চলে এসেছে। কালাপাহাড়েরা শিল্পীকে কখনও ঘায়েল করতে পারে নি।

প্রাণহীন পাথুরে মূর্তিরা শিল্পীর কাছে যে স্নেহ করুণা ও সেবায় পুষ্টি ও সম্পূর্ণতা লাভ করে, আধুনিক যুগে সজীব মূর্তিরা এবং বিশেষ করে স্বয়ং মানুষ নামক প্রাণীর অদৃষ্ট এই ধরণের এক শিল্পীর হাতের গুণে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। ঠিক ভাস্করের মত মানুষের দেহ নিয়ে ভাঙা গড়া করেন, এরকমের একদল বৈজ্ঞানিক শিল্পী দেখা দিয়েছেন। এই শিল্পীরা যে বিদ্যায় অধিকারী তার নাম প্লাস্টিক সার্জারি। এঁরা একাধারে ভাস্কর ও চিকিৎসক। আধুনিক বিজ্ঞানের বলে এই চিকিৎসকেরাই শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা উন্নত ভাস্কর। মাটির তাল দিয়ে কুম্ভকার ঘট গড়ে, পাথর ও প্যারিস প্লাস্টার দিয়ে ভাস্করেরা মূর্তি গড়ে ; কিন্তু এই শিল্পী চিকিৎসকদের কীর্তি ও সাধনা দুরূহতমকে জয় করে সহজ ও সরল করে তুলেছে। রোগে বা অপঘাতে অঙ্গহানি হয়ে কত সুশ্রী ও সুন্দরকে চিরকাল বীভৎস দেহের অসমাননার বোঝা নিয়ে দিন যাপন করতে হয়। তাদের দুঃখকে দুরপনেয় মনে করে, দুরদৃষ্টকে দুরপহার্য মনে করে তারা জীবনের ধিক্কার নিয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়ে থাকতো। কিন্তু অদৃষ্টের ও পরিণামের এই কালাপাহাড়ী অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য এগিয়ে এসেছে নতুন এক শিল্পী চিকিৎসকের দল। আজ কোন ক্লিওপেট্রা আছাড় খেয়ে যদি খেঁদি হয়ে যায়, তবুও তার ভয় নেই। নবীন শিল্পী চিকিৎসক কয়েকটি দিনের যত্নে একটি তিলফুলনাসা গড়ে বসিয়ে দিতে পারবে।

প্রকৃতির প্রভাব

সংসারটা না কি সমরাঙ্গনের মত। জীবনটাই একটা সংগ্রাম। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে করে না কি মানুষ জয়ী হয়েছে আর উন্নতিলাভ করেছে। মানুষের সভ্যতার যে এত বড়াই, এর গোড়ার কথা হলো জড় প্রকৃতির পরাজয়। প্রকৃতি মানুষকে যেখানে বঞ্চিত ও রিক্ত করে রাখতে চেষ্টা করেছিল, মানুষ নিজের প্রতিভায় সেখানে সঞ্চয় ও পূর্ণতা নিয়ে এসেছে।

এই সংগ্রামের গর্ব মানুষের মনকে এত বেশী আচ্ছন্ন করে আছে, যে তার সমস্ত সত্তাই যেন কুস্তিগীরের প্যাটার্নে তৈরী হয়ে উঠেছে। চিন্তায় সংগ্রাম, কথায় সংগ্রাম, খেলায় সংগ্রাম, লেখা-পড়ায় সংগ্রাম। এক দ্বন্দ্বময় জগতে শুধু লড়বার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে মানুষ। কবির লড়াই হয়, খেলায় প্রতিযোগিতা হয়, বিদ্যাশিক্ষাতে দ্বন্দ্ব ও প্রাইজ প্রতিযোগিতা। ভগবানের কাছে পৌঁছবার জন্যেও মানুষ মুক্তিফৌজ গড়ে সৈনিকের ঢঙে মার্চ করে চলেছে।

• • •

কিন্তু হঠাৎ একটা সন্দেহ হয়। সত্যিই কি একটা সংগ্রামের নিয়ম নিয়েই পৃথিবীর দিনরাত্রির পালা চলেছে? সংগ্রাম করার জন্যই কি ফুল ফুটছে, পাখি ডাকছে? আকাশ যে এত নীল, সে কি সংগ্রামের কারণে? কার বিরুদ্ধে এই নভোনীল নীলিমার সংগ্রাম?

সব চেয়ে ভয়ঙ্করভাবে আঘাত করে, থিয়োরীটা যখন সদম্ভে চেঁচিয়ে ওঠে—প্রকৃতিকে পরাজিত করাই মানুষের চিরকেলে সংগ্রাম। এই ক্ষুরস্য ধারা পথেই আমাদের চিরন্তন অভিযান।

সন্দেহ হয়, সর্বঘটে এই সংগ্রামের ছায়া দেখতে পেয়েই কি আমরা সৈনিক হয়ে উঠেছি? না, মনের বা পথের ভুলে সংগ্রামী হয়ে পড়াতেই এক ভুবনময় চ্যালেঞ্জের আদর্শ দেখতে পাচ্ছি আর তাল ঠুকছি?

সত্যিই কি প্রকৃতিকে পরাজয় করে আমরা বড় হয়েছি? প্রকৃতি কি আমাদের শত্রু?

• • •

প্রকৃতির সহযোগিতা করেই মানুষ বড় হয়েছে, সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। থিয়োরীটাকে এইভাবে গড়ে নিয়ে যদি আমরা বিচার আরম্ভ করি, তাহ'লে কি কোন ভুল হবে?

প্রকৃতিকে আমরা পরাজয় করলাম কবে? প্রকৃতিকে পরাজয় করে আমাদের লাভ কি? সভ্যতার প্রথম আচার্য, যিনি ধানের বীজ পুঁতে পৃথিবীতে শস্যের আবিষ্কার করলেন, তাঁকে কি আমরা সেনাপতি আখ্যা দিতে পারি? নিশ্চয় তিনি প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়েন নি, প্রকৃতিকে পরাজয় করেন নি। বলতে পারা যায়, তিনি প্রকৃতির ভাণ্ডারে নতুন উপহার এনেছিলেন, প্রকৃতিকে সাহায্য করেছিলেন। প্রকৃতির আঙিনায় এমনিতেই বুনো ধান সৃষ্টি হতো। মানুষ এই সৃষ্টিকে আরও সহজ করে আনলো, কৃষি আবিষ্কার করলো। প্রকৃতির রীতিকে আরও ত্বরান্বিত করলো মানুষ।

• • •

ইলেকট্রিসিটি আবিষ্কার কি প্রকৃতির পরাজয়? প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যুৎ আছে, সেই ঐশ্বর্যকে মানুষ আহরণ করেছে, কাজে লাগিয়েছে। প্রকৃতি মানুষকে গাছের ছায়া দান করে। মানুষ গাছ তৈরী করে ছায়া সৃষ্টি করে। প্রকৃতির সঙ্গে এই মিলন ধর্মের রীতিই মানুষের সভ্যতাকে পুষ্ট করেছে। মানুষের কারুশিল্পের রহস্য প্রকৃতির ঘর থেকেই নেওয়া। যা ছিল স্বভাবের পাওয়া, তাকে মানুষ বেশী করে পাওয়ার কৌশল আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের শত্রুতার সম্পর্ক যে কোথায় আছে, খুঁজে পাওয়া যায় না। লজ্জাবতী লতার মত প্রকৃতি কখনো মানুষের স্পর্শে কুণ্ঠিত ও কৃপণ হয়ে পড়ে নি। তার ভাণ্ডারে যা আছে, মানুষের কাছে তাকে অবারিত করে দেয়। তার বেশী পাওয়ার কৌশলটুকুও প্রকৃতি মানুষকে দেখিয়ে দেয়।

প্রকৃতির সঙ্গে স্থলে জলে আর জনমে জনমে মানুষ গিঁঠাতে গিঁঠাতে বাঁধা। এই প্রকৃতির তৃণধূলি জলে মানুষের সত্তা পরমাণুরূপে কায়া গ্রহণ করে একদিন বেঁচেছিল। প্রকৃতির প্রথমজাত বেদনায় সেই রেণুকায়া একদিন প্রাণে উদ্ভাসিত হয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে আমরা এগিয়ে চলি, প্রকৃতিকে পরাজয় করে নয়।

মুক্তা ফলের লোভে

পৃথিবীর স্থলের পরিচয় আমরা জানি। স্থলের উপরে যত রকম ঘটনা ও দৃশ্য আছে, তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। স্থলের অন্তস্থলের পরিচয়ও আমাদের অজ্ঞাত নয়। সহস্র ফুট গভীর খাদের ভিতর থেকে বিজ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ তার ইঞ্জিনিয়ারিং নিপুণতার বলে নানা ধাতুরত্ন আহরণ করে আনছে। পৃথিবীর গর্ভে পরিখা খনন করে মানুষ বসবাস করবারও চেষ্টা করছে। বহু প্রাচীন কাল থেকেই সুড়ঙ্গের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। আধুনিক উন্নততর ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার জোরে সুড়ঙ্গ বা টানেল নির্মাণের রেওয়াজ আরও বেড়ে গেছে। ভূগর্ভে রেলওয়ের ব্যবস্থা আধুনিককালে নতুন কিছু নয়, বরং সর্বত্র এই রকম অন্তর্ভৌম যানবাহন ব্যবস্থা আজকাল প্রসার লাভ করেছে।

মানুষের গতিবিধি স্থলে ও জলে আর নিবদ্ধ নয়। আকাশেও যন্ত্রবিজ্ঞানে গরীয়ান মানুষের চলাচল আরম্ভ হয়েছে। অবশ্য আকাশে এখনও মানুষ স্থির আশ্রয় পায় নি। জলের ওপর মানুষ আশ্রয় পেয়েছে। নিম্ন চীনের নদীবহুল প্রদেশে অজস্র লোক নদীর ওপর স্থাবর নৌকা বেঁধে স্থায়িভাবে বসবাস করে। কাশ্মীরের হ্রদে 'ভাসান জমি' তৈরী করা হয়, বাঁশ বা পাটাতনের ওপর মাটি ছড়িয়ে। তার ওপর লোকের বসতি খুবই বিরল, তবে শব্জী চাষ বেশী রকম হয়।

• • •

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জলপৃষ্ঠ ও স্থলপৃষ্ঠ— বর্তমানে এ দুইটি মানুষের অধিষ্ঠানের অবলম্বন হতে পেরেছে। বাকী রয়েছে আকাশ ও জলগর্ভ। আকাশে মানুষ বিমানপোতে শুধু পাড়ি দিয়ে আসতে পারে ; বিমানাবাস তৈরী এখনও সম্ভব হয় নি। জলগর্ভ বা সমুদ্রের অভ্যন্তর সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে।

'মুক্তা ফলের লোভে ডোবে রে অতল জলে যতনে ধীবর।' জলগর্ভে মানুষ নিজের স্বার্থের উদ্দেশ্যে হেঁটে হাতড়ে এসেছে। বহুদিন থেকেই এক শ্রেণীর ডুবুরিদের জাতব্যবসা ছিল শুক্তি উত্তোলন করা।

মহাশূন্যে বিলম্ব অগণ্যকোটী জ্যোতিষ্কের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী। কিন্তু ভূগোলের ভূবৃত্তান্তটুকুই শুধু আমরা কিছুটা চর্চা করেছি। কিন্তু পৃথিবীর বৃত্তান্ত জানা আমাদের অনেকখানি বাকী আছে।

• • •

জলগর্ভের কথা। এই রহস্যময় জগতের কতটুকু পরিচয় আমরা জানি? কিন্তু এ এক বিচিত্র। বিচিত্র নয়নাভিরাম প্রাণীতে পরিপূর্ণ অতি শীতল ও তরল জগৎ। বহিঃনিসর্গের মত এখানেও অজস্র বিভিন্ন দৃশ্যের বৈচিত্র্য রয়েছে। জলগর্ভে এমনও দেখা যায় যে, এক এক জায়গায় সুদীর্ঘ বৃক্ষখচিত উদ্যান। নানা রঙে রঙীন উদ্ভিদ, চকচকে ক্ষুদ্র বৃহৎ মৎস্য ও সরীসৃপের গাত্রবিচ্ছুরিত জ্যোতি। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগৎ যেন যাদুমন্ত্রে শব্দহীন হয়ে আছে। অন্ধ কাঁকড়া, উজ্জ্বল তারা মাছ, বিদ্যুৎ-পুচ্ছ বিশিষ্ট সরীসৃপের জীবন চাঞ্চল্যে ও ফসফোরাসের বর্ণবিভঙ্গ জলরাজ্যের নিসর্গশোভা সৃষ্টি করে।

তিনশত ফুট নীচে—অর্থাৎ জলরাজ্যের উপরতলা। এখানে শামুক পানা প্রভৃতি

জন্মাবার মত আলোর অভাব নেই। কিন্তু সত্যিকারের গভীর জলরাজ্য আরম্ভ হয় তিনশত ফুটের পর থেকে। সমুদ্রের তলদেশ গড়ে ৩১৭২২ ফুট ধরে নিতে পারা যায়। কিন্তু স্থলের পাহাড় পর্বতের মত সমুদ্রতলেও মাঝে মাঝে সুগভীর 'রসাতল' আছে। পৃথিবীর সবের্বাচ্চ পর্বতের উচ্চতার চেয়েও এই রসাতলগুলির গভীরতা বেশী। ১২০০ ফুট নীচে বিচিত্র-দেহ জীবের আশ্রয়, এদের শরীর সারি সারি দীপের মত আলোক-উৎসারক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমাবিষ্ট। এ থেকেই অনুমান করা যায়, সমুদ্রের একেবারে তলদেশে পৌঁছলে সেখানে নিশ্চয় আর একটা জীবরাজ্য পাওয়া যাবে, যারা সংখ্যায় ও বৈচিত্র্যে স্থলবাসী জীবের চেয়ে কম নয়। বায়ুমণ্ডলে আবৃত স্থলচর জীবজগতের কথা আমরা জানি, কেননা, আমরা সেই জগতেরই লোক। কিন্তু জলমণ্ডলে আবৃত 'রসাতল' রাজ্যের খবর আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আধুনিক উন্নত যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে ডুবুরী বহু গভীরে নেমে গিয়ে শুক্তি তোলে, একশত বছর আগের জলমগ্ন জাহাজের মালমসলা তুলে আনে। তবুও এই রসাতল রাজ্যে পৌঁছতে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চলবে না। আবিষ্কারের উন্নতির জন্য আরও এক হাজার বছর বোধ হয় অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

• • •

ডুবুরীর মতন এত দুঃসাহসী ও রোমান্টিক পেশা বোধ হয় আর কারও নেই। শুক্তির লোভে ডুবুরী কালো হিমসলিলের গহনে ডুব দেয়। হাতড়ে হাতড়ে স্পঞ্জ আর শুক্তি তোলে। অক্টোপাস, হাঙ্গর, হিংস্র কুকুর-মাছ তাড়া করে আসে।

নৌকা থেকে লাইফ লাইন ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবুরী। ওপর থেকে টিউবের ভিতর দিয়ে বায়ুস্রোত হেলমেটের ভিতর আসতে থাকে। ডুবুরীর কানে দূর পাম্পের টিক্ টিক্ শব্দ বাজতে থাকে। ডুবুরীর সমস্ত অন্তরপুরুষ এই শব্দের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখে। সামান্য ত্রুটি হলেই তার বুকে চমক লাগে, মৃত্যুর ভ্রূকুটি ভেসে ওঠে। যত নীচে নামা যায় পাম্পের টিক্ টিক্ তত দ্রুততর হয়ে উঠতে থাকে, দ্রুততর বায়ুপ্রবাহ টিউবের ভিতর দিয়ে মুখোসে আসতে থাকে। এই শব্দ থেকেই ডুবুরি বুঝতে পারে, কত গভীরে সে নেমে যাচ্ছে। জলের চাপে গায়ের পরিচ্ছদ চামড়ার সঙ্গে এক হয়ে বসে যেতে থাকে। শুধু মুখোস আর বুকের তামার প্লেটের ওপর জলের চাপে ডুবুরীর শরীরে কোন প্রকোপ হয় না। মাটিতে পা দেবার পর ডুবুরী 'লাইফ লাইন' ঝাঁকানি দিয়ে সঙ্কেত করতে থাকে। ওপরের নাবিকেরা সে ভাষা বোঝে।

• • •

গভীর জলস্তরে ডুবুরীদের বিপদ আছে। এত ভারি পরিচ্ছদ ধারণ করেও তারা অতি গভীর জলস্তরে এসে শোলার মত ভাসতে থাকে, কেননা এখানে জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব তুলনায় তার শরীর থেকে অনেক গুণে বেশী। ডুবুরীর চাঁদের মানুষের মত অবস্থা হয়। এই বানচাল অবস্থায় ডুবুরী যদি একটু মোচড় দিয়ে লাফ দিতে পারে, তবে এক দফা বহু উঁচু স্তরে সে উঠতে পারে। কিন্তু এমনি দুর্দৈব হয় যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও অপোগণ্ড শিশুর মত তার শরীরের মাংস-পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। দুইশত ফুট নীচে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডুবুরী যদি একটুকরো কাঠের ওপর টাঙ্গির আঘাতে করে, তবুও কাঠের টুকরোটি ভাঙে না। জলের চাপে কুঠারের আঘাত শতগুণ হাল্কা হয়ে যায়।

তার মাথার ঠিক খাড়া উপরে ভাসমান কোন জাহাজ থেকে যদি কামান গর্জন হয়,

হবে তার কোন শব্দ দু'শো ফুট নীচের ডুবুরীর কানে আসবে না। অথচ জলের অভ্যন্তরে বিচরণশীল সাবমেরিনের শব্দ তার কাছে সুস্পষ্টভাবে ধরা দেয়। জলের ভিতরে তিন মাইল দূরে কোন বিস্ফোরণের শব্দ ডুবুরীর শ্রুতিগোচর হয়।

সমুদ্রগর্ভের কোন বেলাভূমির ওপর এসে দাঁড়ালে ডুবুরী দেখতে পায়, সবুজ সূর্যের সন্ধ্যারাগের মত একটা আভা। দশ গজ দূরে অবস্থিত বস্তু তার দৃষ্টিগোচর হয়। ওপর দিকে তাকিয়ে সে দেখে বহিঃপৃথিবীর সূর্যরশ্মি অগাধ জলমণ্ডলের ভেতর দিয়ে কোটি কোটি রূপালী বুদ্বুদের মত ফাঁকা হয়ে ঝরে পড়ছে। কাঁকড়া, মাছ, শামুক প্রভৃতি প্রত্যেকটি জলচর জীব সত্যিকারের আকারের চেয়ে—অনেকগুণ বড় হয়ে প্রতিফলিত হয়। আজব দেশের সমস্তই আজব। সমুদ্রগর্ভবাসীর চোখে দৃশ্যমান জগতের এত বড় ছলনা, এত বড় প্রপঞ্চ আর কিছুই নেই। এখানে 'জগন্মিথ্যা' সত্য হয়ে উঠেছে। Things are not what they seem—ঐ তথ্যদৃষ্ট বিরাট কাঁকড়াটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলা যায়।

মুখর পুরাতন

বারাণসীর প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে যায় ভারতীয় তথা হিন্দু সভ্যতার কথা। বর্তমান ভারতে এ রকম শহর দ্বিতীয় নেই। সংস্কৃতির গৌরবে কোন কোন কালে হয়তো তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, পাটলীপুত্র, ওদন্তপুরী বারাণসীকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেসব স্থান এখন ঐতিহ্যের শ্মশানের মত, কতকগুলি ভগ্নস্তূপ তাদের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষীর মত পড়ে রয়েছে। কিন্তু বারাণসীর সে মন্দভাগ্য হয় নি। বারাণসী থেকে পাঁচ মাইল দূরে যে জীবন অতীত হয়ে গেছে, যে কাহিনী শুধু পুঁথিতে আর পাথরে লেখা, সেই জীবন বারাণসীতে এখনও নবীন, মুখর ও চঞ্চল। হাজার বছরের পুরাতন ও অতীত হিন্দু ভারতকে যদি কোথাও এখনও তৎপর দেখা যায়, তা এই বারাণসীতে। ঐতিহ্যের আশ্রয় হিসাবে ভাটিকানও কাশীর তুলনায় নগণ্য। দেশে আরও অনেক তীর্থস্থান আছে, অতি প্রাচীন দেবস্থান আছে, কিন্তু তারা শুধু অতীত সংস্কৃতির এক একটি সাক্ষীর মত। অপর দিকে কাশী অতীত সংস্কৃতির বাহন। অজন্তা গুহার মত বা কারলি গুম্ফার মত বারাণসী মৃত অতীতের কঙ্কাল সংগোপনে ধারণ করে না , বারাণসী অতীতকে মরতে দেয় নি। অতীত এখানে জীবন্ময়। বারাণসীর এই শক্তি বিশ্বের পণ্ডিত সমাজকে মুগ্ধ করেছে। ঘোর পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে, সভ্যতার আলোড়নের মধ্যে বারাণসী অটুট পাষাণ শৈলের মত দাঁড়িয়ে আছে। মহেঞ্জদারো ও হরপ্পার মাঠে দাঁড়িয়ে, ইন্দ্রপ্রস্থের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে ক্ষণিকের জন্য যে আত্মীয় বিয়োগের দুঃখে মন ছেয়ে ওঠে, বারাণসীতে এসে তা হয় না। শত শত যুগের চিন্তা আশা আনন্দ ও সৃষ্টি যেন এখানে বিচিত্ররূপে কাজ করে চলেছে।

• • •

এহেন বারাণসী নগর কোন্ মহাপুরুষ বা মহারাজা পত্তন করেছিলেন তা সঠিক ভাবে বলা যায় না। অতি প্রাচীন গ্রন্থে, পুরাণ ও আখ্যায়িকার মধ্যে বারাণসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যাই হোক না কেন, জাহ্নবীর পুলিনাশ্রয়ী এই পুণ্যভূমি যে অতি প্রাচীন তাতে সন্দেহ নেই। গাঙ্গেয় সভ্যতার প্রথম আধার বোধ হয় এই বারাণসী। মহাভারত ও রামায়ণে বারাণসীর উল্লেখ আছে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর স্বয়ং শাক্যমুনি এই বারাণসীতে তাঁর বাণী প্রচারে আগমন করেন।

ইতিহাসে শুনি আর্য সভ্যতার প্রথম পত্তন হয়েছিল সিন্ধুনদের দেশে। নানা রূপান্তরের

মধ্য দিয়ে আর্য সভ্যতার যখন 'হিন্দুত্ব' প্রাপ্তি হলো, তখন তার মধ্যে সিন্ধুনদের ছিটেফোঁটাও আর রইল না। এই গঙ্গা পুলিনের বারাণসী সেই হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আধার ও কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ালো।

আর একভাবে বিচার করলে বলা যায়—বারাণসী পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বারাণসীর সংস্কৃতি পশ্চিম ভারতে তেমনভাবে প্রচারিত হতে পারে নি। পশ্চিম ভারতে এক তক্ষশিলার যুগ ছাড়া কোন সাংস্কৃতিক শাসন দেশব্যাপী হয় নি। কিন্তু বারাণসী বরাবর পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে ; পূর্ব ভারতের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এই বারাণসীর দান।

এই পুণ্যভূমি বারাণসী, পঞ্চকোশী পথের সীমার মধ্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হলে, যত বড় পাপীই হোক না কেন, স্বর্গলাভ তার হবেই। চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান এই বারাণসীতে ছুটে এসেছিলেন ধর্মতৃষ্ণার আবেগে। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত আর একজন চীনা পরিব্রাজক বারাণসীতে এসেছিলেন, হিউয়েন সাং। তাঁর লেখা বিবরণী থেকে জানা যায়, তিনি এখানে একশতটি শিবমন্দির দেখেছিলেন। মন্দিরের যাজকের সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

• • •

শুধু শৈব হিন্দু সংস্কৃতির অবলম্বন হিসাবেই বারাণসীর প্রসিদ্ধি তা নয়। বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র সারনাথ বিহার কাশীর অনতিদূরে। জাতকের গল্পে বিখ্যাত মৃগদাব কানন বারাণসীর সংলগ্ন ছিল। ভারতীয় কথাসাহিত্যের বিখ্যাত রাজা ব্রহ্মদত্ত বারাণসীর রাজা ছিলেন।

আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাপথের সমস্ত বুধমণ্ডলীর কাছে বারাণসী পুণ্যজ্ঞানের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালো। সকল প্রদেশের জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশে বারাণসী ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাভূমি হলো। হিন্দু ভাস্কর্যের অনুশীলন বারাণসীতে বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ করলো। হিন্দু স্থাপত্যেও বারাণসী একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি সৃষ্টি করলো। শৈব ধর্মের আধিপত্য সত্ত্বেও বারাণসীতে সকল শ্রেণীর দর্শন ও কলার চর্চা অব্যাহতভাবে চলছিল।

এতদিন ধরে বারাণসী পুষ্ট হচ্ছিল সকল শ্রেণীর সাধক ও বুধমণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও সমাদরে। এই গৌরবের অধ্যায় অকস্মাৎ ছিন্ন হয়ে বারাণসীর ইতিহাসে একদিন দুঃখ ও অপমানের আঘাত নেমে এল—বিদেশী ও বিধর্মীর আক্রমণ। মুসলমান আক্রমকদের আঘাতে বারাণসী বারবার জর্জরিত হলো। কুতবউদ্দীন বারাণসী অধিকার করে বসেন। কথিত আছে যে, সাহবুদ্দীন ঘোরী এক হাজার মন্দির ভেঙে দিয়ে তার পরিবর্তে মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলমান শাসকদের রাজত্বে বারাণসীর সুখ শান্তি ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ব্যাহত হয়েছে, আঘাতের ক্ষান্তি কখনো হয় নি। বাদশাহ আকবরের সময়ে কিছুদিনের জন্য একটু বিরাম পড়েছিল শুধু। ঔরঙ্গজেব আবার অনেক কালাপাহাড়ী কাণ্ড করেন। তারপর মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের পর বারাণসীতে আবার কিছু নতুন শান্তি ও সমৃদ্ধির সূচনা দেখা দেয়।

• • •

তারপর ব্রিটিশ যুগ। সহস্র বৎসরের প্রাচীন বারাণসী তার বিশিষ্ট জীবনের দীপ আজও জ্বালিয়ে রেখেছে। মেকলে সাহেবের লেখায় বারাণসীর বর্ণনা অনেকে পড়েছেন। সে বর্ণনার মধ্যে প্রখ্যাত ষাঁড় আর সিঁড়ির উল্লেখ আছে। তা ছাড়া কারুশিল্পে বারাণসীর দানও কিছু কম ছিল না। বারাণসীর তাঁত থেকে যে সূক্ষ্ম রেশমের বস্ত্র সৃষ্টি হতো তার প্রচার ও সমাদর সুদূর ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজরাজড়ার প্রাসাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ভক্ত সাধক, বণিক, শিক্ষার্থী, অধ্যাপক—সকলের কাছে বারাণসীর সমান আকর্ষণ ছিল। তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী নরনারীর আগমন হাজার বছর ধরে এই কাশীকে চঞ্চল করে রেখেছে। অসি, বরুণা, দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা প্রভৃতি বারাণসীর ঘাটগুলির বিচিত্র জনতার শোভা না দেখলে বোঝা যায় না। বিশ্বনাথের মন্দির, বেণীমাধবের ধ্বজা, রাজা জয়সিংহের মান মন্দির, বহু ধর্মশালা, অন্নসত্র, ঘাট, সাধু ও যোগীর আশ্রম, মন্দির, মূর্তি ও বিগ্রহ নিয়ে বিচিত্র বারাণসীর রূপ। ঔরঙ্গজেবের মসজিদটিও স্থাপত্যের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার কিনারা ধরে এই হিন্দু ভারতের তথা অতীত ভারতের এক একটি দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পথিকের দৃষ্টি চলতে থাকে। গঙ্গার সলিলস্রোত ও কলনাদের ছন্দে অতীতের সহস্র বৎসরের কীর্তি কাহিনীর মর্মটুকু শব্দময় হয়ে ওঠে। তারপর চোখে পড়ে ডাফরিন ব্রিজ—রেল লাইন আর ট্রেনের ইঞ্জিনের হুইসিল। বিংশ শতাব্দীর মূর্তি সম্মুখে এগিয়ে আসে—বর্তমানের কথা আবার মনে পড়ে যায়। কিন্তু তার আগে এতক্ষণ বারাণসীর এক ঐতিহাসিক রহস্যে, এক অদ্ভুত অনুভবের আবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়।

মধুমালার দেশ

'স্বপ্নে দেখেছি আমি মধুমালার দেশ।'

এ যুগের শ্রেষ্ঠ ছন্দোবদ্ধগ্রন্থগীত সম্মুখে রয়েছে সারি সারি। পাতা উল্টিয়ে পড়ি, আবৃত্তি করি। বিচিত্র কল্পনা, ভাব, ভাষা ও ছন্দের বৈভবে মন আত্মহারা হয়। বাস্তবতার শাসন দীর্ণ করে মন যেন অরূপলোকে উত্তীর্ণ হয়। কত কল্পান্তরের আবেগ শরীরী হয়ে সম্মুখে আসে। যা অনির্বচনীয়, যা অধোয়া, তাই যেন প্রত্যক্ষের আনাচে কানাচে মুখর হয়ে ওঠে, বর্ণছটা সৃষ্টি করে।

যে কবিতাই পড়া যাক না কেন, যদি সেটা সত্যিই কবিতা হয়, তবে তার মধ্যে এমন কোন গুণ থাকবে যার আবেদন শুধু যুক্তি ও বুদ্ধির মধ্যে পড়ে না। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার সাযুজ্য তাকে লাভ করতেই হবে, যার প্রসাদে একটা রূপের আশ্রয় পাওয়া যায়। বস্তু ও ভাব পরিবেশন করেই শুধু কাব্য ও শিল্পের কর্তব্য শেষ হয় না। সমস্ত ছাড়িয়ে পৌঁছতে হবে রূপে। ভাব ভাষা ছন্দ ও বিষয়, সব কিছুই লুব্ধ চঞ্চল ভ্রমরের মত এই বাঞ্ছিত রূপের মুদ্রিত পদ্মটির চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শিল্প, কাব্য-সাহিত্য, কথাসাহিত্য—সবারই লক্ষ্য এই রূপ। রসিক পাঠককে যে শিল্প ও সাহিত্য এই রূপলোকে হাত ধরে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়, সে সাহিত্য সাহিত্যই নয়, সে কাব্য কাব্য নয়, সে কথা কথা নয়।

• • •

তাই নতুন যুগের কাব্য সাহিত্য পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ক্লান্ত মস্তিষ্কে স্বপ্নে দেখি মধুমালার দেশ। জ্যোৎস্নারাতের কনাস্ত দেশের মত সেই আমাদের রূপকথার জগৎ। সে জগতের রূপ ছেলেবেলা থেকে প্রত্যেক শিশু শ্রুতিধরের মত শুনে শুনে নিজের কল্পনার সিন্দুক পূর্ণ করেছে, বড় হয়ে সঁপে দিয়েছে শিশু পরপুরুষের কাছে। বিনা অক্ষরে বিনা পুঁজিতে এই রূপকথা কত পুরুষ ধরে আমাদের মানসলোকে প্রবাহিত হয়ে আসছে জানি না। রূপকথার এই প্রাণশক্তির, এর অফুরাণ ঐশ্বর্যের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। মানুষ সভ্য হচ্ছে, জ্ঞানী হচ্ছে, অনুশীলন ও বিশ্লেষণে নিপুণ হচ্ছে, ঐতিহ্য ও সংস্কারকে ঝাড়া দিয়ে পুরাতন নির্মোকের মত ফেলে দিচ্ছে। আজকের সাহিত্য কাল অচল হয়ে যায়। কত

পুরাণ, মহাকাব্য ও গীতিকা সাগর লহরী সমান জনমি পুনঃ মিলিয়ে যাচ্ছে। কত শাস্ত্র, নীতিকথা, দোঁহা, স্তোত্র ও মন্ত্র সাধক ও কবির মুখে রচিত হলো, দেশ বা জাতির সমাজ ও সম্প্রদায় বিশেষে তার স্থান হলো। কিন্তু কত দিন? কটা যুগ শেষ না হতেই তা মিলিয়ে গেল জলের তিলকের মত। কত ছন্দসিক ও বৈয়াকরণিক এ কাব্যকে অলঙ্কৃত করেছে, কিন্তু মহাকালের পরীক্ষায় তা লোকময় হয়ে টিকে থাকতে পারে নি। যদি কেউ বলেন, কবি কালিদাস অমর, সে কথা সত্য বলে স্বীকার করতে পারবো না। কালিদাসকে ক' বছরের মধ্যেই মেরে ফেলা যায় যদি অক্ষর ও লিপি অর্থাৎ লিখনকলাকে নিঃশেষ করে ফেলা হয়। কালিদাসের অমরতার মন্দির দাঁড়িয়ে আছে কাগজে কলমে লেখা কাব্যগ্রন্থের ভূমির ওপর। সে ভিত্তি যদি ভাঙে তবে কালিদাসের কাব্যের অমরতাও ভাঙবে। অন্যপক্ষে দেখি আমাদের রূপকথা সাহিত্যের এই অস্থূল প্রাণাশ্রয়ী ও লোকোত্তর শক্তি। সে কথার রূপ প্রখর জ্যোতিষ্কের মত কালের আকাশে বিনা নির্ভরে ভেসে আসছে যুগ যুগ ধরে।

* * *

প্রথম নিঃশ্বাসের মত প্রত্যেক শিশু এই রূপকথার প্রসাদ গ্রহণ করে তার সমস্ত সত্তা দিয়ে। সমস্ত জীবনে তাকে সে আর ঠেলতে পারে না। তাই মধুমালার দেশ স্বপ্নে আজও দেখা দেবে, তাতে আশ্চর্যের কি আছে?

কারা ছিল সেই কথাকার? কথাকে এত রূপ দিয়েছিল কোন্ কবি? কে তাদের নাম জানে? কোথায় তারা কুড়িয়ে পেয়েছিল এই স্বপ্নছবি? এই অপূর্ব অদ্ভুত পুরাতন মেঘদূতের মহিমা আজও অম্লান।

সাত ভাই চম্পা জাগো রে! পারুল দিদির ডাকে সাড়া দাও। রাজার মালী ফুল তুলতে এসেছে। দিও না দিও না ফুল। রাজা এসেছে, চলে যাক্, সুয়োরানী এসেছে চলে যাক্। এবার আসছে দুয়োরানী দুঃখিনী ; সাত ভাই আর বোনের মা। সাতটি চাঁপা ও পারুল ঝাঁপিয়ে পড়লো মায়ের বুকে।

রূপকথার এ আলেখ্য যে রচেছিল সেই অজ্ঞাত শিল্পীর প্রতিভাকে আজ প্রণতি জানাই। জানি অতিদূর বিস্মৃত দিবসের এই কবিগুরু আজ কোন স্মৃতিপটে নেই, কোন নির্মাল্য অর্ঘ সেখানে পড়ে না। তবে জানি কবিতা কল্পনা ও কথার সাহিত্যে এরকম সৃষ্টির তুলনা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল।

* * *

মধুমালার দেশে যে কল্পনার ফসল একদিন ফলেছিল তারই প্রসাদ আজও আমরা অকাতরে গ্রহণ করে কথাকে রূপদান করি। 'সোনার কাঠি' ও 'রূপার কাঠি'র রূপ যাঁদের কবিত্বের ইন্দ্রজালে সত্য হয়ে উঠেছিল, তাঁরা কি 'গেঁয়ো' কবি ছিলেন। সে সোনার কাঠি যে শত যুগের রুচিবিপ্লব উত্তীর্ণ হয়ে আজও ক্লাসিক গরিমায় প্রতিষ্ঠ রয়েছে।

পাতালপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, পক্ষীরাজ আর সাপের মণি—এ রূপকথার জগৎ কাদের সৃষ্টি? মনে হয়, কোন প্রলয়ে সে জগৎ বুঝি নষ্ট হবে না কোন দিন। উপনিষদের জীবাত্মা আর পরমাত্মারূপী দুই পাখির কথা পণ্ডিতেরাই বোঝে, সহস্র বৎসর পরে পণ্ডিতেরা হয়তো তাও ভুলে যাবে, কিন্তু রূপকথার দেশে বেঙ্গমা বেঙ্গমী গাছের ডালে বসে যে আলাপ করে গেল, তার গুঞ্জরণ অনাহত ছন্দে এখনও বেজে চলেছে—রূপগ্রাহী মানুষের স্মরণের মধ্যে।

• • •

তাই মনে হয়, শিল্প ও সাহিত্যে আমরা একান্ত মনে খুঁজছি শুধু এই একটি জিনিস—রূপ। সাহিত্যকে রিপোর্ট না হয়ে রূপকথা হতে হবে। আমরা দেখতে চাই, আমাদের যুগের বেদনা আনন্দ সংসার সংগ্রাম শুধু ভাষা ও ছন্দের জোরে মুখর হবে না, শুধু ভাবের ভারে অন্ধ হবে না, শুধু জ্ঞানঘন হবে না। তাকে রূপময় হতে হবে।

মহেঞ্জো-তরুণীর মৃত্যু

ধনধান্যে সমৃদ্ধ, হাসি আনন্দ কলরবে মুখরিত একটি নগর। শানবাঁধানো বড় বড় রাস্তা, সমস্ত দিন পথ দিয়ে কর্মব্যস্ত নরনারীর আনাগোনা। হাতি ঘোড়া ও মানুষ-টানা বড় বড় রথের আকারে গাড়ি বোঝাই পণ্য-সামগ্রী আসে আর যায়। বড় বড় অট্টালিকার বাতায়নপথে সঙ্গীতের সুশব্দ ও নৃত্যপরা ললনার নূপুর নিক্কণ শোনা যায়। বিচিত্র কারুকার্যে খচিত প্রত্যেকটি তোরণদ্বার। দূর সিরিয়া বাবিলন ও মিশর থেকে পণ্যসম্ভার নিয়ে শহরের সদাগর ছেলেরা বছর শেষে ঘুরে আসে। নরনারী প্রত্যেকের পরিপাটি বেশভূষা, গায়ে দামী পাথর ও ধাতুর তৈরী নানা অলংকার ও আভরণ। এই নগরে অস্ত্রের ঝনঝনা শোনা যায় না। মানুষের মনে রাজ্যজয়ের কোন তাড়না নেই,—তারা চায় সুখে ও শান্তিতে ভরা নিরুপদ্রব জীবন। কোন প্রাচীর বা পরিখা দিয়ে নগরকে ঘিরে রাখা হয় নি।

সেদিন ভোরে, সিন্ধুনদের পূর্বপ্রান্তে দেওদার বনে ঘুম-ভাঙা পাখির ডাকের সঙ্গে সূর্য উঠছে। অকস্মাৎ সারা নগরের বুক ভেদ করে এক আর্তনাদ বেজে উঠলো। দস্যুরা হানা দিয়েছে। পশ্চিম গিরিমালার সহস্র গুহাকন্দর ও বালুকাপ্রান্তর থেকে নানা ভয়ানক হিংস্র আয়ুধে সজ্জিত দস্যুর দল লুব্ধ জন্তুর মত এই সুসভ্য নগরের পথে ঘাটে অতর্কিতে এসে ছড়িয়ে পড়েছে। হত্যার উৎসবে লাল হয়ে উঠলো নগরের কঠিন পাথরের পথ। দস্যুরা আগুন লাগিয়ে দিল—নগরের সেই দারুময় শিল্পশোভা ভস্ম ও অঙ্গার হয়ে ঝরে পড়তে লাগলো।

• • •

নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এক তরুণী নটী। উৎসবরজনীর শেষে তার ক্লান্ত ঘুমন্ত দেহভার পড়েছিল নৃত্যকক্ষের মেঝের ওপর। গায়ের আভরণগুলি খুলে রাখারও সময় হয় নি। হঠাৎ ঘরের সিঁড়িতে শোনা গেল উন্মত্ত দস্যুদের চীৎকার। একজন দস্যু একহাতে এসে ধরলো নটীর গলার মণিময় মালা, আর একজনের হাতের উদ্যত খড়্গ নির্মমভাবে এসে আঘাত করলো তরুণীর অঙ্গে।

তরুণী দস্যুদলের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে রক্তাক্তদেহে ছুটে পালাচ্ছে। তার গলার হার ছিঁড়ে মণিশিলাগুলি খসে ঝরে পড়ছে পথের ওপর। পেছনে ধাবমান দস্যুরা উল্লাসে চীৎকার করে কুড়িয়ে নিচ্ছে তার দেহচ্যুত যত রত্ন আভরণ। তরুণী নটী তবু ছুটে পালাচ্ছে আশ্রয়ের জন্য, প্রাণরক্ষার জন্য।

বড় রাজপথের পাশে নেমে গেছে সরু একটা গলি। সেখান দিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা অন্ধকারময় মণ্ডপ। সেখান থেকে একটা পাথরের সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে গেছে নীচে। সিঁড়ির শেষে একটা গোপন কুঠরি, তার পাশেই একটি জলভরা কূপ।

এক আঁজলা ঠাণ্ডা জল খেয়ে তরুণী সেখানে বসে পড়লো। পেছনে উন্মত্ত দস্যুদের রব আর শোনা যায় না। ওপর দিকে তাকালে দেখা যায়, পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমকুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। সমস্ত নগর পুড়ছে।

এখনো দেহে প্রাণ আছে। তরুণী একবার চেষ্টা করলো, সে ওপরে উঠবে আবার। দেখবে সেই নিহত নগরের চিতাবহ্নি শান্ত হলো কি না। কিন্তু বৃথা! এক-পা দু'পা করে কয়েক সিঁড়ি ওপরে উঠেই তার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসে মিশে গেল। নগরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেই তরুণী নটী পড়ে রইল সেই সিঁড়িতে মাথা রেখে।

• • •

তারপর, এক দুই তিন করে সাতটি হাজার বছর কেটে গেছে। কিন্তু তরুণী নটী তেমনি পড়ে রয়েছে সিঁড়িতে মাথা রেখে। আজও তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

যে কাহিনী বলা হলো, তা আদৌ রূপকথা নয়। এটা ইতিহাসের কথা, আমাদেরই ভারতের ইতিহাস। অতীত ভারতের এক গৌরবময় যুগে, হঠাৎ একদিন এমনই এক ট্র্যাজেডি নেমে এসেছিল। এই কাহিনী কোন শিলালেখে বা তাম্রলেখে পাওয়া যাবে না। মাটি খুঁড়ে এই কাহিনীকে হাড়গোড় সুদ্ধ পাওয়া গেছে। প্রাগার্য ভারতের সভ্যতা অর্থাৎ সিন্ধুসভ্যতার লীলানিকেতন মহেঞ্জোদড়োর স্তূপ খনন করে এই তরুণীর অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। সাত হাজার বছর আগে সেই দুর্ভাগিনী ঠিক যেভাবে সিঁড়ির ওপর মাথা রেখে মরেছিল, আজও তাকে সেইভাবেই পাওয়া গেছে। হাঁটুটি এখনো যেভাবে রয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মরবার আগে সে হামা দিয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেছিল। তার নাম ধাম গোত্র সঠিক জানা যাবে, এমন কোন প্রমাণ সেখানে নেই। কোন্ দুঃসহ ব্যথা বা ঘটনা তার জীবনের এমন করুণ পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিল তাও জানা যায় না। কিন্তু তার গায়ে অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন থেকে এবং আরও নানা প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে, তার জীবনের ঐ ট্র্যাজেডির কাহিনী কল্পিত হলেও একান্ত অসম্ভব নাও হতে পারে।

• • •

বড় বিস্ময়কর এই সিন্ধু সভ্যতা। দুঃখের বিষয় এত বড় একটি কীর্তির সম্বন্ধে কোন লিখিত পরিচয় কোথাও কিছু পাওয়া যায় নি। সিন্ধুনদের সারা উপত্যকা জুড়ে যে সভ্যতার বিস্তার ছিল, যে মানুষেরা দূর ব্যবিলন মিশরের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রাখতো, যাদের শিল্পরুচি এত উন্নত ছিল, যারা এত উন্নত নগর পত্তন করার মত পূর্ত্ততত্ত্ব আয়ত্ত করেছিল, তাদের জীবনের ছবি শুধু আমরা কল্পনা করে নিই। তাদের নামধাম আচার ব্যবহার ভাষা পরিচ্ছদ—কোন কিছুরই বিশদ পরিচয় পাওয়া যায় না।

নাচের ছবি

ঝড়ের ফটো কেউ দেখেছেন কি? অনেকে নিশ্চয় দেখে থাকবেন। তবে ঝড়ের ফটো সচরাচর চোখে খুব বেশী পড়ে না।

কল্পনা করা যাক উনপঞ্চাশ বায়ু বল্গা ছেঁড়া ঘোড়ার মত প্রমত্ত হয়ে আকাশ জুড়ে দাপাদাপি করছে। ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে আসছে দিগন্তের কাজল সমুদ্র

থেকে। আর্ত চীৎকার ছেড়ে গ্রামান্তরে বেণু বন আভূমি হেলে পড়েছে। শাবকসুদ্ধ পাখির বাসাগুলি লুটের বাতাসার মত ছিটকে পড়ছে ক্ষেতে, মাঠে, মাটিতে। অন্তরীক্ষ থেকে কোন ক্ষ্যাপা দেবতা বনবাদাড়ের ঝুঁটি ধরে টানছে সমস্ত নির্মম শক্তি দিয়ে। নোঙর-ছেঁড়া নৌকাগুলি রসাতলের টানে ঢেউয়ের বাড়ি খেয়ে উন্মত্ত হয়ে ছুটছে। লিক্‌লিকে বিদ্যুতের ঝলকে মেঘের স্তবক চিড় খেয়ে ফেটে যাচ্ছে।

এই ঝড়ের ছবি তোলা হলো ক্যামেরায়। তারপর তুলনা করা হোক্ এই ঝড়ের ফটো আর সেই চোখে দেখা ঝড়ের স্মৃতিচিত্র।

সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে না। সাদা চোখেই ফটোটি দেখুন। দেখা যাবে তার মধ্যে কালো মেঘ আছে, ছিটকে পড়া পাখির বাসা আছে, হেলে পড়া বাঁশবন আছে আর বিক্ষুব্ধশীর্ষ বনবাদাড় আছে। কিন্তু ঝড়ের ছবি কোথাও পাওয়া যাবে না। অমন উদ্দাম বিদ্যুল্লেখা যেন খড়ি দিয়ে আঁকা একটা স্তব্ধ রেখা ; প্রকৃতিশরীর যেন কোন রোগে বেঁকে চুরে বসে আছে ; একটি বিকৃত নিসর্গের প্রতিচ্ছবি।

ফটোতে সব বস্তুর এত ভাল রূপ ফুটে ওঠে, ঝড়ের বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন?

• • •

ফটোতে সব জিনিসেরই চিত্র ফুটে উঠবে ঠিক, শুধু একটি জিনিস ছাড়া, সেটা হলো গতির ছবি। মানুষ, পশুপাখি, স্থান, স্থানু—সব কিছুরই নিখুঁত প্রতিরূপ (বর্ণ বাদ দিয়ে) ফটোতে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু গতিকে ফটোতে ধরা সম্ভব নয়। ফটোতে স্থানু রূপই শুধু প্রকাশ পেতে পারে। যেটা নিছক গতি ও ভাব ছন্দ রূপ বিভঙ্গ বিক্ষোভ ফটো প্লেটের বা সেলুলয়েডের নির্জীব চক্ষে ফুটে উঠতে পারে না। এক সেকেণ্ডের একশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেও যে ত্রস্তা পলায়নরতা হরিণীর ছবি ফটোপ্লেটে ধরা পড়বে সেটাও স্থানুর ছবি, গতির ছবি নয় ; যেমন চোখে দেখে বলা সম্ভব নয় ডালে নুন হয়েছে কি না।

যে কোন সচিত্র পত্রিকার পাতা উল্টালে চোখে পড়বে নাচের ছবি। নাচের ছবি—কাঁটালের আমসত্ত্বর মতই শোনায়। যে বস্তুর প্রাণ গতি, তাকে এইভাবে স্তব্ধ করে, দাঁড় করিয়ে বোঝান কি সম্ভব? যে লাস্য, অঙ্গহার রেচক ও মুদ্রার ছন্দোময় গতিহিল্লোলে নৃত্যের রূপ সৃষ্টি হয়, সে জিনিস এই সব ফটোর ঘাড় বাঁকানো পা-তোলা সব জড়পুত্তলি মূর্তির মধ্যে পাওয়া কি সম্ভব? নৃত্যরত কতগুলি মানুষের ছবি ফটোতে দেখলে মনে হয়, যেন কতগুলি বিকলাঙ্গ লোক দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত ভঙ্গীগুলিকে ভেংচি বলেই মনে হয়।

কোন সৌখীন ভদ্রলোক নিজের ফটো তোলবার সময় জামাকাপড়ে ভাল করে সুগন্ধ মেখে নিতেন। তিনি সুগন্ধভরা একটি ফটো আশা করতেন কি না জানি না। কিন্তু যাঁরা নাচের ফটো তোলবার আশা করেন তাঁদের কি করে থামানো বা বোঝান যায়? বোঝা উচিত যে, ছবিতে গতির রূপ দিতে হলে চাই তুলির সাহায্য। ওটা চিত্রকলার অথবা ভাস্কর্যের এলাকা। নটরাজের প্রলয় নাচন শিল্পীর হাতেই রূপ পেতে পারে ; কেন না শিল্পীর এই ছবি বা মূর্তি রেখার 'বন্ধনে' স্থির নয়, রেখার স্ফূর্তিতে ও অবাস্তব স্বাধীনতায় তার উদ্দামতা ও গতিপ্রাণতা রূপময় হয়ে উঠেছে।

মিউজিয়মের বাঙালী

বাঙালী কোন্ জাতি? কুলপঞ্জিকায় যে সব তত্ত্ব আছে তার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক্, নৃতত্ত্বে কি বলে?

রিজলী সাহেব বলে গেছেন, আমরা বাঙালীরা না কি মঙ্গোল-দ্রাবিড় মিশ্র রক্তের সন্তান। এর পর এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। সেসব পড়ে দুটি সিদ্ধান্ত করা যায়, হয় জাতি হিসাবে বাঙালী কিছুই নয়, অথবা সব কিছু। খুলি, চোয়াল ও চুল দেখেই না কি মূল গোত্রগুলি বলে দেওয়া যায়। এই ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেই যে যা বলেছেন, তাতে বুঝলাম সত্যই হেথায় একদিন আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন সকলে এক দেহে লীন হয়েছিল। বাঙালীর করোটীতে খুব বড় রকমের একটা বর্ণসাঙ্কর্যের ইতিহাস লেখা রয়েছে। নেগ্রিটো আলপাইন, প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড কিছুই বাদ পড়ে নি।

পণ্ডিতদের লেখা পড়েই এরকম একটা ধারণা মনে গেঁথে গিয়েছিল। কিন্তু একবার যাদুঘর ঘুরে এলে কোন বাঙালীর এই ধারণা নিঃশেষে দূর হয়ে যাবে।

—একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন, নানা জাতির মৃৎ ও প্রস্তর মূর্তি অধ্যুষিত যাদুঘরের একটি সুপ্রশস্ত কক্ষে, দেয়ালের গায়ে বসানো রয়েছে একটি আস্কন্ধ মূর্তি। বোধ হয় তরুণ বয়সের 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট'। লম্বা সুউচ্চ নাক, টানা টানা ভ্রূ আর চোখ, সুদৃশ্য চোয়াল, ঢেউ খেলানো চুলের স্তবক মাথা ছেয়ে রয়েছে।

ঐ বস্তুটি কি? অ্যাপোলোর মুণ্ডও হতে পারে। একটু এগিয়ে গেলেই কিন্তু এ ভ্রান্তি ঘুচে যাবে, কারণ মূর্তিটির নীচে স্পষ্ট লেখা রয়েছে—বাঁকুড়ার জনৈক রাঢ়ী ব্রাহ্মণ।

এই চাক্ষুষ প্রমাণের পরেও কি বলবো আমরা বাঙালীরা অনার্য?

কথারূপ

ভাষায় চলতি এমন এক একটি শব্দ পাওয়া যায়, যার মধ্যে অদ্ভুত হিউমার, কবিত্ব, ইতিহাস ও উপকথার সংক্ষিপ্ত রূপ লুকিয়ে থাকে। ইংরাজীতে ফুল, ফল, পাখি প্রভৃতির নামের মধ্যে এই ধরণের অজস্র অর্থগূঢ় শব্দ পাওয়া যায়। কণ্ঠাস্থিকে 'বাবা আদমের আপেল' বা ঢেঁড়সকে 'ভদ্রমহিলার আঙুল' বলার মধ্যে সত্যিকারের কবিত্ব রয়েছে।

বাংলা ভাষাও এদিক দিয়ে গরীব নয়। যে ভাষায় পাখির নাম 'বউ কথা কও' বা 'চোখ গেল' সে ভাষার সঙ্গে কাব্যময় শব্দের প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর খুব কম ভাষাই টেক্কা দিতে পারবে। এ ভাষার প্রকোপে পড়ে নীলকর সাহেবের সগুড়ও 'শ্যামচাঁদ' হতে বাধ্য হয়েছে। 'লেডিকেনি'র কথা তো সকলেই জানেন—এক লাটগিন্নীর নামের রসে আজও ভারি হয়ে আছে। এই বাংলা দেশেই আকাশ থেকে 'ইলসেগুঁড়ি' ঝরে পড়ে। এইটুকু 'বেনে-বৌ' ঘাসের ডগার ওপর বসে থাকে। 'তাঁতী-বৌ' গাছের পাতা থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে মুখের লালা দিয়ে জাল বোনে আর মাছি বেঁধে রস শুষে খায়। এক ধানেরই বোধ হয় অষ্টোত্তর শতনাম আছে—কনকচুর, খেজুরছড়ি, দুধরাজ, মৌকলস, জামাই লাড়ু, সীতাশালি, লক্ষ্মীকাজল। 'বিশ্বনাথ মুখো' অমৃত ফল হয়ে গাছে গাছে ঝুলছে। ফুল বাগানে 'শ্যাম

সোহাগিনী' ফুটে উঠছে প্রতি সন্ধ্যায়।

সংস্কৃত শব্দেও এ ধরণের নামরসের অভাব নেই। একটি শব্দ দেখলাম—'তুরঙ্কা'। প্রথমে মনে হলো এ বুঝি 'তুরস্ক নারীর' কোন প্রতিশব্দ হবে। কিন্তু আসলে তা নয়; 'তুরস্ক' একটি অতি সাধারণ মসলা, যাকে আমরা যোয়ান বলি।

সব চেয়ে আশ্চর্য লাগে 'ব্রাহ্মণী' শব্দটি। শব্দটির মধ্যে বর্ণাশ্রমসুলভ বেশ একটু বিকার ঘটাও রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ বুঝবার পর একটু দুঃখই বোধ হলো। 'ব্রাহ্মণী' অর্থ কোচিন মুর্গী।

অবলা থিওরি

কোন কোন ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে নারীর আত্মা নেই। ফিলসফিতেও কতখানি 'সাম্প্রদায়িকতা' থাকতে পারে, এটা তারই একটা বড় নমুনা। যে সংস্কৃতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্টি তাতে এ রকম নারীবিরুদ্ধ মতবাদের প্রশ্রয় ও উৎসাহ দেওয়া হবেই; এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অপর অনেক ধর্মশাস্ত্র ও সংহিতা আছে যাদের দৃষ্টি একটু উদার। তারা নারীর আত্মা নিয়ে এতটা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেয় নি। তাদের মতে পুরুষ ও নারী, দুইই বিধাতার সৃষ্টি; উভয়ের মধ্যেই জীবাত্মার অধিষ্ঠান। পৃথিবীর সকল দেশের ফিলসফির মধ্যে এ বিষয়ে সব চেয়ে উদার মতবাদ প্রচার করেছে ভারতের সাংখ্য। নারী সম্বন্ধে এতটা উদার উক্তির তুলনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। সাংখ্যের 'পুরুষ' হ'ল নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই প্রধানা শক্তি ও সৃষ্টির অধিনায়িকা।

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রাচীন মানবসমাজে নারীই ছিল সমাজের কর্ত্রী। পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে কি করে ও কিভাবে তারা গৌরবের আসন থেকে নেমে এল তার বিশদ কাহিনী এখন শুধু অনুমানসাপেক্ষ। তবে নারীর অদৃষ্টে এ ট্র্যাজেডি ঘটেছে, এটা অস্বীকার করা যায় না।

পুরুষের রচিত ফিলসফির প্রচারক স্বরূপ আবির্ভূত হলেন মধ্যযুগের কবির দল। তাঁদের একটি মাত্র ধূর্ত প্যাঁচের জোরে নারীজাতির সকল মর্যাদায় বিপ্লব ঘটে গেল। প্রচারিত হল—নারী অবলা, লজ্জাই তার ভূষণ। ব্রীড়াশীলা অবনতমুখী নারী, গৃহ তার একমাত্র কর্মস্থলী, সেবা ও সন্তানধারণ তার একমাত্র ধর্ম। দেখা গেছে ঠিক যেদিন থেকে এই অবলা থিওরি নারী সমাজে বিশ্বাসের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে, ঠিক সেই দিন থেকে সুরু হয়েছে তার বুদ্ধির অপকর্ষ। এইখানে নারীর ঐতিহাসিক অধঃপতনের আরম্ভ। ধীরে কোথায় মিলিয়ে গেল মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সবলা মানবীর প্রতিভা, কর্মশক্তি আর বুদ্ধিচর্চা।

* * *

পুরুষতন্ত্র একবার যখন প্রতিষ্ঠিত হ'ল তারপর নারীর বন্ধনদশা দৃঢ়তর করার জন্য নানাদিকে প্রচেষ্টার আর অন্ত রইল না। বৈজ্ঞানিকেরাও কতখানি সঙ্কীর্ণ হতে পারে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একদল বৈজ্ঞানিক প্রচার করলেন—নারীর মস্তিষ্ক না কি আয়তনে ও ওজনে পুরুষের মস্তিষ্কের চেয়ে অনেক ছোট। কাজেই বুদ্ধিচর্চায় নারী পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর থাকবে এটা প্রকৃতির বিধান।

তবু সুখের কথা, আধুনিক বিজ্ঞানীরা এটা অস্বীকার করেছেন। নারীর মস্তিষ্কের আয়তন

পুরুষের মস্তিষ্কের অনুপাতে ক্ষুদ্রতর নয়। বরং দেখা গেছে, দেহের আয়তনের অনুপাতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের মস্তিষ্ক বড়।

• • •

নারীর বিরুদ্ধে অখ্যাতি সৃষ্টি করতে মাঝে আর একটি থিওরি খুব জোর গলায় প্রচার করা হ'ল—নারীর চেয়ে পুরুষ না কি দৈহিক সৌন্দর্যে বড়। হেলেনিক আর্ট তার সব চেয়ে বড় নিদর্শন। গ্রীক শিল্পীরা নারীর চেয়ে পুরুষের দেহের মধ্যেই সৌন্দর্যের পরিচয় পেল বেশী করে। গ্রীক ভাস্কর্যে নারীকে আর্টের একটু উপেক্ষিতা হয়েই থাকতে হয়েছে।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন : 'স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে, ময়ূরীর তাহা নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুঁটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষসকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই।'

পুরুষরচিত রূপতত্ত্বের সাম্প্রদায়িকতা মনোবিজ্ঞানীরা এক যুক্তিতে উল্টে দিয়েছেন। প্রাচীন মানবসমাজের কোন নারী দার্শনিক ঠিক এইভাবেই বলতে পারতেন—পুরুষ কি কুৎসিত! ময়ূরের গায়ে এত নোংরা পেখমের বোঝা ; মোরগের মাথায় সেই তাম্রচূড়া, সিংহের ঘাড়ের রোঁয়া আর ষাঁড়ের ককুদ—কি কুৎসিত আবর্জনায় ভারাক্রান্ত পুরুষের দেহ !

জীবজগতের পুরুষদেহের এই স্বাভাবিক অলঙ্কারের যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেটাও আবার সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। রূপতত্ত্বের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলেও দেখা যায় যে, কীট ও পতঙ্গ জগতে এর ব্যতিক্রম আছে। অধিকাংশ পতঙ্গ ও কীটের মধ্যে অবয়বের অলঙ্কারে স্ত্রী-জীবই সমৃদ্ধ। দৈহিক শক্তিতেও স্ত্রী-কীট ও স্ত্রী-পতঙ্গ পুরুষের চেয়ে উন্নত।

• • •

'যাবো না বাসরকক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,
আমারে প্রেমের বীর্যে কর অশঙ্কিনী।
বীর হস্তে বরমাল্য লবো একদিন···'

রবীন্দ্রকাব্যে সবলা নারীর মুখে এই উক্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত। আজ আবার প্রত্যেক দেশে নারী-অভ্যুত্থানের মধ্যে এই সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে। নারী অবলা নয়, শক্তিতেও সে পুরুষের সমান।

আর একটা কথা বিশেষ করে অবিশ্বাস করার সময় হয়েছে। ইতিহাসের সবলা নারী আজও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয় নি ; যদিও এর জন্য গোঁড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উদ্যোগে যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন করা হয়েছে।

আধুনিক নারীও দৈহিক শক্তিতে পুরুষের চেয়ে কত উন্নত তার প্রমাণ স্কটল্যাণ্ডের নারী শ্রমিক। ভারতেও এর নিদর্শনের অভাব নেই। মহারাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী শ্রমসাধ্য ও দৈহিক শক্তিসাপেক্ষ কাজ নারীরাই করে। মহারাষ্ট্রের এক কারখানায় আশ্চর্য হয়ে দেখেছি, সেখানে মেয়ে শ্রমিকেরা বড় বড় ঘান হাতুড়ী চালাচ্ছে আর পুরুষ শ্রমিকেরা শুধু চিমটে দিয়ে লোহার পাত নাড়াচাড়া আর ঠুকঠাক করছে।

বাংলাদেশেও নারীর দৈহিক শক্তির উৎকর্ষের প্রমাণ পেতে হলে বাঁকুড়া, বীরভূম আর মানভূমের মেয়ে শ্রমিকদের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যায়। দু' মণ ওজনের বোঝা শুধু

নারী শ্রমিকেরাই বহন করতে পারে। পুরুষ শ্রমিক এদিকে ঘেঁসে না। কিন্তু অত্যন্ত বিচিত্র ও দুর্ভাগ্যের বিষয়, মেয়ে শ্রমিকদেরই মজুরী কম।

* * *

তবুও অস্বীকার করার উপায় নেই যে আধুনিক সমাজে নারী ঠিক স্বাধীন নয়। তাকে পুরুষের আশ্রিত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। নারী সব দিক দিয়ে পুরুষের সঙ্গে সমান কৃশলী ও যোগ্য হয়ে ঠিক এঁটে উঠতে পারছে না। সুতরাং এক বিষয়ে নারী এখনও পুরুষের চেয়ে অনগ্রসর নিশ্চয়। পুরাতন মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সবলা নারী নিশ্চয় এমন কোন গুণ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে যার অভাবে তার অভ্যুত্থান সুসিদ্ধ হতে পারছে না।

আধুনিক নারী সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে তার প্রাচীন যুদ্ধবিদ্যার নিপুণতা, সংহার ধর্মে সে আজ আর শ্রেষ্ঠ নয়, এখনও নয়। অথচ বর্তমান সমাজে যুদ্ধই জগতের ভাগ্যের কর্ণধার। কলহকলায় নারী অবশ্য পুরুষের চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মারণ সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করা ও ধ্বংসের জন্য আক্রমণমূলক উদ্যোগ করার উৎসাহ আধুনিক নারীর মনস্তত্ত্বে আর স্থান পায় না। এই দিকে তার প্রেরণা আজ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বাহুবল থাকা সত্ত্বেও দ্বন্দ্বে ও সংগ্রামে বাহুবলের প্রয়োগ করার প্রবৃত্তি তার লুপ্ত হয়ে গেছে।

গ্রীক ইতিকথার অশ্বারোহিণী আমাজন নারী-সম্প্রদায়ের রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও রণনৈপুণ্য এবং বীরনারী চিত্রাঙ্গদার কাছে অর্জুনের পরাজয় আজ কল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইতিহাসে এই কথাটাই একদিন সত্য ছিল, নারী অবলা ছিল না।

হে মোর দুর্ভাগা দেশ

একটা নাটকের খসড়া—

মহানগরীর বুকে রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। জনহীন পথ। প্রশস্ত রাজপথে দীপস্তম্ভে বাতি জ্বলে না। বিপণির দ্বার বন্ধ ; রথচক্রের ঘর্ঘর নাদ নেই, মোটরের ভেঁপু নেই। মানুষের কণ্ঠস্বর ঘরে ঘরে শঙ্কায় মূর্ছিত হয়ে আছে ; শহরের বাতাসে অদ্ভুত এক বিভীষিকার নিশ্বাস থমথম করছে বিষাক্ত বাষ্পের মত।

নির্ভয়ে ঘোরাফিরা করছে দুটো কুকুর। বন্ধ দুয়ারগুলির দিকে এক একবার তাকিয়ে বিস্ময়ে পথ থেকে পথান্তরে চলে যাচ্ছে তারা। স্তূপীকৃত আবর্জনায় পথ ঘাট কলঙ্কিত হয়ে আছে। প্রত্যেক গলির ছিদ্রে মুখগুলি প্রেতপুরীর ফটকের মত হাঁ করে রয়েছে।

মঙ্গল গ্রহ থেকে কোন জীব হঠাৎ এসময়ে এসে পড়লে হয়তো মনে করবে, সারাদিনের উৎসবের পর পুরবাসী সকলে পরম ক্লান্তির ঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাক্ষসপুরীর এ ছদ্মবেশ সে সহজে ধরে ফেলতে পারবে না।

* * *

পুরানো গোরস্থানের ভাঙ্গা পাঁচিলের এক পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে বসেছিল রহমান পাগলা। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে সে ফিক ফিক করে হাসছিল। সমস্ত দিনটা বড় অসোয়াস্তিতে কেটেছে তার। আজ সমস্ত দিন কোন চ্যাংড়ার দেখা নেই। দাড়ি টেনে উত্যক্ত করতে কেউ আসে নি। রহমান উঠে দাঁড়ালো।

কপালে সিগারেটের একটা রাংতা সেঁটে নিয়ে, পায়ে এক জোড়া ঘুঙুর বেঁধে, ছেঁড়া কম্বলের আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে রহমান আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো।

আজানের শব্দ আসছে না। মসজিদের কাছে নমাজীদের ভীড় নেই। রহমান একটু অবাক হলো, কিন্তু কিছুই ঠাহরে এল না। দুটো কুকুর পরম সুহৃদের মত রহমানের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। অন্যদিন এরাই আলখাল্লা কামড়ে খিমচে নাজেহাল করে। পাগলা রহমান ভাবছে, আজ সব ব্যাপারই কেমন উল্টো রকমের।

* * *

বুড়ো রাধু বৈরাগী বাজারের মুদির দোকানের আবর্জনা থেকে চাল ডালের দানা কুড়িয়ে রোজ রাত্রে খিচুড়ি রেঁধে খায়। বাজারের পাশে বাগানটায় একটা পোড়োবাড়ির দাওয়াতে তার সংসার—চটের বিছানা হাঁড়িকুড়ি উনুন। আজ রাত্রে কোন দোকানই খোলে নি, খুদকুঁড়োর আবর্জনাও নেই। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে রাধু হয়রান হলো। একে বুড়ো তার ওপর বোবা ও বধির। রাধু কাঁপতে আরম্ভ করলো। রাগ ও ক্ষিধে, দুইই খুব জোরে পেয়েছে।

হাঁটুতেএকটু জোর এনে লাঠিভর দিয়ে মাটির সরাটা বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো রাধু। বাজার পার হয়ে কাস্তরীর সড়ক। তারপর কয়েকঘর গেরস্থ বাড়ি। পেটে জ্বালা ধরেছে অনেকক্ষণ। দুমুঠো চাল যোগাড় করতেই হবে।

কাস্তরীর সড়কে ঘুটঘুটে অন্ধকারে বাজছে একটি মাত্র শব্দ—ঠুক্ ঠুক্। রাধু বৈরাগী লাঠি ঠুকে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে।

* * *

গলিতে গলিতেএক একটা মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে—জন্তু জানোয়ারের ছায়ার মত। শিকারের লোভে অন্ধকারে চোখ ভাসিয়ে রয়েছে। একটু শব্দ হলেই বিজলী বাতি ঝলসে ওঠে—শিকার এল কি না।

আজ এ নগরীর শিরায় শিরায় মরণের উম্মাদ রাগিণী বেজেছে। পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা। অন্ধ হিংসার ঝড়ে সমস্ত শুভবুদ্ধি লোপাট হয়ে গেছে। ভ্রান্ত স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত। মূঢ় সম্প্রদায়-প্রেম ভোজালী হাতে পথের আনাচে কানাচে ওৎ পেতে বসে আছে। আজ এই নগরীতে কীট পতঙ্গ পশু সবাই নিরাপদ ; শুধু মানুষ ছাড়া। বিংশ শতাব্দীর বাংলার এক নগরীর ভদ্র বর্বরতা পঙ্কশয্যা থেকে জেগে উঠেছে কদর্য পরিণাম নিয়ে।

সড়কে সড়কে দলবেঁধে খুনিয়ার মানুষের দল। লাঠি, ছুরি, বল্লম, এসিড, সোডার বোতল আর কেরোসিনের টিন হাতে। চোখে গুহামানবের ক্ষুব্ধদৃষ্টি, শত্রুর গায়ের গন্ধ পেয়ে পাগল হয়ে ছুটেছে সব। মুখে দেশমাতৃকা আর পরমেশ্বরের উৎকট স্তুতিধ্বনি।

পাড়ায় পাড়ায় জেগে উঠলো আগুনের তাণ্ডব—লেহি লেহি বিরাট অম্বর। অন্তরীক্ষে কালাপাহাড়ের প্রেতাত্মা প্রসন্ন হচ্ছে। মন্দির পুড়ছে, মসজিদ পুড়ছে—গ্রন্থাগার পুড়ে ভস্মসার হচ্ছে। বস্তিতে বস্তিতে অগ্নিশিখার জ্বালা আর ধোঁয়ার গন্ধে ঘুমভাঙা শিশুর চীৎকার।

* * *

পাগলা রহমানের পায়ের ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। গলির অন্ধকারে একোণ ওকোণ থেকেদশ বারটা লোলুপ ছুরির ফলা আনন্দে শিউরে উঠলো। তার অতি পরিচিত

এই খেলার মহল—পাগলের জগতে দুসমন নেই। পাগলার চোখে পড়ে নি, ঐ অন্ধকারে মিশিয়ে রয়েছে তার মণ্ডতের ভ্রূকুটি।

হঠাৎ টর্চের আলো ঠিক্‌রে এসে লাগলো পাগলা রহমানের মুখের ওপর।

ঘুঙুরের আওয়াজ থেমে গেল। ল্যাম্পপোস্টের নীচে কম্বলের আলখাল্লায় ঢাকা পাগলা রহমানের রক্তাক্ত দেহটা দু-চারবার ঘড়ঘড় শব্দ ছেড়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইল। একটা শেয়াল দৌড়ে ঢুকে পড়লো সুপুরির বাগানে—বোধহয় ভয়ে ও লজ্জায়।

• • •

আর একটি অঙ্কের যবনিকা উঠলো অন্য দিকে। রাধু বৈরাগী একটি লাঠির আঘাতে কাটা গাছের মত লুটিয়ে পড়েছে। বুড়ো ভিখিরির চোখ দুটো নিথর হয়ে দৃষ্টি মেলে রয়েছে। একের পর এক হত্যারা আসছে, ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোরার ঘায়ে হৃৎপিণ্ড ছেঁদা করে দিয়ে যাচ্ছে। বোবার কণ্ঠে প্রতিবাদ নেই। মৃত্যুপথযাত্রী ভিখিরির দৃষ্টিতে শুধু এই প্রখর জিজ্ঞাসা জেগে রইল—কি হয়েছে? কেন এই উল্লাস?

দুর্যোগ রাত্রির অবসানে আবার দিনের আলোতে দেখা দিল—হিংসার উৎসবে বিক্ষত নগরীর কদর্য শ্মশানরূপ। ময়নাঘরে রাধু ভিখিরি আর পাগলা রহমানের লাস এতক্ষণে গুমসে উঠেছে। আর—

বাংলার ঘরে ঘরে—আড্ডায় বৈঠকে ক্লাবে সোসাইটিতে—ভদ্রাভদ্র শিক্ষিত ধনী দরিদ্র, উৎকট কৌতূহলে সংবাদপত্রের ওপর মাথা উপুড় করে প্রলুব্ধ দৃষ্টি ঢালছে। কলমের পর কলম হাতড়ে তারা খুঁজছে হতাহতের তালিকা—ক'জন হিন্দু আর ক'জন মুসলমান। রাধু আর রহমান—ভিখিরি আর পাগল। এহেন দুটি জীবেরই গলিত মাংসের আস্বাদ গ্রহণ করছে লক্ষ লক্ষ ভদ্রসন্তান। তাদের সমস্ত ঐহিক পারত্রিক পরমার্থ, তাদের ধর্ম সংস্কৃতি রাজনীতি ও রাজপদ লাভের পথে বোধ হয় সব চেয়ে বড় কণ্টক ছিল ঐ দুটি প্রাণী। এইবার ল্যাঠা চুকে গেছে—সব সমস্যার অতি সহজে সমাধান হয়ে যাবে।

• • •

উপসংহারে বলতে হয় রাধু আর রহমানের বিশেষ একটা দুর্ভাগ্যের কথা। জীবনে তারা তো কখন বুঝতেই পারে নি যে তারা মানুষ। সমস্ত সমাজের ঘৃণার চোরাবালিতে তারা কীটের মত কিলবিল করেছে এতদিন। আততায়ীর ছোরা বুকে বরণ করে তারা জীবনে এই প্রথম অর্জন করেছে হিন্দুত্ব ও মুসলমানত্ব। কিন্তু দুর্ভাগ্য ; এই তত্ত্বজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করার, এই উপাধির গৌরব ভোগ করার আগেই তাদের আয়ু ফুরিয়েছে।

এই নাটকের নাম কি দেওয়া যেতে পারে? সাম্প্রদায়িক বিরোধ?

মরণ কি লাগি

—'একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য বার্তা বহন করে বহু কোটি বৎসর পূর্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীবকোষের কণা।'

সৃষ্টির রহস্য এখনও রহস্যই র'য়ে গেছে। এই জড় জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে দার্শনিকের চিন্তা ও বৈজ্ঞানিকের গবেষণার অন্ত নেই। এ বিষয়ে মতান্তরেরও অন্ত নেই।

কিন্তু জড় জগতে বিপ্লব ঘটিয়ে পৃথিবীতে একদিন আবির্ভূত হলো প্রাণ। সেই দিন

থেকে সুরু হলো সৃষ্টিকলার নতুন বৈচিত্র্য। এই প্রাণের নব নব রূপোন্মেষ এবং বহুধা অভিব্যক্তি নিয়েই জীবজগতের বিবর্তন এগিয়ে চলেছে।

জড় ও প্রাণে পার্থক্য আছে। জড়ের বিনাশ নেই (অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের এই মত)। কিন্তু প্রাণের বিনাশ আছে, অর্থাৎ জীবের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রাণের সবচেয়ে বড় রহস্য হলো যে, সে নতুন প্রাণ সৃষ্টি ক'রে যায়। জড়ের থেকে এইখানেই প্রাণের ব্যতিক্রম।

রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' থেকে আরম্ভে যে পংক্তিটি উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার থেকে এই ধারণা হয় যে, প্রাণ পৃথিবীতে পরে এসেছে। বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে বলতে গেলে সকলেই একমত। জড় আগে, প্রাণ পরে। জড়ই প্রবীণ, প্রাণ অর্বাচীন। আর একটা ব্যাপার থেকে এ ধারণা আরও দৃঢ়মূল হয়, জড় প্রাণকে আশ্রয় করে না, প্রাণই জড়কে আশ্রয় ক'রে বাঁচে। জড়ই প্রাণের পুষ্টি স্থিতির আধার। যদিও প্রাণের ভোক্তা।

* * *

প্রাণ একদিন এসেছিল নব সৃষ্টির মহিমময় বার্তা নিয়ে। কিন্তু কি ক'রে এল? এর উত্তর দেওয়া বৈজ্ঞানিকের কাজ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সব বৈজ্ঞানিকই আমাদের 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' রেখেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁরা কিছুই স্পষ্ট ক'রে আজও বলতে পারেন নি। আজও আমরা জানি না, বস্তুপুঞ্জের কোন্ আবেগে প্রাণের আবির্ভাব হলো পৃথিবীতে। এ আবির্ভাব কি একদিনে হয়েছিল? কিম্বা বহু কোটি বৎসর ধ'রে পরমাণুর কোন পদার্থধর্মের ক্রম পরিবর্তনে এ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। জড়প্রকৃতির সেই প্রথমজা বেদনার ইতিহাস—সৃষ্টির দ্বিতীয় পরম রহস্য, সেই প্রাণের ইতিহাস আমরা এখনও শুধু কল্পনাই ক'রে থাকি।

* * *

—'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে।' এই কথাটা কি বর্ণে বর্ণে সত্য? জীব মাত্রেরই মৃত্যু হয়, এইটাই না কি প্রাণের নিয়ম। একদিন কৃতান্তের আহ্বান আসে, প্রাণপাখি দেহপিঞ্জর ছেড়ে উড়ে যায়—মর জড়দেহটা শুধু পড়ে থাকে পঞ্চভূতে মিশে যাবার জন্য।

কিন্তু যদি বলা যায় যে, এমন জীব আছে, যার মৃত্যু নেই, তা হলে কি কেউ বিশ্বাস করবে? অথবা যদি বলা হয় যে, এমন জীব আছে, যাদের প্রাণ কোন দিনও বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, দেহত্যাগ ক'রে চলে যায় না। অর্থাৎ এমন কোন জীবজগতের কল্পনা করতে পারেন কি, যেখানে নতুন জীব সৃষ্টি চলেছে, অথচ কারও মৃত্যু নেই। সে জগতে শব বলে কিছু নেই, শ্মশান নেই?

স্বর্গ বা অমরাপুরী নামে একটি কাল্পনিক জগৎ অবশ্য আছে, যেখানে আয়ু অনন্ত, যৌবন অনন্ত। মৃত্যুজরাহীন সে জগতে নতুন জীব (দেবতা) সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্বর্গে দুটি জিনিস নেই। একটি চিকিৎসক, দ্বিতীয়টি শ্মশান।

কিন্তু ধূলিমাটি, কীট পতঙ্গ, পক্ষী মনুষ্য অধ্যুষিত এই পৃথিবীতে আমাদের স্থূল দৃষ্টির অগোচরে স্বর্গের মতই একটী জীবলোক রয়েছে। জীবলোক না বলে জীবাণুলোক বললেই ভাল, অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া।

'অহং বহুস্যাম্'—উপনিষদের ব্রহ্মন্ নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন, বহুর সৃষ্টির জন্য। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীব এই ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেন প্রাণসৃষ্টির সেই আদি-বিধান এখনও অব্যাহতভাবে চলেছে। ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে পিতামাতা নেই—তবে সন্তানসন্ততি আছে। পিতামাতা একই দেহে লীন হ'য়ে আছে। এদের পরমায়ু সেইদিন ফুরিয়ে যায়, যেদিন

একটি ব্যাকটেরিয়া দ্বিধা হ'য়ে দুই ভিন্ন ব্যাকটেরিয়ায় পরিণত হয়। পরমায়ু ফুরিয়ে যায় বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় কি? শবদেহ কই?

• • •

প্রাণের প্রথম সৃষ্টি-রহস্য আমরা জানি না, কিন্তু এর প্রকাশের বৈচিত্র্য আমরা দেখি। সেটাও কম রহস্য নয়।

উদ্ভিদকে প্রাণী বলা যেতে পারে, কারণ এর জন্ম মৃত্যু ও বংশবৃদ্ধি আছে। প্রাণীজগতে উদ্ভিদই নাকি প্রবীণতম। প্রাণের প্রথম প্রকাশ হয়েছিল উদ্ভিদের রূপে ; অবশ্য সে উদ্ভিদ কোন ওক বা শাল্মলী তরুবরের মত পরিণত বনস্পতি ছিল না। তাকে উদ্ভিদাণু বলতে পারি। শ্যাওলাই না কি পৃথিবীর আদিমতম উদ্ভিদ জাতি।

সুতরাং সৃষ্টির ক্রমগুলি সাজালে আমরা এই তথ্য পাই। প্রথমে জড় থেকে উদ্ভিদ আবার জড় থেকেই জীব। কিন্তু মাঝে একটা ছিন্নসূত্রতা র'য়ে গেল। জড় থেকে উদ্ভিদ, কিন্তু উদ্ভিদ থেকে কি জীব সৃষ্টি হয়েছে?

এর কোন প্রমাণ নেই। জড়—উদ্ভিদ—জীব, এই রকম কোন ক্রম সাজানো যায় না। প্রাণই একদিন হঠাৎ কোথা হ'তে এসে, 'ভুবনং প্রবিশ্য রূপং রূপং প্রতিরূপ বভূব।' উদ্ভিদের পরে জীব সৃষ্টি হ'য়ে থাকতে পারে ; কিন্তু উদ্ভিদ থেকে জীব সৃষ্টি হয়েছে, বিবর্তনের এমন কোন প্রণালী দেখা যায় না।

কিন্তু যদি বলা হয় যে, উদ্ভিদ থেকে জীব সৃষ্টি হয় নি বা হয় না, কিন্তু জীবদেহ থেকে উদ্ভিদ সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বিশ্বাস্য হবে কি? বিশ্বাস্য হোক্ বা না হোক্, কথাটা সত্য। এমন জীবও আছে যারা জীবদ্দশাতেই উদ্ভিদদশা প্রাপ্ত হয়।

স্যাঁতসেঁতে জায়গায় যদি অনেকদিন ধরে বাঁশ বা কাঠের তক্তা বা গুঁড়ি পড়ে থাকে, তবে তার গায়ে সাদা সাদা একরকম ছাতলা পড়ে। একটু নিবিষ্ট দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, এই ছাতলার মধ্যে অতি ক্ষুদ্র একরকমের পোকা নড়ে চড়ে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত এই পোকাগুলির জীবন। এরা ভূমিষ্ঠ হয় পোকা হয়ে কিন্তু মরে উদ্ভিদ হয়ে। অর্থাৎ কিছুদিন পোকা জীবন যাপন করার পর ওরা ঐ ছাতলা বা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদে পরিণত হয়ে যায়। শেষ জীবনটা উদ্ভিদ হয়ে, স্থিরমূল স্থানু হয়ে এরা লুপ্ত হয়ে যায়। এরকম ট্র্যাজেডি আর কোন্ জীবের ভাগ্যে ঘটে জানি না। পুরাণে শোনা যায়, অভিশপ্তা অহল্যা পাষাণী হয়ে পড়েছিল। কোন্ দুষ্কৃতির কারণে প্রকৃতি এই পোকাগুলির শেষ জীবনে এই ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে রেখেছে, তা অনুমানও করা যায় না। এই সব থেকেই মনে হয়, নিয়ম ও ক্রম এবং অনিয়ম ও ব্যতিক্রম, এ দুয়ের মধ্যে বড় একটা ভেদরেখা টানা দুষ্কর।

• • •

—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। এটা হলো বুদ্ধি চালিত মানুষের কথা। কিন্তু বুদ্ধি বোধি ও বিচারই মানুষের সবটা নয়। ইমোশন বা আবেগ মানুষের শারীর ধর্ম এবং মানসিক ধর্ম দুই-ই। আবেগও মানুষের চরিত্রসৃষ্টি ও তার নীতিতত্ত্ব রচনা করে। তাকে অনেকখানি আবেগকে দলিত ও দমিত করে তবে বুদ্ধির কথা বলতে হয়।

সহজ ইমোশনের প্রেরণায় কিন্তু মানুষ শুধু মরতেই চায়। যেখানে পুলক, বা আনন্দের চকিত স্ফুরণ, সেখানেই মানুষ 'মরি মরি' করে ওঠে। যেখানে পুলকের পরাকাষ্ঠা, সেখানেই মানুষ মরতে চায়। সেখানে মরণ শ্যাম সমান হয়ে দাঁড়ায়।

আহা মরি কী সুন্দর! যে আনন্দের উচ্চকিত ফুৎকারে জীবনের সহজ সরল ব্যঞ্জনা, তার মধ্যে মানুষ আবার মরণ খোঁজে কেন? এও প্রাণধর্মের এক অদ্ভুত রহস্য। ডাঃ ফ্রয়েডের তত্ত্ব এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। জীবন ও মরণ—এই দ্বৈত টানে মানুষের মন সমান নিয়ন্ত্রিত। মানুষ শুধু জীবনের আবেগে 'শূন্যব্যোম অপরিমাণ মদ্য সম' পান করতে ছুটে যেতে চায় না। মরণের মুখেও ছুটে যেতে চায়। মরণ তার কাছে কম মোহময় নয়। মানুষের পিপাসী কল্পনা আকুল প্রতীক্ষায় বসে আছে—কবে মৃত্যু এসে তার নীল পাণ্ডুর অধর চুম্বনে ভরে দেবে।

পরাণ কহিছে ধীরে
হে মৃত্যু মধুর।
এই নীলাম্বর তব
একি অন্তঃপুর॥

মৃত্যুরূপা মহাকালী সাধকদের কল্পনা হতে পারে, কিন্তু কবিরা মৃত্যুর এই করালিনী রূপ কল্পনা করে না।

* * *

ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমত ধরা যাক্। কেন এই মরণোন্মুখতা? জীবন ও মরণ—মানুষের অন্তরতম প্রদেশে বা অবচেতনায় এই দুই দেবতার দ্যূতখেলা অবিরাম চলেছে। তাই ডাঃ ফ্রয়েড বলেন, মৃত্যুকে মানুষ ভালবাসে, কামনা করে। যত লোক আত্মহত্যা করে, তারা সকলেই জীবনের ওপর বিতৃষ্ণার বশে তা করে না। মরণের ওপর তৃষ্ণার বশেও আত্মহত্যা হয়ে থাকে। কিন্তু কেন করে?

আবার সেই প্রশ্নে ফিরে আসতে হয়। প্রাণের উৎপত্তির প্রশ্ন। সৃষ্টির আদি অধ্যায়ে ছিল জড়; সেই জড়েরই কোন আকস্মিক পদার্থধর্মের পরিবর্তনে বিশ্বনিসর্গ একদিন প্রাণসত্ত্ব হলো। জড়ই প্রাণের জনক। এই সিদ্ধান্ত থেকে একটি থিওরী গড়ে উঠেছে। যেহেতু জড় থেকে জীব উদ্ভূত, সেই হেতু জীবের ধর্ম হলো নিরন্তর জড়ে পরিণত হওয়ার চেষ্টা। কিন্তু মৃত্যু না হলে জড় হওয়া যায় না। তাই 'চিরস্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?' জীবনপ্রবাহ অবিরাম কালসিন্ধু পানেই ধেয়ে চলেছে! ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র জীব তার সকল রক্ত স্নায়ু পেশী অস্থি শ্বাস প্রশ্বাসের আচরণে মৃত্যুকেই খুঁজে একান্ত মনে; যেন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে চায়। জীবন হলো ক্ষণিকের খেলাঘর; জড়ই আদি অধিষ্ঠান, আপনার গেহ।

রুশে জার্মানে

—চৌদিকে ধায় সমরতরঙ্গ।

ফিনল্যাণ্ড থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনর শত মাইল ফ্রন্ট। কাতারে কাতারে সমবেত যন্ত্রারূঢ় স্বস্তিকধ্বজ নাৎসী অনীকিনী। অপর দিকে পঞ্চপ্রহরণে সজ্জিত সোভিয়েট রুশের রক্তচক্ষু। করাল নরমেধের আয়োজনে বিংশ শতাব্দী শিউরে উঠেছে রুশের সীমান্তে।

সংঘর্ষ আরম্ভ হয়েছে। 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।' সহস্র যোজন দূর থেকে নীড়াশ্রিত নিরীহ পাখির মত আমরা শুধু এই রুষ্ট কালান্তক ঝটিকার তাণ্ডব কিছুটা কল্পনা করতে পারি। এ রৌরব সমরে কে জিতে কে হারে তার ঠিক নেই।

* * *

জার্মানী রুশিয়াকে আক্রমণ করেছেন। সমস্ত পৃথিবী প্রশ্ন করছে—এ কি মহারথী প্রথা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখন সম্ভব নয়। শুধু যুদ্ধের কথাই মনে হচ্ছে। কী বিপুল আয়োজন! জল স্থল অন্তরীক্ষে কী নিদারুণ মারণযন্ত্রের ঘনঘটা! দুপক্ষের কেউ কম নয়। ভীষ্ম দ্রোণ কৃপের মত বড় বড় আচার্যেরা দুপক্ষেই রয়েছেন। স্টালিন, কালিনিন, মলোটোভ, কাগানোভিচ, ভোরোশিলফ, বুদিনি, ক্রুখের ও টিমোশেঙ্কো। আর একদিকে হিটলার, হিমলার, গোয়েরিং, গোয়েবলস্, রিবেনট্রপ, রায়েডা, লিস্ট আর ফলকেনহস্ট। নামগুলির চেহারাই এক একটা ট্যাঙ্কের মত।

জার্মান মিলিটারী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। রুশ মিলিটারী প্রতিভার কথা শোনা গেছে। মারণ বিজ্ঞানের সহস্র উপচারে পুষ্ট এই দুই যোদ্ধরাষ্ট্রের হানাহানিতে ধ্বংসের যে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়বে, সেটা নিছক যুদ্ধবিজ্ঞানী ছাড়া আর কাউকে আমোদিত করতে পারে না।

* * *

এখানে বসে কল্পনায় স্বপ্নের মত অবাস্তব একটা ঘটনাচিত্র দেখতে পাই। উক্রেনের অবারিত প্রান্তর—শস্যশীর্ষে শিহরিত সোনার অঞ্চল। তারই আকাশে রক্তচক্ষু যন্ত্রবিহঙ্গের গুরুগুঞ্জন। পথে পথে ভীমকান্ত ট্যাঙ্কবহরের উৎকট ক্রেঙ্কার। লক্ষ লক্ষ নাৎসী সৈন্যের ইস্পাতের হেলমেট তরঙ্গবেগে ছুটে চলেছে ভিলনা, মিনস্ক, লেনিনগ্রাড আর ওডেসার অভিমুখে। বিদ্যুদকার্ড ঈশানী মেঘের মত নাৎসী শৌর্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে রুশের উপর। নীপারের কালো জল অস্থির হয়ে উঠেছে মরণ যমুনার উজানের মত।

অপরদিকে বিশেষ করে চোখে পড়ে শান্ত অনুদ্বেল রুশ বাহিনীর নিঃশঙ্ক সংগ্রাম। বিদ্যুতের মত সমস্ত দহন জ্বালা নিয়ে অরাতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া রুশের যুদ্ধ-নীতি নয়। শত্রুব্যূহের বিশেষ কোন অংশে সর্বস্ব নিয়ে মরিয়া হয়ে লেগে পড়তে তাদের শস্ত্রবিদ্যায় বলে না। তাদের রীতি হলো, পাহাড়ী বোয়া সাপের মত শত্রুকে বিরাট পাকে জড়িয়ে ধীরে ধীরে পিষ্ট করে, তারপর মৃত্যুবর্ষী বোমারু বিমানের ঘেরাটোপ দিয়ে ঢেকে ভস্মশয্যায় শুইয়ে দেওয়া। এই দুই সমর কৌশলের চূড়ান্ত পরীক্ষার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে।

হিটলার স্বয়ং রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়েছেন। ভগবানের কৃপা প্রার্থনা ক'রে নাৎসীবাহিনীকে উৎসাহিত করেছেন। স্বকণ্ঠে অভিযানের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছেন।

* * *

কিন্তু মস্কো প্রাসাদকূটে, ক্রেমলিনে, বারবার সকলের ঘুম ভেঙে যাচ্ছে কি না জানি না ; তবে স্টালিন এখনও নীরব, কথা বলেছেন শুধু মলোটোভ। কাউকে আক্রমণের লোলুপ উৎসাহ তাতে ঘোষিত হয় নি ; তাতে শুধু দেশরক্ষার আবেদন ধ্বনিত হয়েছে।

এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যেও বেশ দু'একটা নাটকীয় ঘটনারও খবর পাওয়া যাচ্ছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মজার খবর হলো, হিটলার তাঁর রুশ জমিদারীর গদিতে বসবার জন্য একজন জার ঠিক করে ফেলেছেন। ভদ্রলোক বংশের দিক দিয়ে কাইজারজ। ইনি হ'লেন কাইজারের নাতি ফার্দিনাণ্ড, ফোর্ড কারখানার মিস্ত্রি ছিলেন। ইতিহাসে অবশ্য এমন ঘটনা বিরল নয়। ভাগ্যবিপর্যয়ে আমীরও ফকীর হয়, আবার ভাগ্য প্রসন্নতায় ভিস্তিওয়ালাও দিল্লীর মসনদে বসে।

* * *

আর একটি খবর আছে যেটা আধুনিক মেকানাইজড্ অক্ষৌহিণীর যুদ্ধকীর্তি, ইঞ্জিন আর মোটরের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে একটু রোমান্টিক বিরামের মত উপভোগ্য।

—প্রুথ নদী পার হয়ে নাৎসী ট্যাঙ্কবাহিনী প্রচণ্ড অগ্নিবমন করে সোৎসাহে অগ্রসর হয়ে চলেছে প্রমত্ত লৌহ-ঐরাবতযূথের মত। সীমান্তরক্ষী রুশ ফৌজ সে দাপটে হঠে যেতে বাধ্য হয়। তারপর আরও জার্মান পদাতিক ও ট্যাঙ্কবহর প্রভঞ্জনের মত এসে আক্রমণ করতে থাকে। কিন্তু সোভিয়েট বোমারু বিমানগুলি অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জার্মান বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে দেয়, ফলে তারা পেছনে সরে পড়তে বাধ্য হয়। এমন সময় খড়্গধারী রুশ অশ্বারোহীর স্রোত বরফের ধ্বসের মত পলায়নপর নাৎসী ফৌজকে চার্জ করে সেতুর ওপারে পাঠিয়ে দেয়। দেখা যাচ্ছে, আলেকজাণ্ডারের আমলের ঘোড়া আর তলোয়ার এখনও কৌলীন্য হারায় নি।

* * *

জার্মান ও রুশ দুজনেই বনেদী যোদ্ধা। হূণশৌর্যের পরিচয় য়ুরোপ ও এসিয়া মহাদেশের ইতিহাসে লেখা আছে রক্তলিখায়। তাতার শৌর্যের ইতিহাস গাঁথা আছে য়ুরোপ ও এসিয়ার সমাধিক্ষেত্রের অস্থিপঞ্জরে। জার্মানীর ভাণ্ডারে নানা নতুন আয়ুধ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। রুশেরও আছে মলোটোভের রুটির ঝুড়ি আর বিরাট খবাহিনী। মলোটোভ ইতিহাসের নজীর দিয়েছেন—সমরলক্ষ্মীর বরপুত্র নেপোলিয়ন রুশিয়ায় যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গিয়েছিল। আবার 'যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরলো না'ক তারা।' ইতিহাসের অনেক বিজয়ী বীরকে এরকম দুর্ভাগ্যের মার সহ্য করতে হয়েছে।

* * *

নাটকীয় ক্লাইমেক্স পূর্ণ হয়েছে অন্য একটি ঘটনায়। তাসখন্দের এক খর্জুর কুঞ্জে পাথরচাপা তৈমুরলঙ্গের কঙ্কাল উঠে দাঁড়িয়েছে।

ফিরে চল

ফিরে চল। কে যেন হতাশ হয়ে আক্ষেপ করে বলছে, ফিরে চল।

বিংশ শতাব্দীর এই নরমেধের আসর থেকে ফিরে চল। মূঢ় সভ্যতার শিরায় শিরায় রক্ত পাগল হয়ে উঠেছে। ছিন্নমস্তার মত নিজ রুধির পান করে এই বাতুল সভ্যতার তৃষ্ণা শান্ত হবে। এ সভ্যতার ভাণ্ডারে জ্ঞান-বিজ্ঞান সবই আছে, কিন্তু সব কিছুই মারণ কীর্তির উৎসাহে উদ্‌ভ্রান্ত। দুষ্টমেদে অতিকায় হয়ে উঠেছে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন। একটি যক্ষ্মারোগীর ফুসফুসের ঘা আরাম করতে পারে না, এই তো বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের কৃতিত্ব!

বর্তমান সমাজযন্ত্রের কর্ণধারেরা একটি নিরন্নের অস্থিসার দেহে এক সের মাংস-শোণিতের ব্যবস্থা করতে পারে না, তারাই তাদের নিয়ে ফ্রন্টে ফ্রন্টে পলিটিক্সের জুয়া খেলছে! পৃথিবীর মানচিত্রের ওপর তাদের দাবার ঘুঁটি চলেছে দিগ্বিদিকে। স্থল, জল, অন্তরীক্ষে কীটপতঙ্গও উত্যক্ত হয়ে উঠেছে প্রমত্ত মানুষের কদাচারে।

তাই বলতে ইচ্ছে করে, ফিরে চল এই বারুদের ধোঁয়া, মাইন, টর্পেডো, বোমা, ট্যাঙ্ক, মেশিনগান ও বিস্ফোরকে আচ্ছন্ন বিকৃত ক্ষাত্রবীর্যের তাণ্ডব থেকে! আশাক্ষুণ্ণ পথিকের

মত আবার পিছনের পথ ধরে ফিরে চল।

* * *

একটি শাহীবাগ। এইখানে এসে বসা যাক্। বসরাই গোলাপে ভরা এই বাগিচায় সুগন্ধির মৌতাত। অবিরাম বুলবুলের আলাপ। একটি ঝরোকার ধারে মখমলের রেজাই পেতে বস। লয়লা মজনু বা সিরি ফরহাদের প্রেমের আখ্যান পড় ; সুর্মাটানা চোখের কোণে বেদনার উষ্ণ জলের ফোঁটা রেশমী রুমালে মুছে ফেল।

কিম্বা চবুতরা ছাড়িয়ে, মতী পার হয়ে দেওদারের ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে চল। এঁকে বেঁকে চলে গেছে সড়ক ইদ্‌গাহের দিকে। মসজিদের মিনারে গম্বুজে পড়েছে ডুবন্ত সূর্যের সিন্দুরের ছটা। সুরবাহারের রণনের মত বাতাসে আজানের শব্দ কেঁপে কেঁপে আসছে।

সন্ধ্যায় কেল্লার তোপ পড়ে। টমটমের গুরু গুরু ধ্বনি। তুর্ক শওয়ারের দল, কড়া কড়া মোচ, কাতার বেঁধে কোতোয়ালী থেকে শহরের বড় দরোয়াজার দিকে পাহারায় চলেছে। ছাউনির ময়দানে রাজপুত সেপাইরা তলোয়ার খেলছে।

ওম্‌রাহের প্রাসাদে স্ফটিকের ঝাড় ঝলসে উঠে। নহবতের আলাপে সন্ধ্যাবাতাস মাতোয়ারা। চকে সরাইয়ে মুসাফিরখানায় মুখর সারেঙ্গীর সঙ্গে গজল আর নৃত্যপরা সুন্দরীর নূপুর নিক্কণ। গোলাবপাশে আতরের উৎস আর নীল পেয়ালায় বিহ্বল দ্রাক্ষারসের ফেনপুঞ্জ। পেশোয়াজের চুম্‌কির ঝিলিক আর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত ওড়নার হিল্লোল।

অতীতের এই একটি প্রগল্‌ভ স্বপ্নের তোরণে এসে বারুদের ধুলো ঝেড়ে ফেলে কিছুক্ষণ বসা যাক্।

* * *

এখানে না হয়, আরও পিছনে ফিরে চল। দশার্ণ জনপদের চৈত্যবৃক্ষের পাশ দিয়ে পথ ধরে চল। রেবা, সিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা ও বেত্রবতীর জলে জবাকুসুমসন্নিভ সন্ধ্যারাগের ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। মৃণালকন্দ চঞ্চুপুটে তুলে নিয়ে মেরুমরালেরা আকাশে সাঁতার দিয়ে চলেছে। শশাঙ্কশেখরের কিরীট জ্যোৎস্নায় অলকাপুরীর ধবলিত সৌধমালা, মণিকুট্টিমের শোভা, ধারাগৃহে জলযন্ত্রের স্নিগ্ধ শীকরোৎক্ষেপ। ভবন দীর্ঘিকার মরকত সোপানে এসে বসা যাক্। বৈদূর্যনাল বিকচ কমলের শোভা দু'চোখ ভরে দেখা যাক্। কুরুবকে ঘেরা এই মাধবী মণ্ডপের চপলকিশলয় রক্তাশোক। গৃহময়ূরীর কেকালাপ মুগ্ধ হয়ে শোন। প্রোষিতভর্তৃকা ললনা পিঞ্জরসারিকার কাছে প্রিয়ের কুশল জিজ্ঞাসা করছে। আর আছে, প্রিয়ঙ্গুলতিকার মত সুকুমারদেহ জনপদবধূর চকিত হরিণী-প্রেক্ষণ ও ভ্রূবিলাস।

এইখানে এসে কিছুক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। এখানে ধূম জ্যোতি সলিল মরুতে করাল কেমিস্ট্রির কলঙ্ক স্পর্শ করে নি। শুধু দেবদারুর শাখাঘর্ষণে হঠাৎ দাবাগ্নি জেগে ওঠে, চমরী মৃগের পুচ্ছ পুড়ে যায়। এখানে আকাশে গন্ধকের ধোঁয়া নেই। মেঘে ঘেরা রামগিরি নাগাজিনে শোভিত পিনাকীর মত ভৈরবসুন্দর।

এইখানে এসে তবুও কিছুক্ষণ আরামে বসতে পারা যায়।

* * *

ফিরে চল। আরও দূরে। ব্যাধি জরা মৃত্যু ভরা এই সংসারের প্রপঞ্চ পিছনে ফেলে বৈশালীর পথ ধরে হেঁটে চল। কোন সম্বলের প্রয়োজন নেই। পাথেয় শুধু তথাগতের বাণী। একটি মাত্র কাষায় বস্ত্রে দেহ আবৃত করে মহানিবৃত্তির পথে এগিয়ে চল। লিচ্ছবিদের গ্রামে দুটি

তণ্ডুলকণা সংগ্রহ করে নাও। তাই যথেষ্ট। সকল বিচিকিৎসা, সকল তন্‌হা অতিক্রম করে বিগতাশোক শুদ্ধ বুদ্ধ হতে হবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সঙ্ঘারামে বাতি জ্বলেছে। চৈত্যগৃহে বন্দনা ধ্বনি শোন—ধর্মং শরণং গচ্ছামি। মৈত্রী মহাকরুণার আলোকে প্রদীপ্ত হও। বিসঙ্খারগত চিত্তের সকল তৃষ্ণা ক্ষয় হউক। জন্মকূটের সকল বন্ধন ছিন্ন হউক। 'দিট্‌ঠোহসি পুনঃ গেহং ন কাহসি', আর তাহাকে গৃহরচনা করতে দিও না। স্তূপপাদমূলে আরতিদীপ জ্বালিয়ে শেষ প্রার্থনা কর—সব্বে সত্তা সুখিতা ভবন্তু। বিশ্বের সকলে সুখী হউক। তোমার মহাপরিনির্বাণের শুভক্ষণ এগিয়ে আসছে।

* * *

এখনও পথ শেষ হয় নি। ফিরে চল।

সরস্বতীর তীরে তৃণশ্যামল মাঠে হোমধেনুর দল চরে বেড়াচ্ছে। কুটীর প্রাঙ্গণে সুরচিত যজ্ঞবেদিকা। সাগ্নিক ঋত্বিক পুরোধা—যাজক যজমানের জনতায় যজ্ঞস্থলী সমাকীর্ণ। হবির্গন্ধে আচ্ছন্ন বাতাস। স্তূপীকৃত অরণি ও সমিধ। উদ্‌গাতার কণ্ঠে ঋক্‌মন্ত্রের অনুষ্টুপ সুমন্দ্রে উৎসারিত হচ্ছে।

ছয় ঋতু, বার মাস, ধরিত্রীর সাজ বদল করে দিয়ে যায়। বিস্মিত ঋষিরা পরম শ্রদ্ধায় আবাহন করে, সবিতৃ, পূষণ, পর্জন্য, স্বাহা—প্রসন্ন হও। হে বিচিত্র, তুমি প্রকাশিত হও। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।'

আবার যাত্রারম্ভ। অতীতের কুয়াশা ভেদ ক'রে শীর্ণ পথরেখা ধ'রে ফিরে চল, যেখানে ছায়াভরা পান্থপাদপ এ যুগের যাতনাক্লিষ্ট মানুষের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ইউনিফর্ম ফেলে দিয়ে গাছের বাকল পরে এই অরণ্যের মাঝে এসে বর্বর মানুষের সংসারে দাঁড়াও। এখানেও সুখ আছে। এটাও সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু উৎসব আনন্দে ভরা মানুষের গৃহস্থালী। এখানে চামড়ার যুদ্ধঢাক উদ্দাম নাদে বেজে ওঠে। বল্লমের ধাতুফলক উল্লসিত হয়। বনে বনে মৃগয়া ও শ্বাপদ সংহারের অভিযান চলে। পাতার কুটীরে বর্বর নারী আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে। বুনো ফল আর কন্দমূলেই রসনার বিলাস চরিতার্থ হয়।

রাত্রির অন্ধকারে দরিদ্র আদিম মানবের আঙিনায় আগুনের ধূনি জ্বলে। হাড়ের বাঁশি, জয়ঢাক, দামামা আর ঝাঁঝরের বাজনার সঙ্গে নরনারী যুবা বৃদ্ধ শিশু নৃত্যে বিভোর হয়। প্রবীণ ওঝারা মন্ত্র পড়ে, সিদ্ধিকাঠি নেড়ে ভূত পিশাচ মারী মৃত্যু তাড়ায়। গোষ্ঠীর আহত রোগগ্রস্ত বা মুমূর্ষুকে কোলে ক'রে সর্দার চোখের জল ফেলে।

* * *

ফিরে চল। সভ্যসাধনার সকল ব্যর্থতার ধিক্কার নিয়ে পুরাকল্পের এই পাহাড়ের গুহার অন্ধকারে আদিম মানবের আত্মীয় হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি। এখনো এখানে ফিলসফি ও পলিটিক্স সৃষ্টি হয় নি। এখানে বসে বসে শোন, মহারণ্যের স্তব্ধতা হিংস্র পশুর ধস্তাধস্তির দাপটে শিউরে উঠছে বারংবার। এখানে গান নেই, ভাষা নেই, কেউ হাসতেও শেখে নি। এখানে প্রপাগাণ্ডা নেই, গেস্টাপো নেই। বিংশ শতাব্দীর বিষাক্ত আশ্রয় ছেড়ে এখানে এসে ঠাঁই গ্রহণ করা যাক্।

পশুপালিত মানুষ

আমাদের পুরাণ কাহিনীতে পড়া যায়—শিশু শকুন্তলা না কি কোন মমতাময়ী শকুন মাতার পক্ষপুটের আশ্রয়ে লালিত হয়েছিল। রোমনগরী যিনি রচনা করেছিলেন সেই রমুলাস নেকড়ে পালিত মানুষ। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাঁকে না কি একটি ডিঙিতে শুইয়ে টাইবার নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

গৃহপালিত পশু আছে, কিন্তু পশুপালিত এইরকম মানুষ বোধ হয় কল্পনা ও কিংবদন্তীতেই পাওয়া যায়। গরিলা পালিত টার্জন—এটিও কল্পনার সৃষ্টি।

কিন্তু রমুলাসের উপাখ্যান একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নেকড়ের সম্বন্ধে বিচার করতে গেলে আমাদের ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে, কেননা তার অজস্র বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। আজ পর্যন্ত যে কয়টি পশুপালিত মানুষ দেখা গেছে, তার অধিকাংশই নেকড়ে পালিত। অথচ এই নেকড়েই হিংস্রতার জন্য বিখ্যাত।

স্যার মার্কিসন তাঁর ন্যাচারাল হিস্ট্রী পত্রিকায় একজন নেকড়ে-পালিত মানুষের কথা লিখেছেন। ১৮৫১ সালে আউধের নবাবের দুজন সেপাই গোমতী নদীর ধারে কতকগুলি নেকড়ের সঙ্গে একটি বালককে জলপানরত অবস্থায় দেখতে পায় ও ধরে নিয়ে আসে। ছেলেটির নেকড়ের মতই চার পায়ে (দু হাত আর দু পা) লাফিয়ে লাফিয়ে চলা অভ্যাস ছিল। লক্ষ্ণৌয়ে বালকটিকে কিছুকাল রেখে মানুষ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নি। অনেক চেষ্টার পর ছেলেটির বড় জোর কুকুরের মত সামান্য বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি দেখা যায়।

ঐ বছরে আর একটি নেকড়ে-মানুষ ধরা পড়ে। এটি জুলফিকর খাঁ নামে বাঁকীপুরের এক জমিদারের ছেলে ; ছেলেটার যখন ছয় বছর বয়স তখন তাকে এক নেকড়েনী তুলে নিয়ে যায়। নেকড়েনী তাকে চার বছর ধরে মাতৃস্নেহে লালন পালন করে। চার বছর পর ছেলেটিকে আবার উদ্ধার করা হয়। বলা বাহুল্য নেকড়েনী-মা সহজে তাঁর পালিত সন্তানকে ছেড়ে দেন নি। মিলিটারি বিভাগের একজন সাহেব গুলি করে নেকড়েনীকে মেরে ছেলেটিকে উদ্ধার করে। সেকেন্দ্রার অনাথ আশ্রমে কিছুদিন এক নেকড়ে-মানুষকে রাখা হয়েছিল। এর বয়স চৌদ্দ বছর। ছেলেটি কোনক্রমেই মানুষের আচার ব্যবহার গ্রহণ করতে পারে নি। কাপড় চোপড় দিলেই তাকে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলত। লক্ষ্ণৌয়ে এক নেকড়ের গুহার ভেতর থেকে একজন ডাক্তার একটি ছেলেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসেন। মেদিনীপুরের এক পাদ্রী সাহেব কয়েকটি নেকড়ে-মানুষ পেয়েছিলেন।

পাশবিক স্নেহ মানুষের তুলনায়, নিঃস্বার্থতায় গুণে যে কম নয় তার সব চেয়ে বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া গেছে করাচী চিড়িয়াখানার এক ছাগীর ব্যবহারে। চিড়িয়াখানায় এক বাঘিনী দুটি বাচ্চা রেখে মারা যায়। বাচ্চা দুটিকে স্তনদুগ্ধ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যে বাঁচান সম্ভব ছিল না। কাজেই ঐ বাচ্চা দুটিকে এক ছাগমাতার আশ্রয়ে রাখা হয়। ছাগমাতাও অকুণ্ঠিত চিত্তে বাঘের শাবককে স্তন্য দিয়ে বাঁচায় ও বড় করে তোলে। ছাগস্তন্যভিখারী এই অসহায় বাচ্চা দুটি ভবিষ্যতে যখন শার্দূলবিক্রম লাভ করবেন, তখন কি ভাবে তাঁরা মাতৃঋণ শোধ করবেন তা বলা যায় না। কথামালার উপাখ্যান আমাদের মনে আছে।

ঐতিহ্যের রক্ততিলক

কপালে রক্তচন্দনের তিলক লাগিয়ে দারোয়ান চৌবেজী গুন্‌গুন্ ক'রে দোঁহা আওড়াচ্ছেন—'তুলসীদাস প্রভু চন্দন রগড়ে, তিলক কাটত রঘুবীর।'

চৌবেজী অতি সাত্ত্বিক মানুষ। মাছ মাংস স্পর্শ করেন না। কপালের তিলকটি তাঁর ধর্মাচরণের অঙ্গবিশেষ। অথচ, চৌবেজী নিজেই জানেন না ঐ তিলকটির অর্থ কি? এর কোন ইতিহাস আছে কি না? তাঁর কাছে তিলকধারণ একটা সংস্কারে দাঁড়িয়ে গেছে। তবু এর একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে নিশ্চয়। চেষ্টা করলে তা খুঁজে বের করাও অসাধ্য নয়।

সংস্কার ছাড়া সামাজিক মানুষ দেখা যায় না। যাঁরা রক্ষণশীল তাঁরা সংস্কারগুলিকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন ও সমর্থন করে থাকেন। তবে বুদ্ধির প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সংস্কারগুলির উপর প্রশ্ন ও সংশয় না এনে পারে না। তখন বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

* * *

পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুসুলভ সংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। সে ব্যাখ্যা আদৌ বৈজ্ঞানিক কি না, তা বৈজ্ঞানিকেরাই বলতে পারেন। চন্দ্রগ্রহণের সময় খাবার জিনিসে একরকম দুষ্ট জীবাণু জন্মলাভ করে, ত্রয়োদশীতে বেগুনের শাঁসের ভেতর একরকম খারাপ গ্যাস জন্মে, টিকিতে বৈদ্যুতিক শক্তি আশ্রয় গ্রহণ করে—এইরকম ব্যাখ্যাও অনেকের মুখে শোনা গিয়েছিল। এই ধরণের ব্যাখ্যা দিয়ে সংস্কারগুলির প্রকৃত অর্থভেদ হয় কি না, জানি না। তবে প্রত্যেক সংস্কারের একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, এ কথা বিশ্বাস করি। চৌবেজী যে তিলক ধারণ করেন তার সার্থকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু এককালে এর মূলে একটা সত্যের ভিত্তি ছিল, তা অস্বীকার করি না।

* * *

এক বন্ধুর মুখে শোনা গল্প মনে পড়ে। তাদের গাঁয়ে মহাষ্টমীর বলিদানের মধ্যে অদ্ভুত একটা প্রথা পালন করা হত। বলিদানের সময় হাড়িকাঠের কয়েক হাত দূরে একটা লোক দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত দুটো আকাশে তুলে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই অদ্ভুত প্রথার অর্থ সে-গাঁয়ের কেউ বলতে পারে নি। সকলেই বলে, তারা শিশুকাল থেকে এই নিয়ম দেখে এসেছে। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের ফলে এই রহস্যভঞ্জন হল—এক অতি বৃদ্ধ তাঁর পিতামহের মুখে শোনা ঘটনা জানিয়ে দিলেন। আগে ঐ হাড়িকাঠের নিকটে একটি লেবুগাছ ছিল। বলিদানের সময় গাছের ডালে খাঁড়া বেধে যেত। সেই কারণে বলিদানের সময় একজন লোক ডালটাকে দড়ি বেঁধে টেনে সরিয়ে রাখত। কালের প্রকোপে লেবুগাছটি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু সেই প্রথার এখনও লোপ হয় নি। এখনও কাউকে রীতিমত নিষ্ঠার সঙ্গে হাড়িকাঠের কাছে দড়িটানার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

* * *

সংস্কারের প্রসঙ্গে এই গল্পটির কথা মনে পড়ে। আজ যা নিছক অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়, অতীতে তাই হয়ত কত সার্থক ও প্রয়োজনীয় ছিল।

মনে পড়ে দূর অতীতের অর্বাচীন আরণ্য নরসমাজের কথা। সে সময় না কি নরমাংস

ভোজনের প্রচলন ছিল। অতীতের বর্বর মানুষের নামে যেসব অকারণ অপবাদ প্রচার করা হয়েছে, মনে হয় এই নরমাংসাশী গল্পও তার মধ্যে একটি। অতীতের মানুষ মানুষকে হত্যা করেছে, আজও করে থাকে। তবে নিছক উদরপূর্তির জন্য বর্বর মানুষ অপর মানুষকে হত্যা করেছে ইতিহাসে সেরকম কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ পাই না। বরং অনেক বিশেষজ্ঞের মতে প্রাচীন মানুষ নিরামিষাশীই ছিল, আমিষভোজন অপেক্ষাকৃত পরের যুগের প্রথা। ক্ষুধাশান্তির জন্য কোন হিংস্র জানোয়ারও স্বজাতিকে বধ করে না। বর্বর মানুষই কি পৃথিবীর হিংস্রতম জীব ছিল যে তার ক্ষুধার সম্মুখে স্বজাতি বিজাতির বাছবিচার ছিল না? জীববিজ্ঞানেও এমন কথা বলে না।

* * *

তবে মানুষ মানুষের মাংস খেয়েছে অন্য কারণে অর্থাৎ ধর্মাচরণ হিসাবে। এ প্রথা অতীতে ছিল, বর্তমানেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি। কোন কোন বন্য জাতির মধ্যে নরবলি-প্রথা এখনও লুপ্ত হয় নি। সভ্যদেশেও বর্তমানে নরবলি বা নরমাংস ভোজনের ঘটনা দেখা যায়। কারও কপালে রক্তচন্দনের তিলক দেখলে যদি কোন ইতিহাস পাঠকের মনে অতি প্রাচীন নৃমুণ্ডবিলাসী বর্বর মানবগোষ্ঠীর কথা মনে পড়ে যায়, তবে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। আন্দামানীরা নরহত্যা করে নিহত ব্যক্তির রক্তপান করতো। ভারতের উত্তরপশ্চিমে কাফিরিস্থানের কাফিরেরা (এরা মুসলমান নয়) যুদ্ধে নিহত শত্রুর রক্তপান ও ফুসফুসের একটি টুকরো প্রসাদস্বরূপ খেত। উত্তরপূর্বের লুসাই পাহাড়ের জংলী যোদ্ধা নিহত শত্রুর যকৃৎ ও রক্তমাখা বল্লমের ফলক জিভ দিয়ে চেটে শুধু আস্বাদ গ্রহণ করতো। আসামে পার্বত্য মুণ্ডশিকারীদের মধ্যে এখনও একটি প্রথার চল আছে—শত্রু বধ করার পর তারা রক্তমাখা হাতে খাবার খেয়ে থাকে।

ইতিহাস ঘেঁটে যত নজীরই খোঁজা হোক না কেন, কোথাও এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে প্রমাণ নেই যে, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য নরমাংস ভোজন করা প্রাচীন নরসমাজে প্রচলিত ছিল। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেসব নরবলির মূলে ছিল একটি লৌকিক ধর্মাচরণের তাগিদ। রাজপুত রাজাদের অভিষেকের সময় এখনও কোন ভীল প্রজার রক্ত নিয়ে তিলক ধারণ করার নিয়ম রয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকের মতে এই ধরণের নরমাংস ভোজন, নরশোণিত পান অথবা কপালে রক্ততিলক ধারণের পেছনে একটা 'আধ্যাত্মিক' প্রেরণা আছে। নিহত মানুষের 'মানা' তথা জীবসত্তা আত্মস্থ করে নিজেকে শক্তিমান করা—এই থেকেই না কি আত্মা থিওরির উদ্ভব। এ প্রসঙ্গে আরও দৃষ্টান্ত মনে পড়ে— খৃস্টানদের ইউখারিস্ট ভক্ষণ ও বৈদিক মানুষের পুরোডাশ।

সেকেলে ডাকাতদের মধ্যেও এই ধরণের বর্বর সংস্কারের প্রকোপ ছিল। ঘোর জঙ্গলে বুড়ো বটের নীচে ডাকাতে কালী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বাংলার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে। ডাকাত সাধক বলি-প্রদত্ত মানুষের রক্তের তিলক কপালে ধারণ করে হত্যাধর্মে শক্তি ও সিদ্ধিলাভ করতো। ১৯৩০ সালে নানা ফেরারী নামে যে প্রসিদ্ধ ডাকাত ধরা পড়ে, তার অভ্যাস ছিল নিজের ছুরিকাঘাতে নিহত মানুষের রক্তের ফোঁটা কপালে ও জিভে স্পর্শ করা।

ফসল পূজার জন্য নরবলি দেওয়া এককালে সকল বর্বর সমাজে প্রচলিত ছিল। ভারতের খোন্দদের মধ্যে সেদিন পর্যন্ত এই প্রথা ছিল। কিন্তু উদর-তৃপ্তির জন্য মানুষের

মাংসে কোনদিনই মানুষ খায় নি। মানুষ নরহত্যা করেছে সামাজিক ও ধার্মিক কারণে, শক্তি ও সিদ্ধিলাভের জন্য, আত্মিক বলে বলীয়ান হবার জন্য।

চৌবেজীর কপালে রক্তচন্দনের তিলক দেখে তামস যুগের অজ্ঞ মানুষের এই সব নিষ্ঠুর রীতিনীতির কথাই স্মরণ হচ্ছিল এবং সেটাই যে আধুনিক পবিত্র ও সাত্ত্বিক তিলকের ঐতিহাসিক ভিত্তি নয়, তা কে বলতে পারে?

কস্মৈ দেবায়

শব সংকারের প্রথা নানা দেশে নানা রকমের। দাহ ও সমাধি ছাড়া আরও বিচিত্র সব সংকারের প্রথা আছে। জরথুস্ত্রীয় পার্শীরা শব দাহও করে না, সমাধিও দেয় না। তারা খোলা জায়গায় শবকে শুইয়ে রাখে। মহেঞ্জদাড়োর যুগে বড় বড় জালার মধ্যে শবদেহ ভরে রাখা হতো।

সবচেয়ে অদ্ভুত শব সংকার প্রথা ছিল ছোটনাগপুরের, বিরহোরদের মধ্যে। মৃত আত্মীয় স্বজনের দেহকে এরা তত সহজে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দিত না। কর্ণেল ডালটনের রিপোর্টে পাওয়া যায়, বিরহোরেরা মৃত আত্মীয় স্বজনের মাংস খুবই ভক্তিভরে চেটেপুটে খেয়ে শেষ করতো। এটাও তাদের কাছে ধর্মাচরণের বিষয় ছিল অর্থাৎ মৃতের আত্মাকে আত্মস্থ করা। উত্তরপূর্ব আসামের লোকদের আর অমর-কন্টক মালভূমির আদিম উপজাতিদের মধ্যে শবভক্ষণ প্রথা প্রচলিত ছিল।

এ'তো গেল আদিম জাতিদের কথা। ভারতে সভ্য মানুষের মধ্যেও ধর্মের অজুহাতে শব ভক্ষণের ঘটনা দেখা যায়। অঘোরপন্থী সাধকদের কথা সকলেই জানেন। ১৯৩১ সালে বাঁকুড়ার দুজন ব্রাহ্মণ সদ্যঃপ্রোথিত একটি শিশুর মৃতদেহ খুঁড়ে বার করে তাদের আশ্রমে নিয়ে যায় আর রান্না করে খায়। আদালতে ব্রাহ্মণ দুজনের বিচার হয়।

* * *

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম! কোন্ দেবতার পূজা করি? বৈদিক ঋষির কবিমন সৃষ্টির বৈচিত্র্যে দিশেহারা হয়ে একদিন এই প্রশ্নে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু সত্য সত্য মানুষ কত কিছুর যে পূজা করে তা গুনে বলা অসম্ভব।

পূজা থেকে আসে বিগ্রহ। বিগ্রহ থেকে মন্দির বা দেবায়তন। দেবায়তন থেকে তীর্থ। সমস্ত পৃথিবী ছড়িয়ে নানা জাতির নানা তীর্থ রয়েছে; কেউ না কেউ এই সব তীর্থভূমির পত্তন করে গেছে। কাশী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ, মক্কা, মদিনা ও আজমীর সরিফ বা জেরুসালেম—প্রসিদ্ধ নানা তীর্থস্থানের নাম আমাদের জানা আছে। রেড ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি আদিম জাতিরা এখনও সুগম্ভীর প্রতিধ্বনির আশ্রয় বড় বড় গুহাকে দেবাধিষ্ঠান মনে করে পূজার্চনা করে থাকে।

১৯৩০ সালে দিল্লীতে অপূর্ব এক তীর্থস্থানের পত্তন হয়। চারিদিক থেকে যাত্রী আর পুণ্যার্থীর ভীড় ও মেলা বসে যায় সেখানে।

ঘটনাটা এই। শহরের বিষ্ঠা পুরীষ আবর্জনা ফেলার জন্য মাঠের মধ্যে একটা ট্রেঞ্চ করা হয়। কদিন পরে এই ট্রেঞ্চের পচা আবর্জনা থেকে কার্বনডায়অক্সাইড আর মিথেন গ্যাস বার হ'য়ে মাঠের ওপর আলোকশিখার মত জ্বলতে থাকে। এই 'অলৌকিক' দৃশ্যে জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লোকের ধারণা হয়, স্থানটি নিশ্চয় দেবতার

বিহারভূমি। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে যাত্রী সমাগম হ'তে থাকে।

দাক্ষিণাত্যের তিনেভেলিতে আরও একটি অপূর্ব তীর্থস্থান আছে। এখানে ত্রিবাঙ্কুর যুদ্ধে নিহত কোন সাহেবের প্রেতাত্মার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। এই বিগ্রহের ভোজ্য উপাচারও তেমনি অদ্ভুত। এখানে গন্ধপুষ্প বাতাসা চালকলা অচল। পূজার্থীর দল বিগ্রহের সম্মুখে পাউরুটী, মুর্গী, চুরুট আর ব্র্যাণ্ডির নৈবেদ্য সাজিয়ে দেয়।

মানসকূট

কম্‌প্লেক্স নামে একটা কথার খুব প্রচলন হয়েছে মনোবিজ্ঞান সাহিত্যে। এর যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দের প্রচলন এখনও হয় নি। কেউ কেউ কম্‌প্লেক্স অর্থে 'জটিল' কথাটি ব্যবহার করেন। মনে হয় 'মানসকূট' কথাটি তাৎপর্য্যের দিক দিয়ে ঠিক। যাই হোক, এমন লোক নেই যাঁর মধ্যে অল্পবিস্তর মানসকূট নেই। বিভিন্ন মানুষের কম্‌প্লেক্সও বিভিন্ন। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে মানুষের কম্‌প্লেক্সের ইতিহাস গ্রথিত করেছেন। শত সহস্র রকম কম্‌প্লেক্সগুলিকে মোটামুটি ভাগ করে কতকগুলি পর্য্যায়ে ফেলা হয়েছে। সুপিরিওরিটি অথবা ইনফিরিওরিটি কম্‌প্লেক্স নামে যে দুটো কথা আজকাল লোকের মুখে মুখে শোনা যায়, তাও মনোবিজ্ঞানেব ভাষা। বিজ্ঞানী অ্যাডলার মানুষের মনে এই দুটি মূল কম্‌প্লেক্স দেখতে পেয়েছিলেন। তারই উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর মনস্তত্ত্বের থিওরী গড়ে তুলেছেন।

* * *

আর একটি কথার খুব প্রচলন দেখা যায়—স্যাডিজম্। অনেকদিন হলো এই শব্দটি সাহিত্যগত হয়েছে। এই শব্দটির বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—নিগ্রহামোদ ; এই কম্‌প্লেক্সের প্রকোপে মনের অজ্ঞাত বা সংজ্ঞাত সকল রুচির মধ্যে এমন এক ধরণের আবেগ আশ্রয় গ্রহণ করে, যার ফলে সে অপরের পীড়নের মধ্যে পুলক আহরণ করে। কায়েন মনসা বাচা—তার সকল আচরণ নিগ্রহমূলক হয়ে ওঠে।

এই স্যাডিজম্ কথাটিরও ইতিহাস আছে। ইংরাজী 'স্যাড' শব্দের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ফরাসী দেশে সম্রাট লুইয়ের আমলে মার্কুইস দ্য সাদ নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এই ভদ্রলোক অন্যদিকে বেশ গুণী ও সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু একটা রুচি ছিল—সেটা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি বীভৎস। এই মার্কুইস প্যারিস শহর থেকে নিরীহ যুবতী মেয়েদের নিয়ে শহরের বাইরে তাঁর একটি বাড়িতে জড়ো করতেন। তারপর, সেই সব যুবতীদের চাবুক দিয়ে প্রহারে জর্জর করতেন। এই ছিল তাঁর আনন্দ। তাঁরই নাম থেকে স্যাডিজম্ তথা সাদিজম্ কথাটি উদ্ভূত হয়েছে।

* * *

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে প্রাচীন কলকাতার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জব চার্নকের কথা। জব চার্নকের নামে যেসব কিংবদন্তী শুনতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ঐ ফরাসী মার্কুইসের রুচিগত কোন পার্থক্য নেই।

জব চার্নক যখন ভোজনে বসতেন, তখন চাকরদের ওপর অদ্ভুত একটা কাজ করার নির্দেশ ছিল। প্রত্যেক দিনই একজন-না-একজন লোককে ভোজনের সময় সাহেবের খাবার টেবিলের কিছু দূরে এনে রাখা হতো। চাকরেরা সেই লোকটিকে ধরে চড় ঘুষি লাথি মেরে আধমরা করে ছাড়তো। মার খেয়ে লোকটা পরিত্রাহি চীৎকার করতো। এই আর্তনাদ না

শুনলে জব চার্নকের ভোজনে রুচিই হতো না। প্রহৃত লোকটার আর্তরব কানে শুনছেন আর ডিনার খেয়ে চলেছেন, এই ছিল জব চার্নকের নিয়ম। একটি সতীদাহের সময় এক ব্রাহ্মণ বিধবা জ্বলন্ত চিতা থেকে পালিয়ে গিয়ে চার্নক সাহেবের বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করে। জব চার্নক সাহেব সেই বিধবাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

* * *

'আপনি হইয়া শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা।' এ তো গেল বৈষ্ণব কাব্যের কথা। নারীর মনে পুরুষ হবার কামনা কখনও কখনও দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই মনোভাব এত প্রখর হয়ে ওঠে যে, তখন সেটা কম্‌প্লেক্সে পরিণত হয়।

পরিচ্ছদের ব্যবহারের ভেতর দিয়েও এক ধরণের কম্‌প্লেক্স আত্মপ্রকাশ করে। এর নাম—ট্র্যান্সভেস্টিজ্‌ম্‌, অর্থাৎ বিপরীত সজ্জারীতি বিলাস। যে পুরুষের স্ত্রীলোকসুলভ বেশভূষায় রুচি এবং যে স্ত্রীলোকের পুরুষালী পরিচ্ছদই বেশী প্রিয়, তাদেরই এই কম্‌প্লেক্সের ভাগী বলা যেতে পারে। বহু লোকের মধ্যে এই ট্রান্সভেস্টিস্ট কম্‌প্লেক্স দেখা যায়। কি কারণে এ কম্‌প্লেক্স সৃষ্টি হয় তাও অবশ্য মনোবিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত নয়।

* * *

আর একটি অদ্ভুত কম্‌প্লেক্স আছে—পিগ্‌ম্যালিয়নিজ্‌ম্‌। কোন কোন লোকের মানসিক রুচির এমনই একটা বিপ্লব ঘটে যায় যার ফলে সে রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে প্রস্তর বা মৃন্ময় মূর্তির বেশি প্রণয়ানুরাগী হয়ে পড়ে। রোমান্টিক কাব্যের নায়কের মত কোন কোন লোক প্রস্তর মূর্তির প্রণয়ানুরাগী হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও পাওয়া গেছে।

কশাঘাত দিয়ে আনন্দ সঞ্চয় করা, এরকম নিষ্ঠুর বিলাস পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা গেছে। এমন অনেক কশাঘাত-বিলাসীর নাম করা যায়—যাঁরা গুণে ও জ্ঞানে অনন্যসাধারণ। তবুও তাঁরা এই ধরণের উৎকট একটা রুচির বশীভূত ছিলেন।

চাবুকের প্রহারে অপরকে জর্জর করে আনন্দ পাওয়া, এই সাদীয় কম্‌প্লেক্সের কথা বলা হয়েছে। সাদীয় কম্‌প্লেক্সের প্রকাশ বিচিত্র। এই যুদ্ধের ব্যাপারকেও অনেক বিজ্ঞানী মানুষের মনের অন্তর্নিহিত সাদীয় অপরুচির ব্যাপক প্রকাশ বলে মনে করেন। প্রণয় ভালবাসার ব্যাপারে সাদীয় রুচির দৃষ্টান্ত খুব বেশী।

শুধু নিগ্রহ দিতে নয়, নিগ্রহ পেতেও কেউ কেউ আনন্দিত হন, মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় একে মাসখীয় কম্‌প্লেক্স বলা হয়। প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য ও উপন্যাসে প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে নায়ক নায়িকার আচরণে সাদীয় ও মাসখীয় কম্‌প্লেক্সের আধিক্য খুব বেশী দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়ের এলা অন্তুকে বলছে—'না গো, তুমি আমার নরসিংহ, তোমার হাতে মরণেই আমার মুক্তি।'

চৈতন্য-সাহিত্যে আমরা একজনের নাম পাই, যিনি সে যুগের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ও জ্ঞানী ছিলেন। এঁর নাম অভিরাম গোস্বামী। ইনি শ্রীচৈতন্যের দ্বাদশ অন্তরঙ্গের অন্যতম। এঁর হাতে সব সময় একটি চাবুক থাকতো। বৈষ্ণবগ্রন্থে এই চাবুক 'জয়মঙ্গল' নামে পরিচিত। কাউকে কৃপা করতে হলে তিনি এই চাবুক মেরে প্রেম সঞ্চার করতেন।

"ঘোড়ার চাবুক নাম জয়মঙ্গল
তাহা মারি লোকে করে
প্রেমায় বিহ্বল।"

ডাইন-সংস্কৃতি

আজকের দিনে ডাইন কথাটা শুনলেই স্বতঃ মনে পড়ে মিলটনের কাব্যের একটি পংক্তি— from what a height to what a pit ! আজকের দিনে যে হতভাগ্য ডাইন নামে পরিচিত, সমাজে তার স্থান নেই, সে অপশক্তির আধার, সর্বনাশের বাহন ; বর্তমান ডাইনসমাজ সাধারণ মানুষের পক্ষে শুধু আশঙ্কার আস্পদ। মানুষ তাকে ভয় পায়, আর বাগে পেলে তার ইহলীলা ঘুচিয়ে দেবার অবকাশ খোঁজে। তাই পৃথিবীতে সভ্য অসভ্য সকল সমাজে আজও ডাইন নির্যাতন দেখতে পাওয়া যায়। ডাইন নির্যাতনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি যেভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাকে ঠিক নরমেধ যজ্ঞ বলা যেতে পারে। সাধারণ সংসারী মানুষ, যারা স্নেহ মায়া মমতা নিয়ে জীবন যাপন করে, তারাই ডাইন নির্যাতনে কতখানি ক্রুর হতে পারে, তা না দেখলে সহজে বিশ্বাস হয় না।

অথচ এই ডাইন একদিন মানুষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ গৌরবের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই ছিল সমাজের পরম পূজনীয় অধিকর্তা ও শুভাশুভের বিধাতা। কিন্তু মানুষের সামাজিক ইতিহাসে, যে বিপ্লবের পথে আবর্তিত হয়ে মানুষ আজ যে মনোভাবের অধিকারী হয়েছে, তাতে তার দৃষ্টি-বিচারের রূপও সমূহ বদলে গেছে। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের কাছে যে ভগবানের মর্যাদা পেয়েছে, তাকেই মানবেতর জীব বলে অর্বাচীন প্রপৌত্রেরা জীবন্ত পুড়িয়ে বা পুঁতে ফেলতে উদ্যত। তাই বেচারা ডাইনদের জন্য দুঃখ হয়। সেই সনাতন ভূত প্রেত যক্ষ পরী—যত সব লৌকিক বা অলৌকিক দেবদেবী, সবই তো আজও একাধারে ভীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে বেঁচে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মানুষের মন আজও বিরূপ হয়ে ওঠে নি। শুধু ডাইনরাই কি এমন অপরাধ করলো! সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডাইনের এ অধঃপতন শোচনীয়।

* * *

একদিন ডাইনরাই ছিল সমাজের পুরোহিত। সকল সামাজিক ও পারিবারিক মঙ্গলাচরণের ভার ছিল ডাইনের ওপর। ডাইনের মুখের মন্ত্রকেই প্রাচীন মানুষ একদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে অবধান করেছে। ডাইনের মন্ত্র, তুকতাক্, নানা উদ্ভট অনুষ্ঠান একদিন মানুষকে দুর্গতি থেকে রক্ষা করে এসেছে। সুদূর অতীতে, যখন পর্জন্যদেবকে আবাহন করতে ঋক্ মন্ত্রের বৈদিক ঋষি সিন্ধু নদের তীরে আবির্ভূত হন নি, তখন আরণ্য মানুষের ঋষি ও গুরু এই ডাইন মন্ত্রের জোরে মেঘ এনেছে, বৃষ্টি এনেছে, গাছে গাছে ফল ধরিয়েছে ও হিংস্র পশু তাড়িয়েছে। আজ সমস্ত সভ্যসমাজের পুরোহিতমণ্ডলী মানুষের মঙ্গলের জন্য যে কাজ করেন, প্রাচীন ডাইন ঠিক সেই কাজই করতো। সেদিনের ডাইনের হাতের সিদ্ধিকাঠি সংসারে যে শক্তির খেলা দেখাতো, আজকের কোন ধর্মগুরুর হাতের ধর্মদণ্ড তাই দেখাবার চেষ্টা করে।

* * *

মানব সমাজের আদি বৈদ্য এই ডাইনরাই। যত আধি ব্যাধি উপশম করার প্রক্রিয়া একমাত্র তাদেরই অধিগত ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় সেবাব্রতের যারা ব্রতী ছিল, একদিন তারা কি করে মানুষের আতঙ্কের আস্পদ হয়ে দাঁড়ালো। রোগহরণ, মারীনাশ ও জ্বর জ্বালা দূর করার চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম পত্তন করে ডাইন মানব। সে বিজ্ঞান

যতই রূঢ় ও অপ্রাকৃত হোক না কেন, সেবার আদর্শই ছিল তার পিছনের প্রেরণা। প্রাচীন ডাইন চিকিৎসক পরের রোগশান্তির জন্যে নিজেও যে কৃচ্ছ্র উপবাস ও আত্মনিগ্রহ বরণ করে নিতো তা আধুনিক কোন ব্রতীর চেয়ে তুলনায় নগণ্য তো নয়ই, বরং ঢের বেশী স্বার্থশূন্য ও আন্তরিক।

* * *

ডাইন মানব পৃথিবীর আদি কবি। আধুনিক মার্জিতরুচি মানুষ, উপমা ও অলঙ্কারে খচিত যে কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে, প্রাচীন মানব সমাজে 'মন্ত্র' সেই আনন্দ পরিবেশন করতো। তারও আগে ডাইনের মুখের আবৃত্ত তুক্‌তাক্ ঝাড়ফুঁক ও নানা দুর্বোধ্য শব্দ আলাপ ও বিলাপ প্রাচীনতম কবিতার নমুনা।

ডাইনরাই মানব সমাজের আদি চিত্রশিল্পী। কেউ কেউ বলেন, প্রস্তর যুগের শিকারী মানুষই চিত্রশিল্পের প্রথম সাধক। স্পেনের দুর্গম গুহার অভ্যন্তরে তার নিদর্শন আজও বেঁচে আছে। এ অনুমান সত্য। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণায় জানা গেছে যে, প্রাচীন শিকারী মানুষ মাত্রই চিত্রশিল্পী ছিল না, আর এই চিত্রসাধনা তাদের কাছে মারণ উচাটন ব্রতের মত বা যাদুবিদ্যার মত ব্যাপার ছিল। প্রাচীন ডাইনই ছিল চিত্রকর। ছবি এঁকে সে বিরুদ্ধা প্রকৃতি ঝড় ঝঞ্ঝা ও তুষার অথবা হিংস্র পশুর শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষার শক্তি লাভ করতো। পৃথিবীর প্রথম তান্ত্রিক এই ডাইন মানব। আধুনিক সাধকের মত তারাও 'সিদ্ধাই' লাভ করতো, অন্ততপক্ষে সেই বিশ্বাসটা যে তারা লাভ করতো, তাতে সন্দেহ নেই।

প্রাচীন ডাইন মাটিতে ছক কেটে তুকতাক্ করেছে; পাথর, ধাতু ও অস্থি দিয়ে তার হাতের সিদ্ধিকাঠি তৈরী করতে হয়েছে। এই সিদ্ধাইয়ের প্রেরণা তাকে বাধ্য করেছে শিল্পী হতে।

* * *

যুদ্ধ বিগ্রহে ও উৎসবে ডাইনরাই ছিল প্রধান নিয়ন্তা। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আদিম রাজনীতির নেতৃত্ব এই ডাইনদেরই হাতে ছিল।

কিন্তু এতখানি ক্ষমতাসম্পদে যে ডাইন মানব একদিন প্রচুর মহিমায় সমাজে সমাসীন ছিল ইতিহাসে তার এতটা অধঃপতন হলো কেমন করে? আজ ডাইন নাম শুনে নিরীহতম মানুষের মনও ক্রূরতায় বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এখানে আসে সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন। ডাইনদের এই অধঃপতনের মূল হলো গোঁড়ামি। সমাজের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা নতুনত্বকে গ্রহণ ক'রে, সনাতন রীতি নীতির কিছুটা পরিহার ক'রে, ইতিহাসের সঙ্গে পা ফেলে চলতে চায় নি। কোন্ কুক্ষণে জানি না, ডাইন মানব একদিন তার ক্ষুদ্র অতীতকেই বড় বলে গণ্য করলো, নতুনত্বকে সম্বর্ধনা করার প্রবৃত্তি তার হলো না। এই গোঁড়ামিই রচনা করলো তার গৌরবের মৃত্যুবাণ। নইলে, আজও সমাজ ও ধর্মের ডাইনজাতীয় নেতা আছে, কিন্তু তাদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ওপর আছে নতুনত্বের আবরণ। তারা সমাজে শ্রদ্ধা পায়।

আচার, ব্যবহাব, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতি সাংস্কৃতিক যে-কোন বিষয়ে গোঁড়ামি ঢুকলে ইতিহাসে তার কি নিদারুণ অধঃপতন হয়, ডাইনদের শোচনীয় ভাগ্য বিপর্যয় তার একটা বড় প্রমাণ।

ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস, যিনি স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস নামেই বেশী সুপরিচিত, তাঁকে স্মরণ করার প্রয়োজন আজও আছে।

আমরা জানি কবি গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ছিলেন। তাঁর জীবন বহু ব্যর্থতা, লাঞ্ছনা ও বেদনার একটা আখ্যায়িকা। দেশের সহস্র সহস্র মানুষ তাঁর মত মন্দভাগ্য ও নির্যাতন বরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। এর মধ্যে স্মরণ করার মত কিছু নেই। বর্তমান সমাজের এই স্বভাব, যুগের এই বিকার আজও নিরাময় হয় নি। বহু গোবিন্দ দাসের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে আমাদের রাষ্ট্র সমাজ সম্পদ ও নীতির মূঢ়তা ও অনাচার।

মানুষ হিসাবে তিনি অসাধারণ কিছু ছিলেন না। তিনি নগণ্য সাধারণের একজন ছিলেন। কিন্তু প্রতিভা হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। তাঁর এই প্রতিভার কাছে আমরা ঋণী। তিনি কবি ছিলেন। তাঁর সময়ে কবি আরও অনেকে ছিলেন। কিন্তু কবি হিসাবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

কি কারণে তাঁকে অনন্যসাধারণ বলা যেতে পারে? তিনি তো কোন বড় ছান্দসিক ছিলেন না। ভাষাকে কোন নতুন অলঙ্কারে ঐশ্বর্যবান তিনি করেন নি। তিনি মহাকাব্য লেখেন নি। তিনি ডজন ডজন বই লেখেন নি। তিনি বিদ্যাবাগীশ পণ্ডিত ছিলেন না। তবে কোন্ বৈশিষ্ট্য তাঁর ছিল যার জন্যে আজও তাঁকে স্মরণ করতে ইচ্ছে করে?

সত্যি কথা, তিনি এসব কিছুই ছিলেন না। কিন্তু তিনি কবি ছিলেন—একেবারে ষোল আনা কবি—নিরঙ্কুশ কবি। কাব্যের প্রাণবস্তু যা ভাবের সহস্র বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যঞ্জনা—যা আমাদের মনের প্রান্তরে প্রান্তরে মেঘরৌদ্রের মায়াজাল সৃষ্টি করে, সম্মোহিত করে, সহজ হবার অবকাশ দেয়, তিনি তারই পরিবেশক ছিলেন। তাঁর কাব্যপ্রতিভার উৎস, তাঁর বিচারদৃষ্টি ছিল অনিরুদ্ধ ও অনাবিল। তত্ত্ব বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্যের ভীড় সেখানে ছিল না। আবেগ দিয়েই তিনি যাচাই করে গেছেন সৎ ও অসৎ। নীতিতত্ত্বের লৌকিকতার কোন অনুশাসনের ক্রীতদাস তিনি ছিলেন না।

এই কারণে সেকালের অভিজাত সাহিত্যিকের আসরে তাঁকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে অনেক সত্যি মিথ্যে, খাঁটি আর ভুয়ো যাচাই হয়ে যায়। আজ ঠিক ঐ কারণেই কবি গোবিন্দচন্দ্রকে আমরা সাহিত্যের আসরে শুধু পাংক্তেয় করে নিয়েছি তা নয়—তাঁকে উচ্চাসনে স্থান দিচ্ছি।

* * *

এর কারণ আর কিছুই নয়। আধুনিক কাব্যসাধনায় আমরা আজ যে লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছি, সে সাধনায় কবি গোবিন্দ দাসকে আমরা পাচ্ছি সতীর্থ সহযোগীর মতন। সেকালের গোবিন্দচন্দ্র আজকের দিনের কাব্যিক সাধনায় পুরশ্চরণ করে গেছেন। এ সাধনায় আমরা তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ অনুভব করছি।

গোবিন্দচন্দ্রের কাব্য, উপমা দিয়ে বলতে গেলে বনশ্রীর মত। একটু স্থূল একটু কর্কশ—লতা গুল্ম ফল ফুল কণ্টকবন—এলোমেলো ঝড় বাতাস, পাখির ডাক— কিন্তু সব মিলিয়ে একটা স্বভাবজ শব্দে বর্ণে গন্ধে ও শ্যামল প্রাচুর্যে লিবিক্ত তাঁর কাব্য। কিন্তু যা আছে সবটাই খাঁটি। কলমচারা দিয়ে সাজানো বাগানের যত্নকৃত সৌন্দর্য এর মধ্যে নেই।

এই জন্যেই বোধ হয় তাঁকে স্বভাব কবি বলা হয়।

তাঁর 'ফুলরেণু' নামে কবিতা পুস্তক থেকে কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হলো। এ কবিতাগুলি সবই আজ থেকে অর্ধ শতাব্দীরও পূর্বের লেখা। টেকনিকের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'র কবিতাগুলির সঙ্গে এ কবিতাগুলি সমতুল্য। তবে নৈবেদ্যের ভাষা 'ফুলরেণু'র চেয়ে কিছুটা বেশী শালীনতা সম্পন্ন। অপরদিকে 'ফুলরেণু'র কবিত্ব 'নৈবেদ্য'র কবিত্ব থেকে অনেকটা অগ্রসর এবং ভাষার মধ্যে লিরিক সৌন্দর্য অনেক বেশী।

'তুমি আর আমি দেবি তুমি আর আমি
আবার ভাসিয়া গেছি দূরে দুইজন,
তুমি আর আমি দেবি তুমি আর আমি
তরঙ্গে ভাসিয়া ফিরি দুইটি স্বপন।'

* * *

'বচনে অমৃত তব, অমৃত অধরে
স্বর্গীয় অমৃতগন্ধে দেহ সুবাসিত
সকল ইন্দ্রিয় আজ একত্রিত করে
নয়নে করিব ভোগ 'কর না বঞ্চিত।'

* * *

'আমি এ পুরুষ আর সরলা এ নারী
পাপে পুণ্যে আছি পথে দেখা দুজনারি।'

* * *

'ভুলিয়াছ তুমি বটে, তুমি গিরি নদী,
নিত্য বহ নবস্রোতে নব স্থান দিয়া
বালুতে আঁকিয়া তব তরঙ্গ অবধি,
আমি শুষ্ক স্রোতচিহ্ন রয়েছি পড়িয়া।'

* * *

'তাহারি মমতামাখা মিঠামিঠি চাওয়া
নিশির শিশির ভরা তাহারি নয়ন
তাহারি সলাজ আঁখি দিনে নিভে যাওয়া
তারি মান নব ঘন চুরি করা মন'

* * *

'যাদেরে দেবতা বলি দিয়াছিনু স্থান
তারা তো দেবতা নহে করিয়াছি ভুল।'

সেকালের বায়ুমার্গচারী অতিনৈতিক সমালোচক প্রবরেরা গোবিন্দ দাসের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন। কবি গোবিন্দ দাসও তাদের শ্লেষবাণে বিদ্ধ করতে ছাড়েন নি। শ্লেষশিল্পে তাঁর পটুত্বের নমুনা দেওয়া হলো :

'কুরুচি-আতঙ্কে কিন্তু সুরুচির শ্বান
দংশিবারে সদা তারে করে আস্ফালন
গর্জনে কাঁপায় বঙ্গকাব্যের উদ্যান

সশঙ্কে কবিতাবালা সঙ্কুচিত মন।
কবি কহে কবিতা গো ভয় কর দূর
রুচি ফোবিয়ায় আমি ফরাসী পাস্তুর।

* * *

ইরাণের কবি ওমর খৈয়ামের কথা সকলেই জানেন। ইংরেজীতে তাঁর রুবাইগুলো অনূদিত হবার পর বিশ্বময় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। এ এক নতুন প্রেমদর্শন ; আবেগপ্রধান ও ইন্দ্রিয়ামোদী। কিন্তু বিশ্ববাসী অমৃতবচনের মত ওমর খৈয়ামের রুবাই পান করে আনন্দ পেয়েছে। তার কারণ এর মধ্যে তাত্ত্বিক মস্তিষ্কদর্প—সুরুচিশুষ্ক নীতিশ্লোক নেই। প্রাত্যহিক জীবনের ধূলিধূসরতার মধ্যে ওমর খৈয়ামের কাব্য পাঠকের চোখে ক্ষণিকের জন্য তুলে ধরে গোলাপ বাগিচার ছায়াগন্ধ, বুলবুলের গানে ভরা এক টুক্‌রো আনন্দের জগৎ। মানুষ মুক্তির নিশ্বাস ফেলে। আবেগ এখানে বাধাহীন—অন্তর পেয়েছে মর্যাদা। আশ্চর্যের বিষয়, ওমর খৈয়াম যখন আমাদের কাছে এত আদর পেয়েছে—গোবিন্দ দাসের 'ফুলরেণু' কেন পেল না? ফিটজারাল্ড ওমর খৈয়ামের অনুবাদ করলেন—তাকেই আবার আধুনিক বাঙলা ভাষার চটুল শব্দের ঘুঙুর পরিয়ে আমরা বিমুগ্ধ হয়ে শুনেছি। কিন্তু যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন 'ফুলরেণু'র ঐশ্বর্য, এর প্রেম-দর্শন বাঙলা সাহিত্যে অভিনব এবং অদ্বিতীয়। এর শব্দ, ভাব ভাষা, এ একেবারে বাঙলার মাটির সুরে মাজা। গাঙ্গেয় জোয়ারের মত এর আবেগ। ইরাণের পক্ষে ওমর খৈয়াম যা—বাঙলার পক্ষে গোবিন্দ দাসও তাই। আজ যদি কেউ কবির নামটি না উল্লেখ ক'রে তাঁর 'ফুলরেণু'র কবিতাগুলিকে আধুনিক প্রাঞ্জল ইংরেজী ভাষায় অনূদিত করতো, তা হলে সাহিত্যরসিক মহলে নিশ্চয়ই একটা খোঁজ খোঁজ রব পড়তো।

* * *

কবি গোবিন্দ দাসের এমন অনেক কবিতা আছে যাকে আমরা সংগীতে স্থান দিতে পারি। প্রকৃত গুণী ও সুরকার যদি তাতে সুরযোজনা করেন, তবে আমাদের বিশ্বাস তা এতই উপভোগ্য ও মনবিমোহন হবে, যাতে গোবিন্দ দাসের আসন আবার সাহিত্যের দরবারে যথাসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হবে। যে অনুদার রুচিবাতিক আভিজাত্যের ষড়যন্ত্র তাঁকে একদিন নগণ্যতায় ডুবিয়ে দেবার মতলব করেছিল, সেই অপরাধের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত সাধন হবে। কবির 'ছুঁয়োনা' নামে একটি কবিতার একাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। এ কবিতায় সুর সংযোগ করলে তা কতটা রূপপ্রবণ হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়—

'ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন
লাগিলে গায় গায়
সহজে ভেঙে যায়
রাখ হে ভালবাসা বাসনাহীন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।
থাকিলে দূরে দূরে
পাবে ভুবন জুড়ে
দেখিবে সদা তারে নিতি নবীন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।
কিছুই চেয়ো নাকো

কেবলি দিতে থাক
শোধিতে বাড়িবে সে মধুর ঋণ
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।
পরশে হয় কালা
দরশে বাড়ে জ্বালা
মানসে ফোটে শুধু প্রেমনলিন
ছুঁয়োনা ভালবাসা হইবে মলিন।'

* * *

যে বিখ্যাত ইরাণী কবি ওমর খৈয়ামের সঙ্গে কবি গোবিন্দচন্দ্রের তুলনা করা হয়েছে তা কতদূর সঙ্গত ও সত্য তার প্রমাণে কবির একটি কবিতার পদ উপসংহারে উদ্ধৃত করা যাক্। তাঁর কাব্যদর্শনের মূলতত্ত্ব এরই মধ্যে সংক্ষেপে নিহিত।

বৈজয়ন্তী কাব্যে—'মাঘে' কবি বলেছেন,—

'স্মরণে অনন্ত পুণ্য মরণে উল্লাস
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি
দগ্ধবুকে শত মুখে বহে বার মাস
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি পা দুখানি।'

দিব্যানুভূতি

দিব্যানুভূতি নামে একটা কথা আছে। এ অনুভূতি শুধু না কি যোগিজনসুলভ। ধ্যানে বসে যোগীদের দিব্যদৃষ্টি খুলে যায়। যা সাধারণত ধরাছোঁয়ার বাইরে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, তাই তখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে ওঠে। অজস্র 'অকথিত বাণী, অগীত গান ও অযুত বাসনা রাশি' রূপে রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। পরম তত্ত্বের হিরণ্ময় আবরণটি আপনা থেকেই সরে যায়। একটি কল্পরাজ্যের সিংহদ্বার যোগীর চোখের সামনে যেন অবারিত হয়ে ওঠে। যাঁরা মিষ্টিক বা মরমী সাধক, তাঁরাও ঠিক এভাবেই নিত্য রসের সন্ধানে তৎপর। তবে তাঁদের সাধনায় যোগীদের মত কৃচ্ছ্র পন্থার আদর নেই।

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'—শরীর শুকিয়ে যাক্, ত্বক অস্থি মাংস ক্ষয়ে যাক্—সিদ্ধার্থ এই সঙ্কল্প নিয়ে নিদারুণ কৃচ্ছ্র তপস্যায় ডুবলেন সত্যোপলব্ধির জন্য। কিন্তু তাঁকে ব্যর্থ হতে হলো। তিনি দেখলেন শুধু শরীর নিগ্রহই সার হয়েছে, সত্যের কোন নাগাল পাওয়া গেল না। পরে অন্যভাবে তিনি সাধনায় মনোনিবেশ করলেন। বলতে গেলে একটু আকস্মিকভাবেই একদিন তাঁর কাছে জ্ঞানের জ্যোতির্লোক প্রকাশিত হয়ে পড়লো ; তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন।

* * *

যোগী সাধকেরা চেষ্টা করে, বহু সাধনার প্রসাদে এই রকম দিব্যানুভূতি লাভ করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন, এই অদ্ভুত অনুভূতির অধিকারী কি শুধু যোগী মুনিরা? দিব্যজ্ঞান কাকে বলে তা জানি না ; সেটা সম্ভবত একান্তভাবে সাধকদেরই সাধ্যায়ত্ত। তবে সাধারণ মানুষও দিব্যানুভূতির অধিকারী, এ কথাটা বিশ্বাস করি। অধ্যাত্মতত্ত্বের জটিলতার ভেতর না গিয়েও

মাত্র মনোবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে একথা প্রমাণ করা যায়। হেন লোক নেই যিনি এক-আধবার বা মাঝে মাঝে 'অদ্ভুত অনুভূতির' আস্বাদ পান নি। এই ধরণের অভিজ্ঞতা চেষ্টা করে লাভ করা যায়, চেষ্টা না করেও লাভ করা যায়। সাধারণ মানুষও মাঝে মাঝে নেহাৎ অভাবিতভাবে এক একটা পরম তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করে বসে। যে তত্ত্ব এতদিন তার বুদ্ধির অগম্য ছিল, তাই হঠাৎ তার অনুভবের মধ্যে এসে ধরা দেয়।

* * *

সাধারণ মানুষের এ দিব্যানুভূতির পেছনে কোন প্রচ্ছন্ন পরাশক্তির লীলা নেই। এসব নিছক ঘটনাসাপেক্ষ। নিষাদের শরাঘাতে ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটির নিধনের ট্র্যাজেডিতে মুনি বাল্মীকির খেদ তাঁর কবিত্ব শক্তিকে উৎসারিত করেছিল। 'বেলা যে যায়' ডাক শুনে লালাবাবুর চোখে সমস্ত ইহসুখের নশ্বরতা ধরা পড়ে গেল ; তিনি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেলেন। নগণ্য আপেল পতনের ব্যাপার নিউটনের সমস্ত চিন্তাকে বিজ্ঞানসাধনায় উদ্দীপিত করে তুললো। তুচ্ছ এইরকম এক একটি ঘটনা অন্তর্লোকে হঠাৎ এমন আবেদনের মত পৌঁছয়, অনুভূতি এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, সমস্ত ব্যাপারটাই আগাগোড়া অলৌকিক বলে মনে হয়।

নিত্যদিনের জীবনে আমরা পথে ঘাটে অনেক কিছু দেখি। তার মধ্যে কোনটা মনে সাড়া জাগায়, কোনটা চুপচাপ বিস্মৃতিতে মিলিয়ে যায়। তিনটি ঘটনা মনে আছে।

* * *

—পথ হেঁটে আর ফুরোয় না। সাসারামের ধর্মশালা আর কত দূরে? রাত্রিও গভীর হয়ে এসেছে। একটু দূরে মস্ত বড় একটা পাথর—প্রায় একতলা বাড়ীর সমান। কাছেই একটা পেয়ারা বাগান। উল্কামুখী শেয়ালের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেশলাই জ্বেলে পাথরটা একটু দেখে নিয়ে, গা বেয়ে আর ধরে ধরে ওপরে উঠে শুয়ে পড়লাম। আজ এখানেই নিশি যাপন।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাতাসের মাতামাতি একটু বেশী, কৃষ্ণা তিথির ফালিচাঁদ উঠেছে। অদ্ভুত আলোছায়ার খেলা, অদ্ভুত সব শব্দ। প্রার্থনাধ্বনির মত একটা শব্দ গুমরে গুমরে উঠছে। তারপর ঘণ্টাধ্বনি—সমস্বরে স্তোত্রগান। জ্যোৎস্নাতে দেখা যায় মাঠের বুকে এঁকে বেঁকে চলে গেছে সড়ক—খুব সম্ভব পাটলিপুত্রের দিকে। পথ ধরে চলেছে এক একটা জনতা—সুররিয়ালিস্ট ছবির মত অস্পষ্ট অবাস্তব, মুণ্ডিতশীর্ষ মানুষের দল। তাদের পরিধানে কাষায় বস্ত্র। যেন একটা বড় সভায় যোগদানের জন্য মিছিল করে চলেছে তারা। স্তোত্রগানের শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে—ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লাম। এই পাথরটার মধ্যে কোন যাদু লুকিয়ে নেই তো! গল্পে পড়েছি, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর বাদসাহী প্রাসাদে এই রকম একটা ঐতিহাসিক ইন্দ্রজাল লুকানো ছিল। দেশলাই জ্বেলে পাথরটাকে ভাল করে দেখলাম।

না, অনুমান মিথ্যে নয়। পাথরের গায়ে খোদাই করে লেখা—দেবানাং পিয় পিয়দশী অশোকের অনুশাসন। মানুষ সুখী হবে, দুঃখ থেকে ত্রাণ পাবে ; তারই আবেদন রেখে গেছেন মহারাজা অশোক শতাব্দীর প্রস্তর ফলকে।

ঘটনাটা শুনতে খানিকটা অলৌকিক বলেই মনে হবে। শান্ত মনে, মনোবিজ্ঞানের সূত্র ধরে পরীক্ষা করলেই ব্যাপারটার খুব সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঐ যে ইতিহাসের একটা

মোহ এসে হঠাৎ মন ও ইন্দ্রিয় অভিভূত করে বসলো, এর মধ্যে বাস্তবিক কোন দৈবী শক্তির কাজ আছে কি? কিছুই নেই। পাথরটার ওপর উঠবার সময় দেশলাই জ্বেলে অন্যমনস্কভাবেই উৎকীর্ণ লিপিগুলি চোখে পড়েছিল। সেইটাই আবার মনের মধ্যে ইতিহাস-পড়া বৌদ্ধযুগের ধারণাটিকে অজ্ঞাতসারে আলোড়িত করে তোলে। তার ফলেই এই খোয়াব।

* * *

কোডারমা-গিরিডি বাস সার্ভিস এই পথে যাওয়া আসা করে। বাসের অপেক্ষায় বসে আছি গাছতলায়। এখানে জঙ্গল নেই, শুধু নেড়া উঁচু নীচু মাঠ, পাথরের টিলা, চ্যাপ্টা পাহাড়। দারুণ বৈশাখী প্রদাহে মাঠের ঘাস পুড়ে গেছে। উত্তর দিক হতে এক একটা লু'য়ের হল্কা আসছে থেকে থেকে। রামখড়ির টিবিগুলোর ওপর সাদা পাউডারের ঝড় দাপাদাপি করছে। ডাঙ্গাগুলোর দিকে বেশীক্ষণ তাকান যায় না। গুঁড়ো গুঁড়ো অভ্রের কুচি অগণ্যকোটি সূর্যের মত জ্বলছে সমস্ত মাঠ ছড়িয়ে। সুন্দরী ধরণীর এ কী নিদারুণ শ্রীহীনতা! বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চক্ষুও বোধ হয় পুড়ে যাবে।

হঠাৎ একটা টুকরো মেঘ ছায়াময় চাঁদোয়ার মত শূন্যে এসে ঝুলে রইল। সামনের হাতীর মত কালো পাথরটার গায়ে ধূপের মত আঠাল কষ ফুটে উঠেছে—পাথরের ঘাম।

না পাথরের ঘাম নয়। সেই মুহূর্তে অনুভব করলাম ওটা পাথরের চোখের জল। আজ নয়, দু'শ কোটি বছর ধরে সৃষ্টির বেদনায় পাথর এইভাবে কাঁদছে। কবে সেই প্রথম পুরাকল্পে, জ্বলন্ত ক্রুদ্ধ ম্যাগমা পুঞ্জকে শান্ত করে, সমস্ত অন্তর্ভৌম জ্বালাকে নিজের বুক দিয়ে ঢেকে পাথর এই পৃথিবীর ভূমি সৃষ্টি করেছে। নিজে বিদীর্ণ বিচূর্ণিত হয়ে কোমল পলি মৃত্তিকায় কমনীয় করেছে ধরিত্রীকে।

আমি আর কোডারমার সড়কে বসে নেই। অর্বাচীন বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমি নই। এই সেই গণ্ডোয়ানা ভূমি, যেখানে গলিত প্রস্তরের নিঃশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। যে পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হলো হীরা পান্না পোখরাজ নীলা পদ্মরাগ। কী ঐশ্বর্য ভরা এই পাথরের প্রান্তর। কী প্রাচীন ইতিহাস রূপকথার মত লুকিয়ে আছে এখানে। এই বরাকরের গড়খাই, চুণাপাথরের ধস্ নেমে গেছে—কোটি কীটের চূর্ণাস্থি। পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসীর গোরস্থান এই চুণাপাথর। এরই নীচে এখনও নিঝুম হয়ে রয়েছে পৃথিবীর আদিম অরণ্যের সমাধি—কয়লার স্তর। সড়কের পাশে কুলি মেয়েরা ভেঙে রেখেছে চূর্ণ ফেলস্পার আর কোয়ার্টসের স্তূপ। নিরেট গ্রানিটের স্তর নেমে গেছে নদীর বালিয়াড়ীর দিকে। ঠিক এইখানে একদিন ছিল অতিকায় গোধিকার সংসার। এই পাষাণে পাষাণে এখনো আঁকা আছে কত মরণাহত ডাইনোসরের চুম্বন।

* * *

তোপচাঁচি লেক ছাড়িয়ে পরেশনাথের গা ঘেঁষে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে যাত্রীবোঝাই বাস চলেছে হু হু করে। কনকনে মাঘী শীতের সন্ধ্যা, তার ওপর ঝড় আর শিলাবৃষ্টি। মেঘের জন্য অন্ধকারটা আরও ঘোরাল হয়ে উঠেছে। হেড লাইটের আলোকে দেখা গেল, অদ্ভুত মানুষের মত কী একটি জীব গাড়ির বিপরীত দিক থেকে হেঁটে আসছে। কৌতূহলী যাত্রীদের চোখ বিস্ময়ে আশঙ্কায় নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে রইল। গাড়ি বেগ কমিয়ে আস্তে আস্তে সেই জীবটির পাশে এসে দাঁড়ালো।

একটি সাঁওতাল তরুণী, সম্পূর্ণ উলঙ্গ। মাথায় জঙ্গল-ভাঙা জ্বালানী কাঠের বোঝা। একহাতে কাঠের বোঝা চেপে রেখেছে। আর এক হাতে বুকের ওপর চেপেধরা ক'মাসের একটি শিশু। নিজের পরিধানের ছোট ছিন্ন কাপড়টা খুলে শিশুটিকে আপাদমস্তক জড়িয়ে নিয়ে, বুকে চেপে সাঁওতাল মেয়েটি হনহন্ করে হেঁটে চলেছে। অঝোরে শিলা আর বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে তার অনাবৃত, অলজ্জ, নিটোল ও স্বাস্থ্যোচ্ছল অবয়বের ওপর। বাসযাত্রীদের বিস্মিত চাহনীর দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে হন্ হন্ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শিল্পী নই, তবু ছবি দেখে সুখ পাই। কিন্তু এ ছবির প্রসাদে পেলাম ক্ষণিকের জন্য সেই দিব্যানুভূতি। সৃষ্টির পিছনে মাতৃরূপেন সংস্থিতা দুর্দম্যা প্রকৃতির স্বরূপ। যে শুধু প্রাণের প্রসূতি নয়, প্রাণের ধাত্রী, তারই পরিচয়।

অতিরঞ্জন

অতিরঞ্জন বা বাড়িয়ে বলার মধ্যেও একটা আর্ট আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে 'অতিশয়োক্তি' একটা অলঙ্কার-বিশেষ। অবশ্য বাড়িয়ে বললেই সেটা আর্ট বা অলঙ্কার হয় না। এর মধ্যে রসের সমাবেশ হওয়া চাই—শ্রুতিমধুর ও মনোজ্ঞ হওয়া চাই। ঠিক ঠিক এই অতিরঞ্জন আর্ট প্রয়োগ করতে পারলে, কথা সেখানে সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায়। বলার ঢং যদি স্থূল হয়, তবে রস মাঠে মারা যায়, রূঢ় মিথ্যার দিকটাই প্রকট হ'য়ে উঠে। শ্রোতা বিরক্ত হ'য়ে মন্তব্য করেন—গাঁজাখুরি!

আমাদের পুরাণের আখ্যায়িকাগুলি এই অতিরঞ্জনের আদর্শ দৃষ্টান্ত। মহাবীর হনুমান যখন একলাফে সাগর ডিঙিয়ে যায়, গন্ধমাদন মাথায় ক'রে আনে, তখন পড়তে গিয়ে এডভেঞ্চারবিলাসী মানুষের মন অকুতোভয়ে অতিকল্পনার সাগর ডিঙিয়ে যেতে থাকে। মিথ্যা হ'লেও এর মধ্যে মোহ আছে, আকাঙ্ক্ষার আবেগ আছে। এই ধরণের সত্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে কেন যে মানুষ পরিতৃপ্তি পায়, তা বোঝা দুষ্কর। এর কারণ বোধ হয়, বাস্তবতার ওপর বিরূপতা। তার ওপব মানুষের জীবনের বাস্তব দিকটা তো সুখের নয়। কাজেই অতিরঞ্জন চাই-ই—পুরাণ, উপকথা, রূপকথা, ছেলেভুলানো ছড়া, অতি রোমাণ্টিক উপন্যাস। চাই এমন সব গল্প, যাতে রাজার মেয়ে চাষার ছেলের প্রেমে পড়ে, কাঠুরিয়া মানিক কুড়িয়ে পায়—অভিশপ্ত রাজপুত্র সোনার পালঙ্কে হাজার বছর ধ'রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। আরও আছে—কল্পতরুর কাছে চাইলেই সব পাওয়া যায়। কামধেনু সকল কামনা মিটিয়ে দেয়। এক গণ্ডূষ সুধা পান, আর সঙ্গে সঙ্গে চিরযৌবন আর অনন্ত আয়ু। আলাদিনের প্রদীপের মত এই অতিরঞ্জন সমস্ত যুক্তিবুদ্ধিকে পুড়িয়ে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে সুন্দর একটি মিথ্যার রাজ্যে মনকে উধাও করে নিয়ে যায়।

* * *

অলৌকিক কথাসাহিত্যেরও গোড়ার কথা এই। এর মধ্যেও মানুষের মনের একটি অদ্ভুত কম্প্লেক্সের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাইন, দানব ও রাক্ষসেরা সব সাংঘাতিক জীব। তারা প্রায়ই মন্দ ছাড়া মানুষের ভাল কিছু করে না। অথচ এদের বিশ্বাস করতে দ্বিধা নেই। এই কম্প্লেক্সকেই বলা যায়—'ভয় করতেই ভালবাসি।'

আর এক ধরণের অতিশয়োক্তি আর্ট আছে যার মূলে সবটাই মিথ্যে নয়। অতি সূক্ষ্ম

পরিহাসরসে ভরা এই গল্পগুলি। আধুনিক যুগে মানুষ কল্পনাকে সংযত করে যে বিশ্লেষণী বুদ্ধি ও অন্তর্মুখী ভাবদৃষ্টি লাভ করছে, তারই নমুনা এসব চুটকি গল্প। এ গল্পগুলিকে আজগুবী বলে উড়িয়েও দেওয়া যায় না, অথচ বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধে—বিশ্বাস করলেও মনে একটা খট্‌কা থেকে যায়।

স্বপ্ন ব্যাপারটা অলীক। বায়রনের একটা লাইন আছে—I had a dream which was not all a dream ! ঠিক এই ধরণের অজস্র গল্প আছে, যার অলীকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কিছু, কিন্তু সবটাই ঠিক অলীক নয়। একে 'নাতিশয়োক্তি' অলঙ্কার বলা যেতে পারে।

তিনটি গল্প মনে পড়ে, যেগুলি বিশ্বাস করতে বড় ভাল লাগে। ইচ্ছে করেই বিশ্বাস করি।

* * *

গজভুক্ত কপিত্থের কথা শুনেছিলাম ; হাতী বেল গিলে খায়, আর বিষ্ঠার সঙ্গে বেলটি না কি একেবারে আস্ত আকারে বের হয়, অথচ ভেতরে শাঁস থাকে না—একেবারেই ফাঁপা। এ গল্প বিশ্বাস করতাম না, কারণ হাতীর বেল খাওয়া দেখেছি।

দুধ আর জল মিশিয়ে খেতে দিলে হাঁস নাকি জলটুকু রেখে দুধটুকু খেয়ে নেয়। এ গল্পও বিশ্বাস করি নি, কারণ হাঁসের জল খাওয়ার ব্যাপার দেখেছি।

কিন্তু এক বুড়ো খানসামার মুখে রন্ধনকলার অপূর্ব পরাকাষ্ঠার এক গল্প শুনেছি, যেটা বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। প্রায় নব্বই বৎসর বয়সী হেদায়েৎ খানসামা—নবাবের বাড়িতে রান্না করতো। মিউটিনিতে নবাব মারা যাবার পর থেকে হেদায়েৎ মিঞা চাকুরী-ছাড়া। কারণ তার গুণ-গরিমার উপযুক্ত মাইনে দিয়ে কাজ দেওয়ার মত দ্বিতীয় কোন নবাব ওমরাহ্ ভারতে নেই।

এই হেদায়েৎ বড় বড় রুই, মিরগেল, কাৎলা, কালবোশ আস্ত আস্ত ভাজতো। ছুরি বঁটি মাছের গায়েও ছোঁয়াত না। কিন্তু অদ্ভুত তার মাছ ভাজার কায়দা—অলৌকিক বলে মনে হয়। সেই আস্ত ভাজা মাছটির ভেতরে কোথাও এক কুচি কাঁটা থাকতো না।

কি ক'রে সম্ভব? এ প্রশ্নে হেদায়েৎ শুধু হেসেছিল। বলেছিল—একদিন মাছ ভেজে খাইয়ে দেব, তাহলেই প্রমাণ পাবেন। কিন্তু হেদায়েৎ প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে নি ; হঠাৎ একদিন মারা গেল। তাই হেদায়েতের গল্পটা আজও অবিশ্বাস করতে পারা যাচ্ছে না।

* * *

শুকুলজী পালোয়ান—মির্জাপুরে বাড়ি। বাইশজন চেলা কড়া সরষের তেল দিয়ে তাঁর পাহাড়প্রমাণ শরীর প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত দলাই মলাই করে। শুকুলজীর চৌদ্দপুরুষ পালোয়ান। পালোয়ানী ক'রেই তাঁরা জমিদারী ক'রে গেছেন।

কথা প্রসঙ্গে একদিন প্রশ্ন করলেন—বিলাতে না কি বোক সিং নামে মস্ত এক পালোয়ান বেরিয়েছে?

বললাম—বোক সিং নয়—বক্সিং, ওটা কোন পালোয়ানের নাম নয়। ওটা একরকমের পালোয়ানী।

শুকুলজী বললেন—তা হোক্, কিন্তু আমার ঠাকুর্দার নাম হয়তো আপনারা শোনেন নি। আমি মনে করি দুনিয়াতে তাঁর চেয়ে বড় পালোয়ান আজ পর্যন্ত জন্মায় নি। দিগ্বিজয়ী পালোয়ান ছিলেন আমার ঠাকুর্দা। তিনি মারা যাবার পর আমরা আরও ভাল করে বুঝলাম

তাঁর মহিমা। চিতার ওপর ঠাকুর্দাকে চিৎ করে শোয়ানো হ'ল ; কিন্তু আশ্চর্য, দেখা গেল ঠাকুর্দার শবটি আস্তে আস্তে কাৎ হ'য়ে শেষে উপুড় হ'য়ে রইল। এ দৃশ্যে প্রথমে অবাক হই নি ; কিন্তু একবার, দু'বার, তিনবার! চিৎ ক'রে দিলেই শব উপুড় হ'য়ে যায়। ভয়ে, আশঙ্কায় আমরা বোকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন সময় দৈববাণী হ'ল—ওরে মূর্খ, জীবনে যে কখনো চিৎ হয় নি, কারও হাতে পরাজিত হয় নি, মরে গেলেও কি তাকে চিৎ করতে পারবি?

—অগত্যা ঠাকুর্দাকে উপুড় ক'রে শুইয়েই সৎকার করা হলো।

* * *

কে না জানে, বাংলার সিল্ক পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ? ঢাকাই মসলিনের কথা কে না শুনেছেন? একটি খালি দেশলাইয়ের বাক্সে এক থান মসলিন ভাঁজ ক'রে রাখা যায়! হ্যান্স এণ্ডারসনের অদৃশ্য রাজপোষাকের গল্প কল্পনার দৌড়ে ঢাকাই মসলিনকেও বেশী টেক্কা দিতে পারে নি।

মুর্শিদাবাদের সিল্কের খ্যাতিও সর্বজনবিদিত। কিন্তু শিল্পপ্রতিভায় মুর্শিদাবাদের তাঁতীদের চেয়ে সেখানকার রংরেজদেরই বড় বলে মনে করি। সে রংরেজ সমাজ আজ বোধ হয় আর নেই। তাদের শেষ প্রতিভা হোসেন রংরেজ মারা যায় ১৮৮১ সালে। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি শিল্পের মৃত্যু হলো, যা ফিরে পাবার জন্যে ভবিষ্যৎ পৃথিবীকে বহু দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

হোসেন রংরেজের গল্প শুনেছি। রেশমের কাপড়ে রং ফলাতে তার চেয়ে বড় ওস্তাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কেউ ছিল না। লোকটা বোধ হয় রংয়ের ইন্দ্রজাল জানতো।

একটা বড় কাঠের গামলায় কি সব মালমসলা গুলে একটা কালির মত জিনিস তৈরী ক'রে রাখতো হোসেন। একটি রেশমের কাপড় একবার মাত্র চুবিয়ে নিয়ে দু'বার ঝাড়া দিত শুধু। মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হতো কালির কালো। রেশমের কাপড়ে ফুটে উঠত ইন্দ্রধনুর ছটার মত সপ্তবর্ণের সুষমা। এইভাবে একই সল্যুশন থেকে হোসেন কচি কলাপাতা রং, আসমানী নীল, ধানী রং জরদ, বেগুনী ও চাঁপা, সব রকম রংয়ের অদ্ভুত সব খাঁটি ও মিশাল জলুস বার করতো।

কিন্তু হোসেন আর নেই—'রং-লক্ষ্মী নীরবে রোদন করিতেছে'।

অলৌকিক নৃতত্ত্ব

অপরাপর অগাণিতিক বিজ্ঞানের মত নৃতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান এবং যুক্তি বুদ্ধি ও বিচার দিয়েই মানুষ এ বিজ্ঞানের পত্তন করেছে। কিন্তু আর এক ধরণের নৃতত্ত্ব আছে যা আধুনিক মানুষের সাধনাপ্রসূত নয়। এ নৃতত্ত্বে যুক্তিবুদ্ধির বালাই নেই, সম্পূর্ণ রূপে কল্পনা দিয়েই এ নৃতত্ত্ব গড়া। এই কাল্পনিক নৃতত্ত্বে কত যে বিচিত্র মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। উপকথা, রূপকথা, পুরাণ ও কিংবদন্তী—এ সবের মধ্যে মানুষ শুধু কল্পনার বলে নানা বিচিত্র মানুষের সৃষ্টি করে এসেছে। আধুনিক মানুষও এই সব বিচিত্র মানুষের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান।

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে? এ প্রশ্ন চিরকাল মানুষের কৌতূহলী মনকে নাড়া দিয়ে এসেছে। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ—এ লোকায়ত মতবাদকে কল্পনাবিলাসী মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারে নি। তারা ধরে নিয়েছে, আর একটি জগৎ আছে

যেখানকার মানুষ ঠিক পার্থিব মানুষের মত রক্তমাংসে গড়া নয়। এরা অশরীরী মানুষ, এরা অলৌকিক গুণের অধিকারী। বেলগাছের ব্রহ্মদৈত্য, পাকুড়গাছের কিচিন, শ্মশানের পিশাচ, পড়োবাড়ির ভূত প্রেত, গুপ্তধনের প্রহরী যক্ষ বা গোরস্থানের মামদো—এই ধরণের বহু অপমানব কাল্পনিক নৃতত্ত্বের একটি বিভাগে পড়ে। এই সব অপমানবদের প্রতি মানুষের একটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা আছে।

মনোবিজ্ঞানের আলোকে এই ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, মানুষের মনের অন্তর্নিহিত একটা আতঙ্ক থেকে এই সব বিচিত্র জীবের উৎপত্তি হয়েছে। আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয়, সভ্যতার অনেকটা নীচু স্তরে যখন মানুষ ছিল তখনই নানা আতঙ্কে জর্জরিত তাদের অপ্রবীণ মন থেকেই এই সকল কাল্পনিক অপমানবের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ এই অপমানবেরা সকলেই কুৎসিত ও প্রকৃতিতেও ভয়ানক। এরা অপরের ক্ষতিটাই করে বেশী। সহজেই বোঝা যায়, সভ্যতার এই স্তরে মানুষের মনে শিল্পী-সুলভ রস বা সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ হয় নি। বীভৎস রসের প্রাবল্যেই তখনকার মানুষের মন ভারাক্রান্ত ছিল।

* * *

কাল্পনিক নৃতত্ত্বের দ্বিতীয় স্তরে দেখা যায়, মানুষের রসবোধের উৎকর্ষ, সৌন্দর্যবোধের উন্মেষ। অরণ্যচারী মানুষ নির্জন জ্যোৎস্নারাতে বনপথে একা যেতে যেতে হঠাৎ দেখতে পেল আবছা বনদেবীর মূর্তি, ফুলের গহনা গায়ে চটুল পায়ে বনের পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাখাল ছেলেরা পাহাড়ের পুরানো গুহার সামনে দাঁড়িয়ে শোনে গুহাবাবার সুগম্ভীর মন্ত্রগান। ঝড়ের রাতে, বনস্পতির পল্লব মর্মরে কাঠুরিয়া শুনতে পেল বনদেবীর কান্না। রাত্রিবেলা বড় বড় জলা, নদী বা বিলের ধারে জেলেরা কতবার দেখলো, জলপরী বসে আছে চুপ করে। এমন কি নিত্য মধ্যাহ্নের ঘূর্ণী হাওয়ার নাচের মধ্যেও বিশ্বাসী সরল মানুষ অদৃশ্য কোন দেবতার ক্ষ্যাপামি দেখতে পেত।

প্রত্যেক নিসর্গের এই রকম একটি অধিষ্ঠাত্রী অলৌকিক কোন সত্তা আছে। তারা মানুষের মতই, কখনও বা তাদের দেবতা আখ্যাও দেওয়া হয়ে থাকে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উন্নত শিল্পরুচির অধিকারী হতে লাগলো, তাদের কাল্পনিক নৃতত্ত্বে প্রথম স্থান হলো সুন্দরের ; এমনও হতে পারে, মানুষের এই কাল্পনিক আত্মীয়েরাই একদিন দেবতা হয়ে বসলো। বজ্র, বায়ু, রৌদ্র, বৃষ্টি বা জ্যোৎস্না—এ সব প্রাকৃতিক পরিদৃশ্যের পেছনে এক একটি দেবশক্তি কল্পনা করে নেওয়া হলো। বেদে ঠিক এই ধরণের বহু দেবতার পরিচয় পাওয়া যায়—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, রুদ্র, পূষন্, পর্জন্য।

কাল্পনিক নৃতত্ত্বের তৃতীয় স্তরে এসে পাওয়া যায় যত সব গ্রোটেস্ক মূর্তি মানুষ। এরা অর্ধপশু ও অর্ধমানব। গজানন গণেশ, হাঙ্গরমুখো ড্রাগন, সিংহের শরীর ও মানুষের মুখ মিলিয়ে স্ফিংক্স, মানুষের শরীর আর সিংহের মুখ জুড়ে নৃসিংহ ; তা ছাড়া আরও কত পৌরাণিক হয়াসুর বকাসুর। আরও আছে, মৎস্যকন্যা, নাগবালা, পাখির মত ডানাওয়ালা পরী হুরী আর জিন। এই স্তরে এসে দেখা যায় মানুষের মন ও কল্পনা কত শিল্পপ্রাণ হয়েছে। এইসব পরামানবেরা রূপে গুণে পার্থিব রক্তমাংসের মানুষের চেয়ে উন্নত। তুষ্ট হলে মানুষকে বরদান করে, মানুষ ইষ্টলাভ করে।

* * *

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত কাল্পনিক নৃতত্ত্বের অধিকাংশেই প্রাচীন মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের যুগের মানুষও যে বিচিত্র অপার্থিব মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা ছেড়ে দিয়েছে, তা নয়। পৃথিবীর উপগ্রহ ঐ চাঁদের ভেতর এক বুড়ী বসে বসে চরকা কাটছে, এটা তো ঠাকুরমার মুখে শোনা রূপকথা ; যুগ যুগ ধরে এই গল্প প্রচারিত হয়ে এসেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানীরাই বা কি কম যান? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মঙ্গল গ্রহের মানুষের কথা। এইচ জি ওয়েলস্ সাহেব এ বিষয়ে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছেন—জ্ঞানে বিজ্ঞানে বহুগুণে উন্নত মাঙ্গলিক মানুষেরা পৃথিবী আক্রমণ করলো, পৃথিবীর মানুষ পরাজয় স্বীকার করলো।

প্রায় প্রতি বছরেই একবার করে হিমালয় অভিযান হয়ে থাকে। তুষারমৌলী এভারেস্টের ওপর এখনও মানুষের চরণচিহ্ন পড়তে পারে নি।* এই অভিযানকারীদের মধ্যে সকলেই বিজ্ঞানী। তাঁদের মধ্যে অনেকে ফিরে এসে এমন সব গল্প করেছেন যাতে বোঝা যায় অতিপ্রাকৃতিক নৃতত্ত্বে মানুষ কতদূর আস্থাবান। এঁদের মুখে অদ্ভুত এক শ্রেণীর মানুষের কথা শোনা গেছে—হিমমানব। অত্যন্ত আয়ুষ্মান এই হিমমানবেরা, তারা না কি সহস্রায়ু। দীর্ঘ রোমে এদের দেহ আচ্ছন্ন। স্বচক্ষে কেউ এদের দেখেছেন কি না জানি না, কিন্তু বরফের ওপর তাঁরা হিমমানবদের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছেন।

হিমমানব প্রসঙ্গেই আর এক শ্রেণীর মানুষের কথা মনে পড়ে। এরাও মানুষের কল্পিত অতিপ্রাকৃতিক নৃতত্ত্বের জীব। কলোসাস বা বিরাট মানব। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাঙলা দেশে কিছুদিন আগে এই বিরাট মানবের পায়ের ছাপ না কি দেখতে পাওয়া যায়। কিছুদিন ধরে এ ব্যাপার নিয়ে তর্কে আলোচনায় বৈঠক গরম হয়ে উঠেছিল। জলপাইগুড়ি ফরিদপুর ও আরও অনেক জায়গায় এই বিরাট মানবের পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। কেউ কেউ সে সময় এই পদচিহ্নকে অশ্বত্থামার পায়ের ছাপ আখ্যা দিয়েছিলেন।

তবে এই বিরাট পুরুষের পায়ের ছাপের গল্প সম্প্রতি সৃষ্টি হয়েছে, তা নয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে ও য়ুরোপেও এই নিয়ে এক এক সময় খুব হৈ চৈ হয়ে গেছে।

* * *

সব চেয়ে অবাক করে দিয়েছেন পাদরী লুভান সাহেব। তিনি বিশ্বাস করলেন যে, এই ধরণের বিরাট মানবের সত্যই অস্তিত্ব আছে। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'-এর মত তিনি রাজপুতানার মরুভূমি থেকে আরম্ভ করে উড়িষ্যার জঙ্গল পর্যন্ত সর্বত্র অনুসন্ধান করলেন। এ বিষয়ে তিনি একখানি বই লিখেছেন যা ঔদ্ভট্যে উপকথাকেও হার মানায়।

পাদরী লুভানের অনুসন্ধান একদিন সফল হলো। ভুটানের এক উপত্যকার চাষারা তাঁকে বিরাট মানবের সন্ধান দেয়, ঐ উপত্যকার একটি বহু পুরাতন গুহার ভেতর। বুকে সাহস বেঁধে পাদরী সাহেব একদিন ঐ গুহায় ঢুকে পড়েন আর সত্য সত্যই না কি সেই সব বিরাট মানবদের দু'নয়ন ভরে দেখে ফিরে আসেন।

বিশ্বাস করা যায় কি?

*এভারেস্টে মানুষের পৌঁছনর পূর্বে এই নিবন্ধ রচিত।

এক দেহে হবে লীন

মহামানবের পূর্ণতীর্থ ভারতে একদিন আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন এক দেহে লীন হয়েছিল। ইতিহাসের দিক দিয়ে সে কথা সত্য। কিন্তু এই একদেহগত হওয়ার প্রসেস কি এখন বন্ধ হয়ে গেছে?

বিভিন্ন জাতির একদেহে লীন হওয়ার বাধাস্বরূপ রয়েছে ধর্ম। যতদিন ধর্মগত পার্থক্য থাকে ততদিন জাতিগত সমন্বয়ও বাধাগ্রস্ত থাকে। এটা সমাজতত্ত্বের নিয়ম। বাদশাহ্ আকবরের 'দীন এলাহি' ধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করলো না। কিন্তু সেটা যদি সম্ভব হতো তবে ভারতে আমরা আর একটা সম্প্রদায় পেতাম। অনেকে বলবেন, এভাবে এক একটি সমন্বয়ে ধর্মের আশ্রয়ে এক একটি সম্প্রদায় গড়ে ওঠে মাত্র। তাতে জাতীয় ঐক্য শুধু বিক্ষিপ্ত হয়। জাতিগত সমন্বয় হয় না।

এ সন্দেহের কিন্তু কোন সত্যিকারের ভিত্তি নেই। সমন্বয়ের রীতিই এই ধরণের। যেখানে পরিবর্তনের রূপ বৈপ্লবিক নয়, সেখানে এইভাবেই কাজ হয়। এমন কি, যে আর্যধর্মের কথা আমরা বলে থাকি সেটা ইতিহাসে ঐ ভাবেই বিভিন্ন টুকরো টুকরো সমন্বয় ধর্মের সাহায্যেই গড়ে উঠেছে। হিন্দু ধর্ম বলতে যা বোঝায়, তাতে আরো বেশী করে বিদেশী তত্ত্বের আমদানী হয়েছে। অবশ্য এসব সুদূর অতীতের কথা। বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতত্ত্ব যাঁরা অনুশীলন করেছেন তাঁরাই বলতে পারেন হিন্দুর ধর্মাচরণের কতখানি অংশ বিদেশী।

* * *

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভারতে যে দুটি ধর্মমত প্রবেশলাভ করেছে, অর্থাৎ ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম, সে দুটি মতবাদকে হিন্দুত্বের সঙ্গে সমন্বয়ক্ষেত্রে ক্রমে এসে মিলতে দেখা যায় নি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ইতিহাসের সেই রীতি যেন থেমে গেছে।

আমরা জানি মধ্যযুগে একদল ভারতীয় সাধকের প্রভাবে এই সমন্বয় অনেকখানি সম্ভব হয়েছিল। শুধু ধর্মসমন্বয় নয়, জাতিগত সমন্বয়ও সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানেও খোঁজ নিলে এমন কতগুলি উদাহরণ পাওয়া যাবে, যাতে ভারতীয় ইতিহাসের সেই পুরাতন সত্যটি পুনরায় সকল সন্দেহ অতিক্রম করে প্রমাণিত হবে। পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি নিয়ে যতই তর্ক করুন না কেন, কোটী কোটী ভারতীয় সাধারণ তাদের সহজ মানবতার বলেই একজাতীয়তার দিকে অগ্রসর হয়েছে। 'মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে, এ নহে স্বপ্ন কথা।'

ভারতীয় সমাজতত্ত্ব থেকেই এমন কতগুলি খবর দিতে পারি যেটা ধর্ম বনাম জাতিপ্রাণ তত্ত্বের সংগ্রামের মতই মনে হবে। আরও আশ্চর্যের বিষয় দেখা যাবে যে, যেখানে জাতিগত মিলনের প্রেরণা রয়েছে সেখানে ধর্মীয় বাধাকে নিঃসঙ্কোচে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। ধর্মকে ভেঙেচুরে এক্ষেত্রে জাতিপ্রথা তত্ত্বের সেবকরূপেই গড়ে নেওয়া হয়েছে।

* * *

তিনেভেলিতে একটি সম্প্রদায় আছে যারা ইহুদী এবং খৃষ্টানও। এদিকে নামের ব্যাপারে তারা সকলেই হিন্দু নাম গ্রহণ করে থাকে।

দক্ষিণ ভারতের খৃষ্টান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ আছে। একজন ক্যাথলিক যুবক একবার ত্রিচিনপল্লীর বিশপের ঘরের সুমুখে অনশন সত্যাগ্রহ করে, এই জাতিভেদ

উচ্ছেদের জন্য।

লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের অনেকখানি খৃষ্টান মতবাদ থেকে নেওয়া হয়েছে। এই সম্প্রদায় শবদাহ করে না ; খৃষ্টানদের মতই গোর দেয়। দক্ষিণ ভারতের উত্তর কানাড়ার একটি অরণ্যচারী জাতির লোকেরা খৃষ্টান নাম গ্রহণ করে।

পাঞ্জাবের চেৎরামী সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত ধর্মসমন্বয়ের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এরা খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের উপাসক। তাছাড়া এরা সৃষ্টিকর্তা আল্লা, পালনকর্তা পরমেশ্বর এবং লয় কর্তা খোদার উপাসনা করে।

মাথিয়া কুনবি নামক একটি জাতির ধর্মমত আরও অদ্ভুত। এরা নিজেদের অথর্ববেদোক্ত ধর্মাচরণের অনুগামী বলে ঘোষণা করে অথচ ইমাম শাহ্ নামে একজন পীরের উপদেশাবলী এদের অন্যতম শাস্ত্র। এরা রমজান হোলি ও দীপালি পর্ব পালন করে। বিয়ের সময় ব্রাহ্মণরাই পৌরোহিত্য করে।

চট্টগ্রামের বদরমাকান নামে একটি পীরের দরগা বৌদ্ধদেরও পবিত্র ধর্মস্থান। একে আরাকানী বৌদ্ধরা 'বুদ্ধ মাকান' নামে অভিহিত করেছে।

'হুসেনী ব্রাহ্মণ' নামে একটি সম্প্রদায় আছে, যারা আসলে মুসলমান কিন্তু আচারে ব্যবহারে এরা ব্রাহ্মণদের মতই। এরা শুধু সৈয়দ মুসলমানদের সঙ্গে একত্র বা এক পংক্তিতে ভোজন করেন। 'মালকানা' নামক না-হিন্দু না-মুসলমান রাজপুত সম্প্রদায়ের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এদের অনেককে শুদ্ধি করে হিন্দু করেছিলেন। বাঙ্গলাদেশেও এই ধরণের অনেকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করা যেতে পারে। বাখরগঞ্জের নগরচি, পাবনার কীর্তনীয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের চিত্রকর ও পটুয়া শ্রেণী। মহীশুরে চন্নবাসবেশ্বরের অবতাররূপে এক ব্যক্তি কিছুদিন আগে নিজেকে ঘোষণা করেন। এই ব্যক্তি হিন্দু ও ইসলামের সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে এক আন্দোলনের প্রবর্তন করে। গবর্নমেন্ট এই আন্দোলন দমন করতে বাধ্য হন।

পাঞ্জাবে চুহ্‌রা নামে একটি অবনত শ্রেণী আছে যাদের মধ্যে নাম দেখে জাত চেনার উপায় নেই। ইচ্ছামত এরা হিন্দু বা মুসলমান নাম গ্রহণ করে। অথচ ধর্মাচরণে এদের মধ্যে পরস্পর কোন পার্থক্য নেই।

আর একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, মাদুরা ও তাঞ্জোরের কয়েকটি প্রসিদ্ধ হিন্দু মন্দিরের ট্রাস্টিগণ সকলেই মুসলমান।

সৈনিকের স্বপ্ন

ঠিক এমনি এক জুলাইয়ের দিনে আমরা গিয়েছিলাম শজারু শিকারে। ছোটনাগপুরের যে জঙ্গলের রেঞ্জ ফল্গুর দক্ষিণ কোল থেকে সুরু করে গড়জাত উড়িষ্যায় গিয়ে মিশেছে, তারই মধ্যে এক জায়গায় গা-ঢাকা দিয়ে মিশে আছে হাতাবেড়ি পাহাড়। হাতাবেড়ির করঞ্জার বাদাড়ে ভাল শজারু পাওয়া যায়। জোর বৃষ্টি নামতেই বাধ্য হয়ে একটা আশ্রয় খুঁজতে হল। চোখে পড়লো পাহাড়ের গায়ে এক জায়গায় রেশমী সূতার জালের মত একটা পর্দা বাতাসের দোলা লেগে উড়ছে। কাছে যেতেই শুধু যে আশ্রয় পেলাম তা নয়, একটা আবিষ্কারের আনন্দে মনের উদ্‌ভ্রান্তি শান্ত হয়ে গেল। এটা একটা সুপরিসর গুহার মুখ। একজন অদীর্ঘদেহ মানুষ সোজা হেঁটে ভেতরে চলে যেতে পারে।

সুকঠিন পাথরের খিলানের নীচে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে আমরা বসলাম। কতকগুলি শুকনো কাঁটাঝোপ ছিঁড়ে আগুন জ্বালান হ'ল। দুটো কারণ ছিল। প্রথম, গুহার ভেতরে স্যাঁতসেতে অন্ধকারে একটা অস্বাভাবিক ভয়াল ভাব ছিল। দ্বিতীয়, চা তৈরী করা। ধুনিটা চিড়চিড় করে জ্বলে উঠতেই মাত্র পাঁচ ছয় হাত দূরে একটা বস্তুর দিকে সকলের চোখের প্রখর দৃষ্টি উদ্যত ছুরির মত চকচক করে উঠলো। ভুস্‌কো চূণের মত জিরজিরে একটা মানুষের কঙ্কাল। নিকটে নৌকার খোলের ফ্রেমের মত বিরাট একটা পশুর পাঁজর।

* * *

আজকের এই জুলাই সন্ধ্যায় আবার নতুন করে মনে পড়ছে, সেই হাতাবেড়ির গুহার কথা। কে সেই দুর্ভাগা, যার কঙ্কাল অতিকায় জানোয়ারের হিংস্র আলিঙ্গনে বন্দী হয়ে আজও গুহার অন্ধকারে পড়ে আছে? সে কোন্ যুগের লোক? কেমন ছিল তার সংসার?

আজ কল্পনায় দেখতে পাই, সেই গুহামানবের দরিদ্র সংসারের ছবি। সেদিনের অনভিজ্ঞ, নিরৈশ্বর্য, জীবন-সংগ্রামে বিক্ষত মানুষ। ইতিহাসের সেই নীহারিকার যুগ। ভাষাহীন মূক মানুষের বুকে বেদনার জ্বালাময় বোঝা। বুদ্ধির শৈশব রূঢ়া প্রকৃতির তাড়নায় দিশাহারা। হাতাবেড়ির গুহায় সেই অপোগণ্ড মানবসভ্যতার ব্যথা-জর্জর ইতিহাস লেখা রয়েছে এই কঙ্কালের প্রতিটি পরমাণুতে। আজ আমরা ভুলে গিয়েছি গুহামানবের সেই মহিমময় সংগ্রামের কথা। সভ্যতার আদি শহীদ বীর বর্বরের সাধনার কাহিনী আজ আমরা স্মরণ করি না। কোন প্রস্তর ফলকে সে বীরগাথা লেখা নেই। বিক্ষতদেহ রক্তোপ্লুত গুহামানব পাথরের লগুড় শক্ত মুঠোয় ধরে এইখানে ধুলোর ওপর একদিন ছট্‌ফট্ করে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। তার সমস্ত আদর্শ, আশা আকাঙ্ক্ষা আর আগামীকাল, মৃত্যুর আগে স্বপ্নের রূপে দেখা দিয়েছিল কি তার চোখে?

একটি দুঃসহ অপরাহ্ণ

মাত্র তিনটে বেজেছে, বিকালের রোদে ঝলসে রয়েছে চারদিক। ইট-পাথরের কলকাতার কঠিন শহরে ভব্যতার পরিবেশটুকু কোথাও একটু টোল খায় নি। সেই রম্য রাজপথ আর অট্টালী ; পথের দুপাশে বিপণির বিথার, ট্রামবাসের দৌড়, কোথাও ছন্দোভঙ্গ নেই। শুধু বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে জীবনের ধর্ম। ঘোলা জলের ফেনার মত পুঞ্জ পুঞ্জ মানুষের প্রাণ পথের উপর ঘুরছে ভাসছে, থমকে রয়েছে। কলকাতা শহর যেন কোন বড়লোকের বজরার মত এক মড়াভাসা শ্মশান-নদীর উপর ভাসছে।

প্রত্যেক ট্রাম-বাসের স্টপগুলির কাছে অর্ধোলঙ্গ ও অস্থিসার মানুষের এক একটা ব্যূহ। ডাইনে বাঁয়ে সম্মুখে পশ্চাতে যেন এক একটা নরকংকালের প্রাচীর মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, এক মৃত্যুকুণ্ডের মধ্যে টেনে নেবার জন্য পঙ্কিল হাতগুলি দাও দাও শব্দ করতে থাকে।

পথের দুপাশে ফুটপাথের উপর নিরন্ন গ্রাম-ছাড়া মানুষের ছাউনি পড়ে গিয়েছে। শত শত উনুন জ্বলছে। হাঁড়িতে সিদ্ধ হচ্ছে কচুর শাক আর চিংড়ির খোসা। ধোঁয়ার উৎপাতে কাকের দল এগিয়ে আসতে পারে না, শুধু আশেপাশে লাফালাফি করে বেড়ায়।

যেদিকে তাকানো যায়, শুধু নিরন্ন রুগ্ন মুমূর্ষু মানুষের জটলা। হুল্লোড় চিৎকার কান্না কলহ ও বিলাপের তাণ্ডব। সেই দগ্ধ জনারণ্যে পৃথিবীর সব সুস্বর পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায়, গুঁড়ির উপরে, ডালপালার গায়ে যত সব উচ্ছন্ন সংসারের

সামগ্রী জড়ো করা, তুলে রাখা, টাঙ্গানো। হাঁড়ি, বাঁকা, ঝুড়ি, ডালা, তেলাই, টিনের কৌটো। মানুষ যেন গর্ত খুঁড়ে, চাক বেঁধে, ঢিবি তুলে যেখানে-সেখানে যেমন খুশি বাসা করে ফেলেছে।

ছুটে আসছে মিলিটারী লরির ক্যারাভান। আকারে অতিকায় ঐরাবতের মত, রং ঘেসো ফড়িং-এর মত, ক্রুদ্ধ গণ্ডারের চেয়েও প্রমত্ত বেগ—লরিগুলি মাটি থরথরিয়ে বিদ্যুৎ-তাড়িত ছবির মত ট্রামলাইন ডিঙিয়ে উধাও হয়ে যায়।

তবু শেষ হতে চায় না। টিকলো নাকে চশমা পরা ও হাসিখুশি ইয়ারবাজ চেহারা, এক একটি যুবক-মার্কিন আলগোছে স্টিয়ারিং ধরে রয়েছে। পাশের মেয়েমানুষের শরীরের উপর একটু কাৎ হয়ে শরীর এলিয়ে দিয়ে এক সুতীব্র ইয়ার্কির উল্লাসে যেন উড়ে চলে যাচ্ছে। তার পর আর এক শ্রেণীর রথী, শখ করেই গা আদুড় করে নিয়েছে। মুখের রং তামাটে, গায়ের রং ঘেয়ো ঘেয়ো, চুরুট চুষে ঠোঁটগুলি কেমন ভোঁতা ভোঁতা। এরা বোধ হয় খাস ব্রিটেনের চাষাভুসো জাতের লোক, স্টিয়ারিং-এর উপর বুক সাঁটিয়ে বেপরোয়া বেগে ছুটে চলেছে। হঠাৎ এক একটা ভারতীয় মুখ দেখতে পাওয়া যায়, খাকি পাগড়ির নীচে এক জোড়া কড়া পাকের জাঠ গোঁফ। এদের হাতে পড়ে গাড়িগুলি যেন একটু সাত্ত্বিক হয়ে পড়েছে। মোটেই উদ্দামতা নেই, একটা ক্লান্ত ও অলস ভাব, মন্দস্রোতের ভেলার মত আস্তে আস্তে চলেছে। আবার আসে গোটা পঞ্চাশ জীপ, মাথার উপর ছোট্ট এক টুকরো ক্যানভাসের ছই। বহুদূর থেকেই তাকিয়ে চিনতে পারা যায়, খাকি উর্দির মধ্যে নিগ্রো সৈনিকড্রাইভারের কুচকুচে কালো মুখ ; পুরু ঠোঁটে একটু গম্ভীর ভাস্কর্যের বনেদিয়ানা আছে। চোখের দৃষ্টিতে রসালুতা আছে। মেয়েদের ভিড় দেখলেই একটু জোরে হর্ণ বাজানো অভ্যাস।

হর্ণ বাজাতে বাজাতে চলে যায় মিলিটারী গাড়ির ক্যারাভান। বিশ্বজোড়া যুদ্ধের ঝিল্লীস্বর যেন কিছুক্ষণের জন্য কলকাতার পথের দু'পাশের স্তূপীকৃত যত দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের ধ্বংসস্তূপের বিলাপ ডুবিয়ে দিয়ে যায়।

ঐ মার্কেটের দিকে এগিয়ে গেলে কোলাহলের বীভৎসতা চরম হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম নোংরা করে দেয়। মানুষের বোধশক্তির উপর যেন একটা পঙ্কিল বর্ষণ নেমে আসে। জায়গাটা যেন এক বিরাট পুরীষক্ষেত্র, দুর্গন্ধে বাতাসের পরমাণু বোধ হয় বিষিয়ে দিয়েছে। চালের সন্ধানে মার্কেটের ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করছে জনতা। গালাগালি ও ধাক্কাধাক্কিতে বিপর্যস্ত জনতা। মার্কেটের ফটক যেন হাঁ করে নরমুণ্ডের মালা চিবোচ্ছে।

একটা ছেলে। আর একটু পরেই ঐ ভিড় মাড়িয়ে আর চটকে থেঁতো করে দেবে ছেলেটার ধুকপুকে দেহটাকে। সুপুরি গাছের এক টুকরো খোলের উপর শুয়ে ঘুমোচ্ছে ছোট্ট ঐ ছেলেটা। চোখের কোটর দুটো মাছিতে ভর্তি, বিকট পক্ষহীন প্রেতচক্ষুর মত দেখাচ্ছে। মরে নি এখনো, পেট আর পাঁজরাগুলির মধ্যে নিঃশ্বাসের স্পন্দন এখনো লুকোচুরি খেলছে।

উনিশশো তেতাল্লিশের কলকাতার এক অপরাহ্নের এই এক রূপ। বিরাট এক কটাহে যেন মনুষ্যত্বকে ভাজা হচ্ছে। হৃত-অন্ন ও যুদ্ধদাস বাংলার প্রতি গ্রামে ও জনপদে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত নাড়ীর লালা যেনো জলের মত সব ঠাঁই ভাসিয়ে দিয়েছে। তাই বন্যাভীত মেঠো ইঁদুরের মত নিরাশ্রয় মানুষ দলে দলে এসে কলকাতা নামে একটা চড়ায় এসে আশ্রয়

নিয়েছে। সকাল বিকাল সন্ধ্যা ও রাত্রি—ওরা আসছেই। ট্রেনে চড়ে আর পায়ে হেঁটে, শুধু আসছে আর আসছে। ক্ষান্তি নেই। এক অফুরান অন্ত্যেষ্টির মিছিল।

এই শ্মশানে আবার নেড়ার নাচন কেন? আশ্চর্য, কলকাতা শহরের এই হাহাকারের মধ্যেই পথের উপর হঠাৎ এসে থামে এক আন্তর্জাতিক সেবা সমিতির মোটর ভ্যান। লাউডস্পীকারের চোঙ থেকে এক নাচের বাজনা ভীমমন্দ্রে সুরের গদা ভাঁজতে থাকে। কতগুলি লোক গাড়ি থেকে নেমে পথের পাশে বাড়ির দেয়ালে পোস্টার লাগায়—বাংলা দেশের কাছ থেকে এক কোটি টাকা দান চাই।

একটার ধাক্কা মিটতে না মিটতেই আর একটা। সত্যই একজন হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে হাতের মধ্যে আবেদনের ইস্তাহার গুঁজে দিয়ে যায়—রক্ত চাই। সত্যিই রক্ত চাই। রক্ত খুঁজছে ঐ আবেদন, তরল উষ্ণ যে বস্তু মানুষের দেহের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। রক্তের ব্যাঙ্ক রক্তের জন্য আবেদন ছড়াচ্ছে।

কাব্যতীর্থের প্রার্থনা

সারা ভারতে জ্বালামুখী ফুটে উঠেছে। উনিশ শো বিয়াল্লিশের আগস্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর প্রাণে এক মন্ত্রের ঝড় সঞ্চার করে দিয়ে গেল—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। দেশের মুক্তি চাই এবং তার জন্যেই মরতে চাই। এক বহ্নিময় মহাদ্যুতির রূপে জেগে উঠেছে ভারতের সাধারণ মানুষের আশা স্বপ্ন ও প্রার্থনা।

সংবাদ শুনলাম, মেদিনীপুরের এক গ্রামে জনতার উপর ব্রিটিশরাজের পুলিশ ও সৈনিক গুলী বর্ষণ করেছে। মরেছে অনেকেই, এবং সেই সঙ্গে মরেছেন পল্লীর এক কাব্যতীর্থ।

কাব্যতীর্থ মরেছেন, কিন্তু মনে হয় কাব্যতীর্থের হৃদয়ের স্বপ্ন আর প্রার্থনা যেন এই ভারতের আকাশের বাতাসে হোমবহ্নির সুরভিত জ্বালার মত, সঙ্গীতময় মন্ত্রের মত এখনো ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। কলকাতার এই সন্ধ্যায় এই ঘরের নিভৃতেও চুপ করে বসে শুনতে পাওয়া যায় সেই প্রার্থনার ভাষা আর ধ্বনি, যে প্রার্থনাকে কখনো গুলী করে হত্যা করা যায় না।

—হে জ্বালামুখী, তোমার শুদ্ধ পাবকের লক্ষ শিখা দিয়ে পরাধীন ভারতের জীবন হতে এই সুদীর্ঘ কালরাত্রির পুঞ্জীভূত তমিস্রা দগ্ধ কর ;দুরীভূত কর। ভারতের সমীর হতে সকল গ্লানির জঞ্জাল ভস্মীভূত করে দাও। ভারতের সলিলে নতুন করে স্বাদুতা আন, ভারতের মাটিতে নতুন সৌরভ আন।

—হে আমার দেশের ইতিহাস, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। আমার চেতনার নেপথ্যে যারা নিঃশব্দ হয়ে আছ, হে লক্ষ সাধকের স্মৃতিময় সত্তা, সাড়া দাও, সাড়া দাও। ভারতের জীবনে এই মহা-অরুণোদয়ের জন্য যারা যুগে যুগে তিলে তিলে প্রাণ দিয়েছে, সেই নামহীন পরিচয়হীন হে অখ্যাত প্রণম্যদল, আজ নতুন করে আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর। হে দুর্দ্ধর্ষ বরেণ্যদল, আজ নতুন করে আমাদের বরণ গ্রহণ কর। এস, এস আমার ভারত ইতিহাসের ধ্যানলোকে সমাহিত লক্ষ পুণ্যবান কীর্তিমান ও প্রেমিক, এই পুণ্য লগ্নে আমাদের আত্মায় আবার জাগ্রত হও। ভারতের নতুন সূর্যে তোমরা আবার ভাস্বর হও। ভারতের জননী-জায়া-ভগিনীকে তোমার সুললিত কারুণ্যে মধুরতর কর, ভারতের ভ্রাতা পিতা পুত্রকে জ্ঞানে ও চরিত্রে গরীয়ান কর। হে ভারত ইতিহাসের মহতো মহীয়ান্, আজ এই সংগ্রামের

প্রথম মুহূর্তে এই ক্ষুদ্র গ্রাম্য প্রাণের প্রার্থনারূপে তোমাকে আহ্বান করি।

—হে আমার সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ, সরস্বতী তীর হতে তোমার হোমাগ্নি ধূমের পুঞ্জ পুঞ্জ পূত সৌরভ আজ আমাদের প্রতি গৃহে প্রেরণ কর। সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য করবাবহৈ! বহু যুগের স্তব্ধতার দুঃখ ভেদ করে তোমার মন্ত্রস্বর ভারতের আঙিনায় নতুন করে মুখরিত হউক।

—হে মৌনী কপিলাবস্তু, তোমার সিদ্ধার্থের বাণী আবার নতুন করে শোনাও। জাগো সারনাথ, জাগো মৃগদাব, জাগো উরুবিল্ব, তোমার শীলাচারের পুণ্যে আবার ভারতের গৃহে গৃহে নতুন প্রদীপ জ্বাল। ভারতের প্রতি কুটীর স্বাধীন ভারতের নব সঙ্ঘারামে পরিণত হউক।

—জাগ্রত হও পাটলিপুত্রের পাষাণ। দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী হে ধর্মাশোক, ভারত ভূমিতে আবার শান্তির সাম্রাজ্য সম্ভব কর।

—আহ্বান করি তোমাকে, ক্ষাত্রশক্তিসেবিতা হে আমার সুদূরাতীতা দুর্জয়া ভারতভূমি! তোমার গিরিবর্ত্মে বৈরী-অনীকিনীর হিংস্র অশ্বক্ষুরধ্বনি চিরকালের মত স্তব্ধ কর। সমুদ্রচুম্বিত ভারত উপকূলের সুশ্যাম বেলাবলয় হতে বৈদেশিক জলদস্যুর তরণী দূরাপসৃত কর। শত হলদিঘাটের পুণ্যে মহিমান্বিত হে ভারতের সঙ্কটত্রাণ ক্ষাত্র আত্মা, আবার শুদ্ধা দেশাত্মিকা শক্তিতে ভারতভূমিতে জাগ্রত হও।

—জাগো ভারতের শস্য ও বনস্পতি, স্বাধীন ভারতের বলিষ্ঠ কৃষকের মমতাময় স্পর্শে আবার অন্নময় হও। ভারতের ভাস্কর, স্বাধীন ভারতের হৃদয়কে নতুন করে প্রতিমায়িত কর। দাও প্রেম, দাও পুণ্য, দাও শক্তি, হে মহাপ্রাণ আমাদের যাত্রা সফল কর।

কিংবদন্তী প্রসঙ্গ

পেশোয়ার শহরের পুরনো অঞ্চলে একটা বাজার আছে। তার নাম 'কিস্‌সা কহানি' বাজার। চলতি কথায় বলে 'কিস্‌সা খানি' বাজার। এ বাজারে নানা রকম বিক্রেয় পণ্যদ্রব্যের মতো বিশেষ একটি পণ্য বিক্রীত হতো। সেই পণ্য হলো কিস্‌সা অর্থাৎ গল্প। গল্পকার একখানি রেজাই পেতে বসতেন এবং আগন্তুক শ্রোতার দল বসতেন তাঁর সম্মুখে। এক আনা বা দু'আনার বিনিময়ে একটি কাহিনী বলতেন সেই গল্পব্যবসায়ী। এরকম গল্পের দোকান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে কি না জানি না। শোনা যায়, প্রাচীন য়ুরোপের 'ইন' বা পান্থশালায় এই ধরনের গল্প বলিয়ে বৃদ্ধ থাকতেন, অভ্যাগতদের গল্প শোনানোই ছিল তাঁর জীবিকা। পেশোয়ার শহরের কিস্‌সা কহানি বাজারেও বোধ হয় আর গল্পের দোকান নেই। কিন্তু এ ঘটনা থেকে এই সত্যটুকুও প্রমাণিত হয় যে, গল্প সৃষ্টি করা যেমন মানুষের অন্তরের স্বভাবধর্ম, তেমনি গল্প শোনাও অন্তরের স্বভাবজাত ক্ষুধা বিশেষ। তাই আজও দেখা যায় যে, জংলী অঞ্চলের নিভৃতে অবস্থিত কোন ডিহির অথবা ক্ষুদ্রতম গণ্ডগ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষও তার জীবনের চারদিকে কাহিনীময় এক পরিবেশ রচনা করে রাখে। স্থানিক ঘটনা, অথবা স্থানিক নদী দীঘি অরণ্য পাহাড় ও জলকুণ্ড, অথবা একটি বটবৃক্ষ কিংবা একটি প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রকে অথবা শ্মশানভূমিকে প্রসঙ্গ ক'রে নিয়ে সে বহু কাহিনী সৃষ্টি করে। তার মন তার নিজেরই রচিত এই কিংবদন্তীর দেশে ঘুরে ফিরে তার বিস্ময় ও কৌতূহলের তৃপ্তি খুঁজে বেড়ায়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এই ধরণের এক একটি

কিংবদন্তীর দেশ আছে। আমাদের বাঙ্গলা দেশেও আছে।

* * *

ইতিহাসকে এবং ঘটনাকে প্রশ্ন করে কিংবদন্তী। যেখানে লিখিত ইতিহাস চুপ করে থাকে, সেখানে কিংবদন্তী মুখর হয়ে ওঠে। ঘটনা অতীত হয়ে যায়, ঘটনার জের মিটে যায়, কিন্তু কিংবদন্তী ঘটনাকে সহজে রেহাই দেয় না। বিচারকের মত রায় দান করে কিংবদন্তী। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাঁর অনুচর শের আফগানকে হত্যা করে সুন্দরী মেহের-উন্নিসাকে একদিন বর্ধমান থেকে আগ্রায় নিয়ে গেল। মেহেরউন্নিসা নুরজাহানে পরিণত হলেন, নিহত শের আফগানের পত্নী বাদশা জাহাঙ্গীরের প্রণয়াভাগিনী হয়ে সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠলেন। প্রশ্ন উঠবে, বর্ধমান থেকে চলে যাবার সময় সুন্দরী মেহেরের চক্ষে কি এক ফোঁটা জলও দেখা দেয় নি? লিখিত ইতিহাস কোন উত্তর দেয় না। কিংবদন্তী কিন্তু উত্তর দেয়। কিংবদন্তী সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ক্ষমা করে নি এবং জাহাঙ্গীরের প্রেম-প্রণয়ের এই ভয়ংকর পদ্ধতিকে কোন গৌরব দান করে নি।

মেহের হামারা' এই ধ্বনিই দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করে নিস্তব্ধ নিশীথে বর্ধমান হতে মঙ্গলকোটের দিকে এক একদিন ছুটে যায়।

মেহের হামারা! আলিকুলি শের আফগানেব শেষ নিঃশ্বাস বাদশাহী প্রণয় কলাপের সীমাহীন ঔদ্ধত্যকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য আজও ছুটাছুটি করছে। মেহের হামারা! জাহাঙ্গীরের হুকুমের অনুচর সুবেদার কুতবউদ্দীনের তরবারির আঘাতে ছিন্ন হয় নি পত্নী-প্রেমিক স্বামীর দাবি। মেহের হামারা! দীর্ঘশ্বাসের মত এই শব্দের মধ্যে এক শেরের গর্জন লুকিয়ে রয়েছে।

কিন্তু এমন করে কাকে ডাকছেন শের আফগান? সে নারী কি আর ফিরে আসতে পারে? চলে গিয়েছেন মেহের, তাতার দম্পতির সেই মেয়ে, যে মেয়েকে তার শিশুকালে একদিন কান্দাহারের পথে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে এক বিষধর কৃষ্ণসর্প সস্নেহে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু কি কঠোর এই বাদশাহী কামনার নাগপাশ! এই অবরোধ থেকে মুক্ত হবার সাধ্য আছে কি আমীর-পত্নী এক বিধবার?

সাধ্য ছিল না, বাদশাহের প্রণয় গরিমায় প্রথমে নুরমহল তারপর নুরজাহানে পরিণত হলেন মেহেরউন্নিসা। মোগল বৈভবের সম্রাজ্ঞী হয়ে উঠলেন নুরজাহান।

কিন্তু, তারপর আর কোন প্রভাতে দিল্লী ও আগ্রার প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়িয়ে পূর্বাকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে ছায়াময় দূর বঙ্গালের এক নিভৃতের একটি কবরের কথা কি মনে পড়ে নি সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের? হে তুজক-ই-জাহাঙ্গীরী, সোনার কলমে লেখা সম্রাটের আত্মজীবনী! ক্ষণেকের মত উদাসিনী ও অন্যমনা সম্রাজ্ঞীর কবরী হতে সেদিন যে গুলচাঁদনীর স্তবক হঠাৎ স্খলিত হয়ে মর্মর পাষাণের উপরে লুটিয়ে পড়েছিল, সে কথা লিখতে ভুলে গেলে কেন? মুখ তুলে তুমি বলতে পার নি কেন, হে তারিফ-ই-জানজাহান, কেন এক পূর্ণিমারাতের মাঝ প্রহরে লাহোর কেল্লার হাতিপোল দরজা খুলে গিয়েছিল, আর প্রাসাদকক্ষের রঙীন আলোকের সমারোহ থেকে একাকিনী চুপি চুপি বের হয়ে সম্রাজ্ঞী নুরজাহান এসে রাভি নদীর কিনারায় মুক্ত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে ছিলেন গ্রাম্যনারীর ছদ্মবেশে কিসের জন্য, কার কথা ভেবে, কোন্ বেদনার ভার হতে মুক্ত হবার আশায়? কাশ্মীরের সুরম্য শালিমার বাগে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় বিরামকুঞ্জের নিভৃতে কালো পাথরের বেদিকার উপর সম্রাটের পাশে বসে পীর-পঞ্জলের হিমানীমাখা চূড়ার দিকে তাকিয়ে

সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের কেন যে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, সে-কথা লিখতে এত ভয় পেলেন কেন ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী?

• • •

থাক লিখিত ইতিহাসের কথা, যে যতই নীরব হয়ে থাকুক, বর্ধমানের বাতাস কিন্তু নীরব হয়ে থাকে নি। এ বাতাস আজও এক অদ্ভুত শব্দের রহস্য সৃষ্টি করে ডাকছে তার মেহেরকে। কেউ শুনতে পায়, কেউ শুনতে পায় না। যে শুনতে পায়, তারই মনে প্রশ্ন দেখা দেয়—এ আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন কি মেহের বিবি? মানত করে বিশ্বাসী মানুষ। বর্ধমানে এসে পীর বহরামে শের আফগানের কবরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দেয়।

ঘুমিয়ে আছেন শের। মোগল ইতিহাসের কি বিচিত্র এক ঘটনা নির্মমতা ও মমতার স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে এই কবর। শেরের পাশেই সুবেদার কুতবউদ্দীনের কবর। ঘাতকও হত, উভয়ের পরিণাম আজ একই মাটির আশ্রয় নিয়েছে। আক্রান্ত শের-আফগানের সমশের চিরকালের মত স্তব্ধ হবার আগে একটি শাণিত আঘাতে কুতবউদ্দীনকেও শোণিতে রাঙিয়ে দিয়ে নিষ্প্রাণ করে রেখেছিল। দুই বৈরীর, পরস্পরের প্রাণ-হন্তা দুই মানুষের পাশাপাশি কবর আজ চিরকালীন দুই সুহৃদের মত বসে আছে। মেহের হামারা, শের আফগানের এই দাবির বিরুদ্ধে তলোয়ার তোলবার মত আর কেউ নেই। শান্ত কবরে মানতকারীর প্রদীপ জ্বলে কখনো মাঝ রাতে আর কখনো বা শেষ রাত পর্যন্ত।

সত্যিই কি মেহের এল? কৌতূহল সহ্য করতে না পেরে ঘুম হয় না যে মানতকারীর, সে ই ফিরে এসে কবর থেকে কিছু দূরে অন্তরালে দাঁড়িয়ে থাকে, নীরবে ও নিষ্পলক চক্ষে। হঠাৎ দেখতে পায়, প্রদীপের আলোকে যেন চিকমিক্ করছে এক রেশমী ওড়নার সোনালি চুমকি। যেন বাতাসের তন্তু দিয়ে তৈরী একটি স্বচ্ছ জালিতে জড়ানো রয়েছে একটি সুন্দর মুখ। মাথা হেঁট করে কপাল দিয়ে কবর ছুঁয়ে বসে রয়েছে শোকভারে ভগ্ন এক নারীর শরীর যেন চিরমহপুরের বুকে এক অনন্ত তসলীম পুষ্পিত হয়ে পড়ে আছে। মুহূর্তের মধ্যেই মিলিয়ে যায় সেই ছবি।

এসেছিলেন মেহের বিবি। মানতকারীর কথা লোকে বিশ্বাসও করে। বিশ্বাস করার মত আরও প্রমাণ লোকে স্বচক্ষেই দেখতে পায়। সকাল হলেই দেখা যায়, কবরের উপর ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একরাশ গোলাপের পাপড়ি। মেহের বিবিই আসেন, নইলে কে এসে এত গোলাপের পাপড়ি ঠিক এই কবরের উপরেই এমন করে ছড়িয়ে রেখে যাবে?

ময়নাঘরের বিস্ময়

ময়নাঘর, অর্থাৎ মড়াকাটা ঘর। সার্জনের হাতের ছুরি এখানে শুধু শবের বুক চিরে রহস্যের তদন্ত করে। সার্জন কৈলাস ডাক্তারের মত মানুষকেও এখানে বিস্মিত হতে হয়, মুগ্ধ হতে আর চমকে উঠতে হয়। কুৎসিত এক ভিখারী মেয়ে ; নাম তুলসী। তারই লাস এসেছে।

—ওয়ান মোর আনফরচুনেট।

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার :

করাতের দু-পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হলো। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস্ ফোঁস্ করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চলল লাসের উপর গলাটা। চিরে দেওয়া হলো

লম্বালম্বি ভাবে। বুকের মাঝখানে ও দু'পাশে বড় বড় পোঁচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হলো। সাঁড়াশি দিয়ে পট্ পট্ করে পাঁজরগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—নিশ্চল দুটি কনীনিকা যেন নিদারুণ অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে রয়েছে। শুকিয়ে কুঁকড়ে গিয়েছে চোখের শ্বেত পটল, সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলি অতিস্রাবে বিষণ্ণ।

—ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যদু ডোম বলে—হাঁ হুজুর, কাঁদবেই তো। সুইসাইড কি না। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়, তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ? কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কই, কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালীটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল গ্রসনিকা!

—এত লালা। মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

—হাঁ হুজুর, ভিখিরী তো খেয়েই মরে।

* * *

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে আর ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে, অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মতো বরাঙ্গের এই প্রকটরূপ, অচ্ছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মতো শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সু-সূক্ষ্ম কৈশিক জাল।

কৈলাস ডাক্তার তেমনি বিমুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটা। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গিয়েছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিয়ে আর দু'চোখ অপলক করে দেখতে থাকেন—খণ্ড স্ফটিকের মতো পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী! সন্ধিতে সন্ধিতে সপ্রচুর লাসিকার বুদ্বুদ, গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংশুপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা, ঝাঁপিখোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠল।

আবিষ্ট হয়ে গিয়েছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ওই রূপের পরিচয় কে রাখে। তবুও মানুষের এ তিমিরদৃষ্টি হয়ত ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্যাদা। নতুন তাজমহল হয় তো গড়ে উঠবে সেদিন। যাক্...

* * *

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বলে—এসবে কোন জখম নেই হুজুর, পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হলো পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার

দেখলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। ক্রোমরসে মাখা একটা অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ, পাউরুটি, আর···বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়ল মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠল দপ দপ করে! পোখরাজের দানার মতো বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়ল মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদন করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুললেন—পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা, মাতৃস্তেনের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসলা ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট ও কুঞ্চিত, যেন বিষিয়ে নীল হয়ে রয়েছে এক শিশু এশিয়া।

পাতালপুরীর চাকরী

দত্ত কোম্পানির অভ্রের খনি। ওভারম্যান দিনেশ ডিউটি দিতে নেমে চলল সুড়ঙ্গের পথে। হাতে টর্চ আর বেঁটে একটা লাঠি। চওড়া ঢালু পথ নেমে গিয়েছে। পা ঠেকা দেবার জন্য গাছের ডাল দিয়ে সিঁড়ি বাঁধা হয়েছে। মাথার উপরটা যেন এক বিরাট পাষাণের চন্দ্রাতপ—গাঁইতার মারে চেঁছে আর ছুলে খিলান করে দেওয়া হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে ফাটল, ভূভারের আক্রোশ যেন ভ্রূকুটি করে রয়েছে। কাঁচা গাছের তক্তা দিয়ে খিলানটা এক প্রস্থ তালি মারা হয়েছে; পচে ছিঁড়ে গিয়েছে কাঠ। তারই ফাঁকে চুঁয়ে পড়ছে ভুসকো মাটি, কাদাজল আর কাঁকর। একটা শিমুলের শিকড় সাপের লেজের মতো ঝুলছে। ঢালু সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে, ছাতটা সেখানে পাকা ফোঁড়ার মতো ফুলে উঠেছে। এক ভয়ঙ্কর পরিণামের আশঙ্কায় টনটন করছে জায়গাটা। দুর্বল আশ্বাসের মতো কয়েকটা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

নামতে নামতে দিনেশ এসে দাঁড়াল ঢালুর শেষে। জায়গাটা প্রায় সমতল। দুধে মাটির কাদায় পা ডুবে যায়। দুপাশে স্তরে স্তরে কেওলিন গলে রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা খাড়া চানকের মুখ মাথার অনেক উপরে, পৃথিবীর আলো-ঝলসানো দিনমানের একটি বুদ্বুদের মতো ভেসে রয়েছে।

এখান থেকে তিন দিকে তিনটে সুঁদ চলে গিয়েছে। দুপায়ে গুঁড়ি মেরে মেরে আর দু থাবায় হেঁটে দিনেশ চলল টর্চের আংটা দাঁতে কামড়ে। ধারাল কোয়ার্টাসের নুড়িতে হাঁটু ছড়ে যায়। ঘাড় টাটিয়ে উঠলেও মাথা তোলা যায় না। মাথার উপরে এবড়ো খেবড়ো পাথর, যেন পাতালদানবেরা দাঁত মেলে রয়েছে। বেসামাল হলেই মাথার খুলি ঠুকে যাবে, ভেঙ্গে যেতেও পারে। সরীসৃপের মত পাকিয়ে পাকিয়ে বুকে হেঁটে দিনেশ চলেছে ডিউটি দিতে, পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরি।

* * *

নুড়ি ভরা পথটা শেষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ একটা ঢালু। দিনেশ ঝুপ করে পড়ে গেল নিচে, যেন একটা স্প্রিং-এর গদিতে, অর্থাৎ রামার গাদিতে। খনিকরের উপেক্ষিত কালো

অভ্র রাম্মা। রাম্মা কালো বলেই অকেজো, কেউ ছোঁয় না। হঠাৎ হেসে ফেলে দিনেশ, সে হাসিতে যেন একটু দুঃখও মিশে রয়েছে। মনে হয়, এই কালো রাম্মা আর মেয়ে-মজুর বিলাসীর মধ্যে যেন অদৃষ্টের মিল আছে।

এ জায়গাটা তবু একটু সুপরিসর, চারটে দিক ঠাহর করা যায়। নইলে সুঁদের পথে একবার এলে মনে হয়, এ জগৎ যেন আয়তনতত্ত্বের বাইরে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু অশরীরী একটা প্রাণ অচরিষ্ণু পাথরের স্তর দীর্ণ করে এগিয়ে চলে চাকরি করতে।

দিনেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলি একবার টেনেটুনে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে বসিয়ে নেয়। সুঁদের পথ এবার আরও গভীরে ডানদিকে ঘুরে খাড়া নেমে গিয়েছে। গুমোট বড় বেশী, কাছে কোন চানক নেই। টর্চ জ্বাললেও পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। কোটি কোটি অভ্ররেণু স্তব্ধ ঝড়ের মতো পথ জুড়ে রয়েছে।

অনেকটা ঝুলে ঝুলে নামতে হয়। ধরবার জন্য একটা দড়ি খুঁটোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, গতির বেগে দেহের ভার যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। পাশে একটা চওড়া খুপরি। রেড়ির তেলের একটা প্রদীপ নিভে রয়েছে। একটা শূন্যগর্ভ তাড়ির ভাঁড় আর কয়েকটা গালার চুড়ির টুকরো। নামার পথে দিনেশ এখানে রোজই একবার জিরিয়ে নেয়।

এই খুপরিটা যেন পাতালপুরীর একটা পান্থশালা। শুধু মুনাফা শিকারী ব্যবসায়ী মানুষের নখের আঁচড় নয়, প্রাণময় মানুষের কামনার অলেখা শিলালিপি রয়েছে এখানে, দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

* * *

দড়ি ধরে ধরে দিনেশ আরও নিচে নেমে যায়। এই ধূলি ধাতু ও পাষাণের সংসারে সেও যেন পরমাণুর মতো লঘু হয়ে আসছে। মর্ত্যলোকের যত পাপ পুণ্যের সংস্কার এই অতল অন্ধকারের শাসনে খসে পড়ছে একে একে। মৃত্যু এখানে কত ঘনিষ্ঠ, তাকে প্রাণের মতো এখানে অনুভব করা যায়।

গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধ। দিনেশের চাকরির আস্তানা এগিয়ে আসছে। সুঁদের একটা সঙ্কীর্ণ বাঁক, একটা কুয়োর মতো গর্তের মুখে এসে শেষ হয়েছে। হুম হুম হুম—একটানা ও একঘেয়ে একটা শব্দের গমক। পাষাণের হৃৎপিণ্ডটা যেন অন্ধকারে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। আবার মনে হয়, লক্ষ দীর্ঘনিঃশ্বাসের একটা ঘূর্ণি পাথরের পেটে যেন বন্দী হয়ে রয়েছে, ক্ষেপে ফেটে পড়তে চায়।

কুয়োর মুখে এসে ঝুঁকে তাকাতেই এই শব্দ তাণ্ডবের যেন একটা ছন্দোবদ্ধ অর্থ পাওয়া যায়। খনিমজুর বানিয়াতিদের গান, মেয়ে-কুলি ধারিদের কলহাস্য। খান হাতুড়ির আছাড়ের গুরু গুরু ধ্বনি। নুড়ির স্তূপের উপর ছপ ছপ করে বেলচার টান পড়ছে। আর জ্বলছে একটা প্রদীপ, একটা আলোদানার চক্ষু যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে রয়েছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দিনেশ যেন অন্ধ অজগরের মতো লাফিয়ে পড়ে হাত তিনেক নিচে, সাত নম্বর দরজা, দিনেশের ডিউটি স্থল।

বানিয়াতিদের গান আর ছেনি-হাতুড়ির উদ্দাম সংঘর্ষ বন্ধ হলো। প্রদীপে আরো খানিকটা তেল ঢেলে সলতে উস্কে দেওয়া হলো। জেলেকনাইটের ধোঁয়া, ধুলো আর ঘোলা আলোর সেই নীহারিকার মধ্যে দিনেশের চোখে প্রথম ধরা দিল একটি হাসি-হাসি

মুখ, প্রতীক্ষমান একজোড়া চোখের সার্থক দীপ্তি, বিলাসী।

বিলাসী একটা বেলচা কোলের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।—'আজ বড়ো দেরি হলো বাবু?'

বিলাসীর দিকে একবার তাকায় দিনেশ। হাঁ, পাতালপুরীর মেয়েই বটে। ধুলোয় ঢাকা রুক্ষ চুলের উপর অজস্র অভ্রের কুচি চিক্ চিক্ করছে, যেন একটা চুমকির জালি দিয়ে ঘেরা। কালো রঙে ছোপান একটা ছেঁড়া শাড়ি, যেন রসাতলের এক 'তপস্বিনীর সাজ! ওরা হাড় দিয়ে পাথর ভাঙে। মর্ত্যনারীর মতো ওদের দেহ লালিত্যে লতিয়ে ওঠে নি। ধরিত্রীর এই তমসাবৃত জঠরলোকে ওদের অয়স্কান্তি আর কঠিন লাবণ্য কত নয়নাভিরাম, তা এখানে না এসে দেখলে কেউ বুঝবে না। এই পাষাণের ছন্দে ওদের যৌবন বাঁধা। এখানে ওর কাছে যে কোন ক্লিওপেট্রাকে কুৎসিত প্রেতিনীর মতো মনে হবে!

জাদুঘরের জাদু

কুশল ছিল ইতিহাসের স্কলার। মহারাজপুরের জাদুঘরে প্রথম যেদিন ঢুকেছিল কুশল, সেদিন কল্পনাও করতে পারে নি যে, নিতান্ত একটা চাকরি করতে এসে, কতগুলি নিষ্প্রাণ মূর্তিকে নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রাখতে এসে এমন একটা রহস্যের জীবন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ধোয়ামোছার পর মূর্তিগুলিকে স্পষ্ট করে চেনা যায়। এক একটা গ্যালারির আর তাকের নম্বর দিয়ে, মূর্তি আর সামগ্রীগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও স্তরে সাজিয়ে রাখতে থাকে কুশল। এক নম্বর গ্যালারিতে তিনটে জ্যোতির্লিঙ্গ মূর্তি, দু'নম্বরে গোটাদশেক পোড়া মাটির বৃষ, তার পরেরটায় চুনাপাথরের একটা বিরাটকায় সিংহ। নাগরী লিপির শিলাশাসনগুলি সাজিয়ে রাখে একটা তাকে, আর একটা তাকে ব্রাহ্মী লিপির পাথরগুলি; নাগ বৃক্ষ স্বস্তিকা বা গরুড়ের মূর্তি আঁকা মুদ্রাগুলি গুনে গুনে গুছিয়ে রাখে ভিন্ন ভিন্ন সারিতে— রুপোর তামার ও পোড়ামাটির মুদ্রা! কোন্ দূরাতীত কালের মানুষের এক সমৃদ্ধ উপনিবেশের কত শত টুকরো টুকরো স্মৃতি আর নিদর্শন—শঙ্খের বেদিকা, অস্থিভস্মের আধার, গজদন্তের মঞ্জুষা। ধাতুর দীপাধার আর রঞ্জিত ইষ্টকের খণ্ড। কোন্ পুরসুন্দরীর চিরকালের মত হারিয়ে যাওয়া একটি পাথরের কজ্জলশলাকা আর স্খলিত নূপুর। বিলাসবতীর একটি দর্পণের ভগ্নাংশ। কোন্ কর্মিণী গৃহ-বধূর একখানি দুগ্ধমন্থনের দণ্ড আর শস্যপেষণের শিলাচক্র। কোন্ বিপনিস্বামীব কয়েকটি তৌলের পাথর আর সুতনুকা তরুণীর লাক্ষার কর্ণপুর। পুঁতির মালা, মাটির পাত্র, তামার কুঠার—ভিন্ন ভিন্ন গ্যালারিতে তাকে আর সারিতে সুবিন্যস্ত করে রাখে কুশল। দুটি সৌধস্তম্ভের ভগ্নাংশকে ঠিক মিউজিয়ামের দরজার দু'পাশে রাখা হয়। অনেকগুলি ত্রিভঙ্গ নায়িকামূর্তিও ছিল। অনেকগুলি কাঠের টুল তৈরী করে তার উপর মূর্তিগুলিকে সারি সারি দাঁড় করিয়ে দেয় কুশল। লাল বেলে পাথরের জীর্ণ শীর্ণ এক যক্ষকে তুলে নিয়ে একটা থামের গায়ে হেলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়।

• • •

ঘরের মাঝখানে চূর্ণ বিচূর্ণ অনেকগুলি মূর্তি একটা ঢিবি হয়ে পড়ে ছিল। কাছে গিয়ে নাড়াচাড়া করতেই কুশলের মনটা হঠাৎ ব্যথিত হয়ে ওঠে। শিবের ও শিবসঙ্গিনীর রূপের

নানা মূর্তি, কোনটাই আর আস্ত নেই। কালসংহারের হাতের ত্রিশূলটি আছে, কিন্তু গলিতজটা ও ত্রিনয়ন চূর্ণ হয়েছে। অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্যপর নটরাজের দুটি পা মাত্র আছে, উর্ধাঙ্গ নেই। শিবের কোলে বসে আছে ছোট একটি উমা, কিন্তু উমার সুন্দর মুখখানা গ্রীবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সুন্দর একটা ঢেলার মত পাশেই পড়ে আছে।

মিউজিয়ামের ঘরের মাঝখানে একটা কাঠের মঞ্চ তৈরী করে তার উপর শিব ও শিবাণীর এই চূর্ণীকৃত রূপের এক একটি টুকরো সযত্নে সাজিয়ে রাখে কুশল। সব শেষে একটি মূর্তি পাওয়া যায়, ধুলোর উপর লুটিয়ে শুয়েছিল এই মূর্তি। কুশল দেখে খুশী হয়, এই মূর্তিটা অটুট আছে।

একটা ব্রোঞ্জের দেবিকামূর্তি। সমস্ত অবয়বের সৌষ্ঠবে কেমন একটা ছন্দ রয়েছে। মূর্তির চোখে ও শরীরে যেন কল্লোলিত হয়ে রয়েছে লাবণ্যময় কান্তি। পাথুরে পরিচ্ছদটাও অদ্ভুত। কটিমেখলার সঙ্গে গ্রথিত, যেন ঢেউ দিয়ে তৈরী একটি আচ্ছাদক, তার মাঝে মাঝে জলবেণীর কুণ্ডল।

কি আশ্চর্য ; অনেক চেষ্টা করেও এই অটুট দেবিকামূর্তিকে মঞ্চের ওপর দাঁড় করাতে পারা গেল না। মূর্তিটা যেন নিজের গায়ে ভর দিতে জানে না, দাঁড় করাতে গেলেই হেলে পড়তে চায়। এই রহস্য বুঝে উঠতে পারে না কুশল, ভাবতে বিস্ময় বোধ হয়, বিস্ময়টাও মাঝে মাঝে মৃদু শঙ্কার মত শিউরে উঠে।

জানতে হবে এর রহস্য। তীব্র কৌতূহল মাথায় চাপে কুশলের।

দেখতে পায়, চৌধুরী সাহেব তাঁর রিপোর্টের এক জায়গায় লিখে গিয়েছেন—এই মূর্তি হলো গঙ্গা। এর গঠনভঙ্গী দেখে কোন সন্দেহ থাকে না যে, এটি হলো যুগলমূর্তির একটি। মনে হয় এই মূর্তির পাশেই ছিল শিব গঙ্গাধর, যার প্রসারিত একটি বাহুতে গ্রীবার ভর সঁপে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গঙ্গা।

লালকি নদীর বাঁধ

লালকি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্তি। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম—উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক একটা কংক্রিটের চাঙ্গড় তুলে নিচ্ছে, পর মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের উপর, স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর উপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শাণিত দন্তুর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাসছে।

ইঞ্জিনিয়ার ওভারসিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশ'র উপর। তাছাড়া ফিটার, টার্নার, লেদমিস্ত্রী, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর ; সব নিয়ে হবে হাজারের উপর। দূর ছত্রিশগড় থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলেমাটির তেপান্তরে লালকি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনি ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পরেশনাথের

ডাকবাংলোতে বসে নিচের দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প অল্প দেখা যায়। নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রের মত যেন গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম করবে বলে সঙ্কেতের অপেক্ষায় চুপ করে রয়েছে।

সত্য কথা, এও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির যা-ইচ্ছা-তাই খেয়ালের বিরুদ্ধে। লালকি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুকনো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্‌চিক্ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলে মাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গিয়েছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুর এইখানে জলবাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গিয়েছিল।

* * *

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে, আবাদ করলে ফলতো সোনা। নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লালকি নদীর খামখেয়াল শান্ত করে দিতে হবে, এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটি খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌসুমী বৃষ্টি এই লালকি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, কিন্তু সবই বৃথা। এক অন্ধ বেগ সব জলভার লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ। আট কোটি টাকার স্কিম। দেশ বিদেশের মহাজনরা সাত দিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়েছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, আপাতত সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গিয়েছে। ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গিয়েছে। এই খাল দিয়ে লালকি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে, উর্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এইখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থ-জগতের অকৃপার বিরুদ্ধে, নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে জল ও মাটিকে মানুষেরই পদার্থজ্ঞানের দাস করে রাখতে।

কিন্তু মনে হয়, না, এ তো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ নয়, এ যে জল-মাটির সঙ্গে মানুষের মিতালি পাতাবার এক নতুন আয়োজন। জড়ের সংসার যেন মানুষকে ডাক দিয়ে বলছে—আমারই প্রেমের নিয়মগুলি জেনে নিয়ে তুমি আমাকে তোমার আপন করে নাও, তুমি তো আমার পর নও।

অতীত রূপ ও রূপাতীত

কল্যাণঘাটের কাছে জঙ্গলে ঢাকা একটি প্রাচীন মন্দিরের বিরাট ধ্বংসাবশেষ আছে।

নিশির ডাকে নয়, ঘুম এল না তাই। সোমনাথ ঘরের কপাট খুলে বের হয়ে গেল। রাত্রির শেষ যাম, চাঁদ ডুবছে বেনমতীর উপর। জল আর বালিয়াড়ির গায়ে লেগেছে তামাটে জ্যোৎস্নার আভা। কোন উদ্দেশ্য নেই, সোমনাথ তবু ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মন্দিরের ভগ্নস্তূপের চারিদিকে।

একটা ঢিবি থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়ল, কেউ যেন কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখের ধাঁধা মাত্র। বৃষ্টির কাদাজল লেগে ঢাকা পড়েছে শায়িত একটা মূর্তি।

হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে দিতেই হেসে উঠল একটি মুখ। ললিতাসনা এক সৌম্যা দক্ষিণামূর্তি, বরদা মুদ্রা। কী স্পষ্ট হাসি, আয়ত চোখে কী গাঢ় উজ্জ্বল দৃষ্টি। সোমনাথের সমস্ত শরীর একবার শিউরে উঠল। ভয় ভয় করছে। তার সমস্ত ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞাকে যদি মূর্তিটা প্রশ্ন করে বসে? সোমনাথ অন্য পথে সরে পড়ল।

* * *

ক্লান্ত হয়ে সোমনাথ ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, একটা অবলুণ্ঠিত ভাঙা তোরণের গায়ে। অদ্ভুত এক অনুভবের মোহ তার বিচার বুদ্ধিকে ঘিরে ধরেছে যেন। সময়ের ব্যবধান ভেঙে যাচ্ছে, এক সমুন্নত বিগত যুগের কোলে এসে, পৌঁছে গিয়েছে সোমনাথ। টিপ টিপ করছে পাথরের মূর্তির বুকগুলি। তারা বেঁচে আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে কে? এক স্মেরমুখী নগ্না মূর্তি। সোমনাথ আচমকা দু'পা পিছিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল, এ কে?

যেন প্রণয়রভসে আকুল এক দিব্যাঙ্গনা অতিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে ; গুরু নিতম্বে রত্নসূত্র, কঠিন কুচকলিকা আবেগে কোমল হয়ে রয়েছে। সুপুষ্ট দুটি হাত তুলে ধরে রয়েছে পদ্মবীজের মালা, যেন গায়ে ছুঁড়ে মারবে। তার বুকের উত্তাপ লাগছে সোমনাথের গায়ে ; আর চোখে মুখে তার উষ্ণ নিশ্বাসের ভাপ। সোমনাথের কপালে অজস্র স্বেদবিন্দু চিক্ চিক্ করে ফুটে ওঠে। সরে গিয়ে তোরণের অপর দিকে হিমে-ভেজা কুশ ঘাসের উপর বসে পড়ল সোমনাথ।

এই মূর্তি-লোকের রূপ ও হৃদয় আজ যেন বুকের কাছে অনুভব করছে সোমনাথ। এই বিরাট সুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এক জয়জয়ন্তী রূপ। মূর্চ্ছাহত হয়ে রয়েছে এক প্রাচীন বৈভব। এই ন্যাগ্রোধ আর নাগরঙ্গ বনে উৎসবের প্রদীপ যদি আর একবার ঝলসে ওঠে, দেখা দেবে শত জীবন্ত নর-নারীর রূপ। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মিত্রের মেয়ে কাঞ্চন ; কপালে কাশ্মীর পত্রের লিখা—সুন্দর। ওর কুন্তলস্খলিত একটি ফুল কুড়িয়ে নিতে মন আকুল হয়ে ছুটবে।

কিন্তু নিশির ডাকের এই আবেশ কতক্ষণ? ঐ যে চাঁদ ডুবে গেল। দিনের আলোকে আবার মাটি হয়ে যাবে এই রূপময় অতীত। কাঞ্চন বাতিল হয়ে গিয়েছে চিরকালের মতো।

রসিদ খলিফার মামাবাড়ি

তখন চুংকিং-এর তাঁতিরা নিশ্চিন্ত মনে রেশমী চাদর বুনছে। মাদ্রিদের অপেরা ঘরে বেহালার সুরের খেলা নিরুদ্বিগ্ন নাগরিকের দিনের ছুটি মধুর করে তুলছে। আকাশে উঠে মাটির মানুষের মাথার উপর বোমা ফাটাবার খেলাটা তখনো পৃথিবীতে এত ভালো করে জমে ওঠে নি। নরহত্যার শিল্পে এই নতুন পদ্ধতির হাত পাকাবার কাজটা তখন চলেছে যে-দেশের কাঁচা মাথার উপর, যেখানে এবং যে সময়ে—সেই সময়।

সেই সময় বেস কম্যাণ্ডারকে স্যালুট জানিয়ে ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ফ্লাইং কোরের একটি স্কোয়াড্রন উড়ল আকাশে। নীচে ভোরের পেশোয়ার কুয়াশার বোরখায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রইল চুপ করে। এই ফ্লাইং কোর নামেই শুধু ইণ্ডিয়ান, বিমানবিহারী সৈন্যের সকলেই শ্বেতাঙ্গ, তার মধ্যে মাত্র একটি কৃষ্ণের জীব আছে—অফিসার দিলীপ দত্ত।

বায়ু সমুদ্রে ডানা ঝাপটে দিলীপ দত্তের মন সুখে উড়ে চলেছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে, ছক বেঁধে যেন সীমাহীন নীল পাড়ি দিয়ে চলেছে এক ধূমকেতুর পরিবার। নীচের দিকে তাকালে দেখা যায়, দু'একটা মিনারের গায়ে হিমকাতর প্রভাতের একটু আড়ষ্ট আলোকের প্রলেপ লেগেছে মাত্র। তারপর যব আর জাফরাণের ক্ষেত। কতগুলি মখমলের জাজিম যেন এখানে ওখানে পাতা রয়েছে। স্নাত উপত্যকার গিরি নদীটা রূপালী ফিতার মতো একবার চক্‌চক্ করেই মিলিয়ে গেল।

তোচিখেল পার হয়ে গেল। উদগ্রীব পাথুরে কেল্লাটা যেন নিঃশব্দে চুপি চুপি দেখল, ব্যোমচর গ্রহের মতো রুষ্ট বিমান বহর গোঁ গোঁ করে উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, একটা পাহাড়ের আঁকাবাঁকা বিস্তার। একটা কবচাবৃত সরীসৃপ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সূর্য উপরে উঠছে। পূর্বদিক থেকে একটা আলোর ঝালর হেলে পড়েছে মাটির দেশের কুহকের উপর। সবই ছলনা বলে মনে হয়। নিচে হাজার মিটারের ব্যবধানে মহীতল যেন মিথ্যা হয়ে গিয়েছে।

* * *

মাসুদদের একটা গ্রাম। দূরবীনটা একবার চোখে লাগাল দিলীপ। অনেক দূরে একটা চেপ্টা পাহাড়ের মাথায় হাজার খানেক লোক হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আছে। প্রত্যেকের পাশে এক একটা লম্বানল রাইফেল শোয়ান রয়েছে। আজ জুম্মার দিন। সকাল বেলার নমাজ সারছে একটা লস্কর।

স্কোয়াড্রন উল্কার মত ঝাঁপ দেবার আবেগে স্পীড বাড়িয়ে দিল। চোখের পলক ফেলতেই দেখা গেল, ত্রস্তচতুর হরিণের পালের মতো তর্ তর্ করে নেমে সেই লস্কর লুকিয়ে পড়ল একটা সুগভীর পাহাড়ী খাতের ভিতর। হঠাৎ আনমনার মত চোখ করে কি যেন ভাবতে থাকে দিলীপ।

বেতারে অপারেটর দিলীপের হাতে একটা নোটিস গুঁজে দিয়ে গেল, আর নাহি দূর। যেন একটি সুকোমল সবুজ রেজাই দিয়ে ঢাকা আকা-খেল প্রান্তর। ঠাসা গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক-একটা বুড়ো দেওদারের মাথায় তখনো লম্বা লম্বা কুয়াশার জট ঝুলছে।

থার্মোমিটারের পারা শূন্য সেন্টিগ্রেডের নিচে বিশ ডিগ্রী নেমে গিয়েছে। সময়ের প্রবাহ যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এক চরম লুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানবহরের একটানা সরোষ গুঞ্জন আর নেই। অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে, যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। আলোক ও শব্দের গুঁড়ো ছড়ানো এই বায়ুর দেশে মাটির দেশের জ্ঞানবুদ্ধি অসহায় হয়ে পড়ে। দিলীপ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হওয়া উচিত ছিল তার, তবেই না এই পদার্থ প্রপঞ্চের কিছু রহস্য লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো দিলীপ। যদি এখানে কেউ আসে, সে যেন এই অগোচরের অহংকার ভেঙে এক মুঠো আলোককণিকা বন্দী করে নিয়ে যায়। মাটির দুনিয়ার মান রাখতে হলে তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

স্কোয়াড্রন বধ্যভূমির উপর আকাশে পৌঁছে গিয়েছে। নিচে ওয়াজিরিস্তানের বিচিত্র প্রান্তর, ছোট ছোট গ্রাম, ক্ষেত আর বাগিচা। পাহাড়ের ঢালুতে ভেড়া চরছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে একটা আবেগ আসে। শিল্পী হয়ে ছবি নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীতে ধুলো আছে, কাঁটা আছে, বিষ আছে। সবই মিথ্যা অপবাদ বলে মনে

হয়। মাটির এই রূপ মানুষেরা জানে না, তাই তারা স্বর্গকে কামনা করে। শিল্পী হওয়া উচিত ছিল দিলীপের।

শত্রুপুরী নয়, সেই রূপকথার দেশ। রাবণের সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দিলীপ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সেই দেশ।

হিমে নয়, বৈরাগ্যে নয়, নিতান্ত এক পার্থিব মমতার আবেশে দিলীপের সম্বিৎ অসাড় হয়ে রইল। নীচে যে জীবনের সুখ-দুঃখের নর্তন চলেছে, সে নিজেই যে তার একটি ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত জীবাণু। সেখানে রসিদ খলিফার মামার বাড়ি ; মৃত্যুর ঢিল ছুঁড়ে মারতে হাত ওঠে না।

হিমালয়

প্রাচীন ভারতীয়ের কাব্যসাহিত্যে হিমালয় বেশি কিছু স্তুতিলাভ করে নি। হিমালয়ের চেয়ে হিমালয়ের করুণার সৃষ্টি নদীগুলিকেই স্তোত্রে ও স্তবে বেশি অভিনন্দিত করা হয়েছে। কবি কালিদাস একবার বলেছিলেন—দেবতাত্মা হিমালয়। আধুনিক ভারতকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হিমাচল হলো 'ভারতের অনন্তসঞ্চিত তপস্যার' মতো। কবির চক্ষে ধরা পড়েছে, এক মহা বিরাটের প্রতীকের মতো এ হিমাচল 'স্তব্ধ ভূমানন্দে যেন রোমাঞ্চিত।' অতীতের পুরাণে ও কাব্যে হিমালয় যেটুকু উপেক্ষিত হয়েছে, সেটুকু ভাল করেই সম্মানে ও সমাদরে পুষিয়ে দিয়েছে লোকপ্রবাদ।

ব্যাসদেব যেখানে বসে মহাভারত রচনা করেছিলেন, মার্কণ্ডেয় যেখানে তপস্যা করেছিলেন, অগস্ত্য যেখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্র শোষণ করেছিলেন, পৌরাণিক কিংবদন্তীর সেই সব ঘটনাস্থল আজ হিমালয়ের শৈলপ্রদেশের শিলা নির্ঝর ও গুহার আশে-পাশে ছড়িয়ে রয়েছে। পাণ্ডবেরা যেখানে স্নান করেছিলেন এবং ধ্রুব যেখানে পদ্মপলাশলোচন হরির সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, সেই পাণ্ডবঘাট ও ধ্রুব-ঘাট হিমালয়েরই শৈলপ্রদেশের দুটি স্থান। এখানেই কমলেশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন রাম। যেখানে স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্মীর গলায় মাল্যদান করেছিলেন নারায়ণ, এবং কুপিত হয়ে নারদ নারায়ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই স্থান মন্দিরে চিহ্নিত হয়ে হিমালয়েরই শৈলপ্রদেশের এক পথের পাশে রয়েছে। পৌরাণিক ভারতের অজস্র কাহিনী হিমালয়ের বক্ষে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে। শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব, এমন কি বৌদ্ধও এই হিমালয়ের ক্রোড়ে তার আরাধ্যকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতা করেছে। আছে রামসীতার মন্দির, আছে নরসিংহ ও নবমাতৃকার বিগ্রহ। আছে গৌরীকুণ্ড। আছে সত্যনারায়ণ, গোপেশ্বর শিব এবং বিষ্ণু বদরীবিশাল। আছে রাজা মরুত্তের যজ্ঞস্থলী। উষ্ণপ্রস্রবণের জলে ভস্মাসুরের অস্থিচূর্ণ উৎসারিত হয়। হরগৌরীর বিবাহের দিনে যজ্ঞস্থলে যে আগুন জ্বলেছিল, সেই আগুন আজও জ্বলছে ত্রিযুগলী নারায়ণের মন্দিরের নিভৃতে। কিরাতার্জুনের পদচিহ্ন ধারণ করে রয়েছে ভীলকেদারের শিলা। মহাপ্রস্থানের পথে লক্ষ্মীবন স্মরণ করিয়ে দেয়, পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী এখানেই ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস বর্জন করেছিলেন।

* * *

ভূতাত্ত্বিক বলেন, আজ হিমালয় যেস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, সেস্থানে একদিন ছিল 'টেথিস' সমুদ্র। আজকের ভূমধ্যসাগর সেই প্রাচীন টেথিসেরই অবশেষ। এই সমুদ্রেরই তলদেশের

উপর স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়েছিল পদার্থের পঙ্ক। ভূতাত্ত্বিকেরা যে কালকে বলেন টার্সিয়ারী তথা তৃতীয়ক, অর্থাৎ পৃথিবীর ভৌম সংগঠনের তৃতীয় পর্যায়, সেই কালেরই মধ্য অধ্যায়ে টেথিস সমুদ্রের তলদেশের বহিরাবরক স্তরে এক অভ্যুত্থানের আবেগই হলো আজকের তুষারমৌলি হিমালয়ের উৎপত্তির শুরু। দুই কোটি বৎসর ধরে টেথিসের তলদেশ হতে তরঙ্গাকারে পরপর সমান্তরাল ভাবে বিন্যস্ত ও কঠিনীকৃত পদার্থ পঙ্কের স্তরভার ক্রমেই উন্নত হয়েছে, এবং আজকের হিমালয়রূপে পরিচয় লাভ করেছে। হিমালয়ের সাধারণ কলেবর সেই সমুদ্রেরই তলদেশে থিতিয়ে পড়া ও স্তরীভূত পাললিক শিলা দিয়ে গঠিত। অতি প্রাচীন সমুদ্র শামুক শুক্তি ও কীটের অশ্মীভূত অবশেষ হিমালয়ের শিলাময় পঞ্জরের স্তরে স্তরে মিশে রয়েছে এবং স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে হিমালয় বৃদ্ধ নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের কয়েক কোটি বৎসর পরে হিমালয়ের জন্ম। কিন্তু হিমকূটের অত্যুচ্চ মুকুটগুলি গ্রানিটে গঠিত, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলার সেই আর্কীয় যুগের গ্রানিট, প্রাণের আবির্ভাবেরও বহুপূর্ব কালের এই পৃথিবীর প্রথমজা শিলা গ্রানিট। হিমালয়ের সুবিস্তৃত পাললিক শিলার স্তরসমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে গাঠনিক দুর্বলতা ছিল। এই দুর্বল ও অদৃঢ়বিন্যস্ত স্তরসমূহকে দীর্ণ ক'রে ভূস্তরের নিম্নলোক হতে উপরে উৎসারিত হলো সুপ্রচুর গ্রানিটপুঞ্জ। বিভিন্ন স্থানে উৎসারিত এই গ্রানিটই হলো হিমালয়ের বিভিন্ন অত্যুচ্চ শিখর। শিখর এভারেস্টের শরীর প্রাক্-প্রাণ যুগের শিলাপিণ্ড গ্রানিটেই গঠিত।

শিখর এভারেস্ট, যেখানে চিরনীহারের শীতলতার মধ্যে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে ধরিত্রীর বক্ষ হতে উৎক্ষিপ্ত জড়, সেই শিখর তিন কোটি বৎসরের মধ্যে এই প্রথম দুটি আগন্তুক প্রাণের স্পর্শ লাভ করলো। কোটি তুষার-ঝটিকার আক্রোশ ও হিমপ্রপাতের আর্তনাদ শুনেছে এভারেস্ট ; কিন্তু প্রাণের ধ্বনি, মানুষের মুখ হতে উচ্চারিত ভাষা এই প্রথম শুনতে পেল। তেনজিং ও হিলারী এভারেস্ট শিখরের শীর্ষে উপস্থিত হয়েছেন।

সুন্দর মাদাগাস্কার

ভারত মহাসাগরের বুকে যত দ্বীপ আছে, তার মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ মাদাগাস্কার। আফ্রিকার উপকূল থেকে কিছু দূরে মাদাগাস্কার ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ এলাকার প্রহরীর মত জেগে রয়েছে। এই দ্বীপ এতদিন ফরাসী সরকারের অধীন ছিল। মাত্র কয়েকদিন হলো বর্তমান মহাযুদ্ধের আলোড়নে পড়ে রাজধানীটি ব্রিটিশের অধীনে এসেছে। যাতে এক্সিস পক্ষের হাতে না পড়ে, সেইজন্য আগেভাগেই ব্রিটিশ শক্তি যুদ্ধনীতির দিক থেকে মাদাগাস্কারের রাজধানী অধিকার করতে বাধ্য হয়েছে। তাই মাদাগাস্কার আজ সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। মার্কো পোলো বা ভাস্কো-ডা-গামার যুগে যখন লোকে মাদাগাস্কার নামে বিরাট এক দ্বীপদেশের কথা শুনেছিল, তখনও এতটা চিন্তা তর্ক আলোচনার রব ওঠেনি। এই দ্বীপদেশের আশপাশ দিয়েই বিভিন্ন মহাদেশগামী জাহাজের যাতায়াত চলে। বাণিজ্যের দিক দিয়ে মাদাগাস্কারের গুরুত্ব যেমন, রাজনীতিক ও যুদ্ধনীতিক কারণেও তেমন।

আজ অবশ্য মাদাগাস্কারের কথা সকলের কাছে বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এতদিন ধরে এই দ্বীপদেশটির জীবনের কথা পৃথিবীবাসীর কাছে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি। বৃহত্তর পৃথিবীর চিন্তার আসর থেকে এই দ্বীপটি এতদিন তার নিরালা সুখ-দুঃখেই ঢাকা পড়েছিল।

দূর অতীতে, তের্ শতকের প্রায় শেষের দিকে বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলোর জাহাজ ভেনিসের পতাকা উড়িয়ে একদিন মাদাগাস্কারের দ্বীপের কূলে এসে ভিড়লো। তার আগে মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ; তাঁর ইচ্ছে ছিল শীতের সময় যাতে সিন্ধু নদের মোহনায় পৌঁছতে পারা যায়। সিংহলের কাছাকাছি আসতে বাতাসের গতি বদলে গেল। ক্রমে ক্রমে সেই হাওয়ার পাকে পড়ে মার্কো পোলোর জাহাজ দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললো। নাবিকেরা বুঝেছিল যে, আরও পুরো পাঁচটি পূর্ণিমা না কেটে গেলে বাতাসের গতি উত্তরমুখো হবে না। এমনি অবস্থায় একদিন ঠিক সূর্যাস্তের আগে তাদের চোখে পড়লো একটি দুই-মাস্তুলওয়ালা আরবী নৌকা হাল ভেঙে ও পাল ছিঁড়ে অসহায়ের মত ভেসে চলেছে ; সেই নৌকার পাটাতনের উপর পড়েছিল কয়েকজন শীর্ণ অনশন জীর্ণ অর্ধোন্মাদ আরবী সদাগর। মার্কো পোলো তাদের নিজের জাহাজে তুলে নেন। এই আরবীদের কাছেই শোনা গেল যে, তারা দক্ষিণ দিকের দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল হাতীর দাঁত কেনবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ ঝড়ে পড়ে বাধ্য হয়ে তাদের দক্ষিণ-পশ্চিমের দিকে চলে আসতে হয়েছে।

এই কাহিনী শোনার পরও অনেক দিন পর্যন্ত মার্কো পোলো নিকটে বা দূরে কোন নতুন দেশের দিশা পাননি। এর পর একদিন অমাবস্যার দিনে মার্কো পোলোর জাহাজ হঠাৎ এক উপকূলে এসে ঠেকলো। সমস্ত সকাল জাহাজে বসে নাবিকেরা প্রচণ্ড রোদের জ্বালায় পুড়তে লাগলো। উপকূলে কোন জনমানবের চিহ্ন দেখা গেল না। রাত্রিবেলায় উপকূলের বনজঙ্গল থেকে বন্যপশুদের নিদারুণ চিৎকার শুনে তারা শিউরে উঠতে লাগলো। বিরাট আকারেব বানর জাতীয় জীবজন্তু জাহাজের দিকে তাকিয়ে গর্জন করতে লাগলো। তারা দ্বীপের ভেতরের দিকে প্রবেশ করার একবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পাহাড় জঙ্গলের দূরতিক্রম্যতার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তার পরের পূর্ণিমাতে তারা উপকূলের অন্যদিকে অগ্রসর হলো।

উপকূলের বিস্তৃতি দেখে মার্কো পোলো মনে করলো যে, তারা একটি মহাদেশের সন্ধান পেয়েছে।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নানা আজগুবি কাহিনী পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে লেখা আছে যে, তারা এই দ্বীপের উপকূলে এসে একদিন একটি পাখী দেখতে পান। পাখীটা নাকি আকারে তাদের জাহাজটার সমান ছিল। আর সেই পাখীটা একটা হাতীকে ঠোঁটে কামড়ে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। আরবীদের কাছে আরও নানারকম গল্প শুনে মার্কো পোলো মনে করলো যে, একটি মহাদেশের সন্ধান পাওয়া গেছে। অতএব, এর পরের বার আরও অনেক জাহাজ নিয়ে এসে এই মহাদেশটি অধিকার করতে হবে। কিন্তু মার্কো পোলো এই পরিকল্পনাকে ভবিষ্যতে কাজে দেখাতে পারেননি।

মার্কো পোলোর মৃত্যুর ২০০ বছর পরে লোরেন্সো নামক এক পর্তুগীজ জাহাজের ক্যাপ্টেন নিগ্রো বিক্রীর ব্যবসায়ের জন্য মোজাম্বিক থেকে ঘুরে লিসবনে আসে। এই ক্যাপ্টেনের কাছে আবার লোকে মাদাগাস্কার দ্বীপের কথা শুনতে পেল,—এই দ্বীপদেশের অধিবাসীরা কালো বলেই ঠিক আফ্রিকার নিগ্রোদের মত নয়। সাধারণ লোকে বানরের মাংস খায়। নদীগুলি হাঙ্গরে কুমীরে ভরা।

তারপর এক শত বছর পরে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা ত্রয়োদশ লুই তাঁর প্রাসাদে

অমাত্য রিচিলুর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। রিচিলু রাজার সামনে একটি মানচিত্র পেতে বসেছিলেন। এই মানচিত্রটি পর্তুগাল থেকে হাতিয়ে আনা হয়েছিল। রিচিলু রাজা লুইকে বুঝিয়ে বলেন যে, ওলন্দাজ আর পর্তুগীজেরা আফ্রিকার উপকূলে বেশ প্রতিপত্তি জমিয়ে বসেছে ; কিন্তু আফ্রিকার উপকূল থেকে সামান্য দূরে এই বিরাট একটি দ্বীপদেশ আছে, তার খবর তারা একদিন জেনে থাকলেও আজ ভুলে গেছে। সুতরাং ফরাসী রাষ্ট্রশক্তির অনুকূলে এই দ্বীপটিতে একটি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করা হোক।

লুই এই প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং একটি ফরাসী কোম্পানীকে উপযুক্ত জাহাজ ও সৈন্য দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বলেন।

এর পর আরও কিছুদিন কেটে যায়। ২৫০ বছর পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের এক প্রত্যূষে মাদাগাস্কারের জাতীয় রাজধানী আন্তানা-নারিভো যুদ্ধদামামা আর বিউগলের ধ্বনিতে চমকে জেগে ওঠে। রাজার প্রাসাদের ওপরে ফরাসী পতাকা উড়লো, ফরাসী সেনাদল পথ দিয়ে মার্চ করে গেল।

জোসেফ সাইমন গালিয়ানি—ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ সেনাদল নিয়ে এসে রাজপ্রাসাদের দ্বারে এসে দাঁড়াল। ম্লানমুখ বেদনার্ত শত শত মাদাগাস্কারীয় নরনারী শিশু সাদা কাপড় পরে পথের দুপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল সেই দৃশ্য।

চারজন ফরাসী সৈনিক প্রাসাদের ভেতর গিয়ে আবার বিউগল ধ্বনির সঙ্গে বেরিয়ে এল। সঙ্গে স্বাধীন মাদাগাস্কারের শেষ রাজ্ঞী—বন্দিনী রাণাভালোনা।

দুঃখে মনস্তাপে বিষণ্ণ রাণী রাণাভালোনা ছবির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাপ্টেন গালিয়ানি ঘোষণাপত্র পড়লেন—'ফরাসী সাধারণতন্ত্রের নামে আমি এইক্ষণে ঘোষণা করিতেছি যে, রাণী রাণাভালোনা অদ্য হইতে সিংহাসনচ্যুতা হইলেন। অদ্য হইতে এই দ্বীপদেশ মাদাগাস্কার ফরাসী সাধারণতন্ত্রের উপনিবেশসমূহের পর্যায়ভুক্ত হইল। রাণী রাণাভালোনা এই মুহূর্তে রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। জীবৎকাল পর্যন্ত তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল।'

রাণী রাণাভালোনা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষের সম্মুখে। তাঁর দুই চোখ জলে ভেসে গেল। এইভাবে মাদাগাস্কারের স্বাধীনতা ফ্রান্সের রাহুগ্রাসে লুপ্ত হয়ে গেল।

পৃথিবীতে যত দ্বীপ আছে তাদের আকারে মাদাগাস্কার চতুর্থ স্থান অধিকার করে। বৃহত্তম দ্বীপ হলো গ্রীণল্যাণ্ড, তারপর নিউগিনি এবং বোর্নিও। চতুর্থ হলো মাদাগাস্কার। দ্বীপটির আয়তন ২২৮,৫০০ বর্গমাইল। আফ্রিকার উপকূল থেকে এর দূরত্ব মাত্র ২৫০ মাইল। কিন্তু জলবায়ু, জীবজন্তু ও মানুষের জীবনযাপন প্রণালীর দিক থেকে আফ্রিকার সঙ্গে মাদাগাস্কারের খুব সামান্যই সাদৃশ্য আছে। কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে, এই দ্বীপটি কোন অধুনালুপ্ত মহাদেশের অবশিষ্ট মাত্র। হয়তো এককালে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই দ্বীপ যুক্ত ছিল। আবার অনেকে অনুমান করেন যে, এই দ্বীপ ভারতের অংশ ছিল। এই সব ভূতাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে বলা যায় না। বহু বিভিন্ন উপজাতীয় মানুষে এই দ্বীপটি অধ্যুষিত। মোট জনসংখ্যা ৩৫ লক্ষ।

মাদাগাস্কারের পূর্ব-উপকূলবাসী জাতির নাম—বেতসিমিসারাক। দৈহিক গুণে ও লক্ষণে এদের সঙ্গে যাভাবাসীদের অদ্ভুত মিল আছে।

পশ্চিম উপকূলের লোকেরা হলো—সাকালাভা। এদের দৈহিক গঠনে নিগ্রোত্বের

প্রভাব খুব বেশী রকম আছে, কিন্তু এই নিগ্রোত্ব আফ্রিকার নিগ্রোত্বের মত নয়। সুপ্রাচীনকালে মহাসাগরীয় অন্যান্য দ্বীপদেশবাসী নিগ্রো জাতির একটি বংশ হয়তো এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

তা ছাড়া আছে—আন্তাকারান, আন্তানদ্রয়, ওমহাফানি জাতি, এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যে আরবী লক্ষণ পরিস্ফুট।

জলবায়ুর ব্যাপারে মাদাগাস্কারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পরিদৃশ্য দেখা যায়। কোথাও শীতের আধিক্য, কোথাও গ্রীষ্মের। তামাতাভে বন্দরে বছরের ১৮০ দিন বর্ষা লেগে থাকে, অথচ দক্ষিণের ফোর্ট দোফিনে বন্দরে বছরে মাত্র ২৭ দিন বৃষ্টি হয়।

মাদাগাস্কারের গাছপালা একান্তভাবে তারই নিজস্ব। এই জাতীয় গাছপালা পৃথিবীর অন্য কোন অংশে দেখা যায় না। অবশ্য বর্তমানে নানা দেশে এই সব গাছপালা আমদানী করে ফলান হয়েছে। মাদাগাস্কারের জন্তু জানোয়ারের মধ্যে একমাত্র হিংস্র হলো এব কুমীর। আর সব জন্তুরা নিরীহ। মর্কট জাতীয় 'লেমুর' লক্ষ লক্ষ দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিকেরা মাদাগাস্কারকে যে লুপ্ত মহাদেশের অংশ মনে করেন সেই অনুমিত মহাদেশের নাম তাই 'লেমুরিয়া' রাখা হয়েছে।

মাদাগাস্কারের প্রধান প্রধান শহরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—তানানারিভে, মাজুঙ্গা, মানকারা, তামাতাভে। মাজুঙ্গা শহরের সব কারবার আরবী আর চীনাদের হাতে। সরকারী কর্মচারীর অধিকাংশই আববী।

এই দ্বীপদেশে ঠিক ভারতবর্ষেব মত গরুর গাড়ির প্রচলন আছে। এদেশে সবচেয়ে কষ্ট পাবে নিরামিষাশী লোক। নিরামিষ খাদ্যের দাম সবচেয়ে বেশী, মাংস সবচেয়ে সস্তা। ৩৫ লক্ষ লোক আর ৫০ লক্ষ গরু নিয়ে এই দেশ। এক সের মাংস আর এক সের আলুর দাম একই পড়ে।

জীবনযাত্রায় তাড়াহুড়া কাকে বলে তা মাদাগাস্কারের লোকের অনুভবেব অগম্য। কুঁড়ে কথাটাও তাই এদের মধ্যে নেই। ধীরে সুস্থে গড়িমসি করে সব কাজ করাই এদের নিয়ম।

রাজধানী তানানারিভের রূপ পর্যটকের চোখে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। শহরের চারদিকে ধানক্ষেতের সবুজ সমুদ্র, পথ দিয়ে শত শত রিক্সাগাড়ি ছুটে যায়। লোকজনদের চলাফেরার মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা নেই। মোটরকারের চলার জন্য এই রকম ভীড়ওয়ালা পথ মোটেই সুবিধার নয়। তার উপর সড়কগুলি আঁকা বাঁকা। তা ছাড়া চড়াই উতরাই আছে। কিন্তু এই চড়াইগুলি রিক্সা কুলীরা যেভাবে গাড়িভরা বোঝা নিয়ে একদমে দৌড়ে উঠে পড়ে তা গিয়ারগর্বী মোটরকারের পক্ষেও বিস্ময়কর। নরনারী সকলেই সাদা কাপড় পরে। রঙীন কাপড়ের চলন খুব কম। বাড়িগুলি প্রায় সবই লাল রঙের।

মাদাগাস্কারের শস্য-সম্পদ খুব বেশী আছে—ভুট্টা, কফি, কোকো, চিনি, তামাক, চাউল, লঙ্কা প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে—সোনা, গ্রাফাইট, নিকেল, সীসা, ম্যাঙ্গানীজ ও পঞ্চাশ রকমের মূল্যবান পাথর। কিন্তু যতখানি সম্পদ এই মাদাগাস্কারের ভূমি থেকে আহরণ করা যেতে পারে, শ্রমিকের অভাবে তা হয় না। অধিবাসীদের উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপিয়ে শাসকপক্ষ লোকের মধ্যে কর্মপ্রবণতা বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এই চেষ্টা তেমন সুফল লাভ করেনি—করতে পারেও না। বিদেশ থেকে শ্রমিক আমদানী করার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু নিগ্রো শ্রমিকদের আফ্রিকাতেই চাহিদা রয়ে গেছে।

চীনা শ্রমিকেরা মাদাগাস্কারের রোদ সহ্য করতে পারে না। ইন্দোচীন থেকে আন্নামী শ্রমিকদের আনবার চেষ্টা করা হয়েছে।

রাজধানীর আসল নাম ছিল—আন্তানানারিভো অর্থাৎ 'এক হাজার গ্রামের শহর'। ফরাসীগণ সংক্ষিপ্ত করে 'তানানারিভে' নাম রেখেছে। মাদাগাস্করীয়েরা সাধারণত 'মালাগসী' নামে পরিচিত।

উত্তর মেরুতে রুশ সভ্যতা

য়ুরোপের যে কোন রাষ্ট্র যখনই শিল্প ও বাহুবলে উন্নত হয়েছে, তখনই তাদের মধ্যে ভিন্ন দেশে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপনের একটা প্রয়াস দেখা গেছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সব ঔপনিবেশিক অভিযান হয়ে থাকুক না কেন, তার মূলে রয়েছে অর্থনীতিক কারণ। শিক্ষা বা সংস্কৃতি প্রচারের বিশুদ্ধ আদর্শ মহারাজা অশোকের সময় হয়তো সত্য ছিল, কিন্তু আধুনিক উগ্র ধনতান্ত্রিকতার মধ্যে সে আদর্শ একটা কথার কথা মাত্র। এমন কি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিয়ে আবিষ্কার বা অভিযান করতে আজ আর কেউ অগ্রসর হয় না। একটা অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার, সম্পদ আহরণ বা ঐ রকমই কোন কিছু বৈষয়িক সুখ সুবিধা আত্মস্থ করার উদ্দেশ্য ছাড়া আধুনিককালে বড় কেউ আর দুঃসাহসিক অভিযাত্রায় বার হন না। পাদরীরা মানবতার দোহাই দিয়ে অবনত মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যান বটে, কিন্তু তাঁদের প্রয়াস প্রায়শ শেষটায় সদাগরী সার্থকতায় পর্যবসিত হয়।

সোভিয়েট রুশিয়া জনবিরল উত্তরমেরু প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এই প্রয়াস এখনো ক্ষান্ত হয়নি। সোভিয়েট রুশিয়ার উপনিবেশ বিস্তার কথাটা হেঁয়ালির মত মনে হয়। পররাজ্যে স্বাধিকার বিস্তার তাদের অর্থনীতিক আদর্শের সঙ্গে তো খাপ খাবার কথা নয়।

কিন্তু কথাটা সত্য। সোভিয়েট রুশিয়া তুষারাচ্ছন্ন উত্তর মেরুতে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, নগর পত্তন করেছে, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে সেই তুন্দ্রাভূমিতে সভ্যতার স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার উপনিবেশ বিস্তারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব। এর মধ্যে কোন জাতীয় অর্থনীতিক আত্মপূর্তির বালাই নেই। নিছক সভ্যতার বিস্তার ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য এর মধ্যে নেই। এক কথায় এর প্রমাণ দেওয়া যায়। উত্তর মেরুতে উপনিবেশ স্থাপন সোভিয়েট রুশিয়ার একটি রাষ্ট্রীয় ব্যয় মাত্র ; এটা কোন ব্যবসা নয়, Speculation বা টাকা খাটাবার প্রচেষ্টা নয়। কারণ এই পরীক্ষায় ভবিষ্যতে যে লাভ হবে তাতে মস্কোর ধনভাণ্ডার পুষ্ট হবার কোন ভরসা নেই। কিভাবে এই সাংস্কৃতিক বিস্তার ও পরীক্ষা চলেছে তা মিঃ এইচ পি স্মলকা দেখে এসে একটি পুস্তকে বর্ণনা করেছেন। এই প্রবন্ধে সেই পুস্তক থেকে কিছু তথ্য দেওয়া গেল।

জারের আমলেও উত্তর মেরুতে রুশ রাষ্ট্রের শাসন চলতো। কিন্তু সে শাসন ছিল শোষণেরই নামান্তর। ইয়েনেসির নদীর গলিত বরফের উপর দিয়ে রুশবেনেদের মহাজনী নৌকা এসে ভীড় করতো উত্তর মেরুর যাযাবর মানুষের দেশের ঘাটে ঘাটে। টুনকো খেলনা বা সস্তা ভডকার (মদা) বিনিময়ে তারা মেরুবাসী যাযাবরদের কাছে পেত পশুলোম (Fur), যা খুবই চড়া দামে য়ুরোপের বাজারে বিক্রি হতো। জার শাসনের একমাত্র কীর্তি ছিল এদের ওপর ট্যাক্স বসানো। এই পশুলোম যোগাড় করার জন্য মেরুবাসীদের দুঃসাধ্য পরিশ্রম করতে হতো। এক বোতল ভডকার দেনা শোধের জন্য দিনের পর দিন বলগা

হরিণ নিয়ে চিরতুহিন মেরুস্থলীর প্রান্তরে প্রান্তরে কাঠবিড়ালী বা খেকশিয়াল খুঁজে খুঁজে শিকার করতে হতো। এই শোষণের যা অবশ্যম্ভাবী ফল, তাই ঘটলো একদিন। সভ্যশাসনের করাল বাণিজ্যবুদ্ধি এদের ঘরে ঘরে সর্বনাশের বীজ ছড়িয়ে দিল।

গত মহাযুদ্ধের পূর্বে রুশিয়ার ঔপনিবেশিক রীতি-নীতি এই ধরনের ছিল। কিন্তু আজ আবার নতুন করে সে অভিযান আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সে রীতি আর নেই। লাল সোভিয়েট রক্তশোষণের জন্য মেরু অভিযান করছে না, রক্তসঞ্চয়ের জন্যই করছে। মিঃ স্মলকার বর্ণনা তারই সাক্ষ্য।

উত্তর মেরুপ্রদেশের অধিবাসী যাযাবর মানুষের সংখ্যা মোট দেড় লক্ষ হবে, মোট ছাব্বিশটি বিভিন্ন উপজাতি এই যাযাবর জাতির মধ্যে আছে। সভ্য জাতির আচরণের এরা অনেকদিন থেকেই ভুক্তভোগী। টুঙ্গুসি, সামোয়েড, ইয়াকুত, গোলন্দি, লামুত, ইয়ুরোকা, গেলিয়াক, য়ুকাগির, দোলগান, অসটিয়াক, আর চুকচি, এই কয়টি উপজাতিই এদের মধ্যে বিশিষ্ট।

অল্পসংখ্যক এস্কিমোও এখানে বাস করে, বেরিং প্রণালীর উপকূলভাগে। এদের মধ্যে অসটিয়াকরা মঙ্গোল বংশোদ্ভব ; তাদের চওড়া চিবুক ; মাথার খুলির গঠন আর মুখাবয়ব দেখলেই তা বোঝা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এদের সঙ্গে আমেরিকার আদিম মানুষ রেড ইণ্ডিয়ানদের রক্তসাম্য আছে। এদের ভাষার মধ্যেও বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যথেষ্ট।

কোন কোন উপজাতির মধ্যে তুর্কী ভাষার আধিক্য, কাদেরও মধ্যে মঙ্গোল ভাষার। এ থেকেই মনে হয় যে, মধ্য এশিয়ার যোদ্ধৃস্বভাব তাতার জাতিদের অভিযানে এরাও একদিন পর্যুদস্ত হয়েছিল। হয়তো তখন এরা অপেক্ষাকৃত নিমস্তর ভূমিতে অল্পতর শীতমণ্ডলে উর্বরতর ভূমিতে বাস করতো। কিন্তু আক্রমণের প্রকোপে ক্রমে ক্রমে দূর উত্তরে অনুদার কৃপণ তুষারস্থলীর দিকে সরে পড়তে হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে কসাকরা আগ্নেয়াস্ত্র অর্থাৎ বন্দুকের জোরে এদের পরাভূত করে ; মূল্যবান পশুলোমের লোভে শোষণ করে। এদের সর্দারদের বন্দী করে কসাকরা প্রচুর পশুলোম মুক্তিপণ হিসাবে আদায় করে নিত। এই ছিল তখনকার অবস্থা।

এই তুষারের দেশে বলগা হরিণই মানুষের জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন। বলগা হরিণের দুধ, মাংস-চর্বি এদের খাদ্য। বলগা হরিণ গাড়ী টানে। বলগা হরিণের চামড়ার তাঁবুতে এরা বাস করে, ঐ চামড়া দিয়েই এদের দেহাচ্ছাদনের পোষাক তৈরী হয়। শীতের সময় প্রখর হিমবাতের দুর্যোগে বলগা হরিণের দলকে দক্ষিণে খাদ্যের অন্বেষণে সরে আসতে হয় ; তুন্দ্রাভূমির শ্যাওলাই বলগা হরিণের একমাত্র খাদ্য। কাজে কাজেই মেরুবাসীদেরও বলগা হরিণের জন্যই দক্ষিণে সরতে হয়। প্রকৃতির এই ক্রূর নিয়মের অধীনে থেকেই তারা যাযাবর হতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং এমন মানুষের সমাজে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সৃষ্টি বা প্রতিষ্ঠা আশা করা বৃথা। এইটাই ছিল জার আমলের এবং তাদের আগের আমলের শাসকদের ধারণা। কিন্তু আজ সে ধারণা বদলে গেছে। উত্তর মেরুবাসী, তুন্দ্রাভূমির অবনত মানুষেরা আজ সংস্কৃতিবান হয়ে উঠেছে। সোভিয়েটের সদুদ্দেশ্য আর অধ্যবসায়ের দরুণ রূপকথা আজ বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। এই অবজ্ঞাত মেরুদেশের তুষার প্রান্তরে অদূর ভবিষ্যতে এক 'নূতন আমেরিকা' গড়ে উঠবে। মিঃ স্মলকা সেই আশা

পোষণ করেন।

সোভিয়েট লাল মিশনারীরা প্রথমে দুটি কাজে হাত দিল। একটি মেরু প্রদেশের নদীগুলিতে নৌ চলাচলের ব্যবস্থা করা, দ্বিতীয়টি শিক্ষা বিস্তার। বরফ কাটা (Icebreaker) জাহাজ দিয়ে নদীর উজান বেয়ে ছোট ছোট বাষ্পতরী টেনে নিয়ে যাবার পথেরও ব্যবস্থা করা হলো। স্থানে স্থানে আবহাওয়া অফিস, রেডিও স্টেশন এবং স্কাউটিং এরোপ্লেনের ঘাঁটি বসানো হলো। লোক চলাচল বা মালপত্র যানবাহনের সুন্দর ব্যবস্থা এই ভাবে করা হলো। এখন নিয়মিত বিমান সার্ভিস বসানো হয়ে গেছে। এই মেরুদেশ তুষারে ঢাকা আছে সত্য, কিন্তু তার নীচে অজস্র খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে। সোভিয়েট রুশের উদ্যোগে স্থানে স্থানে খনিপত্তনও হয়ে গেছে। সেখানে আজ প্রথম শ্রেণীর নিকেল, কয়লা, তেল, সোনা এবং প্লাটিনাম নিষ্কাশিত হচ্ছে।

কিন্তু এই সব ব্যবস্থা সোভিয়েট রুশিয়া বিদেশী Enterpriser পদ্ধতিতে করছে না। এ ব্যাপারে তারা গুরুর কর্তব্য গ্রহণ করেছে মাত্র। মেরুবাসীদের সঙ্গে নিয়ে, এই উদ্যোগে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি করে, তাদের শুভ স্বার্থসিদ্ধির কাজে আহ্বান করেছে। লেনিনের উদ্দেশ্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটতে দেওয়া হয়নি। লেনিনের নীতি অনুযায়ীই মেরুবাসী যাযাবর উপজাতির স্ব স্ব রাষ্ট্রীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে এই পরিকল্পনার কাজ চালান হচ্ছে। এই সোভিয়েট 'কলম্বাস'দের বিশ্বাস যে, মেরুদেশের সমৃদ্ধি বাড়াতে যোগ্যতম লোক হল মেরুবাসীরা স্বয়ং। শত শত বছরের অধিবাসের কারণে তাদের মধ্যে যে প্রকৃতিদত্ত শক্তি আছে, সেটা বাইরের লোক সেখানে গিয়ে অর্জন করতে পারবে না, প্রমাণও দিতে পারবে না। সুতরাং প্রধান কাজ হল এই মেরুবাসীদের জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে দেওয়া। তারাই চিনুক বুঝুক তাদের দেশকে ; আর জ্ঞানবিজ্ঞানে শক্তিমন্ত হয়ে নিজ দেশের সমৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করুক।

সোভিয়েট সরকার প্রথমেই মেরুবাসীদিগের একটি সুনির্দিষ্ট নাগরিক অধিকার ঘোষণা করলেন। এদের সঙ্গে কারবার চালাবার ক্ষমতা রইল শুধু সোভিয়েট সরকারের আর সরকার অনুমোদিত কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানগুলির। তাদের সর্বপ্রকার ট্যাক্স থেকে রেহাই দেওয়া হল। মেরুবাসীদের পরিশ্রমে উৎপন্ন বা আহৃত দ্রব্যসামগ্রীর একটা ন্যূনতম মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হল। তাদের ক্রয়যোগ্য জিনিসেরও এইভাবে দর স্থির করা হল।

এ তো গেল ব্যবসা বাজার সুসংস্কৃত করার কথা। তার পর একটা ভৌগোলিক সীমা চৌহদ্দি নিরূপণও বিভাগ করা হল, যে কাজ আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। করবার গরজও ছিল না কারও। এই ভৌগোলিক বিভাগ মেরুবাসীদের মধ্যে নূতন মানবতার ও সভ্য জীবনের অপূর্ব আস্বাদ বহন করে আনল। যে উপজাতি স্বভাবত যে অঞ্চলে আহার-বিহারের অন্বেষণে ঘর সংসার নিয়ে চলাচল করে, সেইগুলি এক একটি বিভিন্ন জিলা (National district) রূপে মানচিত্রে এবং কাজের বেলায়ও বেঁধে দেওয়া হল। এই জিলাগুলি ভূম্যধিকার সেই সেই বিশিষ্ট উপজাতিকেই মঞ্জুর করা হল। এমনকি এই সব উপজাতিদের পুরাতন নাম বদলে দিয়ে নূতন নামকরণ করা হল। সাবেক কালে তাদের জাতীয়তা বা উপজাতীয়তাসূচক কোন নামই ছিল না। সোভিয়েট রুশিয়া প্রথম এই নামকরণ করেছে।

এরপর আরম্ভ হ'ল শিক্ষা বিস্তারের কাজ। তাদের শিক্ষিত করার উৎসাহ সোভিয়েট

রাশিয়াকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, তার জন্য সোভিয়েট সরকারকে অনুতপ্ত হতে হয়েছিল। অর্থাৎ, প্রথমে দলে দলে মেরুবাসী তরুণ তরুণীদের লেনিনগ্রাডের প্রতিষ্ঠানে (উত্তরে উপজাতীয়দের শিক্ষা নিকেতন) নিয়ে এসে তাঁরা শিক্ষা দিতে লাগলেন। জলের মাছকে ডাঙায় রাখলে যে অবস্থা হয়, এই তরুণ মেরু সন্তানদের সেই দুর্ভোগ হল। লেনিনগ্রাডের আবহাওয়া তাদের ধাতে এবং রান্না করা মাংস আর কপির তরকারী তাদের পেটে সইল না। বল্গা হরিণের কাঁচা মাংস, বরফগলা জল আর মেরুর বাতাসে পরিপুষ্ট এই সব ছেলেমেয়েদের হঠাৎ শহরে আবহাওয়া বড় গুরুপাক হয়ে উঠল। ফলে নিউমোনিয়া আর যক্ষ্মায় অনেকের মৃত্যু হল। এর পর সোভিয়েট সরকার অন্য প্রথা অবলম্বন করলেন। মেরুদেশেই তাঁরা শিক্ষায়তন স্থাপন করলেন।

শিক্ষাপদ্ধতি অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হ'ল। প্রথমে কিছুদিন তুন্দ্রা স্কুলে (পাঠশালার মত) শিক্ষা দান, তারপর বাছাই বাছাই ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাইবেরিয়ায় স্থাপিত কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষালয়ে (ইগারকা, দুদিনকা, নোভিপোর্ট, অবডোরস্ক) পাঠিয়ে শিক্ষাদান। এইখানে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত ও রুশ ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় সাধারণত হ'ল রাইফেল ব্যবহার শিক্ষা, মাছ ধরার জাল ব্যবহার শিক্ষা, নৌচালনা শিক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ পরিচয়। মেরুবাসীদের স্বভাবদত্ত শিকার ও মৎস্য ধরার প্রতিভা এইভাবে বিদ্যালয়েই সুমার্জিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া বলগা হরিণ প্রতিপালন ও পশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে খুব ভালরকম শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। মোটর বোট পরিচালনা এবং কাঠের গৃহ নির্মাণ অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। এই সব শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবার বাছাই করা বুদ্ধিমান ও নিপুণ ছাত্রদের লেনিনগ্রাড প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যখন চিকাগোতে বিশ্বধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা করতে যান, তখন সে সভায় তিনি একজন নিগ্রো যুবককে দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে দেখেন ও শুনেন। তিনি পরে অনুসন্ধানে জানলেন যে, এই উচ্চশিক্ষিত দার্শনিক নিগ্রো যুবক একটি নরখাদক নিগ্রো উপজাতির বংশোদ্ভব। আফ্রিকায় এই ছেলেটির আত্মীয় গোষ্ঠীকে (যার মধ্যে সে নিজে ছিল) অন্য একটি উপজাতি যুদ্ধে হারিয়ে বেঁধে রেখেছিল পুড়িয়ে খাবার জন্যে। ছেলেটি সেই বন্দীদশা থেকে কোনমতে পালিয়ে এক য়ুরোপীয় দাস ব্যবসায়ীদের ক্যাম্পে পালিয়ে আসে। তারপর সে জাহাজযোগে আমেরিকায় আসে। সেই নরখাদক গোষ্ঠীর বন্য নিগ্রো ছেলেটিই সুশিক্ষা লাভ করে সেই মহাসভায় দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিল।

সোভিয়েট রুশিয়ার অদ্ভুত শিক্ষা-রীতির গুণে উত্তর মেরুতে আজ ঐ নিগ্রো যুবকের মত শত শত শিক্ষিত যুবক নূতন জীবন লাভ করে ভিন্ন মানুষ হয়ে উঠেছে। মেরুবাসীদের মধ্যে লিপি, অক্ষর, ব্যাকরণ ও লিখনপদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এদের রুশ তৈরী করার (Russifying) জন্য চিন্তিত নয়। নিজের নিজের উপজাতীয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, লোকসঙ্গীত, গাথা প্রভৃতি সকল বিষয়ে মেরু ছাত্ররা গবেষণা করে নিজের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করছে। সামোয়েদ ও ইয়াকূত ভাষায় দুটি সংবাদপত্র প্রচলিত হয়েছে। এই অঞ্চলের আর কয়েকটি রুশ ভাষায় লেখা সংবাদপত্রে দুটি করে উপজাতীয় ভাষায় লেখা প্রবন্ধের ক্রোড়পত্র থাকে। তুন্দ্রা স্কুলের জন্য প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক সব ছাপা হয়েছে। পুশকিন, টলস্টয়, গোর্কি ও টুর্গেনিভের গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতার অনুবাদ বিবিধ

উপজাতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তককে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া সোভিয়েট রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি সম্বন্ধে নানারকমের পুস্তিকা প্রচার ক'রে এদের নূতন সোভিয়েট সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করা হচ্ছে।

লেনিনগ্রাড প্রতিষ্ঠানে মেরুবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য তিনটি ফ্যাকাল্টী (Faculty) খোলা হয়েছে। (১) সোভিয়েট বিভাগ—ইতিহাস, আইন, রাজনীতি ও অর্থনীতি। (২) ব্যবসায় বিভাগ—কৃষি, মাছধরা, আধুনিক শিকার-পদ্ধতি, পশুলোম সংগ্রহ, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং শিল্পোৎপাদন শিক্ষা। (৩) শিক্ষক বিভাগ—বালক-বালিকাদের শিক্ষাদান রীতি।

এই শিক্ষার জন্য মেরুবাসীদের কোন অর্থব্যয় করতে হয় না। বরং শিক্ষার্থী কাল পর্যন্ত তারা আর্থিক সাহায্যে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা পেয়ে থাকে। খাওয়া, পরা, প্রমোদ, ভ্রমণ ও খেলা—সমস্ত ব্যাপারে তাদের খরচের কোন দায় নেই। অধিকন্তু মাসিক পঁচিশ রুবল হাতখরচা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী থাকার সময় এদেব বিবাহের সুযোগও দেওয়া হয় এবং সেক্ষেত্রে দম্পতির জন্য ভিন্ন বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। এখানে এদের অবশ্য রুশ ভাষার মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হয়। য়ুকগিব জাতীয় একটি মেরুবাসী ছাত্র সম্প্রতি অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। এর নাম টায়েকি ওড়ুলোফ ; ইনি 'তুষার মানব' নামে একখানা বই লিখেছেন। ইংলণ্ডের পুস্তক প্রকাশ ব্যবসায়ী মেথুয়েন (Mathuen) কোম্পানী উক্ত বইটির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (Snow People)।

মিঃ স্মলকা লুগা ইনস্টিটিউটেব গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প (এস্টোনিয়ার প্রান্তের নিকটে অবস্থিত) পরিদর্শনে একবার গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি দেখেন, শ্বেতাঙ্গ রুশ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মেরুবাসী ছাত্রদের Fox Trot নাচ শেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানোর সঙ্গত চলেছে। মেরুবাসীদের জাতীয় নৃত্য আছে অবশ্য তবুও রুশ শিক্ষকেরা বলেন, শ্বেতাঙ্গ য়ুরোপীয়দের সঙ্গে একাত্মবোধেব জন্য এই য়ুরোপীয় নৃত্য শিক্ষা দেওয়া যাচ্ছে, যাতে তাদের মধ্যে তিলমাত্র ব্যবধানের সংস্কাব না গড়ে উঠতে পাবে।

তুন্দ্রা ভূমিতে ধনী, দরিদ্র ভেদাভেদ আগে ছিল। যাব তিনশত বলগা হরিণ ছিল, সেই ছিল তাদের মধ্যে ধনী, দরিদ্রের হয়তো একটি দুটি ছিল, অথবা একেবারেই ছিল না, তাদের তখন পেটের দায়ে ধনীর বলগা হরিণ নিয়ে মজুরীতে বা বখরা দিয়ে শিকার খাটতে হত। সোভিয়েট পদ্ধতি এখানে প্রথমে এসেই ধনীদের স্বত্বচ্যুত (Expropriation) করার কাজ আরম্ভ করেনি। উপজাতীয় মণ্ডলে (Tribal Council) প্রস্তাব পাশ করে সিদ্ধান্ত করা হল যে, প্রত্যেক ধনীকে সমগ্র উপজাতেব জন্য কিছু কিছু বলগা হরিণ দিতে হবে। আরও সিদ্ধান্ত করা হল যে, বিক্রয়ের কেন্দ্রে পশুলোম বহন করে নিয়ে যাবার জন্য এবং সেখান থেকে খাদ্যদ্রব্য ও আরও সব সামগ্রী নিয়ে আসার জন্য ধনীদেরই সকল ব্যবস্থা করতে হবে। যদি তারা না করে, তবে আদালতে অভিযুক্ত করা হবে। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয় এবং শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, আজ পর্যন্ত আদালতে উপস্থিত করার কোন কারণ হয়নি। এরপর পাঠান হ'ল এক একটি কেন্দ্রে এক একজন তরুণ তরুণী কমুনিষ্ট কর্মী (Comsomol)। এরা কতকগুলি পরিবার সংঘবদ্ধ করে নিয়ে যৌথভাবে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সংগঠন করল। শিকাব করা ও মাছ ধরা সমস্তই যৌথভাবে নিষ্পন্ন ও সমভাগে বন্টন করার রীতি প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

রুশের অন্যান্য অঞ্চলে যেমন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কৃষিকার্যের উন্নতি করা হয়েছে, মেরুদেশেও তেমনি মাছধরা ও শিকারকে যন্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যে উন্নত করা হয়েছে।

এইভাবে সমগ্র মেরুদেশে এক-একটি সংস্কৃতির ঘাঁটি (Cultural base) স্থাপন করে সোভিয়েট সমস্ত তুন্দ্রাভূমিতে সভ্যতার পত্তন করছে। মেরুবাসীদের যাযাবর বৃত্তিকে উচ্ছেদ করার কোন প্রচেষ্টা নেই। তবে আশা করা যায় যে, ধীরে ধীরে অর্থনীতিক সমৃদ্ধি পাকা হয়ে উঠলে এই সংস্কৃতি ঘাঁটিগুলিকে কেন্দ্র করেই নূতন নূতন স্থায়ী নগর গড়ে উঠবে। উপজাতীয় মণ্ডলকে (Tribal Council) একধাপ উন্নত ক'রে এখন যাযাবর সোভিয়েট (Nomadic Soviet) স্থাপন করা হয়েছে। এবং সাফল্যের সঙ্গে কাজ চলেছে। এখন এই মেরুবাসীদের মধ্যেই অধ্যাপক চিকিৎসক ও ইঞ্জিনিয়ারের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা নূতন জীবনের স্বাদ পেয়েছে। দূর মেরু অঞ্চলের কঠিন বরফের প্রান্তরে প্রান্তরে সোভিয়েট আজ যে সংস্কৃতির জ্ঞানবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাই মেরুবাসীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বিচিত্র ছলনাজালে

কবি লংফেলো বলেছেন—'বাহ্য দৃশ্যে ভুলো নারে মন!' তত্ত্বকথার দিক দিয়ে এ উপদেশ পালনীয় হতে পারে। মিথ্যের ছলনা থেকে সাবধান থাকাই উচিত। মাঝরাতে নিমগাছের অন্ধকারে ভূতের মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়ে লাভ নেই। তাতে কোন আনন্দ নেই। কিন্তু সত্যের ছলনা মনকে প্রসন্নই করে। ময়দানবের তৈরী প্রাসাদে স্ফটিকের সরোবর দেখে দুর্যোধনের বিভ্রম ও নাকাল হওয়ার কাহিনী হাসি ও আনন্দের খোরাক যোগায়। সুতরাং সত্যের ছলনায় মানুষ ভুল করে আনন্দই লাভ করে। সসাগর পৃথিবীর জল স্থল অন্তরীক্ষে এমনি কত যে বিচিত্র ছলনাজাল পাতা আছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের নিজের সৃষ্টিই তার কাছে ছলনার মত হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সত্য বস্তুই রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে আছে।

সৈন্য-শিবির নয়—আপনি কি মনে করেন সারি সারি এই ছাউনীর ভেতর রণক্লান্ত সৈনিকেরা ঘুমিয়ে আছে? একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মনে হবে, বোধ হয় তা নয়। কিন্তু তবে কি?

এই ছাউনির ভেতর জেগে বা ঘুমিয়ে রয়েছে শত শত বাঁধাকপি, কড়াইসুঁটী, শসা ও তরমুজ। ক্যালিফোর্ণিয়ার ক্ষেতে হিমের আক্রমণ তরিতরকারীর পক্ষে মারাত্মক। তাই ছাউনী চাই। দুরন্ত বরফপাতে এই তরুণ উদ্ভিদের পল্টন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। চাষারা তাই সাদা কাপড়ের ছোট ছোট তাঁবু তৈরী করে প্রত্যেক গাছকে সযত্নে সুরক্ষিত করে রেখেছে।

কার শবযাত্রা?—কোন মৃত বীর জ্ঞানী গুণী বা আত্মীয়ের শবযাত্রা নয়। ঐ বাহকেরাই বা কে? তারা কাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে? এই অনুষ্ঠানে প্রকৃত ব্যাপার হলো খেলার মাঠের উদ্বোধন। খেলাধূলা আজ ধর্মাচরণের মত সমাজের নিত্যক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

জীবনে যা কিছু করণীয় বরণীয়, যা আনন্দ আনে, তার মধ্যে মানুষ নিষ্ঠা ও পবিত্রতা আরোপ করতে চায়। রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কোলিয়ারী অঞ্চলে প্রথম ইংরাজ খনিকরেরাও সাঁওতালদের উপদেশ মত খনির মুখে মুর্গী বা শুয়োর বলি দিয়ে কাজ আরম্ভ করতো। মাইক্রোনেসিয়া বা দক্ষিণ সাগরের দ্বীপময় দেশে খেলোয়াড়েরা খেলাকে একটি পবিত্র

অনুষ্ঠান বলে মনে করে। ছবিতে একদল খেলোয়াড় নতুন খেলার মাঠ উদ্বোধন করতে চলেছে। তাদের কাঁধে এই অনুষ্ঠানের জন্যে নানারকম নৈবেদ্য উপাচার রয়েছে। আর আছে একটি বিরাট ভাণ্ডের মধ্যে কতগুলি রুটিফল। অনুষ্ঠান শেষে নিষ্ঠাবান ভক্ত খেলোয়াড়েরা এই প্রসাদ ভক্ষণ করে তবে ঘরে ফিরে আসবে। তার পরদিন থেকে খেলা আরম্ভ হবে।

এই টাকাটি দিয়ে একটা জমিদারী কেনা যায়—পণ্য বিনিময়ের জন্য মুদ্রার প্রয়োজন, তাই অনুমোদিত মুদ্রার চলন আছে। আমাদের দেশেও কিছুদিন আগে কড়ির প্রচলন ছিল। খুচরো বাজার অর্থাৎ শাকসব্জী কিনতে তুচ্ছ কড়িরও Currency গৌরব ছিল। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের য়াপ নামে একটি দ্বীপে সেদিন পর্যন্ত পাথরের মুদ্রার প্রচলন ছিল। ঘসা মাজা একটু গোলাকার হলেই সে পাথরের আর পাথরত্ব থাকতো না। সে দেশে পাথর গোল হলেই লক্ষ্মী। এই সব প্রস্তর মুদ্রার আকার অনুসারে এই দামেরও তারতম্য হতো। ছোট একটা গোল নুড়ি দিয়ে শুধু একটা পায়রা কেনা সম্ভব। কিন্তু যার ঘরে এই রকম একটি বিরাট মুদ্রা, সে তো সেখানে ধনেশ্বর। য়াপ ও পালাও দ্বীপবাসী আদিম জাতিদের এই অতি সাদাসিধে মুদ্রাতত্ত্বের সুযোগ নিয়ে লোভী বিদেশী বোম্বেটেরা অনেক কুকাণ্ড করেছিল। পাশের কোন দ্বীপ থেকে তারা নৌকা বোঝাই করে পাথরের চাক্‌তি নিয়ে যেত আর তার বদলে নৌকা বোঝাই করে নারকেল নিয়ে আসতো। এইভাবে পালাওবাসীরা খুব উৎসাহ করে ধনবান হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে একদিন তারা ভুল বুঝলো। রবীন্দ্রনাথের গুপ্তধনের গল্পের নায়কের মত একদিন তারা উপলব্ধি করলো—সব গেছে আছে শুধু টাকা, কতকগুলি রুক্ষ কঠিন গোল পাথুরে চাক্‌তি। এই পাথুরে সম্পদের মোহ ভেঙ্গে গেল তাদের। সমস্ত দ্বীপ জুড়ে শোকের কান্না উঠলো। যাকে তারা হারিয়েছে: ওরে নারকেল। ওরে নারকেল!

কূর্মাবতার নয়—কূর্মবাহন। আমাদের গঙ্গাদেবী মকরবাহন কিন্তু সেতো গেল পুরাণের কথা। বাহামা দ্বীপের ছেলেরা গঙ্গাদেবীর কীর্তিকেও হার মানিয়েছে। তবে তারা ঠিক মকর বাহন নয়—তাদের বলা উচিত কাছিম বাহন। বাহামা দ্বীপের ছেলেরা জলের ভেতর ডুব সাঁতার দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে অব্যর্থ লক্ষ্যে বিরাট এক একটা কাছিমের গলা টিপে ধরে। এর জন্য কাছিম ও বাহামা ছেলের মধ্যে দস্তুরমতো একটা জলযুদ্ধ হয়ে যায়। পাঁয়তাড়া করে করে তারা আগে কাছিমের গলাটা টিপে ধরে। এই অবস্থায় কাছিম নিজেই জলের ওপর ভেসে ওঠে আর বাহামা ছেলেটিও পরক্ষণেই কাছিমের ওপর চড়ে বসে এবং তীরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। তীরে এসে এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে এই কাছিম শিকারী গায়ের জোরে কাছিমকে দুহাতে তুলে নিয়ে উপরে উঠে পড়ে।

এই ভাস্কর্যের শিল্পী কে?—প্রশান্ত পাষাণে গড়া এই সুরাধার কে রচনা করেছে? আমেরিকার উটা প্রদেশের এই বিরাট পাথরের সুরাধারটিকে 'ভেনাসের পানপাত্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এটি উচ্চতায় প্রায় দোতলা বাড়ীর সমান।

কিন্তু এই সুরাধারের গায়ে কোন শিল্পীর নাম লেখা নেই। খুঁজলেও তার নাম কেউ বলতে পারবে না। তার কারণ এই ভাস্কর্যের রচয়িতা স্বয়ং পবন। উটা প্রদেশে সারি সারি নরম পাথরের স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে। সমস্ত দুপুর প্রান্তরের উপর দিয়ে উদ্দাম ঝড়ো হাওয়া মাতলামি করে। সেই ঝড়ো হাওয়ার দাপটে স্তূপগুলি খসে ভেঙ্গে এই রকম এক একটি

বিচিত্র প্রস্তর কীর্তি সৃষ্টি হয়েছে।

ইনি একজন চিত্রতারকা বা সিনেমার অভিনেতা—এঁর নিবাস আফ্রিকার উগাণ্ডা অঞ্চলের ভিক্টোরিয়া হ্রদে। ইনি জাতিতে কুম্ভীর। হ্রদের ধারে যে অঞ্চলে ইনি বিহার করেন, সেইখানে নিকটবর্তী পল্লীগুলিতে সৌভাগ্যের আবির্ভাব হয়। গ্রামবাসীদের এটা ধর্মবিশ্বাস।

আমাদের দেশে কিছুদিন আগে কুমীর হীরালালের গল্প শোনা গিয়েছিল। হীরালাল নামে এক সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর কুমীরের রূপে দেখা দেন। শত শত ভক্ত তাঁকে দেখবার জন্য নদীর ধারে ছুটে আসতো। ছবির এই কুমীরটির নাম লুটেম্বি। গ্রামবাসীদের ইনি দেবতা বিশেষ। ভক্তরা দলে দলে এসে মাছের নৈবেদ্য দিয়ে তুষ্ট করে। য়ুরোপের বহু সিনেমা কোম্পানী লুটেম্বির ক্রিয়াকলাপের ফিল্ম তুলে নিয়ে যায়। পৃথিবীর যে কোন বড় অভিনেতার মত এঁর জন্যও অনেক ফিল্ম খরচ হয়েছে। কুমীর লুটেম্বিও হ্রদ অঞ্চলের দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকেন। একবার এক মেয়ে ডাকাতের একটি হাত ছিঁড়ে নিয়ে গিয়ে দেব লুটেম্বি তার শাস্তি বিধান করেন।

এ কার গলার হার?—কোন্ রাজকুমারীর গলার রত্নহার পড়ে রয়েছে এখানে? এই স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত মৌক্তিকদম আর তার প্রান্তে একটি পদ্মরাগ খচিত রত্নপুষ্প। আটলাণ্টিক মহাসাগরের এণ্ডোরস দ্বীপে সিক্ত বেলাভূমির ওপর শত শত এই রত্নহার ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। শুধু কুড়িয়ে নিলেই হলো। কিন্তু অত লোভ ভাল নয়। তুলে নিতে গেলেই চম্‌কে হাত ফিরিয়ে নিতে হবে। এ একধরণের সামুদ্রিক সরীসৃপ ধীর স্থির হয়ে তার সমস্ত রঙীন সৌন্দর্য্য নিয়ে বালির ওপর চিকমিক করছে। ছুঁতে গেলেই নড়ে উঠবে—কিলবিল করে সরে পড়বে।

সাবধান! তিনটি গেছো দুর্বাসা রাগ করেছে—দিনের আলোতে এদের দেখা যাবে না। উঁচু গাছের পাতার ভীড়ে কোটরের মধ্যে দুর্বাসার মত রগচটা তিনটি ঋষি তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন। ডানপিটে ছেলেরা সে খবর রাখে না। গাছের ফল পাড়তে গাছে উঠেছে। শব্দ শুনেই ঋষি তিনজনের ধ্যানভঙ্গ হলো। সঙ্গে সঙ্গে কোটর থেকে উঁকি দিয়ে বেরিয়ে এল তিনটি উগ্রবদন—তিন জোড়া রোষকষায়িত লোচন।

কী কথা বলে সমাধি

দাঁড়াও পথিকবর! কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সমাধির গায়ের এই লেখাটিকেও দেখেছেন। লেখাটি পথিক-মানুষকে নীরবে অনুরোধ করছে—তিষ্ঠ ক্ষণকাল এবে এ সমাধিস্থলে। ভাবুক পথিক, যিনি কবির জীবন সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না, তিনিও আনমনা আবেশের মধ্যে হঠাৎ অনুভব করে ফেলতে পারেন যে, এই নীরব অনুরোধের বাণী যেন সরব হয়ে উঠেছে। কেউ যেন কথা বলছে। কে বলছে? আনমনা আবেশ আরও একটু নিবিড় হলেই বুঝতে পারবেন ভাবুক পথিক, মহীর কোলে মহানিদ্রাবৃত এক কবি, শ্রীমধুসূদন যার নাম, তিনিই কথা বলছেন। যাঁরা কবির জীবন ও কাব্যের খবর রাখেন, তাঁদের কেউ যদি সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে ওই লেখাটিকে পড়েন, তবে তাঁদের চিন্তা ও কল্পনার আবেশ যে আরও নিবিড় হয়ে উঠবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে হতে পারে, সমাধির গায়ে লেখা এই অনুরোধের বাণী কবির জীবনের একটি সংবেদনার জাগ্রত কণ্ঠস্বর। কবির জীবনচরিত পাঠ করেও যে বিশেষ একটি করুণতার সত্য অনুভব করা সম্ভব হয়নি,

সেই সত্য সমাধির বাণীর অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে প্রকট হয়ে পড়েছে। সমাধির গা ঘেঁষে যদি ঘাস ও আগাছার ভিড় থাকে, একটি জংলী গোলাপ যদি মুখ লুকিয়ে সমাধির পায়ের কাছে পড়ে থাকে, তবে তো কথাই নেই। পথিক দর্শক তখন খুবই সহজে অনুভব করতে পারবেন যে, সমাধির ওই বাণী যেন অপ্রত্যক্ষ এক ভিন জগতের প্রাণবার্তা। এ জগতের বাণীকে একটি নতুন সুরের কলরবে পরিণত করে, নতুন অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সমাধিভূমির ভিতরে ঘুরে-ফিরে যাঁরা সমাধির গায়ের লেখা পড়বার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরা সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, সমাধিভূমিও এক বিচিত্র সাহিত্যের জগৎ। শত সহস্র সংবেদনা আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসের বাণীতে কলমুখর এক জগৎ, যদিও সমাধিভূমি বস্তুত নিরেট এক স্তব্ধতার নিকেতন। কোন সমাধির বাণী সমাহিত ও বিদেহ মানুষটির সদেহ জীবনের কোন মুহূর্তে তাঁর নিজেরই সাধের ভাব ও ভাষা দিয়ে রচনা করে রাখা হয়েছিল। কোন সমাধির বাণী প্রিয়-পরিজন কিংবা অনুরাগীর রচিত বাণী। এমন কী স্বয়ং রাষ্ট্রেরই ইচ্ছায় নির্মিত বাণীও কোন কোন কীর্তিমান মানুষের সমাধিতে বাণী হয়ে স্থান পেয়েছে দেখা যায়। যারই রচনা হোক, সমাধির বাণী নিগূঢ় এক রহস্যের ইচ্ছায় নূতনতর তাৎপর্য গ্রহণ করে ফেলে। কীর্তিমান মানুষের প্রবল ভক্তের দল তাঁর সমাধির লেখাটিকে প্রবল এক কীর্তিগাথার মতো বহুবচনে প্রকাশিত করেন। প্রেমিক তাঁর বেদনার বাণীকে প্রেমিকার সমাধির ফলকে উৎকীর্ণ করে দেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, সমাধির গায়ে উৎকীর্ণ হলেই বাস্তব জীবন্ত জগতের যত বাণী ও বিবৃতি যেন অর্থান্তরিত হয়ে যায়। প্রশ্ন করা চলে, এটা কি কালের বিচারবাণীর রহস্যময় একটি আত্মপ্রকাশ?

মনস্বী হবস্ যাঁর গ্রন্থ 'লেভিয়াথান' আজও খ্যাতি হারায়নি, তিনি তাঁর সমাধির লেখা নিজেই লিখে রেখেছিলেন। সমাধির বাণী—'এই সমাধির পাথরই তো প্রকৃত পরশ পাথর'। মৃত্যু সম্পর্কে হবস্ তাঁর কোন লেখাতে এরকম নিগূঢ় জিজ্ঞাসার কথা লেখেননি। তিনি যেন তাঁর উপলব্ধির সবচেয়ে প্রিয় সত্যের বাণীকে জীবনের সব কোলাহলের ভিতরে একটি গোপন আঁধারে লুকিয়ে রেখেছিলেন। মৃত্যুই একদিন বিচার করে বুঝিয়ে দেয় সংসারে কে এবং কোন্ বস্তুটি নিছক লোহা, এবং কে ও কোন্ বস্তুটি খাঁটি সোনা।

লাহোর কেল্লার ভিতরে আনারকলির যে সমাধি আজও আছে, তার গায়ের ফলকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রচিত কবিতার দুটি পংক্তি ফার্সি ভাষাতে আজও শোভিত হয়ে কথা বলছে : 'যদি আমি আর একবার আমার দয়িতার মুখটি দেখতে পেতাম, তবে আমি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত খোদাকে ধন্যবাদ দিতাম।' বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন প্রধানা ও অপ্রধানা বেগমদের মধ্যে তাঁর অনুরাগ বিলিয়ে দিয়েছেন এবং শের আফগানের রূপসী পত্নীকে আত্মসাৎ করে নূরজাহান নামে অভিহিত করবার বাসনায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছেন, তখন বিগতা ও বিদেহিনী আনারকলির উদ্দেশে তাঁর বন্দনার এই কবিতা ভাষাতে খুব করুণ হলেও সেলিম-প্রেমিকা আনারকলির সমাধি তাতে একটুও করুণ হতে পেরেছে কি? গাইড যখন হেসে-হেসে ওই কবিতার অর্থ করে পথিক-দর্শককে শুনিয়ে দেয়, তখন পথিক-দর্শকও বুঝে ফেলতে পারে যে, ভাষাতে এত করুণ হলেও সমাধির গায়ে লেখা এই জাহাঙ্গীরী কবিতা একটি অকরুণ মুখরতা। ফাটল-ধরা সমাধি যেন আনারকলির আত্মার বিদ্রূপাহত অবস্থার একটি প্রতিচ্ছবি। জাহাঙ্গীরের প্রেমিকতার চেহারাটিকে অনুরাগের এক নিদারুণ নৈরাজ্যের চেহারা বলে মনে হয়।

নিউ ইয়র্কের পুরনো সমাধিভূমিতে এক পরিচারিকার সমাধি আছে। এক নারী তার দশ বছর বয়স থেকে শুরু করে নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত পরিচারিকার কাজ করে জীবনাতিপাত করেছিল। শুধু দাসীপনা, একটানা ও অক্লান্ত আশি বছর ধরে শুধু দাসীপনা। এই দাসীর জীবন কোনদিন এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হবার এবং বিরাম গ্রহণ করবার সুযোগ পায়নি। এই দাসীরই অন্তরের এক বিপুল প্রশান্তির কথা তার সমাধির গায়ে লেখা আছে—'আমার জন্যে কেউ আজ শোক করো না, কোনদিনও করো না। কারণ আমি এখন অনন্তকাল কোন কাজ না করবার জন্যই চলে যাচ্ছি।' আজ যাঁরা এই সমাধির লেখাটিকে পড়বেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করবেন যে, সমাধির এই লেখা বৃদ্ধা দাসীর আন্তরিক আনন্দের কথা হলেও সমাজের সাধারণ লৌকিক হৃদয়টির একটি কঠোর সমালোচনা।

ইংলন্ডের বিখ্যাত স্থপতি ক্রিস্টোফার রেন-এর সমাধিতে লাটিন ভাষাতে লেখা আছে : 'আমাকে দেখতে চাও? তবে চারদিকে তাকাও।' ঠিক কথা, লন্ডনের সমাধিভূমির বাইরে চারদিকে তাকালেই রেন-এর নির্মিত স্থাপত্য শোভার অনেক নিদর্শন চোখে পড়বে। কীর্তিযস্য স জীবতি, সমাধির বাণীতে কি এই সত্য উদ্‌গীত হচ্ছে না যে, 'আমি' কিছুই নয় ; কীর্তি ও কৃতিত্বটাই যথার্থ 'আমি'। ব্যক্তি-জীবন নিতান্ত নশ্বরতার অধীন জীবন, কিন্তু ব্যক্তির কৃতিত্ব নশ্বরতার বন্ধন অতিক্রম করে বেঁচে থাকতে পারে।

বিখ্যাত সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের সমাধিতে লেখা আছে শুধু দুটি অক্ষর—এফ এন। বিখ্যাত সেবিকার নামের দুটি আদ্যক্ষর। কী আশ্চর্য, যাঁর নাম ও কৃতিত্বের কথায় ইতিহাসের পাতা আকীর্ণ, তার পরিচয় এই সামান্য দুটি নিরলংকার অক্ষর চিহ্ন? সেবিকার বিনীত মমতার জীবন, যার মধ্যে খ্যাতি অন্বেষণের কোন আড়ম্বর ছিল না, তার পক্ষে এই এফ-এন পরিচয়ই সার্থক পরিচয়। ভাষা হিসাবে এই অক্ষর দুটি নাইটিংগেলের জীবনের সাঙ্কেতিক পরিচয়ও নয়, আরও রিক্ত পরিচয়। কিন্তু পথিক-দর্শক যখন এই সমাধির কাছে দাঁড়ায়, তখন তার পক্ষে অনুভব করতে অসুবিধা হয় না যে, ওই দুটি অক্ষরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেই প্রদীপ হাতে নিয়ে এক মমতাময়ী মানবসেবিকা আহত সৈনিকের ব্যথাতুর বিলাপে অভিভূত এক শিবিরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এফ-এন, রিক্ত অক্ষর দুটি বিপুল এক তাৎপর্যে আলোকিত হয়ে বুঝিয়ে দেয় যে, প্রকৃত কৃতিত্বের পক্ষে হাঁক-ডাকের কোন দরকার হয় না, এবং মহত্ত্ব আপনি খ্যাত হয়।

প্রাচীন রোমের সমাধিভূমিতে একটি বাচ্চা মেয়ের সমাধির গায়ে লেখা আছে : 'ওগো পৃথিবী, তুমি এর উপর বেশী মাটির ভার চাপিও না। কারণ, এই শিশু তোমার বুকের উপরে খুবই লঘু ভার হয়ে এতদিন দাঁড়িয়েছিল।' গবেষকদের ধারণা লেখাটি সেদিনের কবি প্লিনির (বৈজ্ঞানিক প্লিনির ভাইপো) রচনা। যদি তাই হয়, তবু বলতে হবে, সমাধির গায়ে লিখিত হয়ে কথাগুলি খুবই গভীর একটি তাৎপর্য গ্রহণ করেছে। এ যেন এক নিষ্ঠুর অদৃষ্টবিধির নির্মম স্বেচ্ছাচারের সমালোচনা। একটি শিশু যার জীবন পৃথিবীকে চাপ দিয়ে পীড়িত করবার মতো কোন বস্তুই নয়, তার দেহটিকে গুরুভার মাটির চাপে দলিত করে কী সুখ পাচ্ছে এই পার্থিব অদৃষ্টবিধি? বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নটির জবাব দিতে আজও পৃথিবীর জ্ঞানগুরু দার্শনিক এবং সাধকেরাও হিমসিম খাচ্ছেন।

সমাধির সাহিত্য যেন সাধারণ সংসারের সাধারণ বন্ধন থেকে বিমুক্ত একটি স্বতন্ত্র প্রাণের সাহিত্য। পার্থিব যশ-অপযশ ও মায়া-মমতার পুনর্বিচার করে সমাধির লেখা যে

নূতনতর ভাবার্থ ব্যক্ত করে, সেটা সব চেয়ে বিশুদ্ধ বিচারবাণী বলে স্বীকৃত হতে পারে। সমাধির এই ক্ষমতা আছে বলেই পার্থিব গৌরবের অজস্র কপটতাকে সে ধরে দিতে ও ধরিয়ে দিতে পারে। শ্রীসরলা দেবীচৌধুরাণী তাঁর আত্মজীবনীতে বিখ্যাত চিকিৎসক ডেনহাম হোয়াইটের কাছ থেকে শোনা একটি সমাধির লেখার কথার উল্লেখ করেছেন। লন্ডনের একটি সমাধিতে সমাহিত ব্যক্তিটির জীবনের একটি মাত্র কৃতিত্বের কথা লিখিত আছে—'ইনি বই ফেরত দিতেন।' কী ভয়ানক কঠোর অথচ খুবই সত্য এই সমাধির এই বাণী। বই পড়তে নিয়ে এসে ফেরত দেওয়া একটি অসাধারণ ব্যক্তিক কৃতিত্ব বলে অভিহিত হয়েছে। কল্পনা করা চলে সমাধির এই বাণীতে একটি নিদারুণ অভিযোগের প্রশ্ন নিহিত রয়েছে। সেই সঙ্গে কঠোর এক বিদ্রূপের অট্টহাসি। চারিত্রিক সততার অনেক সন্দর্ভ পড়ে ও লেখে যে মানুষ, সেও পরের বই পড়তে নিয়ে এসে আর ফেরত দেয় না ; কী আশ্চর্য জীবন্ত মনুষ্যত্বের অহংকারটা তবু লজ্জিত হয় না।

চিত্রকর

চিত্রকর সে—খেয়ালী, আপনভোলা শিল্পী—আপন মনের খেয়ালে ছবি আঁকে। একান্ত অপরিচিত সে ছিল জনসাধারণের কাছে—অজানা, অচেনা।

তা'র ষ্টুডিও কখনো কেহ খোলা দেখে নাই—ভিতর হতে সর্ব্বদা থাকত বন্ধ। একদিন তা'র ষ্টুডিও সে খোলে। দলে দলে লোক ভিতরে ভিড় করে তা'র আঁকা ছবিগুলি দেখবার জন্যে।

সন্ধ্যা হয়ে আসে—দিন ও রাত্রির বিদায় সম্ভাষণের ম্লান মুহূর্ত্তে। একখানা প্রাইভেট কার ষ্টুডিওর দোর গোড়ায় এসে থামে—বড়লোক। স্বামী-স্ত্রী ষ্টুডিওর ভিতর প্রবেশ করে—ছবিগুলি দেখতে। হঠাৎ শিউরে ওঠে দু'জনেই একখানা ছবি দেখে—নাম 'আলেয়া'—স্বামী দেখে তা'র স্ত্রীর ছবি—স্ত্রীর মুখখানা ফ্যাকাসে।

চিত্রকর তাকায় ফ্যাল ফ্যাল কোরে'—তা'দের মুখপানে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করে ভ্রূ কুঁচকে—কণ্ঠস্বর তার বিকৃত—'ছবিখানার কত দাম?'

শিল্পী বলে করুণকণ্ঠে, 'বিক্রীর জন্য নয়।'

ছবিখানার রং কিন্তু টকটকে লাল—বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আঁকা।*

কাগজের নৌকা

কাগজের নৌকার কথা লিখি—তত্ত্বকথা নয়। দুরন্ত নির্ব্বোধ রঙীন মলিন, ছোট ছোট কাগজের নৌকা—ছোট ছোট স্মৃতির টুকরা। স্মৃতি ও কল্পনা দিয়া গড়া অনুভবের মানুষ আমরা। আমরা কাগজের নৌকা মাত্র, নিজেরাই তাকে গড়ি আর স্রোতের জলে ভাসাই। তারপর হঠাৎ কোন দিন কোন স্রোতের বাঁকে কাশের বনের ভীড়ে সে নৌকা লুকিয়ে পড়ে।

একটি নিয়ে নয়—আমরা কাগজের নৌকার মিছিল। এই শান্ত মুহূর্তে ভাবনার কপাট খুলে দিয়ে একবার পেছু পানে তাকাই। শুধু দেখি এক সুপ্রসারিত স্মরণের আকাশপটে জীবনের অজস্র খণ্ড খণ্ড সমাপ্ত ছবি—কাগজের নৌকারা যেন বানচাল হয়ে আছে। সুমুখ

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

পানে তাকাই—কাগজের নৌকারা নানা আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ও অস্পষ্ট, অপূর্ণ ও অতৃপ্ত; কল্পনার আকাশগঙ্গায় পাড়ি দিয়ে চলেছে।

আমরা কাগজের নৌকা ভাসাই—এর মধ্যে একটা দুরন্ত আকুলতা যেন মুক্তি পায়। আমাদের অনুরাগের দল যেন যত সব অনির্দেশ্যকে ধরবার জন্য 'দূরে অজানার সুরে' ছুটে যায়। যত দিন মনের পৃথিবী তরুণ থাকে, তত দিন কৌতূহল-চঞ্চল মানুষ শিশুর মতই এক পরম অন্বেষণের পুলকে তার চিন্তাকে কাগজের নৌকার মত ভাসিয়ে বেড়ায়। কোন ঘাটের আশ্রয় পেল কি না, সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। এরা শুধু অস্থির—তাই এরা সবই সত্য। কাগজের নৌকা হলো জীবনপ্রভাতের খেলা।

তারপর আসে প্রবীণ দিন। বৈকালী আকাশের আলো ম্লান হয়ে আসে। দিনান্তের ক্লান্ত স্বপ্নে বহু না-পাওয়া আর হারিয়ে-যাওয়ার ব্যথা কৃষ্ণ নিশীথের আচ্ছন্নতা ডেকে আনে। তখন আর কাগজের নৌকা নয়, নদীর জলে শুধু প্রদীপ ভাসিয়ে দিই। অপর পারে চির-হেঁয়ালীর দেশে শিথিল জীবনের একটি ক্ষীণ দীপশিখার আশ্বাস পাঠিয়ে দিই।

সে আজ বহু দিনের কথা। এমনি এক বৈশাখী দুপুরে কুমারবাবুদের বাগানে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের ছায়ায় বসে আছি। চুনারের ভাঙা দুর্গ আর পাহাড়ের গা রোদে পুড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী সেই পাহাড়ী প্রদাহের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উড়ে আসছে বাগানের দিকে।

বাগানের আমগাছগুলি জমা নিয়েছিলাম। নগদ দুশো টাকা সেলামী দিয়েছি, আর বিক্রী থেকে টাকায় দুআনা হারে রেণ্ট দিতে হবে। কলমি আমের গাছগুলি গুনতি শেষ করে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম।

এই ফুলবাড়িটা কুমারবাবুদের। বাড়িটা সেকেলে। একটা দরদালান আর বাগানের ত্রিসীমানা প্রায় শ্মশানের নদীটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। পুবের দিকটা কদমের বন, একেবারে ছায়ায় ঠাসা। এই বৈশাখী দুপুরেও সেদিকে তাকালে মনে হয় গত আষাঢ়ের একদল পলাতক মেঘ যেন বন্দী হয়ে আছে। ঐ বাগানটা যেন উদ্ভিদ জাতির একটা উপনিবেশ। সব্জীর ক্ষেত, কুমড়োর মাচান, কলার ঝাড় আর আম, কাঁঠাল ও পেয়ারার সারি। কোথাও একটু জঙ্গলের মত বাঁশের ঝোপ, ময়না কাঁটা আর কুলগাছের রূঢ় রুক্ষ সমারোহ। তার পরেই কিছুদূর পর্যন্ত একটা ঢালু সোতা জমি—কচুগাছের বড় বড় মোলায়েম পাতার সবুজ ফিকে হয়ে এসেছে। উত্তর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত সার বাঁধা ছোট ছোট বাসকের গাছ নিঝুম হয়ে আছে—তাদের মাথার ওপর লাফালাফি করছে শত শত হলদে ফড়িং আর প্রজাপতি।

গ্রীষ্মের দুপুরে এই রকমের একটা প্রকাণ্ড বাগানের স্তব্ধতার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক মোহ আছে। এখানে বাতাসে যেন একটা অন্য পৃথিবীর গন্ধ। একটা যুগাতীত বিস্ময় মন্থর হয়ে আছে চারিদিকে। গাছগুলিকে মনে হয়—তারা বুঝি এক ভাষাহীন বনেদী জীবপরিবার।

কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত লাগলো—দেখলাম খানিকটা দূরে ছোট একটি ছেলে একা একা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক এক সময় আলের ঘাসের আড়ালে ছেলেটির ছোট শরীর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ছেলেটা যেন কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে মনে হলো। এক এক জায়গায় কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ায় আর নিবিষ্টভাবে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটাকে দেখে তেমনি আশ্চর্য ও অদ্ভুত লাগছিল ; এত ছোট্ট একটি মানুষ আর এই বিরাট অটবীভূষিত উদ্যান—দূরে অতীতের একটি ক্ষীণ পথিক-প্রাণ যেন তার আশ্রয় খুঁজে ফিরছে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে রহস্যের আবির্ভাবের মত এই ছেলেটির গতিবিধি দেখছিলাম। ছেলেটি একবার গোলাপ বাগানের ভেতর ঢুকলো ; তারপর বেরিয়ে এসে বাতাবী নেবুর তলায় গিয়ে একবার দাঁড়ালো। ছোট ছেলে কখনো মিছামিছি এভাবে ঘোরে না ; কিন্তু কী যে ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারছি না। ছেলেটাই বা কে? হাতে গুল্‌তি নেই—তা না হলে বোঝা যেত চড়াই পাখী খুঁজছে। ফড়িংয়ের ঝাঁক উড়ছে—সেদিকেও ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলেটা যেন এক প্রশান্ত অভিযাত্রীর মত কোন পরম অন্বেষণের প্রেরণায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সামনে এসে দাঁড়ালো ছেলেটি। পাঁচ বছরও বয়স হবে না বোধ হয়। দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা বড় তিল, তাই মুখখানা অদ্ভুত রকমের সুন্দর দেখাচ্ছিল। দুটি সরু সরু ঘন কালো পাখা ছড়িয়ে একটা প্রজাপতি ওর কপালে যেন ঘুমিয়ে আছে।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল ; কিন্তু একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন করে তাকে আটক করলাম।

ওর নাম নাগেশ্বর—কুমারবাবুর ছেলে। ও খুঁজে বেড়াচ্ছে যাকে তার নাম তিতি—কুমারবাবুদের চাকরের মেয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম—তিতি কোথায়?

নাগেশ্বর আঙুল তুলে বাগানের চারদিকেই একবার দেখিয়ে দিল। ও বলতে চায়—এইদিকে কোথাও আছে।

বললাম—চল, আমিও তোমার সঙ্গে তিতিকে খুঁজবো।

নাগেশ্বর খুশি হয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললো।

মনে মনে তিতির চেহারাটা একবার কল্পনা করে নিলাম। চাকরের মেয়ে তিতি—নাগেশ্বরের সমানই হবে—খেলার সাথী বোধ হয়।

—তিতি আর তুমি খেলা করতে বুঝি?

প্রশ্নের উত্তরে নাগেশ্বর বললে—হাঁ।

তা হলে তিতিও খুব ছোট, গায়ে হয়ত একটা ছেঁড়া পিরাণ আর পায়ে একজোড়া মল। বোধহয় দুরন্ত মেয়ে। নইলে এই দুপুরে বাগানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে একা একা। ছেলেটাকে বৃথা কষ্ট দিচ্ছে তিতি। ছেলেটা নেহাৎ থাকতে না পেরেই রোদে পুড়ে পুড়ে খেলার সঙ্গিনীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একবার সন্দেহ হলো—এটা বোধ হয় কলহান্তরিতার অভিমান।

—তুমি তিতিকে মেরেছিলে বুঝি?

নাগেশ্বর কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললো—হাঁ।

আমার অনুমান ঠিক হলো! শিশু তিতির অনুরাগ হয়তো অপমানিত হয়েছে—কোন বয়োধন্যা কুপিতা নায়িকার অভিমানের চেয়ে এই অভিমান কম প্রখর নয়। আর নায়কের অনুশোচনাই বা কী কম! নাগেশ্বরের মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়—এক বিরহবিধুর শিশু রোমিওর মুখচ্ছবি।

—চল ওইদিকে একবার খুঁজে দেখি। নাগেশ্বরকে নিয়ে সারা আমবাগানটা তালাস করে এলাম। কুঞ্জকরা জবাগাছের ভীড়ের ভেতর ঢুকলাম। তিতি নেই কোথাও।

—কই নাগেশ্বর, তোমার তিতি এদিকে আসেনি।

নাগেশ্বর বললো—হাঁ এইখানে আছে। ওকে পুঁতে দিয়েছে।

বুঝলাম। নাগেশ্বরের কথার মধ্যে একটা নিষ্ঠুর ঘটনার ইতিবৃত্ত হঠাৎ বেজে উঠলো—

পুঁতে দিয়েছে। অর্থাৎ তিতি আর নেই। তবু নাগেশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছে তার সঙ্গিনীকে। সে তার সমাধিস্থা সঙ্গিনীকে যেন আবার হাত ধরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে।

নাগেশ্বরকে আবার অনেক প্রশ্ন করলাম। সে তার সাধ্যমত উত্তর দিয়ে গেল। তিতির অসুখ হয়েছিল। তারপর চাকরেরা সবাই মিলে একদিন রাত্রে তিতিকে কাপড় জড়িয়ে কোলে তুলে নিয়ে বাগানের ভেতরে আসে। তারা সঙ্গে বড় বড় কোদাল আর লণ্ঠন নিয়ে এসেছিল। তিতিকে বাগানে কোথাও পুঁতে রেখে গেছে তারা।

নাগেশ্বরের এই অন্বেষণের পেছনে আছে এই ক্ষুদ্র ইতিহাস।

একবার ভাবলাম নাগেশ্বরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই এবার। তিতিব সমাধি খুঁজে বের করে আর লাভ কি? তার চেয়ে নাগেশ্বর চিরকাল জানুক—তিতি এই বাগানের কোন নিভৃতে মাটির নীচে একাকিনী অভিমানিনীর মত বসে আছে। সে আর ধরা দেবে না।

কিন্তু নাগেশ্বর আজ যেন প্রতিজ্ঞা করেই বার হয়েছে। তিতি না দেখে ফিরবে না।

বললাম,—তিতিকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। ও মরে গেছে। আর ওকে খুঁজে লাভ নেই নাগেশ্বর। তিতিকে আর পাওয়া যাবে না।

নাগেশ্বর জিজ্ঞাসা করলো—কোথায় পুঁতেছে?

—আচ্ছা, চল খুঁজে দেখি।

তিতির সমাধি খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু এই বিরাট বাগানের কোথায় কোন্ নিভৃতে কয়মুষ্টি ধূলির সঙ্গে তিতি মিশে আছে কে জানে!

কত লতামণ্ডপ পার হলাম। বনবাদাড়ের আশে পাশে ঘুরে এলাম। একটা মরা পাতকোর কাছে দেখলাম নতুন রকম মাটির ছোট একটা ঢিপি—কিন্তু তিতির সমাধি নয়—একটা খরগোস নতুন বাসা করেছে।

শেষে নাগেশ্বর নিজেই খুঁজতে লাগলো। আমি তার অনুগামী হয়ে রইলাম মাত্র। ঘুরে ঘুরে কদমের বনের কাছে এসেছি, নাগেশ্বর চুপ করে তাকিয়ে দেখছিল মাটির দিকে। গাছতলায় পুরানো কদমের কেশর আর কাদা মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে আছে। অনেকক্ষণ ধরে সেখানে সে চেয়ে কী দেখলো সে-ই জানে। তারপর অন্য পথে এগিয়ে চললো।

আমরা এসে থামলাম একেবারে খালের জলের ধারে। নাগেশ্বর তার পকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ বের করে নানাভাবে ভাঁজ করলো—তৈরী হলো একটি কাগজের নৌকা। খালের জলে নৌকাটিকে ছাড়া মাত্র বাঁশঝাড় থেকে একটা ব্যাকুল হাওয়ার দমকা তর তর করে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

একটু দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। নাগেশ্বর তেমনি পরিতৃপ্তি ভরা দৃষ্টি দিয়ে কাগজের নৌকাটা দেখছিল। গত শ্রাবণেই বোধ হয় কোন একটি বর্ষণ সজল বৈকালে তারা দুজনে একসঙ্গে কাগজের নৌকা ভাসিয়েছিল।

নাগেশ্বর আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার অন্বেষণ যেন সব দিক দিয়ে এতক্ষণে সার্থক হয়ে উঠেছে। সমাধিস্থা তিতি যেখানেই থাক্, নাগেশ্বর যেন কিছুক্ষণের জন্য তিতিকেই কাছে পেয়েছে। নাগেশ্বরের চোখে সেই শ্রাবণ বৈকালের মেঘঘন ছায়া পড়লো কিছুক্ষণের জন্য।

শিল্পীর স্বাধীনতা

চতুর্দশ লুই একবার দার্শনিক স্পিনোজাকে অনুরোধ করেছিলেন : আপনার একটি গ্রন্থ আমার নামে উৎসর্গ করুন। তাহলে আমি আপনার জন্যে আর্থিক সাহায্যের একটি আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করবো।

গরীব দার্শনিক স্পিনোজা কিন্তু ফরাসীরাজের এই অনুরোধ ও অনুকম্পা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। স্পিনোজার জীবনের শেষ ঘটনা এই যে, তিনি যক্ষ্মা রোগে মারা গেলেন। শেষ মুহূর্তে যে ডাক্তার স্পিনোজার শয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন, তিনি মৃত দার্শনিকের ঘরের একটিমাত্র মূল্যবান বস্তু, রূপোর হাতল লাগানো একটি ছুরিকাকে তাঁর দক্ষিণা হিসাবে হাতে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শিল্পীর স্বাধীনতা বলতে নিশ্চয়ই এই সাধারণ সত্যটিকেই বোঝায় যে, শিল্পী তাঁর চিন্তায় ও কল্পনায় স্বাধীন হবেন। কিন্তু স্পিনোজার জীবনের ঘটনা আরও একটি সত্যের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। শিল্পীর ব্যক্তিত্বেরও স্বাধীনতা চাই। এবং স্পিনোজা কেন যে রাজানুগ্রহের সেই শর্ত অস্বীকার করেছিলেন, সেটাও বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

শিল্পের স্বাধীনতার যে-সব বিঘ্ন আছে, তার মধ্যে এই বিঘ্নটিও কম ভয়াবহ নয়। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব যদি কোন অনুগ্রহের শর্তের কাছে বিকিয়ে যায়, তবে সেই শিল্পীর চিন্তা ও কল্পনার সৃষ্টিও নিজস্বতার গৌরব রক্ষা করতে পারবে না। আলেকজাণ্ডার দ্বিতীয় একজন হোমার খুঁজেছিলেন, যিনি আলেকজাণ্ডারের জীবন-কাহিনী নিয়ে একটি মহাকাব্য লিখবেন। সুখের বিষয়, একজন দ্বিতীয় হোমার পাওয়া যায়নি। যদি পাওয়া যেত, এবং রাজার আজ্ঞাবহ সেই কবি আলেকজাণ্ডারী মহিমার একটি মহাকাব্য সত্যিই রচনা করতেন, তবে কাব্য জগতে একটা মিথ্যার পিরামিড রচনা হতো। তার মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্য ও বিস্ময়ের প্রকৃত সত্যস্বরূপটির প্রকাশ স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারতো না। ভারতীয় কবি চাঁদ বরদই 'পৃথ্বীরাজ রাসো' কাব্য লিখেছেন। কিন্তু কাব্য নামে আখ্যাত এই পৃথ্বিরাজ রাসো বস্তুত পদ্যে লেখা ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে হয়তো কিছু ভাষার ঝংকার মাঝে-মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু যে ভাব ও অনুভবের ব্যঞ্জনায় মানবীয় জীবনের কাহিনী যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে, তার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না।

সাহিত্যের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সত্য এই যে, শিল্পী তাঁর চিন্তা, কল্পনা ও উপলব্ধির স্বাধীনতাকে বাইরের কোন ইচ্ছা, নির্দেশ, অভিরুচি অথবা প্রভুত্বের সন্তুষ্টির জন্য খর্ব করে দিতে পারেন না। যদি দেন, তবে তাঁর সৃষ্টি বড়জোর একটা প্রচারকৃতিত্ব হয়ে উঠবে, কিন্তু সত্যিকারের আর্ট হয়ে উঠতে পারবে না।

কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে। খুবই কঠিন প্রশ্ন। শিল্পীর চিন্তা ও কল্পনার নিরঙ্কুশ স্বাধিকার কি এই যে, তাঁর সৃষ্টি ও রচনা সমাজ ও রাষ্ট্রের সামরিক কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ সম্পর্কে আত্মসংযমের কোন মাত্রা স্বীকার করবে না? আমাদের দেশের সরকারী নীতিতেও দেখা যায়, এক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা আছে। কারও ধর্মবিশ্বাসের উপর রূঢ় আঘাত হয়ে উঠেছে, এমন গল্প ও উপন্যাসকে সরকার নিষিদ্ধ করে দেবেন। সাম্প্রদায়িক অশান্তির প্রয়োচনা হতে পারে, এমন কাহিনী, সেটা যতই আর্টসুন্দর হোক না কেন, তাকে নিষিদ্ধ করবার দায়িত্ব সরকার অস্বীকার করতে পারেন না। শ্লীলতা ও শালীনতা সম্পর্কে গোঁড়া

ধারণার বিরুদ্ধে আর্টের অভিযোগ যতই যুক্তিসিদ্ধ হোক না কেন, একটা সীমা নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যা লঙ্ঘন করে গেলে আর্ট আর আর্ট থাকে না। সরল সত্য এই যে, আর্টের স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচার কখনও সমর্থন পেতে পারে না।

মনে হয়, ব্যক্তির অধিকার ও শিল্পীর অধিকারের মধ্যে যে নীতিগত একটি প্রভেদ আছে সেটা বুঝতে ভুলে যাওয়া হয় বলেই ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার খর্বতাকে শিল্পীর শিল্পগত অধিকার ও স্বাধীনতার খর্বতাসাধন বলে অভিযোগ করা হয়। কোন দেশে সামাজিক সভ্যতার ইতিহাসে কোথাও এমন ব্যাপার সম্ভব হয়নি যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ কল্যাণ ও প্রয়োজনের কাছে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে বিশেষ একটি আনুগত্যে নিয়মিত না করে একেবারে অবাধ ও নিরঙ্কুশ করে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা এক নয়। জন বানিয়ান কারাগারের কুঠুরীতে কঠোর বন্দীজীবনের অধীনতার মধ্যেই 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস' লিখেছিলেন। শিল্পীর ব্যক্তিত্ব তাঁর আন্তরিক সম্পদ। এবং ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতাকে শিল্পী যদি নিজে বিপন্ন না করেন, তবে তাঁর পক্ষে যে-কোন বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও যথার্থ আর্টের সৃষ্টি অসম্ভব নয়।

ভয় সেখানে, যেখানে রাষ্ট্রের অথবা সামাজিক কোন সংস্কারের শাসনে ব্যক্তির এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বই সহজ আগ্রহে, স্বাধীন সন্ধিৎসা ও অনুশীলনে এবং স্বচ্ছন্দ প্রসন্নতার সঙ্গে গড়ে ওঠবার সুযোগ পায় না। সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ এবং প্রমাণ আছে যে, একনায়কের দেশে, বিশেষ করে কম্যুনিস্ট একনায়কতার দেশে এমন ট্র্যাজেডি ঘটেছে। মাননীয় ক্রুশ্চফ নিজেই অভিযোগ করে বলেছেন যে, আধুনিক এক হাজার সোভিয়েট লেখক বস্তুত এক হাজার 'ডেড-সোল', মৃত-আত্মা। আমাদের দেশে কম্যুনিস্ট রাজনীতিকের প্রচারের প্রয়োজন হিসাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্রষ্টা লেখককে ব্যক্তিত্ববিহীন একটা প্রতিধ্বনি করে তোলবার চেষ্টা হয়েছে। সোভিয়েট লেখকের লেখায় রাষ্ট্রিক ইচ্ছা ও নির্দেশের ভজনা আর্ট হিসাবে যতই ব্যর্থ হোক না কেন, অন্তত দেশপ্রীতি তথা জাতি-প্রীতি হিসাবে তার কিছু সার্থকতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট সাহিত্য নিতান্ত একটি কপট সৃষ্টি ; সেটা বস্তুত দেশপ্রীতির বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতক প্রচেষ্টার নিদর্শন।

কার্ল মার্ক্স নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ মনীষী। কিন্তু তাঁর মনস্বিতা প্রায় একশত বছর আগের একটি চিন্তাক্রিয়ার ব্যাপার। মার্ক্সের অভিমত আজকের পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মনীষার কাছে নিতান্ত সেকেলে একটি আবেদন মাত্র। বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রয়োজনের পক্ষে মার্ক্সীয় অভিমতের দাবি বস্তুত জীর্ণ অতীতের দাবি। দুঃখের বিষয়, মার্ক্সের পুঁথির লেখা অবলম্বন করে এবং লেনিনের নাম নিয়ে সেকালের কেতাবী ধর্মোন্মাদনার মত একটা রাজনীতিক মতবাদের উন্মাদনা জাগিয়ে তোলা হয়েছে। এই মতবাদ, এই কম্যুনিজম্ যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের, তেমনিই শিল্পীরও চিন্তা ও কল্পনার স্বাধীন প্রকাশ সহ্য করতে চায় না।

হাজার বছর ধরে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উপর অ্যারিস্টটলের শাসন অপ্রতিহত ছিল। বিজ্ঞানের চরম সত্য অ্যারিস্টটল লিখে দিয়ে গিয়েছেন, তার বাইরে বিজ্ঞানের আর কোন সত্য নেই, থাকতেও পারে না—এই ছিল কয়েক শতাব্দীর ইউরোপের ধারণা। অ্যারিস্টটলের ধারণার প্রতিবাদ করে যে বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, স্পঞ্জ জড় পদার্থ নয়, জলজ প্রাণী ; তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে,

অ্যারিস্টটলের বৈজ্ঞানিক বক্তব্যকে চরম সত্য বলে মেনে নেবার ফলে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের বিজ্ঞানে নতুন কোন আবিষ্কারের সাড়া জেগে উঠতে পারেনি। আজকের পৃথিবীর মানুষের পক্ষেও সন্দেহ করবার আর ভয় করবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে মার্ক্সীয় অভিমতকে একটা চরম রাষ্ট্রিক, অর্থনীতিক ও সামাজিক সত্য বলে মেনে নিয়ে কম্যুনিজম্‌ও স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার অভিব্যক্তি স্তব্ধ করে দিতে চাইছে।

ফ্রান্সেও একদিন চিন্তার বিপ্লব এবং রাষ্ট্রের বিপ্লব ঘটেছিল। ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব প্রায় সব সভ্যদেশের চিন্তার উপর কিছু না কিছু আলোড়ন জাগিয়েছিল। কিন্তু সেটা কোন জাতি বা দেশের প্রতিভা ও মনীষার পক্ষে কোন ক্ষতির হেতু হয়নি। আমাদের রাজা রামমোহন রায়ও ফরাসী বিপ্লবের পতাকাকে অভিবাদন করে সুখী হয়েছিলেন। কিন্তু ফরাসীর বিপ্লবের পক্ষ থেকে কোন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার অন্য কোন দেশের কানের কাছে একথা বলেনি যে, এইভাবে কবিতা লিখতে হবে, এই কথাই সাহিত্যের আসল কথা এবং এটাই খাঁটি আর্ট। কম্যুনিজম্‌ই একমাত্র মতবাদ, যা বিশেষ রাষ্ট্রের রাজনীতিক স্বার্থের নির্দেশে ও ইচ্ছায় অন্য দেশেরও সাহিত্য-জীবনের উপর একটা শাসন জাহির করতে চেষ্টা করেছে। রুশিয়ার কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রবিপ্লব সত্যিই ইতিহাসের একটা নির্দোষ অভিনবতার ঘটনা হতো, যদি অন্য জাতি ও দেশের উপর কম্যুনিজমের অভিযান পরিচালিত করবার চেষ্টা না হতো। অতীতের ইতিহাসের বিশেষ একটি অধ্যায়ে দেখা গিয়েছে, কেতাবী ধর্মের প্রচার-উন্মাদনা অন্য ধর্মের দেশের উপর সশস্ত্র অভিযান না চালিয়ে পারেনি। কম্যুনিজম্ নামে এই কেতাবী রাজনীতিক উন্মাদনাটিও ঠিক তেমনি এক-একটি পার্টি হয়ে অন্য দেশের জাতীয় জীবনের স্বচ্ছন্দ অভিব্যক্তির বিপন্নতা ঘটিয়ে চলেছে। চীন আমাদের দেশকে আক্রমণ করেছে। তবু দেখতে পাওয়া গিয়েছে, চীনের মহত্ত্বের প্রশস্তি আমাদের দেশের কোন কোন মানুষের লেখা কাহিনী কবিতায় ও নাটকে মুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে। এমন ঘটনাকে একটা অভিশাপের দুঃসাহস বলে মনে করে দেশের মানুষের মন এবং দেশের সাহিত্য-জীবন যদি সতর্ক না হয়, তবে খুবই ভুল করা হবে। জুপিটার যাকে হত্যা করতে চায়, আগে তার বুদ্ধির বিনাশ সাধন করে। আজ পর্যন্ত যা দেখা গিয়েছে, তাতে এই ভয়ানক সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের দেশের কম্যুনিজমের প্রচারের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো শিল্পীর চিত্তের সহজ দেশপ্রেমের আগ্রহটির বিনাশ সাধন করা। জাতির ঐতিহাসিক জীবনের কোন মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করা, এমন কি গঙ্গা হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্দনাও নাকি শিল্পী-মনের অধোগতি। এবং স্টালিনকে কবিতায় মা বলে ডাক দেওয়াই প্রগতি।

কম্যুনিস্টের প্রচারিত এই ভয়ানক কপট প্রগতির মোহ কিছু-কিছু নিরীহ অথচ অসতর্ক শিল্পী ও লেখকের উদ্‌ভ্রান্তির হেতু হয়েছিল। সুলক্ষণ এই যে, তাঁদের মোহভঙ্গ হয়েছে। সবচেয়ে বড় আশার কথা এই যে, দেশের মানুষের মন সাবধান হয়েছে।

করুণাধারায় এসো

একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না, যদি বলি যে আমরা নতুন ভারতের আটটি মহাস্থান দেখে ফিরে এসেছি, যেখানে বিজ্ঞানবান মানুষেরই সংকল্প আগ্রহ ও প্রয়াসের স্পর্শ লাভ করে জল মাটি আর উত্তাপের পদার্থধর্ম মানুষেরই কল্যাণকর এক বৈভব আহ্বানের জন্য নতুন শক্তিপীঠ রচনা করেছে। তিলাইয়া, কোনার, পাঁচেট, মাইথন আর দুর্গাপুর। আর, বোকারো,

সিন্ত্রি ও চিত্তরঞ্জন।

দেশের সরকার জাতীয় সমৃদ্ধি সৃষ্টির জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সেই পরিকল্পনার একটা হিসাবী রূপ আছে। কত টাকা খরচ হবে, কত খরচ করা হলো, আরও কত বেশি খরচ করা উচিত ছিল এবং আরও কত কম খরচ করা যেত ইত্যাদি ঘোষণা প্রশ্ন ও বিতর্কের ধারাপাতে সংসদভবন রাজনীতিকেরা আর বিশেষজ্ঞেরা পরিকল্পনার গায়ে যেভাবে আর যেসব অঙ্ক দাগিয়ে দিয়ে থাকেন, তা'তে বেচারা পরিকল্পনাকে সব কল্পনা হারিয়ে শুধু একটা রাশভারি তথ্য হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু পরিকল্পনার এই অঙ্ককণ্টকিত হিসাবী রূপটাই তার একমাত্র রূপ অথবা আসল রূপ নিশ্চয়ই নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে যাঁরা সম্প্রতি দামোদর উপত্যকার চারটি বাঁধ ও একটি ব্যারেজ নির্মাণের কাজ আর বোকারো সিন্ত্রি ও চিত্তরঞ্জন দেখে এসেছেন, তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে দেরি হয়নি যে, পরিকল্পনার এই প্রত্যক্ষ বাস্তব নয়নাভিরাম ও কল্যাণশীল রূপের সঙ্গে তাঁদের মনে কোন প্রশ্ন আর কোন তর্ক নেই। তীর্থযাত্রিকের মতোই মুগ্ধ প্রসন্ন ও হর্ষোজ্জ্বল চক্ষের দৃষ্টি নিয়ে তাঁরা এক একটি বিরাট বিজ্ঞানময় বিগ্রহেরই দিকে তাকিয়ে দেখেছেন।

দেশের বর্তমান—বহু সমস্যা, বেদনা ও বাধায় আক্রান্ত জাতির বর্তমান তার ভবিষ্যৎকে জল, মাটি আলোক ও উত্তাপের করুণা দিয়ে তৈরী এক সুখীজীবনের উপহার সঁপে দেবার জন্য যেন সুবৃহৎ প্রতিজ্ঞায় ও বিপুল ব্যস্ততায় কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমগ্র আয়োজনকেই এক বিরাট কল্যাণের স্থাপত্য বলে মনে হয়। দর্শকের চক্ষে বর্তমানের চেয়ে নিকট-ভবিষ্যতের আর দূর-ভবিষ্যতের এক ছবি বেশি স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। প্রতি জনপদ হৃদয়ে যেন তৃপ্তি ঋদ্ধি ও শক্তির দীপ জ্বলে উঠতে পারে, তারই জন্য এই প্রয়াসের যজ্ঞ। বর্তমান ভারত যেন এক বাৎসল্য ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তার ভবিষ্যতের জন্য তৈরী ক'রে রেখে দিয়ে যাচ্ছে শক্তির আধার আর সম্পদের সঞ্চয়। সুখী হোক্ তারা, যারা আসছে। সুখী হবে তারা, যারা আসবে।

প্রত্যুষের শীতার্ত বাতাস গায়ে মেখে তিলাইয়া বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে যখন জলে টলমল সুবিস্তীর্ণ হ্রদের শোভা দেখছিলেন সাহিত্যিক বন্ধুরা, তখন তাঁদের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল, অনাগত কালেরই এক সম্পন্ন মূর্তির মুখের হাসির দিকে তাকিয়ে রয়েছে মনের কল্পনা, আর মনে পড়ছিল সেই বৌদ্ধ প্রার্থনার কথা। ভূতো বা সম্ভবেসি বা সবেব সত্তা ভবন্তু সুখিতত্তা। অতীতে যারা ছিল, আর ভবিষ্যতে যারা আসবে তারা সুখী হোক সকলে। যে প্রাণ অতীত হয়ে গিয়েছে, তার জন্য সুখ প্রার্থনা করা অবশ্যই গভীর আত্মিক অনুভবের ব্যাপার, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি যে চিত্ত স্নেহাভিষেক লাভ করে, সেই চিত্তের অনুভবও বাস্তবিকতার দিক দিয়ে বেশি সুন্দর বলেই তো মনে হয়।

মনে পড়েছিল আর একটি কবিতার কথা। ভারতচন্দ্রের কবিতার সেই ঈশ্বরী পাটনীর কথা। অন্নপূর্ণার কাছে যে-কোন সুখের বর প্রার্থনা করতে পারতেন দরিদ্র ঈশ্বরী পাটনী। কিন্তু ঈশ্বরী পাটনী শুধু চাইলেন—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'। ঈশ্বরী পাটনীর এই প্রার্থনার মধ্যে মানব-জাতিরই জীবনবাদের একটি বড় তত্ত্ব রয়েছে বলা যায়। যেমন পারিবারিক জীবনে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবনেও ঐ তত্ত্ব শ্রেয় সৃষ্টি করে এসেছে। শ্রেয়ধর্মী মানুষ তার বর্তমানকে গ্রহণ করে স্বার্থ হিসাবে নয়, পরার্থ হিসাবেই। ভবিষ্যতের

প্রতি মমত্ববোধই মানবজাতির ও রাষ্ট্রের বর্তমানের আচরণ ও সংকল্পকে রূপ ও গঠন দান ক'রে থাকে। ভবিষ্যতের সুখের জন্য বর্তমানকে দুঃখ স্বীকার করতেই হয়, এই তো মানবিক সভ্যতার রীতি।

তাই কল্পনা করলে দোষ কি, তিলাইয়া বাঁধের জলে টলমল করছে বর্তমানের দুঃখী ভারতেরই এক বিপুল মমত্ববোধের সম্ভার। ভবিষ্যতের সন্তানেরা যেন দুধে-ভাতে থাকে, পরিকল্পনার অন্তরে নিহিত এই কল্পনার মাধুর্যটুকু উপভোগ করতে করতেই আমাদের চোখের সম্মুখে প্রত্যূষের আকাশের মেঘমেদুরতা মুছে গিয়ে আলো ঝলক দিয়ে উঠলো। ইঞ্জিনিয়ার নির্দেশ দিলেন, বাঁধের চারটি দুয়ার ঈষৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল। প্রবল ধারায় উচ্ছল হয়ে ছুটে নীচে গড়িয়ে পড়লো কংক্রিটে গাঁথা বাঁধের বুক ছাপিয়ে বরাকরবক্ষের পুঞ্জীভূত জলভার। যে দুরন্ত জল অন্ধ আবেগে উধাও হয়ে যেত, সেই জল মানুষের বিজ্ঞানের স্পর্শ পেয়ে করুণাধারা হয়ে গিয়েছে। বরাকরের জলভার আজ আর নিজেকে ব্যর্থ ক'রে দিতে পারবে না। বর্ষার বরাকরও আজ তার জলের ঢল আর ভয়াল ক'রে তুলতে পারবে না। বিজ্ঞানই যেন বরাকরের জলকে ডাক দিয়ে বলছে—করুণাধারায় এসো। বিজ্ঞানের প্রতি আজকের মানবজাতিব মনে যে ঐ একই প্রার্থনা—মানুষের এই অন্নময় সংসারের জীবন যখন শুকায়ে যাবে, তখন তুমিই করুণাধারায় এস। আজ কল্যাণ সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেছে বরাকরের জল।

ছোটনাগপুর উপত্যকার তিনটি দুরন্ত নদীর উদ্‌ভ্রান্ত জলপ্রবাহকে করুণাধারায় পরিণত করার আয়োজন সার্থক হতে চলেছে। আজ এই পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপে যা দেখলাম, দশ বছর আগে একটি গল্পে বর্ণিত কল্পনার মধ্যে তারই আভাস দেখেছিলাম। খুশি হয়ে দেখলাম, গল্পের সেই কল্পনায় আর বাস্তবে কোন প্রভেদ নেই। সেই কল্পনাই এতদিনে শরীরী হয়ে উঠেছে পাঁচটি বাঁধের বিচিত্র নির্মাণ পর্বের নানা যান্ত্রিক আয়োজনের মধ্যে। গল্পটা ছিল এক কল্পিত নিমিয়াঘাটের কাছে এক কল্পিত লালকি নদীর বাঁধ রচনার গল্প। এখন তিলাইয়া বাঁধ নির্মাণের পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে। বাঁধ নির্মাণের কাজ চলছে কোনার, পাঁচেট, মাইথন আর দুর্গাপুরে। আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের শক্তি যেন লীলাচ্ছলে জল ও মাটিকে নিয়ে এক অদ্ভুত স্থাপত্যের খেলা খেলছে। বিচিত্র এর রূপ, বিচিত্রতর এর বিস্ময়। কোনারের বুকের বালুকার উপর দাঁড়িয়ে দশ বছর আগের গল্পের সেই লালকি নদীর বাঁধের কথাই মনে পড়ে গেল :

'লালকি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্তি। উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার উপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক একটা কংক্রিটের চাঙড় তুলে নিচ্ছে, পর মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনের উপর স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর উপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শাণিত দন্তুর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাসছে। নিমিয়াঘাটের এই বেলে মাটির তেপান্তরে লালকি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনি ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়।...কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম করবে ব'লে সঙ্কেতের অপেক্ষায় চুপ ক'রে রয়েছে।

সত্য কথা, এ'ও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির যা-ইচ্ছে-তাই খেয়ালের বিরুদ্ধে। লালকি নদীর চওড়া খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিল সত্তার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুকনো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্ চিক্ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলে মাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গিয়েছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুর এইখানে জল বাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গিয়েছে।

মানুষের বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে, আবাদ করলে ফলত সোনা। নিমিয়া-ঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লালকি নদীর খামখেয়াল শান্ত করে দিতে হবে, এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে। পনরটি খিলানকরা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌসুমী বৃষ্টি এই লালকি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, কিন্তু সবই বৃথা। এক অন্ধ বেগ সব জলভার লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গড়ে উঠছে বাঁধ। এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, আপাতত সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গিয়েছে। ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গিয়েছে। এই খাল দিয়ে লালকি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে, উর্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। ···মিটার গেজ রেল লাইন বসছে এখানে। এরই মধ্যে সিমেন্টের কারখানা খুলবার বন্দোবস্ত হয়ে গিয়েছে। বাঁধটা শেষ হয়ে যাক্, তখন বিরাট একটা পাওয়ার স্টেশন বসবে, সঙ্গে এক জোড়া টার্বাইন। ছে'ষট্টি হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্যন্ত ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।···এই যে পড়ে রয়েছে টন টন স্যাদা বেলেপাথরের ধুলো, এ সব তখন গলে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে এক কাঁচের কারখানায়।

তাই মনে হয়, পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এইখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থ-জগতের অকৃপার বিরুদ্ধে, নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত ক'রে জল-ও মাটিকে মানুষেরই পদার্থজ্ঞানের দাস করে রাখতে।

আবার মনে হয়, না, এ'তো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ নয়, এ যে জল-মাটির সঙ্গে মানুষের মিতালি পাতাবার এক নতুন আয়োজন।·জড়ের সংসার যেন মানুষকে ডাক দিয়ে বলছে—'আমারই প্রেমের নিয়মগুলি জেনে নিয়ে তুমি আমাকে তোমার আপন ক'রে নাও, তুমি তো আমার পর নও।'

বাঁধ নির্মাণের কর্মব্যস্ত আয়োজনের মধ্যে আধুনিক যন্ত্রের, উন্নত যন্ত্রের আর উচ্চশক্তি যন্ত্রেরই সমারোহ বেশি চোখে পড়ে, গতরখাটা মজুরের সংখ্যা কম। উচ্চশক্তির ডিজেল-ইঞ্জিন চালিত এক একটি বুলডজার আর শোভেল হাজার শ্রমিকের হাতের শক্তি ও দক্ষতার চেয়ে শতগুণ বেশি শক্তি ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায় কাজ সেরে দিচ্ছে। সুতরাং প্রথমে একটা অভিযোগ অথবা সন্দেহের খটকা মনে লাগে, এই সব উচ্চশক্তি যন্ত্রের সাহায্য কি হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ নাশ ক'রে দিচ্ছে না? কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বললেন যে, বাঁধ নির্মাণের এই উদ্যোগের রীতিনীতির মধ্যে একটা প্রধান বিষয় হলো দ্রুততা। কারণ বিশবছরের মধ্যে নয়, আর দুই বা তিন বছরের মধ্যে বাঁধের নির্মাণ

সম্পূর্ণ করতে হবে। উচ্চশক্তির যন্ত্র ব্যবহার না ক'রে, নির্মাণকার্য মন্থর ক'রে কয়েক হাজার বেশি সংখ্যক শ্রমিককে আরও কয়েক বছর কাজের সংস্থান দান করলে যে পরিমাণ জনকল্যাণ সাধিত হয়েছে বলে মনে হবে, তার চেয়ে বেশি পরিমাণ জনকল্যাণ হতে পারবে, যদি বাঁধ অল্পকালের মধ্যেই সমাপ্ত হয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ারের এই বক্তব্য শোনার পর যন্ত্রবিরোধী সন্দেহটাকে আর একবার বিচার ক'রে নিয়ে বুঝলাম, ঠিকই বলেছেন ইঞ্জিনিয়ার। এই বাঁধই ভবিষ্যতের বহু লক্ষ মানুষের জীবিকা ও কর্মের নতুন সুযোগ, নতুন উপায় ও নতুন সংস্থান সৃষ্টি করবে। বাঁধের নির্মাণকার্যের দ্রুততার জন্য উচ্চশক্তির ও উন্নত যন্ত্রের প্রয়োজন বর্তমানে কয়েক হাজার শ্রমিকের সাময়িক কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত করলেও নিকট ভবিষ্যতে বৃহত্তর কর্মসংস্থান রচনার সম্ভাবনা নিকটতরই করেছে।

বলেছি, অনেকেই তীর্থযাত্রিকের মতো আগ্রহ ও শ্রদ্ধা নিয়ে এই আটটি মহাস্থানের এক একটি বিজ্ঞানময় বিগ্রহকেই দেখছিলেন। মাদুরার মন্দির অথবা আগ্রার তাজমহলের দিকেও এইরকমই শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের ভাব চোখে নিয়ে পথিক তাকিয়ে থাকেন। কারণ, এই সব স্থাপত্যের মধ্যে শিল্পী মানুষ, সাধক মানুষ এবং ভক্ত-মানুষের অন্তরেরই এক বিরাট আগ্রহের ইতিহাস রূপ গ্রহণ করেছে। ভারতের অতীতের কীর্তিকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আধুনিক ভারতেব এই কীর্তিগুলিব প্রতি কয়েকজন সহযাত্রী সাহিত্যিক বন্ধুর মনের যে অনুভবের পরিচয় পেলাম, সেটা জাতির আর একটি বাস্তব ও সত্য ঐতিহাসিক গৌরবেরই ঘোষণা। আধুনিক ভাবত এই যে বিরাট কল্যাণের স্থাপত্য রচনা ক'রে চলেছে, এর মধ্যে কিন্তু অতীতের মতো সেই দাস-শ্রম নিয়োগের দুঃখকর কোন ব্যাপার নেই। সুতরাং অতীতের তুলনায় বর্তমানের এই কীর্তিগুলিকে যদি একটু বেশি নীতিনিষ্ঠ, একটু বেশি শুচি ব'লে মনে করি, তবে নিশ্চয়ই ভুল করা হবে না। শুধু অতীত কেন, বর্তমান বিশ্বেই কোন কোন শক্তিমান রাষ্ট্রে লক্ষ মানুষের শরীরকে রূঢ় ও কঠোর দাসশ্রমের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রে এবং দেশের মানুষকে শ্রমিকের কাজে 'কন্‌সক্রিপট্' ক'রে, যেভাবে পথ-ঘাট ও বাঁধ রচনার কাজে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে, সেই রকম কোন অন্যায়ের কলুষ আধুনিক ভারতের এই কীর্তিগুলির দেহে অলক্ষ্য বেদনার স্মৃতি রেখে যাবে না। হ্যাঁ জানি, যে সাঁওতাল ছেলে আর মেয়ে এই বাঁধের জন্য মাটি কাটছে, তার অর্জিত মজুরী তার ভাত-কাপড়ের সব অভাব মিটিয়ে দিতে পারছে না। কিন্তু তারা কোন দোর্দণ্ড প্রভুর কশাঘাতে চালিত অনিচ্ছার জীবের মতো কাজ করছে না। দামোদর বাঁধের মজুরেরা গান গায়। তাদের মজুরী কম, তাদের মজুরীর পরিমাণ আরও বেশি হলে ভাল হতো। কিন্তু আমরা অন্ততঃ এইটুকু গর্ব করবো যে, ভারতের আগামীকালের মানুষের জন্য যে সাঁওতাল মজুর আজ গতর খেটে সমৃদ্ধি ও কল্যাণের মঙ্গলেষ্টক স্থাপন করে দিয়ে যাচ্ছে, তারা অতীতের ভারতের অথবা আধুনিক কয়েকটি প্রগতিবাদী রাষ্ট্রের রীতির মতো কোন প্রভুত্ববাদের দ্বারা তাড়িত ও পালিত কতগুলি দাস-শ্রমিক নয়।

তিলাইয়া বাঁধের নিকটে রেস্ট হাউসের সম্মুখে ফুলের শোভায় আচ্ছন্ন লনের উপরে বসে আমরা, অর্থাৎ কলকাতা থেকে আগত অতিথিদের দল টেবিলের উপর ঝুঁকে নানা সুখাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করছিলাম, তখন দেখেছিলাম ময়লা একটা মোটা সুতির চাদরে শরীর মুড়ে লনের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে একটি দরিদ্র চাষীর মূর্তি। এগিয়ে যেয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ময়লা চাদরে জড়ানো সেই চাষীর মূর্তি তার

পরিচয়ও জানিয়ে দিল, তার নাম ঝালো মাহাতো।

ঝালো মাহাতোর চোখের দৃষ্টিটা অদ্ভুত, এবং তার বক্তব্যও অদ্ভুত। ঝালো মাহাতো আমাদেরই জিজ্ঞাসা করলো—এই সব বাঁধ-টাঁধ তৈরী ক'রে কারও কি কোন উপকার হবে বাবু?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমার তো মনে হয়, কারও কোন উপকার হবে না—শুধু আমাদের মতো গরীবের ক্ষতি হবে।

তার ক্ষতি কি হবে, সেটা অবশ্য ঝালো মাহাতো পরিষ্কার ক'রে বলতে পারলো না। ডি-ভি-সি' তার চাষের জমি নিয়েছে। যেখানে তার গ্রাম আর ঘর ছিল, সেখানে এখন বাঁধের জল টলমল করছে; কিন্তু ফসলের 'হরজানা' পেয়েছে ঝালো মাহাতো, জমির বদলে অন্য জমিও পেয়েছে। কিন্তু তবুও তার চিত্ত প্রসন্ন নয়। নতুন জমি তার পছন্দ হয়নি। ঝালো মাহাতো বললে—তার আগের জমি অনেক ভাল জমি ছিল। ঝালো মাহাতোর শেষ অভিযোগ, তার অভাব আর দুঃখ রয়েই গিয়েছে, একটুও কমেনি।

সব প্রশ্নের ঠিক যুক্তিসহ উত্তর দিতে পারছিল না ঝালো মাহাতো। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর সে ইচ্ছা ক'রেই এড়িয়ে গেল। আবার এমন অনেক কথা বললো, যেগুলিকে সে নিজেই পরক্ষণে অস্বীকার ক'রে বললো—ঠিক নখই বাবু, উ সব ঠিক নখই।

ঝালো মাহাতোর অনেক অভিযোগেরই ভিত্তি নেই, আবার কোন কোন অভিযোগের ভিত্তি আছে। তিলাইয়ার বরাকরেব বাঁধ এখনো তার জীবনে কোন নতুন সুখের উন্মেষ সৃষ্টি করতে পারেনি, এটা একটা বাস্তব সত্য এবং এর জন্য যদি এই গরীব চাষীর মনে একটা সংশয় প্রবল হয়ে ওঠে, তবে সেটাও স্বাভাবিক বলে ধরে নিতে হবে। দ্বিতীয় কথা, বাঁধের জন্য যে মাটি তাকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে, সেই মাটির স্মৃতি তার মনের ভিতরে একটা বেদনা আর আক্ষেপ সৃষ্টি করবেই। এই দুই কারণে অপ্রসন্ন হয়ে রয়েছে ঝালো মাহাতোর মন। তিলাইয়ার বাঁধকে তার জীবনের আত্মীয় ব'লে এখনো মনে করতে পারছে না ঝালো মাহাতো। তার ধারণা, ঐ বাঁধ দেশের বড়লোকদেরই এক নতুন খেয়াল।

সেই গল্পের কল্পিত লালকি নদীর বাঁধকেও ঠিক এইরকমই সংশয়ের চক্ষে দেখেছিল আর ঘৃণা করেছিল কল্পিত নিমিয়াঘাটের চাষী তিলক রায়। ঝালো মাহাতোকে দেখে গল্পের তিলক রায়ের কথাও একবার মনে পড়েছিল। রেস্ট-হাউসের লনের ফুলের শোভার মধ্যে আমাদের ভোজনোৎসব, আর ঝালো মাহাতোর বর্তমান জীবনের বিবর্ণ ময়লা চাদর, এই দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান ঘুচে না যাওয়া পর্যন্ত ঝালো মাহাতোর মতো চাষীর পক্ষে আমাদের পরিকল্পিত কল্যাণগুলিকে আপন ব'লে মনে করতে ও বুঝতে অসুবিধা হবে বৈকি।

বাঁধের নির্মাণের আয়োজনে কাজ করছে যেসব পুরুষ আর মেয়ে মজুর, তাদের মনে ঝালো মাহাতোর মতো সংশয়াপন্ন বিবর্ণতার পরিচয় পাইনি। শালবনের মাঝখানে ছোট পাহাড়ে ঘেরা ভূখণ্ডের নিভৃতে কোনার বরাকর ও দামোদরের মাটি, বালু আর পাথরকে সরিয়ে আর সাজিয়ে দেবার যে কাজ তারা করছে, সে কাজের আনন্দ মাঝে মাঝে হাসি-কলরব আর গান হয়ে ফুটে ওঠে তাদের মুখে। আর খুশি হয়েছে তারা, যাদের গ্রামগুলি এইসব বিরাট বাঁধের ছোট ছোট প্রতিবেশীর মতো নিকটে ও অল্প দূরে অবস্থিত। ভবিষ্যতের

সমৃদ্ধিকে কল্পনায় খুব বড় ক'রে অনুভব না করতে পারলেও, এইসব পল্লীর মানুষ অন্তত এই ভেবে কিছুটা খুশি হতে পারছে যে, তাদের জমির দাম বেড়ে গেল। নতুন মূল্য ও মর্যাদা লাভ করছে দামোদর উপত্যকার মাটি, এই আশ্বাস অবশ্যই তাদের মনে অনুপ্রেরণা এনে দেবে, যারা মাটির মানুষ হয়ে জীবনব্রত পালন করবার রীতি গ্রহণ করেছে।

একটা অভিনবত্ব আগে অনুমান করতে পারিনি, কিন্তু তিলাইয়াতে এসেই প্রথম সেই অভিনব দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হলো। তিলাইয়ার বরাকরের জল আটক করায় যে জলাধার রচিত হয়েছে, তার আয়তন প্রায় ত্রিশ বর্গ মাইল। যেন এক উপসাগরের বিসর্পিত দেহ এঁকে-বেঁকে পাহাড়ের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গিয়েছে দূর থেকে দূরান্তরে। কোথাও ছোট পাহাড়ের সারি প্রাচীরের মতো জলের উপর প্রতিচ্ছায়া ভাসিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও এক একটি ছোট পাহাড় জলের মধ্যে দ্বীপের মতোই ভেসে রয়েছে। এ দৃশ্য কাশ্মীরের ঝেলম আর ডাল হ্রদের নিসর্গ শোভাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নতুন সড়ক এই জলধারার গা ঘেঁষে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের দিকে চলে গিয়েছে। জলাধারের পাশে এই সব পাহাড়ের গায়ে কি একদিন সুরম্য নিবাস ও নিকেতন গড়ে উঠবে না? আজ এই কল্পনাও নিছক কল্পনা নয় যে, জলাধারের পাশে পাশে এই সব গিরিদেহেরই রাত্রির অন্ধকারে একদিন নানা সুখী উপনিবেশের ও জনপদ-জীবনের দীপ জ্বলে উঠবে।

ছোটনাগপুরের নিসর্গ-রূপ ও ভৌম গঠনের মধ্যে এই নবরচিত জলাধারগুলিও এক নতুন বৈচিত্র্য এনেছে। কোথাও ত্রিশ বর্গ মাইল এবং কোথাও পঞ্চাশ বর্গ মাইল আয়তনের এক একটি জলাধার যে নতুন নিসর্গশোভা রচনা করেছে ও করছে, তার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ একটা প্রভাব জনমনের উপর এবং জনজীবনের কল্পনাপ্রবণ মানস-সত্তার উপর না প'ড়ে পারে না। গিরি, অরণ্য ও ঝরণা নিয়ে যে রূপের ঐতিহ্য দামোদরের উপত্যকাভূমির পল্লীবাসীর চিত্তে গাথা গান উপকথা ও কিংবদন্তীর জগৎ সৃষ্টি করেছে, খণ্ড খণ্ড উপসাগরের মতো এই জলাধারও নিকটের পল্লীবাসীর চিত্তে নতুন কল্পনার রহস্য রচনা করবে। ছোটনাগপুরের পল্লীবাসীর কল্পনা সাহিত্যে নাগকন্যা নেই, জলপরী নেই, মৎস্যকন্যা নেই, পালতোলা নৌকাও নেই, অনুমান করা যায়, ছোটনাগপুরের কৃষক-পল্লীর সন্ধ্যার উপকথার নতুন নায়িকা হয়ে আসছে জলজগতের রূপসীর দল। প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন মনের ও কল্পনার প্রকৃতিও যে বদলে দেয়, এটা তো সহজ সরল ঐতিহাসিক সত্য।

শান্তরসাস্পদ তপোবনের কথা শোনা যায়। আর শহর ও জনপদ চিরকালই অশান্ততা, মুখরতা ও ধূলিমলিন কর্মব্যস্ততার আস্পদ ব'লে নিন্দিত হয়ে এসেছে। কিন্তু সিন্দ্রির আর চিত্তরঞ্জনের নতুন দুটি জনপদের রূপ দেখলে ধারণা পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে, শহরও, আর আধুনিক কালের শহরও শান্তরসাস্পদ রূপ লাভ করতে পারে। পরিচ্ছন্ন জনপদ, নতুন গাছের ছায়া, নতুন ফুলের রঙীন শোভা আর সৌরভের স্পর্শ মেখে ছবির মতো মাটির উপর যেন নব ভারতের পরিকল্পনার সৃষ্টি আঁকা রয়েছে, সিন্দ্রি ও চিত্তরঞ্জন দুই জনপদ।

বোকারোর বিদ্যুৎ-ভবনে প্রবেশ করলে যন্ত্রশক্তির আর এক মহিমাময় প্রকাশ দর্শকের চক্ষে এক নতুন রূপকথার জগতের মতোই নতুন বিস্ময়ের আবেশ সৃষ্টি করে। যেন এক দুর্বোধ্য ইন্দ্রজালের পুরী, লোহা আর ইস্পাতের তন্তু ও অস্থি দিয়ে গঠিত এক নিকেতনের অভ্যন্তরে অগ্নি উত্তাপ ও বাষ্পের পদার্থধর্মকে সহস্র যন্ত্রের আবর্তনে প্রমত্ত ক'রে বিদ্যুৎ

আহরণ করার কী বিরাট কৌশলকলা। বোকারোর এই বিদ্যুৎপুরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে মনে হয়, এই পুরীর যন্ত্রপরিবার যেন নিজেরই প্রাণের আবেগে কাজ করে চলেছে, কারণ কর্মীর ভিড় তো নয়ই, বরং নির্জনতাই দেখা যায়। যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তা কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এই বিদ্যুৎপুরীর অভ্যন্তরে এসে। এক একটি কন্ট্রোল রুমের ভিতরে থরে থরে সজ্জিত প্রাগ রঙীন আভা ছড়িয়ে জ্বলছে আর জ্বলে উঠছে। কথা বলছে যন্ত্র। বাষ্পের চাপ কোথাও বিন্দুমাত্র উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে কি না, তাপের মাত্রা কোথাও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে কি না, আপনিই সেই মুহূর্তে আপনার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে এই কর্মব্যস্ত যন্ত্রপরিবার।

সিন্দ্রির কারখানাতেও যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তার এই অত্যুচ্চ উৎকর্ষের প্রকাশ দেখা যায়। রাজস্থানের জিপসামকে চূর্ণ ক'রে বিরাট এক রাসায়নিক যজ্ঞে দৈনিক হাজার টন সার অর্থাৎ অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী করছে সিন্দ্রির কারখানা। চিত্তরঞ্জনের কারখানা ইস্পাত লোহা আর পিতলকে গলিয়ে রেল ইঞ্জিনের যন্ত্রদেহের সকল রকমের সাজ তৈরী করছে। তপ্ত ধাতুপিণ্ড এক একটি বিরাটকায় যন্ত্রের পেষণ পেটাই আর কাটাই-এর বিপুল পদ্ধতির ভিতর দিয়ে নানা ছাঁদে গড়ে উঠেছে। একশো রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করেছে চিত্তরঞ্জন, এই কৃতিত্ব নতুন ভারতেরই আত্মশক্তির নতুন জাগরণের ইঙ্গিত।

আর একটি সম্পদ দেখেছি, কর্মীদের নিষ্ঠা। এবং এই সম্পদকে নতুন ভারতের শক্তির এক শ্রেষ্ঠ আধার বলেই মনে করি। দামোদরের পাঁচটি বাঁধের কাজে নিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার আর কর্মীদের আচরণে ও মনোভাবে বস্তুতঃ শিল্পীসুলভ আগ্রহেরই প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। মনে হলো, শুধু কর্মিষ্ঠতা নয়, তাঁদের মনের ভিতরে থেকে এক শিল্পীর কল্পনাকুশল মন তাঁদের কাজে ছন্দ আর স্বাচ্ছন্দ্য দান করে চলেছে।

খুব ভাল লেগেছিল, যখন দেখলাম বোকারোতে রাত্রির পাওয়ার হাউসের প্রবেশ-পথের শীর্ষদেশে জয়পুরী রঙীন পাথরে খোদিত ক'রে রাখা হয়েছে ভারতের নবজীবনের জাগ্রত নূতন শক্তির অভিব্যক্তির প্রতীকের মতো মূর্তি। দেখে তৃপ্ত হলো মন, কারণ এইটুকুর যেন অভাব ছিল আর প্রয়োজনও ছিল। যন্ত্রের গায়ে মানুষের মনের রঙের ছাপ যদি না পড়ে, তবে যন্ত্র মানুষের মনের আত্মীয় হয়ে উঠবে কি ক'রে?

পরিকল্পনার এই সব যান্ত্রিক আয়োজনের মধ্যে চিত্রকর শিল্পীর রঙের তুলিকার স্পর্শ এখনো সেই পরিমাণ অভিনন্দন লাভ করেনি, যে পরিমাণ অভিনন্দনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলাম, প্রকৃতিই এই সব যন্ত্রপুরী আর নতুন জনপদের রূপে রঙ ছড়িয়ে দিয়েছে। এখানে শীতের দিনেও ফুলের যে রঙীন সমারোহ দেখলাম, সেটা বসন্তের পুষ্পামোদের চেয়ে কম নয়নলোভা নয়। যন্ত্রপুরীর সম্মুখের তৃণাকীর্ণ ভূমির এখানে-ওখানে প্রস্ফুট চন্দ্রমল্লিকার শোভা যন্ত্রপুরীর রূপের সেই অভাব কিছুটা পূর্ণ ক'রে রেখেছে, যেটা পূর্ণ করার দায়িত্ব কর্তব্য দেশের শিল্পীরও আছে।

পরিকল্পনার এই বাস্তব মূর্তি যাঁরা স্বচক্ষে দেখলেন, তাঁরা নিজ জাতির আত্মশক্তিরই এক উদ্বোধিত রূপই প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যে প্রসন্ন হয়ে ফিরে এসেছেন। বলতে পারি, জাতির ঐতিহাসিক আকাঙ্ক্ষার স্তব্ধীভূত নির্ঝরের স্বপ্ন এতদিনে দেশের মাটিতে করুণাধারার রূপে প্রবাহিত হবার সুযোগ লাভ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনোবিজ্ঞান

মনের রথী ও সারথী

[মানসিক ক্রিয়াযন্ত্র বা Psychic Apparatus—সহজাত মনোগুণ—মানসিকতা মানুষের একটি শক্তিরূপী আদিম বৃত্তি—পরিপার্শ্বের সঙ্গে ইদের সংঘাত—ইদ (Id) বা স্বয়ং বা প্রথম ব্যক্তিত্ব—ইগো (Ego) বা অহং বা দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব—ইদের প্রতি ইগোর শাসন—পরা ইগো (Super Ego) বা তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বা বিবেক—সক্রিয় মনের তিনটি স্তরভেদ—চেতনতা, অচেতনতা ও অর্দ্ধচেতনতা।]

ফ্রয়েডের সঙ্গে আমরা মন দিয়েই মনকে বিচার করে চলেছি ; মনই মনের মহিমা খুঁজে বার করছে। কণ্টকেনৈব কণ্টকম্—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত। তাই এই বিজ্ঞানের পথে পথে বিভ্রান্তির বিপদ ঘনিয়ে রয়েছে। অন্যান্য বিজ্ঞান থেকে মনোবিজ্ঞানের দুরূহতা এইখানে। মনই মনের গুণাগুণ যাচাই করার টেষ্ট টিউব। ডাক্তার ফ্রয়েড মনের কোন বিশিষ্ট সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করছেন না। তিনি মানুষের প্রকৃতিতত্ত্বের পেছনে একটি অস্থূল সত্তার ক্রিয়া লক্ষ্য করে আসছেন, তার রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করেছেন। তাই তিনি এই আধার বিশেষকে মানসিক ক্রিয়াযন্ত্র (Psychic Apparatus) বলে অভিহিত করেছেন। ইংরাজী অ্যাপারাটাস কথাটার একটা যথার্থ দার্শনিক প্রতিশব্দ ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়—ঘট। কিন্তু মানসিক ঘট বললে কথাটা ততটা বোধক হবে না তাই ক্রিয়াযন্ত্র বলাই সুবিধা।

একটা মানসিক ক্রিয়াযন্ত্র আমাদের আচরণের প্রেরণা যোগাচ্ছে। এই ক্রিয়াযন্ত্রের গঠন কি? ডাক্তার ফ্রয়েড এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যকে দর্শনের পর্য্যায়ে এনে ফেলেছেন। তিনি বলেন—প্রত্যেক মানবশিশু তার দেহের সহজাত একটা ছন্নছাড়া মনোগুণ নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। এই মনোগুণকে তিনি একটা শক্তিরূপী বৃত্তি (Energy) বলে মনে করেন। এই শক্তি শিশুর জীবনচর্য্যার প্রধান ধাত্রী। এই শক্তির লক্ষ্য হলো শিশুর জীবনের সর্ব্বপ্রকার আত্মপুষ্টি বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুকে আহরণ করা। মোট কথা এই শক্তিই হলো সহজাত আদিম ব্যক্তিত্ব। ডাক্তার ফ্রয়েড এই স্বয়ম্ভু আদিম ব্যক্তিত্বের নামকরণ করছেন—ইদ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবন নিছক ইদের প্রেরণায় চালিত হবার তাগিদটা অবশ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু চলা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তার চারদিকের অবস্থাটা অর্থাৎ পরিপার্শ্বের (Environment) সঙ্গে ইদের ইঙ্গিতে চলবার চেষ্টা খাপ খায় না—বরং ব্যাহত হয়। পরাহত ইদ ইন্দ্রিয়গ্রামে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত করে, তারই ফলে শিশুর জ্ঞানের উদয় হয়। এই জ্ঞানের প্রথম পাঠ হলো এই যে—বাইরের জগতটা উদার নয় ; সেখানে শুধু নিজের গরবের বেগে চলা যায় না। তুষ্টি তৃপ্তি ও স্ফূর্ত্তি এত সহজে সেখানে বিকোয় না। কাজেই ইদগত এই অবুঝ প্রথম ব্যক্তিত্ব যেন ঠেকে শিখে শিখে নিজেকে বিভক্ত করে দ্বিতীয় একটি বিবেচনাশীল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে—এর নাম ইগো।

হিস্টিরিয়ার মত আরও যেসব বাতিক আচরণ ও স্মরদশার প্রকোপে মানসিক স্বাস্থ্য বিকল হয়ে যায়, তার ভেতরের রহস্য অনুসন্ধান করে ডাক্তার ফ্রয়েড দেখেছেন ইগো ও

ইদের দ্বন্দ্ব। ইদ যেন সকল ইচ্ছার মূলাধার—প্রতিনিয়ত চরিতার্থতার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে। আর, ইগো হলো সতর্ক সামাজিক বৃত্তি, বা হিসেব ও বিবেচনা করে চলে। ইগো ইদকে শাসিয়ে স্তব্ধ করে রাখতে চায়।

বহির্জগতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিঘাতের দরুণ ইদের একাংশ রূপান্তরিত হয়ে ইগো নামে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করলো। এরপর ফ্রয়েড তৃতীয় ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করলেন। ইগো আবার প্রত্যক্ষ অভিঘাতের অথবা পরাভবের ফলে নিজেকে বিভক্ত করে তার একাংশকে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বা পরা ইগোতে (Super-Ego) রূপান্তরিত করে। সামাজিক জীবনে বিধাতা গোছের একজন প্রভু বা অভিভাবকের (সাধারণতঃ বাপ ও মা) শাসনে কিশোর ইগোকে—আরও বাধ্য সংগত ও নিয়মনিষ্ঠ হতে হয়। বিধি বিধান ও নিষেধের কীর্ত্তি এখানে চরম হয়ে উঠেছে। এর ফলে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব বা পরা-ইগো বৃত্তি চিন্তা ও আচরণের সর্ব্বোচ্চ ও শ্রদ্ধেয় শাসক হয়ে দাঁড়ালো। পরা-ইগোকে বলতে পারা যায়—বৃত্তির সমাজে ইনি গুরুমশায়। আরও সরল ও সংক্ষেপে বলা যায় বিবেক।

মনের ঘটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে জানা গেল যে—একটা সহজাত শক্তিরূপী বৃত্তিপুঞ্জ নিজেকে ত্রয়ীরূপে সাজিয়ে রেখেছে। ইদ-ইগো ও পরা-ইগো অর্থাৎ স্বয়ং, অহং ও বিবেক।

মনস্তত্ত্বের এই অধ্যায়টিকে আমরা মনের জুডিসিয়ারি বা বিচারক বিভাগের পরিচয় বলতে পারি। এর পর খুঁজতে হবে মনের এক্সিকিউটিভ বা কার্য্যনির্ব্বাহক বিভাগের পরিচয়।

মনের কার্য্য প্রথমতঃ উপলব্ধি করা। মন নিজের যে গুণটিকে প্রসারিত করে বস্তু বা বিষয়কে উপলব্ধি করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাকে আমরা বলতে পারি—চেতনতা (Consciousness)। চেতনতা বোধের (Perception) বাহক। চেতনতার খাত দিয়েই বোধপ্রবাহ আমাদের ব্যক্তিত্বে সঞ্চারিত হচ্ছে। এই চেতন মানসের কাজ বিষয়কে গ্রহণ করে প্রত্যয় সৃষ্টি করা। চেতনা সজাগ স্মৃতির সহচর। চেতনমানসের বস্তু স্মরণের সূত্রে গাঁথা থাকে। আহ্বান মাত্র তাকে কাছে পাওয়া যায়। কিন্তু ঠিক নামে ও কাজে এর বিপরীত মনের আর একটি ধর্ম্ম বা গুণ আছে—অচেতনতা (Unconsciousness)। একে মনের তমোগুণ বলতে পারা যায়—বিস্মৃতির জঠরে লুক্কায়িত বিচিত্র ও বিরাট এক ভাবনার জগৎ। চেষ্টা করলেও (মনঃসমীক্ষণ ব্যতিরেকে) এর হদিস পাওয়া যায় না। এই দু'য়ের মাঝামাঝি একটা স্তর আছে, যাকে অর্দ্ধচেতনা (Fore-consciousness) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মনের এই অবস্থায় বিস্মৃত বিষয় একেবারে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যায় না ; তাকে চেষ্টা করলে বোঝা যায় ; বিস্মৃতিকে স্মরণের পথে টেনে আনা যায়।

চেতনতা বা চেতন মনের কাজকে উদাহরণ দিয়ে বোঝার দরকার হয় না। তবুও ২৬শে জানুয়ারী সকাল আটটার সময় কংগ্রেস ময়দানে জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সংকল্প ও শপথ গ্রহণ করতে হবে, এই সিদ্ধান্ত ছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাই করা হলো। বুঝে ভেবে এই সিদ্ধান্তকে স্মরণের মধ্যে সজাগ রেখে, ঠিক সময়ে সাড়া দিলাম। এই আচরণ আগাগোড়া চেতন মনের কাজ। এর মধ্যে জটিলতা, স্থিতি ও অস্পষ্টতা নেই।

অচেতনতা বা অচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের ভাল উদাহরণ হলো স্বপ্ন। আর, অর্দ্ধচেতনতা বা অর্দ্ধচেতন মনের কাজের নমুনা দিতে হলে আমাদের প্রাত্যহিক আচরণের কতগুলি ভ্রান্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, বাক্‌ভ্রান্তি, পরিচিত নাম ভুলে যাওয়া,

লিখতে ভুল করা, মুদ্রাদোষ প্রভৃতি। কোন সুপরিচিত নাম অনেক সময় স্মরণ করা যায় না, যে অবস্থাকে বলা হয়—পেটে আসছে, মুখে আসছে না। এই অবস্থাকে অর্দ্ধচেতনতা বলা যায়।

ফ্রয়েডীয় মতে মনের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে পরিচয় সংক্ষেপে এইখানে শেষ করা যেতে পারে। এর পরে দেখতে হবে মনের কর্ম্মকাণ্ড ; মনোলীলার মধ্যে কোন নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করা যেতে পারে কি? মনের নীতি কি মাৎস্যন্যায়েই নিষ্পন্ন হয়, না তার মধ্যে কার্য্য-কারণ সঙ্গতি আছে?

মন ও মনসিজ

[ইন্সবৃত্তি মুখ্যতঃ কামধর্ম্মী—কামিতা—(Sexuality) ও যৌনতা এক নয়—কামের গূঢ়ার্থ—লিবিডো—(Libido) বা রতি নামে কামবৃত্তির বৈজ্ঞানিক পরিচয়—লিবিডোর রীতিনীতি—শৈশব কামিতা বা শিশুমনের কামবৃত্তি—দমিত লিবিডো ও বাতিক বা মানসিক অসুস্থতা—একেবারে স্বভাবী (Normal) মনুষ কেউ নেই—সকলেই অল্পবিস্তর বাতিকগ্রস্ত।]

'আমি মনসিজ—
নিখিলের নরনারী হিয়া
টেনে আনি বেদনা বন্ধনে।'

ইনি সেই পুষ্পধন্বা, পৌরাণিক কবিদের মতে যিনি অলক্ষ্যে যৌবনের বুকে এক বিহ্বল বেদনার তীর হেনে সরে পড়েন—যার ফলে ধ্যানমগ্ন মহেশ্বর চোখ মেলে পূজারিণী উমার মুখের দিকে স্মিতহাস্যে তাকান, স্নানরত ঋষিকুমারকে দেখে মুনিকন্যাদের বরাঙ্গে শিহর লাগে, বল্কল নীবিচ্যুত হয়।

ইনি মনসিজ, মন জুড়ে বসে আছেন। ডাক্তার ফ্রয়েডও এই কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর বলার বিষয়ের সঙ্গে তত্ত্বের দিক দিয়ে কবিসুলভ ভাবদৃষ্টির পার্থক্য আছে। পুরাণের মনসিজ যেন বয়সের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় বসে থাকে—যৌবনোদ্গমের আগে তার দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়েড তাঁর প্রসঙ্গের আরম্ভেই বলে রেখেছেন যে, কামনার ফুল শুধু যৌবনজলতরঙ্গের টানেই ভেসে বেড়ায় না। শুধু যৌবনধন্য নরনারী নয়, অতি অপোগণ্ড মনুজ সন্তানের মন কামরহিত নয়।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে সদ্যোজাত মানুষের মনেও ইদ বা স্বয়ং নামে এক শক্তিরূপী ইন্সবৃত্তি সঞ্চিত থাকে। কামের (Sex) প্রসঙ্গে ফ্রয়েড আবার বলেছেন যে—মানুষের অন্তশ্চেতনা জুড়ে এক শক্তিরূপী কামবৃত্তি বিরাজ করছে। এই কামবৃত্তি আপনাতে আপনি বাঁধা নয়—আত্মাশ্রয়ী নয়। এর জন্য বাইরে থেকে একটি আস্পদ চাই। প্রেমে প্রণয়ে এই কামবৃত্তি নিজেকে সার্থক করছে। সকল প্রণয়কলার প্রধান লক্ষ্য হলো কাম তৃপ্তি। সব ভালবাসার সার কথা হলো এই কামজ বাসনার চরিতার্থ। জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্থাৎ বাষ্পে মেঘে বরফে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছে, সেই এক আদি কামাবেগে লয়লা-মজনু মার্কা প্রেম থেকে সুরু করে পীড়িতের সেবা, দেশপ্রীতি, শিল্পানুরাগ, আত্মপ্রিয়তা, বাৎসল্য ও পুতুলখেলা পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিজেকে পরিব্যক্ত করে রেখেছে। এই শক্তিরূপী কামবৃত্তিকে ডাক্তার ফ্রয়েড আখ্যা দিয়েছেন—লিবিডো (Libido) বা রতি।

ইদ নামে আদি ইন্সবৃত্তি বা জৈব আবেগের কথা বলা হয়েছে; আবার রতি বা লিবিডো

নামে আর একটা আদি কামবৃত্তির কথা বলা হলো। এ কি করে সম্ভব? দু' দুটো আদি একই আধারে একই প্রেরণা সৃষ্টি করে চলতে পারে কি? তা হলে 'আদি' বলার সার্থকতা কোথায়?

লিবিডো ইদ থেকে ভিন্নতর বা স্বাধীন কোন বৃত্তি নয়। লিবিডো ইদেরই ব্যঞ্জনা। ইচ্ছকে প্রাচীনেরা কামাচারী বলেছেন। সেই উক্তি ফ্রয়েডের বিচারে সর্ব্বাংশে সত্য বলে গৃহীত হয়েছে।

কাম সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক গণ্ডগোলের ব্যাপার ঘটে গেছে। শুধু গোঁড়া নীতিবাগীশেরা নয়—বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকেও ফ্রয়েডীয় মতবাদের কাম-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ উঠেছিল এবং এখনো আছে। ফ্রয়েড বলেছেন যে তিনি সাধ করে কাম সম্বন্ধে একটা হঠ-সিদ্ধান্ত করে বসেননি। হিস্টিরিয়ার চিকিৎসা সম্পর্কে রোগীর মনের তথ্য জানতে জানতে তিনি একেবারে গভীরে গিয়ে এই তত্ত্ব জানতে পেরেছেন। আদি জৈবিক ইচ্ছাবৃত্তি বা ইদের কোন পরাভব থেকে যে-অভিজ্ঞতার ক্ষত বা অভিঘাত (Trauma) মনের ভিতর পুঞ্জীভূত হতে থাকে, সেই সব অভিঘাতের প্রকৃতি থেকে তিনি বুঝতে পারলেন যে—এসবই কামাবেগের অচরিতার্থতা, স্ফূর্ত্তির বাধা বা ব্যর্থতা থেকে সৃষ্টি। নিতান্ত অপোগণ্ড বয়স থেকে এই ট্রোমা বা অভিঘাত মনকে বিক্ষত করে আসছে। সুতরাং অপোগণ্ড বয়সেও মনের ভেতর কামাবেগ যে থাকে না, তা কি করে বলা যায়? ডাক্তার ফ্রয়েড শিশুদের আচরণ পরীক্ষা করেও তাদের মধ্যে কামাবেগের স্পষ্ট নিদর্শন পেলেন। তাছাড়া বয়স্ক মানুষের অচেতন মনের খবর নিতে গিয়ে তাদের শিশুজীবনের কামাবেগের ভালমন্দ অভিজ্ঞতার নানারকম ছাপ দেখতে পেলেন। তিনি এই অপোগণ্ড বয়সের কামাবেগের নাম দিলেন শৈশব কামিতা (Infantile Sexuality)। ফ্রয়েড বললেন, শিশুর কামকলা অস্বাভাবিক নয়, এটাই মানুষের কামবৃত্তির স্বাভাবিক রূপ।

'যৌন' কথাটা এতক্ষণ ব্যবহার করা হয়নি। ফ্রয়েড যে ব্যাপারকে কামিতা বা কামবৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন সেটা নিছক যৌনতা নয়। কাম চরিতার্থতার জন্য যৌন-মিলন অপরিহার্য্য প্রয়োজন নয়। এই কারণে, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য ঠিক রাখবার জন্য তিনি লিবিডো নামে কথাটি তৈরী করে নিয়েছেন। কাম প্রেরণায় পরিপূর্ণ এই কায়মনের আচরণ বা লিবিডো-শরীর যেন আনন্দান্বেষ বা শুধু আনন্দের তাগিদেই ব্যস্ত হয়ে রয়েছে।

সুস্থ ও স্বাভাবিক কামচর্য্যা যদি ক্ষুণ্ণ না হয় তবে চরিত্রে কখনো বাতিক বা অন্যবিধ কোন স্নায়বিক বিকার দেখা দিতে পারে না। এই উক্তি ডাক্তার ফ্রয়েড সিদ্ধান্তের মত পরীক্ষিত সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, একেবারে পরিপূর্ণ সুস্থস্নায়ু অবাতিক ও অক্ষুণ্ণস্বভাব লোক কে? ফ্রয়েড বলেন—সেরকম ষোলআনা সুস্থস্বভাব বাস্তবে দেখা যায় না। সুতরাং তাঁর বক্তব্য আর একটি সিদ্ধান্তকে সামনে টেনে আনে, অর্থাৎ—একেবারে সুস্থকাম কোন মানুষ নেই ; অল্পবিস্তর প্রত্যেকের কামবৃত্তি পীড়িত ব্যাহত ও বিকৃত। প্রত্যেকেই বাতিক— পাগল প্রেমিক কবি সকলেই ; কেউ বেশী কেউ অল্প—এই যা তফাৎ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মানুষের মনের আধারে নিহিত ইদ নামে যে 'প্রথমজা-বেদনা' বা আদ্যা ইচ্ছাবৃত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার অধিষ্ঠান হলো অচেতন মনে। লিবিডো বা রতি নামে যে কাম-প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া গেছে তার লীলাশ্রয় উভয় ক্ষেত্রেই রয়েছে—ইদে

এবং ইগোতে— চেতনতায় ও অচেতনতায়। কাজের বেলায় লিবিডোর আসল নীড় কিন্তু ইগোতে। শিশুর মধ্যে এই ইগো-লিবিডো সবচেয়ে বেশী স্পষ্ট। শিশুর মনের সকল লিবিডো একান্তভাবে তার ইগো বা অহং-এ আশ্রিত। শিশু একটি সম্পূর্ণ আত্মম্ভর ও অহংকারী জীবের নমুনা। এই বয়সে তার অন্ধ ইদপ্রেরিত আচরণ আর অহমিত আচরণে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ ইদ ও ইগো একাত্ম হয়ে আছে—তার আচরণ লিবিডোসর্বস্ব। এরপর, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে শিশু নিজেকে ভালবাসতে আরম্ভ করে—আত্মপ্রীতির অঙ্কুর দেখা দেয়। এই অবস্থা শেষ হয়ে, বয়ঃক্রম আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর শিশুর মনে বহির্বিষয়ের দিকে একটা অনুরাগের ভাব দেখা দেয়।

দেখা গেল, প্রবৃত্তি হিসাবে লিবিডো মানুষের ইগোকে পরিবর্ত্তনের তিনটি ধাপ পার করে নিয়ে যায়—(১) অহমিত লিবিডো (Ego Libido), (২) আত্মপ্রীত লিবিডো (Narcistic Libido) এবং (৩) বহির্বিষয়পরায়ণ লিবিডো (Object Libido)।

পরিণত জীবনে অথবা বয়োপ্রাপ্ত জীবনে যত কিছু অস্মার অপস্মার হিস্টিরিয়া বাতিক ও মানসিক-ব্যাধির কমবেশী প্রভাব ও নিদর্শন চরিত্রে আরোপিত হয়, তার আরম্ভ হয় লিবিডোর দোটানা কার্য্যক্রম থেকে। লিবিডো বাইরের কোন জাগতিক বিষয়কে নিজের সার্থকতার জন্য আস্পদ হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হতে পারে এবং হয়ে থাকে ; আবার কোন কারণে (ব্যর্থতা বা অভিরুচির তাগিদে) ফিরে ইগোমুখী হতে পারে ও হয়ে থাকে। এই টানা-পোড়েনের উৎপাতে মানুষের মানসিক চরিত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

প্রত্যেকের জীবনে অভিজ্ঞতার ঘাত প্রতিঘাত, সাড়া ও স্ফূর্ত্তি, বেদনা ও ব্যঞ্জনা, সাধ ও সার্থকতার রূপ বিভিন্ন। কিন্তু সামাজিকভাবে দেখতে গেলে অর্থাৎ একই সমাজের বিভিন্ন মানুষের জীবনে ঘটনার সাম্য থাকাতে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও মোটামুটি সাম্য দেখা যায়। বাস্তবের সঙ্গে লিবিডোর প্রতিক্রিয়ার ফলে মনের মানুষ জটিল হয়ে পড়ে। নানা বাঁকাচোরা পথে লিবিডো আত্মপ্রকাশে তৎপর হয়ে ওঠে। অনেকটা জলস্রোতের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। অস্থিতি অনাশ্রয় ও গতির বাধা তার সহজ সারল্যকে কুটিল পথে পরিচালিত করে। এই ভাবে ব্যাহত লিবিডো মানুষের চরিত্রে দু'রকমের ক্ষতি সৃষ্টি করে—(১) মানসকূট (Complex) অথবা (২) অপচার (Perversion)।

মানসকূট একটি ভাবনাবিকার মাত্র এবং অপচার হলো আচরণের বিকার। আচরণের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতা লাভের অভাবেই লিবিডো মানসকূট সৃষ্টি করে। অন্য দিকে, লিবিডো অপচার বা কদাচারের (যেটা অসামাজিক) ভেতর চরিতার্থতা লাভ করে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অপচার যেখানে থাকে, মানসকূটের অস্তিত্ব সেখানে নেই। লিবিডো যেন নিজের ভীরুতায় অপচারের আশ্রয় নিতে পারে না বলেই, নিতান্ত অভিমানের বশে মনমরা হয়ে থাকে— মানসকূটের সৃষ্টি করে।

কতরকম মানসকূটই আছে, তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট তালিকা নেই। মোটামুটি যেসব মানসকূট সচরাচর দেখা যায়, তার মধ্যে বহুশ্রুত কতকগুলির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) Sadism (সাদীয় রুচি বা নিগ্রহামোদ)—আত্মসুখের জন্য বা লিবিডোর তৃপ্তির জন্য অপরকে নিগ্রহ করার বাসনা।

এই মানসকূটের প্রকোপে পড়েই লোকে তার ভালবাসার পাত্র বা পাত্রীকে কষ্ট দিতে

কসুর করে না। ট্রেনে কাটা মানুষের বীভৎস ছিন্নভিন্ন লাস দেখবার কৌতূহল চাপতে পারে না, একই সঙ্গে দৃশ্য দেখার আনন্দ ও সদয় খেদোক্তি শোনা যায়। পড়াবার সময় অনেক বাপ-মা ছেলেপিলেদের যেরকম নিষ্ঠুর ভাবে মারধর করেন—মানসিক সুস্থতা থাকলে তাঁরা কখনই তা করতে পারতেন না। রামায়ণের সীতাকে দুঃখকষ্টের মধ্যে ঠেলে দেবার জন্য রামের মনে যেন সবসময়ই একটা ভালমানুষী চক্রান্ত ছিল।

(২) Masochism (আত্মনিগ্রহের রুচি)—এটা সাদীয় মনোভাবের বিপরীত ব্যাপার। নিজেকেই দুঃখে কষ্টে জর্জরিত করে তৃপ্তি পাওয়ার জন্য এক ধরণের অভিমান অনেকের মধ্যে দেখা যায়। ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে এই রুচি বহুভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে—ব্রহ্মচর্য্য, কৃচ্ছ্রতপস্যা, উপবাস ;এসবই আত্মনিগ্রহের ব্যাপার—উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন। সাধারণ আচরণের মধ্যেও অনেককে যেন 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'। নিজেকে একটা পীড়নের মধ্যে নিয়ে না ফেললে তাদের যেন মতি সুস্থির হয় না। প্রণয়কলার মধ্যেও এই রুচি খুবই প্রকট। শরৎচন্দ্রের দেবদাস একটি মাসখীয় রুচির দৃষ্টান্ত। এই মিন্‌মিনে প্রেমিক কোনদিনও তার প্রণয়িনীকে নিজের কাছে আনবার কোন চেষ্টা করলো না ; হাহুতাশ করে, নিজের ব্যক্তিত্বকে ছিন্নভিন্ন করে, লোকটা যেন নিজেকে নিঃশেষ করে দিল।

(৩) Narscism (আত্মাসক্তি)—নিজের প্রতি অনুরাগ। নিজেকে ভালবেসেই তৃপ্তি। নবোভিন্ন যৌবনে মেয়েদের মধ্যে (পুরুষের মধ্যেও) মনে মনে এক আত্মবিহার চলে।

'নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি
হাসত আপন পয়োধর হেরি'।

নায়িকা এইরকম নিজতনুরভসে মজে থাকে। নিজেই নিজের প্রেমের আস্পদ স্বরূপ হয়।

(৪) Exhibitionism (আত্মবিজ্ঞাপনের রুচি)—নিজেকে অপরের কাছে আকর্ষণের বিষয় করে তোলার জন্য যে রুচি। রসশাস্ত্রে উদ্দীপনবিভাব নামে এই ধরণের একটা রুচির উল্লেখ আছে। প্রসাধন কলার উৎপত্তি শুধু নার্সিসীয় (আত্মাসক্তি) মনোভাব থেকে নয় ; আত্মবিজ্ঞাপনের রুচিই এখানে প্রবল। পুরুষের শিভালরি (Chivalry) এই রুচির একটি দৃষ্টান্ত। কবিকেও বলতে হয়েছে :

'লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে মা বিদূষয়ঃ নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়ক সপদি জীবহারকঃ কিং পুনহি গরলেন লেপিতঃ?'

মানসকূটের নাম করতে গেলে, অনেক করা যায়। ছাইভস্ম একটা বাজে জিনিষের (ইট পাথর) ওপর পর্য্যন্ত রতি দেখা যায় (Fetishism), যাকে আপাতঃবিচারে আমরা অকারণ মোহ বলে থাকি। এছাড়া দুটি বিশেষ মানসকূটের কথা ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন—ইদিপাস ও ইলেক্‌ট্রা (Aedepus ও Electra), গুরুত্ব ও তাৎপর্য্যের দিক দিয়ে যাকে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের দুটি বড় স্তম্ভ বলা যায়। গ্রীক উপাখ্যান থেকে এই নাম দুটি সংগ্রহ করা হয়েছে। (১) ইদিপাস—মাতা ও পুত্রের মধ্যে আসক্তিজনিত আবেগ। (২) ইলেক্‌ট্রা—পিতা ও কন্যার মধ্যে আসক্তিজনিত আবেগ।

ডাক্তার ফ্রয়েডের এই দুটি মানসকূটের বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সমাজে বহু মতান্তর ও প্রতিবাদ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রেম, অনুরাগ, আসক্তি, রতি বা লিবিডো, যে নামেই বলা হোক্ না কেন—এই সব

কামজ ভাবনার মধ্যে ফ্রয়েড কতগুলি নিয়মের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। এই নিয়মগুলিই লিবিডোর পরিণামের বিধায়ক।

(ক) Inhibition বা নিরোধ। বাস্তবের কাছে ঘা খেয়ে লিবিডো এক এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে যায়। এই পয়েন্ট থেকে তাকে আর অধিকদূর অগ্রসর হতে দেওয়া হয় না। অহংবোধ বা ইগোর শাসন এই কীর্ত্তি করে।

(খ) Repression বা দমন। এর পর সেই লিবিডো বা রতিজ আবেগ প্রবাহকে যেন উল্টো দিকে অনেকদূর হঠিয়ে দেওয়া হয়—হয়তো অচেতন মনের কোঠা পর্য্যন্ত।

(গ) Fixation বা মোহবন্ধ। লিবিডো ঘা খেয়েও ঘুরে ফিরে বারবার একটি বিশেষ আস্পদের দিকে আসতে থাকে, যাকে মনের দুর্ব্বলতা অথবা বেহায়াভাব বলতে পারা যায়। মায়ের কাছে চড়চাপড় খেয়েও শিশু যেমন কোল ছাড়তে চায় না।

(ঘ) Ambivalence বা উভবল বা দ্বন্দ্বোপেত গুণ। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের এও এক বড় আবিষ্কার। আসক্তির মধ্যে দুই পরস্পর বিপরীত আবেগের কাজ দেখা যায়। এর মধ্যে ভালবাসা যেমন থাকে, ঘৃণাও তেমনি থাকে। যাকে পাবার জন্য মনে আকুলতার সীমা নেই, তাকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যও যেন একটা প্রচ্ছন্ন বিরূপতা রয়েছে।

(ঙ) Sublimation বা সুরুচিপ্রকরণ। লিবিডোর অসামাজিকতা বা কুরুচিপরায়ণতাকে মোড় ফিরিয়ে সদাচারে প্রণোদিত করা। আত্মাসক্তিপ্রবণ (Narcistic) লোক ভবিষ্যতে নিজের শরীরকে সামাজিক ভাবে ভালবাসতে গিয়ে হয়তো ব্যায়ামচর্চ্চায় সুন্দর করে তোলে। আত্মবিজ্ঞাপনের লোভ (Exhibitionism) যার আছে, সে হয়তো, সার্কাসে ঢুকে কসরৎ দেখাতে আরম্ভ করে।

মানসকূটগুলি যেমন সুষ্ঠুতর হয়ে সামাজিক মনোভাব গ্রহণ করতে পারে, তেমনি আসক্তির কদাচারগুলি (Perversion) সুষ্ঠু সামাজিক আচরণ লাভ করতে পারে। সামাজিকতায় উন্নীত এই রুচি ও আচরণ প্রকৃতিগুণে একই থাকে ; এর বহিঃপ্রকাশের রূপ ভিন্নতর হয়, এই মাত্র।

মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাব

[সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের প্রাথমিক গবেষণা—শার্কো ও ব্রয়ারের সহযোগিতা—হিস্টিরিয়া ও অন্যান্য বিকারের চিকিৎসার চেষ্টা—হিপ্নোটিজ্‌ম্‌ প্রণালীর ব্যর্থতা—Catharsis বা আবেগের পরিস্ফূর্ত্তি—সাইকো-এনালিসিসের পত্তন—অবাধ-অনুষঙ্গ প্রণালী—ইচ্ছাবৃত্তি—দমিত ইচ্ছা—অভিঘাত বা Trauma—স্মৃতি ও বিস্মৃতি—অচেতনতা বা অজ্ঞাত মনের অস্তিত্ব—বাতিকের কারণ।]

ভারতের হিন্দুদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে মনকে শরীরের অন্যতম ইন্দ্রিয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আবার অনেকে বলেছেন—মন সূক্ষ্মেন্দ্রিয় মাত্র। যেভাবেই তারা বলুন না কেন, মনকে ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যেই তাঁরা ফেলেছিলেন। এই বিচার প্রাচীন হিন্দু মনস্তাত্ত্বিকের চিন্তানুশীলনের প্রখরতা প্রমাণ করিয়ে দেয়। যোগশাস্ত্রে ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে মন সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মন নিয়ে প্রাচীনদের মধ্যেও গবেষণার উৎসাহ ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে এসে দেখা যায়, ভারতীয় মনস্তত্ত্ব নিছক দার্শনিকের ধ্যানের আশ্রয় ছেড়ে ফলিত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পরীক্ষার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়েছে। আজকের তুলনায় এই তান্ত্রিক পদ্ধতির বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে

আমাদের সন্দিগ্ধ হবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কিন্তু সেযুগে সেটা তান্ত্রিকদের প্রগতিপরায়ণ চিন্তাবৃত্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

যে কারণেই হোক্, অন্যান্য বিষয়-বিজ্ঞানের মত মনের বিজ্ঞান উনিশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সার্থকভাবে অগ্রসর হয়নি। অধ্যাত্মবাদ অতীন্দ্রিয়বাদ প্রভৃতি ধর্মানুষঙ্গিক চিন্তার চাপে মন এতদিন দার্শনিকের দেওয়া নানারকম বিচিত্র সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানের সীমার বাইরে পড়েছিল। বিংশ শতকে এসে মনকে বিজ্ঞানের সূত্রে বাঁধবার আয়োজন আরম্ভ হয়। চল্লিশ বছরের মধ্যেই বিজ্ঞানীরা আমাদের সর্ব্ববিধ আচরণের অদৃশ্য নিয়ামক—এই আড়াল-দিয়ে লুকিয়ে-চলা চটুল মনস্বরূপকে যুক্তির সূত্রে, ফরমুলার অঙ্কে ও লেবরেটরীর তৌল মাপের মধ্যে বেঁধে ফেলেছেন। মনস্তত্ত্ব এখন যথার্থ মনোবিজ্ঞানের পর্য্যায়ে এসে পড়েছে। এখন কিশোর অবস্থামাত্র—এর সম্মুখে এক সুবিপুল সম্ভাবনার ভবিষ্যত পড়ে রয়েছে।

সেই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে একটা নতুন কথা—সাইকো-এনালিসিস (Psycho-analysis)। যাকে সোজা কথায় বলতে পারি—মনকে পরীক্ষা করার পদ্ধতি। বাঙলাভাষায় এই কথাটার তিন-চার রকম প্রতিশব্দ চালু হয়েছে : মনোবিকলন, মনোবিশ্লেষণ, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি। সাইকো-এনালিসিস অথবা সাধারণভাবে বলতে গেলে মনোবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের সঙ্গে কীর্ত্তিত হয়ে রয়েছে যাঁর নাম—তিনি হলেন ভিয়েনার ইহুদী ডাক্তার সিগমুণ্ড ফ্রয়েড।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মোরাভিয়ার (প্রাক্তন অস্ট্রিয়া—বর্ত্তমান চেকো-স্লোভাকিয়া) অন্তর্গত ফ্রাইবের্গ নামে ছোট একটি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। চার বছর বয়স থেকে ভিয়েনা শহরে লালিত পালিত হন। ডারুইনের লেখা পড়ে বালক ফ্রয়েডের সন্ধিৎসা প্রবল হয়ে ওঠে। তারপর কবি গ্যয়টের প্রবন্ধ (প্রকৃতি) পড়ে চিকিৎসা বিদ্যা শেখবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন ও মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় তিনি শারীরবিদ্যা (Physiology) এবং বিশেষ করে স্নায়ুতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন। মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট হবার পর (১৮৮১ সন) তিনি ভিয়েনায় জেনারেল হাসপাতালে কাজ শিখতে এবং মস্তিষ্কের গঠনতত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকেন। ১৮৮৫ সনে ফ্রয়েড বিখ্যাত চিকিৎসক শার্কোর (Charcot) গুণগ্রামে আকৃষ্ট হন। শার্কো তখন সম্মোহন প্রয়োগ করে (Hypnotism) হিস্টিরিয়া ও স্নায়বিক রোগের চিকিৎসা করছিলেন। এক বছর কাল পর্য্যন্ত তিনি প্যারিসে শার্কোর কাছে শিক্ষানবীশী করেন। তারপর ভিয়েনায় ফিরে এসে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন। এই সময় থেকে ফ্রয়েড চিকিৎসক হিসাবে ব্যবসায় আরম্ভ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃত্তি গ্রহণ করেন।

শার্কোর সমসাময়িক বিশিষ্ট চিকিৎসকেরা সম্মোহন-তত্ত্বকে নিছক ধাপ্পাবাজী বলে মনে করতেন। কিন্তু ফ্রয়েড সম্মোহন-তত্ত্বের ক্রিয়া কলাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি শার্কোর কাছেই শিখলেন যে, হিপ্নোটিজ্‌ম্ যেমন হিস্টিরিয়া, অপস্মার বা স্নায়বিক বিকার নিরাময় করতে পারে তেমনি সুস্থ লোকের মনে ঐ প্রথায় এইসব রোগের লক্ষণগুলিও সঞ্চার করা যেতে পারে। তারপর অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের (লীবোল্ট, ব্রেনহাইম প্রভৃতি) পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করে বুঝলেন যে মাত্র গূঢ় আদেশ (Suggestion) দ্বারাই কোন ব্যক্তির মনে মুহ্যমান অবস্থা সৃষ্টি এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যেতে পারে, এর জন্য সম্মোহন প্রয়োজনের অপরিহার্য্য আবশ্যকতা নেই।

ডাক্তার ফ্রয়েড ভিয়েনাতে রোগীদের স্নায়বিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য দুটি চিকিৎসো-প্রণালী গ্রহণ করেন—হিপ্নোটিজম্ ও ইলেক্ট্রোথেরাপী। শারীরবিদ্যাবিৎ (Physiologist) চিকিৎসকেরা ফ্রয়েডের পদ্ধতির বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি তোলেন। তাঁরা শরীরের অঙ্গাবয়বের অতিরিক্ত মন নামে বিশেষ কোন দেহধর্ম্ম বা ইন্দ্রিয়ত্ব স্বীকার করতেন না। ডাঃ ফ্রয়েড সমসাময়িক শারীরবিজ্ঞানী চিকিৎসকদের আপত্তিকে প্রশ্রয় না দিলেও, শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা রোগীর স্বাস্থ্যবিধানে একেবারেই অচল ও বিফল ; আর হিপ্নোটিজম্ দিয়ে যদিও সাময়িকভাবে কিছু সুফল লাভ করা যায়, কিন্তু রোগীর রোগ বরাবরের জন্য দূর হয়ে যায় না। এই ব্যর্থ প্রয়াস থেকেই ডাক্তার ফ্রয়েডের গবেষণা অপেক্ষাকৃত উন্নততর বৈজ্ঞানিক আয়োজনের দিকে চালিত হয়। এর পর তিনি যে প্রথা গ্রহণ ও প্রবর্ত্তন করেন তারই নাম সাইকো-এনালিসিস।

ডাক্তার ফ্রয়েড প্রবর্ত্তিত যে সাইকো-এনালিসিস প্রথা সর্ব্বত্র খ্যাতি ও অখ্যাতি লাভ করেছে, তার মূল কাঠামো আগেই তৈরী হয়েছিল ডাক্তার জোসেফ ব্রয়ার নামে ভিয়েনাবাসী চিকিৎসকের গবেষণালব্ধ তথ্যের মধ্যে। ফ্রয়েড যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই উভয়ের মধ্যে পরিচয় ঘটেছিল। ব্রয়ারের কাছ থেকেই ফ্রয়েড জানতে পেরেছিলেন যে আধিগ্রস্ত রোগী যদি তার মনঃপীড়ার কথা অকপটে ও অকুণ্ঠভাবে ভাষায় প্রকাশ করে ফেলতে পারে, তবে রোগের উপশম হয়। সম্মোহন প্রয়োগ করবার পর আসলে রোগী এই কারণেই কিছুটা সুস্থতা লাভ করে। অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় রোগী জানতো না যে কী কারণে তার এই মনঃপীড়া ; কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় যেন মনের কপাট খুলে যায়। সে বুঝতে পারে, কোন্ প্রচ্ছন্ন অতীত অভিজ্ঞতা মনের গহন থেকে তার আচরণের ও চিন্তার স্বাভাবিকতাকে উত্যক্ত করে চলেছে। ব্রয়ারের গবেষণার সূত্র ধরে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছান গেল, যেখানে রোগের সম্পর্কে প্রথম প্রশ্নটা মন নিয়ে নয়, মনেরই বিশেষ একটি গুণগত রূপ অর্থাৎ স্মৃতি নিয়ে। স্নায়বিক অপচারের মূলে পাওয়া গেল স্মৃতিঘটিত ব্যাপার—অতীত অভিজ্ঞার ব্যাপার।

আর একটু তলিয়ে দেখলে রহস্য আরও সরল হয়ে আসে। এই স্মৃতি কিসের? কোন্ ঘটনার স্মৃতি মনের আকাশে এই এলোমেলো অকালঝঞ্ঝা সৃষ্টি করে রেখেছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হয়—

ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে। অথবা, মনের অতল জলের আবর্ত্তে এক মজ্জমান কামনাসুন্দরী ডাকছে—আমায় উদ্ধার কর। মনের মরুপথে কত নদী তার ধারা হারিয়েছে। কত ঢেউ উথায় হৃদি লীয়ন্তে। এই ব্যর্থ অভীপ্সার—অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার শ্মশানে এক ইচ্ছাময়ী নেচে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে সেই স্মরণের গ্রন্থি টুটে এক একটি ইচ্ছা মুক্তির জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

বিজ্ঞানীরা এই ব্যর্থ ইচ্ছার বেদনাকে একটি পরিভাষায় সংজ্ঞাত করেছেন—ট্রোমা (Trauma)। চরিতার্থতার অপেক্ষায় কোন ইচ্ছা বসে থাকে না। কাজেই উদ্ভব মাত্র কত ইচ্ছাকে মনের মধ্যেই চেপে দিতে হয়—চরিতার্থতার অভাবে। কাজেই যে-বাসনাকে মনে করা গেল যে তার লয় হয়ে গেছে, আসলে তা নির্ব্বাসিত হয়েছে শুধু। ট্রোমা এই নির্ব্বাসনের শোকের চিহ্ন।

কোন গোলমাল হতো না, যদি এই ট্রোমা বা ব্যর্থকাম বেদনাটি লোকে স্পষ্ট বুঝতে

পারতো। এই শোকের কাহিনী ও শোকচিহ্ন সবই তার স্মৃতি থেকে মুছে যায়, অথচ কায়িক ও মানসিক আচরণের ভেতর সেই বিস্মৃত অভিমান বজায় থাকে।

ডাক্তার ব্রয়ারের গবেষণা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল এবং ফ্রয়েড নিজে ভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে যেসব তথ্য আবিষ্কার করেন, তাতে তত্ত্বের দিক দিয়ে উভয়ের গবেষণা এক ভিত্তিতে মিলিত হয়। তাঁরা দুজনে মিলে (১৮৯৩ সনে) হিস্টিরিয়ার মনস্তাত্ত্বিক নির্ণয় নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

হিস্টিরিয়ার চিকিৎসা ব্যাপারে দুজনেই বুঝেছিলেন যে, রোগীর সুস্থতা লাভের প্রধান কারণ হলো—পরিস্ফূর্ত্তি বা মনের ভেতর থেকে একটা নিরুদ্ধ আবেগসমষ্টির মুক্তি লাভ (catharsis)। হিস্টিরিয়া রোগের মূল রোগীর বর্ত্তমান জীবনের ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকেই অবলম্বন করে থাকে না ; প্রধানতঃ এটা অতীতের ব্যাপার।

হিস্টিরিয়ার মত একটা আধি বা মানসিক রোগের পরীক্ষা করতে করতে তথ্যের আবিষ্কার এইখানে সম্পূর্ণ হয়নি। বরং এর পরেই সবচেয়ে বড় আবিষ্কার ঘটে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের বনিয়াদ বলতে গেলে এই আবিষ্কারের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

অচরিতার্থ কামনা থেকে পরবর্ত্তী অধ্যায় হিসাবে পাওয়া গেল দমিত বাসনা, অর্থাৎ চরিতার্থতা লাভের উপায় নেই বলেই বাসনাকে দমন করে দিতে হয়। বাসনা দমিত হলো, অথচ সেটা স্মরণে থাকে না—এ কেমন ব্যাপার? আরও আশ্চর্য্য, বিস্মৃত হয়েও সেই বাসনার কারসাজী বন্ধ হয় না ; আচরণের ভেতর নানা ভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। এতক্ষণে মনের ধর্ম্মকে খানিকটা চিনতে পারা গেল : (১) সজ্ঞান মন ও (২) অজ্ঞান মন। সজ্ঞান মন ও তার আচরণ আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আর একটা মন আছে যেটা আমাদের বিস্মৃত যত অতীত কাহিনী ও ইচ্ছাকে পুষে রাখে এবং আমাদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

ডাক্তার ব্রয়ার এই গবেষণাকে আর বেশী দূর টেনে নিয়ে যাননি। ফ্রয়েডের অনুসন্ধান এখানে এসে ক্ষান্ত হয়নি। কিছুদিন পরীক্ষার পর তিনি আর একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন যার দ্বারা রোগীর মনের নিরুদ্ধ ইচ্ছাপুঞ্জ বা আবেগকে পরিস্ফূর্ত্তি (catharsis) দেওয়া যায়, অথচ সম্মোহন করার প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতির নাম—Free Association বা অবাধ অনুষঙ্গ। সম্মোহন প্রথার মধ্যে ত্রুটীগুলি ফ্রয়েড আগেই লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথমতঃ সকলকেই সম্মোহিত করা সম্ভব নয় এবং দ্বিতীয়তঃ সম্মোহন প্রথায় চিকিৎসা করে যেটুকু সুফল পাওয়া যায়, তা আদৌ স্থায়ী হয় না। কয়েকজন রোগীকে সম্মোহিত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ফ্রয়েড আর একটি উপায় ধরলেন। রোগীকে বলা হতো যে, যেসব কথা তার মনে আসছে, অকপট ভাবে এবং চাপা দেবার চেষ্টা না করে সে তাই বলে যাক্। সব রকম দ্বিধা সংশয় কুণ্ঠা লজ্জা ভয় মন থেকে সরিয়ে ফেলে নির্বাধ উৎসের মত রোগী তার মনের প্রত্যেকটি ভাবনা বলে চলে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মতে এই সব বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন কথাগুলি যেন মনের গহনে সুগুপ্ত সেই ইতিহাসের ছেঁড়াছেঁড়া কতগুলি পাতা। এই পাতাগুলিকে গুছিয়ে সাজাতে পারলেই কাহিনীটি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। এই ভাবনার নির্বাধ অভিব্যক্তির মধ্যেই অজ্ঞাতমনের মালমসলা আপনা-আপনি ভেসে ওঠে।

কিন্তু এই সব নির্বাধ মনের কথা সত্যিই নির্বাধ নয়। অজ্ঞাত মনের সাধ ইচ্ছা কল্পনা

ও বহুবিধ ভীতি কুণ্ঠা ও বিদ্বেষের প্রকোপে এইসব বাধাহীন কথামালা নানারূপে আত্মপ্রকাশ করে। অজ্ঞাত আবেগের পাত্রদ্বারা সত্যের মুখ অপিহিত। তাকে ব্যক্ত করতে হলে যে বৈজ্ঞানিক কৌশল দরকার, তাকেই ডাক্তার ফ্রয়েড কতগুলি নিয়মাবলী দিয়ে গড়ে তুলেছেন, আর নাম দিয়েছেন—সাইকো-এনালিসিস। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, অধুনা সাইকো-এনালিসিস বলতে শুধু ফ্রয়েডীয় রীতিকেই বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা ও প্রতিভা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন সাইকো-এনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণের প্রণালী রচনা করেছেন।

যেদিন থেকে অবাধ-অনুষঙ্গ রীতিতে ডাক্তার ফ্রয়েড মনঃসমীক্ষণ করে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করতে আরম্ভ করলেন, সেইদিন থেকে তাঁর কাছে এক তিমিরাপসৃত মনোরাজ্যের বিচিত্র রূপ যেন প্রকাশিত হলো। মনের গভীরে এক অগোচরের দেশে তিনি দেখলেন—অজস্র ইচ্ছার দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া, সমন্বয় ও সংমিশ্রণের খেলা। হিস্টিরিয়ার নিদান খুঁজতে গিয়ে তিনি সাধারণভাবে মানসিক তথা স্নায়বিক (অথবা বাতিক) এক সত্তার পরিচয় পেলেন। তিনি দেখলেন—

যাকে আমরা বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া বলি, সেটা সত্যই বিলীন ব্যাপার নয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞতা মনের হিসাবের খাতায় জমা থাকে। কিন্তু দেখা যায় যে, যে-অভিজ্ঞতা প্রীতিকর নয়—সেটা ভুলে যাওয়ার জন্য একটা চেষ্টাবৃত্তি আছে, যার ফলে অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির স্তরে বা অজ্ঞান মনের বন্দীশালায় নির্বাসিত হয়। কিন্তু ইচ্ছাবৃত্তি বারবার চরিতার্থ হবার জন্য ব্যাকুল ভাবে সাড়া দিয়ে ওঠে—আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করে। কিন্তু একটা সজাগ চেষ্টাবৃত্তি তাকে বাধা দেয় ; এই প্রতিরোধশক্তি (Resistance) ও ইচ্ছাবৃত্তির স্ফূর্তি, (Impulse) দুয়ের সংঘাতে মনের বাতিক (Neurosis) অবস্থা সৃষ্টি হয়। বাতিক অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে বলা যায়—ইচ্ছা ও প্রকাশ্য উদ্দেশ্যের পারম্পর্যহীন একটা নিরর্থক আচরণ।

এই পর্যন্ত এসে ডাক্তার ফ্রয়েডের আবিষ্কারের তালিকাটি সংক্ষেপে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক :—(১) সজ্ঞান মন (২) অজ্ঞান মন (৩) দমিত ইচ্ছা (৪) ইচ্ছাবৃত্তির স্ফূর্তি (৫) প্রতিরোধ শক্তি।

বাতিক ও সাইকো-এনালিসিস

[বাতিকের গোপন কথাটি—মনের গহনে দ্বৈরথ যুদ্ধ— প্রবৃত্তি বনাম ব্যক্তিত্ব—সব গণ্ডগোলের মূলে আছে কাম—বাতিক যেন অপমানিত কামাবেগের প্রতিশোধ—বাতিকের উপসর্গ—সাইকো-এনালিসিস।]

বাতিক যেন মনের বিষ আর সাইকো-এনালিসিস হলো ওঝা ফ্রয়েডের মন্ত্রচিকিৎসা।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'বাতিক' নামে মানসিক অসুখের কিছুটা পরিচয় ও ব্যুৎপত্তি বর্ণনা করা হয়েছে। 'বাতিক' কথাটা একটা সাধারণ নামকরণ মাত্র ; এর অর্থের পরিধির ভেতর বহু বিভিন্ন উপসর্গের শ্রেণীবিভাগ আছে। সেই সব উপসর্গের বাহ্যিক প্রকাশ রূপে ও রীতিতে যতই পৃথক হোক না কেন, তাদের উৎপত্তির ইতিহাস এক মূলসূত্রে গ্রথিত আছে। এক কথায় বলতে পারা যায় : বাতিকের উদ্ভব দ্বন্দ্ব (Conflict) থেকে।

কিসের দ্বন্দ্ব?

উত্তর নানা ভাবে দেওয়া যায়। (ক) ইগো বনাম ইদ, ইগো বনাম বাস্তব জগৎ, ইগো বনাম পরা-ইগো—মনের ভেতর এদের যে কোন দু'জনের দ্বৈরথ যুদ্ধে বাতিক অবস্থা

অবশ্য সৃষ্টি করে। (খ) অথবা মনের যে কোন দু'টি ক্রিয়াশক্তির (Psychic forces) পারস্পরিক বিরোধে বাতিক অবস্থা তৈরী করতে পারে। কিম্বা ; মোটামুটি ভাবে বলা যায় (গ) অচেতন ও চেতন মনের দ্বন্দ্ব। যেভাবেই বলা যাক্, বাতিক রহস্যের মূল সত্যটা অবিকল থাকে—দমিত ইচ্ছাবৃত্তির আত্মস্ফূর্তির আবেগ।

এর সঙ্গে ডাক্তার ফ্রয়েডের আর একটা মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত স্মরণে রাখা উচিত। যাকে দমিত ইচ্ছাবৃত্তি বলা হচ্ছে, সেটা নিশ্চয় কামজীবনের কোন অভিজ্ঞতা থেকে প্রসূত। এই অভিজ্ঞতা আসলে বাধাজনিত অভিমান। আদি কামাবেগের অতৃপ্তি নিরোধ ও ব্যর্থতা থেকে অন্তশ্চেতনায় যে জটিল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, সেটাই চেতন মনের আবহাওয়াকে বাতিকের ঝড়ে অশান্ত করে তোলে।

একটি যুবকের মনে সর্ব্বদা অপরিসরতার আতঙ্ক (Claustrophobia) ছিল ; সঙ্কীর্ণ অপ্রশস্ত বা বন্ধ ঘরের ভেতর ঢুকলেই তার মনে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হতো। রেলপথে ট্রেনে যাবার সময় কোন টানেল বা সুড়ঙ্গ পড়লেই এক কষ্টকর মানসিক উৎপাতে তার শান্তি নষ্ট হতো। ঘটনাক্রমে এই যুবককেই যুদ্ধে ডাক্তারের কাজ নিতে হলো। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি ভূগর্ভের ভেতর এক কুঠুরীতে তাকে থাকতে হতো। এই সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তার দিন কেটে যেত, কিন্তু চারদিক থেকে একটা বিভীষিকা যেন তাকে চেপে রাখতো সর্বদা। স্বপ্নে দেখতো—তার মৃত্যু অবধারিত, সেই ঘোর পরিণামের মুহূর্ত ক্রমেই এগিয়ে আসছে। তারপর, স্বপ্নের মধ্যেই তার বাল্যজীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল, তার বয়স যখন চার বছর। ছেলেবেলায় এক বুড়োর বাড়ীতে সে প্রায়ই যেত ;ঘরের যত ফেলে দেওয়া বাজে জিনিষ সেই বুড়োকে দিলে তার বদলে এক আধটা পেনি লাভ হতো। একদিন বুড়োর বাড়িতে যাবার সময় সরু অন্ধকারময় পথের ওপর একটা কুকুরকে বসে থাকতে দেখে সে ভয়ে চম্‌কে ওঠে। এই ঘটনা স্বপ্নে কয়েকবার মনে পড়তেই যুবক ডাক্তারটি বুঝতে পারে যে তার এই স্থান-অপরিসরতার আতঙ্ক মূলতঃ বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত ভীতি থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এই তথ্য উপলব্ধির পর ভদ্রলোকের আতঙ্ক নিরাময় হয়ে যায়।

তার আগে ভদ্রলোকের মনের অবস্থার রকমটা কি ছিল? ভদ্রলোক নিজেও জানতেন না, কেন তার মনে এই আতঙ্ক আসে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে কোন কারণ বলতে পারতেন না ;অথচ আতঙ্কটা সত্য। একেই বলে বাতিক অবস্থা। তাই এককথায় বাতিক বলে সেরে দিলে হয় না। বাতিকের পেছনেও একটা কারণ আছে। ডাক্তার ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের গবেষণার আরম্ভ বাতিকতত্ত্ব নিয়েই। কোন আবেগকে দমিয়ে দিলেই সেটা সত্যি দমে যায় না। সেটা লুকিয়ে পড়ে মাত্র—অচেতন মনের গভীরে। অনেকটা জ্যান্ত পুঁতে ফেলবার মত ব্যাপার। তবে পুঁতে ফেলাটাই একমাত্র সত্য ; প্রোথিত বিষয়ের মৃত্যু হয় না। ঘটনা, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা ও স্মৃতি এক একটা বিশিষ্ট আবেগের পাত্রে সুরক্ষিত হয়ে যেন অচেতন মনের ভাঁড়ারে শিকেয় তোলা থাকে।

মনস্তত্ত্বে, বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায়, একটি কথার উল্লেখ বারবার পাওয়া যায়—Resistance বা প্রতিরোধ। কিসের প্রতিরোধ? কে প্রতিরোধ করে? কেন করে?

সাইকো-এনালিসিস বা মনঃসমীক্ষণের মোটামুটি প্রক্রিয়া হলো—অচেতনতা থেকে এই দমিত আবেগকে মুক্ত করে দেওয়া অর্থাৎ তাকে জ্ঞানের গোচরে আনা। বাতিক

রোগীকে জানতে হবে—কি কারণে তার এই বিভ্রান্তি। এই জানাটাই ওষুধের কাজ করে। সাইকো-এনালিসিস করতে গিয়ে চিকিৎসকেরা দেখেছেন যে রোগীর মনে একটা স্বভাবজ আপত্তির প্রভাব আছে, যা তার মনের কপাটে খিল এঁটে রাখতে চায়—সব কথা অকপটে প্রকাশ করতে তার দ্বিধা থাকে। চিকিৎসককে রোগীর এই প্রতিরোধবৃত্তির বেড়াকে কৌশলে অতিক্রম করে মনের আঙিনায় ঢুকতে হয়। ইগো বা অহং-এর একটা সদা-সতর্ক নৈতিক বা সামাজিক রুচির পাহারা ও শাসনের জন্যই এই প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়।

বাতিক থেকে অনেক রকম চারিত্রিক উপসর্গ দেখা দেয়। কারও মধ্যে একাধিক উপসর্গ থাকে—কারও বেশী, কারও কম। মানসকূট (Complex), আতঙ্ক (Phobia), প্রমত্ততা (Mania), মুদ্রাদোষ, অদ্ভুতদর্শন (Hallucination), খোয়াব (Phantasy), ছলদৃশ্য (Delusion), উদ্বেগ (Anxiety) ও বিমর্ষা (Melancholia) থেকে সুরু করে পাগলামি পর্য্যন্ত সবই বাতিকের এক একটা স্তরভেদ ও রূপভেদ মাত্র। এই সম্পর্কে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল যে, ট্রোমা (Trauma) বা ব্যর্থ ইচ্ছাবেগের অভিঘাত থেকেও বাতিকের বীজ তৈরী হয় ; কারণ এই অভিঘাতও আবেগকে দমিয়ে দেবার ব্যাপার।

অনেক সমাজবিজ্ঞানী আধুনিকসমাজ ব্যবস্থাকেও বাতিক আখ্যা দিয়ে থাকেন। আধুনিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকেও বাতিক ব্যাপার বলা হয়। কেন? এই সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি ও গঠন এমন এক অবস্থায় রয়েছে, যার মধ্যে পরিচ্ছন্নতা নেই। সমাজের কর্ম্মকাণ্ডকে অনেকটা দৈবাধীন বা কার্য্য-কারণের সঙ্গতিচ্যুত ব্যাপার বলে মনে হয়। এমন লোক আছে যিনি জানেন যে দশ টাকার কমে বাজারে কোন শাড়ী পাওয়া যায় না, তবুও স্ত্রীর ছিন্নসজ্জা দেখে পকেটে পাঁচটি টাকা নিয়ে দোকান থেকে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—যদি পাওয়া যায়। এই বিমূঢ়তাকেই মনের বাতিক অবস্থা বলা যেতে পারে। বলা যেতে পারে, ভদ্রলোক যেন ক্ষণিকের জন্য নিজের ওপর সব সংযম হারিয়েছেন। যাকে বাস্তবে অসম্ভব ও অপ্রাপ্তব্য বলে জানছেন, তারই আশায় অস্থির হয়ে ঘুরছেন।

এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডীয় সাইকো-এনালিসিস পদ্ধতির সামান্য একটু পরিচয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। চিকিৎসক রোগীর মনে অবাধ-অনুষঙ্গ (Free Association) প্রথায় ভাবনার মুক্তি আবাহন করেন। রোগীকে অকপট ভাবে এবং অকুণ্ঠার সঙ্গে মনের কথা খুলে বলতে হয়। চিকিৎসক আবার কতগুলি কথা বেছে রাখেন (Stimulus word) ; এবং এই এক একটি কথা উচ্চারণ করে রোগীকে প্রত্যুত্তর দিতে বলেন। প্রত্যুত্তরে যা মনে আসে তাই বলে যেতে হবে, ভেবে চিন্তে বললে চলবে না। কিন্তু চিকিৎসক দেখেন যে রোগীর বক্তব্য সত্যিই দ্বিধাহীন স্রোতের মত স্বতঃপ্রবাহিত হয়ে চলে না। সে মাঝে মাঝে থেমে যায়, কথার গতি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়—কোথাও এসে যেন গোলমালে পড়ে যায়। এই সব লক্ষণ-পরম্পরা থেকে ও প্রত্যুত্তরের কথাগুলির নিহিতার্থ থেকে চিকিৎসকের কাছে ক্রমে ক্রমে রোগীর অচেতন মনের সুগোপন কাহিনীটির রূপ স্পষ্টতর হয়ে আসে। রোগীর মানসিক প্রতিরোধ (Resistance) ক্রমেই শ্লথ হয়ে আসতে থাকে, বিস্মৃতির যবনিকা দুলে ওঠে—হিয়ার-মাঝে লুকিয়ে রাখা সেই গোপনকে প্রকাশ করে ফেলে।

অবশ্য চিকিৎসার প্রারম্ভে রোগীর একটা এজাহার নেওয়া হয়—তার ব্যক্তিগত জীবনের বিবরণ।

সাদা কথায় সাইকো-এনালিসিসকে কথা-চিকিৎসা (Talking treatment) বলা হয়।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুরুরা যজমানদের দিয়ে যেভাবে প্রায়শ্চিত্ত করাতেন—তার স্বরূপ অনেকটা সাইকো-এনালিসিসের মত। যজমান অকপটে তার পুরোহিতের কাছে পাপ স্বীকার (Confession) করে যেত ; ফলে নাকি প্রভুর কৃপা ও মুক্তির প্রসাদ লাভ হতো। আধুনিক মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই প্রায়শ্চিত্তের পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক সার্থকতা ছিল বলেই প্রমাণিত হচ্ছে।

ভুল করি কেন?

[সবাই ভুল করে—বাক্‌ভ্রান্তি—পরিচিত নাম ভুলে যাওয়া—লিখতে ভুল—ভুলের ভেতর দিয়ে অজ্ঞাত ও দমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ—প্রীতিকর স্মৃতির প্রকাশ লাভের চেষ্টা—অপ্রীতিকর স্মৃতিকে চাপা দেবার চেষ্টা—ভুল কখনই অনিচ্ছাকৃত হতে পারে না—ভ্রমাত্মক আচরণ বাতিকের মত ব্যাপার।]

ভুল সবারি হয়। মুনিদের মতিভ্রম হয়, সীজারও ভুল করে, আদিদেব ভোলা মহেশ্বরও ভুল করেন—তখন অন্যে পরে কা কথা।

মানুষই কিন্তু একমাত্র জীব যে মননশক্তিতে বৈচিত্র্যবান আর যত ভুল হয় তারই। পশু-পক্ষীর এ বালাই নেই। যে মননশীল তারই পক্ষে ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝতে হবে ভুলভ্রান্তি মনঘটিত আধি বিশেষ।

মনঘটিত আধি—শুধু এই ধরণের একটা নাতিবিশদ প্রবচনের ভেতর ভ্রান্তির যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। ভ্রান্তি রহস্যের অর্থভেদ করতে ডাঃ ফ্রয়েডের মত প্রতিভাকেও বহু বৎসর গবেষণা-তৎপর হয়ে থাকতে হয়েছে। জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, আচরণগত এই অতিসাধারণ ভুল-ভ্রান্তিগুলিই হ'ল অপস্মার, বাতিক ও উম্মাদ প্রভৃতি বি-মানসিকতার পূর্ব্বগঠন (Prototype)। গুণধর্ম্মে উভয়ই একজাতীয়, পার্থক্য যেটুকু তা শুধু পরিমাণের তারতম্যে।

সচরাচর ঘটিত ভ্রান্তির মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হ'ল-বাক্‌ভ্রান্তি ; বক্তব্য ভাষার ওপর বিভ্রমের প্রকোপ যেন একটু বেশী। ভাষাস্খলন (Lapsus Linguoe) হ'ল বাক্‌ভ্রান্তির অন্যতম লক্ষণ, চলতি ভাষায় যাকে বলে—বেফাঁস বেরিয়ে পড়া কথা। উদাহরণস্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোন অফিসের এক ছোকরা কেরাণী হিসাব লেখায় একটা মারাত্মক রকম ভুল করাতে বড়বাবু ব্যাপারটি উপরওয়ালার গোচরে আনতে উদ্যত হন—যেটা তিনি না করলেও পারতেন। বড়বাবুর হৃদয়হীনতায় দুঃখিত কেরাণী অবশেষে চাটুবাক্যে তাঁর সঙ্কল্প টলাতে মনস্থ করলো। অনেক অনুনয় বিনয় করে কেরাণী বললো—'দেখুন বড়বাবু, এ যাত্রা আমায় মাপ করে দিন ; আমিও এর জন্য বাগে পেলে আপনার উপকার করতে ছাড়ব না।' এই কথা শোনার পর বড়বাবু আর কালবিলম্ব না করে অভিযোগপত্রটি উপরওয়ালার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। কেরাণীর চাকরী গেল।

বড়বাবুর এই কঠোরতায় তাঁকে নিন্দা করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের সুখ্যাতি না করে পারা যায় না। কারণ 'বাগে পেলে' উপকার করবে—কলিযুগে এমন প্রহ্লাদ বিরল। সে হয়তো বলতে চেয়েছিল 'সুযোগ পেলে' বা 'দরকার হলে', তবু এই অনভিপ্রেত 'বাগে পেলে' এসে সব আয়োজন ব্যর্থ করে দিল। বড়বাবুর বক্তব্য এই যে, ছোকরা আসলে তাঁর ওপর বৈরভাব পোষণ করে ; ইচ্ছাটা এই যে ভবিষ্যতে একবার বাগে পেলে

সমুচিত প্রতিশোধ তুলবে।

মানুষের আচরণকে রূপদান করে এক একটি উদ্দেশ্যের প্রেরণা বা ইচ্ছা। ব্যবহারতন্ত্র যেন মানুষের সঙ্কল্প ও কৃতিত্বকে এক সেতুবন্ধে যুক্ত করে রেখেছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখি যে ব্যবহারিক জীবনে এতটা ঋজুতা নেই বরং এর অর্থ যেন একটা অসঙ্গতির জটিলতায় অস্পষ্ট। যে সঙ্কল্পকে কোনকালে মনে ঠাঁই দিইনি সেটাই ব্যবহারের ভিতর মূর্ত্ত হয়ে উঠলো। আবার, যে ইচ্ছাস্ফূর্তি প্রায় আসন্ন, কোন অভাবিত কুণ্ঠায় সেটা যেন প্রতিহত রয়ে গেল। একেই বলা হয় ভ্রান্তি—'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।' সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অলীক হবে না যে, উক্ত কেরাণী বড়বাবুর ওপর প্রতিশোধ স্পৃহা পোষণ করতো যার প্রমাণ ঐ প্রক্ষিপ্ত 'বাগে পেলে' শব্দ দুটি। প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার অভিব্যক্তি স্থূলভাবে ভ্রান্তির এই সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা যেতে পারে। আরো ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভ্রান্তির অর্থ আছে ; নিয়ম, নিমিত্ত কারণও আছে।

এক শ্রেণীর পণ্ডিত আছেন—Meyer ও Meringer প্রভৃতি—যাঁরা ভ্রান্তির ভেতর এতটা অর্থ নিগূঢ়তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এঁরা সোজাসুজি ধ্বনিতত্ত্বের বীক্ষণে বিচার করে বিষয়টির সমাধান করতে প্রস্তুত। এঁদের যুক্তিগুলি বিচারের যোগ্য। ধরুন, কোন সাহিত্যরসিক ভদ্রলোক আবৃত্তি করলেন— কোনকালে ছিলে নাকি মুকুলিকা বালিকা বয়কী। 'বয়সী' ভ্রমদুষ্ট হয়ে 'বয়কী' রূপগ্রহণ করেছে। যুক্তি এই যে, অনুপ্রাসিত পদটির 'ক' প্রবণ শব্দগুলির ধ্বনিসাম্যের দাপটে 'বয়সী'র 'স'কে সরে গিয়ে 'ক'কে স্থান দিতে হয়েছে। এক ব্যাকরণজ্ঞ পণ্ডিত মন্ত্রোচ্চারণ কালে বরাবর একটা ভুল শব্দ ব্যবহার করেন—'বিষ্ণায়'। 'বিষ্ণু' শব্দের চতুর্থীরূপ যে 'বিষ্ণবে' এ জ্ঞান পণ্ডিত মশায়ের অনধিগত নয় ; কিন্তু তবুও আবৃত্তিকালে দাঁড়াতো 'বিষ্ণায়'। কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মধ্যে ধ্বনিসাম্যেই সম্ভবতঃ এই ভুলের কারণ ; বিষ্ণায় হ'ল 'কৃষ্ণায়'-এর ধ্বনিগত অনুকরণ।—এই মোটামুটি এই শ্রেণীর প্রতিবাদীর যুক্তি।

ধ্বনি ও শব্দসাম্যের উপর নির্ভর করে ভাষার যে ভাঙা-গড়া ঘটলো তার ভিতর ভ্রান্তির একটা প্রকাশের ধারা মাত্র লক্ষ্য করা গেল, কিন্তু মূল কারণটি এখনো রয়ে গেল অনাবিষ্কৃত। বাক্‌ভ্রান্তির এমন বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়—যেখানে ধ্বনি ও শব্দগত সাম্যের চেয়ে বৈষম্যটাই অধিকতর প্রকট। যেমন পাটব্যবসায়ী জনৈক ভদ্রলোক সত্যই জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'ইলিশ মাছের গাঁইট কত করে?' তাঁর জিজ্ঞাস্য অবশ্য ইলিশ মাছের 'সের বা মণের' দর। এই সের বা মণ ও গাঁইট— এই শব্দগুলির ধ্বনিগত সাম্য কতটুকু? এক রেলওয়ে কর্ম্মচারী বিশ্বনাথের মন্দিরে বেজায় 'প্যাসেঞ্জারের' ভীড় দেখেছিলেন। ইঙ্গিত 'যাত্রী' কথাটির সঙ্গে 'প্যাসেঞ্জার' কথাটির বর্ণ, শব্দ ও ধ্বনিগত কোন সাম্যের নিদর্শনই নেই। স্পষ্ট প্রতীত হচ্ছে যে, মন বা মনোগত অভিলাষই সকল বাক্‌ভ্রান্তির গোড়ায় কাজ করছে।

দ্বিতীয়, এরা নিতান্ত প্রাকৃত শ্রেণীর প্রতিবাদী, যাঁদের কাছে ভুল ভ্রান্তিগুলি নিছক দৈবতাড়িত অপঘটনা মাত্র। সামান্য একটা বাক্‌ভ্রান্তির বড় বড় তাত্ত্বিক ভনিতাকে তাঁরা মুখ চিরে বিশ্বরূপ দেখার মত উৎকট দার্শনিকতা মনে করেন। যদি একান্তই কোন যুক্তি দেখাতে চান, তবে বলবেন—দেহমনের ক্লান্তি, অবসাদ বা অসুস্থতা ; এরাই ভ্রমের জনক। এটা কোন যুক্তিই নয়, কারণ সুস্থ ও অসুস্থ প্রত্যেক নরনারীর আচরণে এই অনর্থসেবা

পরিস্ফুট। এই প্রতিযুক্তিতেও নিরস্ত না হয়ে ডাঃ ভুন্টের (Dr. Wundt) মতানুসারী প্রতিবাদীরা বলেন যে, দেহমনের অসুস্থতা ভ্রান্তির সাক্ষাৎ কারণ না হোক পরোক্ষ কারণ বটে ; অর্থাৎ এই অসুস্থতাজনিত যে অন্যমনস্কতা—তাই ভ্রমের প্রকৃত জন্মহেতু।

অন্যমনস্কতা যে ভ্রান্তির মূল কারণ হতে পারে না তার প্রমাণ কোন বীণ্‌বাদকের সুরবিভোর আবেশ যিনি লক্ষ্য করেছেন তিনি সহজে বুঝবেন। বাদকের আঙুল ঝরঝার ধারার মত তন্ত্রীর ওপর আঘাত হেনে চলেছে, অথচ তার মন তখন একটিমাত্র সুরের ধ্যানে নিবিষ্ট। সে নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তে প্রত্যেকটি আঙুল খেলাচ্ছে না। বাজনার যান্ত্রিক বিষয়টি সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন, তবুও সুর ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রত্যেকেই এক আধবার নিজের এই সব্যসাচীরূপ দেখেছেন ; গভীর মনোযোগের সঙ্গে হয়তো গণিতের কোন জটিল সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত অথচ তারি সঙ্গে গুনগুন ক'রে একটা প্রচলিত গানের গুঞ্জন চলেছে। গণিতের সমস্যায় নিযুক্ত মন বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত গানের ভাষার যোগান দিয়ে যায়—ভুল হয় না।

আবার মনস্কতা সত্ত্বেও যে ভুল হয়—এটা পরীক্ষিত সত্য। শিশুপাঠ্য এক গল্পে আছে—এক বালক তার মায়ের আদেশমত হাটে কতগুলো জিনিষ কিনতে চলেছে। যথা, 'পাকা পাকা বেল, সরিষার তেল, ডিমভরা কই, চিনিপাতা দই।' নিজের স্মৃতিশক্তির ওপর ছেলেটির বিশ্বাসের অভাব ছিল ; কাজেই সে পথে যেতে যেতে খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে উক্ত তালিকাটি মুখস্থ ও মনস্থ করে চললো। অবশেষে দোকানীকে গিয়ে বললো,—দাও, 'পাকা পাকা তেল, সরিষার বেল, ডিমভরা দই, চিনিপাতা কই'। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে বালকটির এতখানি কৃচ্ছ্র মনসংন্যাস আর সতর্কতা সত্ত্বেও ভ্রান্তি ঘটে গেল। য়ুরোপের কোন সংবাদপত্রে 'Crown Prince' কথাটি ভুলক্রমে ছাপা হয় 'Clown Prince'। পরদিন পত্রিকায় এই ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও সংশোধন ক'রে আবার ছাপা হয় 'Clown Prince'। ভুলের এই জেদ বা পৌনঃপুনিকতার উদাহরণ অনেকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবেন। অতএব ভুলের কারণ হিসাবে অন্যমনস্কতার দাবী অগ্রাহ্য।

ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমতে এই ভাব ভাষা বা শব্দ ধ্বনিগত সাদৃশ্য এবং মনের অবসাদ, দেহের অস্বাস্থ্য ও অন্যমনস্কতা—এরা ভ্রমের মূল কারণ নয়। এরা ভ্রমের সম্ভাবনাকে সহজতর করে দেয় মাত্র। প্রচ্ছন্ন কোন ইচ্ছা এই রকম প্রতিবন্ধকহীন পথে আত্মপ্রকাশ ক'রে 'কর্ত্তব্য ইচ্ছা'কে আক্রমণ করে—ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। একটি অভীপ্সাকে কক্ষচ্যুত ক'রে অপর একটি অভীপ্সার আবির্ভাব। ভ্রান্তির মধ্যে এইরকম একটা সঙ্ঘর্ষের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাওয়া যায়, যার একদিকে রয়েছে প্রচ্ছন্ন 'গূঢ় ইচ্ছা' আর অপরদিকে রয়েছে আশু-সম্পাদ্য 'কর্ত্তব্য ইচ্ছা'। গূঢ় ইচ্ছাই আক্রমক আর কর্ত্তব্য ইচ্ছা আক্রান্ত।

আমাদের নিত্যকৃত্য আচরণগুলি আরো বহুবিধ জটিলতর ভ্রান্তির প্রকোপে বিকৃত হয়ে যায় অথচ তার কোন নিকট হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না! অর্থাৎ গূঢ় ইচ্ছাটাও এখানে অজ্ঞাত—চেতনার নেপথ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। গবেষকের কাছে এইটিই বিশেষ বিচারণীয় তথ্য।

যত জটিলতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় স্মরণভ্রান্তির মধ্যে। মণীন্দ্রবাবু একজন সুপরিচিত প্রতিবেশী অথচ কথাপ্রসঙ্গে তার নামোল্লেখের প্রয়োজন হলেই স্মৃতি যেন বন্ধ্যা হয়ে

যায়—কিছুতেই নামটি মনে আসে না। বিশ্লেষণে ধরা পড়বে যে, অচেতনতার সুগভীর স্তরে নিশ্চয় 'মণীন্দ্র' কথাটির সঙ্গে সম্পর্কিত কোন তিক্ত অভিজ্ঞতার ক্ষত সুগুপ্ত হয়ে রয়েছে; স্বভাবতঃ আনন্দপ্রবণ ইচ্ছাটি কোনমতেই সে ক্ষতে পুনরাঘাত করতে রাজী নয়। স্মরণ-ভ্রান্তি অর্থে তা হ'লে বোঝা গেল—অভিজ্ঞতা চাপা দেবার প্রয়াস। কিন্তু এটা হয় শুধু দুঃখকর অভিজ্ঞতার বেলায়। যদি কেউ মাইকেলের একটা কাব্যাংশ আবৃত্তি করতে গিয়ে বলেন,—

'ধরে উচ্চ স্বর্ণছত্র মণীন্দ্র যেমতি
ধরেন আদরে ধরারে।'

এখানে 'মণীন্দ্র' কথাটি ভুল, আসল কথাটি হ'ল ফণীন্দ্র। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, উক্ত প্রক্ষিপ্ত 'মণীন্দ্র' কথাটি কোন বহু পুরাতন সুখস্মৃতির ভগ্নাংশ—সমগ্র পরিচয়ের শুধু আবছায়াটুকু বহন করে এনেছে। এই বাক্‌ভ্রান্তি স্মৃতিঘটিত একটি ব্যাপার—যার ভেতর সেই পুরাতন সুখকর অভিজ্ঞতার অহংপূর্ব্বিকা দেখা যাচ্ছে। স্মরণভ্রান্তির ভেতর দুই বিপরীত পরিদৃশ্য দেখা গেল—অভিজ্ঞতাকে চাপা দেওয়া এবং অভিজ্ঞতাকে জাগিয়ে তোলা, দুইই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের কথা এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে—'তবু শ্রীকে মনে করা সীতারামের উচিত ছিল। রমা-সুখ, নন্দ-সম্পদ, শ্রী-বিপদ ; যার একদিকে সুখ আর একদিকে সম্পদ তার কি বিপদকে মনে পড়ে?'

জিনিষপত্র হারিয়ে ফেলা বা অযথাস্থানে রেখে আসা—এইগুলি আর এক জাতের স্মরণভ্রান্তি। কত প্রীতি উপহার, সম্মানপদক বা সখের জিনিষ, যাকে লালন করতে সাবধানতার অন্ত নেই, এমন জিনিষও মানুষ হারিয়ে ফেলে। এর কারণ কি? কবি বলে দিয়েছেন,—'তোমায় নতুন করে পাব ব'লে হারাই ক্ষণে ক্ষণে।' ডাঃ ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তেও এই কবিকল্পনার প্রতিধ্বনি পাই—এই হারিয়ে ফেলা ব্যাপার হলো—একটা আশঙ্কিত বৃহত্তর ক্ষতি এড়াবার জন্য স্বেচ্ছায় ছোটখাট স্বার্থোৎসর্গ। এই হলো সকল 'হারানো ও নিরুদ্দেশের' মর্ম্মকথা, অনেকটা উপনিষদের 'ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা'র মত শোনায়।

কথিত আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় সদ্যবিবাহিতা বন্ধুকন্যাকে আশিসোক্তি করেছিলেন—'আশীর্ব্বাদ করি বিধবা হও'। কথাটা সম্ভবতঃ নেহাৎ অজ্ঞাতসারে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। মনস্তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, মেয়েটি বিধবা হোক এই ছিল তাঁর মনের প্রকৃত ইচ্ছা, যাতে তিনি মেয়েটিকে আবার বিয়ে দিতে পারেন, তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচারের আদর্শ চরিতার্থ করবার সুযোগ পান।

লিখন ভ্রান্তির ভেতরও এই প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার কারসাজী দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা নিরালায় বসে আনমনে হিজিবিজি লিখে চলেছে; হঠাৎ চমকে দেখে, লেখা রয়েছে 'জগৎসিংহ'—কখন লিখলো তা সে নিজেই জানে না। এই তিলোত্তমা-জগৎসিংহ মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা বাহুল্য ; সেটা সর্ব্বজনবিদিত তথ্য। ডাঃ ফ্রয়েড লিখন ভ্রান্তির একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক নরহন্তা নিজেকে জীবাণুতত্ত্ববিৎরূপে পরিচিত করে সরকারী জীবাণুশালার অধ্যক্ষকে পত্র লেখে—'আপনাদের প্রেরিত জীবাণু নিয়ে আমি লোকের ওপর পরীক্ষা করে দেখতে চাই' ইত্যাদি। তার লেখবার ইচ্ছা ছিল 'জীবজন্তুর ওপর' কিন্তু প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার প্রকোপে ভুলের বশে 'লোকের ওপর' এই সত্য কথাটি বেফাঁস লেখা হয়ে

গেল। এই লিখন ভ্রান্তির ওপর নির্ভর করে পুলিশ অনুসন্ধান চালায় ও অবশেষে তাকে হত্যার প্রমাণসহ ধরে ফেলে।

লিখন ভ্রান্তির মত পঠন ভ্রান্তিও পাঠ্য বস্তুকে বিকৃত ও কটুশ্রাব্য করে তোলে। একটি কৌতুককর হিন্দী গল্প আছে যে, এক ভদ্রলোক পত্র পড়লেন, কেউ তাকে লিখেছে—'আপকা লড়কা আজমীর গিয়া'। তিনি পড়লেন—'আপকা লড়কা আজ মর গিয়া'। সঙ্গে সঙ্গে পুত্র শোকে বুকফাটা চীৎকারে পাড়া মাতিয়ে তুললেন। তার পুত্র মারা যাবে, এই ধরণের একটা দুর্ভাবনা সম্ভবতঃ ভদ্রলোকের মন সব সময় অধিকার করে থাকতো যাকে পুত্রের মৃত্যু কামনারি রূপান্তর বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

শ্রুতি ও দৃষ্টিঘটিত ভ্রান্তি এই একই কারণে ও রীতিতে নিষ্পন্ন হয়—প্রচ্ছন্ন ইচ্ছার কীর্তি। ভ্রান্তির এই দৃষ্টান্তগুলির এখন দুটো গুণবিভাগ করা যায়। প্রথম বিভাগে পড়ে সেই শ্রেণীর ভ্রান্তি যার ভেতর ভুলো মানুষ সহজেই তার প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাটিকে চিনে ফেলতে পারে। দ্বিতীয় বিভাগে পড়ে উৎকট শ্রেণীর ভ্রান্তিগুলি। ভ্রান্তির ভেতর যে ইচ্ছাটা প্রকট হয়ে পড়লো তার মর্ম্মার্থ ভ্রমকারী বুঝতে অসমর্থ বা তাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। ভ্রান্তিটি যে তারই ইচ্ছাজনিত বা ইচ্ছাকৃত এ যুক্তি তাদের কাছে আদৌ বিশ্বাস্য নয়।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর ভ্রান্তিগুলিই বিশেষ গবেষণার বিষয় ; আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক এই তথ্যের ভূমিকার ওপর তার সুবৃহৎ কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছে। যেমন, এক কবির জন্মবার্ষিকী দিনে আর এক কবি বক্তৃতাক্রমে বল্লেন—'কবির এই পঞ্চাশতম মৃজন্মবার্ষিকী দিনে'—ইত্যাদি। দেখা যাচ্ছে যে, বক্তৃতার সহজ প্রবাহে বক্তার ভাষায় 'মৃত্যুবার্ষিকী' কথাটাই এগিয়ে এসেছিল যা বক্তব্য 'জন্মবার্ষিকী'র সঙ্গে আপোষ করে দাঁড়াল 'মৃজন্মবার্ষিকী' রূপে। যশঃক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী এক কবির প্রতি আর এক কবির মনে একটা বিরুদ্ধভাব—তার মৃত্যু কামনা—লুকিয়ে থাকা আশ্চর্য্য নয়। এই বাক্‌ভ্রান্তিটা সেই মনোভাবের অর্দ্ধোস্ফুট উদ্গার মাত্র। উক্ত বক্তা কিন্তু তার মনে এমন কোন মনোভাব বা ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর আপত্তি তুলবেন।

দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের অন্তর্লোক জুড়ে শত শত বাসনার কণা ক্রীড়াচঞ্চল সফরীর মত নিয়ত ছুটে বেড়ায় এবং সুযোগ পেলেই সজ্ঞানকে ফাঁকি দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করে, নিত্যকর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত বা বিকৃত করে। সুতরাং ভ্রান্তি হলো কতকগুলি কর্ত্তব্য-বিষম কর্ম্ম যা অজ্ঞানকৃত বটে কিন্তু অনিচ্ছাকৃত নয়। এই ইচ্ছাটাই শুধু অজ্ঞাত। আমরা অনেক কিছু করি বলি বা শুনি যার সঙ্গে নিকটকর্ত্তব্যের কোন যোগসূত্র নেই—কেন করলাম তাও বুঝে উঠতে পারি না।

'ভুলে থাকা নয় সেতো ভোলা
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি রক্তে মোর
দিয়েছে যে দোলা।'

কবির এই উক্তির সঙ্গে মনোবিজ্ঞানীর অনুশীলনলব্ধ সিদ্ধান্ত প্রায় অভিন্ন। এই মনই তো জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সকল বাসনার একমাত্র নীড়। জীবনের অপোগণ্ড দশা থেকে সুরু করে বর্ত্তমানের পূর্ব মুহূর্ত পর্য্যন্ত অজস্র সাধ নিগ্রহের তাড়নার অপসৃত হয়ে এক অজ্ঞাত মানসন্দ্রণের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করছে। এই অজ্ঞাত ইচ্ছাই 'অন্তর মাঝে বসি অহরহ' মুখ থেকে ভাষা কেড়ে নেয়, নিজের কাহিনী কহে।

ভ্রান্তির মূল কারণ আবিষ্কৃত হল, এর প্রকাশের বহুবিধ ক্রম ও নিয়মের আভাস পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন, ভ্রান্তির সার্থকতা কি? জীবনচর্য্যার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?

এই ভ্রান্তি, যত অকাজের কাজগুলি, বলতে গেলে শত শত আনন্দের আয়োজন (Flight from the unpleasant)। ভ্রান্তি পরোক্ষভাবে কামনাপূর্ত্তির অনুষ্ঠান—জীবনস্মৃতির বেদনাক্লিষ্ট পরিচ্ছেদগুলি বাদ দিয়ে চলবার একটা কুটিল প্রচেষ্টা। শুধু অভিব্যক্তির জটিলতা এর স্বরূপের ওপর অনর্থের মুখোস চাপিয়ে দিয়েছে।

ইচ্ছাবৃত্তির ধর্ম্মই এই—বিরস হতে রসে, আনন্দবিরল হতে আনন্দঘনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। তাই সকল ভুলভ্রান্তির কাঁটা ধন্য করে কামনার ফুল প্রতিনিয়ত ফুটে ওঠার চেষ্টা করছে।

অবরুদ্ধ অজ্ঞাত ইচ্ছার প্রতিক্রিয়ায় শুধু ভ্রান্তি কেন, তার চেয়েও নিদারুণ অনাসৃষ্টি উদ্ভূত হয়ে মানুষের চারিত্রিক জীবন বিকল করে দেয়। বাতিক জাতীয় (Neurosis) যত সব মনোব্যাধি এই ভ্রান্তিরই সমগোত্র। এইখানে এসে মিলেছে ভ্রান্তি বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত ও মনোবিকলন তত্ত্বের জন্মসূচনা। অজ্ঞাত ইচ্ছাকে জ্ঞাত করানো—সংক্ষেপতঃ এই হল মনোবিকলন তত্ত্বের কারুমিতি, যার ফলে রোগী তার স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পায়।

অনর্থের কণ্টকারণ্যে এমনিভাবে অগোচরে একটা এত অর্থপূর্ণ তত্ত্বের অঙ্কুর পড়েছিল যা ডাঃ ফ্রয়েডের প্রতিভার স্পর্শে উদ্ভিন্ন হলো বনস্পতিরূপে—মনোবিকলন তত্ত্বে—সহস্র সন্তপ্ত পথিকের ছায়াশ্রয়রূপে।

অকাজের কাজ

[ভ্রমাত্মক কাজ—বিলক্ষণ কাজ—অপঘাত—জিনিষ হারিয়ে ফেলা—মুদ্রাদোষ—অবশ্যম্ভাবী বা Determinism—অতিপ্রত্যয় বা Superstition—দৈবীমূর্তি দেখা ও অন্যান্য অলৌকিক দৃশ্য দেখার মনস্তাত্ত্বিক কারণ—প্রায়শ্চিত্ত বলিদান উৎসর্গ ইত্যাদি লোকাচারের রহস্য—পরকৃতীক্ষা বা Paranoia—জাতিস্মরতার ব্যাখ্যা।]

কথিত আছে যে, রাজা সোলোমন পশুর ভাষা বুঝতে পারতেন। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকও কতকটা এই গৌরবের দাবী করতে পারে। তবে তাঁরা ঠিক পশুর ভাষার অর্থভেদ করেন না ; মানুষেরি অর্থহীন ভাব ভাষা ও আচরণকে তার সকল অবোধ্যতার নির্ম্মোক হতে মুক্ত করে তাকে একটি সত্য তাৎপর্য্যে বিভূষিত করতে সমর্থ হয়েছেন। মানুষ কর্ম্মপরায়ণ জীব ; তার সমগ্র জাগ্রত জীবনের চলা-বলা দেখা শোনার পেছনে রয়েছে কর্ত্তব্যের অঙ্কুশ। কিন্তু পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে, একজন সুস্থ মানুষের একটি দিনের কর্ম্মসূচী, খুঁটিনাটি সমেত তার আচরণের আদ্যোপান্ত ইতিহাসটি যদি আলোচনা করি, তবে বোঝা যাবে তার কাজের অর্দ্ধাংশের ওপরই হল প্রকৃতপক্ষে অকাজ, যার সঙ্গে নিকট কর্ত্তব্যের কোন যোগসূত্রের বালাই নেই। আপাত-দৃষ্টিতে এই সব আচরণ-গত উৎপাতগুলিকে আকস্মিক, অযথা ও নিরর্থক মনে হয়। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের একটা মূলসূত্র এই যে, ব্যবহারের ভেতর দৈবাৎ আকস্মিক অনর্থক বা কারণহীনভাবে কোন পরিদৃশ্য দেখা দিতে পারে না। একটা জলাশয়ে ক্ষুদ্রতম বুদ্বুদেরও আবির্ভাবের পেছনে থাকে জলাশয়ের অন্তস্থলব্যাপী আলোড়ন। কোন কাজই অনভীপ্সিত (Unmotivated) নয়। মুদ্রাদোষের মত অর্থহীন আচরণকেও স্বাধীন স্নায়বিক প্রেরণার (Motor action) ফল মনে করবার কারণ নেই।

মানুষের এই নিত্যকৃত অকাজ বিশেষ করে এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে,—সে প্রকৃতই সদ্ধর্ম্মশীল জীব, সে বেশীক্ষণ কপট ব্যক্তিত্বের মুখোস পরে থাকতে অক্ষম। মানুষের প্রত্যেকটি ভুল ও অকাজের মধ্যে দেখতে পাই তার সত্যস্বরূপের প্রতিষ্ঠায় সে প্রতিনিয়ত তৎপর হয়ে রয়েছে। ভাবের ঘরে চুরি করতে মানুষ তার মনের দিক থেকে সত্যিই কোন তাগিদ পায় না।

অকাজের কাজ—স্খলন, পতন, ত্রুটি— এই সব ব্যবহারিক প্রমোদগুলিকে ডাঃ ফ্রয়েড গুণকর্ম্ম অনুসারে দুটো শ্রেণী বিভাগ করেছেন—(১) ভ্রমাত্মক কর্ম্ম (Erroneously Carried Out Action) এবং (২) বিলক্ষণ কর্ম্ম (Symptomatic or Chance Action)।

অসাবধানে জিনিষপত্র ভেঙ্গে ফেলা, হোঁচট বা আছাড় খাওয়া অথবা অন্যধরণের ছোটখাট কোন অপঘাত— এই সব হল সচরাচর অনুষ্ঠিত অপকর্ম্ম বা ভ্রমাত্মক কর্ম্মের নমুনা। এমন সর্ব্বগুণাধার নরোত্তম আজও জন্মায় নি, যিনি কোন প্রকার ভ্রমাত্মক কর্ম্মবিপাকের উর্দ্ধে। বিনা উত্তেজনায় ও নেহাৎ শান্ত অপ্রমত্ত অবস্থায় ভদ্রাভদ্র জ্ঞানী-মূর্খ প্রত্যেকে ভ্রমাত্মক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

ভ্রমাত্মক কর্ম্মের বৈশিষ্ট্য হল যে, তারা কোন ঘটনার অজুহাত না পেলে প্রতিষ্ঠারও সুযোগ পায় না। অর্থাৎ ভ্রমাত্মক কর্ম্মের একটা অবলম্বন চাই। মনের ভেতর যে দ্বন্দ্ব চলেছে—যে অভীপ্সাটি বড় অন্তরঙ্গ তাকেই জাহির করার প্রচেষ্টা মুখ্যতঃ এই কর্ম্মভ্রংশের মূল দৃষ্টান্ত—চাকরের ওপর রাগ করে চায়ের পেয়ালাটি আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলা অনেকের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। আসলে এটা হল একটা প্রতিবাদের পদ্ধতি বা বিদ্রোহ। সুতরাং যখন রাগ না করেও হঠাৎ (?) হাত থেকে পেয়ালা পড়ে ভেঙ্গে যায়—তখনও সেই প্রতিবাদই—এ অনুমান অযৌক্তিক নয়। তবে এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদটা কিসের বিরুদ্ধে তা সহজে বোধগম্য হবে না, কারণ সেটা অজ্ঞাত। হলই বা অজ্ঞাত— তারই জের এখানে এসে পৌঁছেছে ব্যবহারের ওপর। হস্তধৃত পেয়ালা এই অসম্বৃত অবস্থার সুযোগ নিয়ে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল।

গ্রহশান্তি ও স্বস্ত্যয়ন—দেবতাকে বিবিধ ভোগ ও উপচারে পরিতুষ্ট করার যে সব রীতি ও অনুশাসন সভ্য বা বর্ব্বর সব মানুষের মধ্যে অল্পাধিক বর্তমান, তার সূচনা হয়তো হয়েছিল এই ভাবেই। যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আশঙ্কা থেকে এই পেয়ালা ভাঙ্গার মত তুচ্ছ একটা স্বার্থবলির সৃষ্টি, তা ভাবালঙ্কারে সুসংস্কৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক বিবেকবোধ, যা বস্তুতঃ সকল প্রকার ধর্ম্মাচরণের প্রেরণা যুগিয়ে থাকে।

আকস্মিক অপঘাতের (Accidental injury) দরুণ অঙ্গহানি হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। আকস্মিকতার দোহাই কিন্তু এখানে খাটে না। অপঘাত না বলে আত্ম-অপহত্যা বলাই যুক্তিযুক্ত কেন না আপাত বিচারে যতই অবিশ্বাস্য হোক না কেন, এত বড় যে কষ্টকর বিচ্যুতি, তা'ও সত্যই মানুষ স্বেচ্ছায় সেধে সৃষ্টি করে থাকে।

ক্ষণিকের উত্তেজনার প্রকোপে মানুষ আত্মহত্যা করে বসে এ কথা সত্য নয়। বরং দেখা যায়—আত্মহত্যার প্ররোচনা নির্জ্জান মনে বহুদিন ধরে প্রধূমিত হতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে ঘটনা সহায় হয় সচেতন মনের দ্বিধা প্রতিবাদগুলিও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে তখন আত্মহত্যার প্রলোভন দুর্দ্দম্য হয়ে উঠে।

আত্মহত্যা লিপ্সার মত এত নিদারুণ একটা অসামাজিক মানসকূট (Complex) বুদ্ধিজ সংস্কারের চাপে প্রচ্ছন্ন থাকতে বাধ্য হয় এবং ঘটনার সম্পূর্ণ সাহায্যের অভাবেও ছোটখাট সুযোগের ফাঁকে দেখা দেয় অপঘাতরূপে। ডাঃ ফ্রয়েডের মতে, যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে আত্মনিধনের কামনা উদ্বুদ্ধ হয়, তার মধ্যে আত্মগ্লানিকর একটা অশান্ত ক্ষোভ বর্তমান থাকে। এই ক্ষোভজনিত উদ্ভাবনার (Phantasy) প্রতিক্রিয়ার অজ্ঞান মানসপটে যে তাগিদ সৃষ্টি হয়—তারই চূড়ান্ত প্রকাশ আত্মহত্যায়। প্লেগমারী পীড়িত দেশে 'গৃহদাহে'র সুরেশের পলায়ন ও অবশেষে প্লেগেরি কবলে তার মৃত্যুতে আমরা তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সহজ পরিণতি দেখতে পাই। যে মনোধর্ম্ম থেকে হোঁচট খাওয়া বা পতনজনিত দুর্ঘটনায় হাত পা ভাঙ্গা ইত্যাদি অপঘাতের উদ্ভব, তারই দান হল আধুনিক ধর্ম্মাচরণের প্রায়শ্চিত্ত বিধান। যে কোন অনুশোচনা বা শোকের কারণ থাকলে লোকে আত্মনিগ্রহের ব্যবস্থা করে। উপবাস, বৈরাগ্য প্রভৃতি বহুবিধ কষ্টকর লৌকিক কৃচ্ছ্রাচারের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এইভাবে সম্ভব।

দুষ্মন্ত রাজার কাছে যাবার সময় শকুন্তলার হাত থেকে রাজার দেওয়া উপহার আংটিটি নদীর জলে পড়ে যায়। উক্ত আংটি ছিল শকুন্তলার পরিচয়ের বাহন। এই দুর্ঘটনার পেছনে শকুন্তলার মনের ইচ্ছা কোন কাজ করেনি এমন কথা বলা যায় না। শকুন্তলা নিশ্চয় চাইছিল, ফিরে যেতে, মুনি কণ্বের ছায়াশীতল তপোবনে ; দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের উগ্র গরিমার ওপর তার কোন আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু কল্পনা করা যাক, যাত্রারম্ভে বা পথে শকুন্তলা পড়ে গিয়ে পা ভাঙ্গলো। এই অপঘাত যদি সত্যই ঘটতো তা হলো নিঃসংশয়ে বলা যেত যে, দুষ্মন্তের বিরুদ্ধে তার অন্তরে একটা প্রতিবাদ, কোন রুদ্ধ আশঙ্কা বা বেদনার ধিক্কার লুকিয়ে ছিল— যার ফলে এই অপঘাত বা আত্ম-অপহত্যা। লোকে লজ্জায় জিভে কামড় দেয়—সুতরাং আবার কখন যদি কোন লজ্জা অজ্ঞাতসারে মনে প্রবেশ করে তাহলে হঠাৎ হয়তো জিভে কামড় পড়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ এই হলো অপঘাতের টেকনিক।

ভ্রমাত্মক কর্ম্ম মাঝে মাঝে রূপকভাবে দেখা দেয়। একে বলা হয় বিলক্ষণ কর্ম্ম (Symptomatic or Chance Action)। ডাঃ ফ্রয়েড বিলক্ষণ কর্ম্মের একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। এক মহিলা তাঁর বিবাহের দিনে ছুরি দিয়ে নখ কাটতে গিয়ে অসাবধানে হাতের আংটি পরার আঙুলটি বিক্ষত করে ফেলেন। এ বিবাহে মহিলার মনে প্রচ্ছন্ন আপত্তি ছিল, এ তারই প্রমাণ। তবে প্রমাণটা এক রূপকের আশ্রয়ে অস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। যদি মহিলাটি ঠিক বিবাহলগ্নে তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণের পোষাকটি পরিধান করে বসতেন, তবে সেটা হত ভ্রমাত্মক কর্ম্ম—যার ভেতর তাঁর গূঢ় ইচ্ছাটা বেশ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে রূপকের যে স্থান, অপব্যবহারের মধ্যে বিলক্ষণ কর্ম্মের সেই স্থান। উষ্মার আবেশে কেউ যখন কারো মুণ্ডপাতের কামনা করেন, সেই সঙ্গে তিনি হয়তো তাঁর হস্তধৃত কোন বস্তু—কাগজ খড়কুটো ইত্যাদি—ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলবেন। এ প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর ভ্রমরের কথা উল্লেখযোগ্য। বেচারা বেড়াল মারতে গিয়ে ভুল করে নিজের মাথায় লাঠি মেরে বসলো 'ভ্রমরের কপাল ভাঙ্গিল'। ভ্রমরের ভাঙা ভাগ্যের বেদনা প্রতীকের রূপে প্রকাশ পেল, তার কপাল ভাঙ্গার অভিনয়ে।

মুদ্রাদোষ নামে যে উপলক্ষবিহীন আচরণ প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায়, তা এই বিলক্ষণ কর্ম্মের অন্তর্গত। এমনিতে মনে হয় মুদ্রাদোষগুলির কোন উদ্দেশ্য নেই, কারণ নেই ;

যেন—'আপনার মাঝে আপনি রয়েছে বাঁধা।' কিন্তু সত্যিই কি তাই?

কেস্তন থেকে ভুনাগ রাজার রাণী কেসর খাঁকে হোরি খেলার আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছিলেন।

'পত্র পড়ে কেসর উঠে হাসি
মনের সুখে গোঁফে দিল চাড়া।
রঙীন দেখে পাগ্‌ড়ি পরে মাথে
সুর্ম্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে
গন্ধভরা রুমাল নিল হাতে
সহস্রবার দাড়ি দিল ঝাড়া।'

কেসর খাঁর এই রুমাল ঝাড়া ও গোঁফে চাড়ার মত আচরণ যখন অভ্যাসগত হয়ে পড়ে, তখনই তাকে বলা হয় মুদ্রাদোষ। সুতরাং মুদ্রাদোষও Unmotivated নয়—কোন অতৃপ্ত সঙ্কল্প পাকাপাকিভাবে অজ্ঞান মনে বসে গিয়ে মুদ্রাদোষের ভিতর দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে স্ফূর্তি লাভ করে। অবশ্য মুদ্রাদোষগুলি এত নিখুঁত ও পরিপুষ্ট আচরণ যে, হঠাৎ মনে হয়, এগুলি যেন সকল মনায়নের সীমানার বাইরে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কবি তাঁর সহজ মনোদৃষ্টির বলে অনুভব ক'রে বলেছেন—

'মর্ম্ম মাঝে বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে।'

এই মানসপ্রকৃতির নাম অবশ্য-মনন (Determinism)। মুদ্রাদোষের হেতু অন্বেষণে অবশ্য-মননের কীর্তি দেখতে পাই। সুতরাং অবশ্য-মননের বিষয় একটা ব্যাখ্যা আবশ্যক।

ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য (Free Will) নামে যে কথাটির সঙ্গে আমরা সুপরিচিত, তার প্রকৃতই কোন অস্তিত্ব আছে কি না তাতে প্রচুর সন্দেহ রয়েছে। ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য নামে সদ্বস্তু যদি কিছু থাকে, তবে তা সচেতন মন ও সংস্কারের রাজ্যে। যদি মনোগত আবেগকে 'ইচ্ছা' বলা হয়, তবে তার কোন স্বাতন্ত্র্য-গুণ থাকতে পারে না। বরং মনের ক্রিয়াকলাপের ভেতর ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যের বিপরীত ভাবটিই অর্থাৎ অবশ্য মননের প্রতিপত্তি দেখতে পাওয়া যায়। যদি কাউকে আপন খুসী মত একটা সংখ্যা বা নাম প্রস্তাব করতে আহ্বান করা হয়, তবুও তার উত্তরটা স্বাধীন ইচ্ছার প্রমাণ দেবে না। তার উত্তর যদি হয়—২৪ সংখ্যা, তবে একটু বিশ্লেষণেই এ রহস্য ধরা পড়ে যাবে যে, উক্ত ২৪ সংখ্যাটির সঙ্গে তার কোন গূঢ় অভিলাষ সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এমনও হতে পারে যে, তার পক্ষে চব্বিশ বৎসর বয়সটি পরম কাম্য। যতই চেষ্টা করুন অন্য কোন একটা সংখ্যা স্মরণ করতে— এই চব্বিশই ফিরে ফিরে আপনার স্মরণের পথে এসে দাঁড়াবে, সেই ছাড়ালে-না ছাড়ে পুরাতন ভৃত্যের মত।

অবশ্য-মননের কূটলীলার বিষয় যা বলা হলো, সেই তথ্যের আলোকে ভাবগ্রাস (Obsession) ও বাতিকের (Neurosis) রহস্য সমাধান সহজ। মুদ্রাদোষও এই আবেশের তামসিকতায় আচ্ছন্ন—অন্ধ আচরণ সমষ্টি মাত্র। 'সুসংহত চিন্তাবৃত্তি, যার সঙ্গে সংজ্ঞানের কোন যোগ নেই—' ডাঃ ফ্রয়েড অবশ্য-মননের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন।

কঠোর অবশ্য-মননের প্রভাবে ভাবগ্রাস প্রখর হয়ে ওঠে এবং তখন মুদ্রাদোষ বাতিকে পরিণত হয়। 'চার প্রহরে চারবার দাঁত খুঁটতে হয়। প্রত্যেকবার ১০৮টি খড়কের সদ্ব্যবহার

করা হয়। যতক্ষণ না রক্তপাত হয়। মাড়ির ঘা শুকুতে পারে না।'—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের এক চরিত্রের এই শুচিতার বাতিক ভাবগ্রাসের (Obsession) চরম পরিণতির দৃষ্টান্ত। মুদ্রাদোষ ক্রমোন্নীত হ'য়ে বাতিকে গিয়ে পৌঁছেছে।

ভ্রমাত্মক কর্ম্মের শেষ পর্য্যায়ে পড়ে অদ্ভুতদর্শন (Hallucination), দৈবীমূর্ত্তি, নিশির ডাক প্রভৃতি। প্রাচীন দার্শনিকের কাছে এইসব অভিদৃশ্য ছিল প্রহেলিকা। নিজেদের বিচার-দৃষ্টির অক্ষমতার কারণে তাঁরা বিভ্রমগুলিকে অলৌকিক রহস্যের কোঠায় ঠেলে দিয়েছেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণের কাছে আজ প্রহেলিকাদি বিভ্রমের অতিপ্রাকৃত রহস্যের জলুস খসে পড়ে গেছে। যে কারণে বিভ্রম সৃষ্টি হয়, তার ফ্রয়েডীয় মীমাংসা হ'ল—'বহির্যোজিত অন্তরানুভূতি'—Outward projection of inner feeling.

একান্ত নিবিষ্ট মনে চলন্ত ট্রেনে বসে বসে যখন কেবলই মনে হয়,—'বাড়ী আর কতদূর', তখন ঘূর্ণ্যমান ট্রেনের চাকার একঘেয়ে ঘটঘট্ শব্দও যেন ঐ কথাটির প্রতিধ্বনি ক'রে বলে—'বাড়ী আর কতদূর'। সুতরাং দেখা যায় যে, সময় সময় অভিভূত বা নিবিষ্ট মনের চিন্তাসমূহ বাইরের রূপরসগন্ধস্পর্শ ও শব্দকে আশ্রয় ক'রে বাস্তব ঘটনার ছদ্ম আকার ধারণ করে, যাকে আমরা আবার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে উপভোগ করি। তন্দ্রালু অবস্থায়ও যখন পরিপার্শ্ব-বস্তুবোধ সম্পূর্ণ দূরাপসৃত হয় না, তখন বহিস্থের প্রভাব মনের ওপর অধিকার বিস্তার করে। এমন অবস্থায় তন্দ্রার বিষয়বস্তু বাস্তবের সাহায্য নিয়ে রূপায়িত হ'তে থাকে। তন্দ্রালু ব্যক্তির পাশে বসে কেউ হয়তো একটি হিন্দী গজল গাইছেন, আর তন্দ্রালু তার আবছা নিদ্রাবেশে শুনছেন একটি বাংলা কীর্তন। আফিমের মৌতাতে মশগুল কমলাকান্তের কানে বেড়ালের ম্যাঁও শব্দটা ডিউক অব ওয়েলিংটনের সকাতর আফিম প্রার্থনার মত শুনিয়েছিল। মনেরই অনুভূতি বহিস্থকে অবলম্বন ক'রে এই সব ঘটনাপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, যার অসারতা ধরে ফেলা ইন্দ্রিয়গ্রামের সাধ্যায়ত্ত নয়। 'ক্ষুধিত পাষাণ'এর নায়ক খণ্ডস্বপ্নের আবর্ত্তের মধ্যে কচিৎ হেনার গন্ধ, কচিৎ সেতারের শব্দ, কচিৎ সুরভি জলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখতে পেত। কখনও বা তরুণী ইরাণীর ছায়া এসে মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের হাস্য কটাক্ষ ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে দর্পণে মিলিয়ে যেত। বিল্বমঙ্গলের সর্পে রজ্জুভ্রম ও ম্যাকবেথের রক্তাক্ত ছুরিকা দর্শন আদর্শ বিভ্রমের দৃষ্টান্ত। বিল্বমঙ্গল ও ম্যাকবেথের বৈচিত্র্য ও অন্তর্দ্বন্দ্বের কাহিনী সর্ব্বজনবিদিত— তারই সঙ্গে বিচার করে দেখলে Projection-এর বিস্ময়কর সুঘটন পটিয়সী কীর্ত্তি বোধগম্য হবে।

ভ্রমাত্মক কর্ম্মে বৈজ্ঞানিক আলোচনা কতভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে, কত অজ্ঞাত রহস্যের হদিস পাওয়া গেছে, তার অনেক পরিচয় আমরা পেলাম। এই মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনীর শেষ ও শ্রেষ্ঠ ফল—অতিপ্রত্যয়ের (Superstition) উৎস আবিষ্কার।

অতিপ্রত্যয় ও অলৌকিকতাবাদ, এই দুই মনোদৃষ্টি এক কাঞ্চনসন্ধিতে যুক্ত হয়ে রয়েছে—একে অপরকে পরিপুষ্ট করেছে। শুভযাত্রার প্রাক্কালে হোঁচট খেলে একটু থেমে যেতে হয়—এ একটি অতিপ্রত্যয়। একে কোন কু বা সুসংস্কার বলা চলে না। সংস্কার হ'ল যুক্তিসাপেক্ষ এবং সংজ্ঞানগত— বুদ্ধি তার প্রসূতি। অতিপ্রত্যয় হ'ল যুক্তি-নিরপেক্ষ একটি প্রেরণা থেকে উদ্ভূত— মনের অন্তস্থলে রয়েছে তার শিকড়।

ডাঃ ফ্রয়েড পরকৃতীক্ষা (Paranoia) নামক চিন্তাভঙ্গীর তুলনা এনে অতিপ্রত্যয়ের

রহস্য নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। পরকৃতীক্ষা এক প্রকারের মনোব্যাধি। 'সন্দেহবায়ু' নামে আখ্যাত চিন্তাবিকারের সঙ্গে পরকৃতীক্ষার সাদৃশ্য আছে। পরকৃতীক্ষক সর্ব্বদা শ্যেনদৃষ্টি মেলে বসে আছেন অপরের ব্যবহার ও মতিগতির ওপর। এর মনে সর্ব্বদা সমালোচনার তুফান চলেছে। কেন লোকটি তার দিকে ওভাবে তাকিয়ে রয়েছে, গরুটা গাছের গায়ে এমন করে শিং ঘসছে কেন? স্বভাবী (Normal) লোকের মন এইসব অতি নগণ্য ব্যাপারে মোটেই আলোড়িত হয় না। কিন্তু পরকৃতীক্ষকের কাছে এসব অত্যন্ত ও অতিরিক্ত অর্থপূর্ণ। সে এর ভেতর থেকে বড় বড় সিদ্ধান্ত টেনে বার করে। যে লোকটা তাকিয়ে রয়েছে, সে নিশ্চয় এখনি টাকা ধার চাইবে—পরকৃতীক্ষক তার কৃচ্ছ্র মননতার বলে এই রকম একটা সহজ বিশ্বাস লাভ করে। পরকৃতীক্ষা-রোগীর মানসিকতার মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অজ্ঞান মনের প্রচণ্ড আবেগ সমষ্টি কিভাবে তার সজ্ঞান মনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অপর ব্যক্তি বা বস্তুর খুঁটিনাটি আচরণের মধ্যে সে যে-উদ্দেশ্য আবিষ্কার করে, সেই উদ্দেশ্যটিই আসলে লুকিয়ে রয়েছে তারই মনের মধ্যে অভীপ্সারূপে।

মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যতীত কোন ব্যবহারিক স্খলন অসম্ভব। কিন্তু যে-ইচ্ছার সংঘাত মানসিক দ্বন্দ্বের জনক তা মনের অগোচর। এই অজ্ঞানতা অলক্ষ্যে ব্যক্তিসত্তাকে পীড়িত করে ; ক্রমে এই দাবী এসে বর্ত্তায় সজ্ঞানের উপর। এই অজ্ঞাত মনের বাসনাপুঞ্জের তাড়নায় চেতনমন বা সংজ্ঞান একটি বিশিষ্ট চিন্তার পথ ধরে অগ্রসর হয়। এই চিন্তার লক্ষ্য হল এমন কতকগুলি প্রত্যয় সৃষ্টি করা যা মনের ক্ষোভ ও ক্ষুধা শান্তি করে। এই হল অতিপ্রত্যয়ের সৃষ্টিক্রম। একে সজ্ঞান কর্ত্তৃক অজ্ঞানকে উৎকোচদান বলা যেতে পারে। দেবতা, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পরলোক, অমরতা প্রভৃতি মতবাদের ভিন্নার্থ বলতে গেলে অবদমিত ইচ্ছার তুষ্টির জন্য সজ্ঞান চিন্তায় আহৃত বিবিধ ও বিচিত্র উপঢৌকন। পুরাণ কাহিনী ও রূপকথার সৃষ্টির মূলে এই অজ্ঞান মনের উদ্ভট কল্পনাবিলাসের আবেদন রয়েছে। মানুষের বাস্তব-পীড়িত রুদ্ধ আবেগপুঞ্জের মুক্তি প্রয়াস, যার প্রেরণায় সে সৃষ্টি করেছে এই সব কল্পরাজ্য—তাব 'সব পেয়েছির দেশ'। শেষের সেদিন ভয়ঙ্করের বিভীষিকা চিত্ত পরিমণ্ডলে যে ছায়াপাত করেছে তারই তাড়নায় সচেতন মন গড়ে তুলেছে তার জরামৃত্যুহীন স্বর্গ, অমৃত ও অনন্তযৌবন। সুতরাং অতিপ্রত্যয়ের মূলে রয়েছে (ব্যবহারিক প্রমাদ বিধায়ক দ্বন্দ্বশীল ইচ্ছাসমষ্টির অস্তিত্ব সম্বন্ধে) 'অজ্ঞাত জ্ঞান' ও 'জ্ঞাত অজ্ঞানতা' (Conscious ignorance এবং Unconscious knowledge)।

অনেকে সফল-স্বপ্ন, চিন্তা-দৌত্য জাতিস্মরতা ও বিস্ময়কর সহ-সংঘটন (coincidence) প্রভৃতি অতিপ্রাকৃতিকতার কাহিনী শুনেছেন। এই সেদিনও দিল্লীতে মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল শান্তিদেবী নামে এক জাতিস্মর বালিকাকে নিয়ে। সে নাকি তার পূর্ব্বজন্মের পিতামাতা ও দেশের সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছিল এবং অনুসন্ধানে (?) সেসব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। দূর প্রবাসে পুত্র হঠাৎ পীড়িত হলো—এদিকে কোন সংবাদ আসার পূর্ব্বেই মায়ের মন শঙ্কায় ভার হয়ে রইল—এ ঘটনাকেও অনেকে লক্ষ্য করেছেন।

এ ধরণের ঘটনা ঘটে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে অতিপ্রাকৃত রহস্য কি আছে? রামবাবুর কথা ভাবছেন, হঠাৎ রামবাবু দেখা দিলেন—এ ঘটনাকে তো কেউ অলৌকিক শক্তির লীলা মনে করে অপার্থিব পুলকে শিউরে ওঠেন না। এসব ব্যাপার ঘটনার নিছক কাকতালীয় সম্পাত মাত্র। কেন না স্বপ্ন তো আসলে মনেরই সাধ সঙ্কল্পের অনিরুদ্ধ বিক্রীড়া। এই

আংশিক ও আকস্মিক সফলতার পিছনে কোন অতিপ্রাকৃত বিধানের কল্পনা করা অমার্জনীয় মূঢ়তা। স্বপ্ন যতটুকু সফল হয়, তার হাজার গুণ হয় বিফল।

জাতিস্মরতাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় অলৌকিক। কিন্তু বিজ্ঞানীর চোখে যাচাই করলে এর সূক্ষ্ম প্রবঞ্চনা ধরা পড়ে যায়। এর মূলে রয়েছে এমন কোন গুপ্ত ও অজ্ঞাত উদ্‌ভাবনা, যা হঠাৎ সদৃশ ঘটনার প্রমুখাৎ একটা পূর্ব্ব পরিচয়ের অনুভূতি (Deja Vu) মনে জাগিয়ে তোলে—'পুরাতন সেই গীতি সে যেন আমারি স্মৃতি'। কালিদাসের—'জননান্তরানি সৌহৃদানি'র অনুভূতিও এই শ্রেণীর পূর্ব্বসঞ্চিত উদ্‌ভাবনাপুঞ্জের সঙ্গে অনুরূপ ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফল। অজ্ঞাত স্বপ্নস্মৃতিও মাঝে মাঝে ঘটনাশ্রয়ী হয়ে পূর্ব্ব-পরিচয় বা জাতিস্মরতা সৃষ্টি করে।—

'মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে।'

এক একটা ঘটনা যেমন বিস্মৃত স্মৃতিকে পরিচয় করিয়ে দেয়, অজ্ঞাত স্মৃতিও তেমনি অকস্মাৎ বিলসিত হয়ে ঘটনাকে এমন অন্তরঙ্গ রঙে রাঙিয়ে দেয়, মনে হয়, এই ঘটনাটি নতুন নয়—এ পূর্ব্বাভিজ্ঞাত ও পরিচিত। স্মৃতি ও ঘটনা এইভাবে পরস্পর স্থান বিনিময় করে মাঝে মাঝে প্রত্যক্ষকে ধাঁধিয়ে দেয়। 'আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম—সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল ; তাই এত মধুর বোধ হইল।' বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা এই সত্যকে সায় দিচ্ছে—ঘটনা যেমন পূর্ব্বস্মৃতিবোধ জাগিয়ে তোলে, স্মৃতিও তেমনি পূর্ব্বঘটনাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে।

এ প্রসঙ্গে আবার সত্তায় আস্থা-বিলাসী অতি-প্রত্যয়ীর (Superstitious) কথা আসবে। অতিপ্রত্যয়ীর লক্ষণ এই যে, সে তার প্রত্যেক ভ্রমাত্মক কর্ম্মকে প্রাকৃতিক ঘটনা বলে ধরে নেয়, যদিও ব্যাপারটা মূলতঃ সম্পূর্ণ আন্তরিক। তার বিচারের প্রণালী উল্টো রকমের। সে মনে করে ঘটনা প্রথম—তারপর চিন্তা করে। মনের গুপ্ত ইচ্ছার কারসাজীতে সে হোঁচট খেয়েছে, কিন্তু সে এই হোঁচট খাওয়াকে স্বপ্রধান ঘটনা মনে করে এবং তারপর তার কারণ স্বরূপ এক একটা প্রত্যয় বা সংস্কার দাঁড় করায়।

পরকৃতীক্ষার (Paranoia) মত মানসিকতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিভাবে সচেতন মন অচেতন মনের দাসত্ব করে। ডাঃ ফ্রয়েড একে অজ্ঞাত-জ্ঞান (Unconscious knowledge) বলেছেন। সময় সময় স্বাধ্যায় ও অনুশীলনের বলে মনকে ধ্যানস্থ বা ভাববিষ্ট করা সম্ভব, এই ধ্যানস্থ অবস্থার পরাকাষ্ঠা যোগী সাধকের 'তুরীয়' অবস্থাকে ডাঃ ফ্রয়েড তাঁর নিজ পদ্ধতিতে বিচার করে বলেছেন—(Dim perception of the unconscious)—সাধকের সম্মুখে ক্ষণিকের জন্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার লক্ষ বাসনা বিলসিত অজ্ঞাত মনের কল্পলোক— তার অনুভূতিকে টেনে নিয়ে যায় কোন 'মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে, চেতনা প্রত্যূষে।'

আধুনিক মনোবিজ্ঞান অদূর ভবিষ্যতে যে পরিণতি গ্রহণ করবে, ডাঃ ফ্রয়েড সে সম্বন্ধে যে-বাণী ঘোষণা করেছেন তা বিশ্বাসী লোকের আস্তিক্য বুদ্ধিকে আঘাত করবে নিশ্চয়, কিন্তু বিজ্ঞানেরও একটা মর্য্যাদার দাবী আছে এবং সেই হেতু ডাঃ ফ্রয়েডের অভিমত তাদের পক্ষেও নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার্য্য। আধুনিক বিজ্ঞান আজ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে নব

নবতর আবিষ্কারের আনন্দে এবং সুধী বিজ্ঞানী মহলে এই আশা ক্রমপুষ্ট হয়ে উঠেছে—আজকের যে তত্ত্ব অধ্যাত্মবিদ্যা (Metaphysics) নামে পরিচিত, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে; তাকে পরাবিদ্যার মহিমা ঘুচিয়ে ফেলে বিজ্ঞানের রূঢ় স্পর্শে অচিরে অধিমনোবিদ্যায় (Metapsychology) পরিণত হতে হবে।

স্বপ্নাধ্যায়

[স্বপ্ন—স্বপ্নে অজ্ঞাত ইচ্ছার সাড়া ও চরিতার্থতা—স্বপ্নরাজ্যের প্রহরী বা সেন্সরের কাজ স্বপ্নের দুই স্বরূপ—নিহিত বিষয় (Latent Content) ও প্রকট বিষয় (Manifest Content)—প্রতীক(Symbol)—স্বপ্নের অর্থ আছে—স্বপ্নের বিশ্লেষণ সম্ভব—কংসের স্বপ্ন—স্বপ্নের প্রকরণ (Dream formation)—স্বপ্নে বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—কতগুলি সাধারণ স্বপ্নের নমুনা (Typical Dreams)।]

তুলসীদাস বলেছেন—সপনে রঙ্ক নাকপতি হোই। স্বপ্নে কাঙালও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র হয়ে যায়। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে, এরকম লোকও আছে শোনা যায়। এতে আশ্চর্য কিছু নেই। আমাদের মনের সব আবেগগুলিই তৃপ্তিপ্রয়াসী। সামাজিক জীবনের বাস্তবতাবোধ প্রহরীর মত (Censor) অনেক আবেগকে ঘাড়ে ধরে বসিয়ে দেয় বলেই, জাগ্রত জীবনে তারা চুপ করে থাকে। কিন্তু প্রতি দিনান্তে এমন একটি সুলগ্ন আসে যখন এই সামাজিক বাস্তবতা বোধ [যাকে ইগোর শাসন বলুন বা প্রতিরোধ (Resistance) বলুন] প্রায় অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে দমিত বাসনার কুঞ্জে কুঞ্জে সাড়া পড়ে যায়—অচেতন মনের রাজ্যে দিনের আলো জাগে।

ঘুম ও স্বপ্নের কথা বলা হচ্ছে। ঘুমের কোলে শুধু মানুষের কর্ম্মক্লান্ত দেহটিই ঢলে পড়ে না, মনের এই নীতিবাগীশ পাহারাওয়ালাও (Censor) ঢলে পড়ে। কিন্তু নিদ্রিত মানুষের মনে সেন্সর একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে না।

স্বপ্ন মানুষের জীবনে সত্যই এক বিচিত্র কুহক। অযুত বাসনার রেণুজাল দিয়ে তৈরী মনের অতলের এক দ্বিতীয় বরুণালয়। বোধব্যাপ্ত অথচ বস্তুকায়াহীন। বস্তুজগতের মতই এখানে মমতা তেমনি কোমল, চুম্বন তেমনি মিষ্টি, হিংসা তেমনি শাণিত, বিরহ অপমান তেমনি জ্বালাকর। ঘুমন্ত মানুষের অসহায় মুখচ্ছবি দেখে কে বুঝবে যে, তার মনের ভেতর তখন এক প্রকাণ্ড ইতিহাস সাড়া দিয়ে উঠে নতুন ভাবে আপনাকে কীর্তিত করে চলেছে?

অচেতনতায় প্রোথিত দমিত ইচ্ছা স্বপ্নে সার্থকতা লাভের চেষ্টা করে। স্বপ্নের ঘটনা এই ইচ্ছাবৃত্তির চাঞ্চল্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। স্বপ্নের প্রকৃতির মধ্যে ডাক্তার ফ্রয়েড কতগুলি নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার দু'টি স্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। (১) যাকে বলা হয়—প্রকট বিষয় (Manifest Content)। ও (২) নিহিত বিষয় (Latent Content)। কাহিনী সাধারণতঃ সাম্প্রতিক কোন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গড়ে ওঠে। স্বপ্নের এদিকটা বুঝতে তেমন কষ্ট হয় না। তিন দিন একটানা ট্রেনে চড়ে বাড়ী ফেরার পর প্রথম যে ঘুম আসে, তার মধ্যে ট্রেনঘটিত কোন পরিদৃশ্য থাকবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট এই ট্রেনঘটিত পরিদৃশ্যগুলির অর্থ (Latent Content) আরও গভীরে গিয়ে পেতে হবে। এই পরিদৃশ্যগুলিকে অবলম্বন করে যেসব আবেগ ও ইচ্ছার পরিস্ফূর্তির চেষ্টা দেখা যাবে, তাকেই স্বপ্নের নিহিত বিষয় বলা হয়।

স্বপ্নের প্রকৃতিকে নাটকীয় বলা চলতে পারে ; তবে এই নাটক খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ছদ্মরূপে ব্যক্ত। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি আসল সত্য নয় ; তারা প্রতীক (Symbol) মাত্র। স্বপ্নের রজ্জু, ঠিক রজ্জু নয়—আসলে সেটা হয়তো সাপ। ফ্রয়েডের মতে স্বপ্ন এই ভাবে অজস্র প্রতীকের আশ্রয়ে অবরুদ্ধ আবেগকে নাটকীয় ঘটনার ভেতর দিয়ে তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে।

ডাক্তার ফ্রয়েড স্বপ্নকে অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়কে মনঃসমীক্ষণের কাজে লাগিয়েছেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যার মধ্যেই অচেতন মনের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়, কেননা স্বপ্ন অচেতন মনে দমিত যত আবেগের আত্মপ্রকাশের নাটকীয় কীর্তি মাত্র। সুতরাং স্বপ্নবিশ্লেষণ মনো-বিশ্লেষণেরই একটা সহযোগী অধ্যায়। বয়স্ক মানুষের স্বপ্নেও শৈশব অভিজ্ঞতার বহু অভিমান চরিতার্থতার জন্য নানা ছদ্মবেশে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেড়ায়। শিশুর স্বপ্নে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কজনিত (ইদিপাস প্রভৃতি) আবেগগুলিই সবচেয়ে প্রখর ও স্পষ্ট। শিশুর স্বপ্ন প্রতীকের ধার ধারে না। আদিম বর্ব্বর মানুষের বা আধুনিক কালের অসভ্য জংলী মানুষের স্বপ্নের রীতিনীতি শিশুর স্বপ্নের মত জটিলতাহীন। রূপকথা, উপকথা এমন কি পুরাণ-কথা নামে যেসব লোকসাহিত্য আছে তাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূলতঃ সেগুলি যেন জাতির গোষ্ঠীগত স্বপ্ন। পরী-হুরী স্বর্গ, দেবদূত, ড্রাগন, পক্ষীরাজ ঘোড়া, বেঙ্গমা-বেঙ্গমী প্রভৃতি বিচিত্র প্রতীকের অত্যদ্ভুত কীর্তি ও অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টার যত কাহিনী যেন দমিত ইচ্ছার আত্মপ্রকাশ—অচেতন মনের সাধ।

ডাক্তার ফ্রয়েড স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটা অর্থপূর্ণ কথা বলেছেন। বাতিক মানুষের মানসিক আচরণ বা চিন্তা আর সুস্থ মানুষের স্বপ্ন গুণে ধর্ম্মে একই। এই সিদ্ধান্তের ফলে মানুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আচরণগুলিকে (শিল্প সাহিত্য নৃতত্ত্ব প্রভৃতি) সাইকো-এনালিসিস প্রথায় বিচার করার প্রয়োজন বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন। এটাও স্বপ্নের নিহিত অর্থ (Latent Content) উদ্ধার করার মত ব্যাপার। সাইকো-এনালিসিসের প্রয়োগে শিল্প-সাহিত্যের একটি গূঢ় স্বরূপের পরিচয় আমরা পেতে আরম্ভ করেছি, যা অন্য ভাবে জানবার উপায় ছিল না।

রাজা কংস বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অন্তিম ঘনিয়ে আসছে। একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখলেন ; সকাল বেলা পাত্র মিত্র পণ্ডিত ও পুরোহিতদের ডেকে এনে সেই স্বপ্নের বিবরণ শোনালেন।—

'এক লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী অতিবৃদ্ধা কৃষ্ণবর্ণা রমণী যেন আমার নগর মধ্যে নৃত্য করিতেছে। এক মুক্তকেশী ছিন্ননাসা বিধবা মহাশূদ্রী যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিতেছে ও আমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এক দিব্যাস্ত্রী মহারুষ্টা হইয়া পূর্ণকুম্ভ ভগ্ন করিতেছে। ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গারবৃষ্টি, ভস্মবৃষ্টি ও রক্তবৃষ্টি হইতেছে। এক সতী রমণী আমার ভবন হইতে নির্গতা হইলেন ; তাহার পরিধান পীতবস্ত্র, অঙ্গ শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত ; গলদেশে মালতী মালা ও হস্তে ক্রীড়াকমল।'—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

রাজা কংসের মনের দ্বন্দ্ব প্রতীকের আশ্রয়ে যে স্বপ্নচ্ছবি সৃষ্টি করেছে—তার ব্যক্ত অর্থ বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রতীকগুলি খুবই স্পষ্ট এবং অর্থ সরল। কিন্তু এর গূঢ় অর্থ বোঝা সহজে সম্ভব নয়। ডাক্তার ফ্রয়েড স্বপ্নে এই গূঢ় অর্থ আবিষ্কার করার একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

কিন্তু এই পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে তিনি সুস্থ ও অসুস্থ বহু নরনারীর স্বপ্ন গভীর ও

বিস্তৃত ভাবে পর্য্যালোচনা করে স্বপ্নের রীতিনীতি জেনে নিয়েছেন। স্বপ্নের এই ব্যাকরণের ওপর তিনি তার বিশ্লেষণের পদ্ধতিকে দাঁড় করিয়েছেন।

স্বপ্ন মাত্রই ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতা (Wish Fulfilment), অন্যভাবে বলা যায়, স্বপ্নের মধ্যে ইচ্ছাবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে।

প্রশ্ন ওঠে, রাজা কংস স্বপ্নে যে সব দৃশ্য দেখলেন—সেগুলি কি তিনি সত্যই কামনা করেন? স্বপ্নে দেখা এই নিদারুণ পরিণামের মধ্যে তাঁর ইচ্ছাবৃত্তি কিভাবে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে? যে দুঃস্বপ্ন দেখে মানুষ ঘুমের ঘোরে আঁতকে উঠেছে, সেটাই তার মনের সাধ—এরকম অনুমান উদ্ভট শোনায় না কি?

এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, স্বপ্নের দুটি অর্থ আছে—প্রকট অর্থ ও নিহিত অর্থ। এখানে উত্তর দিতে গিয়ে—সেই কথা আবার ডবল করে বলতে হয়। স্বপ্নের প্রকট ও নিহিত অর্থ—অর্থের এই দুই বিভাগকে ডাক্তার ফ্রয়েড আর একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন—স্বপ্নের (১) ঘটনাংশ (Dream Content) ও (২) ভাবনাংশ (Thought Content)। স্বপ্নের এই ভাবনাংশকে যখন ব্যাখ্যা করা যায়, তখনই প্রমাণিত হয় যে স্বপ্নের আসল কথাটি হলো ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতা। সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্ন—উভয় ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত সত্য।

স্বপ্নের ছদ্মবেশ। ঈশপের গল্পের শেয়াল যখন নাগালের বাইরের আঙুর নিজের ভোগে আনতে পারলো না, তখন তাকে বলতে হলো—নিশ্চয় আঙুরগুলি টক। এই মনস্তত্ত্বের বিশেষ একটা রহস্য রয়েছে। শেয়াল নিজেই তার নিজের ইচ্ছাটাকে একটা যুক্তি সৃষ্টি করে চাপা দিচ্ছে। বিজ্ঞানীর ভাষায় বলতে পারা যায়—ইচ্ছার দমন (Repression)। আঙুরকে টক অনুমান করে নিয়ে আঙুরকে পাওয়ার ইচ্ছাটাকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্বপ্নের মধ্যেও ইচ্ছাবৃত্তিগুলিকে পরিস্ফূর্তির পথে এইরকম দমনের প্রকোপ সইতে হয়। দমনের ফলে স্বপ্ন সরল না হয়ে, জটিল বিকৃত সংক্ষিপ্ত প্রতীকী ও ছদ্মবেশী হয়ে পড়ে। 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন'—কবির রচনার এই ব্যাজস্তুতি অলঙ্কারের মত স্বপ্নের ঘটনা মাঝে মাঝে স্বপ্নের ভাবনাগত ইচ্ছার বিপরীত রূপ গ্রহণ করে। তাই স্বপ্নের ব্যক্ত অর্থে অর্থাৎ ঘটনাংশে যদি ভালবাসার ব্যাপার দেখা যায় নিহিত অর্থে বা ভাবনাংশে সেটা হয়তো ঘৃণার ব্যাপার।

এই দমন ব্যাপারকেই স্বপ্নরাজ্যের সেন্সরশিপ (Censorship) বলা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বপ্নের ঘটনা সৃষ্টি বা রূপ বা প্রকরণের (Dream Formation) পেছনে কাজ করছে দুটি শক্তি। একটি হলো চরিতার্থতা-প্রয়াসী ইচ্ছার আকুতি ও দ্বিতীয়টি হলো শাসনশীল সেন্সর, যা ইচ্ছাকে স্বাভাবিক রূপে ফুটে উঠতে দেয় না।

দুঃস্বপ্ন সম্বন্ধে এখন একটা সত্য কথা বলা যায়। যেসব অপ্রীতিকর বা ক্লেশকর ঘটনা স্বপ্নে দেখা যায়, আসলে সেগুলি এক একটা অপ্রীতিকর আবরণ মাত্র। এই আবরণের আড়ালে সত্যিকারের ইচ্ছাবৃত্তি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা চরিতার্থতা লাভ করে চলেছে। সেন্সর ইচ্ছাবৃত্তির স্পর্দ্ধাকে বাধা দেয় বলেই, ইচ্ছাবৃত্তি যেন একটা ভুয়া দীনতার সাজ পরে নিজের কাজ হাসিল করে নেয়।

তাই ডাক্তার ফ্রয়েড বলেন যে প্রত্যেকটি স্বপ্নের অর্থ আছে। কংসের দুঃস্বপ্নের নিগূঢ় অর্থটি তাহ'লে কি হতে পারে? এই স্বপ্নের ভেতর তাঁর কোন্ ইচ্ছা চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করেছে?

উত্তরে, সোজা কথায় বলতে পারা যায়—বাঁচবার ইচ্ছা। ধ্বংস আসন্ন ও অমোঘ জেনে রাজা কংসের মন আতঙ্কে কাতর হয়ে রয়েছে। তৈলমর্দ্দন ও আলিঙ্গন—এই দুটি ঘটনার মূল স্বপ্নের ভাবনাংশে খুঁজতে গেলে তার অর্থ দাঁড়ায় :

তৈলমর্দ্দন = লালিত ও সেবিত হবার ইচ্ছা। হীনতেজ শরীরকে পুনর্ব্বার শক্তিশালিতায় উন্নীত করার ইচ্ছা।

আলিঙ্গন = সমর্থন সাহায্য ও অভয় লাভের ইচ্ছা। বিপদ থেকে আত্মরক্ষার কামনা। আশ্বাস লাভ। সন্ধি-স্থাপনের ইচ্ছা।

কংসের স্বপ্নের শেষ দৃশ্যে আছে—'এক সুসজ্জিতা রমণী তাঁর ভবন হতে বের হয়ে চলে গেলেন।' কৃষ্ণের হাতে অবধারিত মৃত্যুর পরিণাম থেকে পরিত্রাণের জন্য ঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যাবার ইচ্ছা হয়তো স্বপ্নের ভেতর এই ঘটনার রূপক সৃষ্টি করেছে।

স্বপ্নের মধ্যে সেন্সর কিভাবে কাজ করে, তার সুন্দর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় পুরাণে কথিত একটি উপাখ্যান থেকে—উষা ও অনিরুদ্ধের স্বপ্ন-সমাগম।

'অনিরুদ্ধ একদিন স্বপ্নাবস্থায় বিকসিত কুসুমপূর্ণ উদ্যানে সুগন্ধি পুষ্পশয্যায় শয়ান এক যুবতীকে (উষা) দর্শন করিলেন। অনিরুদ্ধ সেই কামিনীকে মধুর বাক্যে কহিলেন ; সুন্দরি! আমি রতিপুত্র শৃঙ্গারবিশারদ অনিরুদ্ধ। অতএব আমাকে ভজনা কর। সেই লজ্জিতা কামিনী বস্ত্রাঞ্চলে মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া ঈষৎ বিলোকন করিতে করিতে বলিলেন ; যদি আপনি এতই ব্যাকুল হইয়া থাকেন তবে নিজের যোগ্যাকে বিবাহ করিতেছেন না কেন? যদি আমাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎপিতা বাণের নিকট প্রার্থনা করুন। সুন্দরী এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন এবং অনিরুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হইল।'

স্বপ্নে অনিরুদ্ধের কামলিপ্সা অবাধ ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিল ; আচরণের বৈধতা বোধ প্রথমে ছিল না। কিন্তু তার পরেই দেখা গেল, উষার উত্তরের মধ্যে সামাজিক শালীনতার প্রহরী (সেন্সর) যেন বৈধতার প্রশ্ন সম্বন্ধে তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে।

স্বপ্নের ভেতর যেসব ইচ্ছা স্ফূর্তি লাভের জন্য চেষ্টিত হয়, বৈজ্ঞানিক স্বপ্নব্যাখ্যাতা তার মুখোস খুলে ফেলে তাকে চিনে নিতে পারে। চেনবার পর আর একটা তত্ত্ব ধরা পড়ে যায় ; এই ইচ্ছার অনেকখানিই শৈশব জীবনের অভিজ্ঞতার দান। তখন বোঝা যায়, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে সরে যায়নি ; তারা মনের ভেতরে দানা বেঁধে আছে। স্বপ্নের ভেতর শৈশব স্মৃতি যেন সুপ্তি ছেড়ে উঠে বসে।

স্বপ্নের প্রকট বিষয় (Manifest Content) সচরাচর সাম্প্রতিক কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে তৈরী হয়। ফুটবল ম্যাচে বাঙালী টীম গোরা খেলোয়াড়ের দলকে হারিয়ে দিল : দুদিন আগে হয়তো ময়দানে এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখে আসা হয়েছে। সেই খেলা দেখার স্নায়বিক উত্তেজনা স্বভাবতঃ নিদ্রিত অবস্থায়—স্বপ্নের ভেতর, ফুটবল ম্যাচের দৃশ্য অবতারণা করতে পারে। স্বপ্নের প্রকট বিষয় সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকেই অবলম্বন করে। কিন্তু স্বপ্নের নিহিত বিষয় (Latent Content বা Dream Thought) হয়তো দূর অতীতের কোন অভিজ্ঞতা। এমন কি অপোগত শৈশবের অভিজ্ঞতা, তথা, ইচ্ছাবৃত্তির ব্যাপার হতে পারে।

একদল বৈজ্ঞানিক ছিলেন—যাঁরা বলতেন যে, বিশেষ বিশেষ দৈহিক অবস্থায় (Somatic Condition) বিশেষ বিশেষ স্বপ্ন সৃষ্টি হয়। পেটভরে ঝাল রান্না মাংস খেয়ে

যদি শোয়া যায়, তবে নাকি নির্ঘাৎ দৌড়দৌড়ির স্বপ্ন দেখতে হবে।

এঁদের কথা মেনে নিলেও কিন্তু স্বপ্নতত্ত্বের মূল সত্যটির হানি হয় না ; অর্থাৎ ইচ্ছাবৃত্তির চরিতার্থতার কথা। এই দৌড়দৌড়ি ব্যাপারের প্রকট অর্থ যাই হোক্, দেখা যাবে যে নিহিত অর্থে কোন না কোন ইচ্ছা নিজেকে স্ফূর্ত করার চেষ্টা করছে। ঘুমোবার সময় একটা হাত যদি বেকায়দায় দুমড়ে থাকে, তবে স্বপ্নে পক্ষাঘাত রোগ হওয়ার দৃশ্য দেখা অসম্ভব নয়। স্বপ্নের মধ্যেই ডাক্তার এসে হয়তো বলবেন—কই হাতটা দেখি? ডাক্তারের নির্দেশ মত হাত দেখাতে গিয়ে হয়তো (স্নায়ুর সাড়া লেগে) হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবে। তখন হাতটা টেনে সোজা করে নেওয়া সম্ভব হবে। দেখা যাচ্ছে, হাত টেনে নেওয়ার ইচ্ছাটাই স্বপ্নের মধ্যে খুব ভদ্রভাবে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পর পর ঘটনা তৈরী করে নিয়ে চলেছে।

ব্যক্তিবিশেষে জীবনের অভিজ্ঞতার তারতম্য আছে। তাই তাদের স্বপ্নেরও প্রকৃতির তারতম্য দেখা যায়। ডাক্তার ফ্রয়েড কতগুলি সাধারণ স্বপ্নের (বা স্বপ্নের টাইপ) তালিকা তৈরী করেছেন।

(১) স্বপ্নে নিজেকে উলঙ্গ দেখে বিব্রত হওয়া।

এই স্বপ্নের ভেতর শৈশব অভিজ্ঞতার সঞ্চরণ দেখা যায়। পরিচ্ছদ যেন বয়োপ্রাপ্ত জীবনে এক লজ্জা ও শালীনতার বোঝাবিশেষ। শিশু-অবস্থায় এই সুরুচিশাসনের বালাই ছিল না ; সে-এক মুক্ত ও অবাধ ব্যক্তিত্বের জীবন। পরবর্তী জীবনে স্বপ্নের ভেতর সেই আকাঙ্ক্ষা বিমূর্ত হয়ে ওঠে। তবে স্বপ্নে উলঙ্গতার জন্য বিব্রত বোধের উদ্রেক হয় কেন? এটা সেন্সরের কীর্তি। স্বপ্নেও সামাজিক সুরুচির প্রহরী যেন ছি ছি করে ওঠে।

(২) প্রিয়জনের মৃত্যুর স্বপ্ন।

এই ধরণের ঘটনায় স্বপ্নদ্রষ্টা দু'রকম ব্যবহার করে—হয় স্বপ্নের মধ্যেই দুঃখে কান্নাকাটি ক'রে অভিভূত হয়, নয় অবিচল থাকে। স্বপ্নদ্রষ্টা যদি স্বয়ং স্বপ্নে প্রিয়জনের মৃত্যু দেখে দুঃখিত না হয়, তবে বুঝতে হবে সেটা ভিন্নতর কোন ইচ্ছার ব্যাপার। সচরাচর স্বপ্নে এরকম আচরণ কেউ করে না ; কাজেই এটা সাধারণ স্বপ্ন নয়। স্বপ্নে প্রিয়জনের মৃত্যুতে সকলেই সাধারণতঃ কেঁদে থাকে। ডাক্তার ফ্রয়েড বলেন, এই স্বপ্ন প্রিয়জনের মৃত্যুকামনার স্বপ্ন। কথাটা শুনলে একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয়। যার ক্ষণিক অদর্শনে মন আকুল হয়ে ওঠে, যার বিরহে জীবন শূন্য মনে হয়—স্বপ্নে তারই মৃত্যু কামনা করা কখনও সত্য হতে পারে কি?

ডাক্তার ফ্রয়েডের এই অভিমতটি খুব সাবধানে বুঝতে হবে। স্বপ্নে বাপ মা ভাই বা বোনদের কারও মৃত্যু দেখলে সরাসরি এই সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে স্বপ্নদ্রষ্টা তখনই তার এমন স্নেহভাজন মানুষটির মৃত্যু কামনা করছে। স্বপ্নতত্ত্ব এতটা কখনো বলে না। আসল কথাটা হলো, স্বপ্নদ্রষ্টা তার শিশুজীবনে কোন না কোন সময়ে বাপ-মা-ভাই-বোনের কারও মৃত্যু কামনা করেছিল। সেই দমিত শৈশব কামনার পরিস্ফূর্তি স্বপ্নে মাঝে মাঝে ঘটে যায়। এই ব্যাখ্যাতেও প্রতিবাদীর মধ্যে অনেকে সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁরা বলবেন, যে-শিশু বাপ মা ভাই বোনের আদরে লালিত হয় ও কোল থেকে নামিয়ে দিলে কাঁদতে থাকে, যে-শিশু অহরহ প্রিয়জনের সঙ্গ কামনা করে—সেই বা কেন প্রিয়জনের মৃত্যু কামনা করবে?

ফ্রয়েডের উত্তর : ভেবে দেখতে হবে যে শিশুর ধারণায় মৃত্যু ব্যাপারটা কি? শিশু

মৃত্যুর তত্ত্ব কি ই বা বোঝে? মৃত্যু যে জীবনের শূন্যময় সমাপ্তি বা চিরদিনের বিদায়—এত সব দার্শনিক বিচার শিশুর মনের ঘটে নেই। তাই শিশু যখন তার ইচ্ছাবৃত্তির পরিপূরণে কোন রকম বাধা পায়, তখনই সেই বাধার জন্য দায়ী ব্যক্তিকে (বয়স্ক ভাই বোন বা বাপ মা) দূরে সরিয়ে দেবার কামনা করে। শিশুর মন সরলভাবেই যেন তার সাধের পথে কাঁটা সেই শাসক প্রিয়জনকে 'দূরমপসর' বলে ধিক্কার দিয়ে ওঠে। শিশু বয়সে পিঠাপিঠি ভাই-ভাই বা বোন-বোনের মধ্যে নানা কারণে ক্ষণে ক্ষণে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়। শিশুরা একেবারে ষোল-আনা আত্মাদরপরায়ণ। তাই তার আত্ম-ইচ্ছার পরিতৃপ্তির পথে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের বাধাকে তারা মন দিয়ে মেনে নিতে পারে না। তাকে সরিয়ে দিতে চায়। শৈশবে বিদ্বিষ্ট হয়ে এইভাবে প্রিয়জনকে মাঝে মাঝে 'দূরে সরিয়ে দেওয়ার' আকাঙ্ক্ষা বয়োপ্রাপ্ত মানসের স্বপ্নে মৃত্যু কামনার রূপ পরিগ্রহ করে।

(৩) পরীক্ষার স্বপ্ন।

ডাক্তার ফ্রয়েড রসিকতা করে এই স্বপ্নকে নাম দিয়েছেন—ম্যাট্রিকুলেশন স্বপ্ন। পরীক্ষায় পাশ করে যাবার অনেকদিন পরেও পরিণত বয়সে অনেকে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। পরীক্ষা আসন্ন, পড়া অসম্পূর্ণ, সময় কম ইত্যাদি নানারকম ব্যাপার মিলে স্বপ্নের মধ্যে একটা তীব্র-উদ্বেগ সৃষ্টি করে।

এই ধরণের স্বপ্নের রহস্য ভেদ করে ডাক্তার ফ্রয়েড বলেছেন যে, জীবনে যখনি কোন একটা দায়িত্ব এসে চাপে—কোন কর্ত্তব্য সম্পাদনার তাগিদ আসে অথচ সামর্থ্য সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তখনই লোকে পরীক্ষার স্বপ্ন দেখে। এই উদ্বেগ যেন ছেলেবেলার কর্ত্তব্যচ্যুতির শাস্তির স্মৃতি। আসন্ন কর্ত্তব্য পালনের আগে প্রস্তুতি সম্বন্ধে উপেক্ষা বা ত্রুটী থাকলে স্বপ্নে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আতঙ্ক বুড়ো বয়সেও রীতিমত কষ্ট দিয়ে থাকে।

স্বপ্ন-গঠনে কারিগরী

[স্বপ্নের বৃত্ত ও কেন্দ্র সেন্সরের বিবিধ কূটকীর্তি—সংক্ষেপণ বা Condensation—অপসারণ বা Displacement—স্বপ্নের বৃত্তান্তে ও স্বপ্নমূলের মধ্যে আবেগের গুরুত্ব বিনিময় – ভাবনা বিষয়ের ছদ্মবেশী কীর্তি—পরশুরামের স্বপ্ন—স্বপ্নে 'প্রতীক' অর্থে কি বোঝায়?—স্বপ্নে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির চাক্ষুষ প্রতিচ্ছবিতে (Visual) পরিণতি—প্রত্যাগতি বা Regression—স্বপ্নে শৈশব অভিজ্ঞতার বোধচ্ছবির পুনরাবির্ভাব—স্বপ্নের রাগ বিষয় (Affect)—স্বপ্ন কি কখনো সফল হয়?]

স্বপ্ন বিশ্লেষণের জন্য একটা সুনির্দ্দিষ্ট কাটাছাঁটা পদ্ধতি ডাক্তার ফ্রয়েড দিতে পারেন নি। স্বপ্ন একটি অতি জটিল মানসিক সংঘটন। স্বপ্নালু মানস-প্রকৃতির কতগুলি সাধারণ গুণধর্ম্ম জানা থাকলে যে কোন স্বপ্নের তাৎপর্য্য কিছু-না-কিছু উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়।

শব্দতত্ত্বের ব্যাকরণ বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে সন্ধি সমাস তদ্ধিতের প্রত্যয়ে শব্দের নানারকম ভাঙ্গাগড়া চলে। স্বপ্নের গঠনও এই রকম নানা হেতুর জন্য নানাভাবে নিষ্পন্ন হয়।

(১) সংক্ষেপণ বা Condensation। স্বপ্নের ভাবনাংশ হয়তো খুবই বিস্তৃত, কিন্তু ঘটনাংশ সাঙ্কেতিক (সর্টহ্যাণ্ড) লেখার মত খুবই ঘনীভূত আকারে দেখা দিতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের ঘটনা বেশ বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী বলে মনে হলো। কিন্তু জেগে উঠেই স্বপ্নটি যদি আদ্যোপান্ত মনে পড়ে, তখন দেখা যাবে যে কাহিনী বা ঘটনাটি খুবই

ছোট। মনে হবে, যেন স্বপ্নের অনেক কিছু ভুলে যাওয়া হয়েছে। বিশ্লেষণ করার ফলে যখন ভাবনাংশ ধরা পড়ে তখন দেখা যায় যে, সেটা সত্যিই ঐ রকম সংক্ষিপ্ত—ঘটনাংশের একটি নির্য্যাসিত রূপ। স্বপ্নের ঘটনাকে স্বপ্নমূল ইচ্ছাটির (Dream-wish) বিশদ কীর্তি বলা যায়। কিন্তু ঘটনার প্রত্যেকটি বিষয় মূল-ইচ্ছার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। ঘটনার মধ্যে অনেক অতিরঞ্জন, অনেক অবান্তর বিষয় প্রশ্রয় পায়। স্বপ্নের নিহিতার্থে বা ভাবনাংশের মধ্যে এইসব অবান্তর দৃশ্য ও বিষয়গুলির কোন তাৎপর্য্য নেই।

এই সিদ্ধান্ত থেকে, আর একটি নতুন সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

(২) অপসারণ বা Displacement। সম্পূর্ণ স্বপ্নচক্রের কেন্দ্রটি যেন অন্য কোথাও বা একটু দূরে সরে রয়েছে। কেননা, স্বপ্নের ঘটনাবৃত্ত এমন সব ব্যাপারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যেটা স্বপ্নের ভাবনাংশ (বা সত্যিকারের কেন্দ্রীয় সত্য) নয়।

স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের এই এক অদ্ভুত রহস্য। বোঝা যাচ্ছে যে এর পেছনে একটা তীব্র মানসবৃত্তির খেলা চলেছে। কিন্তু স্বপ্ন যেন গূঢ় মানসবৃত্তির দাবীগুলিকে উপেক্ষা ক'রে আজেবাজে ঘটনা দিয়ে তার কাহিনী তৈরী করে। এই অপসারণ (বা Displacement) আসলে স্থান বদলের (Transference) ব্যাপার। কিসের অপসারণ? কারা পরস্পর স্থান বদল করে?

ফ্রয়েড বলেন : মানসবৃত্তি স্বপ্নে ঘটনার দাবী করে। ঠিক কথা, গুরু বা গূঢ় মানসবৃত্তি স্বপ্নে গূঢ় বা গুরু ঘটনা দাবী করবে—এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তা হয় না। বরং কতগুলি লঘু ঘটনা স্বপ্ন-বৃত্তান্তে স্থান লাভ করে বসে। অর্থাৎ লঘু মানসবৃত্তিটাই প্রাধান্য পায়। ব্যাপারটাকে বলা যায়—ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব।

আগেই ডাক্তার ফ্রয়েডের মারফৎ আমরা জেনেছি যে, স্বপ্নের স্বাভাবিক পরিণতিকে বিকৃত করে দেয় সেন্সর। সুতরাং এই পর্য্যন্ত এসে স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের পেছনে যে দুই কারিগরের কেরামতীর পরিচয় পাওয়া গেল—তাদেরও সেন্সরের আজ্ঞাবাহক ভৃত্য বলা উচিত। স্বপ্নের সংক্ষেপণ ও অপসারণ—এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তা হলেন সেন্সর।

স্বপ্নবৃত্তান্তের প্রকৃতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডের সঙ্গে আমরা এইবার একটা ধারণা স্পষ্ট করে নিতে পারি। স্বপ্নবৃত্তান্তের অনেক খোসা ছাড়িয়ে ফেলার পর আসল অর্থের শাঁসটুকু দেখা দেয়। একটি অন্তঃসারের চারদিকে নানা অবান্তর আবরণ জড়িয়ে যেন স্বপ্নবৃত্তান্তটি গড়া। পাল্‌টিয়ে বলা যায় ; স্বপ্নবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে আসল ভাবিত স্বপ্নে পরিণত হয়। কিন্তু তার আগে, স্বপ্নের উপকরণগুলির (ঘটনাবলী) আবেগ-স্ফূর্তি অপসৃত হয় ; ফলে স্বপ্ন যেন নতুন করে তার উপযোগী উপকরণ যাচাই-বাছাই (Transvaluation) করে নেয়। স্বপ্নে এই যে ভাবনার অদল-বদল হলো তাকে নিছক বিচ্ছিন্নতা বলা যাবে না। ভাবনা তার প্রাথমিক সংস্থানের সঙ্গে এক অনুষঙ্গের (Association) সূত্রে যোজিত থাকে।

আরও পরিষ্কার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় : স্বপ্নের ভাবনাংশে (যাকে স্বপ্নাধার বলা যেতে পারে) থেকে এক একটা আবেগ বিচ্ছুরিত হচ্ছে—সুষুপ্তিলোকের তমিস্রার মধ্যে যেন তারা আকুল হয়ে অভিসারে বার হয়েছে। তারা চায় অভীপ্সিতের সঙ্গে নিগূঢ় মিলন—চায় তৃপ্তি। তাই স্বপ্নের মধ্যে আবেগগুলি সরাসরি একটা সুস্পষ্ট তৃপ্তি ও সম্ভোগের কাহিনী রচনা করবার জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু স্বপ্নপুরীর দ্বারপাল সেন্সর কাহিনীর ভেতর আবেগগুলিকে এরকম বে-আব্রু হয়ে আত্মচরিতার্থতা লাভ করতে দিতে রাজী নয়। অগত্যা

স্বপ্ন এমন একটা কারসাজি করে বসে যার তুলনা হয় না। স্বপ্ন কামফ্লাজের আশ্রয় নেয়।

তৃপ্তিপ্রয়াসী এইসব গূঢ় ও তীব্র আবেগগুলি সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যায়। যোদ্ধারা যেন বীরসাজ খুলে ফেলে। তার বদলে দেখা দেয় নতুন কতগুলি আবেগ—নিরীহ ও দীনহীন, তাদের উদ্দেশ্য তথৈবচ। সেন্সর এদের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি তোলে না। উপমা দিয়ে বলতে হয়, সেন্সর যেন স্বপ্নদুর্গের তোরণ-দ্বারে দাঁড়িয়ে আবেগগুলিকে নিরস্ত্র করে নিয়ে তবে তাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয় ; আবেগগুলির গা থেকে গূঢ় উদ্দেশ্যমুখীন স্ফূর্তিকে নামিয়ে ফেলে দেওয়া হয় (Displacement of Psychic Intensity)। ফলে যেন স্বপ্নবৃত্তান্তে কতগুলি নতুন লঘুস্ফূর্তির আবেগ স্থান পেল। স্বপ্নের বৃত্তান্তের সঙ্গে মূল ভাবনাটির কোন সাদৃশ্য রইল না।

জামদগ্ন্য রাম (পরশুরাম) পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সসৈন্যে অভিযানে বার হয়ে পরশুরাম নর্ম্মদা নদীর তীরে এক বৃক্ষমূলে নিদ্রাযাপন করেছিলেন। রাত্রির শেষ যামে স্বপ্ন দেখলেন : 'তিনি হস্তী অশ্ব পর্ব্বত অট্টালিকা বৃষ কিম্বা ফলবান বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। কৃমিগণ তাহাকে ভোজন করিতেছে, তজ্জন্য তিনি রোদন করিতেছেন। আবার দেখিলেন, গলদেশে পুষ্পমালা ধারণ করিয়া নৌকায় আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। দেখিলেন, সর্ব্বাঙ্গে যেন বিষ্ঠা মূত্র পূয লাগিয়াছে। উৎকৃষ্ট বীণাযন্ত্র বাজাইতেছেন। বকশ্রেণী ও হংসশ্রেণী উড়িতেছে। দেখিলেন দধি, লাজ, ঘৃত, মধু, জীবিত মৎস্য, ময়ূর, সরোবর, সিংহ, সুরভি গাভী সম্মুখে রহিয়াছে। কখনো বা অগম্যা স্ত্রী-সংসর্গ করিতেছেন। তিনি পীতবর্ণের পক্ষী ও মনুষ্যগণের মাংস হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিতেছেন···।'

ব্যাখ্যাতার কাছে পরশুরামের স্বপ্ন একটি টাইপ-বিশেষ। স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের অনেক আইন-কানুন এই স্বপ্নের ভেতর আবিষ্কার করা যেতে পারে।

পরশুরামের স্বপ্নমূলে যে-ভাবনাটি সার্থকতার জন্য আবেগ বিস্তার করছে—তাকে (সুবিধার খাতিরে অনুমান করে নেওয়া যাক্) বল্‌তে পারি, এক ক্ষত্রিয়হীন ও প্রতিদ্বন্দ্বীহীন পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করা। তাই স্বপ্নে মনের আবেগ হয়তো এক দৌড়ে গিয়ে সিংহাসনে উঠে বসতে চায়। কিন্তু সেন্সর জানে যে বাস্তবে সেটা কত দুরূহ—কত কঠিন সংগ্রামে উত্তীর্ণ হয়ে তবে সেটা সম্ভব হতে পারে। তাই সেন্সর এই 'সিংহাসন-বিলাসী' তীব্র আবেগকে স্বপ্নের বৃত্তান্তে স্থান দিতে আপত্তি করে। আবেগের তীব্রতা তখনি ঘুচে যায়। আবেগগুলি তারপর যেন নিরীহের মত সামান্য সব দাবী নিয়ে (হাতী-চড়া, ঘোড়ায়-চড়া, গাছে-চড়া ইত্যাদি) স্বপ্নবৃত্তান্তের ভেতর ঢুকে পড়ে। সেন্সর আর বাধা দেয় না। কেননা দাবীটা খুবই নগণ্য। স্বপ্নবৃত্তান্তের পরিণত রূপে দেখা যাচ্ছে যে স্বপ্নমূল ভাবনার সঙ্গে তার কোন ঘটনা সাদৃশ্য নেই। তবু পরোক্ষভাবে এই নগণ্য লঘু ঘটনাগুলি (হাতী-চড়া ইত্যাদি) মূল ইচ্ছার সঙ্গে একটি অনুষঙ্গ রক্ষা করে চলেছে। পরশুরামের প্রতিষ্ঠা উচ্চাসনেই রয়েছে।

স্বপ্ন ব্যাখ্যার প্রসঙ্গে এইবার প্রতীকের কথা না বলে নিলে আর চলে না। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, স্বপ্নে পরশুরামের হাতী চড়া ব্যাপারটা সিংহাসন-চড়ার প্রতীক মাত্র। হতে পারে ; কিন্তু হাতী চড়া ব্যাপারটা স্বপ্ন-নির্বিশেষে সিংহাসন-চড়ার (বা আধিপত্য লাভ) রূপক প্রকাশ বা প্রতীক নয় ; স্বপ্ন-বিশেষে হাতী চড়ার দৃশ্য বধ্যভূমিতে নিয়ে

যাওয়ার ব্যাপার হতে পারে ; কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে যাকে প্রতীক বলে, তার মূল স্বরূপ সাধারণতঃ সর্ব্বক্ষেত্রে এক। ফ্রয়েড এইভাবে প্রতীকের একটি তালিকা সৃষ্টি করেছেন।

উদাহরণ : স্বপ্নে জাহাজের মাস্তুল পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রতীক। প্রতীকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আর একটু প্রণিধানের প্রয়োজন আছে। ব্যাখ্যার সময় স্বপ্ন-দেখা কোন বস্তুকে প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে সেটা সেখানে আদৌ প্রতীক হিসাবে কাজ করছে কি না। জাহাজের মাস্তুল প্রতীক হিসাবে অবশ্য সব সময়ই একই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু স্বপ্ন বিশেষে জাহাজের মাস্তুল শুধু বস্তুগত অর্থ জ্ঞাপন করতে পারে। কাজেই স্বপ্নের ব্যাকরণে বস্তু কোথায় প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেটা ব্যাখ্যাতা তাঁর বিচার দিয়ে বুঝে নেবেন। যেখানে বস্তু প্রতীক হিসাবে কাজ করছে না, সেখানে বস্তুর বস্তুগত অর্থ ধরে নিয়েই ব্যাখ্যায় অগ্রসর হতে হবে।

কামকলার বিষয় ও বস্তুগুলি সহজেই স্বপ্নে প্রতীকী রূপ গ্রহণ করে। প্রতীক হিসাবে কাম-প্রতীকগুলিই (Sexual Symbol) বেশী স্পষ্ট ও সার্থক।

স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের মধ্যে আমরা মূলতঃ সেন্সরের প্রতিরোধ কার্য্যের খেলা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। তাছাড়া আরও দুটি শক্তির প্রক্রিয়া বা প্রবণতা দেখা গেল—সংক্ষেপণ (Condensation) ও অপসারণ (Displacement)। এর পর গুরুত্বের দিক দিয়ে আরও দুটি শক্তির প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় :

(ক) ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে মূর্ত্তি বা রূপ গ্রহণ করার জন্য একটা প্রবণতা (বা Representability)। একটা শব্দগত উপকরণ স্বপ্নে শব্দত্ব নিয়ে দেখা দিল না ; দেখা দিল দৃশ্যে চিত্রিত হয়ে (Pictorial)। কোন মামলাবাজ স্বপ্নে দেখলো যে, পথের ওপর বসে সে মোকর্দ্দমার নথী ঘাঁটছে। এই স্বপ্নকে তর্জমা করলে স্বপ্নার্থ দাঁড়ায়—মোকদ্দমায় হেরে যাওয়া। 'অমুককে পথে বসিয়ে দিয়েছে'—এই পদটির অনুগত অর্থ হলো হেরে যাওয়া, নিরুপায় হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া ইত্যাদি। স্বপ্নের মধ্যে 'পথে-বসা'র শব্দগত প্রকাশ শ্রুতিচ্ছবি সৃষ্টি করেনি—করেছে চাক্ষুষ (Visual) দৃশ্য। স্বপ্নে পথে বসে পড়ার ব্যাপারকে চোখে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

(খ) স্বপ্নের বাহ্যিক গঠন দুর্বোধ্যতা পরিহার করে চলবার চেষ্টা করে। এটা অবশ্য সাধারণ সত্য নয়।

স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের রীতিনীতি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বরাবর দেখে আসছি যে স্বপ্নের ভাব-বিষয় ও বৃত্তান্ত-বিষয়ের মধ্যে রূপগত একটা পার্থক্য থেকে যাচ্ছে। উভয়ের সম্বন্ধ নির্ণয় করার অর্থই হলো স্বপ্নের গঠনতন্ত্রের (Dream-work) নির্ণয়। আমরা দেখেছি যে স্বপ্নের ভাববিষয়ের শব্দগত উপকরণ চাক্ষুষ প্রতিচ্ছবিতে বিমূর্ত্ত হয়। এখানে এসে স্বপ্ন-প্রকৃতির আর একটি নতুন তত্ত্বের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যাগতি বা Regression-এর কথা এসে পড়লো।

(৩) প্রত্যাগতি Regression। অজ্ঞাত মন থেকে আবেগীভূত ইচ্ছা সজ্ঞান (জাগ্রত) মনে যখন প্রকাশলাভের চেষ্টা করে, তখন এই মানসিক ক্রিয়াকে আমরা 'গতি' (Progress) আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু এর উল্টো ব্যাপার হলে, অর্থাৎ সজ্ঞান জাগ্রত মনের (চেতন) চিন্তা যদি অচেতনতার দিকে ধাওয়া করে, তবে তাকে প্রত্যাগতি (Regressive) অবশ্যই বলতে হয়। সুতরাং, সে হিসাবে স্বপ্নের ধর্ম্ম গতিশীল নয় ; বলতে হয়—

প্রত্যাগতিশীল। জাগ্রত অবস্থাতেও যখন কোন বিষয়ে স্মরণ মনন ও নিদিধ্যাসন চলতে থাকে, তখন মনোযন্ত্রটির কাজ করার কায়দা আমরা লক্ষ্য করেছি : ভাবনা-বিষয় থেকে যেন একটা সাড়ার তার মনের স্তরের পর স্তর ভেদ করে ভেতরের দিকে (পশ্চাতে-অতীতে) চলে যেতে থাকে। শেষে যেন একটা স্টেশনে এসে থামে। এই স্টেশন হলো উক্ত ভাবনা-বিষয়ের প্রাক্তন উপাদানসমূহের স্মৃতিচিহ্ন। যে কাঁচামাল থেকে ভাবনা-বিষয়ের (Ideational Content) সৃষ্টি হয়েছিল—এই প্রত্ন-মানসিক অনুসন্ধানে যেন তার নিদর্শন উদ্ধার করা হলো। কিন্তু জাগ্রত চিন্তার সীমানা এর বেশী নয়। আরও পিছনের দিকে যাবার ক্ষমতা তার নেই।

কিন্তু স্বপ্নে? স্বপ্নেতে মনের কলে যে সাড়া জেগে ওঠে, তার কাজ আরও অন্তর্ভেদী। চিন্তার অভিযান শুধু স্মৃতিচ্ছবির স্টেশন পর্য্যন্ত এসে থেমে যায় না। এহ বাহ্য। স্বপ্নচর চিন্তা আরও গভীরে চলে যায়, দূর অতীত-জীবনের এক ঝাপসা অনুভবের দেশে ; সেদেশের রূপ শুধু কতগুলি বোধচ্ছবি (Perceptual Image) দিয়ে তৈরী কাঁচা হাতে গড়া এক অপোগণ্ড শিল্পীর কীর্ত্তি। মানুষের শৈশব একদিন মনের গহনে এই পারাবারের তীরে শুধু বালু নিয়ে খেলা করে গিয়েছে। সেখানে বুদ্ধির সূর্য্য দেখা দেয়নি, সংস্কারের চাঁদের আলো ছিল না—এক আদিম জৈব বোধ দিয়ে সেদেশের বন নদী পাহাড় গড়া রয়েছে। কর্ণের কথার মধ্যে তার পরিচয় কিছুটা ফুটে উঠেছে—

'গেছ মোরে লয়ে
কোন্ মায়াচ্ছন্ন লোকে, বিস্মৃত আলয়ে,
চেতনা প্রত্যুষে। পুরাতন সত্য সম
তব বাণী স্পর্শিতেছে মুগ্ধচিত্তে মম।
অস্ফুট শৈশবকাল যেন রে আমার,
যেন মোর জননীর গর্ভের আঁধার
আমারে ঘেরিছে আজি।'

বাগানে গাছের ঝোপের আড়াল থেকে এক অদৃশ্য পাখীর শিস্ বয়স্ক মানুষের কানের ভেতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে একটা বোধচ্ছবি জাগ্রত করে। কিন্তু একে ঠিক বোধচ্ছবি বলা উচিত নয়—এটা ভাবচ্ছবি। সবুজ পত্রগুচ্ছের মাঝে একটি শ্যামা পাখীকে সে তার মনের ভেতরেই অনুভবের মধ্যে দেখতে পায়। কিন্তু শিশুবয়সে কখনই এই ভাবচ্ছবি সম্ভব হতো না। ভাবচ্ছবি গড়বার মত এতখানি মানসিক উপকরণ সে-সময়ে ছিল না। পাখীর শিস্ শুনে ইন্দ্রিয়ের সাড়ার ফলে তখন একটা বোধচ্ছবি তৈরী হতো শুধু। সেই বিস্মৃত শৈশব অভিজ্ঞতার বোধচ্ছবি আজকের পরিণত ভাবচ্ছবিরই যেন ভ্রূণমূর্ত্তি। স্বপ্নের চিন্তায় ভাবনা বিষয় বিশিষ্ট হয়ে এই প্রাক্তন বোধচ্ছবিকে জাগ্রত করে। এই ফিরে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রত্যাগতি (Regression) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

স্বপ্নে পাওয়া শৈশবের এই বোধচ্ছবির মধ্যে ডাক্তার ফ্রয়েড (এবং আরও অনেকে) মানুষ জাতির শৈশবের ইতিবৃত্ত খুঁজে পেয়েছেন। তিনি বলেন এই বোধচ্ছবিগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করতে পারলে সমস্ত মানুষ জাতির জীবনের অতি প্রাচীন ইতিহাসের রূপ জানতে পারা যাবে।

(৪) স্বপ্নের রাগ-বিষয় (বা প্রভাব বা Affect)। স্বপ্নে দেখা গেল—ঘরে ডাকাত

পড়েছে, সর্বস্ব লুট করে নিচ্ছে, ভয়ে বুক দুরুদুরু করছে। মনোবিজ্ঞানী বলবেন, এক্ষেত্রে স্বপ্নের ডাকাত তো সত্যিকারের ডাকাত নয় ; বাস্তবতার রক্তমাংসে দিয়ে এই ডাকাতের শরীর তৈরী নয়। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার ভয়টা বাস্তব, সত্যিই তার বুক ভয়ে দুরুদুরু করে কাঁপছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর, ডাকাতেরা হয়তো স্বপ্নের সঙ্গেই উপে যাবে ; কিন্তু মনের ত্রাসে তখনো কিছুক্ষণ বুক কাঁপতে থাকবে।

ফ্রয়েড বলছেন—ঘরে ডাকাত পড়েছে, এই স্বপ্ন দেখে যদি স্বপ্নদ্রষ্টা লজ্জা পেতে থাকে, তাহলেও বলতে হবে—লজ্জাটা মিথ্যা নয়। বরং লজ্জাই একমাত্র বাস্তব সত্য। অনেক সময় লোকে স্বপ্নের ভেতর খুবই করুণ ও বেদনাকর দৃশ্য দেখে, তবু অনুভূতির দিক দিয়ে নির্বিকার ও অবিচল থাকে। সেই করুণ দৃশ্যটা যেন তার মনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করলো না। দৃষ্ট বিষয় থেকে কোন অনুরাগ বা বিরাগ মনের ওপর সঞ্চারিত হলো না। এ কি করে সম্ভব? জাগ্রত অবস্থায় কোন দৃশ্যকে এইভাবে ভাগ করে দেখা সম্ভব হয় না। করুণ দৃশ্য দেখলে করুণ ভাবের উদ্রেক করবে, হাস্যকর দৃশ্য দেখলে হাসি আসবে নিশ্চয়। কিন্তু স্বপ্নেতে বিষয় যেন মাঝে মাঝে প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। কেন?

উত্তর: স্বপ্নে বৃত্তান্তগুলির গূঢ় মানসিক আবেগ (বা Psychic Intensity) বিচ্যুত হয়। প্রসঙ্গক্রমে স্বপ্নগঠনে এই কারিগরীর কথা আগেই কয়েকবার উল্লেখ করা হয়েছে। অপসারণ (বা Displacement) প্রক্রিয়ার কারণ বর্ণনার মধ্যে আমরা কাহিনীর এই ধরণের আবেগচ্যুতির ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। স্বপ্নে যেন কাহিনীর পায়ের নূপুর উদ্দাম হয়ে উঠলো, অথচ তার রুনুঝুনু রমানিনাদ শোনা গেল না—এরকম ব্যাপারও লক্ষ্য করা গেছে। অপসারণ প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে এক্ষেত্রেও বলা যায় যে, দৃশ্যটা করুণ বটে, কিন্তু তার করুণতাটুকু যেন খসে গেছে।

ডাক্তার ফ্রয়েড আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন : তা নয় হলো, কিন্তু এর ঠিক বিপরীত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় কেন? স্বপ্নেতে কেউ কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল, কিন্তু দেখা যায় কাহিনীর ভেতর আদৌ কাঁদবার মত কোন ঘটনাই নেই।

স্বপ্নব্যাখ্যাতার আসল কাজ হলো স্বপ্নের নিহিত (Latent) বিষয় উদ্ধার করা। স্বপ্নমূল (ভাবনা বিষয়ে বা নিহিত বিষয়ে) পৌঁছতে পারলে দেখা যাবে যে, সেখানে স্বপ্নের রাগ-বিষয় অক্ষুণ্ণ আছে। অপসারণ ব্যাপারে স্বপ্নের ভাবনা-বিষয় (Ideational Content) স্বপ্নবৃত্তান্তে (প্রকট বিষয়ে) প্রবেশ করার সময় রূপান্তরিত হয়। আলোচ্য স্বপ্নের রূপান্তরের মধ্যে মূল রাগ-বিষয়টি (Affect) কিন্তু পরিবর্ত্তিত হয়নি। সে স্বপ্নমূলে যেমনটি ছিল বৃত্তান্তেও সেই ভাবে ও রূপে ঢুকে পড়েছে—রাগ-বিষয় অবিকৃত আছে।

স্বপ্নের বৃত্তান্তের সঙ্গে রাগ-বিষয়ের এই বেখাপ্পা সম্বন্ধ এইবার বুঝতে পারা যায়। ঘরে ডাকাত পড়েছে—স্বপ্নের এই বৃত্তান্তের মধ্যে ভীত হবার কারণ রয়েছে, লজ্জিত হবার কিছু নেই। কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সত্যিই লজ্জিত হয়, তবে বুঝতে হবে যে কাহিনীটির ভাবনাংশে (Latent বা Thought-content) লজ্জিত হবার একটা মূল কাহিনী লুকিয়ে আছে। বৃত্তান্তে বদলি হবার সময় কাহিনীর ঘটনা-রূপ ভিন্ন রকমের হয়ে গেছে, কিন্তু রাগ-বিষয়টি অবিকৃত রয়ে গেছে।

দৃশ্য-বিষয় (Conceptual Content) ও রাগ-বিষয়ের (Affectual Content) মধ্যে বিসদৃশতা বা অসঙ্গতির রহস্য হলো এই। সেন্সরের রক্তচক্ষুর শাসনের দাপটে কাহিনী

ডিগবাজি খেয়ে ভোল ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু মূল রাগ-বিষয় সেই শাসনের ধার ধারে না। সেন্সরকে উপেক্ষা করে রাগের ঢেঁকি বৃত্তান্তের স্বর্গে এসেও তার স্বভাবের নিয়মে ধান ভানতে থাকে। স্বপ্নের-মূল ভাবনাংশে হয়তো ব্যাপারটা নিজের বিয়ের কাহিনী ছিল, তার জন্য লজ্জা পাওয়ার কারণ ছিল। কিন্তু ভাবনাংশ বৃত্তান্তে বদলি হবার সময় সেন্সরের প্রকোপে বিকৃত হয়ে বা ছদ্মবেশ নিয়ে ঘরে ডাকাত পড়ার কাহিনী গ্রহণ করেছে। তবু দেখা গেল, মূল ভাবনাংশের রাগ-বিষয়টি (অর্থাৎ লজ্জার ভাবটি) রূপান্তরিত হয়নি।

কিন্তু এটা আংশিক সত্য মাত্র ; সেন্সর স্বপ্নের মূল ভাবনাংশের লজ্জার ভাবটিকে নিরীহ মনে করে বৃত্তান্তে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে বলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। সেন্সর যদি বিরুদ্ধে থাকতো, তবে লজ্জার ভাবটিকে অর্থাৎ রাগ-বিষয়টিকেও রূপ বদলাতে হতো। এটা সেন্সরের পরীক্ষাকে এড়িয়ে যাওয়া বা উপেক্ষা করার নমুনা নয়। সেন্সর ঐ রাগ-বিষয়টি আপত্তিজনক মনে করেনি, তাই বাধা না দিয়ে ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে।

এইবার ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তটিকে সংক্ষেপে বলে নিতে পারা যায় : স্বপ্নবৃত্তান্তে যখনই যে ধরণের রাগ-বিষয় (শোক হর্ষ বিষাদ ইত্যাদি) দেখা যায়, স্বপ্নের ভাবনাংশে অবিকল সেই রাগ-বিষয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

এইখানেই চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল মনে করলে ভুল হবে। রাগ-বিষয়ের সম্পর্কে আরও জানবার আছে।

ঐ সিদ্ধান্তকে পাল্‌টিয়ে যদি বলা যায় : স্বপ্নের ভাবনাংশে যে যে রাগ-বিষয় থাকবে, সেটাও বৃত্তান্তে অবশ্য দেখা দেবে। ডাক্তার ফ্রয়েড বলেছেন : না, এরকম সিদ্ধান্ত করা যায় না। স্বপ্নের ভাবনাংশ সব সময় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বৃত্তান্তে অবিকল ভাবে প্রবেশ লাভ করবে এমন কোন নিয়ম নেই। এমন স্বপ্নও দেখা যায় যে, যার বৃত্তান্ত থেকে কোন রাগ-বিষয় উৎসারিত হয় না (Indifferent Dream)। এই ধরণের স্বপ্নগুলির যেন ভালমন্দ কোন স্বাদই নেই।

এক্ষেত্রে বললে হয়, স্বপ্নমূলের রাগ-বিষয় যেন সেন্সরের প্রকোপে চাপা পড়ে গিয়েছে।

স্বপ্নগঙ্গার একেবারে গোমুখীতে গিয়ে আমরা কি দেখতে পাই? অজস্র নিরুদ্ধ চিন্তা মুক্তি পেয়ে যেন এক তৃপ্তি-আকুল ইচ্ছার স্রোত সৃষ্টি করছে। এই ইচ্ছার পথে পথে সেন্সরের উপল-বন্ধুর বাধা। ইচ্ছার স্রোত নানা বাঁকাচোরা পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইচ্ছার প্রসূতি চিন্তাগুলির রূপও একেবারে শুদ্ধাদ্বৈত নয়। প্রত্যেক অজ্ঞাত চিন্তার সঙ্গে বিপরীত-ধর্ম্ম বৃত্তিও যুক্ত হয়ে থাকে (Contradictory Counter-part)। ফলে, স্বপ্নের মূল ভাবনার কেন্দ্রে অজ্ঞাত চিন্তা ও ইচ্ছার মধ্যে নানারকম বিরোধিতার দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া চলে। একটি অজ্ঞাত ইচ্ছা অপরটির ওপর জোর ফলিয়ে দমিয়ে দিতে চায় ; কেননা প্রত্যেক অজ্ঞাত ইচ্ছার লক্ষ্য এক নয়। একটি অজ্ঞাত ইচ্ছা হয়তো অভিমানের ভেতর দিয়ে সার্থক হতে চায় ; সেই সঙ্গে আর একটি অজ্ঞাত ইচ্ছা অহংকারের ভেতর দিয়ে চরিতার্থতার জন্য এগিয়ে আসে। ফলে অজ্ঞাত ইচ্ছাগুলি চরিতার্থতার পথে পরস্পরকে বাধা দিতে থাকে— নিরোধ করে। এর মোটামুটি ফল দাঁড়ায়—রাগ বিষয়ের কাটাকুটি হয়ে গিয়ে (অভিমান—অহঙ্কার) শূন্যত্বপ্রাপ্তি অথবা নিরোধ।

ডাক্তার ফ্রয়েড আর একটা কথা বলে নিয়েছেন। নিরোধের ফলে রাগ-বিষয় মাঝে মাঝে বিপরীত রূপে প্রকাশ লাভ করতে পারে (Inversion)। সামাজিক নীতিতত্ত্বে

'ভণ্ডামি' নামে আচরণের প্রকৃতি ও গঠন যে ধরণের, রাগ-বিষয়ের বিপরীত রূপ গ্রহণও সেই রকম। 'হাসি মুখে ছুরি মারা' কথাটার মধ্যে রাগ-বিষয়ের এই বিপরীত রূপ ধারণের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ছুরি মারার সময় মনোভাবের উগ্র নিষ্ঠুরতার বাহ্যিক প্রকাশ উল্টে গিয়ে উজ্জ্বল হাসিতে দেখা দিয়েছে।

লোকে ঘুমিয়ে পড়লে স্বপ্ন দেখে ; আবার এমন ব্যাপারও দেখা যায় যে, স্বপ্নই যেন ঘুম ভেঙে দিচ্ছে। যাকে বলে—স্বপ্ন দেখে জেগে ওঠা। একবার ঘুম ভেঙে যাবার পর স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করা নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়। স্বপ্নের সব ঘটনা স্মরণে আসতে চায় না।

কোন কোন লোক আছেন—যাঁরা বলেন যে, স্বপ্ন দেখেন না। তাঁরা নাকি নিরেট একখানি স্বপ্নহীন ঘুম ঘুমিয়ে নেন।

এই দুই শ্রেণীর বক্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে স্বপ্নের বিবরণ জাগ্রত চিন্তায় স্মরণ করা সহজসাধ্য কাজ নয়। যাঁরা স্বপ্নবৃত্তান্ত একেবারে ভুলে যান, তাঁরাই বলেন যে স্বপ্ন তাঁরা দেখেন নি। যাঁরা স্বপ্ন স্মরণ করতে পারেন, তাঁদেরও বক্তব্যে গোলমাল থাকে। স্বপ্নের বৃত্তান্ত আগাগোড়া সবই মনে আছে—অনেকে নিজের সম্বন্ধে এই রকম অভিমত ব্যক্ত করেন। এটাও ভুল। আসল কথা হলো, জাগ্রত চিন্তায় স্বপ্নের স্মৃতি আদ্যোপান্ত চিত্রিত করা যায় না। স্বপ্নের অনেক দৃশ্য ও ঘটনা জাগ্রত চিন্তায় স্মরণ-সাধনায় উহ্য থেকে যায়।

ফ্রয়েড বলেন, স্বপ্নবৃত্তান্তকে জাগ্রত চিন্তার স্মরণ থেকে মুছে ফেলার এই কীর্তি হলো সেন্সরের। সেন্সরের শাসনবিধানে জাগ্রত চিন্তা যেন একটি নিষিদ্ধ এলাকা—স্বপ্নের কোন জীবের পক্ষে সেখানে ইচ্ছামত প্রবেশের অনুমোদন নেই।

কিন্তু স্বপ্নব্যাখ্যাতার কাজই হলো পণ্ডিতোদ্ধার ; সেন্সরের সব প্রতিরোধের আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিয়ে বিস্মৃত বৃত্তান্তকে আবার স্মরণের পথে টেনে আনা। তাই দেখা গেছে যে প্রথমে ভুলে গেলে চেষ্টা করে স্বপ্নকে হুবহু স্মরণ করা যায়। ব্যাখ্যাতার প্রয়োজন মূল স্বপ্নের ভাবনাংশ নিয়ে। ব্যাখ্যাতাকে এখানে অনেকটা প্রত্নতাত্ত্বিকের মত মানসগর্ভের সমাহিত তত্ত্বকে উদ্ধার করতে হয়।

গল্প আছে, এক রোমান সম্রাট তাঁর জনৈক প্রজাকে প্রাণদণ্ড দান করেন। বেচারা প্রজা স্বপ্ন দেখেছিল যে, সে সম্রাটকে হত্যা করেছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ঐ রোমান সম্রাটের বিচারকে কখনই সমর্থন করবে না। কেননা, স্বপ্নতত্ত্ব এত ঋজু সরল ও স্পষ্ট নয়। স্বপ্নে হত্যা করার নিহিত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম হতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতেরা সকলেই স্বপ্নতত্ত্বের অর্থ নিয়ে চিন্তা করেছেন। সফল স্বপ্ন ও বিফল স্বপ্ন নামে দুটো শ্রেণীভেদ করবার চেষ্টা প্রাচীন মনস্তাত্ত্বিকদের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়।

'নিদ্রায়াং নিশ্চলীভূতে চিত্তেহভীষ্টং প্রবিশ্য যৎ।
ভাব্যং সূচয়তি স্বপ্নঃ সদ্যঃ প্রত্যক্ষতো যতঃ॥'

'নিদ্রাকালে চিত্তের নিশ্চল অবস্থায় অভীষ্ট প্রবেশ করে'—প্রাচীন মতের এই প্রথম অংশটুকু বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। কিন্তু পরের অংশটুকু, অর্থাৎ—'সেই অভীষ্ট ভবিষ্যৎ সূচনা করে, তাহা সদ্য এবং প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ; এই উক্তির মধ্যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধি নেই। স্বপ্নের মধ্যে অতীতের পরিচয় রেকর্ড করা রয়েছে। স্বপ্ন মানসিক চরিত্রের ঐতিহ্যে পুষ্ট। ফ্রয়েড বলেন—স্বপ্নে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত একেবারে যে নেই, তা নয়। অথচ তিনি বিশেষ

জোর দিয়ে বলেছেন যে, মনের জগতের সত্য (Psychic Reality) আর বাস্তব জগতের সত্য (Material Reality), দুই ভিন্ন বিষয়।

ডাক্তার ফ্রয়েডের এই বক্তব্যের অর্থ বিশেষ প্রণিধান করে বুঝতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবে তৈরী মানসিক চরিত্রের একটা বর্ত্তমান অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। যদি বর্ত্তমানকে বোঝা যায়, তবে তার ভবিষ্যৎ পরিণামের একটু আভাষ ইঙ্গিতও অনুমান করা সম্ভব। ডাক্তার ফ্রয়েডের নথী থেকে, একটি মেয়ের বিয়ের আংটি হারিয়ে ফেলার স্বপ্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশ্লেষণে বোঝা গেল যে, মেয়েটি তার স্বামীর স্বামিত্বের ওপর প্রসন্ন নয়। মেয়েটির গোপন ইচ্ছা এই বিয়েকে অস্বীকার করতে চায়। বাস্তবে দেখা গেল, ক'বছর পরেই তাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ হলো। সুতরাং বলতে ইচ্ছা করে, স্বপ্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিল।

কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানে এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন পাওয়া কঠিন। উক্ত উদাহরণে স্বপ্নে ও বাস্তবে একটা কাকতালীয় মিল হয়েছে মাত্র। ফ্রয়েডের বিচারের সূত্র ধরে বলা যায় যে, স্বামীর প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব যখন অজ্ঞাত মনে দমিত অবস্থায় রয়েছে, তখন সে মনোভাব অজ্ঞাত মনের ভেতরেই সার্থক হবে অর্থাৎ সে বিবাহ বিচ্ছেদের স্বপ্ন দেখবে।

সুতরাং স্বপ্নের ঘটনার মধ্যে যে ভবিষ্যৎ সূচিত হয়—সেটা স্বপ্নেরই ভবিষ্যৎ। বাস্তবে স্বপ্ন সফল হয় না।

আসক্তি ও আসঙ্গ

[কামপ্রবৃত্তির গঠন—কামাস্পদের প্রয়োজন—অপচার (Perversion) কাকে বলে—ব্যতিক্রে ও অপচারে পার্থক্য—শিশুর কামকলার ইতিকথা—ইদিপাস উপাখ্যান—ইলেকট্রা উপাখ্যান—বয়স্ক জীবনে কামপ্রবৃত্তির শিশুয়ালি (Infantilism)]

পৃথিবীর কবিরা অনেকদিন আগে থেকেই মুস্কিলে পড়ে গেছেন। তাঁরা বুঝেছেন যে, কাব্যের নায়ক নায়িকাদের পীরিতির রীতি কোন শাসন সংযত করে রাখা একরকম অসাধ্য ব্যাপার। 'প্রীত না মানে জাত কুজাত'—এই একটা একগুঁয়ে সত্যের দক্ষিণা ঝড় তাঁদের সাজানো প্রেমের বাগানে অনেক নিষিদ্ধ অনুরাগের ফুল ফুটিয়েছে, আবার অনেক বিহিত মিলনের কুঞ্জশোভা নষ্ট করে দিয়েছে। ডাক্তার ফ্রয়েডও একই তত্ত্বের আবৃত্তি করেছেন আরও গভীরে এসে—কামাবেগের নিছক দৈহিক আচরণের তথ্যে এসে। তিনি বলেন, কামবেগ বা যৌনপ্রবৃত্তির (Sexual Instinct) রীতিও ঐ ধরণের ; তার চরিতার্থতার জন্য অবশ্য একটা আস্পদ দরকার, কিন্তু তার জন্য জাত-কুজাতের বিচার তো নেই-ই—সম বা বিষম কারণ শরীর, ইতর প্রাণী, জড় বস্তু অথবা নিজের দেহ, এর মধ্যে যে-কোন একটি তার রমণ-বিষয় (Sexual Object) হয়ে উঠতে পারে। মানুষের বিবিধ ও বিদঘুটে যত কামঘটিত অপচারের (Perversion) ইতিবৃত্ত পরীক্ষা করে তিনি বুঝেছেন যে যৌনাবেগ চরিতার্থতার জন্য নর-নারী মাত্রই তার বিপরীত কারণ-শরীরীকে আস্পদ হিসাবে গ্রহণ করে, একথা লোকময় সত্য নয়। অনেকের আচরণ ও মনোবৃত্তির মধ্যে সম-কামিতার (Homo-Sexuality) উপসর্গ দেখা যায়। লৌকিক রুচিতে যা অমার্জ্জনীয় এমন অনেক কামাপচার কোন কোন ব্যক্তিকে গর্হিত অপরাধ-সেবার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। পশু-

সংসর্গ পর্য্যন্ত মানুষের কামাপচারের কবল থেকে রেহাই পায় না। অসঙ্গ সঙ্গমের (বা Masturbation) প্রকোপ বয়স বিশেষে দেখা যায় এবং কোন কোন লোকের অভ্যাসে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। অনুসন্ধান করলে জানা যায় যে বহু বুদ্ধিমান অপচারী বদমাস তাদের কদর্য যৌনচর্চ্চাকে একটা বিকৃত ধার্ম্মিকতার ভড়ং দিয়ে গুরু বা সিদ্ধ সাধক সেজে থাকে এবং তারই সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রবৃত্তির বিক্ষেপ তুষ্ট করে। অপচারীদের মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা করে ফ্রয়েড দেখতে পেয়েছেন যে, রমণেচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট কোন আস্পদ নেই। একটু বেশী প্রশ্রয় নিয়ে বলা যায়—মানসিকতা বুঝে যে কোন বস্তু লোকের কামাস্পদের স্থান গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে—আস্পদবিশেষের মধ্যে নিহিত কোন গুণ নেই, যা কামভাবের উদ্রেক করে। কামাবেগ আস্পদনির্ভর নয়—আস্পদ নিরপেক্ষ বলা যায়। কামাবেগ স্বতঃ উৎসারিত হয়ে তার নিজের খেয়ালে কোন বিষয়কে (নর-নারী, জীব, বস্তু ইত্যাদি) শৃঙ্গার-সহচর হিসাবে বেছে নেয়। সিদ্ধান্ত হলো : কামাবেগ একটি আস্পদ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রবৃত্তি।

আর একটা প্রমাণ আছে। যারা সামাজিক আচরণে অস্বভাবী (Abnormal) তারা সকলেই কামপ্রবৃত্তিতে অস্বভাবী। কিন্তু এমন অনেক লোক দেখা গেছে যে, তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে কাম-মানসিক জীবনে (গোপনে) অত্যন্ত বিকৃতরুচি কিন্তু বাহ্যতঃ দশজনের সঙ্গে মেলামেশায় ও আচরণে আর সকলেরই মত স্বাভাবিক। শিক্ষা দীক্ষা ও কৃষ্টির দিক দিয়েও কারও চেয়ে হীন না হয়েও, কামুক জীবনে যেন তাঁরা ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রেখে চলেন না। বোঝা যাচ্ছে, কামের আস্পদ কামরীতির বড় কথা নয়। কাম যেন এক স্বপ্রধান প্রবৃত্তিবান সত্তা। কোন নীল সাড়ীর মধ্যে এমন কোন শক্তি লুকিয়ে থাকে না, যা দেখা মাত্র মনকে নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলে যাবে। মন নিজের গুণে তাকে আপন করে নিয়ে আঁচলে বাঁধা পড়ে।

ডাক্তার ফ্রয়েড তারপর প্রমাণ করেছেন যে কামাবেগ তুষ্ট করার জন্য সর্ব্বদা জননাঙ্গ ব্যবহারের প্রয়োজন না হতে পারে। অপচারীদের ক্রিয়াকলাপ থেকেই তিনি এইসব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। অন্যতর যে কোন একটি ইন্দ্রিয় রতিসুখের সাড়া যোগাতে পারে এবং অপচারী মানুষের তাতেই তৃপ্তি চরম হয়ে ওঠে। দক্ষস্মৃতিতে অষ্টবিধ মৈথুনের তালিকা দেওয়া হয়েছে:

'স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেবচ॥'

তত্ত্বের দিক দিয়ে ফ্রয়েডের অভিমত মোটামুটি এই স্মৃতিবচনের সঙ্গে মিলে যায়। যৌন সংস্রব না রেখেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কীর্তির ফলে একই ধরণের প্রসন্নতা অনেক অপচারী লাভ করে থাকে। কেউ শুধু দেখেই সুখী (Voyer বা দৃষ্টিরমণ), কেউ বা একটুখানি পরশের কাঙালি শুধু (Toucher বা স্পর্শরমণ) আবার এমন কেউ আছেন যিনি শুধু চুম্বনের মাঝেই হারিয়ে যেতে জানেন। অর্থাৎ দর্শন চুম্বন আলিঙ্গন ইত্যাদি যেসব গৌণ আচরণ কামের নর্ম্মানুষঙ্গ মাত্র—যাদের কাজ যৌনাসঙ্গকে আয়োজনে উদ্বোধিত করা, তারাই মাঝপথে দাঁড়িয়ে নিজেরাই মুখ্য পরিণাম হয়ে ওঠে।

এতদূর এসে ফ্রয়েড দুটি পদ্ধতি লক্ষ্য করলেন : (১) অপচারীদের কামপ্রবৃত্তি জননাঙ্গের ওপর নিষ্ঠা রেখে চলে না। তারা সদাসৎ অবয়ব বিচার করে চলে না (দৃষ্টান্ত

সমকামিতা)। (২) পূর্ণাঙ্গ যৌন সংশ্রবের বালাই না রেখে ইন্দ্রিয়জ গৌণ সাড়াগুলির মধ্যেই তাদের রতিসুখ লাভ হয়।

প্রবৃত্তির চর্চ্চায় স্বাভাবিক মানুষ ও অপচারীদের মানসিকতার মধ্যে গুণগত আসল পার্থক্য কোথায়? ঘৃণা লজ্জা ভয়—এই তিন বাধাকে অপচারীরা অতিক্রম করতে পারে, রুচিবান মানুষ পারে না। যেসব আচরণের জন্য অপচারীদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান লোলুপ হয়ে রয়েছে, সভ্যভব্য মানুষের কাছে সেসব আচরণ ন্যক্কারজনক। স্বাভাবিক সুস্থকাম মানুষের প্রবৃত্তির উৎপাত এই সব 'প্রতিরোধে'র (ঘৃণা লজ্জা) শাসনে সুসংহত থাকে।

অপচারীদের কীর্ত্তিকলাপ পরীক্ষা করে ডাক্তার ফ্রয়েড কাম প্রবৃত্তি সম্বন্ধেই নির্বিশেষ একটা সিদ্ধান্ত করেছেন : কামপ্রবৃত্তি একটা অবিভাজ্য ঐকিক আবেগ নয়। বহুবিধ উপ-আবেগের সমন্বয়ে এর প্রকৃতি গঠিত। অপচারের ব্যাপারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে এই সমন্বিত কামপ্রবৃত্তি তার ভিন্ন ভিন্ন উপ-আবেগে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। উদাহরণ : দৃষ্টিহ্লাদ (বা Scoptophilia) নামে একটা মানসিক তথা আচরণিক রোগ আছে। এই অস্বভাব আচরণকে দৃষ্টি রমণ (Voyer) বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, চোখে-দেখা রূপের পুলকাবেগ আপনাতেই নিঃশেষ নয়। এই পুলক কামপ্রবৃত্তির একটা দিক পরিপুষ্ট করে। কামপ্রবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায় যৌনাসঙ্গে। কিন্তু দৃষ্টি-রমণ অপচারের মধ্যে ব্রাউনিং-এর ষ্ট্যাচু ও বাষ্টের মত শুধু তাকিয়ে থাকাটাই আবেগের পরাকাষ্ঠা। আনুষঙ্গিকটাই পরিণাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বলা যায়, কামপ্রবৃত্তি ভাগ ভাগ হয়ে গিয়ে অপচার সৃষ্টি করে।

বাতিকদের মনঃসমীক্ষণ করে ফ্রয়েড সবারই মধ্যে এক কাম বিপর্যয়ের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন। সকল বাতিকের গোড়ায় একটা কামঘটিত গলদ অবশ্য লুকিয়ে আছে। বাতিকদের বা অন্যান্য আধিগ্রস্ত লোকের আচরণকে অপচারীদের বিকারের সঙ্গে তুলনা করা যায় এবং উভয়ের একটা ব্যাকরণের মিলও লক্ষ্য করা যায়। বাতিক ও অপচারীদের বিকারের মধ্যে পার্থক্যটা প্রণিধানের যোগ্য। বাতিকের বিকার অপচারীদের মত আচরণে সার্থক নয়। বাতিকের ক্ষোভ মাত্র কতগুলি লক্ষণ (Symptom) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বাতিকের এই বিলক্ষণ কর্ম্মগুলি প্রকারান্তরে কামাচার মাত্র।

অপচারীরা এক হিসাবে সফলকাম, কিন্তু বাতিকেরা বিফল তপস্যায় ক্লিষ্ট হয়ে গেছে; সামাজিক রুচি ও সংস্কারের প্রতিরোধের দুর্গের মধ্যে তাদের প্রবল প্রবৃত্তির দল বন্দী।

কামপ্রবৃত্তির গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি খুবই দরকারী প্রসঙ্গের অবতারণা এইবার করা যেতে পারে : প্রবৃত্তির শিশুয়ালি (Infantilism)।

শিশু-বয়সে কামপ্রবৃত্তি যেরূপ দেখা দেয়, তার সঙ্গে পরিণত বয়সের অপচারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায়, অপচারের মানসিক শিকড় শিশু জীবনের মাটীতে আশ্রিত রয়েছে। সেই অপোগণ্ড কামপ্রবৃত্তিগুলি যেন বড় হয়েও বুড়ো হয় না। প্রবীণ বয়সেও প্রবৃত্তির ছেলেমানুষী দুরন্তপনা ও নষ্টামি মিটে যায় না।

শিশুদের কামচর্য্যার রীতিনীতি ডাক্তার ফ্রয়েড বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা করেছেন। ফলে দেখা গেছে যে, শিশুদের কামুকতা বুড়ো অপচারীদের (Pervert) মত। সম-কামিতা, আত্মরতি, বস্তুরতি থেকে সুরু করে মূত্র-পুরীষ সেবা পর্য্যন্ত—শিশু নামে এই ক্ষুদ্র বর্ব্বরের

কোন্ আসক্তি না আছে? এমন কি বিনা কারণে পিঁপড়ে বা ফড়িং ধরে চট্‌কে মেরে ফেলার নিছক সাদীয় কীর্তি একেবারে দুধে শিশুর আচরণেই দেখা যায়। ফ্রয়েড বলেন, এসবই শিশুর কামকলা (বা কামের শিশুয়ালি) মাত্র। শিশুর মনে জননাঙ্গের সম্বন্ধে বিশিষ্টবোধ জাগ্রত হয় অনেক পরে। কিন্তু তার আগে থেকেই তার কামচর্চার অধ্যায় সুরু হয়ে যায়। হাতের বুড়ো আঙুল চোষা থেকে আরম্ভ করে মলবেগ চেপে রাখা পর্য্যন্ত সবই কামকলার শৈশব পাঠ।

তাহ'লে কি সিদ্ধান্ত এই করতে হয়, এই অপচারীসুলভ উন্মার্গ কামপ্রবৃত্তিটি মানুষের জন্মার্জ্জিত? ফ্রয়েড বলেন—হাঁ, কামের অপচারিতাই স্বাভাবিক (Normal) সত্য। সামাজিক নীতিতত্ত্বে যাকে আমরা স্বভাব-সঙ্গত বলি সেটাই আসলে স্বভাব-বিরুদ্ধ। সভ্য জীবনে নানাবিধ লৌকিক রুচির শাসন (Resistance) সেই অপচারবিলাসী জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তিকে সংস্কৃত (বিকল্পে বিকৃত) করে রাখে।

শিশুর কামাচারের প্রথম স্বৈরতার দশা শেষ হয়ে আসে তখন, যখন সে তার প্রথম প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে চিনতে পারে। শিশুর মন তার কাঁচা মনের আবেগ দিয়ে প্রথম যাদের আত্মীয় বলে চিনতে পারে, তারা হলো শিশুর বাপ ও মা। শিশুর মনে সামাজিক সম্পর্কের বোধ প্রথম উন্মেষ লাভ করে মা-বাপের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে, জৈবমোহে অনুপ্রাণিত এক দম্পতির বাৎসল্যে অভিষিক্ত লালনসাধনার মধ্যে।

শিশুর কামাবেগ এই সময় ব্যক্তি বিশেষে আরোপিত হয়। এই ভাবে আস্পদলাভের পর শিশুর প্রবৃত্তি বিশিষ্ট একটি ছাঁচে ঢালাই হতে থাকে। এই শৈশব কামগঠন ভবিষ্যৎ জীবনে অন্তরে অন্তরে অটুট থাকে এবং চরিতার্থতার জন্য দাবী জানালে বাস্তবের বিরুদ্ধ সংঘাতে মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। এই দ্বন্দ্বের প্রভাব চরিত্রের ওপর প্রতিফলিত হয়।

ডাক্তার ফ্রয়েড শিশুর এই নবরূপে রূপায়িত কাম-মানসিক আবেগকে দুটি বিশিষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন :

(১) ইদিপাস (Edipus)—'সুতমাতা পরস্পরে, প্রথমে যে প্রেম করে', তারই আবেগ-গ্রন্থির নাম হলো ইদিপাস মানসকূট। এই প্রসঙ্গে ইদিপাস নামটির ব্যাখ্যার জন্য গ্রীসীয় উপাখ্যান উল্লেখ করা যেতে পারে।

থীবিসের রাজা লাইয়াসের ছেলের নাম ইদিপাস। রাণী বা ইদিপাসের মাতার নাম জোকাস্টা। ইদিপাস ভূমিষ্ঠ হবার আগেই রাজা দৈববাণী শুনেছিলেন যে, তাঁরই ছেলে তাঁকে হত্যা করবে। ইদিপাস জন্মলাভ করা মাত্র তাকে দূরস্থানে ফেলে দেওয়া হয়। করিন্থের রাজা সেই সদ্যোজাত ও অজ্ঞাতকুলশীল পরিত্যক্ত শিশুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে পালন করেন। বড় হয়ে ইদিপাসের সঙ্গে একদিন পথে রাজা লাইয়াসের মুখোমুখি দেখা ও কোন কারণে কলহের সূত্রপাত হয়। ফলে দুজনের মধ্যে মারামারি হয় এবং রাজা লাইয়াস নিহত হন। ইদিপাস তখন থীবিস নগরে প্রবেশ করেন এবং রাণী জোকাস্টাকে বিয়ে করে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। জোকাস্টার গর্ভে ইদিপাসের দুটি পুত্র এবং দুটি কন্যা হয়। ইদিপাস পরে জানতে পারে যে সে ঘটনাচক্রে নিজের গর্ভধারিণীকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করে বসেছে। এর পরেই ইদিপাসের জীবনের ট্রাজেডি আরম্ভ হয়। [সোফোক্লিস কথিত উপাখ্যান]

উপাখ্যানের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়, কেন ফ্রয়েড 'ইদিপাস' নামটিকে মাতা-পুত্র

আসক্তির পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

(২) ইলেক্‌ট্রা (Electra) বা পিতা-কন্যার পরস্পর আসক্তি। এই নামটিও সোফোক্লিস বর্ণিত উপাখ্যান থেকে নেওয়া।

আগামেম্‌ননের মেয়ের নাম ইলেকট্রা, পত্নীর নাম ক্লাইটিমনেস্ট্রা। আগামেমনন পত্নীর হাতে নিহত হন। মেয়ে ইলেকট্রা তখন তার সহোদর ভাই ওরেষ্টিসকে দিয়ে মাতা ক্লাইটিমনেষ্ট্রাকে হত্যা করিয়ে পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

এই ঘটনার যে-মর্ম্মার্থ ডাক্তার ফ্রয়েডকে সমর্থন করে সেটা হলো—পিতার প্রতি কন্যার অনুরাগ, যার প্রেরণায় মাতাকে হত্যা করতেও দ্বিধা হয় না।

উক্ত দুই উপাখ্যানের মধ্যে পিতা ছেলের কাছে এবং মা মেয়ের কাছে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে বর্ণিত হয়েছে। কিসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা? ডাক্তার ফ্রয়েড উত্তরে বলবেন,—আসক্তির আস্পদ নিয়ে। শিশু পুত্রের কাছে মাতাই তার সকল কামনার আস্পদ এবং পিতা যেন প্রতিদ্বন্দ্বী। কন্যার কাছে পিতাই অনুরাগের প্রধান আস্পদ, মাতা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিনী। এই অভিমত যুক্তিতে উত্তীর্ণ হলে, আর একটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই করতে হয়। অর্থাৎ শিশুবয়স থেকে ছেলে বাপের বিরুদ্ধে এবং মেয়ে মায়ের বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব নিয়ে বড় হতে থাকে। শৈশবে এই অনুরাগ শিশুর কামজ স্ফূর্তির ভেতরেই সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। ভবিষ্যতে অর্থাৎ বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে মূল কামজ অনুরাগ অজ্ঞাত মনের ভেতরেই চাপা থাকে, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ নানা আচরণে নিষ্পন্ন হয়। নরনারীর মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে এই দুই মানসকূটের ক্রিয়া বরাবর লক্ষ্য করা যায়। হিষ্টিরিয়া-রোগীর মন বিশ্লেষণ করে যেসব দমিত আবেগের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়, দেখা গেছে যে তার মধ্যে ইদিপাস ও ইলেকট্রার প্রকোপ খুব বেশী।

রঙ্গভরা মন

[হাসি পায় কেন—রঙ্গরসের (Wit) নমুনা—রঙ্গ-ভঙ্গী ও রঙ্গ-ভাবনা—রঙ্গ-বিষয়ের গঠনে মনের প্রক্রিয়া—স্বপ্ন ও রঙ্গ গঠনগত সাদৃশ্য—মানসশক্তির ব্যয়সংক্ষেপ (Economy in Psychic Expenditure)—উইট হিউমার ও কমিক—রঙ্গকলায় শিশুয়ালি (Infantilism)—সভ্যতা ও রঙ্গকলা—রঙ্গ ও আনন্দবোধ।]

—আমরা খাসা আছি!

—তার প্রমাণ?

—'হাস্য পেলেই হাসি,

'আর নৃত্য পেলেই নাচি।'

কবি ডি-এল রায় খাসা থাকবার একটা হদিস দিয়ে তাঁর দায় খালাস করে দিয়েছেন। কিন্তু হাস্যকে পাই কোথা থেকে? সে তো পথেঘাটে ছড়িয়ে পড়ে নেই। অনেক সাধনায় তাকে পেতে হয়। হাসি পাওয়া জীবনের এক পরম পাওয়া। হাসি যেন এক এক ঝলক তৃষ্ণার জল, ক্লিষ্ট মনের মানুষ ক্ষণে ক্ষণে চুমুক দিয়ে, আশ মিটিয়ে পান করে তৃপ্ত হয়।

হাসি একটা শারীর আচরণ ; কিন্তু তার পেছনে আছে একটি রসোপেত আবেগের স্ফূর্তি। ডাক্তার ফ্রয়েডকে তাঁর মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় রঙ্গরসের (Wit) প্রসঙ্গ আনতে হয়েছে। আমাদের জানতে হবে, ফ্রয়েড রঙ্গরস তথা হাস্যতত্ত্বের মধ্যে মনস্তত্ত্বের কোন্ বৈজ্ঞানিক নির্ণয় খুঁজে পেলেন।

প্রথমে ভাষাগত উদাহরণ ধরা যাক্। ভাষার মধ্যে নানারকম শব্দগত প্রক্ষেপ ও মিশ্রণের কারুকার্য্য দেখা যায়, যার ফলে (কানে শুনে বা পড়ে) মনে রঙ্গরসের সঞ্চার করে।

(১) মানভূম জেলার এক গেঁয়ো জমিদারের ছেলে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়তো। গাঁয়ের স্কুল ছেড়ে শহরের কলেজে ঢুকেই সে হঠাৎ সাহেব ব'নে যায়। তার গায়ের রং ছিল ঘোর কালো; সাহেবী পোষাকে সেজে, মুখে পুরু করে স্নো-পাউডার ঘসে, সুগন্ধ লোশন দিয়ে চুল পাট করে আর রুমালে এসেন্স চুবিয়ে ছেলেটি ক্লাসে আসতো। বাংলা ক্লাসে একদিন পণ্ডিতমশাইকে ছেলেটি তার সরল কৌতূহলের বশেই প্রশ্ন করেছিল—পণ্ডিতমশাই, 'ছুঁচো' শব্দের ভাল বাংলা কি?

পণ্ডিত মশাই উত্তর দিলেন।—সুগন্ধনকুল!

(২) প্রশ্ন : কম্ বলবন্তং ন বাধতে শীতম্?

উত্তর : কম্বলবন্তং ন বাধতে শীতম্।

অথবা—

প্রশ্ন : পৃথিবীটা কার বশ?

উত্তর : পৃথিবী টাকার বশ।

(৩) প্রশ্ন : নারায়ণ নামে পত্রিকাটির কি উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর : চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য!

(৪) কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর!

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর!

(৫) প্রশ্ন : গীতায় ঈশ্বরবাদ আছে?

উত্তর : হাঁ, ঈশ্বর বাদ আছে। (রসরাজ অমৃতলাল)

(৬) অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে কাছে ডাকিয়ে একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন—'আপনাকে আমি দণ্ড দেব।'

শুনে রায় মশায় ঘাব্‌ড়ে গেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পরক্ষণেই রায় মহাশয়ের দিকে একটি লাঠি এগিয়ে দিয়ে বললেন,—'এই নিন, আপনার দণ্ডটি ভুল করে ফেলে গিয়েছিলেন।'

ওপরের উদাহরণগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে রঙ্গরসের কিছু-না-কিছু উপাদান আছে। এর মধ্যে ভাষা ও শব্দগত ভাব এবং অর্থের প্রত্যয় লক্ষ্য করলে আমরা রঙ্গরসতত্ত্বের একটা প্রাথমিক ব্যাকরণ দাঁড় করাতে পারি।

স্বপ্নের ভাবনা ও বৃত্তান্তের গঠনতন্ত্র এবং বাতিক মানুষের চিন্তার রীতিনীতির সঙ্গে রঙ্গ রসের ব্যাকরণেরও সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথম উদাহরণটি ধরা যাক্—'সুগন্ধনকুল'। শব্দটি উচ্চারিত হবার পূর্ব্বক্ষণে পণ্ডিতমশায়ের মনে দু'টি কথা একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল—সুগন্ধ + গন্ধনকুল। ছাত্রটির সুগন্ধি বিলাস পণ্ডিতমশাই ভাল চক্ষে দেখতেন না। তাই তার ওপর প্রসন্নও ছিলেন না। এদিকে 'ছুঁচো' শব্দটির একটি সাধু প্রতিশব্দ হলো—গন্ধনকুল। এই দুটি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ পণ্ডিতমশায়ের ভাবনায় সংক্ষিপ্ত হয়ে (দ্রঃ Condensation) 'সুগন্ধ নকুল' হয়ে পড়েছে। নতুন কথাটার ভেতরে একটা নতুন অর্থ পরিস্ফুট; এবং পণ্ডিতমশায়ের প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাটিও পরিস্ফুট। তিনি একটা সংক্ষিপ্ত আলঙ্কারিক উপায়ে ছাত্রটিকে 'ছুঁচো' বলে বিদ্রূপ করতে চাইছেন। উভয় শব্দের মধ্যে 'গন্ধ' কথাটী আছে;

কিন্তু তার মধ্যে একটি অপসারিত (দ্রঃ Displacement) হয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণে প্রশ্নের মধ্যেই উত্তর নিহিত রয়েছে।—কোন্ বলবানকে শীতে কাতর করে না? কম্বলবানকে করে না। অথবা—পৃথিবীটা কার বশ? উত্তর, টাকার বশ। এর মধ্যেও দেখা যায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত দু'টি আস্ত শব্দের অংশবিশেষ জোড়া লেগে নতুন অর্থ তৈরী করে উত্তর দিচ্ছে। আবার দেখা যায়—আস্ত শব্দ দু'ভাগ হয়ে বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করে। যেমন, রসরাজ অমৃতলালের উক্তি—গীতায় ঈশ্বর বাদ আছে। ঈশ্বরবাদ কথাটি শুধু বিভক্ত হয়েছে, তা নয় ; পরন্তু বিপরীত অর্থও প্রকাশ করছে (Inversion)।

রঙ্গরসে দ্ব্যর্থ-বোধক (Ambiguity) একটি বহুপ্রচলিত অলংকার। 'কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত' পংক্তিটির দুই অর্থ সকলেই জানেন। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর জিজ্ঞাসার উত্তরে অন্নপূর্ণা যে-ভাষায় স্বামীর পরিচয় জানিয়ে দিলেন, তার মধ্যে দ্ব্যর্থ-বোধ এবং ব্যাজরূপের (Inversion) এক বিস্ময়কর কাব্যিক সৃষ্টি।

বাকী উদাহরণগুলির মধ্যেও রঙ্গরসের গঠনতন্ত্রে একই নিয়ম আবিষ্কার করা যায়।

অর্থহীনতা (Nonsense) রঙ্গরস সৃষ্টির পক্ষে আর একটা বড় সহায়। মৃদঙ্গীরা বাজনার সময় যেসব বোল ছাড়েন, সেগুলি শুনলে অনেক সময় হাসি পায়। বোলের ভাষায় কোন অর্থ নেই, কিন্তু ভাবার্থ আছে (অর্থাৎ বাজনার তাল-মান ইত্যাদি)। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে অর্থহীনতার আড়ম্বর খুবই বেশী দেখা যায়। মহাবীর হনুমান তার লাঙ্গুলটিকে যোজনব্যাপী বিস্তার সাধন করলেন ; পৌরাণিক লেখকও এই ভাবে উদ্ভট ননসেন্সের সাহায্যে রঙ্গরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। গুলিখোরদের গল্পের একমাত্র মজা হলো এই চরম অর্থহীনতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় একবার একটা স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে শুনলেন, একটি ছাত্র 'বৃন্দাবন' কথাটিকে 'বিন্দ্রাবন' উচ্চারণ করছে।

ভূদেব স্কুলের শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেদের কোন্ বই পড়ানো হচ্ছে?

শিক্ষক—দ্রিতীয় ভাগ।

ভূদেব বললেন—ব্রেশ!

এই ঘটনার মধ্যে রঙ্গরস জমে উঠেছে বিকৃতি (Distortion) ও অর্থহীনতার মধ্যে।

বিদ্রূপসাহিত্যে বিশেষ একধরণের রঙ্গরসের আধিক্য দেখা যায়। এর টেকনিক হলো বিপরীত অর্থের সাহায্যে বিষয়কে ধিক্কার দেওয়া। উদাহরণ—'For Brutus was an honourable man'। লক্ষ্ণৌবাসী ভদ্রলোক তাঁর ক্লাসিক সৌজন্যের খাতিরে অতিথির সম্মুখে পানের ডিবা এগিয়ে দিয়ে বিনয়বচনে অনুরোধ করেন—অনুগ্রহ করে একটু তক্‌লিফ করুন। ভদ্রলোক পান খাইয়ে অতিথিকে তুষ্ট করতে চান, কিন্তু ভাষায় কষ্ট (তক্‌লিফ) দিতে চাইছেন। ভাষার এই রঙ্গরসিকতা সৌজন্যকে রসিত করেছে।

সর্বস্বান্ত রায়ত যখন অত্যাচারী জমিদারকে বলে,—সবই আপনার দয়া হুজুর! মিথ্যে দেনার দায়ে মামলা করেছেন, ভিটেমাটি ক্রোক করেছেন, হালের গরুকে সেঁকো খাইয়ে মেরেছেন, ক্ষেতের আল ভেঙে দিয়েছেন ; আপনার 'দয়ার' শেষ নেই হুজুর।

'দয়া' কথাটা ব্যবহার করে (দয়ার বিপরীত) প্রচণ্ড নিষ্ঠুরতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

রঙ্গরস কখনো কখনো রূপকভাবে গড়ে ওঠে। মোটামুটি বিশ্লেষণ করলে, রঙ্গরসের গঠন ও স্বপ্নের মধ্যে একই নিয়মের খেলা দেখতে পাওয়া যায়।

এরপর প্রশ্ন আসে, রঙ্গ দেখে শুনে হাসি পায় কেন?

রঙ্গবিষয়ের কাহিনীগত বা চিন্তাগত অর্থ (Thought Content) বুঝেই কি আমরা হেসে ফেলি? ডাক্তার ফ্রয়েড বলেছেন : আসল ব্যাপার তা নয়। তা হ'লে, কাহিনীটি সাধারণ প্রাঞ্জল রঙ্গহীন গদ্যে বললেই লোকে অর্থটি আরও সহজে বুঝতে পারতো এবং হাসতো। বলতে হয়, রঙ্গকথার টেকনিক বা অন্বয় বা প্রকাশভঙ্গী হলো শ্রোতার হাসির আসল কারণ।

কিন্তু আর একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত মাত্র সরল রঙ্গকথার (Harmless Wit) বেলায় খাটে। কিন্তু ডাক্তার ফ্রয়েড দেখেছেন যে রঙ্গবিষয় সর্বক্ষেত্রে সরল কথার কথা নয়। বহু রঙ্গবিষয়ের মধ্যে একটা গূঢ়ার্থ প্রবণতা আছে (Tendency Wit)। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙ্গকথার প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে চটুলতা বিচিত্রতা বা অভিনবত্বের বিশেষ কোন আস্বাদ পাওয়া যায় না। এই রঙ্গকথার চিন্তাগত অর্থ বা ভাবনাংশটিই (Thought Content) চমকপ্রদ। 'হরিরে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়'—এই পদটির প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে চমক লাগাবার মত বা রস সৃষ্টি করার মত ব্যাপার সামান্যই রয়েছে। কিন্তু অর্থটা ওজনে বেশ ভারি। কেউ হয়তো বললো, পাখির ঘুম ভাঙলে সূর্য্য ওঠে। এই কথার মধ্যে যা-কিছু রঙ্গরস আছে, সেটা ভাবার্থগত অংশের মধ্যেই আছে; অর্থাৎ বক্তার মূঢ়তাটাই এখানে উপভোগ্য এবং এই মূঢ়তা সমস্ত পদটির ভাবার্থ দিয়েই প্রমাণিত হয়। পদটির প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কোনই রসকষ নেই—কথার কোন কারুকার্য্য নেই। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, এখানে রঙ্গরস নিছক টেকনিক বা প্রকাশভঙ্গীকেই আশ্রয় করে নেই। রঙ্গকথার ভাবনাংশ বা উদ্দেশ্যও (বা Tendency) রস সৃষ্টির সহায়তা করে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্থগূঢ় রঙ্গ-কথার উদাহরণ সাহিত্য রচনার ভঙ্গী থেকে অনেক পাওয়া যায়।

এখন সিদ্ধান্ত করা যায়—মাত্র রঙ্গ-কথাটির মধ্যে রস সৃষ্টির কোন শক্তি নেই। রসের স্ফূর্তি আসছে দুটি আধার থেকে :

(১) রঙ্গ-ভঙ্গী (Wit technique)

(২) রঙ্গ-ভাবনা (Wit tendency)

রঙ্গকথা শুনে হাসি পায় বা মনের মধ্যে একটা রসাবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোন একটা চরিতার্থতার (Gratification) ব্যাপার শ্রোতার মনের মধ্যে ঘটছে।

হাঁ, একটা কিছু চরিতার্থ আছে, যা অন্যভাবে হবার উপায় ছিল না। কার্টুন শিল্পীরা দেশের একজন পদস্থ ও প্রতাপশালী ব্যক্তির ব্যঙ্গচিত্র এঁকে থাকেন। কার্টুনের মধ্যে একটা রূপক পরিবেশ সৃষ্টি করে অনেক বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হয়; এই মনের ভাব অন্য কোন উপায়ে (গান গেয়ে বা সরল গদ্যে) প্রকাশ করলে মানহানির দায়ে পড়ার ভয় আছে। কার্টুন শিল্পী ছবির মধ্যে সেই ভয়কে (যাকে একটা বাধা বা Inhibition বলা যায়) কৌশলে অতিক্রম করতে পারেন। রঙ্গকলার পদ্ধতিও এই রকম। একটা মানসিক নিষেধ বা প্রতিবন্ধককে ফাঁকিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। রঙ্গকলার মধ্যে এই চেষ্টা সফল হয়—যার ফলে চরিতার্থতা বোধ জাগ্রত হয়, মন খুসীতে ভরে ওঠে।

রঙ্গরসের স্পর্শে মনে হাসিখুসীর যে আবির্ভাব হলো, তাতে মনের যন্ত্রে নিশ্চয় একটা

আলোড়ন হয়ে গেল বুঝতে হবে। রঙ্গরসের সাড়ায় মনের এই ক্রিয়াটি এইবার আমরা লক্ষ্য করবো। আগেই বলা হয়েছে যে—মনের একটা নিরোধ শক্তিকে (Inhibition) অতিক্রম করে ইচ্ছা স্ফূর্তি লাভ করে। এই ইচ্ছা প্রায়তঃ অজ্ঞাত ইচ্ছা। এখনি সোজাসুজি 'অজ্ঞাত-ইচ্ছার স্ফূর্তি' না ব'লে মনোযন্ত্রের কাজটা আগে বুঝে নেওয়া যাক্। ডাক্তার ফ্রয়েড এই কাজকে বলেছেন—'মানসশক্তির ব্যয়সংক্ষেপ' (Economy in Psychic Expenditure)। নিরোধশক্তির একটি মানসিক মূলধন আছে। অবাধ্য স্ফূর্তিপ্রয়াসী ইচ্ছাকে চেপে রাখতে হলে, এই মূলধনের কিছুটা খরচ হয়। রঙ্গরসের ব্যাপারে ইচ্ছার স্ফূর্তিকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্য যতটা নিরোধ প্রয়োজন, মানসিক মূলধন থেকে ততখানি সাহায্য আসে না। এই কার্পণ্যের সুযোগেই ইচ্ছা রঙ্গ-বিষয়ের রূপ স্ফূর্তি লাভ করে।

আর এক ভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা যাক্। আমরা জানি, যুক্তিবিচার মানুষের চিন্তায় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চারিত হয়েছে। অপোগণ্ড বয়সে বা ভূমিষ্ঠ হবার সময় কেউ যুক্তির টিকী মাথায় নিয়ে দেখা দেয়নি। শৈশবের চিন্তা ও ধারণার বহু মূঢ়তা বাসা বেঁধে থাকতো। সেই মূঢ়তার ভোঁতামূর্ত্তিকে বয়সের সঙ্গে বুদ্ধি ও যুক্তির ছুরি দিয়ে কেটেকুটে পরিষ্কার করে নিয়ে আমরা জ্ঞান, সত্য বা বাস্তবতাবোধ লাভ করেছি। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানে উপমাটা অন্যভাবে দেওয়া হয় : শৈশবের ভ্রান্ত ধারণা বা মূঢ়তাকে আমরা বড় হয়ে যুক্তিলব্ধ বোধের জোরে চাপা দিয়েছি। যুক্তির এই চাপা-দেওয়া কাজকেই 'নিরোধ' বলা যায়। ভাঁড়ামি নামে রঙ্গকলার মধ্যে নাকাল হওয়া বা মূঢ়তার অভিনয় থাকে। রঙ্গকলার অন্যান্য নমুনার মধ্যেও মূঢ়তার অভিব্যক্তি দেখা যায়। এক কথায় বলতে হয়, দমিত মূঢ়তা নিরোধকে ফাঁকি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এই পরিদৃশ্য নিজের মধ্যে বা অপরের মারফৎ উপভোগ করে রঙ্গরসের আস্বাদ লাভ হয়। এই চরিতার্থতার দৈহিক প্রতিচ্ছবি হাসির রূপে ফুটে ওঠে।

ইংরাজী 'উইট' (Wit) কথাটির প্রয়োগ আমরা এপর্য্যন্ত রঙ্গরস নির্বিশেষে করে এসেছি। ক্যারিকেচার, হরবোলা, বিদ্ঘুটে মুখোস পরা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, ধাঁধার উত্তর, ভাঁড়ামি, ইয়ার্কি প্রভৃতি যতরকম হাসবার আয়োজন আছে, ফ্রয়েড তার মধ্যে গুণ অনুসারে প্রধান তিনটি রঙ্গ-বিষয়ের বিভাগ করেছেন : (১) উইট (Wit) (২) কমিক (Comic) এবং (৩) হিউমার (Humour)। প্রত্যেক রঙ্গ বিষয়ের মধ্যে একটা গূঢ়মানসিক শক্তির কার্পণ্য দেখা যায়।

(ক) উইট— নিরোধের (Inhibition) চাপ লঘু করে বা এড়িয়ে বা কম খরচ করিয়ে যে অজ্ঞাত ভাবনা আত্মপ্রকাশ লাভ ও রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

(খ) কমিক— চিন্তার (Thought) চাপ লঘু করে বা এড়িয়ে যে অজ্ঞাত ভাবনার আত্মপ্রকাশ রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

(গ) হিউমার—অনুভূতির (Feeling) চাপ বা প্রাবল্যকে লঘু করে যে অজ্ঞাত ভাবনার আত্মপ্রকাশ রঙ্গরস সৃষ্টি করে।

এতক্ষণে আমরা একটা সাদা কথার বৈজ্ঞানিক অর্থ বুঝতে পারি। যাকে বলি—'মনকে হাল্‌কা করা'। হাসলে নাকি মন হাল্‌কা হয়। ফ্রয়েড সাহেব এই মন হাল্‌কা হওয়ার ব্যাপারকেই—গূঢ়মানসিক শক্তির ব্যয়সংক্ষেপ (বা Economy in Psychic Expenditure) বলেছেন।

রঙ্গকলা ও হাস্যতত্ত্বের সম্পর্কে যতটুকু বোঝা গেল, তাতে সাধারণ আচরণের ভুলভ্রান্তির সঙ্গে একটা তুলনা চলে। ভ্রমাত্মক আচরণের মধ্যে অজ্ঞাত ইচ্ছা নানা ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্নের মধ্যেও তাই। রঙ্গকলার ক্ষেত্রে এসেও দেখা যাচ্ছে একই ব্যাপার।

পার্থক্য এক জায়গায় আছে। রঙ্গকলার মধ্যে অজ্ঞাত ইচ্ছা স্ফূর্ত হয়ে শুধু আনন্দরস (Pleasure) জাগ্রত করে ; অন্য কোন ভাব বা রস জাগ্রত করে না। রঙ্গকলা সভ্যমানুষের মনোযন্ত্রের এক অদ্ভুত সৃষ্টি। রঙ্গকলার মধ্যে একজনের অজ্ঞাত ইচ্ছার স্ফূর্তি আর পাঁচ জনের মনে পরিবেশন করা যায়। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে অজ্ঞাত ইচ্ছা সামাজিকতা রক্ষা করা চলে। স্বপ্নের এই রস-সংক্রামক গুণ নেই।

বর্ব্বর মানুষের কাছে রঙ্গরসের প্রয়োজন ছিল না। প্রাচীন বন্য বর্ব্বর মানুষ অথবা আধুনিক ক্ষুদ্র মনুষ্যশিশু—এই দু'জনের মধ্যে কারো মনে রসিকতার বালাই নেই। মানুষ যত সভ্য হচ্ছে, নিরোধও সেই হারে বেড়ে যাচ্ছে। রঙ্গকলার প্রয়োজনও সেই হারে বেড়ে চলেছে।

রঙ্গকলা অনুশীলনের মধ্যে আমরা নিজেদেরই হারিয়ে যাওয়া মনকে খুঁজে বেড়াই। শিশু বয়সে মনের কাজ সহজ সরল ভাবে সারা হতো। সে'সময় মনকে হালকা করার কোন প্রয়োজন ছিল না ; কারণ মন নিজেই হাল্‌কা ছিল। কিন্তু বয়োন্নতির ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মনের ওপর নানা প্রতিক্রিয়ার চাপ পড়তে থাকে। মনের স্প্রিংগুলি যেন ভারের চাপে বসে যেতে থাকে। যে-আচরণের সাড়া মনের এই চাপ হালকা করে—তারই প্রতিসাড়া হলো মনে আনন্দরসের (Pleasure) অনুভব।

মনকে হালকা করার জন্য আমরা হাসি। এই মন এক-দু হাজার বছর পরে কেমনতর হয়ে যাবে জানি না। তখন আমাদের মুখের হাসিটিই বা কেমন হয়ে যাবে কে জানে।

টোটেম ও ট্যাবু

[গোষ্ঠীদেবতা টোটেম—আদিমতা থেকে বর্ব্বরতায়—সমাজগঠনের প্রথম প্রয়াস—পৃথিবীর প্রথম আইন ট্যাবু—ট্যাবু-শাসনে বর্ব্বরের মানসিক প্রতিক্রিয়া—বর্ব্বরের ও বাতিকের মানসিক গঠনের সাদৃশ্য—টোটেমতন্ত্র ও সভ্যতার বিবর্ত্তন—ইদিপাস ও টোটেম-রহস্য।]

অসভ্য জাতিদের মধ্যে বংশ বা গোষ্ঠীর নামকরণ হয় টোটেমের (Totem) নামানুসারে। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন টোটেম। টোটেম কথাটি রেড-ইণ্ডিয়ানদের ভাষা। সাধারণতঃ কোন জন্তু বা গাছকে বংশের টোটেম রূপে কল্পনা করে নেওয়া হয়। টোটেম হলেন বংশের কল্পিত আদি-পুরুষ (বা আদিজীব বা আদিপিতা)। চল্‌তি কথায় টোটেমকে বংশদেবতা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য জাতিদের মধ্যে গোষ্ঠীগুলির টোটেম হলো কাঙ্গারু এমু ইত্যাদি।

টোটেম-জীব পরম শ্রদ্ধাস্পদ জীব। তাকে হত্যা করা নিষেধ।

আদিম মানুষের কল্পনায় টোটেমের আবির্ভাব প্রথম সমাজ-গঠনের সূচনা করেছিল। এক টোটেম—এক গোষ্ঠী, এই ছিল নিয়ম। টোটেমের নামে আদিম মানুষের গোত্র-পরিচয় তৈরী হলো ; আদিম মানুষ সামাজিকতার সাধনার প্রথম ধাপে পা দিল। এইখানে বর্ব্বর যুগের আরম্ভ।

টোটেমতন্ত্রের দ্বিতীয় বিধান হলো—সগোত্র বিবাহ (অর্থাৎ নরনারীর দৈহিক মিলন) নিষেধ। এক-টোটেমী গোষ্ঠীর মধ্যে কোন নর-নারীর যৌনসংসর্গ দূষণীয় অপরাধ বলে সাব্যস্ত হলো। টোটেমতন্ত্রেই প্রথম দেখা গেল যে, মানুষ একটা পাশব প্রথা পরিহার করার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ আত্মীয়াসক্তি (Incest) নিষিদ্ধ হচ্ছে। অন্যভাবে বলা যায় একশোণিত (Consanguinous) বিবাহ নিষিদ্ধ হলো।

মানুষের সামাজিক ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে (১) প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো—টোটেম জীব হত্যার বিরুদ্ধে। (২) দ্বিতীয় নিষেধ প্রথম রিপুর ওপর—আত্মীয়াসক্তির বিরুদ্ধে।

এই নিষেধকেই ট্যাবু (Taboo) বলা হয়। এই কথাটাও বর্ব্বরদের—পলিনেসীয় অসভ্যদের ভাষা থেকে নেওয়া হয়েছে। শোনা যায় ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে ও অথর্ব্ব বেদে 'ট্যাবু' কথাটি আছে। ট্যাবুর তাৎপর্য্য হলো—'সভয় শ্রদ্ধা'। 'এটা করতে নেই, ওটা ছুঁতে নেই—করলে খারাপ হয়'—এই ধরণের এক একটা ট্যাবু (নিষেধ) হলো বর্ব্বর সমাজের পিনাল কোড ; অথবা মানবসমাজের প্রাচীনতম স্মার্ত্ত বিধান।

নবজাত শিশু, রজস্বলা নারী, মৃত স্বজনের শব ইত্যাদি বিষয়ে ট্যাবু জনিত অশৌচ পালনের রীতি আধুনিক অনুষ্ঠান নয়—বর্ব্বর যুগ থেকেই এইসব প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এই সবের মধ্যে একটা স্পর্শদোষ রয়েছে। একদিন কোন প্রয়োজনের খাতিরে বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই ট্যাবু জারি করা হয়েছিল এবং তার অন্যথা হলে শাস্তির ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই উদ্দেশ্যটা লোকে ভুলে গেল, প্রয়োজনও হয়তো আর ছিল না। তবু ট্যাবু আচরণের মধ্যে নিরর্থক ভাবে বর্ত্তিয়ে রইল।

এখন ট্যাবুর প্রকৃতি বিচার করে নিতে পারা যায় : ট্যাবুর উদ্দেশ্য অজ্ঞাত—অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদ নেই। তবু তাকে কায়মনে পালন করা হচ্ছে, অথচ পালন না করলে (অথবা লঙ্ঘন করলে) কোন শাস্তি পাবার ভয়ও নেই। তবে বাধা কোথায়? সকলের অলক্ষ্যে আঁতুড় ঘরের শিশুকে ছুঁলে কেউ নিন্দে করতে আসবে না, কোন চৌকিদার গ্রেপ্তার করবে না। তবু দ্বিধা ও বাধা।

বাধা রয়েছে মনের ভেতর। যাকে ছুঁতে নেই (ট্যাবু), তাকে ছোঁয়া হলো। মনের ভেতর থেকেই একটা অশুচিতা-বোধের শাসন ধিক্কার দিয়ে ওঠে। ট্যাবু অমান্য করতে গেলে এই ভিতর-মনের শাসনই সাবধান করে দেয়। এই নিষেধ-ধার্ম্মিক মনের পুলিশকে বলা যায়—'বিবেকবোধ'। ট্যাবু চর্চ্চার ভেতর দিয়েই মানুষের মনে প্রথম বিবেক জাগ্রত হয়েছে।

ছুঁতে নেই—এই নিষেধ মনের স্বাভাবিক স্পর্শাসক্তি বা ছোঁয়ার ইচ্ছাকে দমিয়ে দিল। সুতরাং ট্যাবুর মধ্যে দমনের (Repression) কাজ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এই দমিত আবেগ অজ্ঞাত মনে গিয়ে বাসা বাঁধলো। ফলে এই দাঁড়ালো যে, ট্যাবুর প্রতি বর্ব্বর মানুষের একটা দ্বন্দ্বোপেত (দুই পরস্পর-বিপরীত) মনোভাব (Ambivalence) তৈরী হলো। অজ্ঞাত মনের ইচ্ছার আবেগ ট্যাবুকে অমান্য করতে চায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবেক-বোধ, বা ভয় বা মানসিক বাধা (Resistance) ট্যাবুকে মান্য করে চলতে বলে। এই দ্বন্দ্বোপেত মনোভাবের দরুণ ট্যাবুর প্রতি একই সঙ্গে দুই বিপরীত গুণ আরোপ করা হয়। যে বস্তু একদিকে পবিত্র, আর একদিক দিয়ে সেটাই অপবিত্র। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় পরিবর্ত্তন হলো ট্যাবুশাসিত মনের পরবর্ত্তী পরিবর্ত্তন। 'ট্যাবু অমান্য করতে

ভয় হয়—তাই সর্ব্বদা ভয় হয় কখন ট্যাবু অমান্য করে ফেলি'। এই ধরণের একটা উদ্বেগ বর্ব্বর মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে বসলো।

ট্যাবুর বিচার এই পর্য্যন্ত নিয়ে এসে এইবার একজন বাতিককে এনে তুলনা করা হোক্। একজন উদ্বেগ-বাতিক (Compulsion বা Anxiety Neurotic) হলেই তুলনাটা ভাল জমবে। ট্যাবুপীড়িত বর্ব্বর এবং আধুনিক বাতিক—উভয়ের মানসিক প্রকৃতি মিলে যাচ্ছে।

বাতিকের অকাজের কাজের মধ্যে তার মনে দ্বন্দ্ব (অজ্ঞাত ইচ্ছা বনাম ইগোর প্রতিরোধ) যেন ছদ্মভাবে কীর্ত্তিত হয়। তাতে যেন মনের ভার (Tension) লাঘব হয়। একেই মনস্তাত্ত্বিক প্রায়শ্চিত্ত বলা যেতে পারে। ট্যাবুপীড়িত বর্ব্বরও নানারকম কৃচ্ছ্র ব্রতাচার (Ceremonial) পালন করে তার মনের দ্বন্দ্বকে হাল্কা করে নেয়।

বর্ব্বর মানুষের কল্পিত আদিপিতা টোটেমের গুণ ও গঠন যে রকম—সমাজের পরবর্ত্তী সভ্যতার অধ্যায়ে সেই একই গুণ ও গঠন নিয়ে নতুন নতুন টোটেম দেখা দিয়েছে। পরিবারের পিতা, সর্দ্দার, রাজা, ধর্ম্মগুরু, ভগবান এরা সবাই যেন এক একটি সভ্যতার টোটেম। ধর্ম্মাচারের যত সব যাজ্ঞিক ক্রিয়াকলাপ, মন্ত্রতন্ত্র, যাদুবিদ্যা, নীতিতত্ত্ব, শাস্তিতত্ত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, পশুবলি, কৃচ্ছ্রাচার, দানাদি পুণ্যকর্ম্ম, সবার গোড়ার কথা টোটেম ও টোটেমের নামে দিব্যি দেওয়া যত সব ট্যাবুর বিধান। আদিমতা থেকে সভ্যতার উত্থানের ইতিহাস যেন মনোবৃত্তির ইতিহাস। আজও ক্ষুদ্র শিশুর ও প্রবীণ বাতিকের মনের গতি প্রকৃতি ও পরিণতির মধ্যে সেই ইতিহাস বিনা অক্ষরে লেখা রয়েছে।

তন্ত্রের উপসংহারে ডাক্তার ফ্রয়েড আবার ইদিপাসের কথা এনে ফেলেছেন। ইদিপাসের জীবনে দুটি কলঙ্ক লেগেছিল—(১) পিতৃহত্যা ও (২) মাতার প্রতি আসক্তি। টোটেম তন্ত্রের প্রথম দুটি ট্যাবুর বিধান হলো—(১) আদিপিতা টোটেমজীবকে হত্যা করো না ও (২) আত্মীয়াসক্তি করো না।

ইদিপাস মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই যেন টোটেম তন্ত্রের অভিযান আরম্ভ হয়েছিল। ডাক্তার ফ্রয়েডের মতে সায় দিয়ে সুতরাং সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, আদিম সমাজ ছিল এক ইদিপাসীয় অরাজকতার যুগ। টোটেম ও ট্যাবু সেই অরাজকতাকে শান্ত করে নিয়ে এল সংযতাচার বর্ব্বর যুগ। সেই মনগড়া পথেই দেখা দিয়েছে আধুনিক সভ্যসমাজের ইতিহাস।

মনস্তত্ত্বের শেষকথা

['ইচ্ছা'র নতুন সংজ্ঞা—আনন্দতত্ত্ব (Pleasure Principle)—অবিরতি বা Cathexis—ইরোস ধর্ম্ম (Eros) বা বাঁচবার আবেগ—তানাটোস (Thanatos) বা মরবার আবেগ—উভয়ের দ্বন্দ্বে সভ্যতার সৃষ্টি স্থিতি পরিণতি।]

উপনিষদের ঋষিরা বলতেন—আকাশে যদি আনন্দ না থাকতো, তবে কে তাকে চাইতো! ডাক্তার ফ্রয়েডও ইচ্ছাবৃত্তির হেতু খুঁজতে গিয়ে আনন্দতত্ত্বে গিয়ে পৌঁছেছেন।

একটা উদ্দেশ্যমুখী আবেগ বাস্তবের বিরুদ্ধতার জন্য সার্থক হতে পারলো না। এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা (যোগশাস্ত্রের দৌর্ম্মনস্য) থেকে অপ্রীতি ও ক্লেশের উদ্ভব হলো। অপ্রীতিকর চিন্তাকে ভুলে যাবার একটা চেষ্টা থাকে। স্মৃতি এই ক্লেশমূলক চিন্তাকে এড়িয়ে যেতে চায়। অর্থাৎ চিন্তাটা অজ্ঞাত মনে গিয়ে চাপা পড়ে থাকে। আরও পরিষ্কার করে বলা

যায়, চিন্তাটা বিস্মৃত হয়ে যায়। এই দমিত ও অচরিতার্থ আবেগই 'ইচ্ছা'য় (Wish) পরিণত হয় ; 'ইচ্ছা'র অন্য নাম আনন্দ মূল (বা Pleasure Principle)। এই ইচ্ছাই আবার ফিরে সর্ব্বপ্রকার চিন্তার মধ্যে চরিতার্থতার পথ খোঁজে, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এক কথায় যথার্থ আনন্দ আহরণের চেষ্টায় থাকে। ইচ্ছার চরিতার্থতাই হলো আনন্দ।

ডাক্তার ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় শেষাশেষি প্রতিপাদ্য রূপে যেসব বিষয় ধরেছিলেন ও প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন—সে-আলোচনা দার্শনিকতার পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ে। তিনি বললেন, মানুষের মানসলীলার সকল প্রেরণা যোগাচ্ছে যে সহজাত বা জন্মগত শক্তিরূপী বৃত্তি (Instinctive Energy), তারও পেছনে রয়েছে যেন এক পরাৎপরা প্রাণ-পরিচর্য্যার বৃত্তি বা বেঁচে থাকার প্রয়াস (Urge to live)। কোন আস্পদকে (নিজেকে বা অপরকে বা কোন ভাব আদর্শ আন্দোলন খেয়াল ইত্যাদি) আশ্রয় করে এই প্রাণ-পরিচর্য্যার বৃত্তি আবেগ-স্ফূর্ত্তির রূপে (Emotional Expression) সার্থক হয়। এই আস্পদাশ্রয়ী আবেগস্ফূর্ত্তিকে অবিরতি (বা Cathexis) আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

[মূল গ্রীক কথাটি হলো Cathexo অর্থাৎ I occupy ; 'আমি দখল করলাম' এই সার্থক আনন্দবোধ বা স্ফূর্ত্তি। 'অবিরতিঃ চিত্তস্য বিষয়সম্প্রয়োগত্মা গর্দ্ধঃ' অর্থাৎ বিষয়-প্রাপ্তির নিমিত্ত চিত্তের লোভকে অবিরতি বলে (পাতঞ্জল ভাষ্য)।]

ভাব আদর্শ ইত্যাদি আস্পদ বা বিষয়গুলি মননশীল জীবনের অবলম্বন—যার জন্য এবং যাকে নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকার এই চিরন্তন সদ্ধর্মকে ডাক্তার ফ্রয়েড ইরোস (Eros) ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু—'চিত্তনদী নাম উভয়তোবাহিনী।' চিত্তনদীর স্রোত দুই দিকেই প্রবাহিত হয়। ডাক্তার ফ্রয়েডও বলেছেন যে শুধু বাঁচবার প্রয়াস নয়, একটা মরবার বা আত্মবিনাশের প্রয়াস (Death urge) একই সঙ্গে রয়েছে ও কাজ করে চলেছে—চিরন্তন টানাতোস (Thanatos) ধর্ম্ম।

বাঁচবার প্রয়াস ও মরবার প্রয়াস—(ইরোস বনাম টানাতোস) মূল প্রবৃত্তিরূপী এই দুই প্রয়াসের দ্বন্দ্ব মানুষের মনের ভেতর দিয়ে কাজ করে সভ্যতাকে তৈরী করেছে ও টেনে নিয়ে চলেছে। ডাক্তার ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তাঁর মনস্তত্ত্ব শেষ করেছেন।



রঙ্গবল্লী

ভারতের প্রথম শিল্পাচার্য্যের নামটি আমরা জানি না। প্রথম শিল্পীসম্প্রদায়ের নাম গোত্র ভাষা চেহারা কিছুই আমাদের জানা নেই। প্রাক্ ইতিহাসের পরিচয়হীন রহস্যের মত তারা যেন অলীক হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি আজও কঠিন বস্তুরূপে বেঁচে আছে। রায়গড় আর মির্জাপুরের গুহার গায়ে ভারতের প্রস্তরযুগের শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলি মনোময় মানুষের এক দিব্য স্বভাবের সত্য প্রমাণ করে রেখেছে। মানুষের 'প্রথমজা বেদনা' যেন ছবির মধ্যেই প্রথম তাৎপর্য্য লাভ করেছে।

প্রাক্ ইতিহাসের শিল্পসাধনার সে-অধ্যায় কোন্ কারণে এবং কবে স্তব্ধ হয়ে গেল, তা'ও আমরা জানি না ; সে ঐতিহ্য একেবারে মুছে গেছে। ইতিহাসের মানুষ আবার নতুন করে শিল্পসৃষ্টির সাধনা গ্রহণ করেছে। হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন আবেগে, নতুন কোন আগ্রহে এবং ভিন্নতর কোন প্রেরণার খাতিরে। শুধু বুঝতে পারি, ইতিহাসের কালে হোক্ বা প্রাক্ ইতিহাসের কালে হোক্, ভাব হতে রূপে মানুষের সৃষ্টি অবিরাম আসা-যাওয়া করেছে। প্রাক্-ইতিহাসের গুহার ছবি, মানুষেরই হৃদয়ের ছবি। হয়তো সে-হৃদয় ইতিহাসের মানুষের হৃদয় থেকে ভিন্ন।

ইতিহাসের স্মরণীয় কালের মধ্যে এসে আমরা পাই আর এক শ্রেণীর গুহাচিত্র—অজন্তা বাঘ এলোরা কঞ্জিবেরম্ প্রভৃতি। কয়েক বছর হলো আর একটি নতুন গুহার ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে—বাদামী গুহা। এই ছবিগুলির মধ্যে ভারতীয় চিত্রবিদ্যা ও পদ্ধতির একটা পরিণত রূপ আমরা দেখতে পাই। যুগব্যাপী একটা সুস্থ সংস্কৃতির জীবন না গড়ে উঠলে, শিল্পরীতির এই উৎকর্ষ কখনো সম্ভব হতো না। এই সাধনার সঙ্গে সঙ্গে যে সুবৃহৎ একটা শাস্ত্রও গড়ে উঠেছিল, সে সত্যে সংশয় নেই। সেই বিরাট শাস্ত্রের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ কিছু কিছু যা কুড়িয়ে পাওয়া গেছে, তার থেকেই প্রাচীনদের শিল্পনিষ্ঠার ওপর আমাদের সশ্রদ্ধ বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। 'মার্গবাপীভিঃ স্থপুটিতমহাবটদ্রুমোপান্তস্থলাম্'—পথের ধারে বটের তলায় কুয়োর দেয়ালে পর্য্যন্ত রঙীন ছবি আঁকা থাকতো। চিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য—এই ত্রিবিদ্যার রীতিনীতি আদর্শ ও পদ্ধতি, এবং বিচার ও পরীক্ষার প্রয়োজনেই শিল্পশাস্ত্র তৈরী হয়েছিল এবং বেদবৎ শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন শিল্পীরা কতখানি কৃতী ছিলেন, তার নিঃসংশয় নিদর্শন তাঁরা রেখে গেছেন। তার তুলনায় আধুনিক ভারতের শিল্পীর দীনতা স্বতঃপ্রমাণিত হয়ে আছে। ভারতীয় শিল্পীর পক্ষে সব চেয়ে ব্যর্থতার যুগ হলো ইংরেজী যুগ।

শুধু তাই নয়, প্রাচীন সাধারণেরা যে আমাদের চেয়ে বেশী শিল্পরসিকও ছিলেন, তার প্রমাণ প্রাচীনদের শিল্পশাস্ত্র। শিল্পের বিচার নিয়ে তাঁদের যে সন্ধিৎসা ও উৎসাহ ছিল, আমরা তার উত্তরাধিকারী হতে পারিনি এবং নতুন কোন গৌরবের ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে পারিনি। স্থাপত্যের প্রশ্ন ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আধুনিক ভারতীয় স্থাপত্যে কোন ঐতিহ্যগত প্রয়াস আমরা দেখতে পাই না। পশ্চিমের ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সর্ব্বতোভাবে আধুনিক ভারতীয়

স্থাপত্যকে অধিকার করে ফেলেছে।

কিন্তু ভাস্কর্য্যে ও চিত্রবিদ্যায় যেন ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট পরিচয়ের একটু রেশ রাখবার প্রয়াস চলেছে। স্থাপত্যের ব্যাপারে ঐতিহ্যকে যতখানি ফাঁকি দেওয়া গেল, ভাস্কর্য্য ও চিত্রের ব্যাপারে তা সম্ভব হলো না। হয়তো সেটা আদৌ সম্ভব নয় বলেই। স্থাপত্য হয়তো অলঙ্কারের মত একটি পরিসজ্জার শিল্প মাত্র। যেখান থেকে খুসী সুবিধামত তাকে আমদানী করা যায়। বিদেশী হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু চিত্র ও ভাস্কর্য্য যেন বিগ্রহের মত। এরা ঐতিহ্য ধর্ম্মী। জীবনগ্রাহ্য না হলে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের যেন কোন মূল্য নেই। ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে যুগব্যাপী জীবনের প্রসাদ। তাই আধুনিক ধনী ভারতীয়দের বিলিতি ঢঙের প্রাসাদের দেয়ালে অজন্তা ঢঙের ছবি আমাদের রুচিকে ততটা পীড়া দেয় না।

সুতরাং আধুনিক ভারতীয় শিল্পীর সাধনা ভারতীয় জীবনের মর্ম্মকে রঙে ও রেখায় ব্যক্ত করবে—এ সিদ্ধান্তের অন্যথা হলেই বুঝতে হবে যে, শিল্পী শুধু একটি অছিলার আড়ালে তার ব্যর্থতাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে। আধুনিক ভারতীয় শিল্প তার সাধ্যমত সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু এই আধুনিক শিল্পের কোন সাহিত্য (Text) আজও রচিত হয়নি। এইখানে আধুনিক ভারতীয়ের অক্ষম শিল্পরুচি ও অরসিকতার প্রমাণ ধরা পড়ে যায়। এই সঙ্গে প্রাচীনদের উৎসাহ ও সাফল্য তুলনা করলে আমাদের অহমিকা খর্ব হয়ে পড়ে।

প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে শিল্পকলা কতখানি প্রতিষ্ঠা অধিকার করেছিল তার দুটি প্রমাণই আমাদের সম্মুখে রয়েছে। (১) স্বয়ং শিল্পকলার বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা (২) শিল্পকলার বিরাট শাস্ত্র, সাহিত্য (বা Text)।

শিল্পরত্ন নামে বিশিষ্ট গ্রন্থটি ছাড়াও আরও বহু গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের চিত্রবিদ্যার সমালোচনা পাওয়া যায়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হ'লো—ভোজের সমরাঙ্গন সূত্রধার, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও তিলকমঞ্জরী।

শিল্পরত্নে যে-শিল্পকে চিত্রাভাস বলা হয়েছে, পেইন্টিং অর্থে তা-ই বোঝায়। শাস্ত্রীয় শিল্প সমালোচনায় 'চিত্র' কথাটা বেশীর ভাগ মূর্ত্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শিল্পরত্নে চিত্রবিদ্যাকে 'বিনোদস্থান' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ শিল্পী শুধু নিজের মনের আনন্দেই সৃষ্টি করেন (Art for Pleasure)। দেখা যায়, আর্টকে বিশুদ্ধ রস হিসাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়েও প্রাচীন ভারতীয় সমালোচক কোন একটা অবাস্তব হেতুতত্ত্ব আরোপ করেননি, যেমন আধুনিকতর য়ুরোপীয় সমালোচকেরা করেছিলেন (দৃষ্টান্ত—Art for art's sake ইত্যাদি)। শিল্পের উদ্দেশ্যপ্রবণতা সর্ব্বাগ্রে স্বীকৃত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, চিত্রবিদ্যাকে মাঝে মাঝে বৈহারিক শিল্প (Professional) হিসাবে সমান মর্য্যাদার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। এমন কি শিল্প বৈহারিক হওয়া উচিত, কোন কোন সমালোচক এই মর্ম্মে আবেদনও করে গেছেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে শিল্পকে গুণ হিসাবে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—সত্য, বৈণিক, নাগর ও মিশ্র। এখানে 'সত্য' অর্থ যথাযথ (True to nature)—যৎকিঞ্চিল্লোকসদৃশম্।

সোমেশ্বরের 'অভিলাষিতার্থ চিন্তামণি'তে চিত্রশিল্পকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) বিদ্ধ অর্থাৎ accurate এবং (২) অবিদ্ধ অর্থাৎ emotional বা ভাবরূপ। রাজশেখরের নাটকে 'বিদ্ধসালভঞ্জিকা' নামে যে চিত্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তারই আধুনিক সংস্করণ হলো 'Portrait statue'.

অভিলাষিতার্থ চিন্তামণিতে চিত্রশিল্পের কারুমিতির তিনটি পর্য্যায় বিভাগ করা হয়েছে—রসচিত্র, ধুলিচিত্র এবং ভাবচিত্র। রসচিত্র হলো একরঙা চিত্র, এর মধ্যে বিবিধ বর্ণের সমারোহ নেই। মাত্র একটি রঙের আশ্রয়ে কোন রসকে প্রধান করে তোলাই রসচিত্রের রীতি। ধূলিচিত্র হলো ক্ষণিকের শিল্পের খেলা। রঙের গুঁড়ো দিয়ে কোন সাময়িক চিত্রণের প্রয়োজন পূর্ণ করেই ধূলিচিত্রের সার্থকতা। ভাবচিত্র কারুমিতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নাম থেকেই বোঝা যায় এই চিত্রের ভাবপ্রধান রূপ ফুটিয়ে তোলাই শিল্পীর লক্ষ্য।

নারদশিল্পে চিত্রকলার তিনটি সংস্থান নির্দ্ধারণ করা হয়েছে—ভৌমিক চিত্র (Floor painting), ভিত্তিচিত্র (Wall painting) এবং প্রস্তর চিত্র (Ceiling painting)।

বিদ্যারণ্যের পঞ্চদশী নামে দার্শনিক গ্রন্থেও চিত্রাঙ্কনের টেকনিক্ সম্বন্ধে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। শিল্পী প্রথমে 'হস্তলেখা' (বা Outline) তৈরী করে নেবেন। তারপর বর্ণিকা (বা Sketch)। সর্ব্বশেষে শিল্পী তাঁর কুশলতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ দেবেন 'উন্মীলনে' (বা Finish)।

ভাগবতে স্থাপত্যাচার্য্যদের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবাহন নামে রাজকুমারের শিল্পী-প্রতিভা এবং 'বিশেষত চিত্রকর্ম্মনি প্রবীণতাং' তাঁকে রাজ্যে সকলের শ্রদ্ধাস্পদ করে তুলেছিল। তিলকমঞ্জরীর বিবরণে দেখতে পাই 'চারুত্বতত্ত্ব' আলোচনা করার জন্য নাগরিকেরা 'আলেখ্যশাস্ত্রবিদ্' এবং 'চিত্রবিদ্যোপাধ্যায়'দের কাছে সম্মিলিত হচ্ছে। [জনপরম্পরাজনিত কুতূহলৈশ্চিত্রমবলোকয়িতুং আগতৈরালেখ্যশাস্ত্রবিদ্‌ভির্নাগরলোকৈঃ সহ বিচারয়ন্নবিচার্য্য চারুত্বতত্ত্বং তস্যা চিত্রপটপুত্রিকায়া রূপমপসারিতাপর বিনোদঃ পূর্ব্বাহ্নমনয়ত্]

চিত্রশালা বা আর্ট গ্যালারির উল্লেখ বহু স্থানে পাওয়া যায়। ত্রিবিক্রমের নলচম্পুতে ভ্রাম্যমান চিত্রশালা জনসাধারণের বিনোদ বিতরণ করে ফিরছে। চিত্রশালার উপাদান গঠন উপকরণ ও স্থাপত্য সম্বন্ধে এক বিশদ শাস্ত্র তৈরী হয়েছিল। আর্ট গ্যালারি বা প্রদর্শনীর এতটা ব্যাপক প্রসার এবং জনসাধারণের সঙ্গে এতটা অন্তরঙ্গতা বজায় রাখার প্রয়াস থেকেই অনুমান করা যায় যে, প্রাচীনেরা শিল্পে আভিজাত্য স্বীকার করেন নি। শিল্পকে জনগত করার আদর্শই তাঁদের সাধনার মধ্যে বড় স্থান অধিকার করে ছিল।

তিলকমঞ্জরীর লেখকের নাম ধনপাল। তিনি জৈন ছিলেন। তিলকমঞ্জরীতে চিত্রশালার বিচারে দেখা যায় যে, সেযুগে ধনী ও রাজাদের প্রাসাদে যেমন চিত্রশালা একটি অঙ্গ হয়ে ছিল, তেমনি জলমণ্ডপ প্রভৃতি সাধারণের সমাগমের স্থানেও চিত্রশালা স্থাপিত হতো। রাজান্তঃপুরেও মহিলাদের শিক্ষা ও আনন্দের জন্য চিত্রশালা ছিল। প্রাচীন অভিজাতের চিত্রানুরাগের আর একটি বিশেষ প্রমাণ হলো যে তাঁরা তাঁদের শয়নঘরের সংলগ্ন একটি চিত্রশালা রাখতেন। [রণিত-মণিনা ভূষণচক্রবালেন বাচালয়ন্তী চিত্রশালিকাং শয্যামমুঞ্চত্, অথবা : প্রবিশ্য বন্ধুসুন্দরীদ্বিতীয়া শয়নচিত্রশালাম্—তিলকমঞ্জরী] শয়নচিত্রশালাকে আবও মোহমধুর করে রাখা হতো সুরভিত করে—'হরিচন্দন পঙ্কোপলেপেন।'

রঙ্গবল্লী নামে এক শ্রেণীর চিত্রকার্য্যের প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। কথাটার শব্দগত অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায়—রঙের লতা। রঙের চূর্ণ প্রভৃতি দিয়ে সাময়িকভাবে মেজের ওপর রঙ্গবল্লী আঁকা হতো। সুতরাং রঙ্গবল্লীকে আমাদের অতিপরিচিত 'আলপনা'র মত একই ব্যাপার বলে ধরে নিতে হয়। বোম্বাই অঞ্চলে জনসাধারণের কাছে এই চিত্রকার্য্য এখনো

'রঙ্গোলি' নামে বেঁচে আছে। 'আল্‌পনা' (অথবা আলিম্পন) কথাটি প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রের কোন পরিভাষার মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু গুণে ধর্ম্মে আল্‌পনা যে রঙ্গবল্লী জাতীয় জিনিষ তাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কবিরা শতমুখে রঙ্গবল্লীর সৌন্দর্য্যকে স্তুতি করে গেছেন। বাণের কাদম্বরীতে রঙ্গবল্লীর শোভা পারিপাট্য ও রচনারীতির বর্ণনা পাওয়া যায়। তিলকমঞ্জরীতে রঙ্গবল্লীর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে—রঙের চূর্ণ দিয়ে স্বস্তিকা ষষ্ঠী দেবী এবং অষ্টমাতৃকার মূর্ত্তি আঁকবার পর, তার চারদিকে 'রক্ষাভূতিরেখা' দিয়ে ঘিরে দিতে হয়। 'রক্ষাভূতিরেখা' কথাটির মধ্যে প্রাচীনতর যাদুতন্ত্রের ঐতিহ্য যেন কিছু কিছু রয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে সাদা রঙের মর্য্যাদা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। শিল্পরত্নের অন্তর্গত 'রসচিত্র' শ্রেণীর যে একরঙা ছবির কথা বলা হয়েছে, সে-ছবি সাধারণতঃ সাদা রঙের সাহায্যেই রচনা করা হতো। শিল্পীর কুশলতা খুবই উৎকর্ষের স্তরে না পৌঁছলে সাদা রঙকে নিয়ে কাজ করা কঠিন ব্যাপার। তিলকমঞ্জরীতেও চন্দ্রলেখা নামে এক রাজকুমারীকে একরকম সাদা রঙের সল্যুশন নিয়ে স্বস্তিকা আঁকতে দেখতে পাই। [চন্দ্রলেখে বিলিখ প্রশস্ত ললিতানিতভ্তঃ ক্ষীরোদমৌক্তিকক্ষোদৈঃ স্বস্তিকাং]। নলচম্পুতেও সাদা রঙের ছবির প্রশংসা আছে অতিসূক্ষ্মমুক্তাফলরচিত তরঙ্গরেখারাজি-রাজিতাজিরং। 'তরঙ্গ রেখারাজি' কথাটির মধ্যে আল্‌পনা বা রঙ্গবল্লীর কুটিলায়িত রেখার টানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

তিলকমঞ্জরীর অন্যান্য অধ্যায়ে আর একটি অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ পাই। সংসারত্যাগী বিবাগী সন্ন্যাসীদের কুটীরের গাত্রেও রঙ্গবল্লী আঁকা থাকতো। দেখা যাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা সংসারের মায়া কাটিয়ে জনপদের বাইরে চলে গিয়েও রঙের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

শিল্পীরা শুধু রাজার অনুগ্রহ নয়, রাজার কাছে যথেষ্ট মর্য্যাদা পেতেন। শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় অনুরাগ একমাত্র আধুনিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নয়। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় সমর্থনে শিল্প পুষ্ট হয়ে উঠেছিল, শিল্পীদের সম্মানের কথা তিলকমঞ্জরীতে ছড়িয়ে আছে—কচিৎ দর্শনপথবর্তীর্ণেষ শীর্ণ দেবায়তনেষু কর্ম্মারম্ভায় সপদি সম্পাদিত পূজাসৎকারা ব্যাপারয়তঃ ইত্যাদি।

সাধারণ্যে শিল্পীরা শ্রদ্ধেয় ছিলেন, শিল্পীও তাঁর শিল্পকে যথাবিনয়ে রাজার বা সাধারণ্যের বা বিশেষজ্ঞ চিত্রবিদ্যোপাধ্যায়দের অভিমত দিয়ে যাচাই করে নিতেন। রাজশিল্পীরা রাজপুত্র বা রাজকন্যাদের ছবি (Portrait) আঁকতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল, বিদেশে পাঠিয়ে বিবাহযোগ্য কুমার বা কুমারী নির্বাচন। [দ্বীপান্তর রাজকন্যাকাভি রনুদিবসমপহার্য্যমান চিত্রফল-কারোপিত বিদ্ধরূপঃ] চিত্রফলকে 'বিদ্ধরূপ' (Accurate Portraiture) রচনা করা হতো।

প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পী তাঁর স্টুডিওতে বসে একমনে ছবি আঁকছেন—কিভাবে আঁকছেন, কি কি উপকরণ তাঁর কাছে রয়েছে, প্রাচীন ভারতের শিল্পসাহিত্য থেকে তার একটা দৃশ্য আমরা ধারণা করে নিতে পারি :

শিল্পী তাঁর চারিদিকে নানা রঙের বাটি সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন, মৃচ্ছকটিক নাটকে তার উপমা আছে। তিলকমঞ্জরীতে পাই, এক রাজকুমারী তাঁর প্রণয়ীর ছবি আঁকছেন। তাঁর হাতের কাছে রয়েছে একটি সমুদগক অর্থাৎ তুলির বাক্স। সম্মুখে একটি বড় ফলক (Board)। আঁকতে আঁকতে এক একবার থেমে যাচ্ছেন রাজকুমারী। তার পরেই আবার

কিছুক্ষণ তুলি চালনা করছেন। প্রত্যেকটী বর্ণলেপের পর একবার করে চিন্তা করে নিচ্ছেন। 'নিপুণামালোচ্যালোচ্য'—বার বার সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করে তিনি ছবি এঁকে চলেছেন।

শিল্পরত্নের উপদেশে শিল্পীকে একটি বিষয়ে বার বার সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। ছবি আঁকবার সময় শুধু তুলি আর রঙ নয়, শিল্পীকে তার দৃষ্টি ও ভাবনাকে সমান কুশলতায় সংযতরূপে চালনা করতে হবে। [স্বস্থচিত্ত সুখাসীনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ]।

পটে আঁকা ছবি (চিত্রপুত্রিকা) রচনা শেষ হলে রেশমী কাপড়ের খাপের ভেতর সযত্নে গুটিয়ে রাখা হতো—তত্রোপরি চ দিব্যাংশুকবেষ্টিতোহয়ং বিমুক্তঃ পটঃ।

সকল শ্রেণীর চিত্রের মধ্যে 'ভাবচিত্র' সব চেয়ে মর্য্যাদার স্থান লাভ করেছিল। শিল্পী যতই বড় কারুকর্ম্মা হোক্ না কেন, পদ্ধতি সম্বন্ধে সে যতই সুকৃতী হোক না কেন, সবার ওপরে তাকে ভাবুক হতে হবে—প্রাচীন ভারতীয় শিল্প রসিকের এই দাবীকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা হয়েছিল। শিল্পী বিশেষ ভাবে মনস্বী হবেন, তারপর আর কিছু—শিল্প সাহিত্যে এই তত্ত্বটিকে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয়েছে। চিত্রবিদ্যা শুধু একটি সূক্ষ্ম কলা নয়, দুরূহ বিজ্ঞানও বটে; তাই শিল্পীকে বিশেষ ভাবে মননশীল হতে হবে। [উৎসুকমনোভিশ্চ কর্ত্তুমারবুমতিস্থূলমপি কর্ম নোপজায়তে সুসূত্রম্। কিং পুনশ্চিত্তৈ-কাগ্রতাতিশয় নিবর্ত্তনীয়চিত্রম্—তিলকমঞ্জরী।]

চিত্রে ভাবের প্রকাশ হলো শিল্পের উদ্দেশ্য এবং শিল্পীর লক্ষ্য। [আবিষ্কৃতানেক ভাববিভ্রমাণি লিখিতানীব কেনাপি নিপুণচিত্রকরেণ দিগ্‌ভিত্তিষু দিবানিশং দদর্শ তস্যাঃ প্রতিবিম্বানি—তিলকমঞ্জরী।]

চিত্রের সকল বিষয়ের মধ্যে ভাবই হলো প্রধান। দুরূহ হলেও শিল্পীর সকল প্রয়াসের সার্থকতা এইখানে। [সুবিশুদ্ধা রেখা সংযতানি ভূষণানি উচিতক্রমাবর্ণ বিচ্ছিত্তিঃ পরিস্ফুটো ভাবাতিশয় ইতি। দুষ্করং চ চিত্রে ভাবারাধনং তদেব চাভিমতমতিবিদগ্ধানাম্—উপমিতি প্রপঞ্চ কথা।]

ভাবচিত্র কাকে বলে? প্রাচীন ভারতের শিল্প সমালোচকেরা এই প্রশ্নেরও বিচার করে গেছেন। যে-চিত্রে সার্থকভাবে 'রস' পরিস্ফুট হয়েছে, সেই চিত্রকে 'ভাবচিত্র' বলা যায়। অভিলাষিতার্থ চিন্তামণির অভিমত হলো—'শৃঙ্গারাদি রসো যত্র দর্শনাদেব গম্যতে। ভাবচিত্রং তদাখ্যাতং চিত্রকৌতুককারকম্॥'

তিলকমঞ্জরীর মত চিত্রসমালোচনার সাহিত্য পৃথিবীর কোন প্রাচীন সাহিত্যে নেই (গ্রীক সাহিত্য ছাড়া)। দুঃখের বিষয়, তিলকমঞ্জরীর বর্ণনায় ভারতীয় চিত্রকলার খুব কমই নিদর্শন আজ বেঁচে আছে। নিদর্শন না থেকেও যদি রীতিটা বেঁচে থাকতো তাহলে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের দিক থেকে লাভ ছাড়া ক্ষতি হতো না। কিন্তু সব চেয়ে আক্ষেপের বিষয়, সেই রীতির সঙ্গে আধুনিক ভারতীয়ের একেবারে বিচ্ছেদ ঘটেছে। রঙ্গবল্লীর মধ্যে কিছুটা ঐতিহ্যের ক্রম রয়ে গেছে। বাকী অন্য কোন পদ্ধতির রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতের শিল্পকলার ইতিহাস বিচার করতে গিয়ে অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যবর্ত্তী বিচ্ছেদটা লক্ষ্য করলে এইটুকু শুধু বোঝা যায় যে, এত বড় ঐতিহ্য ভ্রংশের তুলনা আর নেই। অতীতের সেই সমাজের স্বরূপ এখনো অনেকখানিই সজীব হয়ে আছে; অনেকখানি সেই মানুষ, সেই ধর্ম্ম, সেই ভাষা আর উৎসব, সেই তীর্থ সংস্কার ও আশ্রম আজও রয়েছে। কিন্তু সেই শিল্পকলা নেই। যদি প্রাচীন ভারতের সমাজ একেবারে ভেঙে বদলে যেত তবে এই

ঐতিহ্যভ্রংশের একটা কারণ-সঙ্গতি বোঝা যেত (যেমন, প্রাচীন গ্রীসের আর আধুনিক গ্রীসের মানুষের সামাজিক জীবনের পার্থক্য)। তাই এই ধারণা স্বাভাবিক যে, এমন একটা সময় এসেছিল যখন ভারতের সামাজিক জীবন চরম দীনতায় নেমে পড়েছিল। আধুনিক ভারতের শিল্প যেন নতুন কোন মানবগোষ্ঠির কীর্তি। তাঁরা শুধু আধুনিক মানুষ অথবা আধুনিক ভারতের মানুষ। কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের মানুষ তাঁরা ন'ন। ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলা চলে।

গুহাচিত্রগুলি ছাড়া, প্রাচীন ভারতের এত আলেখ্য, ভাবচিত্র, বিদ্ধচিত্র—এত পট ফলক, 'প্রকৃষ্টচীনকপটিপ্রসেবিকায়াঃ' চিত্রপুত্রিকা, এ সবের একটা টুক্‌রো বা চিহ্ন পর্য্যন্ত আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু নেপালে তিব্বতে এই জাতীয় চিত্রের কিছু কিছু নিদর্শন আছে ; কিন্তু রীতিটি বোধ হয় লুপ্ত হয়ে গেছে।

তিলকমঞ্জরীতে আর একটী চিত্রকলার উল্লেখ পাওয়া যায়—সুচিত্রিত রঙীন 'জবনিকাপট'। [কথাটি বিকৃত হয়ে 'যবনিকাপট' রূপ গ্রহণ করেছে। পণ্ডিতেরাও 'যবনিকা' কথাটা নিয়ে বৃথা শব্দতত্ত্বের কেরামতী দেখিয়ে বলেছেন যে, 'যবন' শব্দ থেকে 'যবনিকা'র উৎপত্তি এবং সেই কারণে ভারতের নাট্যকলার 'যবনিকা' গ্রীক সভ্যতা থেকে ধার করা। তিলকমঞ্জরীতে বলা হয়েছে যে জৈন মন্দিরের কক্ষে যে সুচিত্রিত পর্দা ব্যবহার করা হতো, তারই নাম জবনিকা—নাগদন্তাবসক্ত ধবলচামরার্চিত চারুভিত্তিরেকপার্শ্ববলম্বমান সংকোচিত দেবাঙ্গ জবনিকাপটস্য···] পতাকার ওপর চিত্রকার্য্যের কথারও উল্লেখ আছে। তা'ছাড়া আর একটি শিল্পের উল্লেখ আছে যে-বিষয়ে কোন টেক্‌নিকগত আলোচনা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। শিশুদের খেলার সামগ্রী চিত্রণের কাজ। শিল্পীরা শিশুদের খেল্‌না প্রভৃতিকে নানা রঙে চিত্রিত করতেন। দেড় হাজার বছরের আগে ভারতের শিশুর পুতুলখেলার ছবিটিও তিলকমঞ্জরীর প্রসঙ্গ থেকে বাদ পড়েনি। [অবসিতে চ বাসরে বিরলীভবৎসু কৃত্রিম তুরঙ্গ বারণ ক্রীড়াপ্রধানেষু প্রেক্ষণকেষু···]

ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যের এই আলোচনায় আমরা কয়েকটি সমাজবিজ্ঞানের সূত্র ধরতে পারি। দেখা গেল যে একমাত্র রঙ্গবল্লী হলো জনগত শিল্প। কোন বিশেষ শিল্পীসম্প্রদায়ের হাতে রঙ্গবল্লী চিত্রের চর্চা বাঁধা পড়ে নেই। কোন মহারাজার পোষকতা বা বিদ্যায়তনের অনুগ্রহের ওপর রঙ্গবল্লী (এবং বাংলাদেশের আল্‌পনা) নির্ভর করে নেই। রঙ্গবল্লীর প্রাণ হলো জনসাধারণের সমষ্টিপ্রতিভা। জনগত না হলে শিল্প যে বাঁচতে পারে না, ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাসে সেই নিয়ম একেবারে প্রত্যক্ষ পরিণাম নিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে।

একজন শিল্পী ছবি আঁকবে আর অশিল্পী সহস্রজনে দেখে মুগ্ধ হবে, এটা হলো নিম্নস্তরের সভ্যতার লক্ষণ। যে-সভ্যতার মধ্যে যত বেশী শ্রেণীগত আভিজাত্য ও বিভেদের প্রকোপ, সেই সব সভ্যতার মধ্যে শিল্পের এই রকম শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত অধীনতা দেখা যায়। সমাজের সবাই গান গাইতে পারে, সবাই নাচতে পারে, সবাই ছবি আঁকতে পারে—এই অবস্থাকে আমরা সমাজ তথা সভ্যতার উৎকর্ষ বলতে পারি। গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারসাম্যের মত শিল্পেরও অধিকারসাম্য থাকা চাই। তা না হওয়া পর্য্যন্ত শিল্পের গরিমা যতই অভ্রভেদী হয়ে উঠুক না কেন, ইতিহাসের নিয়মেই তার পতন সুনিশ্চিত।

প্রাচীন ভারতের শিল্পে অবশ্য এতটা লোকময়তার প্রমাণ আমরা পাই না। কিন্তু শিল্পের

প্রসাদ লোকসাধারণে বিতরণের চেষ্টা ছিল, যাকে আধুনিক সমাজতন্ত্রের ভাষায় আমরা গণ-সংযোগ বলে থাকি। কিন্তু প্রাচীনতর সভ্যতার 'শিল্পে সাম্যবাদে'র কীর্তি আজও আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ প্রমাণের মত রয়েছে। পৃথিবীর যে-কোন আদিজাতির (Primitive) সমাজে শিল্পের ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রতিভা বা অসাধারণতার কোন প্রমাণ আমরা পাই না। সব সাঁওতাল মেয়েই মোটের ওপর ভাল নাচতে পারে, সব কোল পুরুষেরাই বাঁশী মাদল বাজাতে পারে ; তীর চালনায় সব ভীলেরাই সুদক্ষ। ব্যক্তি হিসাবে কেউ কারও চেয়ে প্রতিভায় নিকৃষ্ট নয়। যেটুকু তারতম্য দেখা যায়, সেটা খুবই নগণ্য। একজন অতিরিক্ত এবং আর একজন একেবারে রিক্ত, এতটা প্রতিভার পার্থক্য তাদের মধ্যে নেই। আদিজাতির সমাজে বৈষয়িক জীবনে এখনো প্রাচীন সাম্যবাদের জের রয়ে গেছে ; তাই শিল্পও তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিভায় অভিষিক্ত হয়ে সমাজগত অধিকারকে সত্য করে রেখেছে।

শিল্পের ক্ষেত্রে ওস্তাদী জিনিষটা নিম্নতর সামাজিক অবস্থার লক্ষণ। একজন সুকণ্ঠ গান গাইছেন, আর একশো কুকণ্ঠ সেই গান শুনে মুগ্ধ হচ্ছেন—এর মধ্যে একটা সার্কাস দেখার রুচি লুকিয়ে রয়েছে। এবং সেই রুচি যদি সমাজে একটা নীতি হিসাবে গ্রাহ্য হয়ে যায়, তবে সে-সমাজের শিল্পের প্রকর্ষ কালের নিয়মে ঐতিহ্য রক্ষা করতে পারবে না। ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসের শিক্ষা থেকে এই নিয়মটিকে আমাদের মেনে নিতে হবে।

রত্নাকরের হরবিজয় গ্রন্থে চিত্রবিদ্যার যে সমালোচনা করা হয়েছে, তা' থেকে আধুনিক রসিকেরা উপদেশ গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন। হরবিজয়ে স্পষ্ট ভাবে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে—'চিত্রকর্ম্মবিদ্ হলেই সে শিল্পী হলো না। চিত্রকর্ম্মবিদ্ অনেকেই আছেন যাঁরা রেখার বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন। কিন্তু তাঁরা শিল্পী ন'ন। শিল্পী হতে হলে শুধু রেখার কুশলতা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাতে হবে।' রত্নাকরও এই মন্তব্য করে বোধ হয় 'ভাবচিত্রকে'ই প্রধান স্থান দিতে চাইছেন।

প্রস্তর যুগের চিত্রকলা

প্রত্নতাত্ত্বিকের অন্বেষণা নব নব আবিষ্কারে আমাদের সচকিত করে তোলে। ভূ-পৃষ্ঠের পাষাণ কঙ্করের আস্তরণ দীর্ণ করে তাঁরা অকস্মাৎ এক একদিন লোকচক্ষুর গোচরে টেনে আনেন একটা তুতেনখামেনের সমাধি—একটা মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পা। পুরাতন মানুষের প্রতিভার অজ্ঞাত ভাণ্ডার, তাঁদের সুকীর্ত্তিত ইতিহাসের সব বিস্মৃত অধ্যায়—সহস্র শিলালেখ মূর্ত্তি, মুদ্রা ও অলঙ্কারের প্রভূত নিদর্শন অখ্যাতির আড়াল ছেড়ে আবার প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা বিস্মিত, পুলকিত ও অনুপ্রাণিত হই।

এ হ'ল ঐতিহাসিক মানুষের কথা। এই ঐতিহাসিক মানুষেরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে অকিঞ্চন ছিলেন না ; তাঁদের সংসারে উপকরণেরও ছিল প্রাচুর্য্য। তাই মনের সহজ আবেগের প্রেরণাকে তাঁরা অনায়াসে সার্থক করে তুলতেন বিবিধ শিল্প ও সৌন্দর্য্যের সাধনায়। এই সাধনার পথে তেমন কোন প্রতিবন্ধক ছিল না।

কিন্তু যখন শুনি প্রাক্ইতিহাসের মানুষ—প্রস্তর যুগের মানুষ শিল্পচর্চা করত, তাদের মধ্যেও দু'দশটা র‍্যাফেল, ভিঞ্চির আবির্ভাব হয়েছিল, তখন তাঁদের সেই কীর্তিকে অসাধ্য-সাধন বলেই মনে হয়। ঐতিহাসিক মানুষের মত প্রস্তরযুগের মানুষের পক্ষে শিল্প-সাধনা মোটেই সুযোগবহুল ও বিঘ্নহীন ছিল না। আজ আমরা হয়তো অনুমান করে উঠতে পারি

না, কী অপরিসীম দুঃস্থতায় তাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদ ও বেদনায় ভারগ্রস্ত হয়েছিল। প্রস্তরযুগের মানুষের প্রসঙ্গেই আমাদের স্বতঃ মনে পড়ে যায় একদল ম্যামথ গণ্ডার ও গরিলার প্রতিবেশী হত্যাধর্ম্মী বর্ব্বর মানুষ। বস্তুত এটি নিছক অপবাদমাত্র, যার মূলে কোন সত্যের ভিত্তি নেই। প্রাক্‌ইতিহাসের মানুষ শিল্পচর্চ্চা করত— একথা বিস্ময়কর বোধ হলেও সত্য এবং তাদের মনও আধুনিক মানুষের মত রসাঢ্য ছিল, এ তারই নিশ্চিত প্রমাণ।

শিল্পবোধ শুধু ইতিহাসপ্রথিত সংস্কৃতিবান মানুষের একচেটে নয়। প্রাক্‌ইতিহাসের মানুষও এ গুণের অধিকারী। সুপ্রাচীন মানুষ বিজ্ঞানবুদ্ধিতে দীন ছিল নিঃসন্দেহে। তারা হয়তো তাদের অর্দ্ধোলঙ্গ দেহভার নিয়ে শীতাতপের পীড়নে বৃক্ষকোটর বা গিরিগুহায় নিত আশ্রয়—সূক্ষ্মাগ্র প্রস্তরদণ্ডের আঘাতে বন্যপশু হনন করে তার মাংসে করতো তাদের উদরতৃপ্তি, কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া মানুষই রসানুগ শিল্পপ্রীতির যে-পরিচয় রেখে গেছে, তা যে-কোন মডার্নিস্ট চিত্রকরের পক্ষেও ঈর্ষার বিষয়।

এই হিসাবে প্রস্তর যুগের বর্ব্বর-শিল্পীকুল বিশেষ করে শ্রদ্ধাভাজন। অপ্রতুল সংসারের কঠোর জীবন সংগ্রামের অনিশ্চিত মুহূর্ত্তগুলির ফাঁকে ফাঁকে তারা শত শত রূপললিত আলেখ্য রচনা করত। প্রস্তর ফলকের সামান্য কয়েকটা আঁচড়ে, হাড়ের তুলি চালনায়, রঙীন মাটির প্রলেপে। কতখানি দরদ ও নিষ্ঠা থাকলে এ শিল্প সৃষ্টি সম্ভব!

স্পেনে বিস্কে উপসাগরের তটবর্ত্তী পাহাড়গুলির গায়ে অসংখ্য ছোট বড় গুহা ছড়িয়ে আছে। গুহাগুলি সাধারণতঃ অপরিসর, পথগুলি আবার ততোধিক সঙ্কীর্ণ। একদিন এক শিকারীর এক হাউণ্ড খেঁকশিয়ালকে তাড়া করে একটা সঙ্কীর্ণমুখ গুহার ভেতর ঢুকে পড়ে। শিকারী অগত্যা হাউণ্ডটাকে উদ্ধারের জন্য গুহার মুখটা ভেঙে একটু চওড়া করে দেয়। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে এক হিমার্ত্ত শীতের দিনে ডন মার্সেলিনো নামে এক প্রত্নতাত্ত্বিক এই গুহাটির ভেতর প্রদীপ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রাচীন মানুষের ব্যবহৃত প্রস্তর নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির সন্ধানে। সঙ্গে ছিল তাঁর শিশুকন্যা। মেয়ে হঠাৎ গুহার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল—বাবা ঐ দেখ 'টোরোস' (ষাঁড়)। দেখা গেল সিলিংয়ের গায়ে এক ষাঁড়ের সুস্পষ্ট পূর্ণায়তন প্রতিকৃতি আঁকা রয়েছে। আশেপাশে আঁকা রয়েছে আরও বিচিত্র নানা রঙে রঙীন বাইসন, বনশূয়র ও হরিণ প্রভৃতি জানোয়ারের চিত্র। এই রকম অভাবিতভাবে হঠাৎ একদিন প্রস্তরযুগের মানুষের শিল্পকীর্ত্তির নিদর্শন আবিষ্কার হয়। এর পর কয়েক মাসের মধ্যে ফ্রান্স ও স্পেনের আরও বহু গুহার ভেতর যুগপৎ নানা চিত্রগ্যালারীর অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই অভিনব আবিষ্কারে দেশময় সাড়া পড়ে যায়।

আল্টামিরা গুহাটির চিত্রসম্পদের প্রসিদ্ধি খুব। আল্টামিরা প্রমুখ গুহাবলী স্থানের নামানুসারে ক্যান্টাব্রিয়ান (Cantabrian) নামে পরিচিত। একটি আহত বাইসন ও একটি উল্লম্ফমান বনশূয়রের প্রতিকৃতির মধ্যে শিল্পীর প্রতিভার পরাকাষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়। আহত বাইসনের বেদনা ও বনশূয়রের স্ফূর্তি কুশলী শিল্পীর সুচারু রঙের বিন্যাসে ও রেখার যোজনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

এই আবিষ্কারের কিছুদিন পরে আঁরি বেরুই (Henri Beruii) নামে একজন ফরাসী পুরোহিত দোর্দোনে (Dordogne) উপত্যকার একটি পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ার ওপর এক গুহার (Faunt-de-gaumme) ভেতর অপূর্ব্ব ফ্রেস্কো চিত্রাবলীর সন্ধান পান। ক্যান্টাব্রিয়ান

গুহাশ্রেণী থেকে এই গুহাটি প্রায় তিন শত মাইল দূরব্যবহিত। এই গুহার চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো একটি রোমশ গণ্ডার, একটি নেকড়ে ও মুখোমুখি একজোড়া বল্গা হরিণের প্রতিকৃতি। প্রায় অর্দ্ধ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে এই সব লুপ্তবংশ জীবগোষ্ঠির অধিষ্ঠান ছিল। এ থেকেই চিত্রগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। শুধু প্রাচীনত্বই চিত্রগুলির একমাত্র মর্য্যাদা নয়। সুনিপুণ রেখার টানে, রঙের প্রয়োগে ও নির্ব্বাচনে সেই অজ্ঞাত অতিবৃদ্ধ শিল্পগুরুরা প্রতিকৃতিগুলিতে এমন একটা সজীব ভঙ্গিমা ও সুষ্ঠু সংস্থিতি দান করেছে যার ভেতর বিংশ শতাব্দীর গর্ব্বিতরুচি চিত্রকরের পক্ষেও শিক্ষণীয় তথ্য প্রচুর বিদ্যমান। এ ছাড়া একটি অতিকায় বন্য অশ্বের রেখাচিত্রেও শিল্পীর অসাধারণ পারদর্শিতার প্রমাণ ফুটে রয়েছে।

প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে কোন পাখীর ছবির অভাব বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়। অনেকের ধারণা এর কারণ প্রাচীন মানুষের পাখী সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। সম্ভবত এই সব শিল্পীরা তীরবন্দুক আবিষ্কারের পূর্ব্বযুগের। কাজেই পাখীর এ্যানাটোমি সম্বন্ধে তাদের ধারণা তখনো কোন স্থিররূপ লাভ করে নি।

আঁরি বেরুই মনে করেন এই গুহানিহিত প্রাগৈতিহাসিক চিত্রগুলি পরস্পর সমসাময়িক নয়। বিভিন্ন গুহার চিত্রাঙ্কনের রীতি ও পদ্ধতিগুলির প্রাচীনত্বের পরিমাপ করে তিনি প্রস্তরযুগীয় চিত্রকলার তিনটি স্তর নির্দ্দেশ করেছেন। প্রথম হল অরিনাক রীতি ও শেষ মাদালী রীতি (অরিনাক ও লা মাদালীন গুহার নামানুসারে)। আল্টামিরা প্রভৃতি ক্যান্টাব্রিয়ান গুহাচিত্রগুলি এর মধ্যবর্ত্তী স্তরের।

মানুষের অঙ্কিত প্রাচীনতম চিত্র কোন্‌টি? এর সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে স্যার এডউইন রে ল্যাঙ্কেষ্টার (Sir Edwin Ray Lankester) ফরাসী পিরিনিজ পর্ব্বতমালার লোর্তে (Lorte) নামে গুহায় যে চিত্রটি আবিষ্কার করেছেন বিশেষজ্ঞদের মতে সেটাই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাতন চিত্র। একটি চিত্রল হরিণের পাল চলার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের পায়ের কাছে এক ঝাঁক স্যামন মাছ, এই হ'ল চিত্রটির বিষয়বস্তু। হরিণের দল একটি জলস্রোত পার হয়ে যাচ্ছে—কয়েকটি সুলীলায়িত রেখার বিস্তারে শিল্পী এইটুকু বোঝাবার প্রয়াস করেছেন।

গুহাচিত্রের মধ্যে মানুষের প্রতিকৃতির দুর্ভাবও বিশেষ লক্ষিতব্য। খুব সম্ভব মানুষের ছবি আঁকা একটা ট্যাবুবোধের প্রকোপে সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শিল্পীর সমগ্র-গ্রাহী প্রতিভার মুখে এ নিষেধ বেশী দিন স্থায়ী হতে পারেনি। প্রস্তরযুগের অন্তাংশে চিত্রকলার ভেতর মানুষ ও মানুষের জীবন, তার সুখদুঃখ ও শোক আনন্দ, বিচিত্র রূপায়ণ লাভ করেছিল। স্পেনে আলপেরা (Alpera) প্রভৃতি গুহায় স্বতন্ত্রভাবে একটি চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল যা ক্যাপ্সিয়ান (Capsian) পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই গুহায় কমপক্ষে দেড়শ 'ডিজাইন' চিত্র উৎকীর্ণ করা আছে। ক্যাপ্সিয়ান আর্টের বিষয়বস্তু অধিকাংশ গৃহস্থালীর দৃশ্য—নৃত্য, বিবাহ, উৎসব, পশুশিকার ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি। এ পদ্ধতিতে রুচির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য্যবোধের বিকাশ ঘটেছিল যথেষ্ট। দক্ষিণ ভূভাগের অপেক্ষাকৃত সভ্যতর একদল যাযাবর মানুষ যারা স্পেনে এসে বসতি করে, ক্যাপ্সিয়ান চিত্ররীতি তাদেরি কীর্ত্তি—এ শিল্পের ঐতিহ্য তাদের ষোল আনা নিজস্ব।

অনেকের পক্ষে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, এই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পীবর্গ—যারা

জানত না কোন কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন বা গৃহনির্ম্মাণ—পশুপ্রায় আরণ্য বর্ব্বরতায় যাদের প্রত্যহ উদ্‌যাপিত হত, তারা কোন্ প্রেরণার বলে এই শিল্পবিভূতি অর্জ্জন করেছিল? প্রথমে মনে হয়; বুঝি মনেরি রূপসৃষ্টির সহজ আবেগ ও চিত্তরসায়নই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল চারুকলা চর্চ্চায়। কিন্তু সত্যি কথা হলো, একটা বস্তুগত উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ্য ছিল—যাদুতন্ত্র। সাধক যেমন তার যজ্ঞসাধনায় নানা প্রতীক ব্যবহার করে, এও তেমনি। যে-সব পশুর মাংসে ক্ষুধা-শান্তির সহায় ছিল, তাদের নিধনকামনার একটা ঐন্দ্রজালিক তুষ্টি সাধিত হত তাদের এইভাবে চিত্রায়িত করে। সুতরাং প্রাচীন চিত্রকলাকে কতকটা মারণযজ্ঞের ব্যাপার বলতে পারা যায়। বেছে বেছে যত দুর্গম স্থানে, দুর্ভেদ্য গুহার আলোহীন অভ্যন্তরে তারা তাদের চিত্রালয় স্থাপন করেছিল। চিত্র চর্চ্চায় যেন বেশ একটু গোপনতার চেষ্টা ছিল। নিওক্স (Niaux) নামে গুহার ভেতর হানা দিয়ে অতিকষ্টে প্রায় মাইলখানেক পথ অতিক্রম করে তবে আদিম ষ্টুডিওটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এইসব থেকেই মনে হয় চিত্রকলার সাধনা সেকালে যাদুতন্ত্রেরই একটা অঙ্গ ছিল।

আর একটি স্মরণীয় সত্য এই যে, প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকলা কারও খেয়ালখুসীতে হঠাৎ একদিনে গজিয়ে উঠেনি। যুগব্যাপী সাধনার বলে এই চিত্রকলা একটা সুপরিণত রূপ লাভ করেছিল। প্রচুর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা স্বীকার করে তবে কেউ শিল্পী পদবাচ্য হতে পারত। অর্থাৎ চিত্রকলায় দস্তুর মত একটা রীতি (School) গড়ে উঠেছিল যা আয়ত্ত করা ধীর সাধনাসাপেক্ষ ছিল।

বর্ব্বর শিল্পীদের চিত্রকলা সাধনার উপকরণের তালিকাটি শুনলে আজকের একজন অর্ব্বাচীন গ্রাম্য পটুয়াও হাস্য সম্বরণ করতে পারবেন না। খড়ি, গেরুয়া মাটি, কয়লা, প্রদীপের ভুসা, দুধে মাটি, সিঁদুর মাটি, চর্ব্বি, হাড়ের কঞ্চি, শিঙের তুলি ও কলম আর পাথরের ছুঁচ মোটামুটি এই ছিল তাদের ষ্টুডিওর প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

প্রস্তরযুগের আলেখ্যগুলি আবিষ্কৃত হয়ে এই সত্য প্রমাণিত করে যে, শিল্পবোধ এমন একটি মনোধর্ম্ম যা নিছক বৈষয়িক বিজ্ঞান বা বিষয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে থাকে না। বৈষয়িক প্রয়োজনটাই এর মধ্যে বড় কথা। নইলে সেই দূর অতীতে এত শিল্পী এত 'বুনো রামনাথের' উদ্ভব হত না। একাধারে শিকারী, শিল্পী ও যাদুকর যে-মানুষের চরিত্রে এতগুলি প্রতিভার সমন্বয় হয়েছিল তারা আর যাই কিছু হোক 'অসভ্য' ছিল না।

প্রস্তরযুগের শিল্পপ্রগতি কালবিড়ম্বনায় একদিন স্তব্ধ হয়ে এল; এল নব প্রস্তর যুগের মানুষ (Neolithic Man) তাদের ভ্যান্ডালসুলভ উগ্র দৌরাত্ম্যবুদ্ধি নিয়ে। এরা যদিও ছিল বুদ্ধিপটু, কিন্তু মন ছিল নিতান্ত দেউলে। এরা শুধু তৈরী করে গেল সুশাণিত মারণায়ুধ ধাতু প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র। শিল্পের ভাণ্ডারকে এরা কোন নূতন সম্পদে সমৃদ্ধ করে যেতে পারেনি। এরও সহস্র সহস্র বৎসর পরে মিশরে ক্রীটে ও বাবিলনে সভ্যতার পত্তন হয়—এক একটি শিল্পরীতি স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠে। কোন উত্তরসাধকের হাতে প্রস্তরযুগের চিত্রকলা আর শ্রীবৃদ্ধি হয়নি; যে গুহাগর্ভে তাদের জন্ম সে গুহাগর্ভেই শ্মশানের মত একান্ত নিভৃতে আজও তাদের শবভার লুকিয়ে নিয়ে পড়ে রয়েছে।

আধুনিক কালের অসভ্য জাতিদের মধ্যে আফ্রিকার বুশম্যান ও আদিম অষ্ট্রেলিয়ান কৃষ্ণাঙ্গদের ভেতর নিপুণ চিত্রকরের অভাব নেই। এদের আঁকা আলেখ্যগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, এই শিল্পকলার ঐতিহ্যটি বহু পুরাতন যা যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায়

এদের হাতে হাতে বর্তিয়ে রয়েছে। করাল সাহারা মরুভূমির জীববিরল প্রান্তরের এমন একটা প্রস্তরস্তূপের গাত্রে উৎকীর্ণ যে-সব রেখাচিত্র আজও দৃষ্টি-গোচর হয় তা কাদের কীর্তি ভেবে ওঠা দুরূহ। দুঃসাহসী পর্যটক শুধু বিস্ময়ে এইসব চিত্রকীর্তি-স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে থাকে—এই পর্য্যন্ত।

যামিনী রায়

শিল্প হলো শিল্পীর মনের পরিচয়। সুতরাং যে-শিল্প যত সহজবোধ্য ও সহজে উপভোগ্য, সেই শিল্পের পেছনে তার মূলাধার শিল্পীমনটিকেও তত সহজে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু এমন শিল্পও আছে যার ভেতর সহজ সরল ও ঋজু আবেদন নেই। এখানেই শিল্পরসিকের সঙ্কট। এক্ষেত্রে সে দুটো পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথম সে বুঝবার চেষ্টা করে শিল্পীকে অথবা শিল্পীর মনকে। শিল্পীর মনের পরিচয় পেয়ে নিয়ে তারপর সে অগ্রসর হয় শিল্পের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচারে। এ ব্যাপারটি অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়ার মত উদ্ভট অপসাধনা। যেখানে কোন শিল্পকে বুঝতে হলে আগে শিল্পীর মনকে বুঝে নিতে হয়, সেখানে স্বভাবতঃই এ ধারণা জন্মে যে, এ শিল্পের প্রসাদগুণ নেই, ব্যঞ্জনা নেই এবং সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য যা, সে শিল্পরস নেই। কাজেই আমরা বিচার করবো শিল্পকেই এবং শিল্পের ভেতর দিয়ে যে জীবনবেদ রঙে ও রেখায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে—তার মহিমা ঐশ্বর্য্য ও অনন্যসাধারণত্বকে।

শিল্প বিচারের এই প্রাথমিক নিয়মতন্ত্র মেনে নিয়েই আমরা যামিনীবাবুর শিল্পের বিচার করবো। এ বিচারে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, হিন্দু রীতি নীতির সনাতন ধারা, সোনার বাঙ্গলার রূপসাধনার পদ্ধতি ইত্যাদি লৌকিক বা ভৌগোলিক কোন কনভেনশনের আমল দেওয়া চলবে না। নির্মোহ রসানুগ প্রীতিদৃষ্টি নিয়ে শিল্পের বিচার করলে তার প্রকৃত মূল্য যাচাই সম্ভব হয়। যামিনীবাবুর শিল্পও সে হিসাবে কতটা শিল্পরসোত্তীর্ণ তা এইভাবে যাচাই হবে।

প্রথম দেখতে হবে যামিনীবাবুর টেকনিক এবং উপকরণ। যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পের প্রাণবস্তু হলো অনাড়ম্বরতা। টেকনিকেও যেমন কৃচ্ছ্র, আড়ম্বরের প্রয়াস কোথাও নেই, তেমনি তাঁর শিল্পোপকরণের সুচারু প্রাঞ্জলতা। অনাড়ম্বর বলেই যে তাঁর চিত্র অলঙ্কারবিহীন তা নয়। সুসংযত ঐশ্বর্য্যে অলঙ্কৃত তাঁর চিত্রশিল্প। প্রত্যেকটি আঁচড়, প্রত্যেকটি রেখাপাত এবং বর্ণাবলেপ নিখুঁত ভাবে মাত্রাধীন। এখানে তুলিকাবিলাসের অবকাশ কোথাও নাই। তপশ্চর্য্যার মত নিরন্তর সাধনা ও অপরিসীম নিষ্ঠার বলে তিনি এই শৈল্পিক শ্রীকুশলতা লাভ করেছেন।

প্রায়ই একটা অভিমত লোকের মুখে মুখে শোনা যায়—যামিনীবাবু নাকি খাঁটি বাঙালী পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ইউরোপীয় টেকনিকে নিঃসংশয় নিপুণতা থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি দেশী পদ্ধতিকে বেছে নিয়েছেন। তিনি নাকি বাঙ্গলার পটুয়া রীতির উপাসক—নিজের প্রতিভার সংযোগে তিনি এই রীতির অভ্যুত্থান সাধন করেছেন। অর্থাৎ তিনি পুনরুজ্জীবনবাদী (Revivalist)। আমরা এ ধারণা পোষণ করি না। আমাদের মতে তিনি কোন রীতিরই উপাসক নন। দিনের পর দিন তিনি সাধনা করে এসেছেন ; শিল্পের প্রত্যেক পথ ও মত তিনি অতিক্রম করে এসেছেন। তিনি কোন রীতিকে এড়িয়ে যান নি। সব শেষে

তিনি পৌঁছেছেন এই সরল রূপসৃষ্টির স্থিতিতে। একে যামিনীবাবুরই পদ্ধতি বলা চলে। আরও স্পষ্ট করে বলতে পারা যায়, শিল্পের ঐতিহাসিক পদ্ধতি।

ইউরোপীয় চিত্রশিল্পে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তার কারণ অনেকে অনেকভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কেউ কেউ বলেন যে, এই অস্থিরতা স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিণতি, কেন না ইউরোপীয় শিল্পে যে আন্তরিক দৈন্য এতদিন ওপরের জলুসে চাপা পড়েছিল, তাই এই ভাঙনের উপদ্রবে আজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ইউরোপেও অল্পদিনের মধ্যে অনেক পদ্ধতি গড়ে উঠলো। আবার অল্পদিনের মধ্যে সেসব বাতিল হতে চলেছে। কিন্তু সবারই ভেতর একটা সাধারণ একলক্ষ্যাভিমুখী গতি দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো এই আড়ম্বরতার বিলোপ সাধন। অলঙ্কার আড়ম্বর ঘোচাতে গিয়ে অনেকে আবার তাঁদের চিত্রকে হেতুহীন বা Abstract করে ফেলেছেন ; কেউ বা করে ফেলেছেন নিতান্ত লঘু ও চটুল বর্ণসজ্জা। এখানেই আসে প্রকৃত শিল্পীর পরীক্ষা। এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে শিল্প রসপীঠে প্রতিষ্ঠিত থাকতে সক্ষম, তাকেই সজীব ঐতিহাসিক শিল্প বলা যায়।

যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পে আমরা এই ঐতিহাসিকতার আভাস পাই। কেউ বলতে পারবেন না যে, এ শিল্পে কিউবিজ্‌মের প্রাধান্য আছে, ফিউচারিষ্ট স্ফূর্তি বা ঐ রকম কোন কাটাছাঁটা পদ্ধতির অনুসরণের প্রয়াস আছে। সব কিছুই থাকতে পারে। কিন্তু সেটা শুধু এই শিল্পের রূপ ও সৌষ্ঠবের ঐতিহাসিক প্রয়োজনের জন্য।

সদৃশ রূপ বা Exactness বর্জ্জন করে রূপসৃষ্টির প্রয়াস শিল্পক্ষেত্রে নূতন কিছু নয়। স্পেনের প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রের ভেতর সুপ্রাচীন কালের বর্ব্বরশিল্পী যেভাবে তার মনোচ্ছবি উৎকীর্ণ করে গেছে, তার ভেতর শিল্পরসের প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের টেকনিকে আড়ম্বরের বাহুল্য ছিল না, Exactness ছিল না। কিন্তু সেই কারণেই গুহাচিত্র সত্যিকার শিল্প হিসাবে আখ্যাত হচ্ছে। তারপর মানুষের সামাজিক রুচি যেমন ইজ্‌ম-পীড়িত হয়ে উঠতে লাগলো, শিল্পক্ষেত্রেও দেখা দিল সেই অবান্তর আড়ম্বর বা ইজ্‌মের উপদ্রব। কিন্তু সে-মোহ ভেঙে গেছে। শিল্পী আবার খুঁজছে সরল রূপসৃষ্টির পথ। Exactnessকে বাদ দিয়ে, প্রকৃতির প্রসাদে একান্তনির্ভর না থেকে, প্রতিচ্ছবির বদলে মনোচ্ছবি সৃষ্টি করার সাধনায়।

যামিনীবাবুর চিত্রশিল্পে প্রতিচ্ছবিতার কোন বালাই নেই। এমন কি অ্যানাটোমির ব্যাপারেও তিনি এ অনুশাসন মেনে চলেন নি। কিন্তু তবুও যে তাঁর চিত্র এত জীবন্ত— সে শুধু তাঁর শিল্পপ্রাণতার পরাকাষ্ঠার জন্য। নইলে কোন চিত্রশিল্প এতটা নিরাভরণ থেকেও এই শ্রীমণ্ডিত রূপ লাভ করতে পারতো না।

আর একটি কথা। যামিনীবাবু কোন বিশিষ্ট একটি টেকনিকে চিত্র বা আলেখ্য রচনা করেন, তা নয়। বলতে গেলে তাঁর রচনাভঙ্গী নির্ব্বিশেষ। তাঁর প্রদর্শনীতে প্রবেশ করা মাত্র দর্শককে প্রথমে এই বিষয়ে ধাঁধায় পড়তে হয়—এত বিচিত্র পদ্ধতি ও কারুমিতির সমারোহ। কোন বৈয়াকরণিক সূত্রনিষ্ঠা নিয়ে তিনি রচনার সৌষ্ঠব বিধান করেন না। এ বিষয়ে তাঁর যা কর্ত্তব্য তার প্রেরণা পান তিনি নিজের মন হাতড়ে। তাঁর শিল্পীমনই তাঁকে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যায়—যার ফলে তিনি এই রূপের ফসল সৃষ্টি করেছেন। প্রথম শ্রেণীর শিল্পপ্রতিভা ও সত্যিকারের গুণীর এটা একমাত্র পরিচয়।

য়ুরোপীয় আর্টের প্রগতি

চিত্রশিল্পের উৎপত্তি কবে, সে কথা কেউ গুনে বলতে পারে না। এমনও প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার শেখে নি, সেই দূর অতীতেও চিত্রশিল্পের চর্চা করেছে। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, চিত্রশিল্পের পেছনে নিশ্চয় কোন একটা প্রয়োজনের তাগিদ ছিল, যার প্রেরণা মানুষকে শিল্পী হতে বাধ্য করেছে ; এ প্রয়োজনটি কি?

আজ ভাষা বা লিখন মানুষের যে প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, চিত্র ঠিক এই প্রয়োজনটি মেটাবার জন্যেই একদিন আবির্ভূত হয়েছিল। অর্থাৎ মনের কথা বা ভাবের বাহন হিসাবেই চিত্রশিল্পের প্রথম উৎপত্তি। যখন লিপির উদ্ভব হয়নি, এমন কি ভাষাও যখন শুধু কতগুলি হুঙ্কার, হর্ষ, ক্রন্দন বা আক্ষেপ ধ্বনি মাত্র ছিল, তখনও বর্ব্বর মানুষ তার বক্তব্য ছুঁচালো পাথরের আঘাতে পাথরের বুকে পরিপাটি করে খোদাই করেছে।

সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ হয়ে তাকে যথার্থ চারুকলার ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত করেছে। এখন শুধু মনের ভাব প্রকাশের তাড়নার প্রয়োজন মেটাবার জন্যেই চিত্রশিল্পের সার্থকতা নয়। এর উপরও কিছু আছে। রুচির প্রয়োজন মেটাবার জন্য, ঐন্দ্রিয় আহ্লাদ ও রসানুভূতিকে আরও উপভোগ্য করার জন্য চিত্রশিল্পের প্রয়োজন। সুতরাং চিত্রকলা এখন সভ্যতার অন্যতম সেবক।

সুতরাং চিত্র প্রাচীন মানুষের কাছে কতখানি মর্য্যাদার ও আনন্দের বিষয় ছিল, তা আজ কল্পনা করা যায় না। চিত্রের এই সম্মোহনী গুণে মুগ্ধ মানুষ একে যাদুবিদ্যার একটি কীর্তি বলে গণ্য করতো। বিংশ শতাব্দী চিত্রকলার সে-মহিমা মলিন করে দিয়েছে। মুদ্রাযন্ত্র, লিপি ও লিখন প্রণালীর সাহায্যে মানুষ 'সাহিত্য' নামে একটি রসপ্রাণ বিষয়ের সৃষ্টি করেছে। লেখার কাছে আজ আলেখ্য হতমান হয়েছে। কবিতার একটি 'চরণ' তাকিয়ে দেখে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি হয় না, আবৃত্তি করলে অবশ্য ছন্দোবদ্ধ শব্দের ধ্বনি-মাধুর্য্য মনে আনন্দের সাধ জাগায়। কিন্তু আবৃত্তি না করে শুধু মনে পড়েও কবিতার রসগ্রহণে কোন বাধা নেই। লেখা বা ছাপা অক্ষরের সাহিত্যের এই শক্তি চিত্রশিল্পের মহিমাকে অনেকখানি খর্ব্ব করে দিয়েছে।

কিন্তু চিত্রশিল্পও তার সনাতন ঐতিহ্য আঁকড়ে বসে নেই। নূতন পথে নূতন রূপ নেবার জন্যে চিত্রশিল্পে আবার একটা সাড়া পড়েছে। বলতে গেলে আধুনিক চিত্রকলায় অতীত পদ্ধতির বন্ধনকে অস্বীকার করাই সবসময়ে বড় প্রয়োজন বলে শিল্পীরা মনে করেছে। নইলে চিত্রশিল্পের নূতন প্রতিষ্ঠা আর সম্ভব হতে পারে না। গ্রীক, চীন, রেণেসাঁস বা ওলন্দাজ রীতির বন্ধন ঘুচিয়ে ফেলে চিত্রকলা আজ নূতন টেকনিক ও নূতন রসলোকে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর হয়ে উঠেছে। বস্তুর রূপ ও শ্রী সম্বন্ধে সনাতন দৃষ্টি-ভঙ্গী বদলে যাচ্ছে। শুধু নয়নরঞ্জন বর্ণোল্লাস বা নিখুঁত রূপায়ণ চিত্রকলার উপজীব্য আর নয়। অলঙ্কার ও আড়ম্বরের স্থানও ক্রমেই নগণ্য হয়ে আসছে।

চিত্রকলার প্রগতি যে আরম্ভ হয়েছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। আধুনিক চিত্রকলার এই নবোন্মেষের গুণ-লক্ষণ বিশেষ প্রণিধান করার বিষয়।

প্রথম দেখতে পাই চিত্রে লোকসদৃশতা বা Exactness-এর বর্জ্জন। চিত্রকলায় ক্যামেরা-কারসাজী দেখাবার স্থান নেই। শিল্পীর হাতের রং, রেখার টান, মাত্রা ও অবলেপের

স্ফূর্ত্তি কি অদ্ভুত শক্তির খেলা দেখাতে পারে—হাজার বছর আগেকার চীনা শিল্পীর হাতে পাথরের খোদাই করা একটি ধাবমান অশ্বের প্রতিকৃতির মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে। অকি-তাড়িত আধুনিক একটি রেসের ধাবমান ঘোড়ার ফটো-চিত্র তুলনা করলে এই পার্থক্য ধরা পড়ে। ফটো চিত্রটি নিখুঁত সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মধ্যে তেজীয়ান তুরঙ্গমের প্রতি মাংসপেশীর সেই অবাধ গতিস্ফূর্ত্তির প্রকাশ কোথায়? ফটো চিত্রের ঘোড়ার প্রতিকৃতির মধ্যে শুধু একটা উল্লাসহীন স্তব্ধতাই দেখতে পাওয়া যায়। অপর দিকে চীনাশিল্পীর খোদিত অশ্বের প্রতিকৃতির মধ্যে নিখুঁত অ্যানাটোমির বালাই নেই। কিন্তু গতিবেগের উদ্দামতা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে শিল্পীর সৃষ্টিকুশলতার গুণে। কবি ব্লেক-এর টাইগার কবিতা অনেকে পড়েছেন। এই কবিতায় বাঘের অবয়বের বর্ণনা কিছুমাত্র নেই। ধারাল দন্ত নখর, হিংস্র দৃষ্টি বা তর্জ্জন গর্জ্জনের কথা নেই। শুধু কতগুলি অতি সাধারণ শব্দের সুপটু ধ্বনির কারিগরী দেখিয়ে কবি আসল বস্তুটির রূপ সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই কবিতায় সঠিক টাইগার মূর্ত্ত হয়ে ওঠেনি, কিন্তু হয়েছে তার চেয়ে বড় জিনিষ—টাইগারত্ব। ভ্যান গগ (Van Gogh) চিত্র শিল্পের এই রীতির উপাসক।

আধুনিক চিত্রকলার আর একটি লক্ষণ—এর মধ্যে শুধু চিরাচরিত লালিত্য ও লঘু ব্যঞ্জনার আধিপত্য নেই। এমন দিনও ছিল যখন চিত্রে সৌন্দর্য্যের পরিবেবণও অপরাধ স্বরূপ ছিল। ভিক্টোরীয় যুগের ইংলণ্ডীয় আর্টে এই রকম অতিনৈতিকতার প্রকোপে যথার্থ ভীড় হয়েছিল। ধর্ম্ম কর্ম্ম ও গার্হস্থ্যে খৃষ্টীয় পবিত্রতার প্রপাগাণ্ডাই সে আর্টের বিষয়বস্তু ছিল। বলা বাহুল্য Puritanismকে চিত্রকলার আসর থেকে আজ যেভাবে দুর্জ্জনের মত পরিহার করা হয়েছে, তাতে অতিনৈতিক (Puritanic) আর্টকে এর পর থেকে সমালোচকেরা পৈশাচিক তুক-তাকের মত একটি অপ্রাকৃত (Occult) আর্ট বলেই বিচার করবে।

র‍্যাফেল ও রেনেসাঁসের পরেও আর একটি প্রগতিবিরোধী রীতি চিত্রশিল্পের উপর ভর করেছিল—অলঙ্কারের আতিশয্য। বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই এ রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘনিয়ে ওঠে। অতি পরিপাট্য বা Prettiness কে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করার একটা চেষ্টা জেগে উঠলো। ফোভিষ্ট রীতির (Fauvist School) আবির্ভাব এইখানে এবং চিত্রশিল্প-জগতের অন্যতম প্রতিভা গগাঁ (Gaugine)-এর পুরোধা। চিত্রকলার 'Impression' বা মনোচ্ছবির ধর্ম্মকেই এঁরা বড় করে দেখলেন। অলঙ্কারের বন্ধন থেকে চিত্রকলা এখানে মুক্তি পেল। সহজ ও সরল হবার অবকাশ পেল। গগাঁর অনেক চিত্রের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য হলো ঐ নিরাভরণতার মধ্যেও আবেগ ও আবেদনপ্রধান করে তোলা।

প্রগতিশীল চিত্রকলায় পিকাসোর (Picasso) আবির্ভাব একটি বিপ্লব বহন করে এনেছে। টেকনিকের মধ্যে তিনি কিউব (উদ্ভট বলেও মনে হয়) রীতির প্রবর্ত্তন করলেন। রেখার হিসেব ও বর্ত্তুল বা বলয়ের সাহায্য না নিয়ে জ্যামিতিক আয়ত ও ঘন আয়তনপ্রধান রূপকে তিনি আমদানি করলেন অ্যানাটোমির গঠনে। আপাতদৃষ্টিতে পিকাসোর (কিউবিস্ট) রীতিকে অনেকের কাছে হেতুহীন বলে মনে হয় কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। কাব্যে নাটকে যেমন Satire-এর স্থান আছে, কিউবিজম্‌ও চিত্রশিল্পকে অনেকটা সেই গুণে প্রভাবিত করেছে। এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটি 'ব্যঙ্গ' কমপ্লেক্স আছে, কিন্তু তার রসের অভাব নেই।

গ্রোটেস্ক (Grotesque) রীতির মধ্যেও এই 'ব্যঙ্গ' বা Complex-এর স্থান খুব বেশী।

রূপের চেয়ে বিরূপ এবং শ্রীর চেয়ে কুশ্রীর প্রকাশ এর মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। তবুও তাতে শিল্পরসের একটুকু হানি হয় নি। কিউবিজমের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই বিদ্রোহ সত্ত্বেও, যাকে টেকনিকের অনাসৃষ্টি বলেই মনে হয়, অদ্ভুত সৌষ্ঠবরসে চিত্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদ বা Realism-এর মৃত্যু হয়েছে অনেকদিন আগেই। পরিপাট্য ও অলঙ্কারের (Decoration Ornamentation) মূল্য এখন অনেকটা পুরাণের অতিকল্পনা উপকথার মতই। মাইকেল এঞ্জেলোর গঠনধর্ম্ম বা Formএর কাজ টিশিয়ানের (Titian) চটুল বর্ণবিন্যাস, রেমব্রাণ্টের (Rembrant) চিত্রের মেঘরৌদ্রের মত সাদাকালোর মায়াঘটা—এ সব আজ রূপকথার মত উপভোগ করার বস্তু। বিংশ শতাব্দীর যন্ত্রবিদ সমৃদ্ধ সভ্যতায়, নতুন মনোদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের সমাজে রুচিরও বদল ঘটে গেছে। আজ চিত্রকলাকে সেই রুচির প্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে হচ্ছে। তাই এর বর্ত্তমান খুবই কঠিন পরীক্ষায় বন্ধুর কিন্তু ভবিষ্যৎ তেমনি মহৎ সার্থকতায় সুমসৃণ।

আধুনিক শিল্পরীতিতে হেতুহীনতাকে পরিহার করা বা না করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। Formation এবং Sur-realism নামে যে দুটি রীতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে গঠনের হেতুহীন রূপ আবার প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রতীকধর্ম্মী (Symbol) রীতিও নিঃশেষ হয়নি। এই নানা রীতির জটিলতার প্রকোপে চিত্রকলা কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে, কে জানে।

বর্ত্তমান যুগে চিত্রশিল্প নূতন প্রকাশের বেদনায় উদ্বেল হয়েছে, ভাস্কর্য্যেও তাই দেখা দিয়েছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগের নূতন পরিবেশে মানুষের আবেগে যে বিক্ষোভ ও বিপ্লবের সূচনা হয়েছে, শিল্পে সেই আবেগকে আশ্রয় করে নূতন ধরণের প্রতীকধর্ম্মী একটি রীতির পত্তন হয়েছে। যন্ত্রের প্রভাবে মানুষের রূপতত্ত্বে যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তার ফলে নূতন একটি শিল্পকলার আদর্শ বা স্ট্যাণ্ডার্ড হয়তো ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে।

এর পর আসে Sur-realist School—যাঁরা 'Psychic Automatism'এর প্রেরণায় তুলিকা চালনা করেন। ডাঃ ফ্রয়েড কথিত নির্জ্ঞান মনের বিক্ষিপ্ত আবেগ ও কামনার রূপায়ণ এই রীতির লক্ষ্য। সুতরাং পরা-বাস্তব বা Sur-realist চিত্রে অর্থের চেয়ে অনর্থটাই বেশী সুস্পষ্ট। এদের হাতে Realism অন্তর্মুখীন হয়েছে। মনের নিরুদ্ধ ভাবপ্রবাহকে তুলিকা মুখে উৎসারিত করাই নাকি এ রীতির বৈশিষ্ট্য।

যে দিক দিয়েই দেখা যাক্, আধুনিক চিত্ররীতি যে একটি সুমহৎ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আধুনিক কবিতার মত আধুনিক চিত্রকেও দুর্ব্বোধ্যতার অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। এই দুর্ব্বোধ্যতার জন্য শিল্পী বা কবি কেউ দোষী নয়। যে যুগ একটা বড় সামাজিক বিপ্লবের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, সে যুগে সামাজিক মনের মধ্যেও অজস্র উত্তেজনা ও বিক্ষোভের ঝড় ঘনিয়ে থাকবে সন্দেহ নেই। এই রকম মানসজগতে সনাতন সত্য শিবসুন্দরের কি দশা হবে তা কেউ বলতে পারে না। আধুনিক চিত্রশিল্পে সেই বিক্ষোভের স্তূপ খুব বড় হয়ে পড়েছে। বর্ত্তমানে চিত্রশিল্প শুধু একটি পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

য়ুরোপীয় ভাস্কর্য্যের প্রগতি

বর্ত্তমান শতাব্দীতে শিল্পকলার প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক নতুন ভাবধারার স্পর্শ লেগেছে। পুরাতন রীতিকে অতিক্রম করে এক ভিন্নতর রীতির ওপর এই নব শিল্পকলার প্রতিষ্ঠার সূচনা দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া দৃষ্টিভঙ্গী, প্রকাশ ও ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে এই নব্য শিল্পসাধনা একেবারে নতুন সন্ধর্মের (Fundamental) উপর প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছে। ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে আধুনিক কালে যেটুকু নতুনত্বের নমুনা পাওয়া গেছে, বলতে গেলে তা নতুন কিছু নয়। তার মধ্যে আংশিকভাবে আছে Revival বা পুরাতন বিস্মৃত রীতির পুনঃপ্রচলন এবং আংশিকভাবে য়ুরোপীয় কলাপদ্ধতির অনুকরণ। য়ুরোপে সামাজিক পরিবর্তন, চিন্তাবিপ্লব ও নতুন অর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে সমাজের শৈল্পিক দৃষ্টি যেপথে স্বাভাবিকভাবে চালিত হয়েছে, আমাদের দেশে সে জীবনের ভিত্তিও হয় নি এবং স্বভাবতঃ ভারতীয় শিল্পের রূপ একই পথে অগ্রসর হতে পারে না। কাজেই য়ুরোপীয় প্রথা এদেশে আমদানী হয়েছে সত্য, কিন্তু তার পিছনে ইতিহাসসিদ্ধ কোন কারণ ও আদর্শের প্রেরণা নেই। অতএব সে জিনিষ আমাদের চিন্তায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ হতে পারে নি।

য়ুরোপের সুরে সঙ্গীতে চিত্রাঙ্কনে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে একই সময়ে বিংশ শতাব্দীর জটিল চিন্তাবর্ত্তের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে এক সাধনা ক্রমশঃ সার্থকতার দিকে চলেছে। ভারতীয় চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে Revival বা পুনরভ্যুত্থানের আভাসই বেশী। যে অজন্তা, ইলোরা, সাঁচী, গান্ধার ও কাংড়াকে আমরা হারিয়েছি, জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় তাকেই ফিরে পাওয়ার একটা প্রচেষ্টা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্প সাধনার বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে বর্ত্তমান য়ুরোপে এখন কোন পুরাতন রীতির সশ্রদ্ধ পুনরভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা নেই। আছে নতুন পথে মোড় ফেরাবার চেষ্টা।

চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্যের পেছনে অনুপ্রেরণা একই থাকলেও উভয়ের প্রকাশে বৈচিত্র্য আছে। চিত্রে যে রূপ যতখানি ধরা দেয় ভাস্কর্য্যে তার চেয়ে বেশী। কারণ ভাস্কর্য্য সমতলপটে পরিবেশিত রঙের লেপন নয় ; এর মধ্যে আকৃতি জ্যামিতিক নিষ্ঠার সঙ্গে ফুটে ওঠে। কাজেই ভাস্কর্য্যের মধ্যে জীবনের আকৃতি বস্তু ও ভাবগত প্রতিফলন সুন্দরতম ভাবে রূপ নেয়। উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ভাস্কর্য্যে বস্তুগত নিখুঁত সাদৃশ্য রক্ষা করাই শিল্পীর মুখ্য উপপাদ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভাস্কর্য্যের লক্ষ্য বিষয়ের হুবহু অনুমূর্ত্তি সৃষ্টি নয় এবং ভাস্কর্য্য যে বিষয়ের ভাবরূপের বিগ্রহ মাত্র, এ তথ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শিল্পীদের মনে জাগ্রত হতে থাকে। তাই আজ বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ভাস্কর্য্যের রূপ দেখলে ঐতিহ্যপুষ্ট দ্রষ্টার চোখ হঠাৎ চমকে উঠবে। ব্যাপারটা তার কাছে আগাগোড়া জটিল ও দুর্ব্বোধ্য মনে হবে। এর মধ্যে নিখুঁত অ্যানাটমিকে পরিহার করা হয়েছে, আলঙ্কারিতা চটুল কারুবৈচিত্র্য বা সুদর্শন রূপসৌকর্য্যের নিদর্শন নেই। পার্থেনন ভাস্কর্য্যের এথেনীয় রীতি বা পরবর্ত্তী রোমক ফ্লোরেন্টাইন রীতি এক কালে শিল্প-প্রতিভার আধার ছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে শিল্পীর তুলিকা ও ভাস্করের বাটালি নতুন সৃষ্টির সাধনা ছেড়ে দিয়ে সেই রীতির উপাসনাতেই ব্যস্ত ছিল। প্রাচীন রীতির ঐশ্বর্য্যে তাদের মন এক রকম আচ্ছন্নই হয়ে গিয়েছিল। রেনেসাঁস যুগের রীতির প্রতি আজও শ্রদ্ধা শিথিল হয়েছে কিনা বলা যায় না। তখন এই সিদ্ধান্ত শিল্পী সমাজে সর্ব্বজনমান্য ছিল যে, ভাস্কর্য্যের মুখ্য কাজ

হলো মূর্ত্তির আবয়বিক গড়ন যতদূর সম্ভব নিখুঁত ও অনিন্দ্যসুন্দর করে তোলা। আজও ঐ ধারণার শেষ হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। আরও ধারণা ছিল, ভাস্কর্য্যের বিষয় হবে শুধু মানুষ। প্রকৃতি মনুষ্যেতর জীব তার মনোজগতে ও শিল্পপীঠে স্থান পায় নি।

অন্য দেশে অর্থাৎ প্রাচীন ভারত ও চীন দেশে এরকম সিদ্ধান্ত অবশ্য কখনও প্রচলিত ছিল না। রেণেসাঁস যুগের য়ুরোপীয় শিল্পীদের আর একটি সংস্কার ছিল—মানুষের দৈহিক সৌন্দর্য্যের একটা নির্দ্দিষ্ট মান আছে। ভাস্কর্য্যে তার অভাব হলে সে শিল্পসৃষ্টি দীন হয়ে পড়বে। আমাদের দেশেও প্রতিমা লক্ষণ অনুসারে গতানুগতিকভাবে ভাস্কর্য্যচর্চ্চা করার ফলে শিল্পীদের মধ্যে প্রতিভার ও নতুন সৃষ্টি কুশলতার অভাব ঘটেছিল।

বর্ত্তমান, ভাস্করসমাজে রেণেসাঁস যুগের উল্লিখিত সংস্কারগুলি একে একে দূর হয়ে গেছে।

প্রাচীন ভারতীয়, চৈনিক ও মিশরীয় পদ্ধতিতে ভাস্করের মূর্ত্তি গঠন সাধনায় দৈহিক সুচারুতার ওপর এই উগ্র প্রীতি ও নিষ্ঠা ছিল না। তার মূল তত্ত্বই ছিল ভিন্ন। আধুনিক য়ুরোপ প্রাচীন প্রাচ্য পদ্ধতির দিকে দৃষ্টি দিয়েছে। এপোলোর মত পুরুষ আর ভেনাসের মত নারীমূর্ত্তি খোদাই করা ভাস্কর্য্যের চরম সার্থকতা, এ ধারণা আজকাল আর গ্রাহ্য নয়।

সুতরাং য়ুরোপীয় ভাস্করের মন নতুন পদ্ধতির অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে উঠলো। তাদের মনে প্রথম প্রশ্ন জাগলো—বিশেষ কোন পদ্ধতির ওপর নিষ্ঠা ত্যাগ করতে হবে, পদ্ধতিকে উদারতর মণ্ডলের আশ্রয়ে নিয়ে ফেলতে হবে। তাই তারা বিশেষ যুগ ও বিশেষ কোন শিল্পাচার্য্যের রীতি অনুসরণ পরিহার করে বিশ্বের সর্ব্বস্থলের ও সর্ব্বকালের রীতির দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

এরিক গ্রিল (Eric Grill) একজন বিশিষ্ট ভাস্কর। তিনি তাঁর শিল্পরীতির প্রেরণা পেলেন মধ্যযুগের ভাবধারা থেকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গথিক ভাস্কর্য্যের রীতির মধ্যে তিনি তাঁর সাধনার অবলম্বন পেলেন। লিয়ন আণ্ডারউড (Leon Underwood) এবং এপষ্টাইন (Epstein) আদিম আফ্রিকার শিল্পরীতির মধ্যে অনুশীলনযোগ্য আদর্শ খুঁজে পেলেন। কিন্তু এই চেষ্টার মধ্যে নব্যধারার উন্মেষের বদলে পুরাতন আশ্রয়ের অবলম্বনের ব্যাপারই বেশী। এটা হয়ত অক্ষমতার অভিমান প্রসূত। কিন্তু ভাস্করের লক্ষ্য এইটুকু মাত্র নয়। নতুন শিল্প অর্থে সজীব প্রেরণাশীল একটি সৃষ্টি বুঝায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর বারোক (Baroque) ভাস্করদের মধ্যে রীতির অন্যরকম এক উৎকর্ষ হয়েছিল। কঠিন পাষাণকে তাঁরা প্রশান্ত পুষ্পপুঞ্জের মত, লঘু মেঘস্তবকের মত বা সুসূক্ষ্ম ঊর্ণনাভের মত রূপ দিতে পারতেন। পাষাণে এই লঘু হিল্লোল সৃষ্টি করা এক বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তার একমাত্র গুণ ছিল চমৎকারিতা। এর অতিরিক্ত কোন প্রসাদ, গভীরতর কোন ভাব ও আবেগের বালাই তার মধ্যে ছিল না। এর মধ্যে কেরামতি ছিল কিন্তু আদর্শের শুদ্ধতা ও মহিমা ছিল না।

আধুনিক ভাস্করের লক্ষ্য বস্তুর দৃশ্যতা নয়, দৃশ্যাতিরিক্ত আবেগ ও ব্যঞ্জনাকে মূর্ত্তিমান করা। সুতরাং ভাস্কর্য্যেও প্রতীকবাদ (Symbolism) ও পরা-বাস্তবতার (Sur-realism) প্রভাব বিস্তারিত হয়ে উঠেছে। এপষ্টাইন এ বিষয়ে অগ্রগণ্য। তাঁর মূর্ত্তি প্রতীকধর্ম্মী ও ভাবাশ্রয়ী। আবয়বিক সৌকর্য্য তার মধ্যে নেই। তবুও এপষ্টাইনের সৃষ্টিকে আধুনিকতার নমুনা বলা যায় না। বিশেষ কোন ব্যক্তি বা মূর্ত্তি রচনায় এপষ্টাইন এই বস্তু অতিরিক্ত রূপ

ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম। তখন বস্তুকে এড়াতে গিয়ে তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অতিমূর্ত করে ফেলেন।

আধুনিক ভাস্করের রীতিকে অনেকে Architectural বা স্থাপত্যভাবযুক্ত বলে থাকেন। এর অবশ্য কারণও আছে। স্থাপত্যে বড় জিনিষ হলো গঠন বা Form ; আধুনিক ভাস্কর্য্যের এই গঠনধর্ম বড় জিনিষ হয়ে উঠছে। যে পাষাণকে ভাস্কর অস্ত্রের আঘাতে কেটে কুঁদে রূপ দিতে চায়, তারই মধ্যে নতুন নতুন অঙ্গবিন্যাস, রেখা, ভাঁজ, কুঞ্চন ও ভঙ্গী সৃষ্টি করে সে। বাইরের কোন বস্তুর স্থূল আকৃতির অনুকরণ সে করে না। তার উপকরণকেই সে নানা ছাঁদে গড়ে পিটে তার মনের ভাবমূর্ত্তির বিগ্রহরূপে তৈরী করে নিতে চায়।

আধুনিক ভাস্কর্য্য যে পথে চলেছে তার বিরুদ্ধ মতবাদেরও অভাব নেই। এর জটিলতা, দুর্বোধ্যতা ও অমানুষিকতাকে বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে। ঐতিহ্যকে এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টাকে বিদ্রোহ বলে অপবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের চিন্তার মতই বর্ত্তমান ভাস্কর্য্যরীতি জটিল কঠোর ও গভীর। এর মধ্যে আন্তরিকতা আছে যথেষ্ট। এর পেছনে সাধনা রয়েছে। নতুন এক মহত্তর সার্থকতার দিকে য়ুরোপীয় ভাস্কর্য্য ক্রমে এগিয়ে চলেছে।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রগতি

বিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। এ বিজ্ঞানের আরম্ভ কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে নয়। গত তিনশত বৎসর ধরে বিজ্ঞানই য়ুরোপের সমস্ত সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করে আসছে। ফলে য়ুরোপীয় শিল্পকলার প্রগতি ক্ষুণ্ণ তো হয়নি বরং পদে পদে নতুন রূপ ও প্রেরণা পেয়ে এগিয়ে চলেছে। য়ুরোপীয় সঙ্গীত বিদ্যার গত তিনশত বছরের ইতিহাস রূপসৃষ্টিপ্রবণ মানুষের অত্যদ্ভুত ও অক্লান্ত সাধনার ইতিহাস। নব নব সাঙ্গীতিক প্রতিভার অভ্যুদয়, সুরকারের আবির্ভাব, বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার ; নতুন নতুন পরীক্ষা সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে এই তিনটি শতাব্দী পার হয়ে গেছে। তারই উত্তরাধিকারের বলে বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপ আজ যে সুর ও সঙ্গীতের ঐশ্বর্য্য পেয়েছে তা তার যুগব্যাপী বিজ্ঞান অনুশীলনের দান থেকে কম মূল্যবান নয়। বস্তুত বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সঙ্গীত অন্যান্য যুগের তুলনায় অনেক বড় রূপ শক্তি ও আনন্দের আধার। এর উপকরণও যেমন অভিনব, এর প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা তেমনি অপূর্ব্ব। তারপর বড় কথা এই যে, আজকের য়ুরোপীয় সঙ্গীতও অজস্র নতুন সম্ভাবনা ও সৃষ্টির শুভ সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছে। শীঘ্রই হয়তো আবার একটা কোন রসলোকের আবিষ্কার করে য়ুরোপীয় সুরকারের সাধনা নতুন সার্থকতায় পূর্ণতা পাবে।

আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীত পুরাতন সঙ্গীতের তুলনায় মাত্র একদিক দিয়ে একটু নেমে গেছে। মেলডির (Melody) সুললিত হিল্লোল যা এককালে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অন্যতম উৎকর্ষের প্রমাণ ছিল তা আজ লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে তার সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে হার্ম্মনির (Harmony) রূপায়তন—নৃত্যপরা স্রোতস্বতীর মত সঙ্গীতের সুরবিভঙ্গ ও মন্দ্রোল্লাস। গত তিনশত বছর ধরে য়ুরোপীয় সুরপ্রবাহ এই একই হার্ম্মনির খাত বেয়ে ক্রমোৎকৃষ্ট বিস্তৃত হয়ে চলেছে। শিল্পের বাহন হিসাবে শুধু রং তুলি কবিতা নাটক মহাকাব্যই একমাত্র উপাদান নয়—সুরও সেইদিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। মহাকবিদের মত য়ুরোপে মহাগুণীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে। সামান্য শ্রুতিবিলাসের সঙ্কীর্ণতা থেকে পাশ্চাত্য গীত ও বাদ্য আজ মুক্ত হয়ে মহৎ সংস্কৃতির ভূমিকা রচনায় ও নতুনতর আদর্শ

প্রচারে নিযুক্ত হয়েছে। মহাকবিরা ও মহাশিল্পীরা মানবসভ্যতাকে যেভাবে উন্নীত করেছেন, মহাগুণীরাও তাই করেছেন, কিন্তু এই কথা শুধু য়ুরোপীয় সাঙ্গীতিক গুণীপনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কি করে য়ুরোপের সঙ্গীত এই গরিমা লাভ করল? গত তিনশত বছরের সেই সাধনার পেছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা ইতিহাসের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এড়িয়ে যায়নি। দেখা গেছে যে, সঙ্গীতের উৎকর্ষ প্রধানত তিনটি বড় কারণের উপর নির্ভর করে থাকে। প্রথম, যুগের প্রভাব অর্থাৎ সামাজিক ও রাজনীতিক রুচি আদর্শ ও চরিত্র। দ্বিতীয়, সুরসাধনার টেকনিকাল ও যান্ত্রিক উপকরণের উৎকর্ষ। তৃতীয়, কোন প্রতিভাসম্পন্ন গুণীর আবির্ভাব। এই তিনের সমবায়ই সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সূচনা করে ; এর যে কোন একটির অভাবে অপরটি ব্যাহত হতে বাধ্য।

আবার দেখা গিয়েছে যে, একমাত্র নিষ্ঠা, প্রগাঢ় সাধনা বা সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এও অনেকাংশে নির্ভর করে বাইরের সুযোগ সময় ও ঘটনার প্রকৃতির ওপর। অর্থাৎ সুরসাধকের মনের খোরাক চাই। চাই তার চিন্তার উদ্দীপনা। কালোচিত একটা প্রেরণার নাগাল না পেলে তার প্রতিভার উৎস অনিরুদ্ধ প্রবাহে উৎসারিত হতে পারে না। এইজন্য যতক্ষণ গুণী পুরোপুরি ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে থাকেন ততক্ষণ শুধু সুরপটুত্বই অর্জ্জন করেন। সুরব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য ও নতুন রসসৃষ্টির জন্য নতুন ঘটনার ও চিন্তার পরিমণ্ডল থাকা চাই। সুতরাং সমসাময়িক ইতিহাস সুরপ্রতিভাকে সৃষ্টিশীল করার মস্ত বড় একটা কারণ। জার্ম্মানীর প্রখ্যাত গুণী স্বল্পায়ু শুবার্ট (Franz Schubert) সঙ্গীত-জগতের অন্যতম প্রতিভা। শুবার্টের প্রতিভা সত্যই পরিস্ফূর্ত্ত হবার অবকাশ পেত না যদি তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের নতুন জার্ম্মান কবিতাকে উপকরণ হিসাবে হাতের সামনে না পেতেন।

য়ুরোপীয় ইতিহাসের প্রত্যেকটি শতাব্দী সঙ্গীতে শিল্পে এক একটি বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত। ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সঙ্গীতের পরিণাম একটানা উন্নতির রেখা ধরে চলে এসেছে তা নয়, মাঝে মাঝে মন্দা পড়েছে অনেক ; কিন্তু ইতিহাস ও চিন্তার বৈচিত্র্য ও বিপর্য্যয়ের দরুণ অচিরে সে মন্দা মুছে গেছে। ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সঙ্গীত ধর্ম্মনীতির প্রভাবে লালিত হয়ে উঠেছিল। রোম তখন সঙ্গীতবিদ্যার নিকেতন, কেননা রোমই ছিল ধর্ম্মযাজকদের অধিষ্ঠান। প্যালেষ্ট্রিয়ানা (Palestriana) ধর্ম্মসঙ্গীতকে বহুভাবে সুরাঢ্য ও সম্পন্ন করে যান। এই রীতি তাঁর পরে বহুদিন পর্য্যন্ত য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অবলম্বন হয়ে থাকে।

প্যালেষ্ট্রিয়ানা মারা যান ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে। তার পর থেকে ক্রমে ক্রমে সঙ্গীতে ধর্ম্মভাবের শাসন লঘু হয়ে আসতে থাকে। সঙ্গীতের সাধনা আর গির্জ্জার প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সাধারণের দরবারে এসে প্রতিষ্ঠা গ্রহণ করে।

সপ্তদশ শতকে তাই উদ্ভূত হল সুরসাধনার নব যজ্ঞভূমি—অপেরা (Opera)। এই অপেরাও ইটালীয় প্রতিভার সৃষ্টি। অপেরার সূত্রপাত থেকেই সঙ্গীতের মোড় ঘুরে গেল। বলতে গেলে অপেরাই হল রেনেসাঁসের শেষ দান।

অপেরার ভেতর দিয়েই নাট্যসঙ্গীতের (Dramatic Music) সূচনা হল। কিন্তু তখনো অপেরা সর্ব্বতোভাবে গির্জ্জার বা পুরোহিত শাসনের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে নি।

সাধারণের মধ্যে শুধু ধনবান বণিক শ্রেণীর লোকেরাই অপেরার প্রসাদে পরিতুষ্ট হতো। অপেরা তখনো পরিতুষ্ট হচ্ছিল এই ধর্ম্মযাজক ও ভিনিসিয়ান বণিকদের আর্থিক আনুকূল্যে। য়ুরোপের সমস্ত দেশে প্রদেশে অপেরা ছড়িয়ে পড়ে ল্যাটিন সংস্কৃতি ও রেনেসাঁসের বাহন হয়ে। দূর ড্রেসডেনে পর্য্যন্ত অপেরা ইটালীয়ান ভাষাতেই চালানো হত। ইংলণ্ডে এই সেদিন পর্য্যন্ত ইটালীয়ান ভাষাতেই অপেরা গান চলতো।

অপেরার বৈশিষ্ট্য হল নাটককে সুরপ্রাণ করে তোলা। তাতে নাটকীয় রসের হানি হল অনেকখানি, কিন্তু নানা নতুন সুরসংগঠন ও বাদ্যের রীতি ও টেকনিকের প্রবর্ত্তন হল। এর আগে সঙ্গীতে স্বরের কারুকার্য্যই সমধিক ছিল। অপেরাতে স্বরকে অপ্রধান রেখে, সুরের অধীনে ফেলে তার নবজীবন সঞ্চার করা হল। অপেরার ইতিহাসে মণ্টিভের্দি (Monte-verde) এবং স্কারলেটির (Scarletti) নাম চিরস্মরণীয়।

অপেরার আনুষঙ্গিক কণ্ঠসঙ্গীতে হ্যাণ্ডেলের (Handel) কীর্তি অসামান্য। স্বরে নতুন কারিগরী দেখিয়ে তাকে আবার গুণীজনগ্রাহ্য করে তোলে হ্যাণ্ডেল। এই সময় য়ুরোপীয় সঙ্গীতে দুটি অভিনবত্ব দেখা দেয়। যন্ত্রবাদ্যের উন্নতি ও জনপ্রিয়তা এবং একক সঙ্গীতের (Individualistic Music) আবির্ভাব। এর আগে সমস্বরে মিলিত সঙ্গীতেরই প্রাধান্য ছিল। তাতে ব্যক্তিবিশেষের স্বরের লীলামাধুর্য্য ফুটিয়ে তোলার অবকাশ ছিল না। যন্ত্রবাদ্যের মধ্যে বেহালার রাগ এসময় অত্যন্ত সমাদর লাভ করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে অপেরার চতুঃসীমার মধ্যেই সুরশিল্পের নানা পরীক্ষা চলতে থাকে। সঙ্গীতের যে আশু পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে এসেছে, তার লক্ষণ এই সময়েই দেখা দেয়।

অষ্টাদশ শতক সঙ্গীতের সুবর্ণযুগ এই হিসাবে যে, এই কালে সুরদেবতার বরপুত্র বীটোফেনের (Beethoven) জন্ম। তা ছাড়া আরো নাম করা যায়, মোৎসার্ট (Mozart) ও শুবার্ট (Schubert)।

পিয়ানো নামক বাদ্যযন্ত্রটি মোৎসার্টের হাতে নতুন ভাষা পেল। মোৎসার্টের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল এক অদ্ভুত সুরব্যাকরণ সৃষ্টি, যার গুণে পিয়ানো দুশত বছর ধরে গুণীসমাজে কৌলীন্য পেয়ে আসছে। মোৎসার্টের কাছে এসে পাই প্রকৃত অর্কেষ্ট্রার (Orchestra) আস্বাদ। তিনি পিয়ানোতে আলাপের যোগ্য সতেরটি সুরতন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন। হার্ম্মনির প্রাণতন্তু যে মড্যুলেশন (Modulation) ও টোনালিটি (Tonality) তার স্রষ্টা হলেন মোৎসার্ট। পিয়ানোতে হার্ম্মনির এই স্ফূর্তি সৃষ্টি করার যে টেকনিক তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা Keycontrast নামে আখ্যাত। এই রীতি অবশ্য চূড়ান্ত মহিমা অর্জ্জন করে উনবিংশ শতকে বীটোফেনের হাতে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অপেরার ভেতর দিয়ে সপ্তদশ শতক থেকে সুরু করে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত নানা পরীক্ষা চলেছিল। চেম্বার মিউজিক (Chamber Music), সোনাটা (Sonata), কনসার্টো (Concerto), সিম্ফনি (Symphony) প্রভৃতি সাঙ্গীতিক সুরতন্ত্রগুলির প্রভূত সংস্কার সাধন ও রূপবিন্যাস করা হয়। গ্লুক (Gluck) প্যারিস নাট্যালয়গুলির যথেষ্ট সৌকর্য্যবিধান করেন। যন্ত্র সঙ্গীতকে হেড্‌ন (Haydn) নানাভাবে সমৃদ্ধ করেন। সোনাটার স্রষ্টা হিসাবে হেড্‌ন চিরকাল ধন্য হয়ে আছেন।

মোৎসার্ট উক্ত সোনাটার আরো উৎকর্ষ সাধন করেন। হেড্‌নের রসসৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা পরম কমনীয়, লাস্যসুন্দর ও লঘুছন্দ শান্তির স্পর্শ। মোৎসার্ট তাতে দিলেন মোহের

প্রলেপ—কারুণ্যে ঢল ঢল চোখের জলের ভাষা।

অপেরা সঙ্গীতসাধনাকে আর এক দিক দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে গেছে। প্রত্যেক গুণী ও সুরকারের পক্ষে অপেরাই প্রথম দাঁড়িয়ে ছিল তাদের অর্থোপার্জ্জনের একটা ক্ষেত্র হিসাবে। য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রগতির পেছনে এই অর্থনীতিটিও একটি মস্ত ঐতিহাসিক কারণ সন্দেহ নেই।

বীটোফেন ও শুবার্টের জন্ম যদিও অষ্টাদশ শতকে ; তাদের সাধনাপ্রখর আয়ু উনবিংশ শতকে অনেকদূর পৌঁছে তারপর নির্ব্বাণ লাভ করে। য়ুরোপীয় সাঙ্গীতিক আকাশে বীটোফেন হলেন গ্রহরাজ। তাঁর নামের পুণ্যে ভিয়েনা আজও তীর্থ-গৌরবে গর্ব্বোন্নত হয়ে রয়েছে। সত্যিকারের মহাগুণী এই বীটোফেন। তিনি সুরের মিস্ত্রী ছিলেন না। তাঁর সুর সাধনার ভেতর দিয়ে একটা জীবনবেদ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। বীটোফেনের সৃষ্ট সুরের বন্যা আকাশ-গঙ্গার মত ছড়িয়ে গিয়েছিল দিগ্বিদিকে ; সমস্ত য়ুরোপ তার ভেতর ডুব দিয়ে রসাক্ত ও প্রমত্ত হয়ে উঠেছিল।

বীটোফেনও পিয়ানোকে টেনে নিলেন সুরসরস্বতীর আরাধনায়। তিনি রচনা করলেন বত্রিশটি সোনাটা ও নয়টি সিম্ফনি। তা ছাড়া আঠারটি কোয়ার্টেট (Quartet) এবং দুটি কনসার্টো।

বীটোফেনের অপেরাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধ হল ফিডেলিও (Fidelio) নামক গীতনাট্যটির। এর বিষয়বস্তু হল—নির্দ্দোষী ও অত্যাচারে জর্জর একটা বন্দী, যার আত্মত্যাগের শৌর্য্যের কাছে অত্যাচারীর উদ্ধত খড়্গ পরাভূত হল। বন্দী হ'ল মুক্ত। পৃথিবীবাসী উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে আনন্দের স্পর্শে।

বীটোফেনের সুরসৃষ্টির মধ্যে রোমান্সের স্থান খুবই বড় সন্দেহ নেই। তবে সেটা নিছক হৃদয়তাপের ভাপে ভরা নয়। তাঁর সুরের আবেদন সব প্রশ্ন চিন্তা বুদ্ধিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে শুধু বিলসিত করে তোলে না। তার কারণ বীটোফেন তাঁর ফিলসফিকে, তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে জাগ্রত করে তুলেছিলেন সুরের আঙ্গিকের ভেতর দিয়ে।

কবিতা ও সঙ্গীত কতখানি পরস্পর নির্ভরশীল তার সাক্ষাৎ প্রমাণ শুবার্টের সৃষ্টির মধ্যে। কবি যদি ভাল কবিতা না লেখেন, তবে গুণীকেও তার গান বন্ধ করতে হবে। যদিও বা বন্ধ না করেন, তবে সে গানও ভাল হবে না।

এই সম্পর্কে বাংলা আধুনিক কবিতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা চলতে পারে। আধুনিক বাংলা কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যদিও বা এড়িয়ে যেতে পারছে না, তবে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের একমাত্র উপজীব্য রবীন্দ্র-কবিতা। তার কারণ রবীন্দ্র-কবিতার সেই গুণ আছে যার বলে গুণীর আসরে সে ঠাঁই করে নেয়। এখন বিবেচ্য, আধুনিক বাংলা কবিতার মধ্যে গীতরসের নিদর্শন কিছু আছে কি না। যতদূর মনে হয় নেই। সুতরাং এ আশঙ্কা অমূলক নয় যে, আধুনিক বাঙ্গালী কবি ও আধুনিক বাংলা গুণীর শীঘ্রই কোন শিল্পগত সম্পর্ক ঘটবার সম্ভাবনা নেই। আধুনিক বাংলা কবিতা গান করা সম্ভব কিঁ না এ সম্বন্ধে গুণীরাই সঠিক কিছু বলতে পারেন। আধুনিক কবিতা গুণীর ও সুরশিল্পীর কাছে যদি অস্পৃশ্য হয়ে থাকে, তবে সংস্কৃতির দিক দিয়ে সেটা শোচনীয় হবে সন্দেহ নেই।

ওস্তাদ জে এস বাখ (J.S. Bach) মারা যান ১৭৫০ খৃঃ অব্দে। তাঁর জন্ম ১৬৮৫ সনে।

কিন্তু তাঁর জীবনকালে তাকে নিতান্ত অখ্যাতির আড়ালেই দিন কাটাতে হয়েছে। বাখের গুণের সমাদর হল তাঁর মৃত্যুর দুপুরুষ পরে। লাইপজিগের (Leipzig) গির্জ্জার তিনি সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। তাঁর আলোচ্য ছিল ধর্ম্ম সঙ্গীত।

কিন্তু সেই জন্যে তিনি কোন মধ্যযুগীয় সুররীতির চর্চ্চায় তৎপর ছিলেন না। ধর্ম্ম সঙ্গীতের চর্চ্চার ভেতর তিনি সুরের নানা কাঠামো ও কেরামতি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে যেতেন। অপেরার ঘোর জনপ্রিয়তার জন্য গির্জ্জা সঙ্গীতের দিকে তখন আর কারু নজর পড়ত না। কাজেই লাইপজিগ গির্জ্জার ওস্তাদের সুরপটীয়সী প্রতিভার পরিচয় জনসাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি। তা একান্তভাবে লাইপজিগ গির্জ্জারই সম্পদ হিসাবে থেকে গিয়েছিল। উত্তরকালে লাইপজিগ গির্জ্জার সঙ্গীতের ঠাঁট সকলকে বিস্মিত করে দেয় এবং নতুন করে বাখের সমাদর হয়।

অপেরার জন্মদাত্রী ইটালীর মাটিতে আর বিশেষ কোন সঙ্গীত প্রতিভার অভ্যুদয় হয় নি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই গানের আসর ক্রমে ক্রমে সরে এসে জার্ম্মানীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছেও জার্ম্মানীই সঙ্গীতের ধাত্রী ও সুরসৃষ্টিতে সকলের অগ্রণী হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতকের সঙ্গীত এইভাবে উন্নত আভিজাত্যের সৌষ্ঠব পোষণ করে এসে পৌঁছল উনবিংশ শতাব্দীতে—অপূর্ব্ব আবেগপ্রধান যুগে। রোমান্সপ্রধান যুগে।

জার্ম্মানীতে শুম্যান (Schuman) ও ব্রাম্‌স (Brahms) দুজন সুরকুশল শিল্পী দেখা দিলেন। ফ্রান্সে আবির্ভূত হ'ল বের্লিয়ো (Berlioz) ও শোপাঁ (Chopin)। শোপাঁর নতুন সুর পরিকল্পনা নৃত্যশিল্পকে অনুপ্রাণিত করে তুলল। অর্কেষ্ট্রাই সঙ্গীতের প্রধান ভিত্তি হয়ে বর্ত্তিয়ে রইল। এই রোমান্টিক আবহাওয়ার মধ্যে জার্ম্মানীর সুরকার ভেবার (Weber) এলেন গানের ইন্দ্রজালমায়া ছড়িয়ে। তিনি সঙ্গীতকে যাদুমন্ত্রের রূপ দিলেন। সঙ্গীত শ্রোতার সমস্ত সত্তাকে কিভাবে অভিভূত করে ফেলতে পারে, তার প্রমাণ ভেবারের সুরপূত সঙ্গীত। ফরাসী বের্লিয়ো হলেন ভেবারের শিষ্য। রুশীয় ওস্তাদেরা বের্লিয়োকে আদর্শ করে আর এক রীতিতে সাধনা ও সাফল্য অর্জ্জন করল।

তারপর উল্লেখ্য প্রতিভা, যিনি উনিশ শতকের শেষ ভাগে আবার সুরের আকাশে নতুন গুঞ্জন তুললেন তিনিও জার্ম্মান, ভাগনার (Wagner)। ভাগনারের অপেরা রূপ সুর ও সৌন্দর্য্যের বর্ষার মত য়ুরোপের বাতাসকে মধুময় করে তুলল। কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট্য—সমস্তই ভাগনারের অপেরাতে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেল। ভাগনারের সৃষ্টির মধ্যে ছিল অদ্ভুত এক সম্মোহ। তাঁর অপেরার মধ্যে ট্রিস্টান, পার্সিফল ও মাইস্টারসিংগার (Tristan, Parsifal, Meistersinger) য়ুরোপীয় সুররসিক সমাজকে মাতিয়ে তুলেছিল।

এই সময়ে ইটালীতে নতুন জাতীয়তার উদ্দীপনা এসেছে। বুরবন (Bourbon) শাসন, শক্তিমদ অষ্ট্রিয়ার অনাচার এবং পোপের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ইটালীতে চারদিকে বিক্ষোভের বান ডেকে উঠেছে। এই উত্তেজনাকে সুরজাত করলেন ইটালীয়ান ভের্দি (Verdi)। তাই ভের্দির সঙ্গীতে প্রবেশ করেছে শৌর্য্য ও ওজস, শিখায়িত বহ্নির মত জ্বালা বিচ্ছুরণ।

বিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সঙ্গীত তার আদিম ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে। দূর রুশিয়া ও সুদূর ইংলণ্ডে আজ সঙ্গীতের নতুন নতুন আসর রচনা

সোদ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। ভিয়েনা আর লাইপজিগের আধিপত্য মলিন হয়ে গেছে অনেককাল। চেক্ (Czech) দেশে Smetna ও Dverak এবং রুশিয়ায় Tchaikovsky এবং Balakriev ভিন্ন ভিন্ন সাঙ্গীতিক রীতির প্রবর্ত্তন করলেন।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে ইংলণ্ডের দান অতি নগণ্য। সত্যি কথা বলতে গেলে সেদিক দিয়ে তার কোন বড় জাতীয় ঐতিহ্য নেই। তিন শতাব্দী ধরে ইংলণ্ডের সঙ্গীত সাধনা চলে পুরাতন ইটালীয় অপেরাকে ভাঙিয়ে। হ্যাণ্ডেল (Handel) শেষ জীবনে ইংলণ্ডে এসে বসতি করেন। সেই কারণে হ্যাণ্ডেলিয়ান ভঙ্গীর চর্চ্চা ইংলণ্ডে কিছু প্রসার লাভ করে। যখন সমস্ত য়ুরোপ হ্যাণ্ডেলকে অতিক্রম করে গেছে ইংলণ্ড তখনও তার হ্যাণ্ডেলিয়ান রীতিকে ছাড়ে নি।

ইংলণ্ডের গুণীদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় দুজনের মধ্যে। প্যারি (Parry) এবং স্ট্যানফোর্ড (Stanford)। এরা ইংলণ্ডের সঙ্গীতে একটা উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল মাত্র। তার পরে সত্যই একজন প্রতিভাবান সুর শিল্পীর আবির্ভাব হয়—এডোয়ার্ড এলগার (Edward Elgar)। এঁর রীতি ছিল ষোল আনা রোমাণ্টিক। কতগুলি লোকপ্রিয় ওরাটোরিও (Oratorio), সিম্ফনি ও কনসার্টো ইনি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এলগারের সৃষ্টির মধ্যে এমন কিছু প্রতিভার প্রমাণ ছিল না যাতে য়ুরোপের আসরে তার স্থান হতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর সাঙ্গীতিক প্রতিভার মধ্যে তিনজন যশস্বী গুণীর নাম করা যায়—জার্ম্মানীর স্ট্রাউস (Strauss), ফিনল্যান্ডের সিবেলিয়াস (Sibelius) এবং ইংলণ্ডের রাল্‌ফ উইলিয়ম্‌স (Ralph Williams)।

রাল্‌ফ উইলিয়ামসের সুরের ভেতর ইংলণ্ডের জাতীয় সত্তার পরিচয় বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। ইংলণ্ডের ছোট গিরিমালা, উপত্যকা, বনানী ও প্রান্তরের প্রতিধ্বনির মত উইলিয়ামসের সুর। ভাটিয়ালি যেমন বাঙলার গাঙের গান—উইলিয়াম্‌সের সঙ্গীত তেমনি ইংলণ্ডের মাটীর সুরে মাজা।

আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীতের দরবারে বিপ্লবের মত পরিবর্ত্তনের একটা ঝড় এসেছে। চেম্বার মিউজিকের আর সে কদর নেই ; পিয়ানো বাতিল হতে চলেছে। অমন যে সুরপ্রাণ টোনালিটি তাও আজ নীরস বলে মনে হচ্ছে। এমন কি স্বরের সম্মানও সেখান থেকে নির্ব্বাসিত হবার উপক্রম হয়েছে। শোনবার্গ (Schonberg) প্রভৃতিওস্তাদেরা সরল অকৃত্রিম কণ্ঠস্বরের বদলে বিলাপের (Wailing) মত চেষ্টাসাপেক্ষ স্বরের প্রবর্ত্তন করেছেন।

এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে য়ুরোপীয় সঙ্গীতের আর একটা রেনেসাঁস আসন্ন। এই সব বিদ্রোহ ও ভাঙাগড়া তারই পূর্ব্বলক্ষণ। য়ুরোপীয় সঙ্গীত রোমান্স, আবেগ ও ইন্দ্রজাল ব্যতিরেকে আর একটি রসপীঠের সন্ধানে অধীর হয়ে উঠেছে। নইলে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারা তার পক্ষে অসম্ভব। আজ বিজ্ঞান মানুষের শিল্প সাধনার, সঙ্গীতেরও সহায়ক বন্ধু। হয়তো শীঘ্র বাদ্যযন্ত্রেরই এমন একটা অভিনব সংস্কার হবে যার জোরে সঙ্গীতের রীতিনীতি সমূহ ওলটপালট হয়ে যাবে। তা ছাড়া চিন্তার ক্ষেত্রেও আজ যে বিপর্য্যয় চলেছে এবং রুচি ও আদর্শের ঘোর রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাতে সঙ্গীত বিদ্যাকেও নতুন সাজ গ্রহণ করবার লগ্ন উপস্থিত। এবার আশা করা যায় বিজ্ঞানই সংগীতকে নতুন একটি সাজে সাজিয়ে তাকে মানুষের সংস্কৃতির আসরে প্রতিষ্ঠিত করবে।

জাতীয় 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি'

মরুপথে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যিনি জয়শলমীর গেছেন, তিনিই জানেন চারদিকের নিসর্গে কী নিদারুণ শোভার কার্পণ্য। আকাশে মাটিতে একটা বিবর্ণতা ভ্রুকুটী করে রয়েছে। বনজঙ্গলও দেখা যায়, তার মধ্যেও প্রাণপূর্ণ সবুজের সাক্ষাৎ কোথাও পাওয়া যায় না। চারদিকে একটা মলিন ধূসরতা—পোড়া পোড়া ভাব। যাত্রীর চোখ হয়রাণ হয়, কোথায় একটু বর্ণময় প্রসন্নতার আভাষ পাওয়া যায়। এই রুক্ষতার আক্রমণে মনমেজাজ একেবারে তেতো হয়ে যাবার আগেই যাত্রীর চোখে পড়বে উটের গলায় একটি রঙীন অলঙ্কার ঝল্‌মল্‌ করছে। এই অলঙ্কারটির নাম 'গলাবন'। অর্থাৎ টুকটুকে লাল রেশমী কাপড়ের ওপর ছোট ছোট আয়না আর সুশ্বেত কৌড়ি চিত্রিত ভাবে গাঁথা, দুপাশে পেঁজা পশমের ঝালর। শুধু এই নয়, একে একে যেসব সামগ্রী ও উপকরণ চোখে পড়বে এর মধ্যে বর্ণাঢ্যতাই সব চেয়ে প্রবল। পিপাসার্ত্ত হলে উটের চালক একটি কুঁজো থেকে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবে। এই কুঁজোর নাম 'কোপি'। উটের বহিঃচর্ম্মের সঙ্গে যে স্বচ্ছ একটি অন্তশ্ছদ চাম্‌ড়া থাকে, এটা তাই দিয়ে তৈরী। শুধু লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই কোপির গায়ে চিত্রাঙ্কন। বহু বর্ণে রঞ্জিত কোন ইরাণীয় দ্রাক্ষাকুঞ্জ গোলাপবাগ কোন শাহী কেল্লার মিনার শোভা কোপির সুবর্ত্তুল অঙ্গে ফুটে রয়েছে। রং এমনি পাকা যে তেলজল লাগলে মুছে যায় না বা বিকৃত হয় না। একে একে সবই চোখে পড়বে। সহযাত্রী রাজপুতের কোমরবন্ধে তরবারি ঝুলছে। কোমরবন্ধের চামড়ার কাজ সাজ ও ডিজাইন, তরবারির খাপ, মাথার পাগড়ী, পায়ের নাগ্‌রা—সব কিছুর মধ্যে রঙের জলুসটাই সব চেয়ে বেশী প্রকট। সেই মুহূর্ত্তে যাত্রীর মন নৈসর্গিক বিবর্ণতার আক্রমণ থেকে মুক্তি পায়, মানুষের জীবনে শিল্পের মূর্তি ও ক্রিয়ার একটি সূত্র ধরা পড়ে যায়। প্রকৃতি যেখানে কৃপণ, মানুষ সেখানে তার নিজের সাধনাকে এনে শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছে। প্রকৃতির বিবর্ণতাকে হটিয়ে দেবার জন্যই বোধ হয় রাজস্থানে এত বর্ণাঢ্যতা। শিল্পী মানুষ তার প্রয়োজনের দাবীকে ঠিক বেঁধে রেখেছে। আর্টের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যেমন গর্হিত, এবং নিতান্তও তেমনি গর্হিত। তাই সর্ব্বত্র ছন্দ তাল মান ব্যালেন্স ও সামঞ্জস্যের বোধ সকল রুচি ও শিল্প-সৃষ্টির প্রেরণা হিসাব করছে। বাংলা দেশে 'সাদা'র আদর অন্যদেশের তুলনায় বেশী। ঘন সবুজের দেশে 'সাদা' সত্যই একটি রঙ বিশেষ। শেওলা দিঘীর ধারে একটি সাদা বক বসে থাকলে শেওলার সমস্ত দেহে যেন একটা প্রাণের মাত্রা থাকে, নইলে সবটাই সবুজের আবর্জনা মনে হতে পারে। বাংলাদেশের লোকের সাদা ধুতি চাদরের ওপর টান বেশী, এটা স্বাভাবিক।

জীবনযাত্রার উপকরণকে শুধু খাঁটি কাজের জিনিষ হিসাবে তুলেই মানুষের কর্ত্তব্য ফুরিয়ে যায় না। এই কাজের মধ্যেও সুচারুতার আয়োজনকে মানুষের সৃষ্টিবৃত্তির দ্বিতীয় সত্তা বলেই ধরে নিতে হবে। নইলে ঐ কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ যান জীবটার গলায় কৌড়ির মালা পরিয়ে দিতে হয় কেন? হত্যা করার জন্য নিষ্ঠুর অস্ত্র ঐ তলোয়ারটার খাপের ওপর এত নক্সা শেষ পর্যান্ত ভেবে দেখলে মনে হয় যে, প্রয়োজনের বিজ্ঞান আর সজ্জার শিল্প—এই দুটি জিনিষ ভিন্নতর নয়। এরা একাধারে সম্পৃক্ত। এরা উভয়েই বিজ্ঞান অথবা উভয়েরই এরা সহজাত।

সম্প্রতি কলকাতায় 'আর্ট ইন্ ইণ্ডাস্ট্রি' নামে একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল। কাজের

জিনিষকে কতখানি চারুতায় ভূষিত করতে পারে সম্ভবতঃ এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যই তাই। অন্ততঃ নাম থেকে তাই ধারণা হয়। আর একটু জোর করে যদি কোন অর্থ ধরা যায় বলতে হয়—কাজের জিনিষ সৃষ্টিতে আর্ট কতখানি প্রেরণা হতে পারে, এই প্রদর্শনীর সেটাও একটা উদ্দেশ্য। এই প্রদর্শনী দিয়ে কতটা সাফল্যের দাবী কর্‌তে পারে, তার বিচার দর্শক ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল। এ প্রসঙ্গে শুধু কয়েকটি প্রশ্ন তুল্‌তে ইচ্ছে করছে।

আর্ট ইন্ ইণ্ডাস্ট্রি আখ্যাত প্রদর্শনী কি শুধু কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের সুরঙ্গীন বিজ্ঞাপন? বাঁধিপোতার গাম্‌ছার প্রচারের জন্য যদি একটা সাতরঙা পোস্টার এঁকে দর্শকদের সাম্‌নে বিজ্ঞাপিত করা হয়, তবেই কি 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি' সার্থক হলো? মামুলি চেহারার ঐ গামছাটির কোন উন্নতি হলো কি? ব্যবসায়বৃত্তি প্রবল হলে মুনাফার লোভটাই বড় হয়ে ওঠে। তখন পণ্যের উৎকর্ষের চেয়ে পণ্যের প্রসারটাই প্রথম প্রশ্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু আর্টের উপর যদি শ্রদ্ধা থাকে, তবে উৎকর্ষকেই পণ্যের প্রসারের শ্রেষ্ঠ পন্থা মনে হবে। দুর্ভাগ্য, উৎকর্ষ বাদ দিয়ে প্রসার সম্ভব কি না, পণ্য সৃষ্টির ব্যাপারে এইটাই আর্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ফাঁকির আর্ট।

আর একটি প্রশ্ন। প্রদর্শনী অর্থ মিউজিয়ম নয়। কিন্তু সচরাচর আমরা কি দেখি? নতুন পুরাতন, বিশেষ নির্বিশেষে, অচল ও প্রচলিত কতগুলি কীর্তি ও সৃষ্টিকে গ্যালারি করে সাজিয়ে লোকচক্ষুর সাম্‌নে একটা দৃশ্য বিতরিত হয় মাত্র। একেই আমরা প্রদর্শনী বলি। মিউজিয়ম ও প্রদর্শনী—দুটিই শিক্ষাদাতা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু উভয়ের শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মিউজিয়মের প্রভাব ও কাজ ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। প্রদর্শনীর কাজ সাক্ষাৎ প্রেরণা দেওয়া, পন্থা নির্দ্দেশ করা, আদর্শ চিনিয়ে দেওয়া। প্রদর্শনী আপনার রুচি ফিরিয়ে দেবে, শিল্পবোধকে হাতে কলমে গুণান্বিত করবে, জটিলকে সরল করবে, অভাব্যকে প্রাপ্তব্য করে তুলবে। বিদ্যায়তন শুধু ছাত্রদের জন্য, প্রদর্শনী সাধারণের বিদ্যায়তন। এক্ষেত্রে সমস্ত জনসাধারণকেই সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য প্রদর্শনীর। এ ছাড়া প্রদর্শনীর অন্য কোন সৌখীন অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই।

ভারতের ঐতিহ্যগত অথবা জাতীয় 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি' প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা মন্তব্য করতে লোভ হয়। শিল্পের ইতিহাসে ভারতীয় শিল্পীর আর্ট নিষ্ঠার যে পরিচয় আমরা পাই, পৃথিবীর কোন দেশে তার সমতুল্য নিষ্ঠা ও সাফল্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এসিয়া মহাদেশের মাত্র দুটি দেশ ভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে সমকক্ষতা দাবী করতে পারে—চীন ও ইরাণ। কিন্তু ভারতীয় কারুশিল্পের কতগুলি বিশেষ গৌরব ও গুণ আছে, যা অন্য কোন দেশে নেই। ভারতের সেই জাতীয় 'আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রির' ইতিহাস একটু তদারক করে এই বৈশিষ্ট্যের কয়েকটা হেতু আবিষ্কার করা যায়। সেই সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির নিয়ম কারণ ও তাৎপর্য্যের কতগুলি গূঢ় ইঙ্গিত আপনা আপনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ভারতের লৌহশিল্পের ঐতিহ্যের কথা উঠলেই প্রথমে মনে পড়ে অশোকস্তম্ভের কথা। দিল্লীতে কুতব মিনারের কাছে এই নিষ্কলঙ্ক কীর্তিটি আজও পথিকের বিস্ময় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের আরও কতগুলি মুগুা লোহার (Wrought Iron) ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়। দেশীয় রাজ্যের অস্ত্রাগারগুলিতে প্রাচীন লৌহাস্ত্রের অনেক নমুনা আছে। ইস্পাতের কাজ ভারতীয়দের অনধিগত ছিল না। তাঞ্জোরের তৈয়ারী

পৌরাণিক স্টাইলের অস্ত্রশস্ত্র (পরশু, পট্টিশ, অংকুশ, কুঠার ইত্যাদি) উচুঁদরের ইস্পাতের কারুকার্য্যের (Steel-carving) প্রমাণ।

কলাই করা (Tinned Metal) ধাতুপাত্রের ব্যবহার উত্তর ভারতে সুপ্রচলিত। এই শিল্পে কাশ্মীরের শিল্পীরাই সব চেয়ে পটু। কাশ্মীরে তৈরী সুদৃশ্য আফ্‌তবা, তশ্‌ত ও সুরাহির (কুঁজো) গঠন ও কারুকার্য্য যে কোন সৌখীন মানুষের প্রশংসা আকর্ষণ করবে। এই কারিগরী প্রথাটি ইরাণ থেকে আমদানী। তাই কাশ্মীরের ধাতুশিল্পের মধ্যে এসিয়া মহাদেশের বিবিধ ও বিচিত্র ভঙ্গীর এক মহাসমন্বয় দেখা যায়—কফির পেয়ালা ও সিনি (Tray) সমরকন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়, বয়মের (Jar) মধ্যে বোখরার প্রভাব, তামার পাত্রে লাদাখ তিব্বতের স্মৃতি। সব চেয়ে শুনতে আশ্চর্য্য লাগে 'মার্ত্তাবান' নামে বয়মের কথা। নাম থেকে বোঝা যায়, এই বয়মের আদি নিবাস ব্রহ্মদেশ। ভারতীয় শিল্পের আহরণে পড়ে এই মার্ত্তাবান আজ একেবারে ভারতীয় হয়ে গেছে। কাশ্মীর মূলতান থেকে আরম্ভ করে মোরাদাবাদ পর্য্যন্ত—ভারতের গ্রাম্য কারিগরের কাছে আজ এই শিল্পের ডিজাইনটি একেবারে হাতের পাঁচ হয়ে গেছে।

মীনার কাজে (Enamelling) ফ্রান্স ও জাপানের সুনাম থাকলেও ভারতের জয়পুরের কাছে সকলকে হার মানতে হয়। গাঢ় লাল রঙ ফুটিয়ে তুলতে জয়পুরী কারিগরের মত কাজ আজও কেউ দেখাতে পারেনি। জয়পুরী মীনাকরেরা মন্ত্রগুপ্তির মত এই শিল্প রহস্যকে একেবারে ঘরানা করে রেখেছে।

পাতের কাজে (Plating) ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর প্রাচীনতা সম্বন্ধেও কোন সংশয় নেই। সোনা আর রূপার পাতের কাজই দেখবার মত। দক্ষিণ ভারতের শিল্পরীতি সাধারণত 'স্বামী' পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতির মধ্যে পৌরাণিক মূর্তিকে (নন্দী, চামুণ্ডা প্রভৃতি) রূপায়িত করাটাই ডিজাইনের সার কথা। সোনা ও রূপার পাতের কাজে স্বামী রীতির খুবই উৎকর্ষ দেখা যায়। কাশ্মীরী পাতের কাজে ইয়ারকন্দ, লাসা ও চুনারের ভঙ্গী এসে মিশেছে। গোলাবপাশ (Sprinkler), আসাসোটা (Mace) আতরদান পানদান প্রভৃতি আসবাবের মধ্যে পাতের কাজের দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা খুবই অগ্রসর হয়েছে।

তারের কাজের (Filigri) ইতিহাসে একটা আন্তর্জ্জাতিকতার কাহিনী লুকিয়ে আছে। ঠিক একই ধরণের কাজ আরব মাল্টা জেনোয়া নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক ও গ্রীসে এবং ভারতের কটকে দেখা যায়। কটকের গ্রাম্য রৌপ্যকারের দশ বছর বয়সের ছেলেও এই 'রূপোর সুতো' তৈয়ারীর কাজে সুপটু। এই সুতো দিয়েই তারপর নানারকম সুগন্ধির আধার ইত্যাদি তৈরী করা হয়। কটকের শিল্পীর সবচেয়ে প্রশংসনীয় গুণ হলো এই যে, তারা যেসব নগণ্য উপচার নিয়ে যত অল্প সময়ের মধ্যে তারের কাজ সারতে পারে, অন্য দেশের শিল্পীদের দক্ষতা সেই পর্য্যায়ে পৌঁছয়নি। আরও প্রশংসা করতে হয়, এই কাজে তাপতত্ত্ব সম্বন্ধে সমূহ জ্ঞান না থাকলে শিল্প ব্যর্থ হয়ে যায়। কটকের শিল্পীদের এই ঐতিহ্যলব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে।

কোফ্‌তগারী (Damascening) নামে ভারতে বহুপ্রচলিত এক শিল্প আছে। কোন ধাতুপাত্রের উপর এক বা ততোধিক ভিন্ন ধাতু দ্বারা অলঙ্কৃত করাকেই কোফ্‌তগারী শিল্প বলে। সাধারণতঃ লোহা বা ইস্পাতের পাত্রের উপর সোনা-রূপার কাজ করা হয়ে থাকে। শিখ রাজত্বের সময় পঞ্জাবে অস্ত্রশস্ত্রের ওপর কোফ্‌তগারী কাজের খুবই চলন দেখা

দিয়েছিল। বর্ত্তমানে শিয়ালকোট, যোধপুর , জয়পুর ও তাঞ্জোরে কোফ্‌তগারী শিল্প বেঁচে আছে। কোফ্‌তগারী প্রসঙ্গে একটি দেশীয় স্টাইলের নাম মনে পড়ে যায়—গঙ্গা-যমুনা রীতি। শুধু কোফ্‌তগারীতে নয়, তারের কাজে ও পাতের কাজে গঙ্গা-যমুনা রীতির বেশ আদর আছে। একই সঙ্গে সোনা ও রূপা মিশাল কাজকে গঙ্গা-যমুনা রীতি বলে।

বিদ্‌রী শিল্প—নিজাম হায়দারাবাদের বিদার সহরের নাম থেকে এই শিল্পটি পরিচিত। ২৪ ভাগ টিন ও ১ ভাগ তামা মিশিয়ে যে মিশ্র ধাতু তৈরী হলো, তাই দিয়ে তৈরী সামগ্রী সাধারণতঃ বিদ্‌রী নামে পরিচিত। বিদ্‌রীর রং কালো, কখনো ফিকে হয় না, মরচে পড়ে না, ওজনে ভারী। বিদ্‌রী ধাতুর তৈরী পাত্রের ওপর মীনা কোফ্‌তগারী সহজেই নিষ্পন্ন করা যায়। বাংলা দেশের কাঁসা পিতল ধাতু শিল্পে ভারতীয় উন্নতির আর একটি নিদর্শন। বিদ্‌রী কাঁধে লোটা (ঘটি) ভারতীয়দের নিত্য প্রয়োজনের সঙ্গী। এই লোটার একটু রোমান ঘনিষ্ঠতা আছে (Latin 'Lotus' Washed)।

তামা আর পিতলের পাত্রের ব্যবহার ভারতে সর্ব্বত্র। পূজোপকরণে তামার বিশুদ্ধতা শাস্ত্রমতে গ্রাহ্য। বিজাপুর, এবং ত্রিবাঙ্কুরে পিতলশিল্পের গঠনরীতিতে এখনো প্রাচীন রীতির প্রভাব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। চালুক্য যুগের পদ্ধতি এর মধ্যে বেশী প্রকট। তাম্রাধারগুলি গোল বর্ত্তুল বা অষ্টকোণাকৃতি—চালুক্য যুগের মন্দিরগঠনের রীতির সঙ্গে এই রীতির একটা সাদৃশ্য আছে।

ভারতের প্রস্তর শিল্পের বিরাট ইতিহাসের পেছনে আর একটি এইরকম বিরাট শিল্পের কীর্তি আজ আমাদের কাছে একেবারে অগোচর হয়ে গেছে—ভারতের দারুশিল্প। বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতির যেসব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের নিদর্শন পাওয়া যায়—তার মধ্যে সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজ দেখলে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তার আগের যুগে শিল্পীসম্প্রদায় কাঠের মত অপেক্ষাকৃত নরম আধারের পরেই তাদের হাত পাকিয়ে নিয়েছিল। দারুশিল্পের সেই ঐতিহ্যই ক্রমে ক্রমে পাথরের গায়ে এসে পড়েছে। কিন্তু সেই প্রাচীন দারুশিল্পের কোন বড় কীর্তি আজ আর বেঁচে নেই। আজ তবু পাষাণের কথা বেঁচে আছে, কিন্তু কাঠের কাহিনী একেবারে পুড়ে গেছে বা পচে লুপ্ত হয়ে গেছে। কাঠের এই নশ্বরতায় ব্যথিত হয়েই কি শিল্পীরা কঠিন পাষাণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল? হতে পারে। মৃত মহেঞ্জোদাড়ো নগরের কবরে যে পরিমাণ কয়লার সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় সেই প্রাগার্য্য মহানগর সে যুগের শ্রেষ্ঠ দারুশিল্পের গর্বে মোড়া ছিল। আকস্মিক কোন অগ্নিকাণ্ডের ফলে সেই শিল্পগরিমা ভস্মীভূত হয়েছিল। ভারতের প্রাক্-ইসলামীয় পাষাণ শিল্পে (মূর্ত্তি গঠনে) কিছু কিছু গ্রীক প্রভাবের আমদানির কথা জানতে পাওয়া যায় (দৃষ্টান্ত : গান্ধার রীতি)। কিন্তু স্থাপত্যে ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবনাই বরাবর প্রধান ছিল। ইস্‌লামীয় যুগে প্রথম প্রথম রাজকীয় প্রচেষ্টার সব স্থাপত্য কীর্ত্তিগুলিই প্রধানত তুর্ক ও ইরাণীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছিল। সম্রাট আকবরের সময় থেকে ভারতবর্ষেও যেন য়ুরোপীয় রেণেসাঁসের হাওয়া একটু একটু জাগতে আরম্ভ করলো। ফ্রান্সে ও ইতালিতে যেমন অখৃষ্টান শিল্প মহলে একটা সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে নতুন পরিবর্ত্তনের অধ্যায় আহ্বান করেছিল, ভারতে সম্রাট আকবরও তেমনি অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দু শিল্পরীতিকে মুসলমান রাজকীয় কীর্ত্তির মধ্যে স্থান দিলেন। আগ্রার কেল্লা, ফতেপুর সিক্‌রীর প্রাসাদ ও সেকেন্দ্রার সমাধি রচনার মধ্যে সম্রাট আকবর হিন্দু স্থাপত্যের বহু রীতির জের রেখেছেন। ভারতের

স্থাপত্যে আর একটি বিপ্লবের সূচনা করলো আর একটি ঘটনা। সম্রাট আকবর জাহাঙ্গীর ও শাজাহান—এঁরা সকলেই স্থাপত্য রচনায় হিন্দু শিল্পীদের নিয়োগ করতে কোন দ্বিধা করেন নি। তার ফলে যেমন নিছক ইসলামীয় রীতির মধ্যে হিন্দু ওস্তাগরের প্রতিভার ছায়া পড়লো, তেমনি নিছক হিন্দু রীতির মধ্যে অভারতীয় (তুর্ক-ইরাণ বা সারাসেনীয়) পদ্ধতির প্রবেশ নিষিদ্ধ রাখা গেল না। এই সময়ের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ভারতে এমন কোন হিন্দুমন্দির রচিত হয়নি যার গঠন-রীতিতে সারাসেনীয় প্রভাব পড়েনি। পাথরের সুন্দর একটি নমুনা যোধপুরী ঝরোকা। এর মধ্যে প্রাচীন হিন্দু রাজপুত পদ্ধতি বজায় থাকলেও কিছুটা ম্রিয়মান হয়েছে নিশ্চয়। সে সঙ্গে অভারতীয় সারাসেনীয় প্রভাব নানা ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঝরোকা, জালি, চবুতরা, ছত্রী ইত্যাদি রাজপুত স্থাপত্যের রচনার মধ্যে হিন্দু অনুশাসন অতিক্রম করে ইস্লামীয় প্রভাব ক্রমে মিশে গেছে। কোনমতেই আট্‌কে রাখা সম্ভব হয় নি। অবশ্য সেই পুরাতন কালেও সে রকম কোন 'কৃষ্টি রক্ষার' প্রচেষ্টা হয়েছিল কি না, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিল্পের ব্যাপারে ছুৎমার্গ আজকের ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানের এক শ্রেণীর মাথার ব্যারাম মাত্র।

প্রস্তর শিল্পে সাধারণত শ্বেতমর্ম্মর, লাল বেলেপাথর, রামখড়ি (Soap stone), নকল ফিরোজা ও সুলেমানী পাথরের কাজ দেখা যায়। নকল জড়োয়ার কাজ ভারতে প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত। প্লিনির লেখায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাম্বে প্রদেশে রতনপুর নামে একটি গ্রামে পাথরের টুক্‌রাকে যে উপায়ে রঙ করে রত্নখণ্ডের মত তৈরী করা হয়, সে-শিল্প একমাত্র এই গ্রামটিরই নিজস্ব। চশ্‌মদা (Cat's eye) ও বাবা ঘোরী (Onyx) নামে পাথর স্বাভাবিক ভাবে এখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায়। অন্যান্য নগণ্য চেহারার পাথরের নুড়ি গুলিকে ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে নেয়। তার ফলে নুড়িগুলির গায়ে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ ফুটে ওঠে। এই নুড়ির খাঁটিত্ব যাচাই করতে জহুরী গলদ্‌ঘর্ম হয়। আগ্রার তাজমহলের রচনায় অনেকে ফারেন্টাইন প্রভাব দেখতে পান। অর্থাৎ লাল বেলে পাথরের ওপর শ্বেত মর্ম্মর গাঁথবার ভঙ্গী থেকেই অনেকের মনে এই সংশয় উপস্থিত হয়। স্যার জর্জ বার্ডউড এবিষয়ে গবেষণা করে বলেছেন যে এই ধরণের মার্বেলের গাঁথুনি ভারতে শাজাহানের আগেই প্রচলিত ছিল। এর প্রমাণ স্বরূপ দিল্লীর কাছে হুমায়ুনের সমাধির গঠনরীতি দ্রষ্টব্য। তাজমহলের ইঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি ছিলেন জনৈক ভেনিস বাসী, এই কিংবদন্তীর সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

বর্ণক (বা Glazing) মৃৎশিল্প সভ্যতার একটি মাপকাঠি। ভারতের মৃৎশিল্পের প্রচলন প্রাচীন কাল থেকেই আছে। কিন্তু সভ্যতরতার প্রমাণ হলো মসৃণ মৃৎশিল্প (Glazed Pottery)। মৃৎশিল্পে মসৃণতা সম্পাদনের রীতি নাকি ভারতীয়দের জানা ছিল না। এই প্রথা আসে মুসলমানদের সঙ্গে। কাহিনী আছে, চেঙ্গিস খাঁ তার স্ত্রীর সঙ্গে চীনদেশ থেকে মসৃণ মৃৎশিল্প আমদানী করেন। তারপর এই শিল্প পারস্যে চালান হয়, সেখান থেকে ভারতে আসে। কিন্তু এই ধারণা খণ্ডিত হয়েছে ভারত সীমান্তের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য্যের আবিষ্কার থেকে। অতি প্রাচীন কালের মসৃণ মৃৎপাত্রের টুকরা পাওয়া গেছে। এই আবিষ্কারের কথা বাদ দিলেও, আরো প্রমাণ আছে। মাদুরা প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় নগরে এখনো খাঁটি দ্রাবিড় মৃৎশিল্পে এই চেক্‌নাই বা মসৃণতা সৃষ্টির বিদ্যা সজীব হয়ে আছে। মৃৎশিল্পী কুম্ভকারেরা অধিকাংশ হিন্দু, কিন্তু কুজাগর (যারা মৃৎশিল্পের ওপর চেক্‌নাই তোলে বা গ্লেজ করে)

সম্প্রদায় মুসলমান। ভারতবর্ষে পোড়া মাটীর (Terra-cotta) সামগ্রী সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি কালো রঙের (Black Pottery) শ্রেণী আছে। গ্রীস দেশেও প্রাচীন কাল থেকে এই ধরণের মৃৎপাত্রের ব্যবহার প্রচলিত। কাঁচা মাটীর পাত্র পোড়াবার সময় চুল্লীর ধোঁয়া চুল্লীর ভেতরেই আবদ্ধ করে রেখে পাত্রগুলিকে এইভাবে কৃষ্ণকায় করা হয়। মৃৎশিল্পকে রঞ্জিত ও চিত্রিত করার প্রথা সভ্যতমতার প্রমাণ।

ভারতবর্ষে কুম্ভাগরেরাই মৃৎপাত্রকে মসৃণ করা ও রঞ্জিত করা উভয়বিধ কাজ করে থাকে। সাসারামের রঙীন মৃৎশিল্পে ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় আছে। সাসারাম স্টাইল শুধু সাসারামের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। এখান থেকে বিশ মাইল গেলে এই স্টাইলের চিহ্ন পাওয়া যায় না। অথচ শের শাহের আমল থেকেই এই মৃৎশিল্প প্রচলিত। স্টাইলের এই যুগব্যাপী কূপমণ্ডুকতা থাকা সত্ত্বেও স্টাইলের কেন মৃত্যু হলো না, সেটাই বিচার্য্য বিষয়। শের শাহী স্থাপত্যের (শের শাহের সমাধি ইত্যাদি) মধ্যে যে স্থাপত্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান, সাসারামী মৃৎশিল্পে তার বিপরীত ব্যাপার দেখা যায়—রঙের প্রাচুর্য্য। এটা হিন্দুসুলভ গুণ। বাংলা দেশের কুম্ভকারেরাই একাধারে ভাস্কর ও চিত্রকর। মৃৎশিল্পে কৃষ্ণনগরের দক্ষতার কথা সবাই জানেন। পেশোয়ারী মৃৎশিল্পের চেকনাই অতুলনীয়। রোমান মেজলিকার (Majolica) মত পেশোয়ারী শিল্পীরা এক মিশ্র-মৃত্তিকা চূর্ণ তৈরী করার আর্ট জানে। খৈবারের খড়িমাটী ও লালমাটীর ওপর প্রলেপ দিয়ে তারপর সফেদার সল্যুশনে চূর্ণ চেক্‌নাই তোলা হয়। রঙীন করার জন্য খৈবারের লালমাটী, পাথর এবং নীল লাজবর্দ (Cobalt) ব্যবহার করা হয়। জয়পুরী মৃৎশিল্পের উপাদান হলো, কামচিনি অর্থাৎ বরবরা (Felspar) গুঁড়ো করে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া হয়। মূলতানও এই শিল্পে বিখ্যাত। ভারতে রঙীন টালির আমদানী হয় মুসলমানদের সময়। বেলুচিস্তান ও পারস্যের গা ঘেঁসে থাকায় মূলতানের শিল্পে ইরাণীয় প্রভাব খুবই প্রবল। মূলতান রঙীন টালির একটী আড্ডা।

ঠিক প্লাস্টার অব প্যারিসের (Plaster of Paris) মত এই জাতীয় একটি জিনিষের ব্যবহার ভারতে প্রচলিত আছে। এটি ভারতেরই প্রতিভার উদ্ভাবনা। চল্‌তি কথায় একে চুনাম বলা হয়। চুণ বালি এবং মর্ম্মর পাথর একসঙ্গে গুঁড়িয়ে কোন আঠাল পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে এই 'মাটী' তৈয়ারী করা হয়। রাজস্থান ও দিল্লীতে এই প্রথা চালু আছে।

মোজেয়িকের (Mosaic) কাজ ভারতে সাধারণত সীসের কাজ নামে আখ্যাত। অবশ্য সীসের কাজ বলতে প্রধানতঃ সিমেন্ট জাতীয় (চুনাম প্রভৃতি) মৃত্তিকার ওপর কাঁচা ও নরম অবস্থায় ছোট ছোট আয়নার টুক্‌রো বসিয়ে দেওয়া বোঝায়। (দৃষ্টান্ত : লাহোরের সীস মহল)

ভারতের দারুশিল্পে বা কাঠের কাজে তিনটি রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়—প্রাচীন হিন্দু, ইস্‌লামীয় এবং শিখ রীতি। প্রথমেই মনে পড়ে ভারতীয় দারুশিল্পের পিঁজরার কাজ (Lattice work)। পিঁজরার কাজ ভারতীয় দারুশিল্পে উন্নতরুচির বাহক। আধুনিক কালে য়ুরোপীয় রুচির গৃহসজ্জার আসবাব বা ফার্ণিচার প্রভৃতির দ্বারা ডিজাইনের প্রতিযোগিতা পিঁজরার কাজের অধঃপতন ঘটিয়েছে। ভারতীয় ক্লাসিক দারুশিল্পের প্রভাব আজও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দরজা জানালা তৈয়ারীর ও পরিকল্পনার মধ্যে বেঁচে আছে। পঞ্জাব স্থাপত্যে বোখরচা (Balcony), তিলি (Panel), গম্বুজ (Dome) গঠনের মধ্যে বিস্ময়কর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশ্মীর দারু-স্থাপত্যে এই পিঁজরার কাজ কোন কালে বহু

প্রচলিত ছিল। গুণে ধর্মে কাশ্মীরী শিল্পীরা ষোল আনা ইরাণীয়। কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দিরে এবং অবন্তীপুরের স্থাপত্যে প্রাচীন গ্রীক স্টাইলের প্রভাবটিই সর্ব্বস্ব। কিন্তু সে-অধ্যায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে কাশ্মীরী দারু শিল্পে কোন বনেদি ঐতিহ্যের রেশ খুঁজে পাওয়া যায় না, য়ুরোপীয় ভঙ্গী হালে আমদানী হয়েছে। নেপাল দারুশিল্পের একটি বড় আশ্রয়। কিন্তু এর মধ্যে ভারতীয় রীতির প্রভাব খুব অস্পষ্ট। চীন এবং তিব্বতী স্টাইলই শিল্প-জীবনে জাগ্রত হয়ে আছে। গ্রোটেস্ক (Grotesque) রচনায় নেপালের দক্ষতা বেশী। ড্রাগন নামে যে-উদ্ভট দানবের অস্তিত্ব য়ুরোপ ও এশিয়ার মূর্ত্তিশিল্পে ছড়িয়ে আছে, ভারতবর্ষের মধ্যে (?) একমাত্র নেপালেই তাকে পাওয়া যায়। নেপালী শিল্পের 'বিজলি' প্রকৃতপক্ষে সেই সুবিখ্যাত ড্রাগন।

দক্ষিণ ভারতের দারুশিল্পে চালুক্য স্টাইল সজীব। দক্ষিণী হিন্দু মন্দিরশিল্পের টেক্‌নিক্ অনুসরণ করেই এই দারুশিল্প আজও চালু হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে সূক্ষ্ম চারুতার বিকাশ যেন ক্রমে ক্রমে ব্যাহত হয়েছে। বিরাটত্ব ও কেরামতীর ভাবটাই প্রবল। আর্টের ক্ষেত্রে কেরামতীর আধিক্য অবনতির সূচনা করে। দক্ষিণী শিল্পে শেষ দিকে এই লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। নিরেট পাথরকে কেটে কুঁদে হয়তো একটি দানবের মুখ তৈরী করা হলো, কিন্তু এর মধ্যে এত বেশী কেরামতী দেখাবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে যে শিল্পীর রসবোধ প্রশংসা করার কিছুই থাকে না। দক্ষিণী শিল্পের এই দানবের পাথরের জিভটি হয়তো ঝুলে আছে, দর্শক হাত দিয়ে সেটাকে নাড়লে ঠিক নড়ে ওঠে ; কিন্তু টেনে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কোন দেবতার একটি বিরাট পাথরের রথ তৈরী করা হলো, এই রথের চাকা এমন ভাবে তৈরী যে ছেলে মানুষে হাত দিয়ে তাকে এক পাক ঘুরিয়ে দিতে পারে, অবশ্য স্বয়ং রথটি একেবারে অনড় এবং মাটির সঙ্গে গ্রথিত। একটি তেঁতুল বীজকে দু'বছর ধরে ছুঁচ এবং ছুরি দিয়ে কাজ করে হয়তো একটি বংশীধর কৃষ্ণের মূর্ত্তি তৈরী করা হলো। এই কেরামতীর মধ্যে কী নিদারুণ শ্রমের অপচয় হয়ে থাকে, সেটা সহজেই অনুমেয়। আর্টিষ্টকে যখন এই ধরনের সার্কাসী মনোভাব পেয়ে বসে ঠিক তখন থেকেই আর্টের দুর্গতি সুরু হয়। দক্ষিণী ভাস্কর্য্যের এই শিক্ষা আর্টের অন্যান্য ক্ষেত্রে (সাহিত্য কাব্য চিত্র সঙ্গীত নৃত্য) প্রয়োগ করে আমরা শিল্প জগতের এই নিয়মটি বিশ্বাস করতে পারি।

ভারতের কাঠের কাজের মধ্যে চন্দন কাঠের কাজে সূক্ষ্ম কলাসৌন্দর্য দেখা যায়। ভারতের কাঠের পুতুলে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক জীবনের কাহিনী গুপ্তভাবে রক্ষিত। একটু বিশ্লেষণী বুদ্ধি দিয়ে খোঁজ করলেই অনেক তথ্য ধরা পড়ে।

সাদেলী কাজ ভারতের দারুশিল্পের একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি । এই পদ্ধতি প্রায় তিনশো বছর আগে পারস্যের শিল্প শহর থেকে আসে। কাঠের তৈরী সামগ্রীর ওপর গজদন্ত, শিং মেহগনি বা রূপার পাতে গড়া এক একটি প্যাটার্ণ আঠা দিয়ে বসিয়ে দেওয়ার কাজকেই সাধারণতঃ সাদেলী কাজ বলে।

কামানগিরি (Wood Painting) কাজ। পাঞ্জাবের মুজঃফরগড়ে তীর ধনুক (ধনুক কামান) একটি বিশিষ্ট শিল্প। কিন্তু বর্ত্তমানে কামানগিরি বলতে সাধারণতঃ কাঠ রঙীন করার শিল্পকেই বোঝায়। বিকানীরের কাঠের দরজা ও দেয়াল রঞ্জিত ও চিত্রিত করা হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, চিত্রিত বিষয়ের মধ্যে ঝড়-বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, শিলাপাত ও মেঘ যেভাবে আঁকা হয়, তার সঙ্গে কোন চীনা চিত্রের পার্থক্য নেই। 'Papier Mache' নামে শিল্প (কাগজের

মণ্ড থেকে শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী) এককালে কাশ্মীরে প্রচলিত ছিল এবং সৌন্দর্য্যে ও সৌকর্য্যে ইরাণের সমকক্ষতা লাভ করেছিল। বর্ত্তমানে কাশ্মীর থেকে এই শিল্প লুপ্ত। রাষ্ট্রীয় ঔদাসীন্য এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। গোড়ার গলদ হলো শিল্পীদের অপরিসীম দারিদ্র্য। কাশ্মীরী 'পাপিয়ে মাশে' ঠিক য়ুরোপীয় প্রথায় কাগজের মণ্ড থেকে তৈরী করা হয় না। ভেজা কাগজ স্তরে স্তরে সাজিয়ে শুকিয়ে, তার ওপর প্লাস্টার অব প্যারিস বা গচ নামে সিমেণ্ট জাতীয় 'মাটী'র প্রলেপ দিয়ে পালিশ ও রঙীন করে নেওয়া হয়।

ভারতের গজদন্ত শিল্পের (Ivory) প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি বিস্ময়কর ঐতিহাসিক তথ্যের কথা বলে নিতে হয়। ভারতবর্ষে হাতীর দাঁতের জিনিষ নামে যেসব পণ্য ও শিল্প প্রচলিত, তারা সবই বিশুদ্ধ হাতীর দাঁতের তৈরী নয়। নানা রকম কৌটা বোতাম খেল্না ও ছুরি তরবারির হাতল যে-হাতীর দাঁতের তৈরী, সেটা ঠিক হাতী নয়—সেটা ম্যামথ। কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না, কিন্তু সত্য। অমৃতসর বেড়াতে গিয়ে কোন ছোট রেলস্টেশনে ফেরীওয়ালার কাছ থেকে যে সৌখীন যাত্রী একটি নসির ডিবে কিন্‌লো, সে সেই মুহূর্ত্তেও জানে না যে ৫০ লক্ষ বছর আগেকার একটি প্রাচীন জীবের অস্থি দিয়ে তার এই সখের সামগ্রীটি রচিত। এই সস্তা 'হাতীর দাঁত' সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের বাইরে থেকে স্থলপথে চালান আসতো। তুষার অধ্যুষিত সাইবেরিয়া থেকে এই ম্যামথের অস্থি নিয়মিত ভাবে চালান যায়। সাইবেরিয়ার তুষারভূমির অন্তরালে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তুর বিরাট সমাধি লুকিয়ে আছে। ম্যামথের হাড় খুঁড়ে বের করা সেখানে একটি খনিজ (?) শিল্প। ওয়েণ্ডেল উইল্কি কয়েক বছর আগে সোভিয়েট রুশিয়ার ইয়াকুতস্ক রেপাব্লিকে পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। তিনিও সেখানে দেখে এসেছেন—'A sizable ivory industry has been built, curiously enough, on the tusk of mammoths, prehistoric animals which once ranged over this area and have been preserved ever since Arctic cold storage'. এই কারণেই বোধ হয় ভারতের কোন কোন স্থানে এই চালানী গজদন্তকে 'মছলি কা দাঁত' বা মাছের দাঁত বলে।

ভারতের গজদন্ত শিল্পে আফ্রিকার ঐরাবত-জগতের আত্মদান কম নয়। মোজাম্বিক ও জাঞ্জিবার থেকে নিয়মিত ভাবে গজদন্তের চালান আসে। তাছাড়া খাস ভারতীয় হাতী আছে। ভারতের সর্ব্বত্র গজদন্ত প্রচলিত। লক্ষ্য করার বিষয় হলো গজদন্ত শিল্প কোন জাত বা সম্প্রদায়ের হাতে নেই। কোথাও সূত্রধরেরাই কুঁদিকারের (গজদন্ত শিল্প) কাজ করে, কোথাও স্বর্ণকার বা রৌপ্যকার এবং কোথাও মুসলমান ধর্ম্মের লোক। এই কারণে বলা হয়, ভারতের গজদন্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু পৌরাণিক আখ্যায়িকা থেকে এই অভিমত সমর্থন করা যায় না। সিন্ধুর ব্রাহ্মিণাবাদ শহরের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে গজদন্তের তৈরী দাবার ঘুঁটি আবিষ্কৃত হয়েছে। গজদন্ত শিল্পে এই ঘুঁটিগুলিই প্রাচীনতম নিদর্শন। অষ্টম শতকে ব্রাহ্মিণাবাদ শহর ভূমিকম্পের ফলে বিধ্বস্ত হয়েছিল। সাঁচীর একটি ফটকে উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় যে—'বিদিশার গজদন্ত শিল্পীরা এই স্তূপের স্থাপত্যে কারুকার্য্য করেছিল।' যাই হোক, গজদন্ত শিল্প ভারতীয় জীবনে একটি সজীব শিল্প। পৌরাণিক দেবী থেকে সুরু করে নর্ত্তকীর বেণীর চিরুনিতে পর্য্যন্ত হাতীর দাঁতকে কাজে লাগানো হয়েছে। এর মধ্যেও ভারতীয় ঐতিহ্যগত প্রস্তরশিল্প ও দারুশিল্পের টেকনিক অনুসরণ করা হয়েছে।

মোষের শিঙ, ঝিনুক, কচ্ছপের খোলা, শঙ্খ, সজারুর কাঁটা, মাছের আঁইস, পালক, অশ্ব পুচ্ছ ইত্যাদি জীবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অবশিষ্ট দিয়ে তৈরী ভারতে একটি বিরাট সজীব শিল্প রয়েছে। কোন কোন প্রদেশে শিল্পীদের এই সব এক একটি জাতিগত পেশা। হিন্দুর কাছে চামর ও মৃগাজিনের মত শুদ্ধ জীবদেহের তৈরী শিল্পের মত বাইসনের শিঙের জিনিষও শুদ্ধ। দক্ষিণী ব্রাহ্মণেরা বাইসনের শিঙের পূজোপকরণ ব্যবহার করে।

চর্ম্মশিল্পে ঘোড়ায় জীন (Saddle) ভারতের একটি বিশিষ্ট শিল্প। এর মধ্যে ভারতীয় সুলভ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও অলঙ্করণ সবই আছে। বই বাঁধবার কাজে চামড়ার ব্যবহার মুসলমানদের প্রবর্ত্তিত। আলোয়ার লাইব্রেরীর সাদীর গুলিস্তান কাব্যটির চামড়া বাঁধাই দেখলে চর্ম্মশিল্পেও ভারতের উচ্চ রুচি ও কলাজ্ঞানের অতুলনীয় দক্ষতা স্বীকার করে নিতে হয়। ঢাকার শাঁখারীর শঙ্খশিল্প পৃথিবীতে অদ্বিতীয়।

লাক্ষারঞ্জিত (Lac work) দ্রব্য ভারতে সুপ্রচলিত। শুধু রঞ্জনকার্য্যের জন্য নয়, লাক্ষারই নানারকম সামগ্রী ও অলঙ্কার তৈরী হয়ে থাকে। ধাতুনির্ম্মিত ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত সামগ্রীর ওপর লাক্ষার কাজ ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি। ল্যাকার কাজ (Lacquer) নামে একটি শিল্প ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে আমদানী হয়। ল্যাকার একটি উদ্ভিজ্জ তৈল মাত্র, এর সঙ্গে রঙ মিশিয়ে গাঢ় ও আঠাল করে নিয়ে শিল্পকাজে ব্যবহার করা হয়।

ভারতবর্ষে এই ল্যাকার ধরণের একটি বিশিষ্ট শিল্পপদ্ধতি আছে—গেসো'র কাজ। কোথাও কোথাও একে মুনাবাতি'র কাজ বলা হয়। শঙ্খচূর্ণ বা খড়িচূর্ণের সঙ্গে বেলের আঠা মিশিয়ে একরকম আস্তর (বা Stucco) তৈরী করা হয়। এই আস্তর দিয়ে কাঠ পাথর, এমন কি কাঁচের ওপরেও প্রলেপ দেওয়া যায়। গেসোর ওপর রং পাকা হয়ে ধরে। বিকানীরের রায় নিবাসের সমগ্র দেয়াল গেসোর কাজ করা। রাজপুতানার তোঁক নামে দেশীয় রাজ্যে চামড়ার ঢালগুলি পর্য্যন্ত গেসো প্রথায় সুচিত্রিত ও রঞ্জিত করা হয়। তোঁকের গেসোর সঙ্গে জাপানী ল্যাকারের খুবই সাদৃশ্য। তোঁকে গেসো কারিগরদের মধ্যে একটা কিম্বদন্তী আছে যে তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুস্থানের লোক নয়, তারা কোন সুদূর পূর্ব্বদেশ থেকে এসেছিল। এই কিম্বদন্তীর মধ্যে জাপানী-রীতির প্রভাবের রহস্য খানিকটা ধরা পড়ে। চিত্রিত বিষয়ের মধ্যে মেঘ বজ্র ও বিদ্যুতের আধিক্য জাপানী-রীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ।

ভারতের বস্ত্রশিল্পে একটি অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভাবনা বা পদ্ধতি আছে। পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও এর চিহ্ন নেই। এই কাপড় সাধারণত 'আফ্রিদি মোমের কাপড়' নামে প্রচলিত। মোমজাম ও অয়েলক্লথ নামে যে কাপড় সবদেশেই প্রচলিত, সেটা ঠিক এই ধরণের জিনিস নয়। সাধারণ কাপড়ের ওপর গলিত মোমের প্রলেপ দিয়ে মোমজাম হয়। কিন্তু আফ্রিদি মোমের কাপড় সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কুসুম ফুলের বীজ থেকে (Carthamus Oxyacantha) তেল বার করে সেই তেল ১২।১৩ ঘণ্টা জলে সেদ্ধ করে ঠাণ্ডা জলে ফেলে রাখা হয়। এখন এই চিটে মোমের মত বস্তু বা রোগনের সঙ্গে রঙ মেশানো হয়ে গেলে তাক্‌লি প্রথায় এর থেকে সুতো টেনে বার করা হয়। এই পদ্ধতির মৌলিকতা আফ্রিদি প্রতিভার দান হলেও ভারতে নানাস্থানে এই পদ্ধতি প্রসার লাভ করে। বরোদাতে রেড়ীর তেলকে সেদ্ধ করে এই ধরণের প্লাস্টিক সুতো তৈরী করা হয়। এই পদ্ধতিটি ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হতে চলেছে।

টোপ তোলা (Embossing)—যদিও সর্ব্বপ্রকার ধাতু, কাঠ ও চামড়ার ওপর টোপ তুলে নক্সাকে রূপায়িত করা আধুনিক কালের কারুকলার একটি রেওয়াজ, ভারতীয় ক্লাসিক

ও জনগত কারুশিল্পে এই পদ্ধতি বহু প্রাচীন কাল থেকে সুরু করে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তিয়ে আছে।

খচিত শিল্প (বা Marquetry বা Inlaid work)—ভারতবর্ষের পদ্ধতি বিদেশেও অনুকরণ হয়েছে। যে কোন ধাতু বা কাঠ কাঁচ ও চামড়ার ওপর অপর যে কোন একটি ধাতু বা বেলোয়ারী জড়োয়া পাথর ইত্যাদি খচিত করা ভারতীয় শিল্পীর কাছে একটি সুসাধ্য পদ্ধতি। 'বলায়াবনদ্ধ তাম্রাশ্ম'—এর মধ্যে ভারতীয় খচিত শিল্পের (বা Inlaid work) প্রাচীনতার আভাষ আছে বৈকি।

ভারতের বয়নশিল্পের প্রগতি শতাব্দী ধরে বিশ্বের বিস্ময় হয়ে ছিল। ভারতের ছিট (Calico) মসলিন, কিংখাব (Brocades) গালিচা, শাল, গাট্টা (Satinette), মশরু, পট্টু, জামদানী, মলমল, গুলবদন ইত্যাদি জিনিষ ইরান ও ভারতের যুক্ত কারু-প্রতিভার নিদর্শন।

ভারতীয় মস্‌লিনের নামকরণের কবিত্ব লক্ষ্য করার বিষয়। অবরওয়ান বা স্রোতের জল, বফ্‌ত্‌ হানা বা বাতাসের বিনুণী ; শব্‌নাম বা সান্ধ্য শিশির। জামদানীর প্যাটার্ণের মধ্যে এক ধরণের বুটিদারের নাম 'পান্না হাজারা'—বুটিগুলিকে হাজার হাজার পান্নার মত মনে হয়।

আম্‌লি'র কাজে (Embroidery) ভারতের পদ্ধতি বিশিষ্ট ভাবে ইরাণীয় পদ্ধতি। শাল এবং জামাবর তৈয়ারীর কাজে ভারতের আম্‌লিকরের সূচী পৃথিবীর প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। এমব্রয়ডারি শিল্পে উন্নত ধরণের সব সূচীকার্য্যই ভারতীয় কারিগরের অধিগত। যথা—ফুলকারী (Darn stitch), চিকন (Satin stitch) ইত্যাদি। চীনা গ্রন্থি (বা Chinese knot) নামে সূচীশিল্পের নমুনা পাঞ্জাবে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। পেশোয়ারী আম্‌লির কাজে (Herring bone) হেরিং মাছের কাঁটার ভঙ্গী অনুসারে সেলাইয়ের রেওয়াজ আছে।

লেস শিল্প (Lace work) ভারতে য়ুরোপীয়দের সঙ্গে আসে। দক্ষিণ ভারতে লেসের কাজ বর্ত্তমানে একটি পল্লীশিল্প হয়ে উঠেছে। এর পেছনে ছিল খৃষ্টান পাদ্‌রীদের উদ্যোগ। লেসের কাজ একান্তভাবে য়ুরোপীয় প্রতিভার দান, বর্ত্তমানে এই ধারণাই প্রচলিত আছে। কিন্তু কোয়েটা এবং কান্দাহারে বর্ত্তমানে সাজপোষাকের বর্ডার হিসাবে যে ঝালর লাগানো হয়, সেটা আসলে লেস ছাড়া আর কিছু নয়। এর মধ্যে য়ুরোপীয় রীতির কোন চিহ্ন দেখা যায় না। এসিয়ার লেস শিল্পের নমুনা হিসেবে বোধ হয় কোয়েটার লেসই শুধু এখনো বেঁচে আছে।

ভারতের জাতীয় কারুশিল্পের একটা অতি-সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া গেল। এর থেকে কতকটা উপলব্ধি হবে যে, ভারতের কারিগরেরা জাতীয় সংস্কৃতির কত বড় বাহক। এই কারিগরেরাই শিল্পী-ভারতের মেরুদণ্ড। ভারতের কারিগরের স্কন্ধে জাতীয় সংস্কৃতির কতখানি দায়িত্ব চাপানো হয়েছে, আর একটি দৃষ্টান্ত থেকেই সেটা সুপ্রমাণিত হবে। ধরা যাক্‌, বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারীর শিল্প। ভারতের সঙ্গীতাচার্য্যেরা নিশ্চয় নিজ হাতে সরোদ রবাব আর তব্‌লা পাখোয়াজ তৈয়ারী করেন না। সাঙ্গীতিকের সঙ্গী যন্ত্রের জন্য সেই কারিগর নামে পরিচিত মানুষটিকে শুধু তার হাতুড়ি বাঁটালির ওপর নির্ভর করে থাকলে চলে না ; কারিগরকে তার সুরজ্ঞান ও স্বরজ্ঞানের ওপরেও একটা কঠিন পরীক্ষা সইতে হয়।

আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি অতি পুরাতন একটি সত্য। আর্ট জীবনের উপাদান বিশেষ এবং বিচিত্র ইণ্ডাস্ট্রির সমবায় নিয়েই জীবনের রূপ। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের মেরুদণ্ড এই আর্ট

ইন ইণ্ডাস্ট্রি'কে ইংরেজী শাসনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যে অমর্য্যাদা ও দুর্ব্বিপাক সইতে হয়েছে তার গ্লানি আজও আমাদের পদে পদে জীবনের ছন্দকে ক্ষুণ্ণ করে চলেছে। ইংরেজ সমালোচকেরাই ঠাট্টা করে বলেছেন যে, 'ঠগী কয়েদীদের শাস্তি দেবার জন্য' ব্রিটিশ সরকারের প্রথম দৃষ্টি পড়ে ভারতের কারুশিল্পের দিকে। কারুশিল্পকে ইংরেজ সরকার প্রথম সম্মান দিলেন 'কয়েদীর কাজ' (Jail labour) হিসেবে। এখনও কয়েকটি স্কুল আর এক আধটা প্রদর্শনীর বিজ্ঞপত্র ছাড়া ভারতীয় কারুশিল্পের পূজায় সরকারী প্রচেষ্টার আর কোন আগ্রহের নৈবেদ্য দেখা যায় না। ভারতের শান্তিনিকেতন জেলগুলিই প্রধানতঃ সরকারী কারুশিল্পের আশ্রম। কয়েদী সম্প্রদায়ের হাতে এভাবে সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব পড়লে সুফল যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। ভারতের জাতীয় কারুশিল্পের রম্যতা, সূক্ষ্ম কলাকুশলতা ও সুরুচি দ্রুত অপকর্ষের দিকে নেমে পড়েছে।

তারপর, দেশের শিক্ষিত সাধারণের কথা ধরা যাক্। তাঁদের ইংরাজী-শিক্ষা উদরান্নের একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে, সেজন্যই একটা কৃতার্থম্মণ্যতা ও আত্মদীনতার আবেগে তাঁর ইংরাজী শিল্পরুচির ভালমন্দ বাছবিছার না করে একেবারে একটা আদর্শ হিসেবেই মেনে নিলেন। ফলে, আধুনিক ভারতীয়ের মনের সঙ্গে জাতীয় শিল্পের পুরুষপরম্পরার আত্মীয়তায় একটা বিচ্ছেদ সৃষ্টি হলো। একসঙ্গে শাসক সম্প্রদায় ও নিজদেশের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়, উভয়ের সৌহার্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে জাতীয় কারুশিল্প একেবারে অসহায়তার চরমে পৌঁছে গেল।

ভারতের কারুশিল্পের ওপর দেশীয় শিক্ষিতের যতই ঔদাসীন্য ও অবহেলা থাকুক না কেন বিদেশীদের কাছে শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু এই কারুশিল্প একটা বড় চাহিদা পেয়ে এসেছে। জয়পুরী মার্ত্তাবান বা মির্জ্জাপুরী ফুলদান শিক্ষিত ভারতীয়ের কাছে অভ্যর্থনা না পেলেও বিদেশী ক্রেতার কাছে তার কদর আছে। সুতরাং অভিভাবকহীন ভারতীয় কারুশিল্পকে বিদেশী বণিকের ব্যবসার খাঁক্তি মেটাবার জন্য আর এক ভাবে বিপর্য্যস্ত হতে হলো। জোর চাহিদার জের পূরণ করতে গিয়ে পণ্যের কলাগত উৎকর্ষ ক্রমেই ক্ষুণ্ণ হতে সুরু করলো। সস্তা ডিজাইনের মাল প্রচুর উৎপাদন করা—বিদেশী রপ্তানী ব্যবসায়ীর এই দাবীতে কারুশিল্পকে একটা নাকাল অবস্থায় টেনে নিয়ে এল। এর ফলে কোন কোন শিল্পের এক একটি অনুপম প্যাটার্ণ ও ডিজাইন লুপ্ত হয়ে গেছে। ডিজাইন চুরির ষড়যন্ত্রের কথাও শোনা যায়। কাশ্মীরী শাল ও গালিচার শিল্পে বিদেশী মহাজন ও দেশীয় দাদনদার দালালের মুনাফাবিলাস আর্টের দিক থেকে প্রভূত ক্ষতি করেছে।

এইভাবে জাতীয় শিল্প সত্যই ক্রমে ক্রমে রূপহীন হয়ে পড়লো। অর্থাৎ শুধু ইণ্ডাস্ট্রি রইল, তার মধ্যে সেই আর্ট আর রইল না। ভারতের কারিগর কয়েক পুরুষের মধ্যে তাদের শিল্পীর ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে নিছক স্থূল প্রয়োজনের উপযোগী মাল তৈয়ারীর পেশা নিয়ে পড়ে রইল। শিল্পীরা প্রায় মজুরের পর্য্যায়ে পৌঁছে গেল।

যদি শুধু ইণ্ডাস্ট্রি বা মাল তৈরী করতেই হয়, তবে মেশিনের প্রতিযোগিতার কাছে কারিগর দাঁড়াতে পারে কি? এতদিন তারা দাঁড়িয়েছিল ইণ্ডাস্ট্রির আর্টের সাধক হিসাবে। আর্টহীন ইণ্ডাস্ট্রিজের মেশিনের কাছে তারা হেরে যেতে বাধ্য। হেরে যেতেও হয়েছে। বিদেশী কারখানার সস্তা শ্রীহীন ও কারুতাবিহীন পণ্য ভারতের বাজার গ্রাস করে ফেলেছে।

এরপরের অধ্যায় হলো আরও শোচনীয়: ভারতের কারিগরদের ইণ্ডাস্ট্রির শেষ

সম্পর্কও ছাড়তে হলো। আর্টহীন শিল্পে মেশিনের সঙ্গে তারা পাল্লা দিতে পারে না। এখন তারা যায় কোথায়?

হুইট্লি রিপোর্টে (Royal Commission on Labour) এর আংশিক উত্তর পাওয়া যাবে। জাতীয় শিল্প থেকে বিচ্যুত কারিগর বংশ অগত্যা কারখানার দিকেই জীবিকার জন্য এগিয়ে গেছে, তারা কারখানার মজুর হয়েছে। ভারতের মজুর গোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এই জীবিকাভ্রষ্ট শিল্পীবংশ। "The village craftsman finds himself subjected to competition from the larger world. The textile mills have many weavers drawn from families that, for generations previously, worked at handlooms ; the village worker in hides and leather the carpenter and the blacksmith are all being subjected to pressure from the factory. In many cases, the easiest, perhaps the only, way-out of the difficulty is for the village craftsman to transfer his allegiance to the rival which is supplanting him." এই মন্তব্যের একটা তত্ত্ব একটু তলিয়ে বুঝতে হবে—দেশীয় কারুশিল্পের সঙ্গে দেশ বিদেশের কারখানার যে প্রতিযোগিতার কথা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা আর্টের ব্যাপার নিয়ে প্রতিযোগিতা নয়। নিছক ইণ্ডাস্ট্রির প্রতিযোগিতা—কে বেশী মাল তৈরী করতে পারে। কে কত সুন্দর জিনিষ তৈরী করতে পারে—প্রতিযোগিতা ঠিক এই পথে দেখা দেয়নি। জুপিটার যাকে হত্যা করে, আগে তাকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করে নেয়। ভারতীয় কারুশিল্পকে আগে আর্ট-ভ্রষ্ট করে নিয়ে তবেই কারখানার মার মেরে তাকে পরাভূত করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু ভারতে কয়টি কারখানা আছে? ক'জনের জীবিকার সাশ্রয় হতে পারে ভারতের কলকারখানাগুলিতে? সামান্যসংখ্যক শ্রমজীবির রোজগারের পথ করে দিতেই ভারতের গোনাগুনতি কারখানাগুলি হিমসিম খায়। কাজেই শিল্পভ্রষ্ট কারিগরের পক্ষে কারখানাতেও স্থান পাবার আশা নেই।

ততঃ কিম্? তারপর এক কানি জমি নিয়ে হালচষা ছাড়া আর পথ নেই। আর্ট গেল, তারপর ইণ্ডাস্ট্রিও গেল। ভারতের কারিগরকে এর পর চাষা হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন্ উপদেশ দিতে পারা যায়?

ইংরাজী শাসনের আবির্ভাবের প্রথম কাল পর্য্যন্ত ভারতে যে বনেদী কারুশিল্পের পরিচয় আমরা পাই, তার মধ্যে কতগুলি সাংস্কৃতিক তত্ত্বের নিয়ম ধরা যেতে পারে।

(ক) একটা অভিযোগ আছে যে, ভারতের কারুশিল্প 'জাতগত' হয়ে থাকার ফলে এর অবনতি হয়েছে। এই অভিযোগ সর্ব্বৈব মিথ্যা। 'জাত' (Caste) নামে যে সামাজিক সঙ্কীর্ণতার কথা বলা হয় ভারতের আর্টের ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব পাওয়া যায় না। ভারতের কারুশিল্পী সম্প্রদায় কোনদিন সামাজিক অসম্মান পায়নি। ব্রাহ্মণ রাজমিস্ত্রী (Mason) আছে, বৈষ্ণব গজদন্ত-শিল্পী বা কুঁদিকার আছে। তাছাড়া কারিগরেরা জাত হিসাবে অধিকাংশই বৈশ্যপদবাচ্য হিন্দু, সমাজ শত গোঁড়ামি সত্ত্বেও শিল্পীদের কখনো অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য মনে করেনি।

'জাতগত' শিল্পের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ আছে। পুরুষানুক্রমিক পেশা হিসাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাক্‌লে কারুশিল্পের অবনতি হয় এবং হয়েছে। জানা উচিত যে, ভারতীয় সমাজে শিল্পীর পেশা এতটা জাতগত কোন কালেই ছিল না। তার শিল্পীদের একটি সুবৃহৎ

অংশ মুসলমান, যাদের মধ্যে জাতপ্রথা তত প্রবল নয়। মুসলমান শিল্পীরা ঠিক শিল্প অনুসারে কড়া গোষ্ঠী সমাজে বিভক্ত নয়। মোগল সম্রাটদের আমলে ওস্তাগর বা মিস্ত্রী সম্প্রদায় ছিল অধিকাংশই হিন্দু (যারা তাজমহল গড়েছিল), আজ দেখা যায় সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য—অধিকাংশ মুসলমান (এরা হিন্দু মন্দির তৈরী করে)। কারুশিল্প সেরকম কোন জাতে বাঁধা থাকতে পারেনি।

তারপর, এক একটি শিল্প গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকলেও তার অবনতি ঘটবেই, এমন নিঃসংশয় প্রমাণ আমরা পাই না। দৃষ্টান্ত—সাসারাম মৃৎশিল্প প্রভৃতি। দেখা গেছে, একটি ক্ষুদ্র গ্রামের একটি পরিবারের সাধনার মধ্যেই কোন বিশেষ একটি শিল্প কয়েক যুগ ধরে অনন্য গৌরবে বেঁচে আছে। এগুলিকে আমরা এক একটি স্কুল বা ঘরানা বলতে পারি। শুধু ভাব্‌বার কারণ হচ্ছে যে, এই ঘরানার বাইরের অগ্রসর জীবনের যোগসূত্রটি ঠিক আছে কি না? ঘরানা যদি কুশলী উদার তৎপর ও নূতনত্বপরায়ণ হয়, তবে অবনতির কোন কারণ আসতে পারে না। প্রাচীন হিন্দু ভাস্কর্য্য খাস হিন্দুস্তানে লুপ্ত হয়ে গেছে কিন্তু সুমাত্রা দ্বীপে সজীব হয়ে আছে। সেখানে ভাস্কর পাথর কুঁদে হয়াসুর বিরূপাক্ষ বা ত্র্যম্বক শিবের মূর্ত্তি গড়তে পারে। কী প্রাচীন একটি পদ্ধতি আজও ক্ষুদ্রসংখ্যক এক সম্প্রদায়ের হাতে বেঁচে রয়েছে, ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে।

(খ) ভারতের কারুশিল্পে কোন কালে কর্মঠ মনোবৃত্তির স্থান ছিল না। এসিয়া ও য়ুরোপ মহাদেশের নানা শিল্পরীতির শত স্রোত ভারতে এসেছে। ভারতীয় প্রতিভার সঙ্গে তার সমন্বয় হয়েছে—নতুন রূপ ও গুণ গ্রহণ করেছে। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাব সমসাময়িক ভারতের শিল্পীজীবনেও এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। [আপত্তি থাক্‌লে একে ঐতিহাসিক সহ-সংঘটনা বা Parallelism in history বলতে পারেন।] ভারতের জাতীয় কারুশিল্পের ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক স্বরূপটিই বড় হয়ে উঠেছে।

বর্ত্তমান ও আগামী কালের ইণ্ডাস্ট্রির ভাগ্যলিপি মেশিনের হাতে। এর জন্য আপশোষ করার কিছুই নেই। মেশিন একটা মহত্তর মঙ্গলের সূচনা নিয়েই এসেছে—মেশিন থাকবে। মেশিনের সৃষ্টিকে শ্রীমণ্ডিত করাই বর্ত্তমানের আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি। একে সমস্যা বলা যেতে পারে, কর্ত্তব্যও বলতে পারা যায়। প্রাচীন যুগের মানুষ বন্যহস্তীকে বশ করে তার গায়ে আল্‌পনা এঁকে দিতে পেরেছিল। বর্ত্তমানের মানুষ মেশিনকেও বশ করে একটু আর্টিস্টিক, একটু সৌখীন ও একটু রসিক করে তুলতে পারবে না কেন?

আল্‌পনা

'আল্‌পনা' চিত্রশিল্পের উদ্ভব কবে হয়েছিল তা আজকের দিনে গুনে বলা সম্ভব নয়, তবে এ রীতি যে প্রাচীনতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আল্‌পনা চিত্রশিল্প একান্তভাবে বাংলারই লোকশিল্প, এ কথা সত্য নয়। ভারতের নানা প্রদেশে, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন আছে। এ শিল্প বিশেষ ক'রে ভারতের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাও সত্য নয়। ভারতের বাইরে সভ্য-অসভ্য জাতির মধ্যে এই শিল্পরীতির প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।

উত্তর ভারতে গ্রামবাসীদের মধ্যে গৃহভিত্তি ও দেয়ালগাত্র চিত্রশোভিত করার রীতি বহুদিন থেকে চ'লে এসেছে। ছোটনাগপুরের আদিবাসী যারা, ওঁরাও ও মুণ্ডা—এদের মধ্যে

আল্পনার চর্চা খুবই প্রচলিত। ঘরের মেঝেতে গিরিমাটি দুধেমাটি ও আরও নানা রঙিন মাটির রঞ্জক তৈরী ক'রে এরা যেসব চিত্র রচনা করে তা দেখতে যেমন নয়নাভিরাম, শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়েও তা প্রথম শ্রেণীর। এই শিল্পরীতির উৎস খুঁজতে গেলে প্রাক্‌ইতিহাসের বিস্মৃত-অধ্যায়ে এসে ঠেকতে হয়।

বাংলার যে আল্‌পনা শিল্প, তার মধ্যেও আদিম শিল্পরীতির নমুনা সুস্পষ্টভাবে বর্তমান। যুগে যুগে এর মধ্যে নানা নতুন প্রথা ও বিষয় বস্তু যোজিত হয়েছে ; কিন্তু আদিম মানুষের শিল্পপ্রাণতার প্রমাণস্বরূপ একটা অতি প্রাচীন রীতি এর মধ্যে আজও জড়িয়ে আছে। আল্‌পনা চিত্রশিল্পকে লোকশিল্প বলা হয়। একে আটপৌরে শিল্প বলা উচিত। অজন্তা, এলোরা, কোনারক, কাংড়া উপত্যকা বা আবু পাহাড়ের রীতি ও সার্থকতা ভিন্ন রকমের। এরা অনেকটা কীর্তিস্তম্ভের মত। প্রতিভাবান শিল্পী তাঁর কীর্তি পাথরের স্তূপে ও গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ ক'রে রেখে গেছেন। দশজনে তাই উপভোগ করেছে শুধু দর্শক হিসাবে। আল্‌পনার চিত্ররীতি এ ধরণের নয়। এর সঙ্গে সঙ্গীতের শিল্পধর্মের তুলনা হ'তে পারে। একজন গুণীর একটি গান শুধু পাঁচজনে শুনে তা উপভোগ করে না ; পাঁচজনে সে গান গেয়েও উপভোগ করে, আল্‌পনাও তেমনি। শুধু কটি দিনের জন্য, কয়েকটি প্রহরের মত মানুষ টেনে আনে তার মনের সুগুপ্ত শিল্পীকে। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকে কয়েকটি ছবি ; তার পরেই তাকে মুছে ফেলা হ'ল। সুতরাং আটপৌরে চিত্রশিল্প ব'লে যদি কিছু থাকে, যাকে অন্নপান বা পরিচ্ছদের মত আমরা অহরহ প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করি, তা এই আল্‌পনা শিল্প।

কেউ কেউ ব'লে থাকেন, প্রাচীন চিত্রাক্ষরের (Heiroglypic) ক্রমবিবর্তন হয়ে নাকি আল্‌পনার সৃষ্টি হয়। ভাষার লিখন রীতিতে যেদিন বর্ণের উদ্ভব হ'ল সেদিন আর চিত্রাক্ষরের বোঝা বইবার কাজ রইল না। কিন্তু পুরাতন কালের সাধনালব্ধ চিত্রাক্ষরকে মানুষ আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পারল না। চিত্রাক্ষরকে টেনে আনা হল চিত্রের ক্ষেত্রে। তারই রূপের খানিকটা অদল বদল ক'রে যে সরল ও লোকগ্রাহী চিত্রসৃষ্টির প্রথা উদ্ভূত হ'ল তাই না কি আল্‌পনা-শিল্পের আদিপুরুষ।

এ অনুমানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ রয়েছে। চিত্রাক্ষর থেকে আল্‌পনা চিত্রের জন্ম, এটা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কেননা চিত্র আগে, অক্ষর পরে। অক্ষর থেকে চিত্রে আসবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। প্রাক্‌-ইতিহাসের মানুষও ছবি আঁকত, আল্‌পনারও সৃষ্টিকর্তা তারাই। চিত্র থেকে অক্ষরের জন্ম হয়েছে, তার পর অক্ষর তার ভিন্ন পথে উৎকর্ষ অর্জন ক'রে এসেছে।

সুদূর অতীতে আল্‌পনাচিত্রের যে রীতি ছিল আজ তা নেই। কিন্তু নিকট অতীতে যে রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অর্থাৎ অনেকদিন শুধু একটা Convention-এর অধীনে গতানুগতিকতা ক'রে আসা হয়েছে। এও অনেকটা হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের প্রতিমালক্ষণ অনুসারে মাহিমারা ভাস্কর্য্য চর্চার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আজকের আল্‌পনাশিল্প সুপ্রচলিত বটে, কিন্তু এরা রীতি প্রাণহীন হয়ে গেছে। রীতির উৎকর্ষ অনেকদিন আগেই মন্দীভূত হয়েছে। বাংলার এই রীতিগত আল্‌পনার কতকগুলি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, এর উপকরণ। এত রং থাকতে পিটুলি গুলে একটা অতি দুর্বল সাদা রং-এর ব্যবহার। এর মধ্যে অতি দূর ইতিহাসের স্মৃতি প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে সু-প্রাচীন কালের অতি ক্ষীণবুদ্ধি বর্বর মানুষের হাত দেখতে পাওয়া যায়। আঙিনায়

গোময় লেপন যেমন বুদ্ধিহীন বর্বর মানুষের রীতি ছিল—যখন মাটি আর জল মিশিয়ে একটা কাদার তাল প্রস্তুত করার মত বুদ্ধি ও প্রতিভা মানুষের ছিল না।

যদিও সাদা রং-এর ব্যবহারই আল্পনা শিল্পে সব চেয়ে বেশী প্রচলিত, অন্যান্য রং-এর ব্যবহার একেবারে নির্বাসিত নয়। মাঘমণ্ডলের ব্রতে রংএর বিচিত্রতা আছে। কিন্তু রংএর নাম শুনলে হাসি পায় ; সেগুলো আবার আমাদের সেই অতিবৃদ্ধ পিতৃপুরুষদের দরিদ্র সংসারের নিকট স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—প্রাক্-ইতিহাসের মানুষের নগণ্য শিল্পোকরণ। সবুজ রংএর জন্য বেলপাতা গুঁড়ো, হলদে রংএর জন্য হলুদ, কালো রংএর জন্য ভুসা, আর লাল রংএর জন্য ইঁট।

আল্পনা চিত্রের টেকনিকের বৈশিষ্ট্য এর রেখাঙ্কনের পদ্ধতিতে। কোথাও রেখার ঋজুতার বালাই নেই। প্রত্যেকটি টান সুবলয়িত— প্রত্যেকটি বর্তুল। এর মধ্যে জ্যামিতিক সৌকর্য কোথাও নেই। শুধু রেখার হিল্লোল—কোথাও ঋজু রুক্ষ আঁচড় বা কোণের চিহ্ন নেই। নদী প্রবাহের মত রেখাগুলির ছন্দই আল্পনা চিত্রের টেকনিকের প্রণিধানযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

বাংলার ব্রত পার্বণের সঙ্গে আল্পনা চিত্র একাত্মভাবে সংযুক্ত। এও আল্পনা চিত্রের প্রাচীনতার আর একটি প্রমাণ। বাংলার ব্রতধর্ম বেদ বেদান্ত পুরাণ বা তন্ত্র থেকে আসে নি। আদিম বাঙালীর ধর্মোৎসব এই ব্রত। এর আখ্যায়িকাগুলিও প্রাচীন ইতিহাসের টুকরো টুকরো এক একটি বিস্মৃত অধ্যায়।

কিন্তু আল্পনা যতদিন প্রতিভার আওতায় ছিল ততদিন এর ক্রমোৎকর্ষ হয়ে এসেছে। তাই দেখতে পাই বাংলার আল্পনায় নানা পৌরাণিক দেবদেবীর ভিড়। আবার মনসা রক্ষাকালীও আছে। এমন কি, বনদেবীর পূজার কথাও চিত্রে আছে। বনদেবীর ছবি! এ নিকট অতীতেরও ইতিহাস নয়। আল্পনা ও ব্রত কত পুরাতন তার প্রমাণ এই। এমন দিন ছিল যখন অরণ্যের মধ্যেই মানুষকে সংসার পাততে হয়েছিল, সেদিন সে পূজো করত বনদেবীকে।

'তারা ব্রতে'র আল্পনার মধ্যে আদিম মানুষের কল্পনা-কুশলতার নিদর্শন পাওয়া যায়। পৃথিবীর গাছ-পালা পশু-পাখী ছাড়াও এতে আছে চন্দ্র সূর্য ও নক্ষত্র। আকাশমণ্ডলে যে জ্যোতিষ্করাজ্য প্রতি রাত্রে ফুটে ওঠে তা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনাকে চিরকাল উদ্দীপ্ত করে এসেছে। তারা-ব্রতের আল্পনা চিত্রে সৌরজগতের কল্পনাবদ্ধ একটি প্রতিচ্ছবি দেবার প্রয়াস রয়েছে। আল্পনা বৃত্তের শীর্ষে স্ফুরিতরশ্মি সূর্যদেব—মধ্যে ষোড়শ নক্ষত্র সমন্বিত বিশ্বজগৎ আর নিম্নে পূর্ণচন্দ্র।

আল্পনার টেকনিকে বৃত্তের স্থান খুব বেশী। প্রত্যেক আলেখ্যতে দেখা যায় একটি বড় বৃত্ত। এই বড় বৃত্তের মধ্যে ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট কয়েকটি বৃত্ত। বৃত্তের পরিধিগুলির মাঝামাঝি যে স্থান তা নানা সূক্ষ্মতর চিত্রকার্যে অলংকৃত।

আল্পনা শিল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এ শিল্পের শিল্পী প্রায় সর্বক্ষেত্রেই নারী। বর্তমানে অবশ্য কোনও পুরুষকে আল্পনাশিল্পে দেখা যায় না। কিন্তু এককালে এ সাধনার বিস্তর পুরুষ সাধক ছিল, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। যেদিন থেকে পরিবারবন্ধন ও গৃহকর্মের একটা রীতি প্রচলিত হ'ল সেইদিন থেকেই এই শিল্প সাধনার কর্তব্য মেয়েদের উপরই ন্যস্ত হ'ল ; যে কারণে রন্ধন প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকটি কর্তব্য মেয়েদেরই উপর

বিশেষ করে অর্পিত হয়েছে।

ময়মনসিংহ গীতিকায় আমরা কাজলরেখার কাহিনী পড়ি। এককালে মেয়েদের ব্রতনিষ্ঠা ও তার সঙ্গে আল্‌পনানিষ্ঠা কতখানি ছিল, কাজলরেখার এ কাহিনীতে তার বর্ণনা আছে।— শালি-ধান্যের চাল একরাত্রি আগে ভিজিয়ে রেখে পরদিন পিটুলি ক'রে কাজলরেখা আল্‌পনা আঁকতে বসল। কত ছবি সে আঁকল তার একটা ফিরিস্তিও আছে। মনসা, বনদেবী, শিব-পার্বতী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, রক্ষাকালী, কার্তিক, গণেশ, রাম-সীতা, পুষ্পক-রথ, সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র ; আরও আঁকল, গভীর বনের মধ্যে জীর্ণ মন্দিরের ভিতর মৃত রাজকুমারের মূর্তি। বলা বাহুল্য, এতগুলি বিষয়বস্তু যে চিত্রণে ফুটে উঠেছিল তার টেকনিকে নিশ্চয়ই বিচিত্রতাও অজস্র পরিমাণে ছিল। নইলে পিটুলির মত মামুলী একটা উপকরণে এত রসাঢ্য চিত্রাঙ্কন সম্ভব হত না।

এখন প্রশ্ন, আল্‌পনা চিত্রশিল্পের কোনও সার্থকতা আজকের দিনে আছে কি না। আল্‌পনা চিত্রশিল্পের সার্থকতা তো আছেই। এর প্রয়োজন আজকের দিনে আরও বেশী ক'রে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। আজকের দিনের প্রতিভাবান শিল্পীর মহৎ একটি কর্তব্য রয়েছে এই দিকে। আল্‌পনাকে তার প্রাচীন রীতিবন্ধন থেকে মুক্তি দিতে হবে, এর (Archaic) দুর্বলতা ঘুচিয়ে নতুন রূপ দিতে হবে। কারণ এতটা লোকময় শিল্প বাংলায় দ্বিতীয় আর নেই। আল্‌পনাকে যদি নতুনভাবে শিল্পপ্রাণ ক'রে তুলতে পারা যায়, তবে তা জাতিকে মনে প্রাণে শিল্পপ্রবণ ক'রে তুলবে। তাতে জাতির সমষ্টিগত প্রতিভাকে উত্তরোত্তর নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় টেনে নিয়ে যাবে। পিটুলিশ্রদ্ধা ছেড়ে দিয়ে, পেঁচা-পেঁচীর প্রতি অতি-ভক্তি না দেখিয়ে আজ শিল্পীকে গ্রহণ করতে হবে নানা রংএর তুলিকা। তাকে নূতন দৃশ্যবস্তুর অবতারণা করতে হবে, আধুনিক মানুষের কল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে।

ব্যবহারিক শিল্পের দিকে দিয়ে আল্‌পনার সার্থকতা খুব বেশী। শাল আলোয়ানের শাড়ির পাড়, কার্পেট, জাজিম ও গালিচা, চা এর ট্রে, মৃন্ময় বা দারুময় গৃহোপকরণ এ সব সামগ্রীকে আল্‌পনা রীতিতে সুশোভিত করা চলতে পারে। এতে সামাজিক ভাবে জাতির রুচির উৎকর্ষ সাধিত হবে।

আল্‌পনা চিত্রশিল্পের কথাপ্রসঙ্গে আর একটি কথা স্বতঃই মনে আসে। ভারতীয় অথবা বঙ্গীয়, কোনও সুপ্রাচীন শিল্প-রীতি আজ বেঁচে নেই। অজন্তার চিত্রকর যেদিন তার তুলি নামিয়ে রেখে গেছে সেই দিন থেকে সে চিত্ররীতিরও আয়ু ফুরিয়ে গেছে। কোনারক ভুবনেশ্বর গড়েছিল যে ভাস্কর, তারা আজ নেই, তাদের শিল্পরীতিও আজ নেই। নৃত্য এবং নাট্যেরও এই একই পরিণতি। এ থেকেই মনে সংশয় হয় যে ওই সব শিল্পরীতি দশের মধ্যে কখনও প্রসার লাভ করে নি, অথবা প্রসারের চেষ্টা হয় নি। জাতি ও শিল্পীর মধ্যে একটা আভিজাত্যের দূরত্ব ছিল। তাই এ শিল্পরীতির পরিণতি যা হওয়া উচিত ছিল তাই হয়েছে। অন্যদিকে দেখতে পাই, আল্‌পনা চিত্রশিল্প আজও বেঁচে আছে। এর এই প্রাণবত্তার মূলে হ'ল তার লোকময়তা। একটা বিশ্ববিদ্যালয় যা করতে পারে না, আল্‌পনা প্রথা তাই করেছে। শিল্পকে সমাজের রক্তমাংসের ভিতর এমনভাবে আত্মস্থ ক'রে নেবার উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়।

কাজেই আল্‌পনার উৎকর্ষ সাধনের যেকথা বলা হয়েছে, সমস্ত জাতিকে নবতর শিল্পসাধনায় দীক্ষিত করার তাই একটা পন্থা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি না যে, শিল্পের

সার্থকতা শুধু গুটিকয়েক শিল্পীর ব্যক্তিগত কল্পনা স্ফূর্তি বা কয়েকটি রসিকের তৃপ্তি সাধনের জন্য। শুধু রাজারাজড়া, ধনী ও গুণীর স্টুডিও বা বৈঠকখানা, অথবা সরকারী গ্যালারি বা মিউজিয়ম সুশোভিত করার জন্য শিল্প, এ ধারণাকে আমরা আমল দিই না। আলো বাতাসের মত শিল্পকেও আমরা জাতির গার্হস্থ্য জীবনের সম্পদরূপে দেখতে চাই।

আল্‌পনা একদিন এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অখ্যাতির আড়ালে তাকে অনেকদিন চাপা প'ড়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তার সজীবতা আজও লুপ্ত হয় নি। আজকের দিনে চারদিকে লোকশিক্ষার বুলি শুনতে পাই। লোককে অ আ ক খ শেখাবার জন্য এই বুলি। এতেই গলদ্‌ঘর্ম হবার উপক্রম। কিন্তু লোক-শিল্পশিক্ষার যদি প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লে মনে করা হয় তবে তাতে এই গলদ্‌ঘর্মের আশঙ্কা নেই। শিল্প-শিক্ষার জন্য সত্যিকারের বিদ্যাব্যবস্থা আমাদের এই আল্‌পনা প্রথার মধ্যেই রয়েছে।

চিত্রকলায় রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন। তাঁর ছবির একমাত্র মর্য্যাদা এই নয় যে তা' এক মহাকবির তুলিকাবিলাসের সৃষ্টি। এরকম কোন অভিমত পোষণ করা প্রকারান্তরে চিত্রকলাক্ষেত্রে কবির অধিকারিত্বকেই সবিনয়ে অস্বীকার করা হয়ে দাঁড়ায়। আবার কবির কাব্যকীর্ত্তির কারণে একটা অতিশ্রদ্ধার বাষ্প মনে পুষে নিয়ে তাঁর চিত্রকার্য্যের বিচার করতে বসলে তাতেও অবিচার হবার আশঙ্কা বেশী, কারণ, এতে সমালোচকের দৃষ্টির নিরপেক্ষতা খর্ব্ব হয়। যুক্তিহীন বিচারে নগণ্যও যেমন অতিরঞ্জনের প্রলেপে নিজেকে অসাধারণ করে তোলে, তেমনি সত্যিই যা অসামান্য তাকেও সামান্য দীনতায় নেমে আসতে হয়। কাজেই কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পী হিসাবে কতদূর কৃতী ও সফল, তার সঠিক যাচাই হতে পারে একমাত্র তাঁর চিত্রকার্য্যের শিল্পোৎকর্ষের বিচারে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ সব রকম ঐতিহ্যের আনুগত্য সোজাসুজি এড়িয়ে গেছেন। এ বিষয়ে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাঁর ছবি ভাল বা মন্দ, গোড়াতেই এ নিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক বাদ দিয়ে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ছবিগুলি এমন কতকগুলি বিশিষ্টতায় ওতপ্রোত যা চোখের দেখার কৌতূহলকে টেনে নিয়ে দূর মনোলোকে পৌঁছে দেয়। এত সহজ ও সরল বলে বোধ হয় তা এত বেগবান। মোট কথা রবীন্দ্র-চিত্রকলা যেন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, তাই তাকে বিচার করাও এত কঠিন। কেন না নিয়মের ব্যতিক্রমে যার জন্ম, তার পরিচয় ও পরিমাপ নিয়মের মাপকাঠিতে সম্ভব নয়।

এই অপূর্ব্ব-রীতির চিত্রকলার উৎস কি? কবি নিজেই এর পরিচয়সূত্রে বলেছেন—

'আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ু স্রোতে
নিয়মের দিগন্ত পারায়ে
যায় সে হারায়ে
নিরুদ্দেশে
বাউলের বেশে।'

খেয়াল ছবি—তার উৎস হ'ল মনের গহন এবং সেছবি ভেসে আসছে প্রকাশের প্রবাহ ধরে নিয়মের দিগন্ত পারায়ে।

পুরাতন শিল্পরীতি ও অনুশাসনকে না মেনে, তার পরিবর্তে চিত্রকলার কোন নতুন রীতির প্রবর্তন রবীন্দ্রনাথ করেন নি। কারণ না-মানার আবার রীতি কি? রীতির ভেতর একটু না একটু সীমাবদ্ধতা ও অনুদারতা থেকেই যায়। রীতির হাতে পড়ে শিল্প যেমন কোথাও অপরূপ হয়ে ওঠে, তেমনি কোথাও আবার নিঃশেষে হারিয়ে বসে তার আপন রূপ।

শিল্পী রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন খেয়াল-ছবি। তিনি এখানে রূপকারের ভূমিকায় তুলি হাতে নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হন নি। মনের গহন থেকে মুক্তধারায় যে অশান্ত কল্পনার পুঞ্জ ভেসে আসছে তারই অবিকার ভাবরূপটিকে কবিশিল্পী বর্ণে ও রেখায় ধরবার প্রয়াস করেছেন।

শিল্পীর কর্ত্তব্যে এইটুকু যথেষ্ট নয় যে, সে যা আঁকবে তাই নয়নাভিরাম হবে। তার কাজ নয় শুধু চিত্রে মূর্ত্তিতে ও আলেখ্যে রূপের সৌকর্য্য সাধন। শিল্পীকে আসলে হতে হবে প্রকাশকুশল ; রীতির ওপর শ্রদ্ধা রাখতে গিয়ে তাঁকে তার মনোচ্ছবিটির প্রতি নিষ্ঠা ক্ষুণ্ণ করলে চলবে না। এ মতলব সকল বিতণ্ডা উত্তীর্ণ হয়ে বহুদিন আগেই য়ুরোপে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগীয় দৃশ্যদাসত্ব হ'তে য়ুরোপীয় চিত্রকলা মুক্তি পেল সেইদিন, যেদিন শিল্পীকুল এই তত্ত্বটিকে বরণ করে নিয়েছিল। পিকাসো (Picasso) ও গগাঁর (Gaugine) নিদারুণ বিদ্রোহ য়ুরোপের শিল্পপ্রগতি ব্যাহত তো করেই নি, বরং তাকে আরো সৃষ্টিপ্রবণ ও গতিশীল করে তুলেছে।

'যেমন তেমন এরা বাঁকা বাঁকা
কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা।'

তাঁর চিত্রকলায় টেকনিকের সম্পর্কে কবিশিল্পী এই পরিচয় দিচ্ছেন। শিল্পী স্পষ্ট স্বীকার করে নিচ্ছেন যে তাঁর চিত্রের সবটা তুলি দিয়ে গড়া নয়—তার কিছুটা আবার ভাষা দিয়ে গড়া। তুলি দিয়ে যেটুকু গড়া তার সবটাই দর্শকের কাছে প্রত্যক্ষ, তাকে সহজেই চিনতে ও বুঝতে পারা যায়। যেটি প্রত্যক্ষ নয়, সেইটিই হ'ল ভাষা দিয়ে আঁকা এবং এই ভাষার অর্থভেদ যিনি করতে সমর্থ হবেন তাঁরই কাছে রবীন্দ্র-চিত্রকলার রূপভেদ করা হয়ে উঠবে।

এখন সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব। রবীন্দ্র চিত্রকলা কোন গুণে বিশিষ্ট? এই অপ্রত্যক্ষতা, যা ভাষা দিয়ে আঁকা—এইটিই তার বৈশিষ্ট্য। চোখের দেখার বদলে মনের দেখাই এখানে সহায়। কবিশিল্পীর 'ঝাঁকড়া চুল' ও 'একাকিনী' এ দুটি ছবির দিকে দৃষ্টি দিলে চোখের কর্ত্তব্য শীঘ্র ও সহজে সারা হয়ে যায়, তারপর সুরু হয় সমস্ত মন জুড়ে জানাজানির সাড়া—'কিছু তার বুঝি না, কিছু পাই অনুমানে।'

অলঙ্কার শিল্পকে একটি রূপ দান করে সত্য। কিন্তু অলঙ্কার সরিয়ে দিলে শিল্পের কোন প্রাণান্তিক হানি হয় না, জলুসই শুধু চলে যায়। রূপ যায় কিন্তু শ্রী থাকে। পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পী এই কাজে চিত্রে অতি-পরিপাট্যকে (Prettiness) বর্জ্জন করে লাভবান হয়েছেন। রবীন্দ্র-চিত্রকলায়ও আমরা রূপসাধনার নিদর্শন পাই, পাই অপূর্ব্ব শ্রীসাধনার পরিচয়।

অনেকে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কতকগুলি চিত্রকে গ্রোটেস্ক (Grotesque) বলে মনে করেন। এ অভিমতকে নিতান্ত উপেক্ষা করা চলে না। কবিশিল্পীর আঁকা 'ঘণ্টাকর্ণ', 'খাসা-লেজুড়ী' প্রভৃতি ছবিগুলিকে গ্রোটেস্ক বলে স্বীকার না করে পারা যায় না। শিল্পী যদি চান তাঁর মনোচ্ছবির যথাযথ প্রকাশ, তবে তাঁকে খানিকটা বিরূপের আশ্রয় গ্রহণ করতেই হবে। অন্তশ্চেতনা জুড়ে যেমন ছড়িয়ে আছে রূপের মায়াজাল তেমনি রয়েছে বিরূপের কুয়াশা। গজানন, গণেশ, নৃসিংহ, ফিংক্স ও ড্রাগন যে-কল্পনার সৃষ্টি, সে-কল্পনাই জন্ম দিয়েছে

'ঘন্টাকর্ণ'কে। কেউ কেউ মনে করেন গ্রোটেস্ক-এর পেছনে থাকে শিশু বা আদিম-মানবসুলভ অপ্রবীণ ও অকৃত্রিম কাঁচা মনের কৌতূহল ও প্রেরণা। কেউ কেউ এর পেছনে একটা ব্যঙ্গ কৌতুকের ছায়া দেখতে পান। এই গ্রোটেস্ক চিত্রে গুহা মানবের দানও কিছু কম নয়। সুতরাং গ্রোটেস্ক অর্থে উদ্ভট কিছু বোঝায় না—এও মনের রুচির কীর্তি যার পেছনে রয়েছে একটা হেতুর ভিত্তি ; যুগের শিল্পী অদ্যাবধি তাকে রচনা করে আসছে। আশ্চর্য্যের বিষয় বিরূপের ছবি এই গ্রোটেস্কই গথিক সৌন্দর্য্যের একটা বড় অবলম্বন। শোনা যায় যে, সুরশিল্পী ভাগনার (Wagner) বাদ্যযন্ত্রে এমন এক একটি সুর আলাপ করতেন যাতে নিস্তরঙ্গ একটি হ্রদের নিঃশব্দতা ফুটে উঠতো। সুতরাং শব্দ যদি নিঃশব্দরসকে বহন করে আনতে পারে, তবে বিরূপও রূপকে বহন করে আনবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে? এ কীর্তিতে রবীন্দ্রনাথের তুলিকাও পূর্ণ সাফল্যের দাবী করতে পারে।

'গেছোবাবা', 'জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা'—এ দুটি এবং এই ধরণের তুলির খেয়ালে রচিত আরো কয়েকটি ছবি ঠিক গ্রোটেস্ক পর্য্যায়ে পড়ে না। সত্যি কথা বলতে গেলে, এরা কোন পর্য্যায়েই পড়ে না। ফ্যান্টাসির (Phantasy) লঘু মেঘে গড়া এদের দেহ—অবচেতনার পটে ক্ষণে ক্ষণে যেসব অপূর্ব্ব অদ্ভুত মূর্ত্তির উত্থান লয় চলেছে। গেছোবাবার অ্যানাটোমির কোন বালাই নেই ; নিখুঁত রেখায়িত স্পষ্টতার আলোকে তাকে গোচরীভূত করার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথের আঁকা অবচেতন মনের বিগ্রহ এই প্রতীক-চিত্রগুলির পক্ষে এই পরিচয় যুক্তিযুক্ত মনে করা যেতে পারে।

'কাছের মূর্ত্তির চেয়ে দূরের মূর্ত্তিতে তুমি বড়'— রবীন্দ্রনাথের সমস্ত চিত্রকলা-সাধনার পেছনে এই ইঙ্গিতটি সত্য হয়ে উঠেছে। নির্বন্ধন তাঁর ছবি, সব অবান্তর সেখান থেকে বিদূরিত—শিল্পীর তুলিকা একান্তভাবে শুধু সদ্ধর্মের (Fundamental-এর) প্রকাশেই তৎপর। বুদ্ধি দৃষ্টির দাপটে তার অর্থ আড়ালে লুকিয়ে যায়। পরের হাসিকান্না লোকে যেমন হেসে কেঁদেই প্রকৃত উপভোগ করে— তেমনি কবি শিল্পীর এই ছবিগুলি—এই 'দূরের মূর্তি'কে একমাত্র বোঝা যায়, উপভোগ করে, মনের পটে মুদ্রিত করে।

স্থাপত্যের শিল্পতত্ত্ব

বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel) তাঁর লিখিত একটি পুস্তকে মানব সভ্যতার গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, সভ্যতা ক্রমোর্দ্ধগামী নয়। একটানা সংস্কৃতির উৎকর্ষ কোন জাতির বা কোন দেশের হয়নি। আরও বলেছেন যে, শিল্পের বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। তিনি দেখিয়েছেন যে, আধুনিক মানুষ কোন কোন বিজ্ঞানে ও শিল্পে অতীত যুগকে পিছনে ফেলে উন্নতির দিকে এগিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু কোন কোন শিল্পে অবনতি ঘটেছে। যেমন, স্থপতি শিল্পে।

এ আপশোষ অনেকের মুখে শোনা যায় যে তাজমহল আর গড়ে উঠবে না। সেই বাবিলনের শূন্যোদ্যান, মিশরের মহামহিম পিরামিড, গ্রীসের সেই অ্যাম্ফিথিয়েটার (Amphitheatre) ও পার্থেনন (Parthenon), গথিক (Gothic) প্রাসাদের কারুময় বিরাটত্ব, চীনের প্রাচীর, বরবুদুর, কোনারক বা তাঞ্জোর মন্দিরের প্রশান্ত পাষাণে সুগঠিত স্থাপত্য-কীর্ত্তিকে অতিক্রম করে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-বিজ্ঞানে পুষ্ট মানুষের প্রতিভা বেশী মহনীয় কিছু সৃষ্টি করতে পারছে না।

রাসেল সাহেবের এ অভিযোগ সত্য কি?

আধুনিককালে, বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের পর থেকে স্থাপত্য বিদ্যায় বলতে গেলে নবযুগের আবির্ভাব ঘটেছে। একটু প্রণিধান করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, রাসেল সাহেবের ঐ অভিযোগ সত্য নয়। আধুনিক একটি অভ্রংলিহ্ স্কাই স্ক্র্যাপার (sky-scraper) মিশরের পিরামিডের চেয়ে গুণে গৌরবে কিসে যে ন্যূন, তা বোঝা দায়। অতীতে একটি দুটি পিরামিড লক্ষ দাস শ্রমিক ও শিল্পীর অহোরাত্র শত বৎসরের পরিশ্রমেই সম্ভব হয়েছিল। মানুষের আনন্দ বা স্বাচ্ছন্দ্য তাতে কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। Art for Art's sake-এর মত সেসব ছিল এক একটি শক্তিমদ নরপতির ব্যসন মাত্র। এ হেন স্থাপত্য কলার অধঃপতন হবে, তাতে সন্দেহ কি?

অট্টালিকা রচনায় যে আধুনিক রীতির পত্তন হয়েছে, সেটা কোন দেশ বিশেষের একচেটিয়া নয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—মরু, দ্বীপ, উপকূল, উপত্যকা, শৈলসানু, সর্ব্বত্র যেখানে যেখানে আজ নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে, সেখানকার স্থপতিসমাজ নির্ব্বিচারে আধুনিক রীতিকে বরণ করে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিকতা প্রচারে আধুনিক স্থপতি যতখানি কাজ করেছেন, কোন শিল্পী বা শিল্প সেই দিক দিয়ে মানবসমাজের এতটা উপকার করতে পারেনি। সুদুর্গম আরণ্য কঙ্গোর অভ্যন্তরেই হোক বা দক্ষিণ গোলার্দ্ধের অষ্ট্রেলিয়া উপকূলের মেলবোর্ণ হোক, সর্ব্বত্র সৌধ রচনার একটি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কংক্রীটের রোমান্সে মুগ্ধ দেশ বিদেশের মানুষ প্রথম আন্তর্জাতিকতার আস্বাদ লাভ করেছে। পোষাক পরিচ্ছদ, চিত্র, ভাস্কর্য্য বা সঙ্গীত, কোন শিল্পই এতখানি আন্তর্জাতিক প্যাটার্ন লাভ করতে পারে নি।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারদের সহজে কেউ শিল্পী বলে সম্মান দিতে কুণ্ঠিত। প্রতি রাজধানী বন্দর ও সহরে আধুনিক সৌধ রচনার ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য করলে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায়। সৌধ রচনায়, এমন কি অতি সাধারণ একটি আস্তাবল রচনায় আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার যতখানি রুচি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রমাণ দিয়ে থাকেন, তাতে তাঁদের অশিল্পী বলা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। বিংশ শতাব্দীর নূতন শিল্পী হলেন আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার।

আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যায় ব্রিটিশ ও আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারের প্রতিভার দান সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হলেন গ্লাসগোর চার্লস রেনি ম্যাকিন্‌টস (Charles Rennie Mackintosh)। এর পরে যেসব বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যবিশারদের নাম করতে পারা যায়, তাঁরা হলেন—রাইট (আমেরিকা), ডুডোক (হল্যাণ্ড), কর্বুসিয়ে (সুইজারল্যাণ্ড), স্টীভান্ (ফ্রান্স), আল্টো (ফিনল্যাণ্ড), আসপ্লুন্দ (সুইডেন), মেণ্ডেলসন (জার্ম্মানী), লুবেটকিন (রুশিয়া) এবং ম্যাকগ্রাথ (অষ্ট্রেলিয়া)। এঁদেরই সম্মিলিত সাধনা স্থাপত্য বিদ্যায় নবযুগের সূচনা করেছে।

অতীতের স্থাপত্যের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—সে সময়ে স্থাপত্য কার্য্যে ব্যাপকতার কত অভাব ছিল। মধ্যযুগেও এই রকম ব্যাপকতার অভাব ছিল। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ আর দেবমন্দির—এই তিনটি বস্তু রচনার মধ্যে মোটামুটি তিনটি রীতি অবলম্বন করা হতো। সাধারণ মানুষের গৃহাবাস যতদূর সম্ভব নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু আজ প্রতি জনপদের স্থাপত্য সৌন্দর্য্য এতদূর উন্নত হয়েছে যে, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর' বলবার

মত উৎসাহ আর কারও নেই। সেটা মধ্যযুগে বা আরও আগে বরং বলা যেতে পারতো।

সাম্প্রতিক কালে অট্টালিকা রচনার রীতিতে কত যে বৈচিত্র্যের পরিবেশন করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেই সঙ্গে অজস্র নূতন নূতন সব উপকরণের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে, যা আগে কখনও কল্পনা করা হয়নি। ক্লাব, হোটেল, স্কুল, ব্যাঙ্ক, অফিস, প্রমোদাগার ও হাসপাতাল—প্রত্যেক বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষা বা সেবাসদনের জন্য বিভিন্ন রকমের ডিজাইন উদ্ভাবিত হয়েছে।

আধুনিক স্থাপত্য রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো অনাড়ম্বরতা। এই কারণে আগেকার প্রচলিত অনেক উপকরণকে পরিহার করে নূতন নূতন উপকরণ আমদানী করা হলো। স্থাপত্য শিল্পে প্রথম বিপ্লবের সূচনা করলো রিইনফোর্সড্ কংক্রীট (Reinforced Concrete)। তারপরে বিজ্ঞানের সৌজন্যে এল লিফ্‌ট, শৈত্য নিয়ন্ত্রণ, বায়ু চলাচল (Air conditioning, Ventilating) ও উত্তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা।

দেয়াল গড়ার উপকরণে প্রথম বস্তুর রাসায়নিক ও পদার্থ ধর্ম্মের বিচার করে দেখা হলো। তারপর বিচার্য্য বস্তুর বর্ণ। আধুনিক সৌধে বর্ণের যে বিস্ময়কর সমারোহ সৃষ্টি করা হয়, তা অভূতপূর্ব্ব। দেয়ালের বহির্গাত্রে কালো কাঁচ ও নিকেলের আস্তরণ ব্যবহারে সৌধের রূপ কত খুলে যায়, তা আগে কল্পনার বাইরে ছিল। ঝকঝকে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত, ধাতুর পাত, টেরাকোটা, বেলোয়ারী, ক্রোম-ষ্টীল, অ্যালুমিনিয়াম, ব্রঞ্জ ও মার্ব্বেলের টালি এবং রঙীন পাথরের সুমসৃণ পাতলা পাতলা চাপ দিয়ে গড়া হর্ম্ম্যগাত্র আজ পুরাণকল্পিত ময়দানবের স্থাপত্য কীর্ত্তিকে ম্লান করে দিয়েছে।

* * *

গ্রীষ্মমণ্ডলের কোন রৌদ্রদগ্ধ উদ্যানের গাছের ফলের অভ্যন্তরে সঞ্চিত রস এত স্নিগ্ধ শীতলতা পায় কেমন করে? শিল্পী ইঞ্জিনিয়ার এর রহস্য উদঘাটন করে তাকে আপন স্থাপত্য সৃষ্টির কাজে লাগালেন। ইঞ্জিনিয়ার লক্ষ্য করলেন কমলা লেবুর খোসাটির গঠনরীতি। খোসার ওপরে প্রথমে একটি শীতাতপ-প্রতিষেধক আবরণ, তারপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত একটি শ্বেতাবরণ, সর্ব্বশেষে একটি চিম্‌ড়ে আচ্ছাদন। ইঞ্জিনিয়ার কমলা লেবুর খোসার এই গঠনরীতিকে হুবহু অনুকরণ করে অট্টালিকার দেয়াল রচনা করলেন। পলেস্তারা ও ছিদ্রবহুল ইষ্টক দিয়ে রচিত এই রকম দেয়ালঘেরা ভবনে শীতাতপের প্রকোপ স্বাচ্ছন্দ্যের কোনই ব্যাঘাত করতে পারে না।

আধুনিক অট্টালিকা রচনায় ইঞ্জিনিয়ারদের আর একটি বাহাদুরী হলো কম্পননিরোধ ব্যবস্থা। পথের ট্রাম বাসের অবিরাম গড়ানি দুপাশের সৌধভবনগুলিকে যেভাবে প্রতিনিয়ত ঝাঁকানি দিয়ে যায়, সাবেকী অট্টালিকা সে-উপদ্রব বিশ বছরেও সইতে পারতো না। কিন্তু ইস্পাতের ফ্রেমের অদ্ভুত স্পন্দনসহ প্রকৃতি আধুনিক স্থাপত্যকে সে আশঙ্কা থেকে মুক্ত করেছে।

তারপর আসে শ্রুতিকটু শব্দ বা হট্টগোল নিবারণের ব্যবস্থা। এই দিক দিয়েও আধুনিক ইঞ্জিনিয়ার তার কুশলতার প্রমাণ দিয়েছেন। শব্দ-নিরোধক (Sound proof) বস্তুবিশেষ দিয়ে দেয়াল, সিলিং ও ছাতের পলেস্তারা প্রভৃতি সৌধের আভ্যন্তরীণ প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

আধুনিক স্থাপত্য বিদ্যায় ভবনের বায়ু চলাচল ব্যবস্থা এতটা সুসম্পাদিত হয়ে থাকে

যা ইতিপূর্ব্বে কোন যুগে সম্ভব হয়নি। দশ হাজার বাসিন্দায় পরিপূর্ণ একটি বিরাট হর্ম্ম্যের দশতলা পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি জানালা কপাট, ধুলো মাছি-মশা থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিশ্ছিদ্র করে আঁটা থাকে, কিন্তু যান্ত্রিক উপায়ে এমনই সুন্দর বায়ু চলাচল ব্যবস্থা যে ভবনবাসীরা কোন সুইস স্বাস্থ্যনিবাসের মত প্রফুল্ল ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন থেকে বঞ্চিত হয় না।

বাসভবনের উত্তাপ সংরক্ষণেও এই রকম যান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্ভব।

* * *

নূতন সৌধশিল্পে ইঞ্জিনিয়ারকে খুব বেশী যত্ন ও নজর দিতে হয়েছে আলোক ব্যবস্থার দিকে। আলোক বিন্যাসের মধ্যে সৌধের রূপ অনেকখানি নির্ভর করে। তা ছাড়া বাসিন্দাদের সুবিধা ও প্রয়োজনের কথা তো আছেই। আলোকব্যবস্থা প্রকরণের যে কত নূতন রীতির উদ্ভব হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রখর রৌদ্রের মত উজ্জ্বল আলোক থেকে সুরু করে হেমন্তের কুহেলিকা মাখা অস্ফুট জ্যোৎস্নার মত আলোক, সবই যান্ত্রিক কৌশলে আজ ভবনে ভবনে উপভোগ সম্ভব হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর নূতন শিল্পী, আধুনিক সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এই ইঞ্জিনিয়ার শ্রেণী ; তাঁদের প্রতিভা আজ স্থাপত্য বিদ্যাকে যে-ভাবে প্রগতিশীল করে তুলেছে, তাতে বিংশ শতাব্দীর মানুষ নূতন এক শিল্পানন্দের অধিকারী হবে সন্দেহ নেই।

এইবার, ভারতীয় স্থাপত্যের দিকে একবার লক্ষ্য করা যাক্। প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের উত্থান পতন পরিবর্ত্তন ও বিলোপ এবং সেই সঙ্গে নবীন ভারতীয় স্থাপত্যের প্রকৃতি আলোচনা করলে শিল্প ও সংস্কৃতির তত্ত্বে কয়েকটি ঐতিহাসিক নিয়ম আমরা ধরতে পারবো।

'স্থাপত্য' ও 'সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং' এই দুই অনুশীলনের মধ্যে একটা সংজ্ঞাগত ভেদ যেমন আগে ছিল, তেমনি এখনও আছে। স্থপতির কাছে আমরা আশা করি চারুত্ব এবং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে কারুত্ব। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রয়োজন, একই আধারে এই দুই গুণের সমাবেশ। ইঞ্জিনিয়ারকে আর্টিস্ট হতে হবে, অথবা আর্টিস্টকেই ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমানের সংস্কৃতির ক্ষেত্রের বহুব্যাপকতা জটিলতা ও বিবিধ দুরূহতার কথা মনে পড়ে যায়। বর্ত্তমানের সাংস্কৃতিক রুচির দাবী মেটাবার মত এই দুই যোগ্যতা একই ব্যক্তির প্রতিভার মধ্যে সম্ভব কি না, সেটাই সন্দেহের বিষয়। সুতরাং যন্ত্রী ও গায়কের সহযুক্ত প্রতিভার সৃষ্টির মত অর্থাৎ সঙ্গীত কলার মত, স্থাপত্যও দুই কর্ম্মীর প্রতিভার সহযোগিতার সৃষ্টিরূপে বিকাশ লাভ করবে। বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে স্থাপত্য একক প্রতিভার আয়াসে সাধ্য হয়ে উঠবে না। হবে, বিভিন্ন চারু ও কারুকর্ম্মীর সমন্বিত প্রতিভার সৃষ্টি।

আমাদের ভারতীয় ক্লাসিক স্থাপত্যের ইতিহাসের রীতিনীতি ও গতির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে স্থাপত্যাচার্য্যেরাই ছিলেন একাধারে শিল্পী ও ইঞ্জিনিয়ার। 'মানসার' নামে হিন্দু স্থাপত্যবিদ্যার গ্রন্থটিকে হিন্দু ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রন্থও বলা যায়। মানুষের সাহিত্যের ইতিহাসে 'মানসার' গ্রন্থের মত দ্বিতীয় একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় না। এমন কি, গ্রীক সাহিত্যেও ফলিত বিজ্ঞান ও আর্টের একই সঙ্গে এত সুন্দর প্রকরণ নেই। মানসারের সূত্র তত্ত্ব ও নির্দ্দেশ থেকেই আমরা বুঝতে পারি, ভারতীয় ক্লাসিক স্থাপত্যে কেন এত কলাগত উৎকর্ষের প্রাধান্য ছিল। ভারতীয় স্থাপত্যের এই বিশেষত্ব যে কোন সমালোচকের চোখে ধরা পড়ে যায়। স্থাপত্যে চারুত্বের দিকটা এত প্রবল ও প্রধান যে, তার ব্যবহারিক

দিকটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। গুম্ফার দেয়াল বা একটি স্তম্ভ সাদাসিধে ভাবে চৌরস করা থাকলে ব্যবহারিক প্রয়োজনের কোন অসুবিধা হতো না। তবু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পী প্রভূত পরিশ্রমে সারা দেয়াল ও স্তম্ভের গাত্রে মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করেছে। প্রয়োজনকে শোভাময় করে রাখবার জন্য প্রাচীন শিল্পীদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। এই সঙ্গে আর এক শ্রেণীর শিল্পী-প্রতিভার কীর্ত্তি এই স্থাপত্যের ভেতরেই রূপ গ্রহণ করছে দেখতে পাই অর্থাৎ মূর্ত্তি প্রকরণ বা ভাস্কর্য্য। স্থপতিকে শুধু ইঞ্জিনিয়ার হতেই হয়নি, ভাস্কর্য্য নামে আর একটি দুরূহ আর্টকে তার আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হয়েছে। স্বভাবতঃ সন্দেহ হয়, প্রাচীন ভারতের 'স্থপতি' নামে শিল্পীরা সত্যিই কি এক সঙ্গে এতগুলি গুণের অধিকারী ছিলেন? অধিকারী ছিলেন না বলেই মনে হয়। ইঞ্জিনিয়ার স্থপতি ও ভাস্কর—এই তিন শ্রেণীর শিল্পীকে নিয়ে যিনি দেব দুর্গ বা রাজ আয়তনকে রূপ দিতে পারতেন তিনিই ছিলেন স্থাপত্যাচার্য্য। অর্থাৎ এক কথায় স্থাপত্যবিদ্ বা স্থাপত্যাচার্য্যের কাজ ছিল প্রযোজনার কাজ (Directorial work)। হয়তো এই প্রযোজক ঐ তিনটি শিল্প ও বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে কিছু কিছু অধিগত ও পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পারদর্শিতার সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো ঐ তিন শিল্পের সমন্বয়ীকরণ ও সৌষ্ঠব সৃষ্টির মধ্যে।

স্থাপত্যকলার বিচারের মধ্যে আমরা একে একে নবপদবাচ্য এক এক শ্রেণীর শিল্পীর আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখছি, নিছক বাস্তুবিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ারকেও প্রাচীন কালে শিল্পী হতে হয়েছে এবং বর্ত্তমানের দাবীও তাই। তা ছাড়া আর এক শ্রেণীর শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম—প্রযোজক বা ডিরেক্টর। আধুনিক কালের ব্যান্ড অর্কেস্ট্রা অপেরা এবং সিনেমা প্রভৃতি গীতনাট্যগত রচনার মধ্যে ডিরেক্টর নামে এক শ্রেণীর নূতন শিল্পীর অভ্যুদয় আমরা লক্ষ্য করেছি। শিল্পের ইতিহাসে এই আবির্ভাব একেবারে নতুন কিছু নয়। ভারতীয় স্থাপত্যাচার্য্যেরা প্রধানতঃ প্রযোজক শিল্পীই ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কালে যেটা বিশেষ বিশেষ শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য হয়ে উঠেছিল, আমরা বিশ্বাস করতে পারি, আধুনিক কালে এবং ভবিষ্যতে সেটা সব দিকে প্রকাশ খুঁজবে এবং সত্য হয়ে উঠবে। এমন কি, যুগের শিল্প প্রগতির রীতি দেখে আরও উৎসাহিত হয়ে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে প্রযোজনার শিল্প একটি মহৎ শিল্প হিসাবে খ্যাতি লাভ করবে এবং প্রযোজক-শিল্পীরাই প্রধান হয়ে উঠবেন। স্বয়ং শিল্পী না হয়েও শুধু ভাবগ্রাহিতার গুণে এবং সুরুচির অধিকারীত্বে এই প্রযোজক শিল্পীরাই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব আনবেন। তারই উন্মেষ দেখা দিয়েছে। পৃথক্ পৃথক্ শিল্পীরা নানা উপকরণ দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেন। প্রযোজক শিল্পী এই শিল্পীদেরই উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করবেন এবং তার ফলে যে আর্ট সৃষ্টি হবে তাই আমাদের বিংশ শতাব্দীর নতুন আর্ট অথবা আর্টের গঠনতান্ত্রিক রূপান্তর বা বিপ্লব।

শুধু প্রাচীন ভারতের নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্য সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখতে পাই, স্থাপত্য ঠিক ইষ্টাপূর্ত্তের পর্য্যায়ে ছিল না। ইষ্টাপূর্ত্তের মধ্যে পাই বাপী কূপ তড়াগ প্রভৃতি এবং বড় জোর একটি দেব মন্দির। অবশ্য নগর রচনায় স্থপতিদের প্রতিভাকেই কাজে লাগানো হতো। কিন্তু এসবের মধ্যে স্থপতিদের শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং কৃতিত্বটাই চোখে পড়ে। জনহিতের জন্য, সর্ব্বসাধারণের গৃহাবাসের রূপটুকু মনোরম করবার জন্য স্থপতিদের কোন মনোযোগ ছিল না। স্থপতিরা শুধু রাজা ও দেবতার তুষ্টিবৃদ্ধি করেছেন। রাজপ্রাসাদ এবং দেবায়তন, বড় জোর রাজধানী ও রাজপথ—মাত্র এই দিকেই স্থপতিদের সব অধ্যবসায়

ক্ষয় হয়ে যেত। তাই প্রাচীন স্থাপত্যে আমরা বিরাটত্ব দেখতে পাই কিন্তু ব্যাপকত্ব পাই না। লক্ষ পর্ণকুটীরের মাঝখানে একটি কোনারকের মন্দির প্রচণ্ড শিল্প বৈভবে মাথা উঁচু করে রয়েছে—প্রাচীন কালের ইতিহাসে সর্ব্বত্র এই দৃশ্যটাই প্রকট। অবশ্য আজও যে শিল্পের এই আভিজাতিক দাসত্ব ঘুচে গেছে বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের জাতি ছন্দ আভাষ ও বিকল্প শ্রেণীর হর্ম্ম্য, অন্তর্মণ্ডল দ্বারশোভা ও অন্তর্নিহার, প্রাকার আর মহাগোপুর, দণ্ডক স্বস্তিকা ও মৌলিক অট্টালিকা, সবই একান্তভাবে ঐশ্বর্য্যবানের উপভোগ্য শিল্পের বর্ণনা। বৃহত্তর জনসাধারণের গৃহস্থালীর দীনতার কথাটাই এইসব বৃত্তান্তের ভেতর উহ্য হয়ে আছে।

ভারতের চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতের ইতিহাসে আমরা যেমন একটা পারিষদিক (বা Academic) বা দরবারী রূপ দেখতে পাই, তার লোকপ্রচলিত রূপও একটি দেখতে পাই। লোক চিত্রকলা (Folk-Painting) বা লোকসঙ্গীত (Folk Song) ইত্যাদি কথাগুলি এই শিল্পের এই লোকগত রূপকেই বোঝায়। যে কোন ক্লাসিক শিল্প গণসংযোগে এসে নতুন এক রূপ গ্রহণ করে। চিত্র ভাস্কর্য্য এবং সঙ্গীতের এই লোকগত রূপান্তর আমাদের দেশেও হয়েছে। দরবারী কানাড়া হয়তো একদিন কোন রাজার দরবারেই প্রথম মুখর হয়ে উঠেছিল, আজ কিন্তু সেই দরবারী কানাড়া এক পল্লীভিখারীর ভজন গানকেও প্রসন্ন করে তুলছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, স্থাপত্যকলায় এই রকম কোন লোকগত রূপান্তর আমরা দেখতে পাই না। প্রাচীন স্থপতির এত সকল বিকল আর পেচক প্ল্যান, এত শান্তিক পৌষ্টিক জয়দ ধনদ ও সর্ব্বকামিক নিকেতনতত্ত্ব—সবই রাজা ও দেবতার জন্য একচেটে হয়ে রয়ে গেছে। এত বৃহৎ ও সুন্দর একটি আর্ট এই আভিজাতিক বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে লোকসমাজে এক তিল প্রসার লাভ করতে পারেনি এবং কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। ভারতের জনসাধারণের গৃহাবাস সেই পর্ণকুটীর ও মাটীর কুঁড়ে হয়েই আজও রয়ে গেছে। হাজার বছরের মধ্যেও সেই স্থাপত্যের উৎকর্ষ কিছুমাত্র ছায়াপাত করতে পারেনি সাধারণের জীবনে। ভারতে লোকস্থাপত্য সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। ভারতের ক্লাসিক স্থাপত্যকলার এই সামাজিক সঙ্কীর্ণতা তাকে আজ ইতিহাসের বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই ঐ অসামাজিক শিল্পের মৃত্যু হয়েছে। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার কাব্য নৃত্য সঙ্গীতের জীবন্ত চিহ্ন আজও আমরা খুঁজে পাই, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সেই স্থাপত্য আজ আর কোথাও নেই। তার কারণ, প্রাচীন ক্লাসিক স্থাপত্য মানুষের ঘরে ঢুকতে পারেনি। একমাত্র রাজার ঘরেই ঢুকেছিল। সেই রাজা নেই, সেই স্থাপত্যও নেই। লোকগত হলে সেই স্থাপত্যের রেশ আজও নিশ্চয় বেঁচে থাকতো।

উপসংহারে এসে, আধুনিক স্থাপত্যের প্রসঙ্গে একটা নতুন পরিণামের ইঙ্গিত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। শিল্পের ইতিহাসে স্থাপত্য কোন কালেই ভৌগোলিক সীমা মানেনি। এক দেশের স্থাপত্যের রীতি নীতি ও ভঙ্গী অন্য দেশে প্রবর্ত্তিত হয়েছে। অবশ্য এটা শুধু স্থাপত্য শিল্পেরই বৈশিষ্ট্য নয়। সব শিল্পের মধ্যে এই আন্তর্জাতিকতার গুণ আছে। কিন্তু আধুনিক স্থাপত্যের সঙ্গে এসেছে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং। এই স্থাপত্য শুধু গির্জা মন্দির ও মসজিদের ডিজাইন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। দেশে দেশে ও জাতিতে জাতিতে ভৌগোলিক ব্যবধানকেও লোহার সাঁকো বেঁধে জুড়ে দিচ্ছে। সারা পৃথিবীতে রিইনফোর্সড্ কংক্রীটের ময়-মায়া ছড়িয়ে পড়েছে। সাত হাজার বছরের পুরানো দেবতা শিবকেও আজ কংক্রীটের

মন্দিরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। রেঙ্গুনের সোয়ে প্যাগোডাটি আজ সহস্র বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। রাজপথ হর্ম্ম্য দোকান আমোদাগার হামাম মার্কেট ইত্যাদি আধুনিক সভ্যতার যত বাস্তুগত প্রয়োজন, সব যেন আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দৌলতে একটি প্যাটার্নে সর্বত্র গড়ে উঠেছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এই ভৌগোলিক ব্যবধান নষ্ট করে দিয়েছে। দেশ ও জাতিগুলির দূরত্ব নিকটতর হয়ে আসছে। সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বাস্তুশিল্পেই সবচেয়ে আগে আন্তর্জাতিকতা দেখা দিয়েছে। সঙ্গীতে পরিচ্ছদে ও নৃত্যে জাতিগত প্রভেদ এখনো খুবই স্পষ্ট। এই ব্যাপারে সমীকরণের কোন প্রস্তাব সকলে মেনে নিতে রাজী নয়। এবং সে রকম লক্ষণ দেখা দিলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধও প্রবল হয়ে উঠে। কিন্তু আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা বাস্তুশিল্প যেন আমাদের অজ্ঞাতসারে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে খুব কম গোঁড়ামি ও আপত্তি দেখতে পাওয়া যায়। লছমন্ ঝোলায় ঝুলে ঝুলে খরস্রোতা নদী পার হবার মত ধর্ম্মনিষ্ঠা আর কোন তীর্থযাত্রীর নেই। বরং একটি সুকঠিন লোহার পুল পেয়েই তীর্থযাত্রী ভক্তেরা খুসী হয়েছে।

জনপদ রচনার একটি প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি আছে—সর্ব্বতোভদ্র পদ্ধতি (বা প্ল্যান)। জনপদের চারদিকে চারটি মুক্ত দ্বার থাকা চাই—তারই নাম সর্ব্বতোভদ্র প্ল্যান। আধুনিক স্থাপত্যকেই আমরা এক কথায় সর্ব্বতোভদ্র আখ্যা দিতে পারি। কোন দেশ-জাতির একেবারে নিশ্ছিদ্র বন্ধনের মধ্যে আধুনিক স্থাপত্য আবদ্ধ নয়। আধুনিক স্থাপত্যের চারদিক খোলা। প্রাচীনের তুলনায় আধুনিক স্থাপত্য ঢের বেশী লোকগত হয়েছে। আধুনিক এক গরীব কেরাণীর বাড়ীটির মধ্যে আধুনিক স্থাপত্যের ছাপ আছে। আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা স্থাপত্যের লৌকিক সংকীর্ণতা নষ্ট করে দিয়েছে—সর্ব্ব দেশের আসরে এবং সর্ব্বজাতির সংস্কৃতিতে একটি শিল্পগত ঐক্যকে প্রথম সত্য করে তুলেছে।

ভারতের ভাস্কর্য্য

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দেবার মত দুঃসাহস কোন সমালোচকের আছে কি না জানি না। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের বৈচিত্র্য ব্যাপকতা সূক্ষ্মতা রম্যতা ও বাস্তবতা, এর উত্থান পতন ও আহরণ, এর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন, এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য, এর সাংস্কৃতিক প্রসার—সবকিছু মিলে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের যেন ভিন্ন একটা জাগতিক সত্তা আছে। মুগ্ধ দর্শক শুধু এক একটি মূর্ত্তির যুগবিভূতির দিকে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে থাকে। ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মা যুগে যুগে কী বিচিত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করেছে, কী স্পষ্ট কল্পনায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে, সেই ইতিহাস যেন মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে গ্রথিত হয়ে আছে। ভারতীয় সংস্কৃতির সেই সজীব উৎস বহুকাল হলো শুকিয়ে গেছে। সেই ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য্য আমাদের হাতে হাতে পুরুষপরম্পরায় সুরক্ষিত হয়ে আসেনি। সে ঐশ্বর্য্য হারিয়ে গেছে। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এই চরম লুপ্তি, ভারতীয় সংস্কৃতির অধঃপতনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। আমাদের সংহিতাবদ্ধ জীবন এখনো হয়তো সেই শিব ও বিষ্ণুর স্তোত্রগুলি আউড়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই স্তোত্রের কাব্যিক আত্মাটিকে পাথরে ও মাটিতে গড়ে তুলতে পারে না। সেই শিব আর বিষ্ণুকে রচনা করতে আমরা ভুলে গেছি। এক মৃতযুগের বাহক হিসাবে শুধু আমরা শবাধার বহন করি, সেই জীবনের শোভাযাত্রা বন্ধ হয়ে গেছে।

ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গ্যালারিটিকে সেই মূর্ত্তিগুলি দিয়ে আমরা মনে মনে

একবার সাজিয়ে দেখতে পারি। পথিক দর্শক তা' হলে যেন এক স্বপ্নলোকের রূপের মধ্যে আবেশে ঘুরতে থাকবে। এই গ্যালারির ভেতর প্রথম প্রবেশ করেই যে মূর্ত্তিটি প্রথম চোখে পড়বে, তার বেদীটি তৈরী হয়েছিল পাঁচহাজার বছর আগে। ইনি হলেন মহেঞ্জোদাড়োর চুনাপাথরের যোগী। উপবীতের ভঙ্গীতে একটী কাপড় দিয়ে শরীর জড়ানো—একদিকের কাঁধ ও বাহু অনাবৃত। পরিপাটি চাপদাড়ির ওপর পুরু ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসি মিশে আছে। চোখে বেশ একটা নিরুদ্বিগ্ন প্রসন্ন দৃষ্টি। মহেঞ্জোদাড়োর এই যোগীর চেহারায় একটি আন্তর্জাতিক উদারতার ছাপ রয়েছে। মনে হয়, ইনি যেন প্রাচীন মিশরকে জানেন। বোধ হয় প্রাচীন ব্যাবিলন একবার ঘুরে এসেছেন। সিন্ধু সভ্যতার এই প্রতিনিধি মানবের সমস্ত পরিচয় এখনো আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর মারফৎ আমরা প্রাচীন সিন্ধু-সভ্যতার সেই কলাদেহটির স্বরূপ অনুমান করে নিতে পারি। প্রাচীন মহেঞ্জোদাড়ো আধুনিক ভারতের মত ভাস্করহীন দেশ ছিল না। সভ্য সজীব ও সুসংস্কৃতির আধার মহেঞ্জোদাড়োতে ভাস্করেরা সজাগ ছিল। সে-যুগের ও সে-জাতির সংস্কৃতিকে তারা মূর্ত্তিমান করেছে।

পথিক দর্শক শুধু মূর্ত্তিময় তপোবনের মত এই গ্যালারির প্রতি বেদীর সম্মুখে বিস্মিত হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাতে জানাতেই সারা হয়ে যাবে। দেখা যাবে, এক একটি যুগের স্রোত যেখানে মন্দা হয়ে আসছে, সেখান থেকেই নতুন যুগের ধারা উৎস হয়ে উঠছে। কোথাও বা দুই ভিন্ন ধারা এসে মিশে গেছে। কোথাও বা ভারতের সীমার বাইরে থেকে মূর্ত্তিগুলির আত্মা আমদানী করা হয়েছে। কোথাও বা ভারতের বাণী দেশের সীমা ছাড়িয়ে দূর সমুদ্রপারে নতুন নতুন দ্বীপে মূর্ত্তি লাভ করেছে। বৃহত্তর ভারতের সেই পালিত মূর্ত্তি-সন্তানেরা এই গ্যালারির এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। প্রাচীন ইরাণ, কুশান, হেলেনীয় গ্রীস—ভারতের সংস্কৃতির স্পর্শে নতুন মূর্ত্তিতে ফুটে উঠেছে। পাথর চুণাপাথর লাল বেলে পাথর, তামা, ব্রঞ্জ টেরাকোট্টা (পোড়ামাটি) ও কাঠ—ভাস্করের কুশলী যন্ত্রের আঘাতে সকল কঠিনতা হারিয়ে বিচিত্র রূপের সমারোহ সৃষ্টি করেছে।

এইখানে দাঁড়িয়ে আছেন এলিফ্যান্টার বিরাট ত্র্যম্বক সদাশিব। মোটা মোটা ঠোঁট, বিরাট মুকুটে ও চূড়ায় সুপ্রচুর কারুকার্য্য। নিজের গরিমায় আত্মস্থ পরম ঐশ্বর্য্যবান শিবমূর্ত্তি। এই শিব জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, জগৎ তাঁকে দেখছে। এক নির্বিকার প্রশান্ত গর্বের রূপ।

মীরপুর থাসের ব্রহ্মাকে দেখা যায়। একেবারে অন্যধরণের মূর্ত্তি। যেন এক বয়স্ক চীফ-জাস্টিসের প্রতিমূর্ত্তি। খাড়া নাক, সুবঙ্কিম দুটি রেখার মধ্যে আয়ত ঠোঁট। অর্দ্ধ নিমীলিত চোখে একটা চিন্তামগ্ন আবেশ। মাথার ভঙ্গীতে অদ্ভুত এক সম্ভ্রম ও অহঙ্কার ফুটে উঠেছে।

এর পাশেই আর একটি ব্রহ্মাকে দেখা যায়—চোলযুগের ব্রহ্মা, দক্ষিণী ব্রহ্মা। তরুণ পৌরুষের এত সুন্দর মূর্ত্তি পৃথিবীর কোন ভাস্কর্য্যে দেখা যায় না। চোখ, ঠোঁট, চিবুক, ভুরু ও নাকের এমন নিখুঁত সমাবেশ বিরল। এক মহাকাব্যের তরুণ নায়কের মত এই মূর্ত্তি।

মহাবলীপুরমের 'পাথুরে পালোয়ান'কে দেখা যায়। মাংসপেশীর স্তূপ শরীরের ওপর ফুলিয়ে ফুলিয়ে ভাস্কর এই পালোয়ানের শারীর গৌরবকে স্থূলভাবে কীর্ত্তিত করেনি। কাঁধ বুক কটি বাহু ও পদের সৌষ্ঠবগত সমন্বয়ের ভেতরেই শক্তিমত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ভুবনেশ্বরের নায়িকাদের কাছে এসে আধুনিক গোঁড়া নীতিবাগীশও একবার ভুল করে থমকে দাঁড়াবেন। গ্রীসীয় নগ্নিকাদের সঙ্গে ভুবনেশ্বরের নায়িকাদের তুলনা করা চলে না,

কেননা উভয়ের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। গ্রীসীয় নায়িকা দর্শকের চোখকে তার অবয়বের রহস্যের দিকে টানতে থাকে। কিন্তু ভুবনেশ্বরের নায়িকা অর্দ্ধ নিরাবরণা হয়েও দর্শককে যেন তার মনের কথাটাই বলতে চায়। নায়িকার ত্রিভঙ্গঠাম, মুক্ত কুচশোভা, গভীর নাভি-ত্রিবলী, লীলায়িত বাহু ও লাস্যাধরের আবেদন প্রতি মুহূর্ত্তে এক ক্রীড়াসঙ্গিনীর চঞ্চল আত্মাকে দর্শকের দৃষ্টিপথে টেনে আনে। এই মূর্ত্তি দর্শকের মনকে উদ্দীপিত করে, উত্তেজিত করে না। মূর্ত্তির সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়ালে সে যেন হেসে হেসে অভিনন্দন জানায়, চলে যাবার সময়ও যেন হেসে হেসে বিদায় দেয়। দর্শককে আর একবার চোখ ফিরিয়ে দেখতে হয়—মনে হয় নায়িকার ঠোঁটে ভাষা যেন অর্দ্ধোচ্চারিত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু মথুরার যক্ষিণী ও সাঁচীর বৃক্ষকাদের মধ্যে এই সুস্মিত চটুলতার বালাই নেই। উঁচু কার্ণিশের কারুশোভাকে মাথার ওপর বহন করে, দুই বাহু ছড়িয়ে বক্ষস্ফীত করে তারা যেন তাদের দেহের সকল মাংসলত্বকে বিজ্ঞাপিত করছে।

নেপালের কুবের এবং যবদ্বীপের অগস্ত্যের মূর্ত্তি দুটির পেটের গঠন লক্ষ্য করার বিষয়। অগস্ত্যের ঔদরিক শক্তির কথা সকলেই জানেন, এক চুমুকে সমুদ্র পান করেছিলেন। অগস্ত্যের ভুঁড়ির মধ্যে যেন সেই ঔদরিকতার প্রহসনটুকু লুকিয়ে আছে। নেপালী কুবেরের বর্ত্তুল পেটটিও দেখবার মত। টাকাওয়ালাদের অমানুষত্বটুকু এই স্ফীতোদরের গড়নের মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভাস্করের রিয়েলিজ্‌ম্ প্রশংসনীয়।

ভারতের নরসিংহের মূর্ত্তিটিও চোখে পড়বে। পাশব শক্তির এই প্রচণ্ডতার পরিকল্পনা ভারতীয় ভাস্করের প্রতিভার মৌলিক দান। ভারতীয় গ্রোটেস্কের এই ভয়ানক রস লক্ষ্য করার বিষয়। অন্যান্য দেশের গ্রোটেস্ক যথা—স্ফিংক্স ড্রাগন প্রভৃতির মধ্যে ভয়ানক রসের অভাব আছে। তারমধ্যে বীভৎস রসের প্রাধান্যটাই বেশী।

কিন্তু ভয়ানক রসের চরম মহিমান্বিত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় শিবের এক একটি সংহার মূর্ত্তির মধ্যে। কালসংহার শিবের নৃত্যোন্মত্ততার মধ্যে, নটরাজের ভঙ্গীতে এবং সবচেয়ে বেশী ত্রিপুরান্তক মূর্ত্তির মধ্যে। এই গলিতজটা, নয়নে-রুদ্র-বহ্নি, উদ্যতত্রিশূল, আভিচারিক ভঙ্গীর মধ্যে সংহারের আকুলতা দিব্য রূপ লাভ করেছে।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের গ্যালারির শেষ নেই যেন। কত উমা-মহেশ্বরের বিহ্বল দাম্পত্য, গ্রোটেস্ক গণেশ, অর্দ্ধনারীশ্বর, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব শক্তি ও প্রজ্ঞাপারমিতা একের পর এক অন্তহীন মিছিলের মত চলে গেছে যুগ যুগান্তের পথে পথে।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এই গ্যালারির একদিকে যবদ্বীপের প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তিটির দিকে একবার দৃষ্টি দেওয়া যাক্। দেখামাত্র দর্শককে স্বীকার করে নিতে হবে, পৃথিবীর ভাস্কর্য্যের ইতিহাসে এই মুখশ্রীর তুলনা নেই। নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ—এই মূর্ত্তি শুধু নারীত্বের মূর্ত্তি। কোন্ ভাস্করের ধ্যানে নারীত্বের এই রূপ প্রথম জন্মলাভ করেছিল আমরা জানি না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, সেই শিল্পীর মনটিকেও আমরা উত্তরাধিকার হিসাবে পাইনি। সেই শিল্পী শেষ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেই শিল্পের ঐতিহ্যও মুছে গেছে।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার শেষে এসে আর একটা প্রশ্ন মনে জাগে। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এই ঐশ্বর্য্যের মূলে কি শুধু ভাস্করদেরই কৃতিত্ব?

প্রতিমা লক্ষণম্ নামে আমাদের একটি ভাস্কর্যবিদ্যার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আছে। মূর্ত্তি প্রকরণের সময় ভাস্করদের এই লক্ষণ অনুসারে শিল্পসৃষ্টি করতে হতো। ভিন্ন ভিন্ন শিল্পসূত্র ও আগম

শাস্ত্রগুলির মধ্যেও মূর্ত্তিতত্ত্ব প্রকরণের নিয়মাবলী লেখা আছে।

এখন প্রশ্ন আসে, এই মূর্ত্তিগুলি কি ভাস্করদেরই কল্পনায় প্রথম জন্মলাভ করে? অথবা এসব কি শুধু ভক্ত ও সাধক কবিদের কল্পনার মূর্ত্তি? ভাস্করেরা কবি-কল্পনার মূর্ত্তিগুলিকে রূপ দিয়েছিলেন, না কবিরা ভাস্করের সৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে স্তবে ও স্তোত্রে অভিনন্দন রচনা করেছিলেন? প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য্যের ইতিহাসের রীতিনীতি লক্ষ্য করলে মনে হয়, ঐ উভয় উক্তিই সত্য। কবিত্বগুণের অধিকারী ভাস্কর যেমন ছিলেন, তেমনি ভাস্কর্য্যপ্রতিভাসম্পন্ন কবিও ছিলেন। নইলে শুধু প্রতিমালক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে এত প্রাণবান ভাস্কর্য্য রচনা সম্ভব হতো না। সংস্কৃতিময় ভারতের কবিত্বকে একদিন যেমন ভাস্করেরা পাথরে কীর্ত্তিত করেছে, তেমনি নিশ্চয় কোন কোন ভাস্করের প্রতিভা নিজস্বগুণে সম্পূর্ণ শাস্ত্রাতিরিক্ত নতুন মূর্ত্তি একদিন সৃষ্টি করেছে। কবি ও সাধকেরা পরে সেই মূর্ত্তিকে ছন্দে ও শ্লোকে গেঁথেছেন।

সোমনাথ

উনিশ'শো সাতচল্লিশ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি দিন। মাত্র একমাস আগে সারা ভারতে স্বাধীনতা লাভের পুণ্যাহে মহোৎসব হয়ে গেছে। সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরে এক মন্দির-নিকেতনের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দুই ব্যক্তি। দর্শক দুজনের চোখের দৃষ্টিতে বেদনা ফুটে উঠেছিল, কারণ দৃশ্যের মধ্যেও একটা বেদনা ছিল। ভারত ইতিহাসেরই একটি বেদনা। এক বিরাট স্থাপত্যমহিমার শ্মশানসমাধির মতই দেখাচ্ছিল সেই ধ্বংসীভূত মন্দিরকে। শীর্ষ নেই, আমলক নেই, প্রদক্ষিণ পথে বন্য-গুল্ম ও কন্টকের সমারোহ। মন্দিরদেহ চূর্ণ হয়ে গেছে, চারদিকে ছড়িয়ে আছে শুধু তার শত সহস্র শিলাময় অস্থি ও কঙ্কালের খণ্ড। তার ভগ্ন স্তম্ভে এবং বিগলিত সোপানে ও চত্বরে দূরাতীত কালের এক অপমানের আঘাত চিহ্ন আজিও দেখা যায়। যেন নির্বাক অভিযোগ নিয়ে সমুদ্রোপকূলের নির্জনতার মধ্যে একা পড়ে আছে সেই মন্দিরাবশেষ।

সৌরাষ্ট্রের সমুদ্রতীরের এই স্থানটির নাম ভারতবাসী মাত্রের কাছে পরিচিত—প্রভাসপত্তন। অদূরে দেখা যায় 'দেহোৎসর্গে'র শ্যামতরুরেখা, যেখানে মহাভারতের সকল ঘটনা ও কর্মবিপ্লবের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ একদিন তরুছায়াতলে নিদ্রিতাবস্থায় ব্যাধের সায়কে বিদ্ধ হয়ে শান্ত ও নিরাড়ম্বর মৃত্যু বরণ করে নিলেন। ভারত ইতিহাসের স্মৃতিপূত এমনই এক স্থানে ও পরিবেশে দাঁড়িয়ে যে দর্শক দুজন বিধ্বস্ত মন্দিরের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁদের একজন হলেন ভারতের সর্দার ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই এবং অপরজন হলেন ভারতের পূর্ত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল। বিধ্বস্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণভূমি থেকে কিছু দূরে এক প্রান্তরের প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল স্থানীয় পল্লীবাসীদের জনতা কৌতূহলী হয়ে। স্বাধীন ভারতের সর্দারকে অভিনন্দন জানাবার জন্যেই তারা এসেছিল।

শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল হঠাৎ প্রশ্ন করেন—এ মন্দিরকে কি নূতন করে আবার গড়া যায় না সর্দারজী?

সর্দার বল্লভভাইয়ের চোখের দৃষ্টি দীপ্ত হয়ে ওঠে। যেখানে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে সমুদ্রের জল ঢেউ তুলে ছুটে এসে সশব্দে ভেঙ্গে পড়ছে। সমুদ্রজলের এ উচ্ছ্বাসে যেন বহু শতাব্দীর আবেদন কল্লোলিত হয়ে উঠছিল। সর্দারজী

একবার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তারপর আবার মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরেই উত্তর দিলেন—হ্যাঁ, গড়া যায়, গড়া হবে।

শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল—তাহ'লে আমি আজ ভারতবাসীর কাছে এইকথা ঘোষণা করে দিতে পারি কি, যে ভারতের সর্দার সোমনাথ মন্দির নতুন করে গড়ে তুলবার সিদ্ধান্ত করেছেন?

সর্দারজী—হ্যাঁ, ঘোষণা করে দিতে পারেন।

কয়েক মিনিট পরেই অদূরে অপেক্ষমান স্থানীয় জনতার কাছে শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল এই মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে দিলেন। জনতা উল্লাসে জয়ধ্বনি করে—জয় সোমনাথ!

জয় সোমনাথ! এই ধ্বনিতে সেদিন যেন প্রভাসপত্তনের এই ধ্বংসস্তুপে ঘুমন্ত শতাব্দী জেগে উঠলো। বহু দিন, বহু বৎসর এবং কয়েক শতাব্দীর পর এ স্থানের বাতাসে এই জয়ধ্বনি আবার শিহর সঞ্চার করলো।

সোমনাথ! সোম অর্থাৎ চন্দ্রদেবের পূজ্য মহাদেব। এইখানে মহাদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে নিত্য পূজা করতেন সোম। নিত্য সমুদ্রজলে স্নান করতেন। সৌরাষ্ট্রের উপকূলভাগের এই স্থানটিতে ভারতীয় পুরাণেরই একটি কাহিনী ধূলি-বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে। দক্ষের সাতাশটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন সোম। কিন্তু প্রেমের ব্যাপারে একজনের ওপর সোমের পক্ষপাতিত্ব ছিল, রোহিণীর ওপর। রোহিণীই ছিলেন সোমের প্রেমভাগিনী আর সকলেই নিতান্তই স্ত্রী। সোমের এই অনুরাগ-বৈষম্যে দুঃখিতা সোম-পত্নীর দল পিতা দক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেন। রুষ্ট শ্বশুর দক্ষ রাগ করে সোমকে অভিশাপ দিলেন—এই অন্যায়ের ফলে তুমি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হবে। সোমের অনুনয়ে এবং সোমের পক্ষ নিয়ে অন্যান্য দেবতাদের অনুরোধে শ্বশুর দক্ষ জামাতা সোমকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু একটি সর্তে— মহাদেবের বিগ্রহ স্থাপন করে নিত্য পূজা করতে হবে এবং তাহলেই মাসে এক পক্ষকাল ধরে দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হলেও এক পক্ষকাল ধরে ক্ষয়পূর্তি হবে।

দক্ষের আজ্ঞা শিরোধার্য ক'রে সোম নিত্যপূজার জন্যে জ্যোতির্লিঙ্গম্ স্থাপন করলেন। পুরাণমতে এই হলো সোমনাথ বিগ্রহের ও সোমনাথ মন্দিরের প্রথম প্রকাশের কাহিনী।

কিম্বদন্তী আছে, সমুদ্রের জল জোয়ারের আবেগে স্ফীত হয়ে এসে এই জ্যোতির্লিঙ্গকে নিত্য স্নান করিয়ে দিত। সোম তাঁর প্রিয় দেবতার পূজার জন্যেই বুঝি সমুদ্রজলে জোয়ার-ভাঁটার লীলা সৃষ্টি করেছিলেন। যাইহোক, কিম্বদন্তীর ভেতর থেকে সোমনাথ বিগ্রহের প্রাচীন ইতিহাস হিসাবে অন্ততঃ এইটুকু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে সোমনাথ লিঙ্গম্ সম্ভবত সমুদ্রতীরে উন্মুক্তস্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোন মন্দির ছিল না। সমুদ্রের জল জোয়ারের আবেগে এসে প্রতিদিন লিঙ্গম্-এর ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেত। যিনি প্রথম সোমনাথ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি যে শুধু ভক্ত ছিলেন তা নয়, তিনি কল্পনাকুশল কবি এবং পরিকল্পনাকুশল শিল্পীও ছিলেন। নৈসর্গিক লীলা ও রূপের সঙ্গে সমন্বিত করে তীর্থস্থান পরিকল্পনা করার নিদর্শন ভারতে অনেক আছে। সোমনাথও এই ধরণের উচ্চস্তরের ভক্ত-শিল্পীমনের একটি বিশিষ্ট সৃষ্টির উদাহরণ।

ঠিক কোন্ সময়ে এবং কার উদ্যোগে সোমনাথ মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এ বিষয়ে একেবারে সঠিকভাবে যদিও কিছু বলা যায় না, তবুও স্থানীয় ভূস্তরের নিম্নে

খননকার্যের ফলে যেসকল তথ্যমূলক নিদর্শন পাওয়া গেছে তারই ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতকে প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। তখন সোমনাথ ছিল শিবপন্থী পাশুপত সমাজের ধর্মসাধনার প্রধান পীঠস্থান। প্রথম মন্দিরটি কালের প্রকোপেই বিনষ্ট হয়ে যায়। প্রথম মন্দিরের ভিত্তিভূমির ওপরেই দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয় বল্লভী রাজবংশের শাসনকালে, ৫০০—৭০০ খৃষ্টাব্দে। এই মন্দিরটিরও কালক্রমে ভগ্নদশা যখন হয় তখন সেই পুরাতন মন্দিরদেহের সঙ্গেই গ্রথিত করে নূতন মন্দির নির্মিত হয়। এই তৃতীয় মন্দিরটির নির্মাণ কাল হলো ৮০০ খৃষ্টাব্দ। কনোজের প্রতাপশালী গুর্জর প্রতিহার সম্রাটদের রাজত্বকালে মন্দিরটির যথেষ্ট উন্নতি হয়। গুর্জর-প্রতিহার সম্রাটরা ৮০০—৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারতে রাজত্ব করেন এবং তাঁরা সোমনাথের ভক্তও ছিলেন।

সোমনাথের খ্যাতি শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সোমনাথ ছিল সে সময় ভারতের একটি বৃহৎ বন্দর। বৈদেশিকের পোত সোমনাথ বন্দরে বিশ্রাম করতে আসতো এবং বৈদেশিক বণিক ও নাবিকেরা সোমনাথ মন্দিরের বিরাট রত্নবৈভব দেখে বিস্মিত হয়ে দেশে ফিরে যেত। আরব পর্যটক আল বেরুণি এবং রোমক পর্যটক মার্কো পোলোর লিখিত বিবরণীতে সোমনাথের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দশম শতাব্দীর পরেই সোমনাথ পত্তনের অদৃষ্টে আঘাতের অধ্যায় আরম্ভ হয়। সোমনাথ হতে অনেক দূরে, হিন্দু ভারতের উত্তর সীমান্ত ছাড়িয়ে গজনীরাজ মামুদ সোমনাথ মন্দিরের ঐশ্বর্যের কাহিনী শুনে বিচলিত হয়ে উঠলেন এবং সোমনাথ পত্তনের অধিবাসী একদিন দেখতে পেলেন—শত্রু দুয়ারে পৌঁছে গেছে।

গজনীর মামুদ কর্তৃক সোমনাথ মন্দির আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমান ঐতিহাসিক ইবন আসিরের লিখিত বিবরণীতে বলা হয়েছে : 'ছাপান্নটি স্তম্ভের ওপর মন্দির-কক্ষটি স্থাপিত। বিগ্রহের চতুর্দিকে এবং উপরে ও নীচে শ্রেণীবিন্যস্ত রত্নপ্রদীপ। বিগ্রহের নিকটে একটি ঘণ্টা যে স্বর্ণশৃঙ্খলে বাঁধা আছে, তার ওজন ২০০ মণ। নিকটেই একটি রত্নাগার, তার মধ্যে অজস্রসংখ্যক স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূর্তি। এক হাজার পূজারী বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত। তিন শত গায়ক মন্দিরের দ্বারে গীতবাদ্য ও নৃত্যের অনুষ্ঠানে নিযুক্ত।'

বিরাটসংখ্যক অশ্বারোহী এবং উষ্ট্রারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে লুণ্ঠক মামুদ সোমনাথ মন্দির আক্রমণ করলেন, ১০২৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের এক বৃহস্পতিবারে। শুক্রবারও সারাদিন আক্রমণ চলে এবং শনিবার দিন আক্রমণকারী ও আক্রান্তের যুদ্ধ চরম হয়ে ওঠে। মন্দিরের ভেতর থেকে দলে দলে হিন্দু বের হয়ে আসতে থাকে, মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করে এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বাধা দিয়ে একে একে মৃত্যুবরণ করে।

লুণ্ঠক মামুদ ৫০ সহস্র নিহত হিন্দুর শোণিতে রাঙা পিচ্ছিল প্রবেশপথ পার হয়ে মন্দির অভ্যন্তরে ঢুকে বিগ্রহ চূর্ণ করলেন এবং সমস্ত স্বর্ণ-রৌপ্য রত্ন ও মন্দিরের হীরকখচিত দ্বারটি পর্যন্ত নিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করলেন।

এই হলো ইবন আসিরের লিখিত ইতিহাসে বর্ণিত কাহিনী। এ কাহিনীর মধ্যে মামুদের জয়গৌরব এবং মন্দিররক্ষার্থী হিন্দু পরাজয়ের বর্ণনায় অনেক মিথ্যা আছে। মিনহাজ-উস্-সিরাজ নামক আর এক ঐতিহাসিকের লেখাতেও (তবাকত-ই-নাশিরি) মামুদের শৌর্য ও

গৌরব সম্বন্ধে বহু-বাচনিকতার ঘটা আছে। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্রে ঘটনার ভিন্ন রকমের বিবরণ পাওয়া যায়।

সোমনাথ মন্দির আক্রমণের পূর্বে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতের উত্তর অঞ্চল কয়েকবার আক্রমণ করেছিলেন। আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন। এবং এক একটা লুণ্ঠনের পালা শেষ করে তিনি গজনীতেই ফিরে যেতেন। উত্তর ভারতে তিনি কোন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেননি, আফগানিস্থানের গজনীই ছিল তাঁর রাজধানী। তবে সমগ্র পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর ওপর তিনি রাজনৈতিক প্রভুত্ব রেখেছিলেন। সোমনাথের ওপর আক্রমণই তাঁর শেষ ভারত আক্রমণের ঘটনা। আলবেরুনি এবং ইবনে আসির মামুদের বীরত্বের অনেক ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু অন্য একজন মুসলমান ঐতিহাসিকেরই লেখায় জানা যায় যে, 'সোমনাথ লুঠ করে ভারত থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি হিন্দু সামন্তদের আক্রমণে বার বার পরাজিত হয়েছিলেন। বিশেষ করে রাজপুতানার মরুভূমি অঞ্চলের হিন্দু রাজারা মামুদকে পদে পদে বিপর্যস্ত করেছিলেন। রত্নের বোঝা নিয়ে লুণ্ঠক মামুদ বস্তুত বারবার যুদ্ধ এড়িয়ে কোন মতে পালিয়ে যাবার চেষ্টাই করেছিলেন এবং তাঁর সে চেষ্টা সফল হয়েছিল। [ফার্সী ভাষায় লিখিত প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণী তারিখ-ই-সোরট (সৌরাষ্ট্র)।]

যাই হোক, লুণ্ঠক মামুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রাণপাত করেও মন্দির রক্ষী হিন্দুর দল শেষ পর্যন্ত মন্দির রক্ষা করতে পারেন নি। লুণ্ঠক মামুদ সোমনাথ মন্দিরকে পুড়িয়ে দিয়ে চলে যান।

তৃতীয় মন্দিরটি কালের প্রকোপে ধ্বংস হয়নি, ধ্বংস করেছিল ধর্মের অছিলায় লুণ্ঠনোন্মত্ত মামুদ। মালবরাজ ভোজ এবং গুজরাটরাজ ভীমের উদ্যোগে চতুর্থ মন্দির নির্মিত হয় তৃতীয়ের ধ্বংসস্তূপের একাংশে, মামুদের প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরেই। তারপর ১১৬৯ খৃস্টাব্দে গুজরাট রাজ কুমারপাল মন্দিরটিকে নূতন করে এবং বিরাট আকারে নির্মাণ করেন। এইটি হলো সোমনাথের পঞ্চম নির্মিত মন্দির। আজ সোমনাথ মন্দিরের যে ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়, সেটা হলো কুমারপাল কর্তৃক নির্মিত মন্দিরেরই ধ্বংসস্তূপ।

কুমারপালের নির্মিত পঞ্চম মন্দিরটিও কালের প্রকোপে বিনষ্ট হয়নি, হয়েছে ধর্মবিদ্বেষীর আঘাতের প্রকোপে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খিলিজির সেনাপতি পঞ্চম মন্দিরের বিগ্রহ ধ্বংস করেন, কিন্তু মন্দিরটিকে সমূহভাবে ধ্বংস না করে শুধু কিছু জখম করেই অব্যাহতি দেন। ১৩০৮—২৫ অব্দে গুজরাটরাজ মহীপাল দেব মন্দির-নিকেতনের সংস্কার সাধন করেন। এর পর থেকে হিন্দু ধর্মবিদ্বেষীরা কয়েকবার শুধু বিগ্রহ অপসারিত করে, মন্দিরটিকে অক্ষত রেখে। ১৩৭৫ সালে গুজরাটের সুলতান একবার বিগ্রহ অপসারিত করলেন। হিন্দু প্রজারা আবার নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করে। ১৪১৩ সালে গুজরাটের সুলতান আহমদ শা মন্দিরের কিছুটা ক্ষতি করেন এবং বিগ্রহও অপসারিত করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দু প্রজাদের চেষ্টায় আবার মন্দিরের সংস্কার সাধন এবং বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। গুজরাটের সুলতান বেগদা ১৪৫৯ সালে বিগ্রহ অপসারিত করে মন্দিরটিকে মসজিদে পরিণত করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে হিন্দুরা মসজিদকে আবার মন্দিরে পরিণত করবার সুযোগ পায় এবং বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল বাদশাহ আকবরের সময় থেকে আরম্ভ করে শাজাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত

সোমনাথ মন্দিরকে বিশেষ কোন বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু তার পরেই এলেন আওরঙ্গজেব। ১৭০৬ অব্দে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে বিগ্রহ ও মন্দির উভয়কেই সমূহভাবে ধ্বংস করে ও পুড়িয়ে ফেলা হয়। আজও বিধ্বস্ত সোমনাথ মন্দিরের স্তূপের মধ্যে ভগ্নস্তম্ভের অঙ্গে ধর্মদ্বেষীর হিংস্র মশালের জ্বালা ও কালিমার চিহ্ন রয়েছে। আওরঙ্গজেব মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের ওপরেই মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নির্মাণকার্যের অসুবিধার জন্যেই সে পরিকল্পনা বর্জন করেন।

আওরঙ্গজেবের সময়েই সোমনাথ মন্দিরের যে প্রদীপ নিভে যায়, সে প্রদীপ আর জ্বলে উঠবার সুযোগ পায়নি। নূতন করে মন্দির গড়ে তুলবার চেষ্টা অথবা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আর হয়নি। ১৭৮৩ সালে ধর্মশীলা অহল্যাবাঈ সোমনাথের ঐতিহাসিক মন্দিরনিকেতনের ভগ্নস্তূপ থেকে কিছু দূরে স্বতন্ত্রভাবে নূতন একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

স্বাধীন ভারতে, ইংরাজী ১৯৫১ সালের ১১ই মে তারিখে, বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে প্রভাসপত্তনের সৈকতভূমিতে সেই ঐতিহাসিক মন্দিরনিকেতনের কক্ষেই আবার নূতন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মহোৎসব হবে। সাতটি শতাব্দী ধরে যে মন্দির ও বিগ্রহ বার বার ধর্মদ্বেষীর আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছে এবং সার্ধ দুই শতাব্দী ধরে সে ভগ্নাবশেষ অতীত ইতিহাসের স্মারকচিহ্ন হিসাবে মাত্র প্রত্নতাত্ত্বিকের কৌতূহল এবং প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের করুণা উদ্রেক করেছে। ভক্তের সমাগম হয়নি। পূজা ছিল না, আরতি ছিল না। সোমনাথ পত্তনের পত্তনটুকু মাত্র ছিল, সোমনাথ ছিল না।

১৯৫১ সালেব ১১ই মে তারিখে সোমনাথ আবার জাগছেন। এই ঘটনাকে নিতান্ত ধর্মশীল হিন্দু ভারতীয়দের জন্য একটা পুরাতন মন্দিরের পুনর্নির্মাণ বা বিগ্রহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অথবা একটি স্থানের তীর্থগৌরব নতুন করে প্রবর্তনের আয়োজন বলে মনে করলে ঘটনাকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হবে না। সোমনাথের ইতিহাসে মানবসভ্যতারই একটি মূল সত্যের পরীক্ষার ইতিহাস পাওয়া যায়। ধ্বংসীর শক্তিই পৃথিবীতে জয়ী হয়, না রচয়িতার শক্তি জয়ী হয়? ভাঙনের ধর্ম বড়, না সৃষ্টির ধর্ম বড়? আক্রমণের অথবা রক্ষার—এ দুই কর্মবাদের মধ্যে ঐতিহাসিক শক্তি লাভ করে কোনটি? এই সব প্রশ্নেরই মীমাংসা রয়েছে সোমনাথ মন্দিরেরই ইতিহাসে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদ্বেষী ও ধ্বংসীর দল সোমনাথকে ভেঙেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সোমনাথ মন্দিরের দেহ শুধু ভেঙেছে, প্রাণ ভাঙেনি। সেই ধ্বংসের শ্মশানভূমিতেই বার বার প্রাণবন্ত হয়ে জেগে উঠেছে সোমনাথ। সোমনাথ মন্দির জাগতিক কল্যাণশক্তির অভ্যুদয়ের প্রতীক।

সুলতান মামুদ কয়েকবার কাশ্মীর আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। এই সব ঘটনা থেকে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, তৎকালীন হিন্দুদের দেশপ্রেম, শৌর্য ও যোদ্ধাসুলভ গুণের অভাব ছিল না। এবং মামুদও মস্ত বড় বীর ছিলেন না। তবু কেন দূর গজনী থেকে মামুদের মত লুণ্ঠক মনোবৃত্তির একজন আক্রমণকারী বার বার এসে উত্তর ভারতকে বিপর্যস্ত করতে এবং সোমনাথকে ধ্বংস করতে পেরেছিল? এর উত্তরই হলো ভারতবাসীর পক্ষে একটা শিক্ষণীয় ঐতিহাসিক সত্য। তৎকালীন উত্তর ভারতের হিন্দুদের অনৈক্যের জন্যই মামুদের পক্ষে বার বার ভারত-লুণ্ঠন সম্ভব হয়েছিল। ভারতীয় যৌথ হিন্দু ঐক্যবদ্ধ হয়ে মামুদকে বাধা দিতে পারেনি, যদি দিত তবে ভারতের

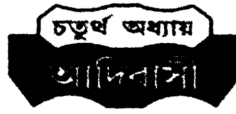
ইতিহাস অন্যরকম হতো এবং সোমনাথের প্রদীপকে বার বার নিভে যেতে হতো না। বিংশশতাব্দীর স্বাধীন ভারতে যে সোমনাথ মন্দির আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে, তার মধ্যে ভারতবাসীর পক্ষে শিক্ষণীয় সেই রাজনৈতিক সত্যটিও প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সত্য একাদশ শতকের ভারতবাসী বিস্মৃত হয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসী এবং সংযুক্ত ভারতবর্ষের কর্মনীতি ও চেতনার প্রতীকরূপেই সোমনাথ মন্দির নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

সর্দার বল্লভভাই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠাতা। অন্ততঃ এই একটি কৃতিত্বের জন্য তিনি ভারতীয় জাতির চিত্তে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁরই ইচ্ছায় ও উদ্যোগে সোমনাথ মন্দির নতুন করে নির্মাণের জন্য একটি উপদেষ্টা কমিটি এবং বোর্ড অব্ ট্রাস্টি বা অছি পরিষদ গঠিত হয়েছে। ভারতের সর্বত্র হতে অর্থ সংগৃহীত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। মন্দিরের ধ্বংসস্তূপকে খনন করে সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ মন্দিরের সুপ্রাচীন ভিত্তিভূমি সঠিকভাবে নির্ণয় করে নিয়েছেন। সেই ভিত্তিভূমির ওপরেই নতুন মন্দির গড়া হবে। রাজা কুমারপাল কর্তৃক নির্মিত পঞ্চম মন্দিরটির গঠন আকার ও স্থাপত্যরীতি কি ছিল, তা অনুমান করা হয়ে গেছে। পঞ্চম মন্দিরটির অনুরূপ করে নতুন মন্দিরটি নির্মিত হবে। মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভের আগেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছে এবং বর্তমানে ভিত্তিভূমির ওপর শুধু একটি কক্ষ নির্মাণ করে বিগ্রহ স্থাপন করা হবে।

সোমনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে পৃথিবীর সকল মহাদেশের মাটি এবং সকল সাগরের জল পূজোপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনেকেই ইতিমধ্যেই তাঁদের দেশের মাটি ও সমুদ্রের জল সোমনাথ পুনঃপ্রতিষ্ঠা কমিটির কাছে প্রেরণ করেছেন।

নতুন সোমনাথ মন্দির, তার ভিত্তিভূমিতে মিশে থাকবে পৃথিবীর সকল মহাদেশের মাটি। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বের সৌহার্দ্যধর্মের নতুন প্রতীক হয়ে গড়ে উঠবে সোমনাথের মা[illegible]নিকেতন। 'জয় সোমনাথ' ধ্বনিতে প্রতি তীর্থ-পথিক আবার নতুন করে শুনতে ও স্মরণ করতে পারবে মানবইতিহাসের সেই বাণী

'মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে॥'



আদিবাসীর সাংস্কৃতিক সমস্যা

ভারতের আদিবাসী সমাজের ভাষা সম্বন্ধে প্রধান প্রশ্ন, আদিবাসীদের ভাষার স্থায়িত্ব, উন্নতি ও উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে কি না? হয়ে থাকলে তার সমাধানের উপায়ই বা কি?

আদিবাসীদের ভাষা সম্বন্ধে একটা মন্তব্য করা যায় :—এদের ভাষা হলো শুধু কথিত ভাষা। লিখিত ভাষা নয়, অর্থাৎ ভাষাকে লিপিবদ্ধ করে রূপ দেবার মত কোন অক্ষর আবিষ্কৃত হয়নি। উপজাতীয় ভাষা আছে, কিন্তু উপজাতীয় অক্ষর বা লিপি নেই।

খৃষ্টান মিশনারীরা প্রথম উপজাতীয় আদিবাসীদের ভাষাকে লিখিতভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে তাঁরা রোম্যান অক্ষরকেই গ্রহণ করেছেন। কোন কোন উপজাতীয় ভাষার একটা ব্যাকরণ রচনার প্রয়াসও মিশনারী সম্প্রদায় করেছেন। বাইবেল প্রচার করার জন্যই প্রধানত মিশনারী সম্প্রদায় উপজাতীয় ভাষার জন্য এই উৎকর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ১৮৬৬ সালেই স্যার রিচার্ড টেম্পল এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন যে, আদিবাসীদের ভাষার জন্য দেবনাগরী অক্ষরই প্রকাশভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। তিনি বলেছেন, রোম্যান অক্ষরে গন্দি ও অন্যান্য উপজাতীয় ভাষাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হলেও দেবনাগরী অক্ষর এ বিষয়ে বেশী উপযুক্ত।

আর একটা কথা। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে আদিবাসীরা প্রধানত দ্বিভাষী (Bilingual)। একটি তাদের নিজস্ব উপজাতীয় ভাষা, পারিবারিক জীবনে উপজাতীয় ভাষা তারা ব্যবহার করে, কিন্তু বর্তমান বৈষয়িক জীবনে বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে আসতে বাধ্য হওয়ায় আদিবাসীরা আর একটা সমতল প্রদেশের ভাষায় (হিন্দী, তেলেগু, বাঙলা ইত্যাদি) সমান দক্ষতার সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে। এই অবস্থায় আদিবাসীরা যদি লেখাপড়ার ব্যাপারে রোম্যান অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত থাকে তবে হিন্দী তেলেগু এবং বাঙলা ইত্যাদি উন্নত সাহিত্য তাদের কাছে পর হয়ে যেতে বাধ্য। অথচ যদি নিজস্ব উপজাতীয় ভাষার জন্যই দেবনাগরী বা আঞ্চলিক উন্নত ভাষার (বাঙলা, তেলেগু ইত্যাদি) অক্ষর তারা গ্রহণ করে, তবে একই সঙ্গে দুটি উপকার তাদের কাছে সুলভ হয়ে উঠতে পারে। নিজস্ব উপজাতীয় ভাষাকে লিপিবদ্ধ করতে পারবে এবং আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও প্রবেশ সহজ হবে। আদিবাসীদের মত সঙ্গতিহীন সমাজের পক্ষে এক সঙ্গে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের অক্ষর প্রণালী শেখবার চেষ্টা বস্তুতঃ আদিবাসীকে বিড়ম্বিত করা। সাধারণ ভারতবাসীর ছেলে তার মাতৃভাষার একটিমাত্র অক্ষর প্রণালীর সাহায্যে বিদ্যারম্ভ করে। কিন্তু আদিবাসী ছেলেকে দুই ধরণের অক্ষর প্রণালীর দ্বারা অত্যাচার করা কি উচিত?

খৃষ্টান মিশনারীরা বলবেন, একটি মাত্র অক্ষর প্রণালীই হোক, কিন্তু সেটা হবে রোম্যান অক্ষর। কিন্তু এর ফলে আদিবাসী মানুষ তার হিন্দী বাঙলা তেলেগু প্রভৃতি একটি আঞ্চলিক

ভাষার দক্ষতা সত্ত্বেও, সেই ভাষার সাহিত্যগত সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ একটা উন্নত ভাষা আয়ত্ত করেও সেই ভাষার সাংস্কৃতিক শক্তি তার কাছে অনায়ত্ত হয়ে থাকবে, পড়তে না পারার জন্য। অথচ এই আঞ্চলিক ভাষা তার জীবনের প্রতি পদে প্রয়োজন। হাটে ঘাটে মাঠে বাজারে আদালতে সভা মঞ্চে আইন পরিষদে—সর্বত্র আদিবাসীকে তার বক্তব্য ও ভাব প্রকাশের জন্য আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করতে হয়। এই আঞ্চলিক ভাষাকে মুখে মুখে ও মনে মনে শিখেও, শুধু অক্ষর পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়ে কেন সে তার শিক্ষাকে অপূর্ণ করে রাখবে?

চিরকাল ইংরাজ শাসন, ফরাসী শাসন বা জার্মান শাসন যদি ভারতবর্ষে থাকে, তবে ইংরাজী ফরাসী বা জার্মান ভাষা অবশ্য সরকারী ব্যাপারে প্রধান ভাষা হয়ে থাকবে এবং সে ক্ষেত্রে রোম্যান অক্ষরে পরিচিত হবার একটা সার্থকতা আছে। কিন্তু সে রকম বৈদেশিক শাসন তো কোন দেশের পক্ষে সনাতন রীতি নয় এবং স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও ইংরেজী ভাষার প্রাধান্য ঘুচে যেতে বসেছে। তা ছাড়া ইংরাজী ভাষা শিখে জজ্ ম্যাজিস্ট্রেট হবার সম্ভাবনা কজন আদিবাসীর ছিল? খুব অল্প সংখ্যক। সুতরাং অল্প সংখ্যক ভাবী সরকারী কর্মচারীর জন্য সমগ্র জনশিক্ষার বিষয় ইংরাজী অক্ষরে (অর্থাৎ রোম্যান অক্ষরে) পরিচালনা করার কোন অর্থ হতে পারে না। আদিবাসী জনসাধারণের পক্ষে হাটে বাজারে ভারতীয় ভাষা প্রয়োজন। সুতরাং আদিবাসীদের জন্য কোন ভারতীয় ভাষার অক্ষরই গ্রহণ করার বস্তু। ভারতীয় ভাষার অক্ষর গ্রহণ করলে, যেমন উপজাতীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা লিপিবদ্ধ ও মুদ্রিত করা সহজসাধ্য হবে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও দখল সহজতর হবে। এর ফলে উভয়ের উন্নতি। আদিবাসীর নিজস্ব উপজাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ এবং ভারতীয় সাহিত্যে আদিবাসী লেখক ও চিন্তাশীলের দান সম্ভব হবে।

আদিবাসী সমাজের প্রত্যেক উপজাতীয় ভাষা এক একটা সমৃদ্ধ ব্যঞ্জনাপ্রবণ ভাষা নয়। অধিকাংশ ভাষাই শত শত অপভ্রংশে পরিণত। একই গন্দি বা সাঁওতালী ভাষা জেলায় জেলায় জঙ্গলে জঙ্গলে উপত্যকায় উপত্যকায় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যে এবং বিকৃতি অনুসারে পরস্পর থেকে অল্প বিস্তর পৃথক। সিংভূম জেলায় আদিবাসীদের মধ্যে নয়টি উপভাষা (Dialect) প্রচলিত। আদিবাসী সমাজের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাদের ভাষাগত বিপর্যয়ের বহু ঘটনা হয়ে গেছে। কোন কোন গোষ্ঠী তার আদি ভাষাটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বা বর্জন করে নতুন একটি উপজাতীয় বা ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করেছে। ভাষায় ভাষায় সংমিশ্রণ হয়ে বহু সঙ্কর ভাষার উদ্ভব হয়েছে। আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত এই সঙ্কর ভাষাগুলি নিতান্ত দুর্বল ভাষা। এই দুর্বলতার কারণ প্রধানতঃ হলো, ভাষীদের সংখ্যাল্পতা, অল্প সংখ্যক মানুষের মুখে কথিত হয়ে কোন ভাষা বড় হয়ে উঠতে পারে না। বরং দিন দিন সে ভাষার শক্তি ও ভাবপ্রকাশের সামর্থ্য কমে আসতে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে ভাষা জিনিসটা দুর্মর। এই দুর্বল অপভ্রংশ-বহুল উপভাষাগুলি লুপ্ত হতে বহু সময় নেয়। অকেজো হয়েও এই দুর্বল উপভাষাগুলি টিকে আছে। মাত্র সাঁওতালী গন্দি প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতীয় ভাষা ভাষীদের সংখ্যাগুরুত্বের জন্য ভালভাবেই বেঁচে আছে। ১৯২১ সালের সেন্সাস কমিশনার মিঃ ট্যালেন্টস আরও স্পষ্ট করে এই মন্তব্য করেছেন যে এই সব অপরিণত স্বতঃসৃষ্ট কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্য নেই যা সংরক্ষণ

করে রাখবার যোগ্য। সমতল প্রদেশের বেশী ঐশ্বর্যপূর্ণ সাধারণ ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে এই সব উপজাতীয় ভাষা মিশে লুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য এবং সেজন্য দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই।

মিঃ গ্রীগস্‌ন বলেন—'উপজাতীয়েরা নিজস্ব ভাষা হারিয়ে ফেললে এই একটা লাভ অবশ্যই হয় যে, তাদের লেখাপড়া শেখবার সমস্যাটি সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়।'

মিঃ সিমিংটন ভীলদের শিক্ষা সমস্যা আলোচনা করে এই মন্তব্য করেছেন যে ভীলি অথবা অন্য কোন উপভাষায় তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না করাই উচিত। মিঃ সিমিংটন কোন ভারতীয় ভাষাতেই, ভীলদের শিক্ষা বিধানের সার্থকতা সমর্থন করেন। কারণ উপভাষাগুলির দুর্বলতা এবং ব্যর্থতা সম্বন্ধে মিঃ সিমিংটন যথেষ্ট সচেতন। এক তালুক থেকে কিছু দূরে আর একটি তালুকে গেলেই উপভাষাগুলির পরস্পরের মধ্যে মাত্রাহীন পার্থক্যের রূপটা উপলব্ধি করা যায়। এখানে এক রকম ওখানে আর একরকম। এ ভাষাগুলি বস্তুতঃ ভাষাই নয়। বলতে গেলে বলা যায় কতগুলি 'বাক্যের বিকৃতি।'

তবে মিঃ সিমিংটন প্রস্তাব করেছেন যে, যে সব শিক্ষক আদিবাসী সমাজকে ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করবেন, তাঁরা যেন স্থানীয় আদিবাসীর উপজাতীয় ভাষা বা উপভাষা সম্বন্ধে পারদর্শী থাকেন। উড়িষ্যার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সম্বন্ধে তদন্ত কমিটির যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতেও মন্তব্য করা হয়েছে যে—'খন্দমাল গঞ্জাম কোরাপুট প্রভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে স্কুলের শিক্ষকেরা অবশ্য উড়িয়া ভাষাতেই আদিবাসীকে শিক্ষাদান করবেন, কিন্তু শিক্ষকদেরও স্থানীয় আদিবাসীর ভাষা সম্বন্ধে সম্যকভাবে পারদর্শী হতে হবে।'

আদিবাসীদের উপজাতীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য গুণ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেকে প্রশংসার উচ্ছ্বাস দেখিয়ে থাকেন। যেমন, মিঃ এলুইন। গন্দি ভাষায় কতগুলি লোক-সঙ্গীত ও গাথা অবশ্য আছে, সাঁওতালী ভাষায় অনেক ছড়া গান রূপকথা ও উপকথা আছে। সবই সত্যি। কিন্তু বাঙলা, হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের তুলনায় এই সব উপজাতীয় ভাষার ঐশ্বর্য কতটুকু? শুনতে অনেকের খারাপ লাগলেও সত্য কথা হলো, এই সব উপজাতীয় ভাষা সাহিত্যগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে তেমন কিছুই নয়। সব চেয়ে বড় কথা হলো, বর্তমান যুগের উপযোগী নয়। এসব উপভাষা কয়েক হাজার বছর আগেকার আরণ্য জীবনের উপযোগী ভাষা। ভাষার যাদুঘর হিসাবে এই সব ভাষাকে সাজিয়ে রাখতে অনেকে ইচ্ছে করেন, কিন্তু সেটা হলো যাদুঘর দরদীর মনোবৃত্তি, আদিবাসী দরদীর মনোবৃত্তি নয়। আদিবাসীকে উন্নতি করতে হলে তাকে উন্নত ভাষার সুযোগ ও দীক্ষা দিতেই হবে।

'সিংভূমের আদিবাসী হো সমাজকে হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অন্য বিষয়ে অনুন্নত হয়েও এই আদিবাসী সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে একটা উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করেছে।'

এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের পর এমন অভিযোগ নিতান্তই ভিত্তিহীন যে ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করলে আদিবাসীর ক্ষতি হবে। হিন্দী ভাষা শিখে হো সমাজের কোন ক্ষতি হয়নি কিম্বা তারা আরও অবনত হয়নি।

সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, ভাষা জীবনের কোন একটা লক্ষ্য

নয়। একটা লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়, একটা পদ্ধতি। দেখতে হবে, আদিবাসীর জীবনকে উন্নত করার জন্যই পদ্ধতি হিসাবে ভাষা কাজ ঠিক করছে কিনা। হিন্দী ভাষা শেখার অর্থ হিন্দু সংস্কৃতিতে-দীক্ষা দেওয়া নয়, অথবা আদিবাসী সংস্কৃতিকে লুপ্ত করে দেওয়া নয়। হিন্দী ভাষাকে আদিবাসীর সংস্কৃতিগত জীবনের বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্যগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই অথবা আরও উন্নত করার জন্যই নিয়োজিত করা যায়। যাঁরা পরিবর্তন বিরোধী, একমাত্র তাঁরাই উল্টো কথা বলেন। কিন্তু আদিবাসী সমাজকে যাঁরা আধুনিক যুগের সমাজে পরিণত হতে দেখতে চান, তারা অবশ্যই আদিবাসীদের জন্য যুগোপযোগী ভাষার সুপারিশ করবেন। হিন্দী ভাষার সাহায্যেই সুন্দর ও বিরাট সাঁওতালী সাহিত্য রচিত হতে পারে। বাঙলা ভাষার সাহায্যেই বিশেষ একটি 'পাহাড়িয়া সাহিত্য' সৃষ্টি হতে পারে।

আদিবাসীর পক্ষে ভারতীয় ভাষা গ্রহণের প্রস্তাব একটা রাজনৈতিক অভিমত নয়। এর মধ্যে ভারতীয়করণের কোন আক্রমণমূলক নীতি নেই। এটা নিছক নৃতত্ত্ব ও সমাজ বিজ্ঞানের অভিমত। একজন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক এ সম্বন্ধে কি অভিমত পোষণ করেন দেখা যাক :

ডাঃ ম্যারেট তাঁর নৃতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে ভাষা অধ্যায়ে বলেছেন যে, উপজাতীয়দের সংস্কৃতিগত বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাকে যখন সভ্য প্রভুরা পরিবর্তন করতে চান, তখন তাঁদের একটু সাবধান হওয়ার প্রয়োজন। আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত বা সমাজগত বৈশিষ্ট্যের সবই বদলে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যে সব উপজাতীয় ব্যবস্থা তাদের জীবনের উন্নতির পক্ষে হানিকর সেগুলিকে অপসারিত করবার প্রয়াস আবশ্যক। হঠাৎ অথবা সব কিছু একদিনে বদলে দেবার চেষ্টা করলে আদিবাসীদের মানসিক গঠনের সর্বনাশ করা হবে। কিন্তু সংস্কৃতিগত এই সব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কথা সত্য, ভাষার ব্যাপারে সেটা সত্য নয়। উপজাতীয় ভাষা বদলে দিয়ে নতুন উন্নত ভাষা প্রচলিত করলে কোন ক্ষতি হবে না।

লাঙ্গল দিয়ে যে সাঁওতাল ক্ষেত চাষ ও শস্য উৎপাদন করে সেও কৃষক। আবার একজন রাজপুত বা ভূমিহার ব্রাহ্মণ যখন ক্ষেত চাষ করে, সেও কৃষক। কিন্তু সাঁওতাল কৃষক ও রাজপুত কৃষকের মধ্যে মনস্তত্ত্বগত প্রভেদ অনেকখানি। হিন্দী ভাষী রাজপুত কৃষক যে মনের অধিকারী, সাঁওতাল কৃষক সে ধরণের মনের অধিকারী নয়। একজন ভাষায় উন্নত, আর একজন ভাষায় অবনত। এক্ষেত্রে উভয়ের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গী, ভাবগ্রহণ ক্ষমতা ও জীবনে উন্নত হবার শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য। এর প্রধান কারণ—ভাষাগত শক্তির তারতম্য।

আদিবাসী উপজাতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্যই এবং বর্তমান যুগের অর্থনৈতিক জীবনের পরীক্ষার যোগ্য হবার জন্যই তাদের পক্ষে একটি উন্নত ভারতীয় ভাষা গ্রহণ করা উচিত। ভারতীয় ভাষা আদিবাসীর পক্ষে নিতান্ত বৈদেশিক ভাষা নয়। কারণ, ভারতীয় ভাষা যে সংস্কৃতির বাহন সেই সংস্কৃতি আদিবাসীর পক্ষে বৈদেশিক সংস্কৃতি নয়। বর্তমান আদিবাসী সমাজের সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি, উভয়ের ভিত্তি দূর অতীতের এক ঐতিহাসিক সম্পর্কে যুক্ত। আদিবাসী সংস্কৃতিকে প্রায় হিন্দু (Proto Hindu) সংস্কৃতি বলা হয়েছে। সংস্কৃতিগত ঐতিহাসিক বনিয়াদ এক আছে বলেই, বর্তমানে ভাষাগত বনিয়াদ এক ক'রে দিলে কোন হানি হবে না।

উপজাতীয় সমাজ-সংহতি

উপজাতীয় আদিবাসী সমাজের সংহতি আগের তুলনায় কোথাও ভেঙে পড়েছে, কোথাও ভেঙে যাচ্ছে। সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়বার ব্যাপারে প্রথম দুটি কারণ হলো—(১) হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া ; (২) খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা।

এই দুটি ব্যাপারকে ঠিক আক্রমণমূলক ঘটনা বলা যায় না। কোন আইনের জোরে নয়, বাধ্যতামূলক নির্দেশ বা রেগুলেশনের জোরে নয়, আদিবাসী সমাজের বহু গোষ্ঠী বা দল স্বাভাবিক ঐতিহাসিক কারণেই সংস্কৃতিগত টানে হিন্দু সমাজে স্থান গ্রহণ করেছে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে নীচ জাতের ঠাই গ্রহণ করেছে। কিন্তু হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার দরুণ তারা আর্থিক বিষয়ে বা শিক্ষাদীক্ষার বিষয়ে আগের তুলনায় দীন হয়েছে, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ে থাকলে অন্য কারণে হয়েছে, হিন্দু সমাজভুক্তির জন্যে নয়।

ঠিক তেমনি যেসব আদিবাসী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারাও আর্থিক বা অন্যান্য বিষয়ে হীনতর হয়নি। ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে তারা একটা ভিন্ন সমাজে পরিণত হয়েছে, ব্যক্তিগত ভাবে কোন হানি হয়নি।

উল্লিখিত এই দুটি সমাজান্তরের প্রক্রিয়া একটা গর্হিত ব্যাপার অবশ্যই নয়। কিন্তু এর ফলে উপজাতীয় সমাজের ভাঙন সম্ভব হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে এসে উন্নত হবার মত ব্যাপার। যারা চলে এল, তারা 'উন্নত' হলো ঠিকই ; কিন্তু গ্রাম অবনত ও দীনতর হয়ে রইল। সুতরাং এই দুটি প্রক্রিয়াকে বলতে পারা যায়, উন্নতিমূলক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। বহু আদিবাসী নিজ উপজাতীয় সমাজ ছেড়ে দিয়ে হিন্দু বা খৃষ্টানরূপে 'উন্নত' হয়েছে, তার ফলে উপজাতীয় সমাজের সংহতি ও শক্তি অনেকখানি অবনত হয়েছে।

কিন্তু আসল হানিকর ব্যাপার হলো ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি। উপজাতীয় সমাজের সংহতিকে যদি সত্যি সত্যি কেউ বিনষ্ট করে থাকে, তবে সেটা করেছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট। ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি উপজাতীয় সংসারে নিছক ভাঙনের নীতি নিয়েই প্রবেশ করেছিল। কিছু গড়ে তোলবার, উন্নত করবার, এমন কি, পরিবর্তন করবারও কোন নীতি ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতিতে ছিল না। তাই ব্রিটিশ শাসনের প্রতিক্রিয়া আদিবাসীর সমাজ-জীবনে শুধু পুরাতন উপজাতীয় ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েই এসেছে। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার যেসব ক্রিয়াকলাপ আদিবাসীর উপজাতীয় সমাজ-ব্যবস্থার ওপর আঘাত দিয়েছে, সেগুলি হলো—

(১) ব্রিটিশের কর সংগ্রহের পদ্ধতি

(২) ব্রিটিশের পুলিশী পদ্ধতি

(৩) ব্রিটিশের বিচার পদ্ধতি।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উক্ত তিনটি পদ্ধতিই হলো কেন্দ্রীভূত পদ্ধতি। দূর শহরে বা রাজধানীতে এই সব ব্যাপারের শক্তিকেন্দ্র স্থাপিত। আইন ও এক্সিকিউটিভ ক্ষমতা এই কেন্দ্র থেকে চালিত হয়ে উপজাতীয় সমাজের ওপর কর্তৃত্ব করছে। কেন্দ্রীভূত এই সব শাসন-ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যটা কি? উপজাতীয় সমাজকে সাহায্য করা বা উন্নত করা নিশ্চয় নয়। উপজাতীয়দের ভাল মনের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব ব্যবস্থা করা হয়নি। এটা বাইরে থেকে চাপানো, বাইরের মানুষের দ্বারা আবিষ্কৃত এবং বাইরের স্বার্থরক্ষার জন্য পরিকল্পিত একটা শাসন-ব্যবস্থা। উপজাতীয়কে সাহায্য করার জন্য নয়, উপজাতীয়েরা যাতে এই

শাসন ব্যবস্থাকে সাহায্য করে, তারই জন্য সমস্ত বিধানগুলি রচিত। সুতরাং উপজাতীয় সমাজ নিজে ভেঙে যেতে বাধ্য হয়েছে। নিজে ভেঙে গিয়ে বাইরের থেকে চাপানো একটা ব্যবস্থাকে তারা সহ্য করে চলেছে। আদিবাসীর গোষ্ঠী পঞ্চায়েৎ শক্তিহীন হয়ে গেল, গোষ্ঠী সর্দার তুচ্ছ হয়ে গেল। শ্রদ্ধাস্পদ গোষ্ঠী সর্দারের চেয়ে উর্দিপরা ও পাঁচ টাকা মাইনের চৌকীদার আদিবাসীর ওপর ঢের বেশি প্রভুত্বের অধিকারী হলো। এল দারোগা ও তহশীলদার, আদিবাসীর সমাজের ওপর অগাধ প্রভুত্বের সুযোগ নিয়ে। পঞ্চায়েতের অধিকার লুপ্ত হয়ে গেল, সামান্য একটা মুর্গী নিয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করতে আদিবাসী বাদী ও বিবাদীকে শহরে এসে উকীলবাবুর আর আদালতের শরণ নিতে হলো।

এর মধ্যে একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার যোগ্য। ব্রিটিশ শাসনে উপজাতীয়ের গোষ্ঠী পঞ্চায়েৎ যেমন নষ্ট হয়েছে, তেমনি সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম পঞ্চায়েতও নষ্ট হয়েছে। ব্রিটিশের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা এবং বৈদেশিক উগ্রতার ফলে সাধারণ ভারতবাসী এবং আদিবাসী উভয়েরই স্বয়ংচালিত আত্মশাসনের 'সাধারণতন্ত্র' নষ্ট হয়েছে। উপজাতীয় সমাজের সংহতি বিনষ্ট হওয়া, উপজাতীয়দেরই বিশেষ দুঃখ নয়। এটা সাধারণ গ্রামীণ ভারতের দুঃখ। সুতরাং আদিবাসীর এই সমাজ সংহতির সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করবার কোন বিশেষ প্রয়োজন নেই। এটাও নিখিল ভারতীয় সমস্যা এবং সারা ভারতবর্ষের গ্রামীণ মানুষের পঞ্চায়েৎ প্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য যে ব্যবস্থা করতে হবে, আদিবাসী সমাজের সমস্যারও সেই সঙ্গে সমাধান হয়ে যাবে।

জঙ্গল সমস্যার কথাই ধরা যাক। আদিবাসীরা আরণ্য অঞ্চলে থাকে ; সুতরাং জঙ্গলের ওপর তাদের অধিকার এবং জঙ্গলের উন্নতি বা অবনতির সঙ্গে আদিবাসীর উন্নতি বা অবনতির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, এই জঙ্গল সমস্যা নিছক আদিবাসীর সমস্যা নয়, এটা ভারতের প্রাচীন মানুষের সমস্যা। ব্রিটিশ বননীতি ও আইনের জন্য যেমন অরণ্যবাসী আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয়ও ঠিক সেই পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এসেছে।

সমস্যাটির আর একটি দিক আছে। আদিবাসীদের দাবী মেনে নিয়ে এবং তাদেরই ভালর জন্য যদি বননীতি স্থির করা হয়, তাহলেই ন্যায় বিচার হয় না। এমন আদিবাসী গোষ্ঠী আছে যারা বনকে অল্পদিনে উচ্ছেদ করে, বেপরোয়া বনের পশু সংহার করে অথবা বন পুড়িয়ে ঝুম চাষ করে জীবন নির্বাহ করতে চায়। কিন্তু এই বনের পাশেই হয়তো কৃষিপ্রবণ সাধারণ ভারতবাসীর গ্রাম আছে, বনের ভালমন্দের ওপর তাদের ভালমন্দ নির্ভর করে। এক্ষেত্রে বনকে উচ্ছেদ করার সুযোগ দিয়ে আদিবাসীর মঙ্গল করতে গিয়ে ভারতীয় গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষতি করা কি উচিত? এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষক ভারতবাসী ও অকৃষক আদিবাসীর স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুতরাং প্রশ্ন, এক্ষেত্রে কার স্বার্থ দেখতে হবে?

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জঙ্গল সংরক্ষণের (Reserve) নীতি যেভাবে প্রয়োগ করেছেন, তাতে আদিবাসী ও সাধারণ ভারতবাসী উভয়েরই ক্ষতি হয়েছে। আদিবাসী যেমন জঙ্গলে ইচ্ছামত শিকার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি গ্রামের ভারতীয় কৃষকও জঙ্গলে গরু চরাবার সুযোগ, শুকনো পাতা কুড়াবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের শাসন ব্যবস্থার সমস্ত নীতির মত বননীতির মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য আছে—নিষেধমূলক নীতি।

বনকে সংরক্ষণ করে বনবাসী এবং গ্রামবাসী উভয়ের অধিকার দূরে সরিয়ে রাখা হলো। কিন্তু গ্রামবাসী বা আদিবাসীর ওপর বন সৃষ্টি বা উন্নত করার কোন কতর্ব্য দেওয়া হলো না। গঠনমূলক কোন নীতি—ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মস্তিষ্কের মধ্যে স্থান লাভ করেনি। তাঁরা শুধু নিষিদ্ধ করতে জানতেন। বনের ওপর জনসাধারণের যেমন ভোগ করবার অধিকার থাকবে, তেমনি বনকে সংরক্ষণ ও উন্নত করবার দায়িত্বও জনসাধারণের ওপর থাকবে—গভর্নমেন্টের নীতি এইভাবে নির্দিষ্ট ও পরিচালিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু গভর্নমেন্ট শুধু নিষিদ্ধ করতেই জানেন। বনের ওপর জনসাধারণের ভোগের অধিকার নিষিদ্ধ করা হলো এবং সংরক্ষণের ব্যাপারে জনসাধারণকে কোন কর্তব্যে উৎসাহিত করা হলো না। গভর্নমেন্টের বননীতির ত্রুটি রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়। "গ্রামের পাশে বনকে গ্রামের লোকের স্বার্থের জন্য গ্রামের লোকদের দ্বারাই তত্ত্বাবধান করালে তার দ্বারা এত রকম ভাল কাজ হতে পারে যে, এবিষয়ে সাফল্য লাভ করার জন্য সকল রকম চেষ্টা করা উচিত।"[1]

বন সম্পর্কে যে সমস্যার কথা বিবৃত করা হলো, তার মধ্যে এই কটি বিশেষ তথ্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বননীতি সাধারণ গ্রামবাসী ভারতীয় ও উপজাতীয় আদিবাসী উভয়েরই অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে। এই দিক দিয়ে উভয়ের সমস্যা একই। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, বন সম্পর্কে গোঁড়া উপজাতীয় দাবী এবং ভারতীয় কৃষক গ্রামবাসীর দাবী, ঠিক এক নয়, বরং পরস্পরবিরুদ্ধ।

এক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের পরিষ্কার পথটি হলো—বনের ও বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে প্রধান লক্ষ্য রেখে, বননীতি নির্ধারিত করা। বিশেষ কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর অকৃষকোচিত সংস্কারকে তুষ্ট করতে গিয়ে বন নষ্ট করার সুযোগ দেওয়া যায় না। আদিবাসীকে কৃষিতে উৎসাহিত করা, এবং বন সংরক্ষণে ও পরিচালনায় ভারতীয় ও আদিবাসী কৃষক সমাজের ওপর দায়িত্ব নির্দেশ করা—বননীতির মধ্যে এই দুটি ব্যবস্থা আবশ্যিক। কোন জমিদার ঠিকাদার গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বার্থের জন্য নয়, বনসম্পদকে সমগ্র ভারতের জাতীয় ঐশ্বর্যরূপে স্বীকার করে নিয়ে বনশাসনের ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া উচিত। বনের উন্নতি আদিবাসী সমাজেরই উন্নতি।

মজুরী সমস্যার বিভিন্ন দিক্

পূর্ব প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে আদিবাসীদের মধ্যে বর্তমানে মজুরিগিরিও জীবিকা হিসাবে স্থান লাভ করেছে। নানা শ্রেণীর মজুররূপে আদিবাসীকে দেখা যায়। টাটানগরের ইস্পাত কারখানায়, কয়লার খনিতে, চা বাগানে এবং পাব্লিক ওয়ার্কসের সড়ক তৈয়ারীর জন্য পাথর বিছাইয়ের কাজে। এদের সমস্যা সাধারণ সমজীবিকাসম্পন্ন ভারতীয় মজুরের সমস্যার মতই।

তা ছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে ক্ষেতমজুরও আছে। এই ক্ষেতমজুর প্রথা আজকের দিনের নতুন প্রথা নয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু অতীত থেকেই ক্ষেতমজুরের আবির্ভাব

(1) 'The management by the people, for the people, of the forests close to their villages, possess so many desirable feature that every effort should be made to ensure its success' -Royal Commission on Agriculture in India, Report

হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেও এরা ছিল এবং এখনও আছে। মজুরীর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কাজ করা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু মজুরগিরি করতে বাধ্য করা একটা অসঙ্গত প্রথা নিশ্চয়। ভারতবর্ষে দূর অতীত থেকে বাধ্যতামূলক মজুরগিরির (Compulsory Labour)[2] প্রথা চলে আসছে। কিন্তু বাধ্যতামূলক বলেই যে ব্যাপারটি সমূহভাবে নিন্দনীয় তা নয়। দেখতে হবে, কি উদ্দেশ্যে এই বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ছিল। জনপদের সকলের জন্য ইস্টাপূর্তের কাজে যদি সকলকে কিছু কাজ করতে বাধ্য করা হয়, সেটা ঠিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বলে ধরা যায় না। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বাপী, কূপ, তড়াগ ও পথ নির্মাণে প্রাচীন ভারতের গ্রামপঞ্চায়েৎ সকলকে কাজ করতে বাধ্য করতো। এটা হওয়াই উচিত, এটাকে সেবাকার্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা বলা যেতে পারে।

কিন্তু জনমঙ্গলের ব্যাপার ছাড়া যেটা নিতান্ত ব্যক্তিস্বার্থের ব্যাপার সেখানে বাধ্যতামূলক মজুরগিরির প্রথা নিশ্চয় নিন্দার্হ। প্রাচীনকালেও ভারতের ভূস্বামীবর্গ যে তাঁদের প্রজাদের এইভাবে জোর করে খাটাতে বাধ্য করতেন না, একথা বলা যায় না। এটাই গর্হিত ব্যাপার এবং এই ব্যাপার আজও চলে আসছে। এই বাধ্যতামূলক মজুরগিরির প্রথাই বেগার বেথি ইত্যাদি নামে পরিচিত। বর্তমানের জমিদার থেকে আরম্ভ করে সরকারী কর্মচারিবৃন্দ আদিবাসী প্রজাকে এইভাবে জোর করে খাটাতে বাধ্য করে থাকেন। আইনে এই প্রথা নিষিদ্ধ থাকলেও কার্যতঃ এবং প্রথা হিসাবে এটা চলে আসছে। বোম্বাই প্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে মিঃ সিমিংটন যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে তিনি আদিবাসীকে জোর করে কাজ করাবার গর্হিত প্রথাটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। জোর করে কাজ করানো, কাজ না করলে মারধর করা এবং মজুরী দৈনিক এক আনা মাত্র।[3] মিঃ সিমিংটন আরও অভিযোগ করেছেন যে, জমিদারেরা শুধু আদিবাসী প্রজাকে মজুরগিরি করতে বাধ্য করেই ক্ষান্ত হয় না, তাদের কামলালসা চরিতার্থ করতে আদিবাসী নারীকেও বাধ্য করে।

জোর করে কাজ করাবার যে উদাহরণ দেওয়া হলো, সেটা কিন্তু একমাত্র আদিবাসী প্রজারই দুঃখ নয়। এটা ভারতের গরীব প্রজাসাধারণের দুঃখ। ভারতের বহু অঞ্চলে ভারতীয় প্রজাকে জমিদার বা সরকারী কর্মচারীর স্বার্থের জন্য কাজ করতে বাধ্য করানো হয়। গতর খেটে জমিদারের খাজনা শোধ করে দেবার প্রথাও আছে। দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও গরীব ভারতীয় প্রজা এবং আদিবাসী প্রজা উভয়ের সমস্যা এক। উভয়েই একই শোষণপ্রথার বলি। সুতরাং আদিবাসী সমাজের এই সমস্যা ভারতীয় সমস্যারই একটি অংশ।

আদিবাসীদের মধ্যে আর এক ধরণের মজুরগিরি আছে—চুক্তিবদ্ধ শ্রম (Bonded Labour)। চলতি কথায় এর নানারকম নাম আছে। ছোটনাগপুরে বলে কামিয়ৌতি উড়িষ্যায় বলে গোঠি ইত্যাদি। এই প্রথা বস্তুতঃ ক্রীতদাস প্রথা। জমিদার বা মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে গরীব প্রজা বা খাতক খেটে শোধ করার জন্য প্রতিশ্রুত থাকে। কিন্তু

---

(2) 'Compulsory Labour in the interest of the village community has been in existence, in some form or other, in nearly every part of India'- John Matthai (Village Government in India)

(3) 'All Jungle tract tenants are liable to be called upon to work for their landlords. This forced Labour is demanded for as many days as are necessary for the landlord's requirements. If they refuse or procrastinate they are liable to assault or beatings. The maximum remuneration of forced labour is one anna per diem. More often rice is given, barely sufficient for one man for one meal.

ঋণের হিসাবে এমনই জুয়াচুরির খেলা চলতে থাকে, বছরের পর বছর খেটে গেলেও খাতকের ঋণ শোধ হয় না। এই কামিয়া বা খাতক মরে গেলে, তার ছেলে এই ঋণ শোধ করার জন্য দায়ী হয়। পুরুষানুক্রমে এই দাসমজুরগিরি চলতে থাকে।

এই কামিয়ৌতি বা গোঠী প্রথাও নিছক আদিবাসী সমাজের দুঃখ নয়। গরীব ভারতীয় প্রজাও অভাবে পড়ে জমিদার ও মহাজনের কাছে এইভাবে আত্মবিক্রীত হয়। সাধারণত নিম্নজাতের হিন্দু বিয়ে করার জন্য কন্যাপণ সংগ্রহের চেষ্টায় বা অন্য কোন সামাজিক কাজের জন্য থোক টাকার অভাব অনুভব করে থাকে, এবং সেই সময় ধার করতে বাধ্য হয়। ভারতীয় কৃষি কমিশন (Royal Commission on Agriculture in India) মন্তব্য করেছেন যে, এই দাসমজুরেরা আইন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলেই এত দুর্ভোগ ভুগে থাকে। কমিশনের মন্তব্যের মধ্যে ভুল আছে। দাস মজুর খুব ভাল করেই জানে যে, সরকারী আইনে এই ধরণের শোষণের প্রশ্রয় নেই। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? দাসমজুর জানে, এই আইনের সাহায্য নিয়ে তার আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। আদালতে মামলা করার মত তার সামর্থ্য নেই এবং জমিদারি বা মহাজনের শত্রুতা থেকে আত্মরক্ষা করারও তার সামর্থ্য নেই। প্রতিবাদ করলে কেউ তাকে বাঁচাতে আসবে না। আত্মরক্ষার জন্য থানা পুলিশ উকীল আদালত—এসব ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হলে যে পরিমাণ পয়সা খরচ করতে হয়, সে সঙ্গতি তার নেই। এই জন্যেই সে নিষ্ক্রিয়, আদৌ অজ্ঞতার জন্যে নয়।

কিন্তু আদিবাসী দাসমজুরদের সম্বন্ধে রাজকীয় কৃষি কমিশনের মন্তব্য অনেকখানি সত্য। আদিবাসীরা সত্যিই আইন সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ, সুতরাং তারা আরও বেশী শোষিত এবং অত্যাচারিত হয়।

জমিদার, মহাজন এবং সরকারী কর্মচারী এই তিনের উদ্যোগেই দাসমজুর প্রথা চলছে। এর বিরুদ্ধে আইন কাগজে কলমে থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে তার কোন প্রয়োজন নেই। বরং একটি বীভৎস ঐতিহ্যরূপে এই প্রথাটি উদাসীন গভর্নমেণ্টের নিষ্ক্রিয়তার সমর্থনে চলে আসছে।

কংগ্রেস ও আদিবাসী

কংগ্রেসের আবির্ভাব ১৮৮৫ সালে। তখনকার 'রাজভক্ত' কংগ্রেস বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে যেসব বিষয়ে যতটুকু মুখ খুলে সমালোচনা করতেন এবং দেশহিতার্থে যেসব দাবী করতেন, তার মধ্যে আদিবাসীর স্বার্থের কথাটা একেবারে উপেক্ষিত হয়নি। ১৮৯১ সালেই কংগ্রেস প্রস্তাব (১০ম প্রস্তাব) গ্রহণ করে যে—'বনসংক্রান্ত আইনে দাক্ষিণাত্যে যে কঠোরতা অবলম্বিত হয়, তাহাতে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। অবিলম্বে প্রতিকারের জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করা হইতেছে।'

বনসংক্রান্ত আইনের কঠোরতা যে-শ্রেণীর অধিবাসীকে পীড়িত করেছিল, তারা অধিকাংশই আদিবাসী, এটা অনুমান করা যেতে পারে। পর পর কয়েকটি বৎসরের কংগ্রেস অধিবেশনে বনসংক্রান্ত আইন ও তার প্রয়োগ রীতির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৯৩ সালের কংগ্রেসের প্রস্তাবে সুস্পষ্ট করেই বলা হয় 'বনসংক্রান্ত আইনে বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্য ও পাঞ্জাবের কোন কোন পাহাড়িয়া অঞ্চলে জনসাধারণের উপর অত্যন্ত অবিচার চলিতেছে।' পরবর্তী কয়েকটি অধিবেশনের প্রস্তাবে বন বিভাগের কর্মচারীদের

আচরণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করা হয়।

এটা সত্য যে, কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ সে সময় যে স্তরে ছিল তাতে অবশ্যই তার মধ্যে আদিবাসীদের সম্বন্ধে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন বৃহত্তর আদর্শের দাবী করার মত চেতনা ছিল না। শুধু বনআইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেই কংগ্রেস তখন কিছুটা যেন পরোক্ষভাবেই আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহের প্রমাণ দিয়েছিল। আবগারী আইন সম্পর্কে তখনকার কংগ্রেসের বহুল প্রতিবাদকেও পরোক্ষভাবে আদিবাসীর হিতরক্ষার প্রয়াস বলা যেতে পারে।

আদিবাসীদের সম্বন্ধে কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে একটা সামাজিক জাতীয় আদর্শ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে তার প্রথম প্রমাণ পাই ১৯০৩ সনের কংগ্রেসের ৯ম প্রস্তাবে। বলা হয়, "বহুকাল হইতে রাজনৈতিক সমাজনৈতিক ও শাসননৈতিক বিষয়ে ঘনিষ্ঠরূপে সম্বন্ধযুক্ত অঞ্চলসমূহকে 'বিচ্ছিন্ন' করিবার জন্য গভর্নমেন্ট যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহাতে বিচলিত হইয়াছে। বাঙলা প্রদেশ হইতে ঢাকা-ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম-ছোটনাগপুর বিভাগের কিয়দংশ অঞ্চলকে এবং মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে গঞ্জাম ও ভিজাগাপট্টম এজেন্সী অঞ্চলকে গভর্নমেন্ট বিচ্ছিন্ন করায় কংগ্রেস প্রতিবাদ করিতেছে।"

১৯০৩ সালের ৯ম প্রস্তাবেই কংগ্রেসের বৃহত্তর জাতীয়তাবোধের প্রমাণ দেখতে পাই। আদিবাসীকে জাতিদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটা 'রক্ষিত অঞ্চলে' আবদ্ধ ক'রে বিশেষ ভাবে শাসন করার কূটনৈতিক পদ্ধতিকে কংগ্রেস তখনই সন্দেহের চক্ষে দেখেছে এবং ক্ষুব্ধ হয়েছে।

এর পরের অধ্যায়—কংগ্রেস জাতীয়তাবাদের সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং তখন ব্রিটিশ কূটনীতিকে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বে আহ্বান করতে কুণ্ঠিত হয়নি। ১৯৩৫ সালে যখন নতুন ভারত শাসন আইন প্রবর্তিত হলো, কংগ্রেস তখন আদিবাসীদের সম্বন্ধে আর অচেতন বা অস্পষ্ট-চেতন নয়। কংগ্রেসের আদিবাসী-নীতি তার আগেই একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে ফেলেছে। ১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত নতুন শাসন সংস্কারে আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে যেভাবে 'বহির্ভূত' করা হলো, কংগ্রেস সেই ব্রিটিশ কূটনীতির তাৎপর্য বুঝতে এবং মুখ খুলে বলতেও দেরী করেনি। ১৯৩৬ সালের কংগ্রেসের ফৈজপুর অধিবেশনে এক প্রস্তাবে বলা হয়—"দেশের সর্বত্র সমানভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব প্রতিহত করার জন্য অসঙ্গত আচরণের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট দেশের মানুষকে নানা ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করার উদ্দেশ্যে এই আর একটা চেষ্টা করেছেন।"* দু' বছর পরে কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনেও অনুরূপ মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আদিবাসী অঞ্চলগুলিকে 'বহির্ভূত' করার পেছনে যে সত্যিই সাম্রাজ্যিক অভিসন্ধি আছে, সে সম্বন্ধে সব চেয়ে বড় প্রমাণ মিঃ চার্চিলের একটা মন্তব্যের মধ্যেই সে সময় পাওয়া গিয়েছিল। মিঃ চার্চিল বলেছিলেন—"সমস্ত ভারতবর্ষকেই 'বহির্ভূত অঞ্চল' করার জন্য যদি চেষ্টা করা হতো, তবুও আমি কোন আপত্তি তুলতাম না।" বহির্ভূত করার নীতি একটা বেশ পাকাপোক্ত সাম্রাজ্যবাদী নীতি বলেই ভারতশত্রু মিঃ চার্চিল সারা ভারতবর্ষের ওপর সেটা চাপাতে পারলে বেশী আনন্দিত হতেন। বহির্ভূত করার নীতির মধ্যে কিছুমাত্র গণতান্ত্রিকতা থাকলে মিঃ চার্চিল অবশ্যই সেটা সারা ভারতবর্ষের ওপর চাপাবার কথা

* 'Yet another attempt to divide the people of India into different groups, with unjustifiabl and discriminatory treatment, to obstruct the growth of uniform democratic institutions in th country.'

আনন্দের সঙ্গে বলতে পারতেন না।

এ বিষয়ে জনমতকে আন্দোলনমুখী করার জন্য ভারতের জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস সচেতন হয়ে ওঠেন। দক্ষিণ ভারতে 'বহির্ভূত অঞ্চল সমিতি' (Excluded Areas Association) স্থাপিত হয়। ১৯৩৮ সালে প্রায় প্রত্যেক কংগ্রেস-প্রদেশের আইনসভায় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় 'বহির্ভূত-করা', 'বিশেষ রক্ষা' ইত্যাদি ব্রিটিশ পলিসির বিরুদ্ধে বিতর্ক হয় এবং প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

অনেকেই জানেন, দেশসেবকের জন্য মহাত্মা গান্ধী যে ১৮ দফা গঠনমূলক বা রচনাত্মক কর্মবিধি প্রণয়ন করেছেন, সেটা বস্তুত দেশ ও জাতিকে 'শান্তিপূর্ণ বিপ্লব'-এ দীক্ষা দেবার ব্যাপার, যা সত্যিকারের স্বরাজের ভিত্তি এবং জনসাধারণকে দেশ ও জাতির পরিচালকরূপে পরিণত করার উদ্যোগ।

এই গঠনমূলক কর্মবিধি কংগ্রেস কর্তৃকও অনুমোদিত হয়েছে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস সদস্যদের এই গঠনমূলক কাজ গ্রহণ করার জন্যও মাঝে মাঝে নির্দেশ দিয়েছেন। দুঃখের বিষয় গঠনমূলক কাজকে কংগ্রেসী সদস্যেরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ কংগ্রেসী সদস্য এই দিকটা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছেন। মাত্র অতি অল্পসংখ্যক কংগ্রেসী ও কংগ্রেসানুরাগী ব্যক্তি গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন।

এই গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির ১৬ নম্বরের নির্দেশটি হলো—আদিবাসী সেবা। এই বিষয়ে স্বয়ং গান্ধীজী সংক্ষেপে তাঁর গঠনমূলক কর্মবিধির পুস্তিকায় যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করা হলো।

"আদিবাসী কথাটা নতুন তৈরী কবা হয়েছে যেমন 'রাণিপরাজ' কথাটা। রাণিপরাজ অর্থাৎ কালিপরাজ অর্থাৎ কালো মানুষ, যদিও কালিপরাজের ত্বক্ অন্য কারও ত্বক্ অপেক্ষা বেশী কালো নয়। আমার ধারণা, কালিপরাজ কথাটা শ্রীজগৎরাম তৈরী করে-ছিলেন। ভীল, গন্দ এবং অন্যান্য যাদের পাহাড়ী গোষ্ঠী বা আদিম গোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে, তারাই হলো আদিবাসী। কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো আদি অধিবাসী। আমার ধারণা, ঠক্কর বাপা প্রথম এই কথাটি তৈরী করেছিলেন।

"আদিবাসী সেবা গঠনমূলক কর্মপদ্ধতির অন্যতম অঙ্গ। যদিও এই কাজটিকে কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে ষোড়শতম স্থান দেওয়া হয়েছে, তবুও গুরুত্বের দিকে এই কাজ অপরাপর কোন কাজের চেয়ে ছোট নয়। আমাদের দেশ এত বৃহৎ এবং এত বিভিন্ন সমাজ ও গোষ্ঠী আছে যে, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্ষম লোকের পক্ষেও ভারতের সকল মানুষের ও তাদের অবস্থা সম্পর্কে সব কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানা সম্ভব নয়। যখন কেউ এই ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারে, তখন সে এটাও বুঝতে পারে যে, আমাদের পক্ষে এক জাতীয়তার দাবী সার্থক করা কত কঠিন, যদি না দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি বা সমাজের চেতনায় সর্বসাধারণের বা সর্বসমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ সজীব হয়ে ওঠে।

"সমগ্র ভারতে আদিবাসীরা সংখ্যায় দু' কোটীর ওপর। কয়েক বছর আগে বাপা গুজরাটে ভীলেদের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৪০ সালে থানা জেলাতে শ্রীযুত বালা সাহেব খের তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ নিয়ে এই অতিপ্রয়োজনীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বর্তমানে আদিবাসী সেবামণ্ডলের সভাপতি।"

"ভারতের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে আরও কয়েকজন কর্মী ও সেবক কাজ করছেন, কিন্তু

তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। এই বিষয়ে সত্যি সত্যি মন্তব্য করা যেতে পারে—'ফসলের ভরসা খুবই ভাল, কিন্তু ফসল তোলবার মত খাটিয়ের সংখ্যা কম।' এই ধরণের সেবাকার্য নিছক মানবসেবার কাজ নয়, এই কাজ খাঁটি জাতি গঠনের কাজ। এই কাজের দ্বারা যে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার দিকেই এগিয়ে যাব, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না।"

গান্ধীজী যদিও বলেছেন যে, খাদিপ্রচার, অস্পৃশ্যতা নিবারণ, মাদক বর্জন প্রভৃতি অন্যান্য গঠনমূলক কর্মবিধির তুলনায় আদিবাসী সেবা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবুও দেশের গঠনমূলক কর্মীরা এ বিষয়ে তেমন মন দিতে পারেন নি এবং আজও দেখাতে পারেন নি। আদিবাসী সেবার গুরুত্ব উপেক্ষিত হয়েছে।

গান্ধীজীর গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রচারিত হবার পূর্বে এবং আদিবাসীর সম্বন্ধে কংগ্রেসী আগ্রহের বহু পূর্বেই খৃষ্টান মিশনারী সমাজ অবশ্য আদিবাসীদের মধ্যে সেবামূলক কাজ আরম্ভ করেছেন। কিন্তু খৃষ্টান পাদরী সমাজের দ্বারা পরিচালিত সেবামূলক কাজ এবং গান্ধীজী পরিকল্পিত সেবামূলক কাজের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। খৃষ্টান পাদরী সমাজের আদিবাসী-সেবা বস্তুত ধর্ম প্রচারের মূল উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত। জাতি গঠনের আদর্শ তার মধ্যে ছিল না এবং বর্তমানেও নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, বহুকাল পূর্বে ব্রাহ্ম সমাজের কোন কোন প্রচারক আদিবাসীদের মধ্যে সেবামূলক ও শিক্ষামূলক কাজ করেছেন। খাসিয়া সমাজে শিক্ষা বিস্তারে ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক •নীলমণি দাসের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী সমাজে ব্রাহ্ম প্রচারকের কাজ অবশ্যই পরোক্ষভাবে আদিবাসীর মনে বৃহত্তর জাতীয়তা বা ভারতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছে। কিন্তু এ ধরণের উদ্যোগের দৃষ্টান্তও খুব কম।

১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কংগ্রেস অবতীর্ণ হবার পূর্বে কংগ্রেসের তরফে জনসাধারণের কাছে যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচারিত হয়, তার মধ্যে বিশিষ্ট একটি ঘোষণা ছিল।

"জনসমাজের মধ্যে যে সব সমাজ অনগ্রসর এবং দলিত তাঁরা যাতে দ্রুত উন্নতি লাভ করেন এবং জাতীয় জীবনে অন্যান্য সকলের মত সমান ও সম্পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারেন, তার জন্য রাষ্ট্র অনগ্রসর ও দলিত সমাজকে সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় রক্ষামূলক ব্যবস্থা ও বিশেষ সুবিধা করে দেবে। বিশেষ করে উপজাতীয় (আদিবাসী) অঞ্চলের জনসাধারণের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র এমনভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করবে যেটা উপজাতীয়দের গোষ্ঠীগত রুচি ও প্রতিভার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। তপশীলভুক্ত সমাজগুলির শিক্ষা বিষয়ক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যও বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে।"

নির্বাচনে সাফল্য লাভ করার পর কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন এবং আদিবাসীর উন্নতি সম্বন্ধে যতটুকু উদ্যোগের প্রমাণ দিয়েছেন, তার পরিচয় এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।

প্রথম বোম্বাই গভর্নমেণ্টের কথা ধরা যাক। বোম্বাইয়ের কংগ্রেসী গভর্নমেণ্ট হরিজনদের উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়েকটি আইন পাশ করেন। হরিজনদের সম্পর্কে উন্নতিমূলক এই আইন পরোক্ষভাবে আদিবাসীর উন্নতির পক্ষে কার্যকরী হয়েছে। তা ছাড়া প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে অনগ্রসর সমাজে (হরিজন ও আদিবাসী) শিক্ষা বিস্তার ও সামাজিক উন্নতির জন্য এক কোটি টাকা বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে।

মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে ঠিক এই রকমের হরিজন উন্নতির জন্য বিশেষ আইন ও বিশেষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই উদ্যোগ-আইনগুলি প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীদের পক্ষে বিশেষ সুবিধার কিছু হয়নি।

আসামের শিক্ষা বাজেটে উপজাতীয় শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষভাবে বৃত্তি দেবার খরচ ধরা হয়েছে। উপজাতীয় উন্নতি কমিটি (Tribal Welfare Committee) নামে একটি কমিটিও আসাম গভর্নমেণ্ট গঠন করেছেন। চা-বাগানের প্রাক্তন মজুরদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্যই এই কমিটিকে আসাম গভর্নমেণ্ট আর্থিক সাহায্য করে থাকেন।

প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বের কালে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালেই উড়িষ্যার আংশিক বহির্ভূত অঞ্চলের অধিবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে ঐ তদন্ত সম্পূর্ণ হয় এবং রিপোর্টও প্রকাশিত হয়। কিন্তু ততদিনে কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে জাতীয় সংগ্রামের জন্য আবার উদ্যোগী হতে আরম্ভ করেছে। কাজেই উক্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনাদৃত হয়েই পড়ে থাকে এবং পরে আবার ১৯৪৬ সালে বর্তমান কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই সুপারিশগুলি বিবেচিত হতে আরম্ভ হয়েছে। আদিবাসী জনসাধারণের উন্নতির কাজ পরিচালনা করার জন্য একজন বিশেষ অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং প্রাদেশিক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে আদিবাসী সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থারও উদ্যোগ করা হয়েছে। উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট আদিবাসীদের উন্নতির জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭-৪৮ সালের বাজেটে এই সম্পর্কে তিন লক্ষ টাকা খরচেব বরাদ্দ করা হয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে আশ্রম ধরণের তিনটি বোর্ডিং সহ স্কুল স্থাপিত হয়েছে। আদিবাসীদের উন্নতি সম্বন্ধে উড়িষ্যা গভর্নমেণ্টকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি পরামর্শদাতা বোর্ডও গঠিত হয়েছে।

যুক্তপ্রদেশের আইনসভায় মুখ্যতঃ হরিজনদের উন্নতির জন্যেই একটি আইন পাশ হয়েছে। এই আইনের বিশেষত্ব হলো, বেগার খাটা প্রভৃতি কয়েকটি কুপ্রথার আক্রমণ থেকে হরিজনদের রক্ষা করা। যেহেতু বেগার খাটার বিভীষিকা আদিবাসীদেরও সমানভাবে পীড়িত করে থাকে সেই হেতু এই আইন আদিবাসীদের পক্ষেও রক্ষামূলক হয়েছে।

বিহার গভর্নমেণ্ট একটি সরকারী বিভাগই স্থাপন করেছেন—এর নাম 'উন্নতি বিভাগ' (Welfare Department)। আদিবাসী হরিজন এবং মুসলিম সমাজের অনগ্রসর সম্প্রদায়-গুলির উন্নতির জন্যই এই বিভাগ। বিশেষভাবে ৫ লক্ষ টাকা আদিবাসীদের উন্নতিমূলক কাজের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। বিহার গভর্নমেণ্টের এই উন্নতিমূলক পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয় ছাড়া মোটামুটি বিষয়গুলি হলো (ক) প্রত্যেক বড় আদিবাসী গ্রামে একটি করে বাঁধ প্রতিষ্ঠা বা পুষ্করিণী খনন। (খ) আদিবাসী অধ্যুষিত প্রত্যেক থানা এলাকায় একটি করে শস্যের গোলা স্থাপন। (গ) আদিবাসী অঞ্চলে কয়েকটি কেন্দ্রে আদিবাসী ছাত্রদের জন্য একটি ক'রে হোস্টেল স্থাপন।

এ ছাড়া বিহার গভর্নমেণ্ট প্রত্যেকটি আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এক একটি সাংস্কৃতিক পরিষদ (Cultural Board) গঠন করেছেন। বিশেষ করে সাঁওতাল, পাহাড়িয়া, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো ও খেড়িয়া ইত্যাদি বড় বড় সমাজগুলির জন্য এই সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠিত হয়েছে। এই সংস্কৃতি পরিষদগুলি বছরে দু'বার ক'রে সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির নীতি ও

পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে, গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ যেসব উদ্যোগ ও নীতি গ্রহণ করেছেন, তারই কিছুটা আভাস দেওয়া হলো। এ ছাড়া ভূমি, জঙ্গল, মাদক, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি সাধারণ সকল বিষয়ে গভর্নমেন্ট যেসব উন্নতিমূলক পরিবর্তন করছেন তার প্রভাব ও সুফল প্রত্যক্ষভাবে আদিবাসীরাও সাধারণভাবে নিশ্চয় পেয়ে থাকেন।

গত নির্বাচনের পরে বাঙলাদেশে যে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো, সেটা পুরোপুরি মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা। এই মন্ত্রিসভার কীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বাঙলাদেশের উনিশ লক্ষ আদিবাসীর উন্নতির জন্য বাঙলার লীগ মন্ত্রিসভা কোন বিশেষ উদ্যোগ করেননি।

ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং ভারত বিভাগের পর আদিবাসীদের সমস্যার মধ্যে কয়েকটি নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্থানে (সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) আদিবাসী সমাজ নেই। পূর্ব পাকিস্থানে র‍্যাডক্লিফ সাহেবের খেয়ালে চাক্‌মা আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন আমলে বহির্ভূত এলাকা নামে এই খাসশাসিত অঞ্চলকে পূর্ব বাঙলার সঙ্গে যুক্ত করে দেবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বিশেষ কূটনৈতিক উদ্দেশ্যে এই কাণ্ড করা হয়েছে।

এ ছাড়া, সুসঙ্গ-শেরপুর পরগণা নামে আংশিক বহির্ভূত এলাকাটিও পূর্ববঙ্গের মধ্যে পড়েছে। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রধানত হলো হাজং এবং গারো প্রভৃতি কৃষিপ্রবণ হিন্দুসংস্কৃতিসম্পন্ন আদিবাসী সমাজ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুসঙ্গ শেরপুর পরগণাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিলে বাঙলার আদিবাসী সমাজের ভৌগোলিক সংহতি অটুট থাক্‌তো। কিন্তু র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বাঙলাদেশের শুধু হিন্দু ও মুসলমান সমাজই নয়, আদিবাসী সমাজও বিভক্ত হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষে নেতৃ ও কর্তৃস্থানীয়দের উদ্যোগ এবং তৎপরতার যেটুকু প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে আদিবাসীদের মর্যাদা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার কারণ আছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নিয়মতন্ত্র এখনো চূড়ান্তভাবে রচিত হয়নি। গণপরিষদ অতি দ্রুত এ বিষয়ে তাঁদের যথাবিহিত কর্তব্য করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গণপরিষদের সংখ্যালঘু সাব-কমিটি (Minority Sub-Committee) এবং 'বহির্ভূত অঞ্চল কমিটি' (Excluded Areas Committee) নানারূপ তথ্যসংগ্রহ ক'রে, বিচার ও বিবেচনা ক'রে তাঁদের সুপারিশ রচনা করেছেন।

কিন্তু পূর্ব পাকিস্থানে দুর্ভাগ্যক্রমে যেসব আদিবাসী সমাজকে থাক্‌তে বাধ্য করা হলো, তাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তিত হবার কারণ আছে। পাকিস্থান রাষ্ট্রকে 'ইসলামীয়' পদ্ধতিতে গড়া হবে—এই কথা জিন্না সাহেব থেকে আরম্ভ ক'রে আরও অনেক পাকিস্থানী নেতা ঘোষণা করেছেন। ডাঃ আম্বেদকর ও শ্রীজগজীবন রাম, ভারতের দুই হরিজন নেতা পাকিস্থানে হরিজনদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন আশঙ্কিত হয়েছেন, তেমনি আশঙ্কা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত আদিবাসীদের সম্বন্ধেও করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি থেকে এরই মধ্যে যেসব খবর এসেছে, তাতে ধারণা হয় যে চাক্‌মা সমাজের পক্ষে পাকিস্থানে থাকা একটা সামাজিক সঙ্কটের ব্যাপার হয়ে উঠছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষের আদিবাসী সমাজের ভেতরে বিশেষ বিশেষ

রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন প্রচারকার্যের কিছু কিছু নমুনাও পাওয়া যাচ্ছে, যেটা মূলতঃ জাতীয়তাবিরোধী কাজ। উড়িষ্যার নীলগিরি নামে দেশীয় রাজ্যে আদিবাসীরা যে আচরণের প্রমাণ দিয়েছে, সেটা গর্হিত ব্যাপার এবং এর পেছনে বাইরের মতলবী দলের হাত আছে ব'লে মনে হয়। পৃথক্ ঝাড়খণ্ডের দাবীও মাঝে মাঝে যেরকম উগ্রতার সঙ্গে বিক্ষোভরূপে দেখা দিচ্ছে, সেটাও সুস্থ সামাজিক আদর্শের প্রেরণায় নয়। আসামের নাগা সমাজেও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নাগা জাতীয় পরিষদের (Naga National Council) সভাপতি মিঃ আলিবা ইম্প্‌তি নাগা অঞ্চলকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্যই দাবী ক'রে বসে আছেন। অপরের এবং বাইরের অভিসন্ধিপ্রবণ কোন দল ও ব্যক্তির ইঙ্গিতেই যে নাগা নেতা মিঃ ইম্প্‌তি এই দাবী করেছেন, তা'ও বোঝা যায়।

কিন্তু ভারতের হিন্দুসমাজ হোক্, ভারতের মুসলিম সমাজ হোক্ বা ভারতের আদিবাসী সমাজ হোক্—ভেদবাদের দ্বারা এই সব সমাজকে খণ্ড খণ্ডভাবে বিচ্ছিন্ন করার কোন অপচেষ্টাকে ভারত গভর্নমেণ্ট প্রশ্রয় দেবেন না, এটাই হলো স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতি। আসামের নাগা সমাজের কোন কোন অংশের স্বতন্ত্রতার দাবী স্বীকার করা যেতে পারে না। আসামের আদিবাসী সমাজ সম্পর্কে গভর্নমেণ্ট যে একজাতীয়তার নীতি প্রয়োগ করবেন, সেটা বলাই বাহুল্য। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যবিধান, নতুন নতুন পথ নির্মাণ ইত্যাদি দ্বারা আসামের আদিবাসী অঞ্চলকে প্রাগৈতিহাসিক দশা থেকে উদ্ধার ক'রে বিংশ শতাব্দীর যোগ্য জনপদে অবশ্যই পরিণত করতে হবে। এ না হ'লে সমগ্র দেশ ও জাতির সঙ্গে আদিবাসী সমাজের ঐক্যবোধও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

আদিবাসী সমস্যা ও বিশেষজ্ঞের অভিমত

উপজাতীয় সমাজ-সংহতি অর্থাৎ আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত সামাজিক জীবনের ভিত্তি প্রধানতঃ যে কারণে ভাঙতে আরম্ভ করেছে, সে সম্বন্ধে পূর্বপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর প্রধান কারণ হলো ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইন। শুধু আইন নয়, এই সব আইন যেভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে সেটাও গর্হিত। আংশিক বা সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চলে সরকারী কর্মচারীদের ওপর এত বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় যে, সেটা প্রায় অপব্যবহারের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। একজন অফিসারের হাতেই শাসন ক্ষমতা, বিচার ক্ষমতা ও শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। আদিবাসী অঞ্চলে এই অফিসারেরাই ইউনিয়ন বোর্ড বা তালুক বোর্ড, বা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন। এভাবে আদিবাসী অঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের নীতি সমূহ ব্যর্থ করা হয়েছে।

এমন অনেক ব্যাপার আছে যেটা উপজাতীয় সমাজনীতি অনুসারে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত। দৃষ্টান্ত—জোর করে কোন মেয়েকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করা। কিন্তু ব্রিটিশ আইনে এটা অপরাধ। এবং ব্রিটিশ আইনের মহিমায় দীক্ষিত ভারতীয় হাকিম সুদূর সহরে ও সদরে বসে যখন এই ধরণের কোন মামলার বিচার করেন, তখন তাঁর পক্ষে সমস্ত ঘটনাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা সম্ভব হয় না। বিচারটা একপেশে ও গোঁড়া বিচার হয়ে থাকে। আদিবাসীর পক্ষে ব্রিটিশ আদালতের ধর্ম সম্বন্ধে কোন ধারণা করাও সম্ভব নয়। ব্রিটিশ আদালতের বিচারে শাস্তিলাভ করে আদিবাসী অনেক সময় এই মনোবেদনাই লাভ ক'রে থাকে যে, বিনা অপরাধে তার শাস্তি হলো।

শ্রীশরৎচন্দ্র রায় লিখেছেন : "ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন ও শাসন উপজাতীয়দের সংহতি আরও বিনষ্ট করেছে এবং তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত নিজস্ব 'পঞ্চ'-এর অর্থাৎ নিজস্ব সামাজিক কর্তৃত্বকে খর্ব করে দিয়েছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত, সম্পত্তির উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে উপজাতীয় সামাজিক প্রথাগুলিকে স্বীকার করে নিয়ে গবর্ণমেন্ট যেসব নির্দেশ দিতেন, আদালত আবার সেগুলিকে অস্বীকার করতো। দৃষ্টান্ত পিতৃ সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার। এই উপজাতীয় প্রথাকে অস্বীকার করে আদালত বৃটিশ-ভারতীয় প্রথা অনুসারে দায়াধিকার আইনের (Succession Act) বলে মামলার বিচার করতো, যেটা উপজাতীয়দের সামাজিক জীবনের মৌলিক ব্যবস্থা ও আত্মীয়তার নীতির বিরোধী।"

আদিবাসীদের জমি ধীরে ধীরে মহাজন জমিদার প্রভৃতি লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে। এইভাবে ভূমিহীন মজুরে পরিণত হয়ে আদিবাসীরা তাদের সমাজ সংহতিও হারিয়েছে। এই অধঃপতনের মূল কারণও হলো ব্রিটিশ পদ্ধতির ভূমি আইন। অবশ্য, এই অধঃপতন একমাত্র আদিবাসী চাষীর দুর্ভাগ্য নয়, ভারতের সর্বত্র সাধারণ চাষীকেও এই দুর্ভাগ্যে ভুগতে হচ্ছে।

ভূমির ওপর থেকে চাষীর অর্থনৈতিক মূল উচ্ছিন্ন হলে তার সামাজিক মনোবলের ভিত্তিও থাকে না। এটা বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। ভারতের বর্তমান দুরবস্থাগ্রস্ত আদিবাসী সমাজের 'মনোবল হানি'র যে কথা বহু নৃতাত্ত্বিক উল্লেখ করেছেন, তার প্রধান কারণ হলো ভূমি থেকে অধিকারচ্যুত হওয়া। এবং এই 'মনোবল হানি' সৃষ্টির ব্যাপারে ব্রিটিশ পদ্ধতির আইন সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে।

"জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে চাষীকে বিশেষ করে রায়তী অঞ্চলের চাষীকে ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুসারে অবাধ অধিকার দিয়েছে। চাষী ইচ্ছে করলেই তার জমিকে পরের হাতে তুলে দিতে পারে, তার এই অধিকারকে বাধা দেবার কোন নীতি ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ছিল না। তারপর, ব্রিটিশ আইন অনুসারে যে ধরণের বিচারপদ্ধতি অবলম্বিত হয়, তার ফলে ঋণদাতা মহাজন তার খাতকের ওপর বড় বেশী ক্ষমতা লাভ করে। এ ছাড়া, আবার তামাদির আইনের ফলে খাতক তার ঋণ-পত্রকে নির্দিষ্ট অল্পমেয়াদী কালের মধ্যেই নতুন করে তৈরী করিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এর ফলে খাতকের অবস্থা আরও খারাপ হয়। একজন চাষী প্রয়োজনে পড়ে ঋণ গ্রহণ করবে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং এর মধ্যে বিশেষ রকমের দুর্ভাগ্য আশঙ্কা করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু এইসব ব্রিটিশ পদ্ধতির অন্যান্য ব্যাপারগুলি সব মিলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাতক চাষীকে বস্তুতঃ ক্রীতদাসে পরিণত করেছে···আদালতের সাহায্যে খাতকের কাছ থেকে এত সহজে প্রাপ্য টাকা উদ্ধার হয় বলেই মহাজনেরা বেশী করে ঋণ দেবার জন্যে উৎসাহিত হয়েছিল। চাষীর আর্থিক অবস্থা যখন ভাল ছিল, তখনও এইভাবে মহাজনের ঋণ দেওয়া ও আদায় করার প্রক্রিয়া ভালভাবেই সম্পন্ন হতে পেরেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন চাষীর অবস্থা খারাপ হয়ে এল, তখনি মহাজনের পক্ষে ঋণ আদায়ের ভরসাও সঙ্কুচিত হলো। এবং মহাজনও চাষীর কাছ থেকে ঋণের টাকা আদায়ের ভরসা কম দেখে টাকার বদলে চাষীর 'জমি' আদায় করে নেবার পথ ধরলো। এইবার চাষী বুঝতে পারলো, কোন্ অবস্থায় সে পৌঁছেছে।"

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষে মহাজনী প্রথা ছিল, মহাজন চাষীকে ঋণ দিয়ে সুদ

সুদ আদায় করতো। কিন্তু এই প্রাক্ ব্রিটিশ প্রথা ও বর্তমান ব্রিটিশ প্রথার মধ্যে একটা মৌলিক তারতম্য দেখা যায়। এ সম্পর্কে বি এ কলিন্স (B. A. Collins) নামক জনৈক ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধৃত করা গেল :

"ব্রিটিশ প্রবর্তিত সাধারণ সিভিল শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থাগুলি চাষীকে তার কৃষিজাত সামগ্রীর লাভাংশ এবং তার জমি থেকে তাকে বঞ্চিত করবার যন্ত্রস্বরূপ কাজ করে থাকে। অতীতে (ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে) নিরক্ষর খাতক এবং সামান্য সাক্ষর মহাজনের মধ্যে শুধু মৌখিক চুক্তি অনুসারে লেনদেন হতো। কিন্তু সেই মৌখিক চুক্তির প্রথা উঠে গিয়ে একটা কেতাদুরস্ত লিখিত-পড়িত চুক্তির প্রথা স্থান লাভ করেছে। এই প্রথা একপেশে, হিসাবের দিকটা একমাত্র মহাজনই বুঝতে পারে এবং তার হাতেই থাকে, কারণ সে বর্তমানে চাষীর মত নিরক্ষর নয়। এর ফলে চাষী অসহায়ভাবে মহাজনের কাছে ক্রীতদাসের অবস্থায় বাঁধা পড়তে থাকে।"

নিরক্ষর আদিবাসী চাষী তো মহাজনের তমসুকটিতে টিপ সই দিয়ে টাকা নিয়ে চলে যায়। কিন্তু তমসুকে কি লেখা আছে সে সম্বন্ধে কোন ধারণা তার নেই, অথচ আদালতের কাছে এই তথাকথিত আইনসম্মত ভাবে রচিত তমসুকখানাই একমাত্র প্রামাণ্য এবং বিশ্বাস্য বস্তু। আদালত মহাজনের পক্ষে ডিক্রি দেবার সময় আর অন্য কোন প্রমাণ গ্রাহ্য করেন না।

ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য অনেক দেশেও কোন না কোন প্রকার জমিদার প্রথা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা পার্থক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের জমিদার নামে ভূস্বামী মাত্র খাজনা আদায়কারী ব্যক্তিমাত্র এবং তার প্রজাপত্তনী জমিতে কৃষিকাজের ব্যাপারের সঙ্গে সে কোন সম্পর্ক রাখে না। অন্য দেশের ভূস্বামী এরকম নয়। তাদের জমিতে অন্য চাষী যেসব কৃষিকাজ করে থাকে সেই কৃষিকাজের সঙ্গে লাভালাভ নিয়ে সে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

তা ছাড়া ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে জমিদারী ও মহাজনী ব্যাপারে আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। জমিদার এবং মহাজন অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন অঞ্চলের লোক হয়ে থাকেন। চাষীরা এক সমাজের লোক এবং জমিদার বা মহাজন আর এক সমাজের লোক। বিশেষভাবে আদিবাসী অঞ্চলে এই ব্যাপার সবচেয়ে বেশী সত্য। ভারতের রাজকীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্টে এই মন্তব্য করা হয়েছে :

"জমিদার এবং মহাজনেরা প্রায়ই স্থানীয় অঞ্চলের লোক নয়, তারা ভিন্ন সমাজের লোক। এই কারণে তার জমিদারী অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তার মনে কোন স্বাভাবিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্কবোধ নেই। সে তার অধিকারযুক্ত জমিদারীকে একটা সম্পত্তি মনে করে শুধু শোষণ করবার জন্যেই উৎসাহিত।"

ভূমি ঋণ সম্বন্ধে ব্রিটিশ আইন ও ব্যবস্থা ভারতের চাষী সমাজকে কিভাবে বিপর্যস্ত করেছে, তার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া গেল। এই সম্পর্কে শুধু আর একটা মন্তব্য করা যায় যে, উক্ত আইন ও ব্যবস্থায় আদিবাসীরাই সমাজের সবচেয়ে বেশী বিপর্যস্ত ও শোষিত হয়েছে, কারণ আদিবাসীরাই বিশেষভাবে অজ্ঞ, নিরক্ষর এবং দরিদ্র একটি সমাজ।

ব্রিটিশ শাসন আমলে প্রজা ও চাষীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যে কোন আইন করা হয়নি তা নয়। ভূমি ও ঋণসংক্রান্ত বিষয়ে এই ব্রিটিশ আইন ও নীতির বিবর্তনের তিনটি ধাপ দেখা

যায়।

(১) প্রথম অধ্যায় : জমিদার ও মহাজনদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন প্রবর্তন।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায় : চাষী প্রজা ও খাতকের স্বার্থের জন্য জমি সম্বন্ধে হস্তান্তরবিরোধী ও রক্ষামূলক আইন প্রবর্তন।

(৩) তৃতীয় অধ্যায় : শোষিত চাষী প্রজা ও খাতকের বোঝা লাঘব করার জন্য মকুবমূলক আইন পরিবর্তন।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ নীতি দ্বারা প্রজা শোষণের ব্যবস্থাটি কায়েম করা হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শোষণের কুক্রিয়ার কিছুটা গতিরোধ করার চেষ্টা হয়, কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হয় না। অগত্যা, তৃতীয় অধ্যায়ে, ঋণ মকুব প্রভৃতি রিলিফ বা প্রত্যক্ষ সাহায্যমূলক উদ্যোগ কিছুটা করা হয়।

কিন্তু আইনঘটিত এইসব উদ্যোগ দ্বারা চাষীপ্রজার আংশিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্ভব হলেও তার যথার্থ অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব হয়নি। সহজে জমি হস্তান্তর করার সুযোগ থাকলে, গরীব চাষী প্রজা অর্থাভাবে জমি হস্তান্তর করবেই। সুতরাং এ বিষয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবন্ধক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান হলো, যাতে চাষীপ্রজা অর্থাভাবে না পড়ে, এবং সেটা সম্ভব করার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আরও কিছু গঠনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন, যথা চাষীপ্রজাকে কৃষিকার্যের জন্য মূলধন যোগান দেওয়া, বিনা সুদে বা অল্পসুদে সরকারী ঋণ পাইয়ে দেওয়া, সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্য নির্ধারণ ও বিক্রয় ব্যবস্থা ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভারতের সাধারণ চাষীপ্রজার যেসব সমস্যার কথা এবং তার সমাধানের কথা বলা হলো, তার প্রত্যেকটি আদিবাসী সমাজেব সম্বন্ধে খাটে। আর সামাজিক অবনতির কথা ধরলে, আদিবাসীর সে সমস্যাও হরিজন সমাজের সমস্যারই মত। হরিজনদের সামাজিক উন্নতির জন্য যে পদ্ধতির উদ্যোগ প্রয়োজন, আদিবাসীর সামাজিক উন্নতির জন্যেও সেই পদ্ধতি প্রযোজ্য।

শুধু একটি বিষয়ে আদিবাসীদের সম্পর্কে বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজন। আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে এখনো গোষ্ঠীবদ্ধ গঠন রয়েছে, আদিবাসীদের রুচি অনুসারে তাদের কতগুলি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এই দিক দিয়ে তাদের সমস্যাও অন্য সাধারণ চাষীপ্রজার সমস্যা থেকে পৃথক।

সুতরাং আদিবাসী সমাজের এই বিশেষ সমস্যাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করে, বিশেষভাবে তার সমাধানের চেষ্টাই আদিবাসী সেবার প্রকৃত নীতি হওয়া উচিত। তা ছাড়া, সমস্ত বিষয় ধরলেও, দেখা যায় যে, আদিবাসীরা অন্যান্য অনুন্নত সমাজের (হরিজন ইত্যাদি) তুলনায় একটু বেশী দরিদ্র, একটু বেশী নিরক্ষর, একটু বেশী অবহেলিত। সেই কারণে মিঃ গ্রীগসনের অভিমত সমর্থন করেই বলা যায় যে, আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য একটু বেশী উদ্যোগ এবং একটা বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

ভারতের আদিবাসী সমাজেব সমস্যা এবং তার সমাধানের পদ্ধতি কি? বহু বিশেষজ্ঞ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনেক বিষয়ে পরস্পর বিভিন্ন, অনেক বিষয়ে পরস্পরবিরুদ্ধ ও অনেক বিষয়ে অবিসম্বাদিতভাবে এক। ভারতে আদিবাসীদের সম্বন্ধে যেসব বিশেষজ্ঞের অভিমত আমরা পেয়ে থাকি, তাঁরাও ভিন্ন ভিন্ন

শ্রেণীর পণ্ডিত। প্রধানত তিন শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের অভিমত আমরা পেয়ে থাকি। (১) নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ (২) সরকারী অফিসার বিশেষজ্ঞ এবং (৩) সমাজ-সংস্কারক বিশেষজ্ঞ।

আরও জটিল ব্যাপার হলো, আদিবাসীদের সমস্যা সম্বন্ধে এক নৃতাত্ত্বিক ও আর এক নৃতাত্ত্বিকের মধ্যে, এক অভিজ্ঞ অফিসার ও আর এক অভিজ্ঞ অফিসারের মধ্যে এবং এক সমাজ সংস্কারক ও আর এক সমাজ-সংস্কারকের মধ্যে মতবৈষম্য আছে। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যই এই মত-পার্থক্যের প্রধান কারণ। নৃতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, গভর্নমেণ্টের পক্ষে আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিকের পরামর্শকেই গ্রাহ্য করা উচিত। অভিজ্ঞ সরকারী অফিসারও তাঁর অভিমতকেই প্রামাণ্যরূপে গৃহীত হবার দাবী করেন। সমাজ-সংস্কারক তাঁর আদর্শগত নীতিকেই বা অগ্রাহ্য হতে দেবেন কেন? তিনিও সমানভাবে তাঁর অভিমতের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে জোর দিতে কুণ্ঠা করেন না।

সম্পূর্ণ সত্য না হ'লেও এটা কিছুটা সত্য যে, নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞেরা আদিবাসী সমাজকে তাঁর ল্যাবরেটরীর উপাদান বলেই মনে করে এবং তাঁদের দৃষ্টিটাও নিছক গবেষকের দৃষ্টি, আগ্রহটা নিছক বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

অভিজ্ঞ সরকারী অফিসারের দৃষ্টিতে প্রায়ই একটা ভ্রান্ত ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা শাসকের চক্ষু নিয়ে আদিবাসীকে নিছক শান্ত ও সুবাধ্য প্রজা হিসাবেই দেখতে চান এবং সেই জন্য তাঁদের অভিমতগুলি প্রায়ই একটা আইনবিলাসের তত্ত্ব হয়ে ওঠে।

সমাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিভঙ্গীতেও অনেক ক্ষেত্রে একপেশে গোঁড়ামি দেখা যায়। হয় ধর্মীয় গোঁড়ামি, নয় একটা পলিটিক্যাল গোঁড়ামি। আদিবাসী সমাজকে উন্নত করতে গিয়ে তাঁরা অনেক সময় আদিবাসীকে খাঁটি হিন্দু আর খাঁটি খৃষ্টানে পরিণত করবার দাবী করে থাকেন।

এই জটিল মতারণ্যের মধ্যে বেচারা আদিবাসীকে কোন্ মতে পথ করে দিতে হবে, সেটাই প্রশ্ন? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হবে না, যদি না তার আগে একটি নীতি নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ আদিবাসীর উন্নয়নের ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট বা কোন সেবক প্রতিষ্ঠান কোন্ নীতিকে তাঁদের কর্মপন্থা নিয়ামক ব'লে গ্রহণ করবেন?

উত্তর হিসাবে বলতে পারা যায়—জাতীয়তার নীতি। আদিবাসী সমাজকে ভারতের জাতিদেহের অঙ্গীভূত করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, আদিবাসী তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সাধারণ বাঙালী, বেহারী, উড়িয়া, মারাঠীর মত হয়ে যায়, কারণ, এই রকম একরূপ হয়ে যাওয়া ভারতীয় জাতীয়তার ধর্মই নয়। বহু বৈচিত্র্যে সমন্বিত হয়ে থাকাই ভারতীয় জাতীয়তার নীতি, এক কথায় বলা যায় ভারতের সামাজিক-ঐতিহাসিক নীতি। বর্তমানের দুঃখী দুর্বল অনুন্নত সাঁওতাল উন্নত সাঁওতাল হয়েই ভারতীয় সমাজজীবনে অন্য সকল সমাজের মত দায়িত্বে, নেতৃত্বে ও সেবকত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এক দেহে লীন করে দেবার প্রোগ্রাম গ্রহণ করলে সেটা বস্তুত সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজম হয়ে উঠবে। কোন নৃতাত্ত্বিক বা গভর্নমেণ্ট অফিসার বা সমাজসংস্কারক যদি জাতীয়তার অর্থ 'এক' দেহে লীন' করে দেওয়া মনে করেন, তাহলে ভুল করবেন। পোলট্রি-বিশারদের দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতি দিয়ে মানুষের সমাজতাত্ত্বিক সমস্যার সমাধানের কল্পনা গর্হিত মূঢ়তা মাত্র। ভারতের অন্যান্য সমাজের সঙ্গে আদিবাসীর বংশ সংমিশ্রণ এক বিরাট সমাজবিপ্লবের ব্যাপার। এত বিরাট একটা পরিবর্তন ঐতিহাসিক নিয়তির হাতেই ছেড়ে

দেওয়া উচিত। উন্নতির একটা বিশেষ ছাঁচ কল্পনা করে নিয়ে সব আদিবাসীকে সেই ছাঁচে একসঙ্গে ঢালাই করে গড়ে তোলা সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ মাত্র। তা না করে, যাতে আদিবাসীদের ছাঁচটাই উন্নত ও যুগোচিত হয়ে গড়ে ওঠে, তার ব্যবস্থাই একমাত্র সভ্যতাসঙ্গত পদ্ধতি। বলা যায়—আত্মবিকাশের (Self-Development) পদ্ধতি এবং এটাই হ'লো ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অগ্রসর হলেই বরং অদূর বা দূর ভবিষ্যতে একদেহে লীন হওয়া অর্থাৎ শোণিত সমন্বয় হওয়া স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হবে। স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় একদেহে লীন হওয়া অর্থে এই বুঝায় যে, আদিবাসী সমাজ তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে সমগ্র ভারতীয় জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত করে দিয়ে, স্বয়ং ভারতের সকল সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে ও সামাজিকতায় এক হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় একটা ভবিষ্যতের পরিণামকে সম্ভব করার জন্য কোন পণ্ডিত তাঁর বর্তমান বুদ্ধির সামর্থ্য দিয়ে আজই কোন পরিকল্পনা করতে পারেন না। কাজেই বর্তমানের আদিবাসী সমাজের সমস্যা সমাধানে আত্মবিকাশের নীতিকেই একমাত্র নীতি বলে গ্রহণ করা কর্তব্য।

পূর্ব প্রসঙ্গে আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের বহু অভিমত উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরস্পরের অভিমত সম্পর্কে একটা তুলনামূলক ধারণা যাতে সম্ভব হতে পারে, তারই জন্য এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বিশেষজ্ঞদের অভিমত পরিবেশন করা হলো।

ডাঃ হাটন : ব্রিটিশ আগমনের বহু আগে থেকেই আদিবাসী সমাজের পরিবর্তন হয়ে আসছিল, কিন্তু সে পরিবর্তন ছিল অত্যন্ত মন্দগতি। সেই কারণে আদিবাসীরা পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো, কিন্তু ব্রিটিশ আসবার পর রেল ও রাস্তা বেশী করে তৈরী হবার সঙ্গে বাইরের সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে পরিবর্তনের গতি হঠাৎ এত বেশী দ্রুত হয়ে গেছে যে, তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার সামর্থ্য আদিবাসীদের নেই। জঙ্গল সংরক্ষণ, আদিবাসী অঞ্চলে খনির কাজের প্রসার, ঘরে-তৈরী হাঁড়িয়া, বা মহুয়া বা পচাই মদ বন্ধ করে আবগারী স্পিরিট মেশানো নম্বরী মদের প্রচার, জমি সম্পর্কে আইন ও ভূমিকর প্রথার প্রবর্তন, ঋণ সম্পর্কে আইন, আদিবাসী অঞ্চলে ভিন্ন অঞ্চলের লোকের বসতি বিস্তার এই সব কারণে আদিবাসীদের সামাজিক জীবন ভেঙে যাচ্ছে।

এই অবস্থা চলতে থাকলে আদিবাসী সমাজ প্রশান্তমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদি-বাসীদের মত দৈহিক অবনতি ও মানসিক উৎসাহহীনতার (Physical decline and psychichal apathy) কারণে একটা দুর্বল উপজাতীয় জীবন বহন করে চলবে।

''সমস্যা সমাধানের উপায় হলো—আত্মশাসন ব্যবস্থা সম্বলিত এক একটি উপজাতীয় অঞ্চল সৃষ্টি করা, যেখানে আদিবাসীরা পার্শ্ববর্তী বা চারদিকে অবস্থিত প্রদেশগুলির অধীন না থেকে স্বাধীনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।' আদিবাসীকে বিশেষভাবে রক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে সব 'বহির্ভূত অঞ্চল (Excluded Area) সৃষ্টি করেছেন, তাঁতে আদিবাসীদের ভাল হয়েছে।

মিঃ গুবার্ট : মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই ধারণা হয় যে, বাইরের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে আদিবাসীদের জীবনে কোন বিপর্যয় হয়নি। সম্ভবত, দূর অতীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এখানে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে এবং বহু

শতাব্দী ধরে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি পাশাপাশি চলে আসছে। বাইরের সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে এই প্রদেশের আদিবাসীরা পৃথিবীর অন্য দেশের আদিবাসীর মত লুপ্ত হয়ে যাওয়া দূরে থাক, বরং সবচেয়ে বেশী বংশ বৃদ্ধি করেছে।

"বাইরের ব্যবসায়ী ও মিশনারীদের কার্য্যকলাপের ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল ও অন্যান্য অনেক দেশের আদিবাসীদের জীবনে ধ্বংস ডেকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ভারতের মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রয়োগ করা যায় না। এই প্রদেশের আদিবাসীদের অবস্থা আর অন্য কোন দেশের ধ্বংসশীল আদিবাসীদের অবস্থা, উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আরোপ করা সঙ্গত হবে না।"

অবশ্য কতকগুলি ব্যবস্থা আদিবাসীদের পক্ষে ক্ষতিকর হয়েছে। হাঁড়িয়ার বদলে আবগারী মদ পান করতে বাধ্য হওয়া, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদকের ব্যবহার বৃদ্ধি, কাপড়ের সংস্থান করার ক্ষমতা নেই, তবু কাপড় পরার অভ্যাস। নরবলি, ডাইনী পোড়ানো ইত্যাদি বীভৎস প্রথা বন্ধ করে দেওয়া উচিত, তবে আদিবাসী সমাজে জোর করে ধরে নিয়ে কোন মেয়েকে বিয়ে করার প্রথা বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না। ঝুম চাষও রহিত করা ঠিক নয়।

কিন্তু উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের যতটা 'ক্ষতি' হয়েছে, তার তুলনায় 'লাভ' হয়েছে অনেক বেশী। গোষ্ঠী সর্দারদের স্বৈরাচারী প্রভুত্বের তুলনায় একটা আইনবদ্ধ গভর্নমেণ্টের শাসন ঢের ভাল ব্যবস্থা।

প্রতিবেশী সভ্যতর অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে চললে আদিবাসীদের উন্নতি হবে।

শরৎচন্দ্র রায় : দেখা গেছে সমতলবাসী ভুঁইয়া সমাজ ভিন্ন সমাজের সভ্যতর প্রতিবেশীর সংস্পর্শে এসে উন্নত হয়েছে, যদিও এর ফলে তাদের আদিম তেজস্বিতা (primitive virility) কিছু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পাহাড়ী ভুঁইয়া সমাজের তুলনায় সমতলবাসী ভুঁইয়ারা উন্নত। সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে ভুঁইয়াদের মধ্যে কোন সামাজিক অসুবিধা অথবা মনের দিক দিয়ে কোন নৈরাশ্যবাদ (pessimism) দেখা দেয় নি।

খাড়িয়া সমাজের মধ্যে দুধ-খাড়িয়া গোষ্ঠী হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজ এবং সভ্যতার খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে। কিন্তু এর ফলে এই দুধ-খাড়িয়া সমাজের উপজাতীয় সংস্কৃতি লুপ্ত হয়নি। বরং তারা হিন্দু সংস্কৃতি থেকে এমন সব প্রথা এবং উপাদান গ্রহণ করেছে, যা তাদেরই উপজাতীয় সংস্কৃতির মৌলিক উপাদানরূপে একাঙ্গীভূত হয়েছে।

মিশনারীদের উদ্যোগে প্রচারিত খৃষ্টধর্মের সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের মোটের ওপর ভালই হয়েছে। ব্রিটিশ আইনের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার ফল খারাপ হয়েছে। কতগুলি কুপ্রথা দূর হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আদিবাসীরা তাদের জমি হারিয়েছে এবং তাদের অনেক ঐতিহ্যপুষ্ট অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ডাঃ ডি এন মজুমদার : কোল্হান অঞ্চলের হো সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে বুঝা যায় যে, তারা পূর্ব-পুরুষদের তুলনায় অল্পায়ু ও দুর্বলদেহ হয়েছে, যদিও বংশবৃদ্ধির হার আগের তুলনায় বেশী। ঔদাসীন্য, উৎসাহহীনতা, নৈরাশ্যবাদ প্রভৃতি মনোবলহীনতার যে সব লক্ষণ আদিবাসীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেগুলি অবশ্য বেশী শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছায় নি। নতুন পরিপার্শ্ব ও পরিবর্তনকে বরণ করে নিয়ে তার সঙ্গে

নিজেকে খাপ খাওয়াতে হো সমাজ শিখেছে।

আদিবাসীদের দুরবস্থার কারণ :

(১) আবগারী আইন, চোলাই প্রথার (Outstill System) ফলে আদিবাসীদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস বেড়েছে।

(২) আদিবাসীদের নিজস্ব গোষ্ঠীগত কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের কর্তব্যচ্যুত করে সরকারী শাসন কর্মচারীর নিয়োগ গোষ্ঠীগত জীবনের সংহতি নষ্ট করেছে।

(৩) যে সব জমিতে আদিবাসীরা ঝুম চাষ করতো সে সব জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

(৪) আদিবাসী অঞ্চলের জমির নীচে খনিজ পদার্থ থাকলেও, আদিবাসীরা মোটা টাকা জমা দিয়ে লাইসেন্স না নিলে সে সব খনিজ তুলতে পারে না।

(৫) ঝুম চাষের পদ্ধতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে, লাঙল চাষ পদ্ধতিতে আদিবাসীরা অভ্যস্ত নয়।

(৬) ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে জোর করে মেয়ে ধরে নিয়ে বিয়ে করা (Marriage by capture) নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(৭) বর্তমান হাট, বাজার ও মেলা প্রভৃতি ব্যাপারে আকৃষ্ট হবার ফলে আদিবাসীদের আর্থিক ধ্বংস হয়ে চলেছে।

(৮) যে ধরণের শিক্ষা (Education) বর্তমানে আদিবাসীদের দেওয়া হচ্ছে, তাতে ভাল'র বদলে ক্ষতিই বেশী হচ্ছে।

(৯) সরকারী বিচার বিভাগের রাজকর্মচারীরা আদিবাসীদের সামাজিক প্রথা, ভাষা এবং মানসিক গঠন সম্বন্ধে অজ্ঞ বলে আদিবাসীদের বাদবিবাদে ন্যায়সঙ্গত বিচার করতে পারেন না।

(১০) মিশনারীদের কার্যকলাপের ফলে আদিবাসীরা নিজেদের সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে।

(১১) সভ্য সমাজের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে নতুন নতুন রোগের আবির্ভাব হয়েছে। এই সব রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাদের ঐতিহ্যগত ভেষজ-বিধির মধ্যেও কোন ব্যবস্থা নেই।

এই সব কারণে ভারতের আদিবাসী সমাজের বংশাবনতি এবং জনসংখ্যা হ্রাসের লক্ষণ (tendency to decline) দেখা দিয়েছে।

ভাই অমৃতলাল ঠক্কর : আদিবাসী সমাজ প্রায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার পর্যায়ে রয়েছে। এদের সমস্যা হলো : (১) দারিদ্র্য, (২) নিরক্ষরতা, (৩) স্বাস্থ্যহীনতা, (৪) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্গম্যতা, (৫) শাসনব্যবস্থার ত্রুটি, (৬) নেতৃত্বের অভাব।

আদিবাসীরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির, তার ওপর ঝুম চাষ, মদ্যপান, বেগার প্রথা ইত্যাদির জন্য নিতান্ত দরিদ্র সমাজে পরিণত হয়েছে। এদের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং যৌনরোগের প্রাবল্য দেখা যায়।

সভ্য সমাজের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। আদিবাসী অঞ্চলে পথঘাটের প্রসার, শিল্প ও বাণিজ্যের পত্তন ও শিক্ষাবিস্তার হওয়া উচিত। গোষ্ঠীগত পঞ্চায়েতগুলিকে পুনর্জীবিত করতে হবে। প্রাদেশিক আইনসভায় আদিবাসীদের

প্রতিনিধিত্বের জন্য আসন সংখ্যা আরও বেশী সংরক্ষিত করতে হবে। আদিবাসী অঞ্চল-গুলিকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সাধারণ শাসন কর্তৃত্বের বহির্ভূত করে রাখার নীতি আদৌ সমর্থন করতে পারা যায় না। অখৃষ্টান আদিবাসী সমাজে এমন শিক্ষিত ও যোগ্য লোকের সংখ্যা কম, যাঁরা তাঁদের সমাজের নেতৃত্ব করতে পারেন. সেই কারণে অন্য সমাজের সেবক মনোভাবসম্পন্ন যোগ্য কর্মীদেরই আদিবাসী সমাজের নেতৃত্ব নিতে হবে, যতদিন না আদিবাসী সমাজ থেকেই যোগ্য নেতৃদলের আবির্ভাব সম্ভব হয়।

আদিবাসী সমাজকে ভারতের অন্যান্য সমাজ থেকে স্বতন্ত্র ক'রে রাখা চলতে পারে না। আদিবাসী সমাজকে দুর্গম পাহাড় ও আরণ্য অঞ্চলে স্বতন্ত্র করেও আবদ্ধ করে রাখার অর্থ বলতে গেলে কতগুলি নৃতত্ত্ববিলাসী পণ্ডিতের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য আদিবাসীদের তত্ত্ব পরীক্ষার উপাদানের মত কাঁচের পাত্রে আবদ্ধ করে রাখার ব্যাপার।

আদিবাসী সমাজকে আমাদের দেশেরই সভ্য সমাজের একটি অংশরূপে পরিণত করতে হবে। দেশের কোন একটা প্রচলিত ধর্মের অবলম্বী সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যে নয়, দেশের সাধারণ সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অন্য সকল অগ্রসর সমাজের সঙ্গে তাঁদেরও সমান সুযোগ ও অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। আদিবাসীকে স্বতন্ত্র করে রাখার থিওরী একটা ক্ষতিকর থিওরী। এ থিওরী আমাদের জাতীয় সংহতির মূলে গিয়ে আঘাত করছে।

মিঃ ভেরিয়েব এলুইন : আদিবাসী সমাজকে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

প্রথম, জমিদার ভূস্বামী ও সর্দার শ্রেণীর আদিবাসী যারা হিন্দুসমাজে মর্যাদাপূর্ণ স্থান লাভ করে একটা অভিজাত সমাজে পরিণত হতে পেরেছে এবং যাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল। দ্বিতীয়, যারা হিন্দু সমাজের সান্নিধ্যের ফলে হিন্দু সমাজ ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, সেই সব শ্রেণীব আদিবাসী।

তৃতীয়, যারা পাহাড় ও জঙ্গল অঞ্চলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত জীবন যাপন করছে।

উক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিবাসীদেরই মনোবলহীনতা বা স্নায়বিক হানি (Loss of Nerve) হয়েছে, তাদের মন একটা ব্যর্থতাবোধ দ্বারা পীড়িত। এর কারণ হলো (১) আবাদ জমি হাতছাড়া হওয়া, (২) জঙ্গলের সামগ্রী আহরণের অবাধ অধিকার বিনষ্ট হওয়া, (৩) অর্থনৈতিক শোষণ, (৪) উপজাতীয় শিল্পকর্ম বিনষ্ট হওয়া এবং সৃষ্টি করার আগ্রহের ব্যর্থতা, (৫) আইনের প্রকোপে পড়ায় নৈতিক ও স্নায়বিক অবসাদ, (৬) ধর্মীয় শিকার-উৎসবের প্রথা লুপ্ত হওয়া, (৭) ঘরে মদ তৈরীর পুরাতন পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করে দেওয়া, (৮) অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন, (৯) অন্য ধর্মের সঙ্গে আদিবাসীর উপজাতীয় ধর্মের সংস্পর্শ এবং (১০) আদিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন সঙ্ঘের উদ্যোগে সংস্কারমূলক আন্দোলন।

প্রথম শ্রেণীর আদিবাসী অর্থাৎ অভিজাতসমাজ সংখ্যায় খুবই কম। এদের ওপর অপরের সংস্কৃতি সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুত্ব প্রভাবিত মনোবলহীন আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যাই সবচেয়ে বেশী, সংখ্যায় প্রায় দুই কোটি। তৃতীয় শ্রেণীর আদিবাসী সভ্যতার সংস্পর্শ থেকে দূরান্তরিত, বিশুদ্ধ গোষ্ঠীগত সমাজের আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ।

প্রথম শ্রেণী সম্পর্কে কোন সমস্যা নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যা হলো প্রকৃত আদিবাসী সমস্যা। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্যার রূপও পরস্পর থেকে বিভিন্ন, সুতরাং সমাধানের পদ্ধতিও বিভিন্ন হওয়া উচিত।

"যে দু' কোটি আদিবাসী (অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর আদিবাসী) কোনরকম সভ্যতার সংস্পর্শে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে, তারা নিকট ভবিষ্যতে সেই সংস্কৃতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে অভিভূত হবে। সুতরাং এই শ্রেণীর আদিবাসীর সমস্যা ভারতের অন্যান্য চাষী সমাজের সমস্যা থেকে খুব বেশী পৃথক নয়।...এটা ভারতের সাধারণ পল্লী উন্নয়নের সমস্যার অন্তর্ভুক্ত।...এই দুই কোটি অর্ধ-সভ্যতাসম্পন্ন আদিবাসীকে ভারতের সাধারণ জনসমাজের সঙ্গেই স্থান গ্রহণ করতে হবে।"

প্রকৃত সমস্যা হলো তৃতীয় শ্রেণীর আদিবাসীকে নিয়ে। এদের সভ্য করা বা 'উন্নয়ন' করার চেষ্টা ভ্রান্ত পথ, সেটা করলে এরা ধ্বংসে হয়ে যাবে। এদের সমস্যা সমাধানের পথ হলো 'ন্যাশনাল পার্ক' প্রতিষ্ঠা। এই ৫০ লক্ষ বন্য আদিবাসীর জীবনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করে তাদের বিষয় সম্পূর্ণভাবে তাদেরই হাতে ছেড়ে দিতে হবে। গভর্ণমেন্ট শুধু এক একটি বন্য অঞ্চলকে 'সম্পূর্ণ আদিবাসী এলাকা' রূপে নির্দিষ্ট করে দেবেন, যেখানে আদিবাসীরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাদের খাঁটি উপজাতীয় সংস্কার ও প্রথা নিয়ে অবাধভাবে জীবন যাপন করতে পারবে।

ডাঃ জি এস ধুরে্য : আদিবাসী সমাজ ঐতিহাসিক সত্য অনুসারে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসারে আদিবাসীরা হলো প্রায়-হিন্দু সংস্কৃতির মানুষ। বর্তমানের অশিক্ষিত দরিদ্র ও পীড়িত আদিবাসী সমাজ ভারতের কোটি কোটি দুঃস্থ কৃষকসমাজের মতই, জমিদার মহাজন সরকারী কর্মচারী ও আইন দ্বারা শোষিত আদিবাসী সমাজকে 'অবনত হিন্দু'ই (Backward) বলা যেতে পারে। আদিবাসীদের প্রত্যেকটি সমস্যা বিচার করলে দেখা যায় যে, এদের অর্থনৈতিক সমস্যা হলো সাধারণ ভারতীয় কৃষকের অথবা গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক সমস্যা এবং সাংস্কৃতিক সমস্যা হলো হিন্দু সংস্কৃতির সমস্যা।

'বহির্ভূত এলাকা' সৃষ্টি ক'রে অথবা 'ন্যাশনাল পার্ক' সৃষ্টি করে কৃত্রিম উপায়ে আদিবাসীর সমস্যা সমাধান করা যায় না। ভারতের সাধারণ সমস্যার অংশ হিসাবেই আদিবাসীর সমস্যার সমাধান করলে সেটাই সর্বোত্তম সমাধান হবে।

কয়েকজন বিশেষজ্ঞের যে অভিমত উল্লিখিত হলো, তা থেকে আদিবাসীদের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে প্রধানতঃ দুরকমের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। একদল বিশেষজ্ঞকে বলা যায়—স্বাতন্ত্র্যবাদী (Isolationist)। এঁরা মনে করেন, ভারতের সভ্যসমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের ক্ষতি হয়েছে, সুতরাং আদিবাসী সমাজকে স্বতন্ত্রভাবে থাকবার একটা ব্যবস্থা করা বিধেয়। বিশেষ করে ইংরাজ অফিসার বিশেষজ্ঞ এবং কতিপয় ইংরাজ নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের এই অভিমত।

আর এক দল বিশেষজ্ঞকে বলা যায়—সাযুজ্যবাদী (Assimilationist)। এঁরা মনে করেন, সভ্য সমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসীদের উন্নতি হয়েছে এবং যাতে আদিবাসী এই সভ্য সমাজের সজীব অঙ্গ হিসাবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি লাভ করে আধুনিক হয়ে উঠতে পারে, তারই ব্যবস্থা করা উচিত। বিশেষ করে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক, সমাজ সংস্কারক ও কংগ্রেসী জাতীয় নীতি এই অভিমতের সমর্থক।

বাংলার আদিবাসী

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাঙলার আদিবাসী ও উপজাতীয় সমাজের জনসংখ্যা হলো :

বাঙলার সমস্ত জিলায় : ১৬৫৫৯৯৭	কুচবিহার রাজ্য : ২৪৩৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম : ২৩৩৩৯২	ত্রিপুরা রাজ্য : ৩৩৬৩৩
সিকিম : ৬৩২০৬	

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার ফলে বাঙলা প্রদেশ দুভাগ হয়েছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ প্রদেশের আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা যথাক্রমে দাঁড়িয়েছে :

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ : ১৩৬৮৭৮০	পূর্ববঙ্গ প্রদেশ : ২৮৭২১৭

সমগ্র ভৌগোলিক পূর্ববঙ্গ ধরলে উক্ত প্রাদেশিক হিসাবের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীর জনসংখ্যা এবং শ্রীহট্ট জেলার একাংশের আদিবাসী জনসংখ্যাও যুক্ত হবে। এই হিসাব ধরলে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ববঙ্গের সমগ্র আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ লক্ষের কিছু অধিক। আর মাত্র কুচবিহার রাজ্য নিয়ে সমগ্র ভৌগোলিক পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী ও উপজাতীয়ের জনসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৪ লক্ষ।

১৯৪১ সালের সেন্সাস অর্থাৎ আদমসুমারীর রিপোর্টে যেসব আদিবাসী বা উপজাতি গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেটাই কিন্তু সব নয়। ১৯৪১ সালের এই হিসাব বস্তুতঃ 'উপজাতীয় ভাষী' জনসংখ্যার হিসাব। উপজাতীয় ভাষায় যত সংখ্যক লোক কথা বলে, এটা তারই হিসাব।

কিন্তু আর একটা কথা আছে। ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাঙলা দেশেও এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যারা বংশের দিক দিয়ে উপজাতীয় আদিবাসী, কিন্তু তাদের মাতৃভাষা বর্তমানে প্রাদেশিক ভাষা হয়ে গেছে। সুতরাং বাঙলা দেশের প্রকৃত আদিবাসী সমাজের জনসংখ্যার হিসেব নিতে হলে শুধু ভাষাগত বিচার করলেই চলবে না। ভাষা যা-ই হোক সামাজিক ভাবে যারা উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন করছে, তাদের আদিবাসী বা উপজাতীয় ব'লেই্ গ্রহণ করা উচিত। কারণ, সাধারণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুসমাজ এবং আদিবাসী সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্য খুব বেশী নয়। এমন কি ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়েও উভয়ের মধ্যে খুব বেশী উৎকর্ষ বা অপকর্ষের তারতম্য দেখা যায় না। পার্থক্য হলো উভয়ের সামাজিক গঠনের পার্থক্যের মধ্যে। আদিবাসীরা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করে, আর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে প্রকৃত গোষ্ঠীবদ্ধতা নেই।

বাঙলা দেশে আবার এমন কয়েকটি সমাজ আছে, যারা কোন কালে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজই ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে উপজাতীয়ত্ব এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কোন নিদর্শন নেই এবং ধর্মে ভাষায় ও সামাজিক আচারে এরা আজ হিন্দু। নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে তারা আদিবাসী হলেও সামাজিক দিক দিয়ে তাবা হিন্দু।

দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন উপজাতীয় আদিবাসী সমাজ এবং বৃহত্তর হিন্দুসমাজ— উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণের যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বহুকাল হলো চলে আসছে, তার বিভিন্ন অপরিণত অর্ধপরিণত ও পরিণত রূপ হলো বাঙলার বিভিন্ন আদিবাসী সমাজ। সুতরাং বাঙলার আদিবাসী সমাজের কুলজী বিচার করে তিনটি পর্যায় দাঁড় করানো যেতে পারে :

(১) বংশে হিসাবে আদিবাসী, যাদের ভাষা উপজাতীয়, সমাজও উপজাতীয় অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ।

(২) বংশে হিসাবে আদিবাসী, যাদের ভাষা প্রাদেশিক অথচ সমাজ উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধ স্তরেই আছে।

(৩) বংশ হিসাবে আদিবাসী, যারা প্রাদেশিক হিন্দুর ভাষা এবং হিন্দুর সমাজ গ্রহণ করে একটা 'জাত' হয়ে গেছে। অর্থাৎ আদিবাসী হয়েও যাদের ভাষা উপজাতীয় নয়, সমাজও উপজাতীয় গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্যে আর নেই।

হিন্দু সমাজভুক্তির এই প্রক্রিয়ার মধ্যে 'ধর্মে'র স্থানও অবশ্যই আছে। কিন্তু ধর্ম দ্বারা ঠিক উপজাতীয়ত্ব বা আদিবাসীত্ব নির্ণয় করা যায় না। এর কারণ, পূর্ব অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। বস্তুতঃ আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দু ধর্মেরই একটি রূপ বলতে কোন বাধা নেই। এবং খাঁটি উপজাতীয় আদিবাসীরাও নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতে আপত্তি করে না। বিভিন্ন আদম সুমারীর রিপোর্টের দিকে তাকালেই এই বিশেষ সত্যটি উপলব্ধি করা যায়। বহু আদিবাসী আছে, যাদের ভাষা এবং সমাজ দুইটি খাঁটি উপজাতীয় স্বরূপে রয়েছে, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেকে হিন্দু বলতে দ্বিধা করে না।

আদিবাসীর উপজাতীয় ধর্ম ও হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক ঐক্য সম্বন্ধে ডাঃ হাটনের সমাজ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিবরণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। মিঃ এলুইনও জোর করেই বলেছেন যে, ভারতের সমস্ত আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বলেই গণ্য করা উচিত। শুধু আসামের আদিবাসী ধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোন অভিমত দেননি। ভারতেব আদিবাসীকে ধর্মের দিক দিয়ে (Theologically) তিনি হিন্দু বলে মনে করেন, এবং রাজনীতির দিক দিয়েও আদিবাসীকে হিন্দু বলে গণ্য করতে তিনি রাজী আছেন। এ সত্ত্বেও ঠিক ডাঃ হাটনের মতই কে জানে কিসের জন্য অখুশী হয়ে মিঃ এলুইনও আদিবাসীর ধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে একটা বিশিষ্ট ও পৃথক ব্যাপার (A distinct and apart) বলেছেন। কেন পৃথক? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আদিবাসীদের বিশিষ্ট কতগুলি ধর্মসংস্কারের নাম করেছেন যেগুলি ঠিক হিন্দুত্বের সঙ্গে খাপ খায় না। যথা—গরু বলি, অপদেবতার পূজা, ধর্মানুষ্ঠানে রক্ত ও মদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি।

মিঃ এলুইনের মন্তব্যের মধ্যে আমরা দুটি সত্যের প্রমাণ পাই। প্রথম, আদিবাসীদের ধর্মনীতি সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এবং দ্বিতীয়, হিন্দুধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও ধারণা নেই। হিন্দুধর্ম যদি একটা খারাপ ধর্ম বলেও তিনি মনে করেন, তবুও তাঁর জানা উচিত যে, এই ধর্মের নীতি ও সংস্কারের একটা গণ্ডীবদ্ধ রূপ নেই। যদি হিন্দুধর্মকে খারাপ বলেই ধরা হবে, তবে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ কবিতার বর্ণনার মতই মাত্রাহীন ব্যাপকতার দ্বারাই এই হিন্দু ধর্ম খারাপ—'কি না আছে হিন্দুধর্মে কি না আছে ভাই।' আদিবাসীদের যেসব বিশিষ্ট ও পৃথক (distinct apart) সংস্কারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, খোঁজ করলে দেখবেন সেসবই হিন্দু সমাজের বিভিন্ন জাত পাত গোষ্ঠী পন্থীর কোন না কোন সমাজে ধর্ম সংস্কাররূপেই চলছে। হিন্দুসমাজের মধ্যেই যে শত শত সম্প্রদায়, শ্রেণী, আশ্রম ও জাত রয়েছে—এত বিভিন্ন ও বিচিত্র শাক্ত, সৌর গাণপত্য, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক রয়েছে—যারা পরস্পর থেকে বিশিষ্ট এবং পৃথক, কি তারাই আবার অন্যদিক দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এবং তারা হিন্দুই।

আদিবাসীকে এত ঘনিষ্ঠরূপে হিন্দু বলে বুঝতে পেরেও মিঃ এলুইন কেন যে তাদের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্যগুলির ওপর এত জোর দিয়েছেন, তার কারণ ঠিক বোঝা যায় না. আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা? হিন্দু সমাজের কুপ্রথাগুলি যাতে তারা গ্রহণ না করে তার জন্যে সাবধানতা? এই যদি মিঃ এলুইনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভালই। কিন্তু তার জন্যে আদিবাসীকে পৃথক্ করে ধরবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ সমস্ত সমস্যাটাই মোটামুটিভাবে 'হিন্দুর সামাজিক সমস্যা', আদিবাসী সমস্যা তারই একটি অংশ মাত্র। হিন্দু সমাজের সব সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি এক নয়, এবং হিন্দুসমাজের বৈশিষ্ট্য হলো: বহু সংস্কৃতির সমাবেশ। নিজের সংস্কৃতি বিসর্জন না দিয়েই আদিবাসীরা হিন্দুসমাজে আসতে পারে এবং এসেছেও। হিন্দুর সামাজিকতা আর খৃষ্টীয় সামাজিকতার মধ্যে এইখানে একটা বড় পার্থক্য। হিন্দুসমাজের সংস্কৃতি প্রযোজিত শিল্পের (Directorial Art) মত—একই দেহে বিভিন্ন অলংকারের পরিসজ্জার মত একই সময়ে বিভিন্ন বৈচিত্র্যপ্রবণ সংস্কৃতির সমাবেশ। অপরের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে অথবা অপরের সংস্কৃতিকে সর্বদা রূপান্তর করিয়ে দিলেই যে জাতিগত সংমিশ্রণ সহজ হয়, হিন্দু সমাজ এই সাংস্কৃতিক ফ্যাসিজমের পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। হিন্দুসমাজ আদিবাসীর সংস্কৃতিকে 'গ্রাস' করতে চাইলে অন্যথা পরিণাম খারাপ হবে, এবং যেখানে যতটুকু গ্রাসের ব্যাপার হয়েছে সেটাও খৃষ্টীয় মিশনারী সংঘের মত হিন্দু সমাজের টাকার জোরে বা গায়ের জোরে হয়নি। আদিবাসী বাধ্য হয়েই এই ভুল করেছে। মিঃ এলুইনের সিদ্ধান্ত যদি সত্য বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবুও সমস্যাটা ঠিক মিঃ এলুইনের কথিত সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়, হিন্দুসংস্পর্শঘটিত অধঃপতনের সমস্যাও নয়। মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতি যদি সম্ভব করা যেতে পারে তবে নিজেদের সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ভালমন্দ বিচার করা তাদের কাছে সহজ হয়ে উঠবে। মিঃ এলুইনের আরও জানা উচিত, আদিবাসীর অর্থ-নৈতিক সমস্যার কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকলেও বিষয়টা বৃহত্তর এবং সমগ্র হিন্দু জন-সাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার একটা অংশ।

আদিবাসীদের সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহাসে আর একটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রণিধানের যোগ্য। দেখা গেছে যে, হিন্দুসমাজের পক্ষে থেকে মিশনারী প্রথায় ধর্মান্তরিত করার কোন উদ্যোগ না থাকলেও বহুকাল থেকে আপনা হতেই আদিবাসীরা হিন্দুর ধর্ম ও সমাজে চলে আসছে। আর, খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কিছু কিছু আদিবাসী খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু ইসলাম আদিবাসী মনের ওপর কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি। নিম্নশ্রেণীর লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ওপর ইস্লামের প্রতিক্রিয়া খুবই সফল হয়েছে, বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হল আদিবাসীরা কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি। ভারতে যখন মুসলমান রাজশক্তি ছিল, তখনো মোল্লা সমাজের দ্বারা চালিত ধর্মান্তরকরণের উদ্যোগ আদিবাসীদের কাছে এসে ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বাঙলা দেশে বাস করে যেসব বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী, তারা নৃতত্ত্ব ভাষা ও সামাজিকতায় পরস্পর থেকে বিভিন্ন। এদের মধ্যে অধিকাংশকেই বাঙলা দেশের বাইরের লোক বলা যেতে পারে। বহু অতীত থেকে বাঙলায় বসতি ক'রে আসছে, এমন আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা কম এবং এ ধরণের যারা আছে তারা আজ ভাষা, ধর্ম ও সমাজে একরকম হিন্দু হয়েই গেছে। বাঙলা দেশে 'আগন্তুক' এই আদিবাসী সমাজকে তাদের মূল

ভৌগোলিক অধিষ্ঠান হিসাবে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) সাঁওতাল ওঁরাও মুণ্ডা প্রভৃতি যারা ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যা অঞ্চল থেকে এসে বাঙলায় বসতি করেছে।

(২) উত্তর পূর্ব সীমান্তের চীন-মঙ্গোলীয় বংশের উপজাতীয় গোষ্ঠী, যারা আসামের দিক থেকে এসে বাঙলায় বসতি করেছে। উদাহরণ—গারো, কাছাড়ী, হদি প্রভৃতি।

(৩) উত্তরের হিমালয় অঞ্চলের তিব্বতী মঙ্গোলীয় বিভিন্ন উপজাতির গোষ্ঠী যারা দার্জিলিং জলপাইগুড়ি অঞ্চলে এসে বসতি করেছে। উদাহরণ—ভোটিয়া, গুরুং, লেপ্চা, নেওয়ার প্রভৃতি।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা প্রভৃতি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কুকি প্রভৃতি সমাজ যারা আরাকান ও বর্মার চীন-পাহাড় প্রভৃতি অঞ্চল হতে এসে বসতি করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে যদিও এরা 'আগন্তুক', কিন্তু সেটা বহু অতীতের ঘটনা, আজ তারাই প্রকৃত স্থানীয় অধিবাসী এবং তারাই উক্ত অঞ্চলের বৃহত্তম সমাজ।

বাঙলার বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক পরিচয়

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে বাঙলা দেশে (সিকিম, কুচবিহার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা রাজ্য সমেত) মোট ২০টি গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু মাত্র ভাষার ভিত্তিতেই এই কটি আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ ধরা হয়েছে। প্রকৃত আদিবাসী সমাজের সংখ্যা আরও বেশী। এ বিষয়ে বরং ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে আরও বিশদ এবং বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, যারা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ।

উপজাতীয় বিভিন্ন ভাষা অনুসারে ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাঙলা দেশে আদিবাসীদের যে বিশটি সমাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে, তারা হলো—

ভোটিয়া, চাক-মা, দামাই, গুরুং, হদি, কামি, খাস, কুকি, লেপচা, লিম্বু, মংগর, মেচ, ম্রু, মুণ্ডা, নেওয়ার, ওঁরাও, সাঁওতাল, সারকি, সুনুওয়ার, টিপ্‌রা।

কিন্তু ভাষা অনুসারেই এই তালিকা নির্ভুল নয়। ভাষা অনুসারে সমাজ বিভাগ করলে আরও কয়েকটি বিশেষ আদিবাসী সমাজের নাম উল্লিখিত হওয়া উচিত ছিল। যথা ঃ খন্দ, লুসাই ইত্যাদি। খন্দ গোষ্ঠীর আদিবাসী বাঙলা দেশে আছে এবং তাদের নিজস্ব ভাষাও আছে—খন্দি বা কন্ধি বা কুই। লুসাইও একটি বিশিষ্ট ভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লুসাই ভাষাকে ছাত্র ও পরীক্ষার্থীর 'মাতৃভাষা'রূপে স্বীকারও করেছে।

অথচ ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টের এই তালিকায় চাকমা সমাজের নাম স্থান পেয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা সমাজও মূলতঃ বাঙলা ভাষী, সে ভাষাটি, বাঙলারই একটি উপভাষা।

আরও প্রশ্ন উঠবে উপজাতীয় ভাষী হদি সমাজের নাম যদি উল্লেখ করা হলো, তবে ময়মনসিংয়ের গারো হাজং কাছাড়ী প্রভৃতি বিশিষ্ট উপজাতীয় ভাষী সমাজের নাম কেন উল্লেখ করা হলো না?

যদিও হদি হাজং ও গারো কাছাড়ী এদের প্রত্যেকের উপভাষা (Dialect) একই বোড়ো (কাছাড়ী) ভাষা গ্রুপের অন্তর্গত, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, জনসংখ্যার হিসাব। বাঙলার

গারো ও হাজং-এর সমগ্র জনসংখ্যা কি হুদি জনসংখ্যার মধ্যেই এক করে ধরা হয়েছে? তা ধরা হয়নি।

ভোটিয়া, দামাই, গুরুং; খাস, কামি, লেপ্‌চা, লিমবু, মংগর, মেচ, নেওয়ার, সারকি, সুনুওয়ার—এই কয়টি গোষ্ঠীর ভাষা উপভাষা মাত্র, মূল তিব্বতী-চীন ভাষাবর্গের হিমালয় গ্রুপের অন্তর্গত। কিন্তু এদের নাম ভিন্ন ভিন্ন করে দেখান হয়েছে এবং সেটাই ঠিক। কারণ মূল ভাষাবর্গ এক হলেও এদের প্রত্যেকের উপভাষা পরস্পর থেকে বিশিষ্ট এবং তারা এক একটি ভিন্ন ভিন্ন উপসমাজ। একটি উপসমাজ আর একটি উপসমাজ থেকে বিশিষ্ট। এই রীতি অনুসারে হুদি গারো ও হাজং ভিন্ন ভিন্ন উপ-সমাজের নাম ও জনসংখ্যা ভিন্ন করে দেখান উচিত ছিল।

আদমসুমারীর রিপোর্টের প্রধান ভ্রান্তি হলো আদিবাসী গোষ্ঠীর নাম ও জনসংখ্যা গণনার সুনির্দিষ্ট একটা মান (Standard) অনুসরণ করা হয়নি। কখনো ধর্ম, কখনো ভাষা গ্রুপ এবং কখনো বা উপভাষা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ এবং জনসংখ্যা গণনা করা হয়েছে।

বাঙলার আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজ হিসাবে মাত্র ২০টি গোষ্ঠীর নাম ১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত রিপোর্টেরও অন্য অধ্যায়ে (সমগ্র ভারতের আদিবাসী সমাজের তালিকা) বিস্তৃতভাবে সমগ্র ভারতে যে ১৭৫টি উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায় যারা বাঙলা দেশে অল্পবিস্তর আছে, অথচ প্রাদেশিক তালিকায় তাদের নাম উল্লিখিত হয়নি। যথা :

বেদিয়া, বাহেলিয়া, ভূইয়া (ভূঁইহার?), ঝিঝিয়া, পান, পাসি, দোসাদ, রাভা, নাট, ঘাসি, কাছাড়ী, নাগেসিয়া, ভূনিজ কোরা, থারু, মালপাহাড়িয়া, গারো হাজং, খন্দ, লুসাই, হো, মাহলি, তুরী।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে সর্বভারতের—উপজাতীয় গোষ্ঠীর বিস্তৃত তালিকায় উল্লিখিত কয়েকটি গোষ্ঠীরও নাম আছে। এই সব গোষ্ঠী বাঙলা দেশেও কিছু না কিছু আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ঐ সালেরই বাঙলার উপজাতীয় গোষ্ঠীর প্রাদেশিক তালিকায় এই কয়টি গোষ্ঠীর কোন উল্লেখ নেই। একটি রিপোর্টে উপজাতীয় শ্রেণী বিভাগের ব্যাপারে দু জায়গায় দু রকমের হিসাব কেন?

১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাঙলার উপজাতীয় গোষ্ঠীর নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে যে প্রাদেশিক হিসাব ও তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে উপরে উদ্ধৃত দুটি তালিকার সব নামই পাওয়া যায়। এ ছাড়াও ১৯৩১ সালের রিপোর্টে বাঙলার উপজাতীয় গোষ্ঠীর নামের তালিকায় আরও কয়েকটি নাম পাওয়া যায়, যার উল্লেখ ১৯৪১ সালের সর্বভারতীয় তালিকায় বা বাঙলার প্রাদেশিক তালিকায় কোথাও নেই।

বেরুয়া, বিন্দ, দোয়াই, জিমদার ; থামবু, থামি, খিয়াং, কুর্মি কওর (কাওয়ার?), মাল (মালার?), মুরমি, রায়, টোটো।

'শবর' নামে উপজাতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বাঙলা দেশে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে আছে। ১৯৪১ ও ১৯৩১ সালের বাঙলা দেশের সেন্সাস রিপোর্টে এই গোষ্ঠীর কোন উল্লেখ নেই। বাঙলা দেশের শবর সমাজ সম্পূর্ণরূপে হিন্দুত্ব গ্রহণ করেছে এবং একটা জাত হিসাবে হিন্দু সমাজভুক্তও হয়ে গেছে, সম্ভবত এই কারণে শবর সমাজের কোন উল্লেখ নেই। বাঙলা দেশে আদিবাসী গোষ্ঠীর এই রকম হিন্দু সমাজভুক্তির ইতিহাস

বিচার করলে আরও কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম স্বভাবত মনে পড়ে। সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব লাভ হয়েছে, অর্থাৎ একটা 'জাত' হিসাবে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে গেছে, যদি এই কারণে শবর সমাজের নাম ১৯৩১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ না করা হয়ে থাকে, তবে আরও কয়েকটি সমাজের নাম উল্লেখ না করা উচিত ছিল। যথা, ভূমিজ, ভুঁইয়া ও কুর্মি সমাজের নাম। বাঙলা দেশে বসতি করেছে, এই সব সমাজের মানুষ ধর্মে ও সমাজে হিন্দুই হয়ে গেছে, উপজাতীয়ত্বের আর কিছু নেই। বাঙলা দেশে এই রকম সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব প্রাপ্ত এবং হিন্দু সমাজভুক্ত উপজাতীয় সমাজের নাম ধরলে আর একটি তালিকা হতে পারে। যথা :

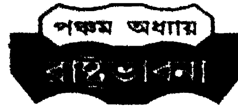
ভুঁইয়া, ভূমিজ, কুর্মি, শবর, কোচ পালিয়া, রাজবংশী।

নৃতত্ত্বের দিক দিয়ে বিচার করলে এবং নিকট অতীতের ইতিহাস ধরলে বাঙলার উল্লিখিত সমাজগুলি উপজাতীয় সমাজ ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁরা হিন্দু সমাজভুক্ত। ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে তাঁরা বাঙলার হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। এঁদের উপজাতীয় অবস্থা থেকে সাধারণ হিন্দু সমাজে পরিণত হবার ইতিহাস বেশী অতীতের ঘটনা নয় বলেই এখনো এঁদের সমাজে বিশিষ্ট কতগুলি প্রাচীন উপজাতীয় সংস্কার বর্তমান আছে।

ভারতের অন্যান্য অংশের মত বাঙলা দেশেও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যাযাবর সমাজ আছে, যাদের মধ্যে বর্তমানে উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু আছে। এদের উপজাতীয় না বলে উপ-সমাজই বলা ভাল। এই যাযাবর উপ-সমাজগুলির ইতিহাস ভিন্ন। এরা আদিবাসী সমাজ নয়। শিক্ষা, দীক্ষা ও সামাজিকতায় এই সব উপসমাজ খুবই অবনত। এদের এক একটা জীবিকা অবশ্য আছে। যেমন কারও পেশা পাখি-ধরা, কারও শেয়াল মারা, কারও গো-সাপ শিকার করা ইত্যাদি। কোন কোন উপ-সমাজ বন্য ওষধি বিক্রী করে, কেউ-বা বাঁশ বা বেতের ডালা ঝুড়ি তৈরি করে বিক্রী করে। এই সব উপসমাজের অনেকে আবার একেবারেই জীবিকাহীন। জীবিকাহীন হলে স্বাভাবিকভাবে নৈতিক অবনতি যেমন হয়ে থাকে, অনেক উপসমাজের মধ্যে সেটা খুবই হয়েছে। বৃটিশ শাসন-নীতি অনুসারে এই সব জীবিকাহীন উপসমাজকে 'অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠী' (Criminal Tribes) নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এদের সম্পর্কে 'গোষ্ঠী' 'ট্রাইব' (Tribe) কথাটা ব্যবহৃত হলেও এদের উপজাতি না বলে উপসমাজই বলা উচিত। ভারতের অন্যান্য আদিবাসী সমাজের সঙ্গেও এদের কোন সংস্কৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায় না। এরা আদিবাসীও নয়, উপজাতীয়ও নয়। অনেক 'জাত'কেও (Caste) অপরাধপ্রবণ গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেমন বাঙলার অঞ্চল বিশেষের বাগ্দী।

১৯৪১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ভারতের উপজাতীয় গোষ্ঠীর (Tribe) তালিকায় যে ১৭৫টি নাম দেখা যায়, তার মধ্যে ভুলক্রমে তথাকথিত 'অপরাধপ্রবণ' অনেক উপসমাজের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সব অপরাধপ্রবণ উপসমাজের অনেকে বাঙলা দেশেও আছে। যথা :

নাট, বেদিয়া, দুসাদ, ঘাসি, পাসি, বাহেলিয়া।



ভারতের দেশীয় রাজ্য

মহারাজ রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যৎ বাণী অনুসারে সারা ভারতবর্ষের মানচিত্রের রং সত্যি সত্যি একদিন লাল হয়ে গেল। শিখযুদ্ধের পর সমগ্র ভারতের মধ্যে এমন এক টুকরোও মাটি রইল না, যা বস্তুতঃ ব্রিটিশ অধিকৃত নয়।

তবুও নেটিভ ষ্টেট বা দেশীয় রাজ্য নামে ছোট বড় ৫৬২টি ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এগুলিও ষ্টেট অর্থাৎ রাজ্য এবং এর অধিপতিরা রাজা। মুসলিম দেশীয় রাজ্যও আছে, অধিপতিরা নবাব। অধিপতির আধুনিক মর্য্যাদা ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রকার ভেদে উপাধির তারতম্য আছে। হিন্দু দেশীয় রাজ্যের মহারাজা, রাণা, রাজা, রাজা সাহেব, ঠাকুর সাহেব ইত্যাদি, এবং মুসলিম রাজ্যের গদিতে নবাব, আমীর, ও খান ইত্যাদি প্রজাপালক সমাসীন রয়েছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে এঁদের 'হিজ হাইনেস' বলে সম্বোধন করেন, ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজার কপালে অবশ্য এত উচ্চ সম্বোধন জোটে না। রায়, কুমার, সর্দ্দার ইত্যাদি হ্রস্ব মর্য্যাদার সম্বোধন নিয়েই এঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের দরবারী গর্ব্ব আর একটু পরিচিত, তিনি হলেন 'হিজ এখজলটেড হাইনেস'। এদের পোষাক পরিচ্ছদের ঐশ্বর্য্য দেবেন্দ্রোপম এবং কটিবদ্ধ তরবারীর দিকে তাকালেও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নরপাল বলে মনে হবে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সরকারী খাতায় এইসব যদিও দরবারখচিত রাজ্যগুলির মুড়ি-মিছরি দরভেদ নেই—সবই করদরাজ্য মাত্র। (সাবসিডিয়ারী ষ্টেটস)।

ব্রিটিশের আমন্ত্রিত এই ৫৬২টি দেশীয় রাজ্যের অপর নাম 'ভারতীয় ভারত' (ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া) সাম্প্রতিক কালে, ১৯৪৩ সালে সম্রাটের প্রতিনিধি* (ক্রাউন রিপ্রেসেনটেটিভ) যে অন্তর্ভুক্তির (মার্জার) পরিকল্পনা ঘোষণা করেন, সেই অনুসারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যকে বড় বড় কয়েকটা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বরোদা ও নবনগর প্রভৃতি কয়েকটি বড় রাজ্যের সংগে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যকে যুক্ত করা হয়েছে। এই ভাবে ধরলে দেশীয় রাজ্যের সংখ্যা ৫৬২টির কিছু সামান্য কম হবে, কিন্তু রাজার সংখ্যা ৫৬২টিই আছে।

এই রাজ্যগুলির মধ্যে আকার প্রকার ও ঐশ্বর্য্যের কত তারতম্য, নিম্নে উল্লিখিত তালিকা থেকেই সে সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে, মিঃ কে এম পানিকর তাঁর লিখিত 'দেশীয় রাজ্য' নামক গ্রন্থে (ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস) দেশীয় রাজ্যগুলির মর্য্যাদাগত তিনটি শ্রেণী বিভাগ করেছেন।

রাজ্যের সংখ্যা	রাজ্যের আয়তন বর্গমাইল	রাজ্যের জনসংখ্যা
১৩৫	৫,৭২,৯৯৭	৭,৫১০,৩৪৪৯

* যিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল তিনিই দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে 'সম্রাটের প্রতিনিধি' হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। যেহেতু দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন নয় সেহেতু ভারতের গবর্ণর জেনারেল আনুষ্ঠানিকভাবে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে কোন নির্দ্দেশ পাঠাতে পারেন না। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্রাটের অধীন সুতরাং সম্রাটের প্রতিনিধিই এক্ষেত্রে একমাত্র নির্দ্দেশদাতা।

(১) সত্যিকারের রাজ্য বা ষ্টেটস রাজারা 'শাসক' (রুলার) আখ্যাপ্রাপ্ত এবং মর্য্যাদা বলে নরেন্দ্র মণ্ডলের সদস্য—

(২) কতকগুলি এষ্টেট্স যার ভূস্বামীবর্গ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সরকারী সংখ্যা অনুসারে 'প্রধান' (চীফ্) আখ্যাপ্রাপ্ত, এঁদের শুধু নরেন্দ্র মণ্ডলে নির্ব্বাচিত হবার যোগ্যতা আছে—

	১০৮	২০,৫৭৪,	২৫,১৯,৯৮৯
(৩)	ক্ষুদ্র	তালুক	জায়গীর
	৩১৯	৪,৫৬৭	১৩,৬৭,৫২১
মোট	৫৬২	৫,৯৮,১৩৮	৭,৮৯,৯৬,৮৫৪

দেখা যাচ্ছে যে, দেশীয় রাজ্য নামে এতগুলি রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত অত্যন্ত মর্য্যাদা ভেদ রয়েছে। এমন কয়েকশত রাজ্য রয়েছে যেগুলি 'রাজ্য' নামেরই যোগ্য নয়, বড় বড় ২০টি রাজ্য নিয়েই আয়তন হয়ে ওঠে ৩,৯৬,২৯১ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫,৫৫,০৯,৬৭৫—এই কয়েকটি যথার্থ 'দেশীয়রাজ্য' আখ্যা পেতে পারে। সমস্ত দেশীয় রাজ্যের (৫৬২টি রাজ্যের) রাজস্বের পরিমাণ হয়ে ওঠে ৪৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে বড় বড় ২৩টি রাজ্যের রাজস্ব হলো ৩৫ কোটির ওপর। সুতরাং বাকী ৫৩৯টি রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০ কোটির কম।*[১]

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ রাজ্যই আয়তনে ক্ষুদ্র। কি রকমের ক্ষুদ্র? একটু তুলনা করলেই এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সম্ভব হতে পারে। হায়দরাবাদ রাজ্য একটি বিশিষ্ট দেশীয় রাজ্য এবং জনসংখ্যা হলো ১ কোটি ৪০ লক্ষ। বিলবারী নামক রাজ্যটিও দেশীয় রাজ্য এবং জনসংখ্যা হলো ২৭ এবং বাৎসরিক রাজস্ব হলো ৮০ টাকা।

কাথিয়াবার রাজ্যগুলির মোট সংখ্যা হলো ২৮৩, এর মধ্যে ৯টি সত্যিকারের পদস্থ রাজ্য আছে— ভবনগর, কচ্ছ, ধরংগধরা, গোণ্ডাল, ইডার, জুনাগর, মোরভি, নবনগর, ও পোরবন্দর। এই কয়টি বিশিষ্ট রাজ্য বাদ দিলে কাথিয়াবাড় রাজস্ববর্গের মধ্যে থাকে মোট ২৭৪টি রাজ্য, কর রাজস্ব হলো ১৩৫ লক্ষ টাকা মাত্র। কল্পনাতেও কোন ধারণা করা সম্ভব নয়, কি করে ১৩৫ লক্ষ টাকায় ২৭৪টি রাজ্যের রাজ পরিবারের ও রাজ্য পরিচালনার খরচ সঙ্কুলান হতে পারে? অকল্পনীয় হলেও ব্যাপারটা বস্তুতঃ সত্য।

ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যগুলির আকৃতি ও আয়তন কি রকমের কাথিয়াবাড় রাজ্যগুলি তার দৃষ্টান্ত। এই ২৮৩ রাজ্যের মোট আয়তন হলো ৩২ হাজার বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ অঙ্ক করে হিসাব করলে মোটামুটি ২৫ বর্গমাইল ভূমি ও ৫শত লোক নিয়ে এক একটি রাজ্য। আর বাস্তবক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ১৭৮টি রাজ্য আছে, যার আয়তন ১০-১০০ বর্গমাইল। তা ছাড়া ২০২টি রাজ্যের আয়তন হলো ১০ বর্গমাইলের কম। এর মধ্যে ১৩৯টি রাজ্যের আয়তন ৫ বর্গমাইলেরও কম, ৭০টি রাজ্যের আয়তন হলো ১ বর্গমাইলেরও কম।

---

*১ মি. কে. এম. পানিক্কর উল্লিখিত হিসাব ও তালিকা রচনা করেছেন। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের শেষ লিপিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী হিসাবের একটু পার্থক্য দেখা যায়। ভারত গভর্ণমেণ্টের বিবরণ অনুযায়ী (মেমোরেণ্ডাম অব ইণ্ডিয়ান ষ্টেটস) সবশুদ্ধ ৬০১টি দেশীয় রাজ্য আছে। এই দেশীয় রাজ্যের আয়তন সমগ্র ভারতের আয়তনের পাঁচভাগের দু'ভাগ এবং জনসংখ্যা হলো ৮১,৩১০,৮৮৫—এটা ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর হিসাব। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী অনুসারে দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যা হলো ৯,২৯,৭৩, ০০০- ৯ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৩ হাজার।

১৯৩৫ সালের ভারত গভর্ণমেন্টের আইনে দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে যে সংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেটা বিশেষ লক্ষ্য করার মতো। বলা হয়েছে "ভারতের সেইসব অঞ্চলকেই দেশীয় রাজ্য বলে মনে করা হয় যা ব্রিটিশ ভারতের অংশ নয় এবং যাকে মহামান্য সম্রাট এই ধরণের একটা 'রাজ্য' বলে স্বীকার করেন, অঞ্চলগুলি রাজ্য এষ্টেট, জায়গীর বা অন্য যে কোন নামেই অভিহিত থাকুক না কেন।"

দেখা যাচ্ছে যে শুধু 'মহামান্য সম্রাটের স্বীকৃতি' ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক মর্য্যাদার আর কোন ভিত্তি নেই। আইনতঃ ছোট বড় সব রাজ্যেরই আয়ু এবং অস্তিত্ব মহামান্য সম্রাটের স্বীকৃতির নথিপত্রে নীরবিন্দুবৎ লেগে রয়েছে। সম্রাট স্বীকার না করলে যে কোন দেশীয় রাজ্য ধুলো হয়ে যাবে, সম্রাট স্বীকার করলে যে কোন ক্ষুদ্রক্ষুদ্রাতি তালুক বা জায়গীরের ধুলো 'রাজ্য' হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর জন্যে দেশীয় রাজারা মোটেই চিন্তিত, লজ্জিত বা দুঃখিত নন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহ দিয়েই যে তাঁদের ঐতিহাসিক সত্তাটি তৈরী, সে সত্য তারা ভুলতে পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস, এ অনুগ্রহের নড়চড় হবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টেরও বহু ঘোষণায় তাদের বরাবর এই একই আশ্বাস দিয়ে এসেছেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট দেশীয় রাজ্যগুলিকে ঘরে বাইরের আক্রমণ থেকে অথবা লুপ্তির আশঙ্কা থেকে রক্ষা করবেন। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে ব্রিটিশের (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) সম্পর্ক কতগুলি সন্ধি (ট্রিটি) অথবা ফরমান (এনগেজমেণ্ট) কিংবা সনদ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছিল। এইসব সন্ধি, ফরমান ও সনদে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যেসব অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেগুলিই দেশীয় রাজ্যের জীবনকাঠি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সম্রাটের হাতে ভারতের রাষ্ট্রীয় শাসন বদলি হবার সময় (১৮৫৮) মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিলো :

এইসব সন্ধিগুলি আমাদের দ্বারা গৃহীত হলো এবং ভবিষ্যতে নিষ্ঠার সঙ্গে এগুলি অক্ষুণ্ণ রাখাও হবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শক্তির আশ্বাসে লালিত ৬০১টি গদি এবং দরবার, দেশীয় ভারত নামে একটি বিরাট সামন্ততন্ত্র ভারতের প্রায় ৯ কোটি প্রজার ভাগ্যবিধান করে চলেছে। দেশীয় রাজ্যের ইতিহাস বলতে গেলে ভাবতে বিগত দু'শত বৎসর ব্যাপী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস। নামধাম ও রাজবংশ বিচার করলে এই দেশীয় রাজ্যগুলি সকলেই সমবয়সী নয়, অনেকে অতি প্রাচীন এবং অনেকে নিতান্ত অর্বাচীন। ভারতের ইতিহাসের বিভিন্নকালে ও অধ্যায়ে এদের আবির্ভাব।

বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক কুলপঞ্জী বিচার করলে দেখা যায় এর মধ্যে আছে—

(ক) কতগুলি হিন্দুস্থানের রাজ্য।

(খ) কতগুলি মোগল-পাঠানের যুগের রাজ্য।

(গ) কতগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগের রাজ্য।

(ঘ) একটি মাত্র খাস সম্রাট শাসিত যুগের রাজ্য—বেনারস।

এতগুলি বিভিন্ন যুগের সামন্তরাজ্য ব্রিটিশ অনুগ্রহে আজও রয়েছে। এর মানে এ নয় যে, এসব রাজ্য খাঁটি হিন্দু সামন্ততন্ত্র অথবা মোগলাই সামন্ততন্ত্রের আদর্শ অনুসারে চলছে।

রাজ্যগুলির কুলগোত্র ও বয়স যাই হোক, বর্তমানে সবাইকে একটি নতুন আদর্শে দীক্ষিত হতে হয়েছে—ইংরাজী সামন্ততন্ত্র। এই সামন্ততন্ত্র যেমন অদ্ভুত তেমনি অভিনব, এর নজীর নেই। বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এই দেশীয় রাজ্যগুলি সমস্যা হিসাবেও বিদঘুটে। এরা কেন আছে, পৃথিবীর কোন্ উপকার করেছে—এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কোম্পানীর আমলের ইংরেজ সেনাপতিদের রাজ্য প্রসারের সাধনায় কতগুলি তাঁবেদার মিত্রপক্ষ ও পঞ্চমবাহিনী তৈরী করার প্রয়োজনে যে ৬০১টি কূটনৈতিক নীড় তৈরী করা হয়েছিল তারাই আজ দেশীয় রাজ্য নামে আখ্যাত। ব্রিটিশের সামরিক প্রয়োজনে এদের তৈরী করা হয়েছিল। ব্রিটিশের ভারত অধিকার কবেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আজ আর ভারত জয়ে সামরিক প্রয়োজন বলে কিছু নেই। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলি রয়ে গেছে। ভারত শাসনের জন্য দেশীয় রাজ্য নামে কিছু থাকবার কোন প্রয়োজন ছিলো না। যারা নিতান্ত যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল, শান্তিকালীন অবস্থায় তাদের কোন সার্থকতায় থাকবার কথা নয়। কিন্তু ব্রিটিশের অনুগ্রহে তবু তারা রয়েছে এবং এটাই সমস্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা প্রচণ্ড জটিলতা সৃষ্টি করে রেখেছে। নিষ্প্রয়োজনে একটা অতীতের ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখেছেন। সাইমন কমিশনও দেশীয় রাজ্যগুলিকে একটা জটিল সমস্যা বলে মনে করেছিলেন—'যার কোন নজীর বা তুলনা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

দুই

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

ভারতভূমির মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক সংস্থানের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

ভারতের মানচিত্রের উত্তর-পূর্বে লক্ষ্য করা যাক্, ভৌগোলিক বাংলার মধ্যেই এখানে তিনটি রাজ্য দেখা যাচ্ছে—কোচবিহার, সিকিম ও ত্রিপুরা, আর দেখা যাচ্ছে ভৌগোলিক আসামের মধ্যে মণিপুর।

পূর্ব ভারতের দক্ষিণ অঞ্চলে একটু পশ্চিম দিকে সরে আসা যাক, গড়জাত এলাকায় অরণ্যময় মূর্তি চোখে পড়ে। এখানে পরস্পর সংলগ্ন একগুচ্ছ দেশীয় রাজ্য রয়েছে, ব্রিটিশ-ভারতের তিনটি প্রদেশকে এই রাজ্যগুলি যেন মাঝখানে পড়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। মধ্যপ্রদেশ উড়িষ্যা ও বিহার এই তিন প্রদেশের, এক একটা প্রান্ত এই রাজ্যাকীর্ণ অঞ্চল স্পর্শ করে রয়েছে।

আরও দক্ষিণে সত্যিকারের দাক্ষিণাত্য যেখানে আরম্ভ, সেখানে পড়ে রয়েছে সুবিস্তৃত হায়দরাবাদ। এর উভয় প্রান্ত প্রায় পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলভাগ পর্যন্ত প্রসারিত। হায়দরাবাদ দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সীমারেখা স্পর্শ করে প্রায় পর্তুগীজ গোয়ার কাছাকাছি পৌঁছেছে। দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোকোনাড়ার প্রায় গায়ের উপর চলে এসেছে।

হায়দরাবাদের দক্ষিণে মহীশূর রাজ্য, মাঝখানে মাত্র মাদ্রাজের বেলারি জেলা উভয় রাজ্যের মধ্যে একটা ব্যবধান রেখেছে। এরও দক্ষিণে কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুর সিন্ধুধৌত বিস্তীর্ণ উপকূল যার একদিকের সীমারেখা রচনা করে রেখেছে। নিকটেই আছে ক্ষুদ্র রাজ্য পুদুকোটাই, চারদিকে কয়েকটি মাদ্রাজী জিলার দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ভারতের পশ্চিম উপকূল রেখা ধরে উত্তরে অগ্রসর হওয়া যাক। এই পথেও অনেকগুলি রাজ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কয়েকটি হলো উপকূলসংলগ্ন এবং অধিকাংশে স্থলভাগের অভ্যন্তরে সবই মারাঠা যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্নে। এর মধ্যে বৃহত্তম হল কোলহাপুর। ছেঁড়া মালার মত এই দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান ঠিক পরস্পর সংলগ্ন নয়। কিছুটা ব্রিটিশ-ভারত, তারপরেই আবার একটা দেশীয় রাজ্য। এইভাবে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির একেবারে উত্তরে এসে পাওয়া যায় বরোদা রাজ্য। এর আর একটু উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে গেলেই আরব সমুদ্র সংলগ্ন উপদ্বীপকার কাথিয়াবাড় রাজ্যাবলী যার সঙ্গে একটি দেশীয় দ্বীপরাজ্যও আছে—কচ্ছ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর পূর্ব্ব রাজ্যে প্রধান মধ্য ভারত এজেন্সি গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রেওয়া প্রভৃতি। এই দেশীয় রাজ্যগুলি সকলে মিলে বোম্বাই প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশকে সংযুক্ত প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বোম্বাই প্রদেশ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম প্রান্ত এবং পাঞ্জাবের দক্ষিণ প্রান্ত উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে রয়েছে মরুপ্রধান রাজপুতানার রাজ্যসমূহ—বিকানীর, যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর ও জয়শলমীর প্রভৃতি।

যুক্ত প্রদেশের মধ্যে তিনটি দেশীয় রাজ্য বিক্ষিপ্তভাবে যেন একা একা পড়ে আছে—রামপুর, বেনারস ও টেহরি গাড়োয়াল।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে শুধু ভৌগলিক পাঞ্জাবের মধ্যে কতগুলি বিশিষ্ট শিখরাজ্য দেখা যায়—পাতিয়ালা, নাভা ইত্যাদি। তাছাড়া আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। হিমালয়ের সানুপ্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য নীড়ের মতও কতগুলি রাজ্য দেখা যায়।

ভারতের উত্তরে সুবিস্তৃত কাশ্মীর রাজ্য দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে আয়তনে বৃহত্তম—৮৯ হাজার বর্গমাইল। কাশ্মীরের একদিকে তুষারাবৃত পামীর, অপরদিকে তিব্বত। উত্তরে মধ্য এশিয়ার অধিত্যকা ও দক্ষিণে ভারতভূমি—তারই মাঝখানে কাশ্মীর তার ভূস্বর্গ রূপ নিয়ে অবস্থিত। কিছুটা রুশ সীমান্তও কাশ্মীরের গা ঘেঁষে চলে গেছে।

পাঞ্জাবের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল ধরে একধারে সিন্ধু প্রদেশের সীমান্তের কাছাকাছি নেমে আসলে বাহাওয়ালপুর রাজ্য—পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সঙ্গে দুই প্রান্তে সংযুক্ত। সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে একটি দেশীয় রাজ্য খৈরপুর, যার সীমার একটা দিক রাজপুতানার দেশীয় রাজ্য অঞ্চলের সংগে সংযুক্ত।

ভারতভূমির সর্ব্বত্র হরিলুটের বাতাসার মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান দেখে অনেকগুলি প্রশ্ন ও সন্দেহ মনে জাগে। দেশীয় রাজ্যগুলি যে এইভাবে অসংবদ্ধ ও অবিন্যস্তভাবে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, এটা কি একটা আকস্মিক ঘটনাগত পরিণাম মাত্র? অথবা এর পেছনে কারও একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার উদ্যোগপ্রবণ হাত আড়ালে আড়ালে কাজ করেছে?

সমস্ত ঘটনাটার বিশ্লেষণ করলে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির ভৌগোলিক অবস্থানের রূপ বিশ্লেষণ করলে একটা তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। ব্রিটিশ শক্তি ঠিক কতগুলি দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি করবার জন্যই কোন পরিকল্পনা করেছিল, একথা না বলে অন্যভাবে বলা যায় ব্রিটিশশক্তি ভারতবর্ষে তার প্রতিপত্তি দৃঢ়মূল করার জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখলের পরিকল্পনা করেই অগ্রসর হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিই হল বর্তমান ব্রিটিশ-ভারত বা প্রদেশগুলি। এই গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলি দখলে করবার জন্য ভারতের সর্ব্বপ্রান্তে ব্রিটিশের সামরিক

অভিযান উদ্দামভাবে ছোটাছুটি করেছে। এই অভিযানের পথে কূটনৈতিক সহায় হিসাবে, পঞ্চম বাহিনী হিসাবে, উৎকোচপুষ্ট বন্ধু হিসাবে, মিত্র পক্ষ হিসাবে যাদের পাওয়া গেছে, ব্রিটিশ শক্তি যেন দয়া করে তাদের অর্দ্ধগ্রাস করেছে। এই অর্দ্ধগ্রাসভুক্ত অঞ্চলগুলিই দেশীয় রাজ্য, ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক অনুকম্পার এক একটি পকেট। অন্যভাবে বলা যায়, ব্রিটিশের প্রতি ভারতীয় দাসত্বের এক একটি ঐতিহাসিক পকেট।

দেশীয় রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য থেকে আরও কতগুলি বিশিষ্ট তাৎপর্য্য ধরা পড়ে।

(১) রাজ্যগুলি যেন তাঁবেদার (বাফার) রাজ্যের মত ব্রিটিশ-ভারত অর্থাৎ প্রদেশগুলিকে নানাভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

(২) রাজ্যগুলি নিজেরাই পরস্পর থেকে এত বিচ্ছিন্ন যে, তাদের নিজেদের মধ্যে সত্যিকারের একটা রাষ্ট্রিক ঐক্য অথবা আঞ্চলিক সংহতি সৃষ্টি করা অসম্ভব।

(৩) রাজ্যগুলির অধিকাংশই স্থলবেষ্টিত, সীমাসংলগ্ন সমুদ্রোপকূলের (সী বোর্ড) ঐশ্বর্য্য নেই। এ বিষয়ে কোচিন ত্রিবাঙ্কুর ও কাথিয়াবাড় (কচ্ছ সহ) রাজ্যগুলিই একমাত্র ব্যতিক্রম। রাজ্যগুলি যেমন অনেক ব্রিটিশ প্রদেশকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, তেমনি অধিকাংশ রাজ্য আবার ব্রিটিশ প্রদেশগুলি দ্বারা বেষ্টিত।

দেশীয় রাজ্যগুলির এই তৃতীয় ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যটি নিতান্ত আকস্মিক ব্যাপার নয়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারণের নীতিটা যা ছিল তার ফলেই এই ব্যাপার হয়েছে। কয়েকটি বন্দর এবং গঙ্গা ও সিন্ধুর উর্ব্বর উপত্যকা অঞ্চল—মাত্র এই অংশকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারে এনেই প্রথম প্রথম সন্তুষ্ট ছিল। এছাড়া ব্রিটিশশক্তি তার ষ্ট্রাটেজিক সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য মাত্র ভারতের সমগ্র সমুদ্রোপকূল ভাগ দখল করে নেয়। ভারতের এইসব অঞ্চল ছাড়া আর সব অঞ্চল পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক অধিকার কায়েম করার জন্য ব্রিটিশশক্তি খুব বেশী উৎসাহী ছিলেন না, কারণ গঙ্গা সিন্ধুর উপত্যকা ও উপকূল ভাগ করায়ত্ত থাকলে বস্তুতঃ সমগ্র ভারতেরই অদৃষ্ট করায়ত্ত রাখা হলো। এই কারণেই দেখতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই হলো উপকূলভাগ এবং গঙ্গা-সিন্ধুর উপত্যকার বাইরে।

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলি সাধারণতঃ অনুর্ব্বর, গিরিপ্রধান অঞ্চল। ব্রিটিশের এই ভৌগোলিক ষ্ট্রাটেজিক নীতির একটু ব্যতিক্রম হয়েছিল ডালহৌসির শাসনকালে। তিনি তার উদ্ভাবিত 'তামাদি নীতি' প্রয়োগ করে অযোধ্যা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য খাস করে নিয়েছিলেন।

তিন

ঐতিহাসিক কুলপঞ্জী

দেশীয় রাজ্যগুলির অনেকে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের এক একটি সাক্ষ্য। তবে সাক্ষ্যই মাত্র, বলতে পারা যায় প্রতীকগত এক একটা নিদর্শন, কোন ঐতিহাসিক সজীবতা এদের মধ্যে আজ আর নেই। বর্ত্তমানে সকলেই ব্রিটিশের অনুকম্পাশ্রিত রাজ্য মাত্র।

কিন্তু এদের অতীতের দিকে তাকালে ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা নিতান্ত গৌরবহীন নয়। অতীতে এক একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এদের অনেকের

আবির্ভাব। সব দেশীয় রাজ্যে ঐতিহাসিক অতীত একই রকম নয়। সে দিক দিয়ে এদের মধ্যে লঘু-গুরু তারতম্য আছে।

হিন্দুযুগ

প্রাচীনতার দিক থেকে দেখতে গেলে বাঙ্গলার উত্তরে কোচবিহার রাজ্যের দিকে তাকাতে হয়। কোচবিহার দাবী করে মহাভারতের কাল থেকেই, অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় থেকেই এই রাজ্য ও রাজবংশ চলে আসছে। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং (সপ্তম শতক) তাঁর লিখিত বৃত্তান্তে কোচবিহার রাজ্যের ও রাজার উল্লেখ করেছেন।

কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরও প্রাচীন হিন্দু রাজ্য। এই রাজ্যের বর্ত্তমান নৃপতি চের রাজবংশের সন্তান বলে দাবী করেন। ভাস্কো-ডা-গামা ভারতে এসে কোচিন রাজ্যের বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করেছিলেন। ব্রিটিশেরা ভারতে আসবার পর প্রথম যার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন (Treaty) করেন, তিনি হলেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংগে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সেই সন্ধি বস্তুতঃ দুই স্বাধীনের সন্ধি ; পরবর্ত্তী সন্ধিগুলির মত একপক্ষের নির্দ্দেশ প্রধান চুক্তি নয়। ভারতে আগত প্রাচীন আরব পর্যটকেরা কচ্ছ রাজ্যের বিবরণ লিখে গেছেন।

বর্ত্তমান রাজপুতনার দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অনেকে প্রাচীন হিন্দুযুগের রাজত্বের নিদর্শন ; মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রতিরোধ বলে যতটুকু ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল তাব অধিকাংশই রাজপুত রাজ্যের কীর্ত্তি। মেবারের (উদয়পুর) রাণা সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, রাজা রামচন্দ্রের সমগোত্র, রাণাদের কাহিনী দেশপ্রেমের ও হিন্দু বীরত্বের উদাহরণ-রূপে আজও কীর্ত্তিত রয়েছে।

বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যও প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগরেরই একটি সামন্ত রাজ্য ছিল মহীশূব। এই রাজত্বের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাসের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গেছে—হায়দার আলির রাজত্ব। মহীশূরের হিন্দু রাজাকে পরাভূত করে হায়দার আলি মহীশূরে তাঁর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমরশক্তি আবার হায়দার আলিকে (ও টিপু সুলতানকে) পরাভূত করে মহীশূরের গদীতে প্রাচীন হিন্দু রাজবংশধরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্রিটিশ কর্ত্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এই হিন্দু রাজাই বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের পূর্ব্বপুরুষ।

পাঠান ও মোগলযুগ

ভারতে পাঠান অভিযানই প্রথম হিন্দুর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে। পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন কতকগুলি পাঠান সামন্ত রাজ্যেরও আবির্ভাব হয়। পাঠানযুগে উদ্ভূত সেই সব রাজ্যের কেউ কেউ এখনো আছে। পালানপুর রাজ্য একটা উদাহরণ। ভারতের মুসলিম দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পালানপুরেরই ঐতিহাসিক প্রাচীনতা সব চেয়ে বেশী।

মোগল যুগে অনেকগুলি হিন্দু ও মুসলমান রাজ্যের উদ্ভব হয়। বর্ত্তমান রাজপুতানার কতগুলি হিন্দু রাজ্য মেবার ইত্যাদির মত প্রাচীন নয়, সেগুলি মোগলযুগে উদ্ভূত। মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ ও শাসন কর্ম্মচারী ছিলেন আসফ জা, জনৈক

তুরানীয় (Turkman), তিনিই হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ভাওয়ালপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন আওরঙ্গজেবের একজন আফগান শাসন কর্ম্মচারী—দোস্ত মহম্মদ।

মারাঠা অভ্যুত্থানের যুগ

মোগল সাম্রাজ্যিক শক্তির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে মারাঠা রাজশক্তির ক্রমোন্নত প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, মারাঠা রাজশক্তির অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হতে থাকে, মহারাজ শিবাজী যে নতুন হিন্দু রাজশক্তির পত্তন করে যান, পরবর্ত্তীকালে সেই রাজশক্তিই পেশোয়াদের পরিচালনায় 'হিন্দু পদ পাদশাহী' আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতে শ্রেষ্ঠ রাজশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মারাঠা রাজসঙ্ঘের (মারাঠা কনফেডারেশন) রাজপ্রসারী অভিযানের সম্মুখে মুসলমান রাজ্য ও রাজশক্তিগুলি একে একে অবসন্ন হতে থাকে। মোগল বাদশাহও মারাঠার পেন্সনভোগী হয়ে দিল্লী দুর্গে স্থবিরভাবে কালযাপন করতে থাকেন। সেই বিখ্যাত মারাঠা রাজসঙ্ঘের বিশিষ্ট রাজ্যগুলি হলো সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র, গায়কোয়াড়ের বরোদা, হোলকারের ইন্দোর প্রভৃতি। বর্ত্তমান বরোদা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য হলো সেই সব রাজ্যেরই নিদর্শন। ভোঁসলের নাগপুর এবং পেশোয়ার সাতারাকে ডালহৌসি অনেকদিন আগেই ব্রিটিশের খাস করে নিয়েছেন, নইলে, ঐ দুই রাজ্য দু'টিকেও আজ দেশীয় রাজ্যরূপে দেখা যেত।

মারাঠার অভ্যুত্থান এবং মোগলের অধঃপতনের অধ্যায়ে ভারতের বাইরে থেকে দুটি আক্রমণকারীর অভিযান হয়—একটি হলো পারস্যদেশীয় নাদির শাহের অভিযান (১৭৩৯) অপরটি হলো দুরাণী বংশীয় আফগান আহমদ শাহের অভিযান (১৭৪৮)। নাদির শাহের অভিযানে লুণ্ঠনতাই প্রধান বিষয় ছিল। তিনি এলেন, লুট করলেন, আর চলে গেলেন, ভারত রাষ্ট্র ও রাজনীতিতে কোন স্থায়ী চিহ্ন রেখে যান নি। দুরাণী আফগান আহমদ শা'র অভিযানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র পাঞ্জাবে আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা হয় এবং পাণিপথে (১৭৬১) মারাঠার সঙ্গে তাঁকে শক্তি পরীক্ষাও করতে হয়। তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে মারাঠা রাজশক্তি জয়লাভ করেনি সত্যি, কিন্তু বিজয়ীরূপে কথিত আফগান আহমদ শা'ও তাঁর যুদ্ধে জয়ের কীর্ত্তিকে স্থায়ী রাজনৈতিক কীর্ত্তিতে পরিণত করতে পারেন নি। যুদ্ধজয়ী আহমদ শা, উত্তর ভারতে রাজনৈতিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি, বরং অভ্যুত্থিত শিখশক্তি অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাব থেকে আফগান শাসনকে উৎখাত করে শিখ-শাসন প্রতিষ্ঠা করে। উল্লিখিত অল্পকালীন আফগান আধিপত্যের সময় আফগান সামন্তাধীন কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পাঞ্জাবে এবং যুক্তপ্রদেশের পশ্চিমে উদ্ভূত হয়েছিল। পাঞ্জাবের সেইসব আফগান সামন্তরাজ্যের কোন চিহ্ন আজ আর নেই। যুক্তপ্রদেশের রামপুর রাজ্য একটি উদাহরণরূপে রয়ে গেছে। জনৈক রোহিলা আফগান সামন্তর প্রতিষ্ঠাতা।

শিখ রাজ্য

মোগল সাম্রাজ্যিক শক্তির প্রতিষ্ঠা দুর্ব্বল হতে আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবে শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক উৎসাহ প্রবল হতে থাকে। কতকগুলি শিখ সামন্ত রাজ্যের আবির্ভাব হয়

এবং মোগল সম্রাটদেরও ফরমান দিয়ে তাদের স্বীকার করে নিতে থাকে। এইসব শিখ সামন্ত রাজ্যগুলিই পরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে পাঞ্জাব থেকে মোগল রাজশক্তির শেষ অস্তিত্বকে উচ্ছেদ করে এবং তারপর আফগান শক্তিকে পরাভূত করে। সেইসব শিখ রাজসঙ্ঘের (শিখ কনফেডারেন) নির্দেশরূপে কতকগুলি রাজ্য রয়েছে—পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, কপুরতলা, ফরিদকোট ইত্যাদি।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এসে রাজ্য বিস্তারের প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি নতুন দেশীয় রাজ্যের পত্তন করে। কোম্পানীর শাসনকে শেষ দিকে যখন পাকাপাকিভাবে রাজনৈতিক রূপ দেবার সময় আসে, তখনও কোম্পানী নিজের সুবিধা বুঝে কতকগুলি অঞ্চলকে দেশীয় রাজ্যরূপে মর্যাদা দান করে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো কাশ্মীর। মহারাজা গুলাব সিং কোম্পানীর কাছ থেকে কাশ্মীর ক্রয় করেন। গুলাব সিং পূর্ব্বে মহারাজা রণজিৎ সিং-এর সামন্ত হিসাবে জম্মুর 'রাজা' ছিলেন। কোম্পানীই তাঁকে একেবারে 'মহারাজা' করে দেন।

খাস পার্লামেণ্টী শাসনের যুগ

১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে সমগ্র ভারত শাসনের দায়িত্ব সম্রাটের তথা খাস পার্লামেণ্টীয় অধিকারে বদ্‌লি করা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যতগুলি দেশীয় রাজ্যকে স্বীকার করেছিল, সম্রাটের গভর্ণমেণ্টও তাদের স্বীকার করে নেয়। দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াও এই সংগে সমাপ্ত হয়। সম্রাটের শাসনকালে একটি মাত্র দেশীয় রাজ্য তৈরী করা হয়েছে—বেনারস (রামনগর)।

সংক্ষেপে এই হলো দেশীয় রাজ্যগুলির ঐতিহাসিক কুলপঞ্জী। কেউ বয়সে অতি প্রাচীন ও কেউ অতি অর্ব্বাচীন, কেউ আকারে অতি বৃহৎ ও কেউ একেবারে ক্ষুদ্র, কেউ সম্পদে অতিরিক্ত ও কেউ একেবারে রিক্ত—সব রকমেরই দেশীয় রাজ্য আছে। নামে তালপুকুর অথচ ঘটি ডোবে না—এই ধরণের রাজ্যের সংখ্যাই বেশী।

আজ সবাই ব্রিটিশের সামন্তরাজ্য ; কিন্তু অতীত ইতিহাসের যেটুকু বিবৃত করা হলো, তাতে দেখা যায় যে, এর মধ্যে কোন কোন রাজ্য তার প্রথম জীবনে প্রায় একটা সাম্রাজ্যোচিত মর্য্যাদা অর্জন করেছিল। তার বর্ত্তমান রূপ অতীত মর্য্যাদার একটা বামনতারূপ মাত্র। কোন কোন রাজ্য অতীতে হয়ত একটা জাতীয় রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, যার অধীনে অনেকগুলি আঞ্চলিক সামন্ততন্ত্রও ছিল। আজ হয়তো সেই রাজ্যের নাম নিয়ে একটি দেশীয় রাজ্য আছে, কিন্তু তার রাষ্ট্রাশ্রিত সেই সামন্ততন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নেই। মহীরুহের পত্রপুষ্প ও শাখা প্রশাখা কেটে ছেঁটে শুধু এক টুকরো গুঁড়ি বা শিকড় রেখে দেওয়ার মত, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি জাতীয় রাষ্ট্রকে এইভাবে অতি হ্রস্ব আকারে এক একটা দেশীয় রাজ্যে পরিণত করেছেন। মারাঠা রাজ্যগুলির অতীত ও বর্ত্তমানরূপের এই পার্থক্য। কোন কোন রাজবংশের যথার্থ উত্তরাধিকারী হয়ত' ব্রিটিশের বিরাগভাজন হয়েছে তখনই তাকে উচ্ছেদ করে রাজবংশের কুটুম্বগোষ্ঠীর কাউকে ধরে এনে সেই গদিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনাও বিরল নয়। আবার কোন কোন রাজ্যের প্রকৃত

অধিকারীকে বঞ্চিত ক'রে, উৎসাহী ইংরেজ এক বিশ্বাসঘাতককে এনে গদিতে বসিয়ে দিয়েছে। অনেক রাজ্যের ভৌগোলিক সত্তা পাল্টে গেছে, রাজবংশের শোণিতও বদলে গেছে—কিন্তু নতুন ভূমি ও নতুন বংশের রাজা সত্ত্বেও রাজ্যের প্রাচীন নামটিকে অনর্থক আঁকড়ে ধরে রাখা হয়েছে। এটা বস্তুতঃ ঐতিহাসিক গৌরবকে তছরূপ করবার মত ব্যাপার।

কোনো কোনো রাজ্যকে ইংরেজ শক্তি বস্তুতঃ আনুষ্ঠানিকভাবে 'জয়' করেনি (দৃষ্টান্ত ত্রিবাঙ্কুর) এবং যার সঙ্গে মর্যাদাসম্পন্ন শক্তি হিসাবে সন্ধি করেছিল। লিখিতভাবে সেই সন্ধি আজও আছে, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এহেন স্বতন্ত্র রাজাও স্বাধীন ব্রিটিশের সামন্তরাজ্যে পরিণত হয়েছে।

দেশীয় রাজ্যের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই হলো বৈচিত্র্য। সুদূর অতীতের কিংবদন্তীর অস্পষ্ট জগৎ থেকে কেউ চলে আসছে, আভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রবিপ্লবে কারও অভ্যুত্থান, আগন্তুক বহিঃশত্রুর রণনির্দেশের প্রতিক্রিয়ায় কারও আবির্ভাব। গৃহযুদ্ধের প্রকোপ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হানাহানির সংঘাতে, ভাঙ্গাগড়ার এক ঘনবহুল অধ্যায়ে কারও জন্ম, কেউ বা কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অবসন্নতার দুর্ব্বল মুহূর্তে দু'হাতে গুছিয়ে নিয়ে রাজ্য পত্তন করে ফেলেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দানের প্রতি পুরস্কার কোনো ক্ষেত্রে উৎকোচ হিসাবে, কোনো আপোষের সূত্রে এবং কোথাও বা নিছক অর্থের বিনিময়ে সম্পত্তি বিক্রয় হিসাবে প্রভুশক্তি এক একটি দেশীয় রাজ্য সৃষ্টি বা পুনর্গঠন করেছেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির অতীত ইতিহাসে যত কিছুই গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে ব্রিটিশ সামন্তরাজ্যের এক নতুন ছাঁচে সবাই একভাবে ঢালা। পরস্পরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যগত পার্থক্য যাই থাকুক, রাজনৈতিক মর্যাদার প্রকারভেদ সামান্য। বরং এক্ষেত্রেই পরস্পরের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমধর্ম্মিতা আছে। সমধর্ম্মিতার সূত্রগুলি হল :—

(১) দেশীয় রাজ্যগুলি আইনতঃ 'ব্রিটিশ অঞ্চল'। দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও 'ব্রিটিশ প্রজা' নয়। তারা হল-'ব্রিটিশ রক্ষিত ব্যক্তি'।

(২) কোনো দেশীয় রাজ্যের পক্ষে বৈদেশিক সম্পর্ক (ফরেন রিলেশন্স) স্থাপনের ক্ষমতা নেই। বিদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কোনো অধিকার নেই। এই ক্ষমতা ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ নিজের খাস করে রেখেছেন।

(৩) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের নৃপতি তাঁর রাজ্যের শাসন ঘটিত আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যথেচ্ছ ক্ষমতার অধিকারী। কিছু শক্তির সংগে দেশীয় রাজ্যগুলির সন্ধি ও সনদ দ্বারা যেমন সর্তচুক্তি ও নির্দ্দেশ মেনে নিয়েছে, তার দ্বারা আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে দেশীয় নৃপতির যথেচ্ছ ক্ষমতার সীমা নির্দ্দিষ্ট শুধু সন্ধিগত এবং সনদগত নির্দ্দেশ ও সর্তগুলির দ্বারা নয়, এ ছাড়া

(৪) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত।

(৫) প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যকে লুপ্তির থেকে রক্ষা করতেও তাঁর অখণ্ডতা বজায় রাখতে (গ্যারাণ্টি সারভাইভাল এণ্ড ইনট্রিগ্রিটি) ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

(৬) দেশীয় রাজ্যের এলাকার মধ্যে কোনো ব্রিটিশ আইন প্রযোজ্য নয়।

(৭) ব্রিটিশ ভারতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইন সভাগুলির পক্ষে দেশীয় রাজ্যের

জন্য আইন প্রণয়নের কোনো ক্ষমতা নেই।

(৮) ব্রিটিশ ভারতের হাইকোর্ট বা চীফ্ কোর্টগুলির মধ্যে দেশীয় রাজ্যের কোনো মামলা বিচার করার অধিকার নেই।

ব্রিটিশ অধিরাজক শক্তির বিধানানুযায়ী সব দেশীয় রাজ্যগুলিকে এই রাজনৈতিক অনুশীলের দ্বারা এক মর্যাদার স্তরে দাঁড়াতে হয়েছে। এদিক্ দিয়ে তাদের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

কিন্তু আর এক দিকে দিয়ে বর্ত্তমান দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পর বৈসাদৃশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। যথা : আভ্যন্তরীণ শাসন প্রণালী। এমন দেশীয় রাজ্যও আছে ; যার পক্ষে একটি মাত্র পুলিশ অথবা একটি শিক্ষককে বেতন দিয়ে পোষণ করার ক্ষমতা নেই। অপরদিকে এমন দেশীয় রাজ্যও রয়েছে, যার সুগঠিত আধুনিক ফৌজ আছে, সুপ্রীম কোর্ট আছে, আধুনিক সভ্য শাসনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, সঙ্গতি ও উপকরণ সবই আছে।

বৈসাদৃশ্যের রকমটা নিম্নোদ্ধৃত হিসাব থেকেই কতকটা ধারণা করা যায়—

(ক) ৩০টি দেশীয় রাজ্য আছে, যেখানে আইনসভা কায়েম করা হয়েছে। এইসব আইনসভার কয়েকটির মধ্যে নির্ব্বাচিত সদস্যরাই সংখ্যাধিক এবং বাজেট বরাদ্দ সম্পর্কে তাঁদের ভোট দেবার ক্ষমতা আছে।

(খ) কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে 'উচ্চতম বিচারালয়' আছে, প্রত্যক্ষ শাসনকার্য্যের সংগে যার কোনো বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক নেই।

(গ) ৩৪টি দেশীয় রাজ্য আছে, যেখানে প্রত্যক্ষ শাসনকার্য্যের ব্যবস্থাকে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা থেকে পৃথক করা হয়েছে।

(ঘ) কতকগুলি দেশীয় রাজ্য আছে, যার প্রত্যক্ষ শাসনপ্রণালী ও বিচার ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যিনি শাসন কর্ম্মচারী, তিনি হয়তো একই সঙ্গে বিচারকের কাজ করে থাকেন।

উন্নত শাসনপ্রণালীর যে কয়েকটি ব্যবস্থাগত উদাহরণ উল্লেখ করা হলো তা অল্পসংখ্যক কয়েকটি রাজ্যেই প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু শাসন ব্যাপারে মাত্র এই ধরণের কিছু কিছু উন্নত প্রণালীর নিদর্শন আছে বলেই একথা মনে করবার কারণ নেই যে, এই সব দেশীয় রাজ্যে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত। আদৌ তা না। এইসব প্রগতিশীল দু'একটি দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে বড় জোর 'সীমাবদ্ধ স্বেচ্ছাতন্ত্র' বলা যেতে পারে। অধিকাংশ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা বস্তুতঃ পূর্ণ অটোক্রেসী বা স্বেচ্ছাতন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। এই অটোক্রেসী বা স্বেচ্ছাতন্ত্রের রূপ আবার সকল রাজ্যে একই রকমের নয়। কারণ, শিক্ষায়, শক্তিতে ও সংগতিতে সব দেশীয় রাজ্য সমান নয়। এমন রাজ্য আছে, যেখানে অটোক্রেসী বিশুদ্ধ লাঠিতন্ত্র রূপেই বিরাজিত, কারণ লাঠি ছাড়া রাজা মহাশয়ের আর কোনো সঙ্গতি নেই। আবার এমন সঙ্গতিসম্পন্ন রাজ্যও আছে, যেখানে সর্ব্বময় ক্ষমতার অধিকারী রূপে 'হিজ হাইনেস' তার শাসন পরিষদ বা উজীর সভার সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেও অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন। মূলতঃ উভয়ই অটোক্রেসী, রূপে ও রীতিতে যা' কিছু পার্থক্য বা বৈচিত্র।

পরস্পারের মধ্যে বৈসাদৃশ্যর আরও একটি দিক্ আছে। ব্রিটিশের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পর্ক 'সন্ধি' অথবা সনদ দ্বারা স্থিরীকৃত আছে। কিন্তু এইসব সন্ধি ও সনদের

সর্ত্ত—তাৎপর্য্য, নির্দ্দেশ, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই একই রকমের নয়। প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি ও সনদ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে করা হয়েছে। তথাকথিত সন্ধি নামক চুক্তিপত্রগুলি সবই যে বড়দরের ব্যাপার এবং সনদগুলি ছোট দরের ব্যাপার, তা নয়। এমন চুক্তিপত্রের দৃষ্টান্তও আছে, যেটা নামে সন্ধি হলেও, সর্ত্তের দিক দিয়ে অতি নিম্নমর্যাদার নির্দ্দেশে পরিপূর্ণ। অপরদিকে সনদ নামে চুক্তিপত্রটি শুনতে ছোটদরের জিনিষ বলে মনে হলেও এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে সনদের সর্ত্তগুলি বেশী উদার ও মর্যাদাপূর্ণ। অনেক ছোট ছোট রাজ্য সনদের জোরে এমন অধিকার পেয়েছে অনেক বড় রাজ্য 'সন্ধি' করেও ব্রিটিশের কাছে সে ধরণের অধিকার পায়নি এবং অনেকে বহু আবেদন নিবেদনের কাঠখড় খরচ ক'রে পরবর্ত্তীকালে ব্রিটিশের কাছ থেকে নতুন অনুগ্রহের দলিলের দ্বারা সেই অধিকার লাভ করেছে।

সাধারণভাবে বলা যায়, বড় রাজ্যগুলির সংগে ব্রিটিশের সম্পর্ক 'সন্ধি'র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ছোট রাজ্যগুলির সম্পর্ক সনদ ও ফরমান ইত্যাদির দ্বারা নির্দিষ্ট।

দেশীয় রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে আর একটি বৈসাদৃশ্য আছে। এটা সংস্কৃতিগত বৈসাদৃশ্য। ভাষা, সমাজ ও বংশ হিসাবে দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা বিভিন্ন। কেউ হিন্দু ক্ষত্রিয়, কেউ হিন্দু অন্ত্যজ, কেউ আদিবাসী, কেউ মোগল বংশোদ্ভব, কেউ পাঠান ও আফগান বংশের মানুষ। এ ছাড়া শিখবংশীয় নৃপতিও আছেন। এর স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবেই বিভিন্ন রাজ্যের শাসন ব্যাপারের মধ্যেই কিছু কিছু সমাজগত ঐতিহ্যের প্রভাব পড়েছে। নিজাম হায়দারবাদের শাসন ব্যবস্থায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য প্রথা ও প্রণালী গৃহীত হয়েছে, তেমনই রাজপুত ও মারাঠা রাজ্যগুলিতেও হয়েছে। হিন্দু রাজ্য মহীশূর-ত্রিবাঙ্কুরেরও তাই। কিন্তু প্রত্যেক শাসনতন্ত্রের মধ্যে কিছু কিছু নিজস্ব ঐতিহ্যগত রীতিনীতিও মিশে রয়েছে। কোথাও সাবেককালের মোগলাই রীতি, কোথাও ক্ষত্রিয় রাজপুত পদ্ধতি এবং কোথাও বা মহারাষ্ট্রীয় রীতি। এর ফলে প্রত্যেকের শাসনতন্ত্রের ইংরাজীয়ানার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের মত কিছু কিছু নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রাখা হয়েছে।

দেশীয় নৃপতিরা অনেকেই আধুনিকতাসম্পন্ন, বিলাতিয়ানাও অনেকের মধ্যে প্রবল। কিন্তু আচারে এবং আচরণে এই আধুনিকতার পেছন একটা মনের পরিচয় অনেক সময় কৌলিক আভিজাত্যের জন্য গর্ব্বিত, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের এবং 'ছোট জাতের রাজা'কে একটু ছোটভাবে দেখতেই তাঁদের ভাল লাগে। অনেকে যেন আবার তিনশ বছরের পুরানো ইতিহাসের সংস্কার অজ্ঞাতসারে স্মরণ করে দেখেছেন—অতীতে কার পূর্ব্বপুরুষ কবে কার পূর্ব্বপুরুষের শত্রুতা করেছে, বর্ত্তমান দেশীয় রাজাদের অনেকের মনে যেন সেই ঘা এখনও শুকায়নি। নৃপতিদের সম্মেলন এই সব প্রাচীন ক্ষোভের জের নিয়ে এখনও অনেকে পরস্পরের প্রতি একটি আড়ির ভাব দেখিয়ে রাখেন। অবশ্য এটা একটা ঢং মাত্র। সামন্তিক গর্ব্বের সেই প্রাচীন বনিয়াদ এখন আর নেই, সত্যি করে কোনো শত্রুতা ভাবও নেই। আভিজাতিক চালিয়াতি করাব একটা সাধ মাত্র।

সমাজবিপ্লবের সঙ্কেত

একটি অধ্যায় সারা হবার পর আর একটি অধ্যায়ের শুরু। প্রথম পঞ্চবার্ষিক প্রচেষ্টার ব্রত সমাপ্ত হতেই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক উদ্যমের এক একটি উন্নয়নী পরিকল্পনা যেন ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে বর্তমানের অঙ্গীকার। আপন ভাগ্য আপন হাতে গড়ে তুলবার জন্য জাতির মনের মানত ঐতিহাসিক নিয়তি বড় বেশী হিসেবী, তার দান প্রতিদান আর প্রসন্নতা বিশেষ কোন করুণার নীতি মেনে চলে না। জাতির ক্লান্তিকে ভুলেও ক্ষমা করে না ইতিহাস এবং ঐ ক্লান্ত, ঐ থেমে থাকাই বোধ হয় জাতির জীবনের সব চেয়ে বড় ভুল।

ভারতের এক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম সার্থকতা এই যে, এই পরিকল্পনা জাতির মনে ও আচরণে এগিয়ে চলার আবেগ সঞ্চারিত করেছে। ভারতের অতীত ইতিহাসে এইভাবে সমূহ ও সমষ্টিগত উন্নয়নের সাধনা এইরকম যত্নকৃত অধ্যবসায়ের রূপে কখনও দেখা দিয়েছিল কিনা জানি না।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মুহূর্তটিকে তাই ভারতের ভাগ্য বিধায়ক এক নূতন শক্তির প্রথম আবির্ভাবের লগ্ন বলে মনে করতে হয়।

এক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা জাতীয় জীবনে ক্লান্তি পরিহার করে এগিয়ে যাবার আহ্বান, লক্ষ্য নিরূপণের এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য নিজেরই চেষ্টার সুযোগ রচনা করা, সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা নয়।

সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা এক প্রকারের ভাগ্যবাদ ও স্থৈর্যের উপাসনা মাত্র। ইতিহাসে হয়তো সুযোগ নামে আকস্মিক সুঘটনার দানও মাঝে মাঝে এবং অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। সেই সুযোগের শুভত্ব আহরণ করে অনেক জাতি অনেক উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছে, ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়। কিন্তু সেই সঙ্গে ইতিহাস এই সত্যের শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সুযোগের অপেক্ষায় বসে থেকে এবং দৈবের অনুগ্রহে ধন্য হয়ে যাবার আশায় অনড় হয়ে পড়ে থেকে অনেক জাতি তার মরণ-অবসাদ নিজেই ডেকে এনেছে। তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার এই মহৎ গৌরব স্বীকার করতে হয় যে, এই প্রয়াসের অঙ্গীকার হলো নিজেরই ইচ্ছার আর চেষ্টার জোরে সুযোগ রচনার সাধনা। গীতা-রচয়িতা দার্শনিকের চিন্তায় এই সত্যের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। আত্মার জোরেই আত্মাকে টেনে তুলতে হয়। শিষ্য আনন্দের প্রতি ভগবান বুদ্ধের উপদেশ বলে—নিজেকেই নিজের প্রদীপ করে তোলো—আনন্দ।

পরিকল্পনার মধ্যে এই তত্ত্বেরই প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। সুযোগ আপনা থেকেই আসবে না, সুযোগকে ডেকে আনতে হবে। কাম্যকে কাছে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে যে বাউলের মন, সে চুপ করে বসে থাকতে পারে না, কবে তুমি আসবে বলে। মাঝ নদীতে তরী ভাসিয়ে সে এগিয়ে যায়।

বৈষয়িক সম্পদ, বৈভব ও শক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি সাধনের জন্য আয়োজন ও উদ্যমের এক একটি পঞ্চবার্ষিক অধ্যায় জাতির জীবনের শুধু বহিরঙ্গের রূপটুকু বদলে দেবে, এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য যথেষ্ট প্রতিশ্রুতি নয়। এবং যদি এইসব পরিকল্পনা শুধু বৈষয়িক সমৃদ্ধির সৃষ্টিতেই সার্থক হয়, তবে সেই সমৃদ্ধিকে জনজীবনের বিপ্লববাঞ্ছিত পরিণামের সৃষ্টি বলে মনে করবার যুক্তি পাওয়া যাবে না। শুধু সমৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধি, এ ধরণের নীতির কোন মহৎ

তাৎপর্য ও মর্যাদা নেই। এই নীতি বস্তুত জাতির শ্রমের ফসলকে শ্রেণী বিশেষের ভোগের সামগ্রী করে রাখবার এক কপট উদারনীতিবাদ। সামাজিক লক্ষ্য সম্মুখে না রেখে বৈষয়িক লক্ষ্য লাভ করবার আয়োজন যতই বিপুল ও বিরাট হোক না কেন, সে আয়োজনের কোন ঐতিহাসিক মহত্ত্ব থাকতে পারে না। সে আয়োজন চোরাবালির উপর স্থাপিত প্রাসাদের মত এক বিরাট ভঙ্গুরতার নিদর্শন মাত্র। কিসের জন্য সমৃদ্ধি? কার জন্য সমৃদ্ধি?

অপ্রিয় সত্য কথা চাপা না দিলে বলতে হয়, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সামাজিক লক্ষ্য প্রায় না থাকারই মত অতি অস্পষ্ট ভাবে সংজ্ঞাত ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সেই ভয়ঙ্কর অস্পষ্টতার ত্রুটি ও অমর্যাদা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি সামাজিক লক্ষ্য সম্মুখে রেখে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক প্রয়াসের রীতি-নীতি নির্ধারিত করা হয়েছে। কার জন্য এবং কিসের জন্য সমৃদ্ধি, এই প্রশ্নকে স্বীকার করে নিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় উন্নয়নের উদ্যমকে একটি সমাজনীতিক লক্ষ্যের প্রেরণাও দান করা হয়েছে।

অর্থনীতিক লক্ষ্যকে সামাজিক লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধের এই নীতি ঘোষণার মধ্যেই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া যায়। সুখের বিষয় সামাজিক লক্ষ্যের বিষয়গুলিও অনেকখানি স্পষ্টতার সঙ্গে ঘোষণার মধ্যেও পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতির আভাস পাওয়া যায়। উন্নয়নের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে কিনা, এবং কতখানি সফল হয়েছে, তার পরিমাণ নির্ণয় করবার মাপকাঠি কি হবে? শুধুই কি উৎপাদনের তথা উৎপাদিত সামগ্রীর ওজনের পরিমাণ? আশার কথা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনজীবনের সাধারণ মানের উন্নয়ন সাধন করাকেই উন্নতির তথা সমৃদ্ধির নির্ণায়ক মাপকাঠি বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। জীবিকা অর্জনের এবং কর্মের সংস্থান লাভ করবার সুযোগ বৃদ্ধি পেল কিনা, কত লক্ষ মানুষ কত বৎসরের মধ্যে বৃত্তি ও কর্মের সংস্থান লাভ করলো, এই হিসাবই হবে উন্নতির সার্থকতা নিরূপণের হিসাব। কর্মহীনের জন্য জীবিকা অর্জনের সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে কয়েক কোটি মানুষকে কাজে নিয়োগ করবার জন্য একটি লক্ষ্যও স্থিরীকৃত হয়েছে।

সেই সঙ্গে আছে, মাথাপিছু গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ দ্বিগুণিত করবার লক্ষ্য।

আর আছে, জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান উন্নয়নের লক্ষ্য। দ্বিতীয় লক্ষ্য, আর্থিক উপার্জনের বিপুল বৈষম্যের সঙ্কোচন সাধন। ঊর্ধ্বতম আর্থিক উপার্জনের মাত্রা ন্যূনতম উপার্জনের মাত্রার তুলনায় ত্রিশ গুণের বেশী হবে না, এই লক্ষ্য সমাজবাদী লক্ষ্য হিসাবে আদর্শোচিত না হলেও, আদর্শের সূচনা হিসাবে নেহাৎ নগণ্য নয় বলে মনে করা যায়। আশা করা যায় ঊর্ধ্বতম আর ন্যূনতম উপার্জনের মাত্রা বেঁধে দেবার নীতিকে দেশের সরকার খুব বেশী দিন দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না। এবং সেটা যদি অচিরে সম্ভব না হয়, তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাজবাদ লক্ষ্যের মধ্যে বিশেষ একটি অপূর্ণতা থেকে যাবে, এবং সমৃদ্ধির বিপ্লবাত্মক সার্থকতাও অনেকখানি খণ্ডিত হয়ে থাকবে।

সমাজের যারা এতদিন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে অযোগ্যতায় অভিশপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরই প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনের নীতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার, দশ বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করে তোলবার জন্য সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে ফেলবার সঙ্কল্প সমাজের সুযোগহীন শ্রেণী

অবশ্যই একটি নূতন জাগরণের সম্ভাবনার সঙ্কেত। কায়িক শ্রমের মর্যাদাও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এক নূতন উদ্বোধনের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে, যার পরিমাণও জাতীয় জীবনের পক্ষে এক বিপুল সামাজিক পরিবর্তনের রূপ নিয়ে দেখা দেবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভারতের অর্থনীতিক জীবনে প্রথম এবং প্রকৃত ইস্পাত যুগের সূচনা, শিল্প-বিপ্লবের সূত্রপাত। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ভূমি-ব্যবস্থার যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার পরিণামের দিকে অগ্রসর হবার সুযোগ লাভ করেছে। কারিগরের দক্ষতা এবং মজুরের হাতের হাতুড়ি এই উন্নয়নী পর্বের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনে নতুন এক সমাদরের আহ্বান লাভ করেছে। মধ্য শ্রেণীর ভাড়াটিয়া বুদ্ধির শ্রম এবং শ্রমহীন অভিজাত শ্রেণীর চিন্তাগত শ্রম সাধারণের কায়িক শ্রমের তুলনায় যে অদ্ভুত প্রতিপত্তি ও সম্মানের সুযোগ পেয়ে এসেছে, সেই সুযোগের ভিত্তিকে প্রথম আঘাত দান করবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এমন আশা করবার হেতু আছে। সাধারণের সুযোগ শক্তি এবং মর্যাদার অভ্যুত্থান আসন্ন, এই সঙ্কেত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্পষ্টতর ভাবে ফুটে উঠেছে। তাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর অনেক খুঁত এবং অনেক ত্রুটি চোখে পড়লেও, শুধু ঐ আশার সঙ্কেতটুকুর জন্যই পরিকল্পনাকে বিপ্লবের বান্ধব বলে মনে করতে পারা যায়।

কর্ম সংস্থানের যে-সকল সম্ভাবনার পথ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে প্রশস্ততর করা হয়েছে, তার অধিকাংশই হলো কায়িক শ্রমের পথ। যারা গতর খাটাতে পারে ও পারবে, তারাই বেশী সংখ্যায় কাজ পাবে। এই সম্ভাবনা ভারতের বর্তমান মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্বকে নূতন ইতিহাসের কাছে নিতান্তই অবান্তর, অনর্থক ও অপ্রয়োজনের সামগ্রী করে তুলবে। এই সম্ভাবনাই হলো দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর মধ্যে নিহিত সমাজ-বিপ্লবের ইঙ্গিত। মধ্যশ্রেণীর কোন বিশেষ কর্তব্যের দায় আর নেই। শিক্ষায় এবং যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণ শ্রমিক মানুষই জাতির সংস্কৃতি ধারণ ও বহনের উপযোগী প্রতিভার অধিকার লাভ করবে। আরও বড় আশার কথা এই যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং তার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি যদি সত্যই সমাজবাদী লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা রেখে উন্নয়নী আয়োজন বিহিত করতে পারে, তবে মধ্যশ্রেণীর সমূহ লুপ্তি অবধারিত।

একটি প্রশ্ন থেকে যায়। ধনিক শ্রেণীর লুপ্তিও কি আসন্ন? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনার অনেক প্রতিশ্রুতির মধ্যে আর্থিক বৈষম্যের সঙ্কোচন এবং উচ্চতম ও নিম্নতম উপার্জন মাত্রার ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর করার প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করেও এমন সিদ্ধান্ত করবার যুক্তি পাওয়া যায় না যে, ব্যক্তি ধনিকের অস্তিত্ব মিথ্যা হয়ে যেতে চলেছে। ধনিকেরা কোনকালেই সংখ্যায় বৃহৎ ছিল না, এখনও নেই ; কিন্তু তবুও শ্রেণী হিসাবে তারা প্রচণ্ড। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীর উদ্যম এই সংখ্যালঘু প্রচণ্ড শ্রেণীর স্বার্থপরতন্ত্রতার সমূহ উচ্ছেদ সাধন করবে, প্রাইভেট সেক্টরের উপর সরকারের শক্ত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দাপট থাকবে জেনেও এত বড় আশা করবার প্রেরণা পাওয়া যায় না। কিন্তু তবু ভরসার কথা এই যে, মুষ্টিমেয় আভিজাতিক ধনিক স্বার্থের দাবী আর সাধারণের অধিকারের দাবী মীমাংসার জন্য মুখোমুখি শিবির রচনার সুযোগ পাবে। চরম বুঝাপড়ার লগ্ন আর একটু নিকটতর হলো, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাছে অন্ততঃ এইটুকুর জন্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত।

অর্থনীতিক বিপ্লব শান্তিপূর্ণ পন্থায় অবশ্যই সম্ভব, এবং সমাজ বিপ্লবও। ভারতের অর্থনীতিক রূপান্তরের আয়োজন বিনা সামাজিক রূপান্তর কখনই সম্ভব নয়। কে আগে

এবং কে পরে এর মধ্যে এরকম কোন প্রশ্ন নেই। উভয়েই পরস্পরের সহযাত্রী। সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী এক একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে—গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধারণ মানুষের সমষ্টিগত উন্নয়নের পরিকল্পনা। এই সব পরিকল্পনাও আবার আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয় ; সম্পূর্ণ হতেও পারে না। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য চাই আনুষঙ্গিক বহু আইনগত পরিবর্তনের এবং নূতন আইন প্রবর্তনের উদ্যম। দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকীর সমাজবাদী লক্ষ্যের নীতি অনুযায়ী সরকার নূতন নূতন আইন প্রবর্তন করছেন। যেমন নূতন কোম্পানীর আইন, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি। কিন্তু এই অর্থনীতিক বিপ্লবের ধারক হবার উপযোগী সামাজিক শক্তি সৃষ্টির জন্যও আইনগত উদ্যমের প্রয়োজন আছে।

অস্পৃশ্যতা নিরোধক আইন, অথবা হিন্দু নারীর সম্পত্তির অধিকার আইন কিংবা বিবাহ আইন ইত্যাদির দ্বারা সরকার সামাজিক রীতি-নীতির যে সংস্কার সাধন করতে চেয়েছেন, তাই কি ভারতের আসন্ন শিল্প-বিপ্লবের বিপুল ভার বহন করবার পক্ষে যথেষ্ট সামাজিক শক্তি বিকাশের সহায়ক? আজ প্রায় নয় বৎসরের মধ্যে দেশের সরকার ভেজাল নিরোধক একটি আইন প্রবর্তন করতে পারেনি। সরকারী বিভাগীয় কর্মক্ষেত্র হতে দুর্নীতি উচ্ছেদ করবার জন্য সরকারের ইচ্ছা এখনও বস্তুতঃ ইচ্ছার পর্যায়ে রয়ে গিয়েছে। উৎকোচের প্রতাপ বিশেষ কিছু কুণ্ঠিত হয় নি। বহু শিল্প এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ রাষ্ট্রায়ত্ত হবার ফলে এক শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রবণ আমলা গোষ্ঠীরও স্বাভাবিক আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা নূতন একটি আভিজাতিক গোষ্ঠী হিসাবে পরিণত হবার অনেক লক্ষণ এরই মধ্যে তাঁদের আচরণে প্রমাণিত করে দিয়েছেন। এমন কি সাহিত্য সঙ্গীত নাট্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রেও সরকারের সহযোগিতার নীতি একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর প্রচ্ছন্ন আধিপত্যের নূতন সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। এই সবই সমাজের সাধারণের অধিকার, সুযোগ, মর্যাদা এবং দাবীর প্রতিবন্ধক। এক একটি পঞ্চবার্ষিকী সমৃদ্ধি এইভাবে নূতন এক আমলাতান্ত্রিক আভিজাত্যের ক্ষমতাধিকারের প্রকোপে ছন্নছাড়া হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে যদি সরকারের সার্ভিসের ক্ষেত্রেও বিপ্লবমূলক কোন পরিবর্তন না ঘটান হয়। সামাজিক বিপ্লব ছাড়া অর্থনীতিক বিপ্লব যেমন সম্ভব নয়, তেমনই পরিকল্পনাকে বৈপ্লবিক সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সরকারের প্রশাসনিক পদ্ধতিতে এবং সার্ভিসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনটি বিপ্লবমূলক হওয়া চাই। সমাজ ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তনেব জন্য সরকার তবু অনেক কিছু করেছেন, কিন্তু সার্ভিসের পুরাতন অবয়বটিকে এখনও স্পর্শ করেন নি।

রাষ্ট্র ও জনসাধারণের মধ্যে এখনও আত্মীয়তাবোধের সূত্রটি শিথিল হয়ে রয়েছে; এই মানসিক বিচ্ছেদের প্রধান হেতু হলো সরকারের গতানুগতিক পুরাতন প্রশাসন রীতি। সমাজবাদী লক্ষ্যের পথে এই পুরাতন আমলাতান্ত্রিক রীতি-নীতি গুলিও একটি প্রধান বাধা, সমাজবিপ্লবের অন্তরায়। সুখের বিষয়, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আর এক প্রতিশ্রুতি হলো, সরকারী প্রশাসনিক রীতি-নীতিরও পরিবর্তন সাধনার সঙ্কল্প। শুধু প্রশ্ন থেকে যায়, এই সঙ্কল্প অনুযায়ী যে সকল পরিবর্তনেব উদ্যোগ পরিকল্পিত হয়েছে, তাই কি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে যথেষ্ট?

ভারতরাষ্ট্র জীবনপ্রভাত

ছাব্বিশে জানুয়ারীর দিনটি ভারত ইতিহাসের পুণ্যাহ, জাতির স্বপ্ন প্রথম যেদিন সঙ্কল্পের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেই দিনটি ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারী। বৈদিশিকের শাসনবন্ধন থেকে মুক্তি চাই, চাই পূর্ণ স্বাধীনতা, সারা জাতির চিত্ত আলোড়িত করে তুলেছিল যে আকাঙ্ক্ষা, তাই সেদিন সঙ্কল্পের মন্ত্ররূপে উচ্চারিত হয়েছিল। সেই দিন থেকে শুরু করে উনিশশো পঞ্চাশের এই ছাব্বিশে জানুয়ারী, মাঝখানে সহস্র ঘটনার আকীর্ণ বিশটি বছরের সময় পার হয়ে গেছে। তারই মধ্যে একই পনেরই আগষ্টের প্রথম মুহূর্তে সারা ভারতের বাতাস উচ্চ মন্ত্রে আলোড়িত করে বেজে উঠলো লক্ষ লক্ষ শঙ্খ, সৌরাষ্ট্র হতে কামরূপ এবং হিমবান কুমায়ুন হতে সমুদ্রবেলার কুমারিকা, সর্বত্র। পৃথিবী জানলো, একটি ঘটনা ঘটে গেছে। ভারত স্বাধীন হয়েছে। তারপর দুটি পনেরই আগষ্টের পর এই ছাব্বিশে জানুয়ারী, স্বাধীন ভারত তার অভীপ্সিত রাষ্ট্রীয় কায়া লাভ করেছে, রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে যাত্রা শুরু করেছে, বত্রিশ কোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষ।

এই ঘটনা কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় হয়নি। ব্যক্তি বিশেষের প্রয়াস ও অধ্যবসায়ের দ্বারাও নয়। মুক্তির স্বপ্ন ছাব্বিশে জানুয়ারীতে যে সঙ্কল্পরূপে উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল জাতির গণ-সাধারণের সঙ্কল্প। তার জন্য যে সংগ্রাম চলেছিল, তাও ছিল গণ-সাধারণের সংগ্রাম। দুঃখ বরণ করেছে, প্রাণ দিয়েছে ভারতের সাধারণ মানুষ। সে দুঃখের বেদনা ও গৌরব দুই অনুপ্রাণিত করেছে ভারতের সাধারণ মানুষকে। স্বাধীনতা লাভের জন্য যে চেতনার অভ্যুত্থান ভারতের ইতিহাস আলোড়িত করেছে, সে চেতনা ভারতের গণ-সাধারণের মানসলোক হতে উদ্ভূত। মহান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতা দল ও প্রতিষ্ঠান এই অভ্যুত্থানের যজ্ঞে অধ্বর্যু হোতা ও সাগ্নিকের কাজ করেছেন। তাই পনরই আগস্টের প্রথম মুহূর্তে অনুষ্ঠানের নিয়ম হিসাবে যে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠেছিল ভারতের বাতাসে, সে ধ্বনি ভারতেরই গণচিত্তলোকের হর্ষ। প্রথম সাফল্যের জয়রব।

ভারতের গণ-সাধারণ ভারতের ইতিহাসকে গড়ে তুলছে, ছাব্বিশে জানুয়ারী ও পনরই আগস্টের ঘটনায় এই সত্যই প্রকীর্তিত হয়েছে। এর আগে দেশ ও জাতির ভাগ্য গড়বার সাধনায় গণ-সাধারণ এত সার্থকভাবে, এত স্পষ্টভাবে এবং এত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রয়াস করেছে, তার পুরানো উদাহরণ বড় একটা পাওয়া যায় না। ভারতের এই স্বাধীনতা কোন মুকুটধারী রাজন্যের ও রাজসৈন্যের সংগ্রাম দ্বারা অর্জিত বিজয়োপহার নয়। কোন নিভৃতের গুহাস্থিত যোগীর তপস্যার কীর্তিও নয়। ভারতের জাগ্রত সমষ্টি—ধনী ও দরিদ্র, নর ও নারী; শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, সকলের স্বপ্ন সঙ্কল্প, ও সংগ্রামের পরিণামরূপে এসেছে এই স্বাধীনতা। প্রতিষ্ঠা পেল ভারতের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র, গণ-সাধারণের 'ইচ্ছা, কল্যাণ ও অধিকার' নামে তিনটি উপাদান দিয়ে-যে রাষ্ট্রের সমগ্র কায়া রচিত।

সেদিন আসতেও আর বেশী দেরী নেই, যেদিন ভারতের ইতিহাসে গণ-সাধারণের চেতনায় আর একবার বিপুল উদ্দীপনার উৎসব জেগে উঠবে, সরকারী ভাষায়, সে দিনটি হলো, 'সাধারণ নির্বাচনের দিন।' ভারতের সমষ্টি সেদিন রাষ্ট্রের নায়ক হবার অধিকার স্বেচ্ছায় এবং অবাধে সার্থক করবে। এই অধিকারে সবাই সমান। উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। কোটিপতি শেঠ এবং পথের ভিখারী ; উভয়েই একটি করে ভোট দেবে, উভয়

ভোটের মূল্য সমান। উঠে আসবে মাঠের চাষী কিছুক্ষণের জন্য তার লাঙ্গলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে, ভোট দিয়ে যাবে তার ইচ্ছার প্রতিনিধিকে। খনির অন্ধকারময় গভীর হতে উঠে আসবে শ্রমিক তার হাতের গাঁইতি ক্ষণিকের মত রেখে দিয়ে, ভোট দিয়ে যাবে তার ইচ্ছামত তার মনের মত প্রার্থীকে। প্রান্তরের বটচ্ছায়া থেকে উঠে আসবে গোচারক, কারখানা ঘরের যন্ত্রপাতির আসর থেকে শ্রমিক, সদাগর অফিসের মসীজীবী, বিপণির পণ্যস্বামী, গৃহী, ব্রতী ও কর্মী প্রত্যেকে, প্রত্যেক বয়স্ক, পুরুষ হোক্ বা নারী হোক্, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে পূর্ণ হবে রাষ্ট্রের মঙ্গলঘট। এই অধিকারে শিক্ষার কৌলীন্য একেবারে মিথ্যা, বিত্তের বৃহত্ত্ব নিতান্ত মূল্যহীন—বর্ণ বংশ ধর্ম কোন কিছুই এই অধিকারে প্রভেদ আনতে পারবে না। প্রভু ও ভৃত্য সমান অধিকার নিয়ে তার নিজের নিজের ইচ্ছা রাষ্ট্রের সেবায় ও পরিচালনায় নিয়োগ করবে ভোট দিয়ে, হয়তো একই আসরে দাঁড়িয়ে। ভারতের ইতিহাসে এই এক অভিনব ঘটনা, রাষ্ট্রের ওপর গণ-সাধারণের ইচ্ছার এই অধিকার এবং সমানাধিকাব, এর আগে কখনো এ রকম সার্থক রূপ গ্রহণ করেনি।

ভারতবর্ষের কল্পনা থেকে একদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন গণ-নাথ। ভাস্কর তাঁর মূর্তি রচনা করেছে, কবি তাঁর রূপের বন্দনা করেছে এবং তাত্ত্বিক বর্ণনা করেছে তাঁর গুণবিভূতি।

কল্পিত দেবতা এই গণ-নাথকে সমাজ-মানসেরই একটি তত্ত্ব বলে মনে হয়। গণ-সাধারণের চেতনা ও অভিলাষের সমষ্টিই তো গণাধীশ, যিনি 'বিনায়ক', নিজেই নিজের নায়ক, তিনি স্বয়ং নায়ক ও নীত। তিনি 'লোকরক্ষক' এবং সাধারণের 'বিমুক্তি সাধক'। তিনি অবনতজনের বিপত্তির উদ্ধারকর্তা। অকিঞ্চ নাতিমার্জনম, অকিঞ্চনজনের আর্তি তিনি মোচন করেন। কিন্তু উদ্ধতগণের সম্মুখে তিনি অত্যন্ত ভয়ংকর—নতেতরাতিভীকরং।

গণতন্ত্র দিয়ে গড়া হয়েছে ভারতের নতুন রাষ্ট্র। লোকরক্ষক ও সাধারণের বিমুক্তিসাধক রাষ্ট্র। অবনতজনের বিপত্তি ও অকিঞ্চনজনের আর্তি দূর করার জন্য 'কল্যাণরাষ্ট্র'। এবং কোন উদ্ধত যদি সাধারণের কল্যাণ বিড়ম্বিত করে, তার প্রতি ভয়ংকর হয়ে উঠবার মত শক্তি সঙ্গতিও রেখেছে এই রাষ্ট্র। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রের নির্দিষ্ট নীতি ও বিধানে লোকশাসনের এই দুটি উদ্দেশ্যকেই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সাধারণের কল্যাণ সাধনার জন্য সৃষ্টি সংগঠন ও রচনার সুযোগ, তেমনি অকল্যাণের ঔদ্ধত্য দমন করার মত সতর্কতা তৎপরতা ও ক্ষমতার প্রশ্রয়, কিন্তু শাসনতন্ত্রের এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে অথবা ক্ষুণ্ণ হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে যদি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সমষ্টির দায়িত্ব ও অধিকারে খর্বতা থাকে। ছাব্বিশে জানুয়ারীর ঐতিহাসিক পুণ্যাহে যে প্রজাতন্ত্র লাভ করেছে ভারত রাষ্ট্র, সে প্রজাতন্ত্র সমষ্টির মর্যাদার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক বয়স্কের ইচ্ছায় নির্বাচিত প্রতিনিধিসমাজই রাষ্ট্রের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। গণ-সাধারণই নিজের নায়ক হয়ে নিজেকে চালিত করবে, রাষ্ট্রের ওপর সর্বাধিপত্য ক্ষমতার আধার হয়েছে সমষ্টির ক্ষমতা, রাষ্ট্রবলের আধার হয়েছে সমষ্টির সমর্থন। পৌরাণিক কবির গণাধীশের মত প্রজাতন্ত্র ভারতরাষ্ট্রের গণক্ষমতার রূপও 'অনায়ক' অর্থাৎ এর ওপরে কেউ নেই। সমষ্টির ইচ্ছা ও ক্ষমতাই হলো 'এক নায়ক'— দ্বিতীয় নায়কও আর কেউ নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমষ্টির ইচ্ছাটাই কি চরম অভ্রান্ত? গণ-সাধারণ সমষ্টিগত ভাবেও তো ভুল করে? এবং পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে, সংখ্যাধিক্যের ইচ্ছা ও আচরণই জাতিকে বা রাষ্ট্রকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না

যে, ব্যক্তি বিশেষের বা অল্পসংখ্যকের আধিপত্যর প্রথাটাই শ্রেষ্ঠতর। অল্পসংখ্যকের বা কোন প্রমত্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে জাতি বা রাষ্ট্র যখন ভুল করে, তখন তার প্রতিফল হয় বড় ভয়ানক, সংখ্যাধিক্যের ভুলের প্রতিফল ততটা ভয়ানক নয়। সমষ্টি বা সংখ্যাধিক্যের ভুলে যে ক্ষতি হয়, এবং সে ক্ষতি যদি খুব বেশীও হয়, তবুও জাতি তার মনোবল নিঃশেষে হারায় না। ঠেকে শিখে, সামলে নিয়ে, আবার সুপথ খুঁজে নেবার মত প্রয়াস করবার চেতনাটুকু তার থাকে। কিন্তু সমষ্টির অনিচ্ছায়, মাত্র অল্পসংখ্যকের বা কোন অতি-ব্যক্তিত্বর ইচ্ছার জোরে যখন জাতি একটা ভুল করে বসে, তখন জাতির আত্মাই দীর্ণ হয়ে যায়। জাতি আত্মশ্রদ্ধা হারায় এবং বহু স্বার্থে খণ্ডিত হয়ে সে জাতি নিজেকেই চূর্ণ করে, তার রাষ্ট্রীয়তা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়। সমষ্টির ইচ্ছার মধ্যে যে ধৃতি আছে, ব্যক্তি বা অল্পসংখ্যকের মধ্যে সেই ইচ্ছা থাকে না। বহু বিভিন্নকে এক করে রাখার প্রকৃত শক্তি সেখানেই সার্থকভাবে প্রকাশ লাভ করতে পারে যেখানে সমষ্টির ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ঠিক এর বিপরীত পরিণাম দেখা যায় সেখানে, যেখানে সমষ্টি ইচ্ছার সমাদর মর্যাদা ও শক্তি নেই। ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের প্রতাপে শাসিত হয়েও দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রের সুন্দর ঐক্য বহু খণ্ড হয়ে গেছে। সমষ্টির ইচ্ছায় চালিত যে শক্তি, তার স্থায়িত্বগুণ বেশী, তার আহরণী ক্ষমতা বেশী, প্রয়োজনকালে নিজেকে পরিবর্তন করবার যোগ্যতাও বেশী। কোন ব্যক্তির একক প্রতিভায় অথবা সংখ্যাল্প দল-বিশেষের প্রাধান্যে যে রাষ্ট্র যত বেশী পরিচালিত তার জড়ত্ব এবং ভঙ্গুরতা তত বেশী। কোন বৃহৎ ঘটনা বা পরিবর্তনের সম্মুখে পড়লে তাকে অপ্রস্তুত হতে হয়, এবং নিজের জড়ত্বের চাপে তার ভাঙ্গন ধরতেও দেরী হয় না।

মহানুভব কোন ব্যক্তি বা অল্পসংখ্যক সদাশয় ব্যক্তিবর্গের সমাজ, এই দুয়ের মধ্যে কেউ যদি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করেন এবং এদের ইচ্ছাটাই যদি সার্বভৌম আধিপত্য লাভ করে তবে কি তার ফল খারাপ হতে পারে? না'ও হতে পারে এবং হয়তো মহানুভব ও সদাশয়ের আধিপত্যে লোক সাধারণের জীবন কল্যাণমুখীন হবে। কিন্তু তারপর? মহানুভব নরপতির ছেলে মহানুভব হবেন এমন নিয়ম নেই। এক সদাশয়গোষ্ঠী যদি মাত্র নিজের ইচ্ছায় ও আধিপত্যের জোরে আর একটি গোষ্ঠীকে শাসকরূপে প্রতিষ্ঠা করে যান, তবে এই নতুন গোষ্ঠীও যে সদাশয় হবেন এমন নিয়ম নেই। পৃথিবীর ইতিহাসেও দেখা গেছে যে, তা হয়নি। মহানুভব রাজন্যের বংশেও অত্যাচারী রাজন্যের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রজাসমাজের ভেতর থেকেই যদি শিক্ষায় ও চরিত্রউন্নত গোষ্ঠী বিশেষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী হয়, সেটাও শেষ পর্যন্ত সর্বকল্যাণের পক্ষে সহায়ক হবে না। সাধারণের তুলনায় গোষ্ঠী বিশেষের অতিরিক্ত ক্ষমতা নিজের অহমিকায় নিজেই বহু গ্লানির দ্বারা অভিভূত করে ফেলে, শেষকালে রাষ্ট্রকল্যাণের চেয়ে গোষ্ঠী প্রাধান্যের আগ্রহই তার একমাত্র প্রেরণা হয়ে ওঠে। সুতরাং একমাত্র পথ হলো সমষ্টির ইচ্ছাকে সার্বভৌম করার নীতি। সমষ্টি দরিদ্র হোক্, মূর্খ হোক্, অবনত হোক্—সমষ্টির ইচ্ছায় চালিত ক্ষমতাই হলো তার আত্মোন্নতির স্বাভাবিক পন্থা। অল্পসংখ্যক সদাশয় ক্ষমতাবানের কৃপায় শাসিত হওয়া এবং সমষ্টির ইচ্ছার মর্যাদায় শাসিত হওয়া, এ দু'য়ের মধ্যে মর্যাদার পথটিই যে শ্রেয়স্কর, তা'ও ইতিহাসের ঘটনার পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের সমষ্টির ইচ্ছা শ্রেয়লাভ করেছে, প্রজাতন্ত্র ভারতে এই গৌরব বত্রিশ কোটি মানুষের জীবনের নতুন গৌরব এনেছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম, রাষ্ট্রের সন্তানরূপে অধিকার ও মর্যাদা পেল

ভারতের সর্বসাধারণ। সে আজ শুধু রাষ্ট্রের আইন-মেনে-চলা জীবমাত্র নয়, রাষ্ট্রের আইন গড়বার ইচ্ছা বুদ্ধি ও ক্ষমতা। বাংলার চাষী, মালাবারের ধীবর, কাথিয়াবাড়ের গোচারক আর ছোটনাগপুরের খনিগর্ভের কুলি-কামিন, প্রত্যেকের ইচ্ছার ক্ষমতায় আজ দূর দিল্লীর ক্ষমতা গড়ে উঠবে। ভারতের অতীত ইতিহাসে জনসাধারণ কখনো এভাবে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্ক লাভ করেনি। 'পঞ্চায়েৎ', 'শ্রেণী' ও 'গণ' ইত্যাদি যে সকল লোকচালিত কর্তৃত্বের উদাহরণ ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা বিশেষ ঐশ্বর্যরূপে দেখা দিয়েছিল, সেটা ছিল নিতান্ত সামাজিক জীবনের ব্যাপার। সামাজিক আত্মশাসনের ঐতিহ্য আছে ভারতীয় জনসাধারণের, কিন্তু রাষ্ট্রীক আত্মশাসনের দায়িত্ব, সুযোগ বা অধিকার জনসাধারণ কখনো পায় নি। ছাব্বিশে জানুয়ারী তাই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ক'রে ভারতীয় গণ-জীবন-এ এক নতুন কর্তব্যের দীক্ষা দিয়ে গেল।

ভারতরাষ্ট্রের জীবনপ্রভাত দেখা দিয়েছে। অরুণোদয় হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে বিপুল কর্ম ও চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠবে এই ভারতভূমির সর্ব ঠাঁই, তার আলোকপ্রোজ্জ্বল রূপ আজই কল্পনা করতে পারা যায়। ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রীয়তা লাভ করলো, এই ঘটনার তাৎপর্য ও অভিনবত্বের কয়েকটি দিক লক্ষ্য করলে ভবিষ্যৎকে শুধু আর কল্পনা করতে হয় না, অনেকটা উপলব্ধি করতেও পারা যায়।

ভারতবর্ষের চেয়ে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পৃথিবীতে আর নেই। নতুন ভারত রাষ্ট্রের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই হলো একটি বৈশিষ্ট্য। বত্রিশ কোটি মানুষের দেশ তার রাষ্ট্রীয় জীবনকে গণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণতন্ত্রের সব চেয়ে বৃহৎ পরীক্ষাভূমি রূপে দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষ।

বৃহত্তম সংখ্যক নির্বাচক বা ভোটারের দেশ হয়েছে ভারতবর্ষ। রিপাব্লিক বা প্রজাতন্ত্রে ভারত অধিকার দিয়েছে তার সমষ্টিকে, যোল কোটি বয়স্ক নর-নারীর ভোটে নির্বাচিত হবে রাষ্ট্রের পরিচালকমণ্ডল।

পৃথিবীতে আরও গণতন্ত্রের দেশ আছে, যেখানে জনসাধারণ শিক্ষায় ও সম্পদে ভারতের জনসাধারণের চেয়ে অনেক উন্নত। সেখানে সমষ্টির ইচ্ছাকে অবাধ সুযোগের অধিকার দেওয়া এমন কিছু সাহসের কাজ নয়। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ শিক্ষায় ও সম্পদে নিতান্ত রিক্ত। তবুও ভারতের প্রজাতন্ত্র তার জন্য দুশ্চিন্তিত নয়, জনসাধারণের ইচ্ছাকেই ক্ষমতা ও মর্যাদার দেবার দুঃসাহস ভারতবর্ষ করেছে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের যে বিরাট পরীক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, তাও অভিনব।

প্রাচীন সংস্কৃতির সজীব ঐতিহ্য নিয়ে ভারতবর্ষের মত কোন দেশ বর্তমান পৃথিবীতে আর নেই। গ্রীস আর মিশর নামে যে দেশ রয়েছে, সেদেশে প্রাচীনকালে উন্নত সভ্যতা আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু সে দেশে সভ্যতা লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাচীন গ্রীস আর আধুনিক মিশরও প্রাচীন মিশর হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশ। কিন্তু ভারতবর্ষের জীবন প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে ছিন্ন হতে পারেনি। ভারতের ধর্ম দর্শন শিল্পকলা সঙ্গীত স্থাপত্য ভাস্কর্য ও লোকাচারের সহস্র বৎসরের ভাব ও রূপের ধারাটি গঙ্গার ধারার মত জাতির প্রতিভায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই প্রাচীনতম সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশ ভারতবর্ষ পৃথিবীর আধুনিকতম গণতন্ত্রে পরিণত হলো, বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম। মানবীয় সভ্যতারই একটি নতুন পরীক্ষার সূচনা হলো ভারতের প্রজাতন্ত্রের যাত্রা সুরুর সংগে সংগে। পুরাতনে ও নতুনে

সমন্বয়ের প্রক্রিয়া দেখা দেবে ভারতের জীবনে। পুরাতনের কতটুকু সত্যি, ঐতিহ্যের শক্তি কোথায়, নতুনের সত্য কতখানি, রূপান্তরের নিয়মই বা কি—সমাজবিজ্ঞানের অনেকগুলি দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা হবে ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিণামে।

শুধু প্রাচীনতম ও আধুনিকতম সমন্বয়ের দায়িত্ব ও পরীক্ষা নিয়ে নয়, বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে আর একটি নতুন ঘটনা সৃষ্টি করেছে ভারতের স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র। এশিয়া ও য়ুরোপের, অথবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে এশিয়ার অভ্যুত্থানই প্রথম ঘটনা, কিন্তু তারপরেই পরিণামের ক্রম পাল্টে গিয়েছিল, এশিয়ার অবনতি ও য়ুরোপের অভ্যুত্থান। কয়েক শতাব্দী ধরে পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটনার ধারা এইভাবে এশিয়ার ও য়ুরোপের দু'টি ভিন্ন পৃথিবীর মত করে তুলেছে। দুই মহাদেশের মধ্যে সম্পদের এই অসাম্য সভ্যতাকে খণ্ডিত ও বিপর্যস্ত করেছে। ভারতের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে এশিয়ারই নতুন করে অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত সূচিত হয়েছে। য়ুরোপ ও এশিয়ার বৈষয়িক সম্পদ এবং সভ্যতার মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হলে সেটা হবে পৃথিবীর ইতিহাসে একটা নতুন ঘটনা। বিশ্বজীবন যে নতুন পরিণাম লাভ করবে তাও অনুমান করতে পারা যায়।

ভারতের স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক অগ্রগতি বিশ্বসমাজেব রুচি, চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে আর একটা নতুন পরিণাম সৃষ্টি করবে বলে আশা করা যায়। ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে য়ুরোপের চিন্তার সমন্বয়। বিজ্ঞানে ও বৈষয়িক সম্পদে ভারত এখন দাতার যোগ্যতা লাভ করতে পারেনি, এক্ষেত্রে ভারতকে পশ্চিমের কাছে গ্রহীতা রূপেই উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু চিন্তার ঐশ্বর্য আছে ভারতের, সে চিন্তার একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য আছে। মানবীয় জীবনের নীতি ভারতবর্ষ যেভাবে এবং যে পরিমাণে আবিষ্কার করতে পেরেছে, য়ুরোপ তা পারেনি। এদিক দিয়ে য়ুরোপ-এর সভ্যতায় দীনতা আছে এবং যার জন্য বৈষয়িক সম্পদে প্রবল হয়ে উঠেও য়ুরোপের সমাজ ও শান্তি নিয়ত বিব্রত হয়েছে। ভারতের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে য়ুরোপের আচরণে মানবধর্মের নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে এবং তার ফলও হবে বিশ্বজীবনের পক্ষে কল্যাণকর। এশিয়া ও য়ুরোপের হৃদয়ে ভাবগত সাম্য না থাকলে সভ্যতা খণ্ডিত হয়ে থাকবে, এখন যেমন আছে। কিন্তু নিকট বা দূর ভবিষ্যতে উভয়ের মধ্যে যে চিন্তার সেতুবন্ধন হবে, তার সম্ভাবনার ইঙ্গিত এই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের ঘটনায়।

বুদ্ধ-বিবেকানন্দ-গান্ধীর বাণীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করবার আগ্রহ পৃথিবীর সর্বত্র জাগ্রত হতে বাধ্য। কারণ পৃথিবীবাসী আজ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে অধ্যাত্মবাদের দেশ ভারতবর্ষই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আবির্ভূত হয়েছে। ভারতের বাণীকে বুঝবার এবং বুঝে গ্রহণ করবার চেষ্টা সর্বদেশে জাগ্রত হবে বলে আশা করা যায়। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রমাণিত হলো যে, অধ্যাত্মবাদে যে জাতির চিন্তা আশ্রিত, সে জাতি আধুনিক সভ্যতায় অবান্তর হয়ে যায়নি, বরং দেখা গেল যে, সেই জাতি সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতিকে বরণ করে নিয়ে বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। অধ্যাত্মচিন্তার প্রভাবে জাতি পিছিয়ে পড়ে না, অথবা বৈষয়িক বিজ্ঞানে শক্তি ও নিপুণতা লাভে অসমর্থ হয় না, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক অভ্যুত্থানের এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এর প্রভাব বর্তমান সভ্যতার ইতিহাসের ওপর না পড়ে পারে না।

পৃথিবীর বৃহত্তম প্রজাতন্ত্র, যেখানে সর্বাধুনিক বিজ্ঞান ও অর্থনীতি সমাদৃত হয়েছে, ভারতবর্ষ নামে সেই দেশ শ্বেতাঙ্গের দেশ নয়। এই ঘটনা বর্ণবৈষম্য নামে একটি কুসংস্কার এবং 'শ্বেতাঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব' নামে বর্ণগত দম্ভের বিরুদ্ধে প্রথম ঐতিহাসিক আঘাত হিসাবে পড়বে। এশিয়া ও আফ্রিকায় য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসারে শ্বেতাঙ্গের এই বর্ণগত ঔদ্ধত্যের সংস্কার কম সহায়ক হয়নি। আজও সেই সংস্কার অনেক শ্বেতাঙ্গ জাতির মন অশুদ্ধ করে তুলেছে। প্রজাতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রিক মর্যাদা শ্বেতাঙ্গ-এর বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের থিওরীকে ভুয়া প্রমাণিত করে পার্থিব শান্তির একটি প্রধান বিঘ্নকে অপসারিত করবে।

এই পরিবর্তনের লক্ষণ যে এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহির ও ভিতরের পরিবর্তন। ভারতবর্ষই প্রথম প্রজাতন্ত্র, কমনওয়েলথের সদস্যরূপে যাকে সাগ্রহে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহচর্যে, চুক্তিহীন সদিচ্ছার সম্পর্কে পূর্ণ-স্বাধীন বিভিন্ন রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র সমবায় হিসাবে সম্মিলিত রূপ গ্রহণ করতে পারে, তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে কমনওয়েলথের নীতিপরিবর্তনের ঘটনায়। চুক্তিগত বাধ্যতা ছাড়াই মাত্র নৈতিক বাধ্যতার ওপরেই ভিত্তি করে যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহযোগিতা সম্ভব হতে পারে, তারও পরীক্ষা বর্তমান কমনওয়েলথের রূপান্তরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কমনওয়েলথ এখন শ্বেতাঙ্গ প্রধান নয়, জনসংখ্যা ধরলে ভারতবর্ষই তার মধ্যে প্রধান। কমনওয়েলথের বর্ণগত রূপান্তর হয়েছে বলা যেতে পারে এবং এশিয়ার তিনটি স্বাধীন দেশের উপস্থিতিতে কমনওয়েলথের বিশুদ্ধ ব্রিটিশত্ব বা শ্বেতাঙ্গ বদলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। নিকট বা দূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্বে 'এক রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা যে একটা অসম্ভাব্য স্বপ্নবিলাস মাত্র নয়, তার বাস্তবোচিত লক্ষণ কমনওয়েলথেরই ঐতিহাসিক রূপান্তরের ভেতর দিয়ে প্রমাণিত হয়ে চলেছে।

প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই আর এক ভাবে পরীক্ষা হতে থাকবে যার দ্বারা প্রমাণিত হবে 'বিশ্বরাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার আদর্শে বাস্তবতা কতটুকু আছে। ভারতবর্ষই ছোট একটা পৃথিবী—ধর্ম ভাষা বর্ণ আচরণ সামাজিক রীতি-নীতি পরিচ্ছদ ও শিক্ষাদীক্ষার এত বহু ও বিবিধ রূপ নিয়ে মানবসমাজের অধিষ্ঠান আর কোন দেশে নেই। এই বৈচিত্র্যকে ক্ষুণ্ণ না করে তাকে একটি ঐক্যে সমন্বিত করা, এই দুরূহ ব্রতের পরীক্ষা করেছে ভারতবর্ষ। ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এই যে, ভারতের এই বৈচিত্র্যকে একটি বৃহত্তর কল্যাণের নীতি দিয়ে ঐক্য বিধানের প্রয়াস করা হয়েছে। নগরের হর্ম্যবাসী এবং অরণ্যের আদিবাসী, উভয়ের জীবনযাত্রার কত পার্থক্য। কিন্তু উভয়েই প্রজাতন্ত্র ভারতের প্রজা, উভয়ের সাক্ষরে ভারতের কল্যাণ পরিচালিত হবে। ভারতের প্রজাতন্ত্র মানুষের ইতিহাসেরই একটি সমস্যাকে সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। বৈচিত্র্যকে ভেদবাদের দ্বারা বিদ্বিষ্ট না ক'রে, অথবা প্রবল প্রভাবে সকল বৈচিত্র্যকে রূঢ়ভাবে বিনষ্ট না করে একত্বের প্রতিষ্ঠা। প্রজাতন্ত্র ভারতের অভ্যন্তরে বহুকে এক করার এই সমন্বয়ধর্ম যদি সার্থক হয়, তবে পৃথিবীরই বহু এবং বিভিন্নের পক্ষে মিলিত হবার প্রেরণা ঐতিহাসিক আবেগ রূপেই দেখা দেবে এবং প্রজাতন্ত্রে ভারতের সাফল্য আদর্শরূপে সেই নিখিল-সমন্বয় ত্বরান্বিত করবে, এই আশা অত্যাশা নয়।

ভারতবর্ষের রূপ কী তীব্রগতিতে এবং কী বিস্ময়কর এক একটা ঘটনা জাগিয়ে বদলে যাচ্ছে। ভারতের সহস্রটি মন আজ এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। এমন ঐক্য ভারতের ইতিহাসে

কোনদিন দেখা দেয়নি। ছয়শত করদ রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে, আজ তারা সকলে ভারত প্রজাতন্ত্রের অংগীভূত। ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রসন্ন ঔদার্যের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে ডাক দিয়ে নিয়ে এসেছে সকল 'বহির্ভূত অঞ্চল'কে। অরণ্য অঞ্চলের আদিম ভারতীয়ও আজ প্রজাতন্ত্রের বিধানে নিজের ইচ্ছায় তার শাসনপরিষদ রচনা করবার ক্ষমতা পেয়েছে। এক রাষ্ট্রভাষা রচনা করে প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষ তার সকল প্রান্তের ভাবের আধার তৈরী করছে। ভারতের সকল মানুষের প্রতিভার স্পর্শে গড়ে উঠবে ভারতের জাতীয় ভাষা। ভারত কবির একটি সঙ্গীতের সুস্বরে ভারতের জনগণমনের মিলনতীর্থ রচিত হয়ে চলেছে। নেমে গেছে বৈদেশিক রাজমুকুটের প্রতীক, সে আজ যাদুঘরের নিদর্শন মাত্র। উঠে এসেছে ধর্মাশোকের স্তম্ভশীর্ষের চক্রসমন্বিত সিংহপ্রতীক ভারত ইতিহাসের আত্মা থেকে। ভারতের অর্ণবযান আজ ত্রিবর্ণ-পতাকার হিল্লোলিত গর্ব নিয়ে মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে যায় আর আসে। ভারতরাষ্ট্রের জীবনপ্রভাতের সূচনায় সমগ্রজাতির বন্দনা গ্রহণ করছে, ছাব্বিশে জানুয়ারির সূর্য্য। এ বন্দনায় বন্দিত হচ্ছে বিশ্বের ভবিষ্যৎ, মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ।

ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর

যদি প্রশ্ন করা হয়, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের কোন ক্ষেত্রে এমন কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কি, যাকে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন বলা যেতে পারে? রূপগত, গঠনগত ও রুচিগত পরিবর্ত্তন? নীতি ও আদর্শে পরিবর্ত্তন?

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখের আগের ও পরের ঘটনাবলীকে যদি তুলনা করা যায় তবে কতগুলি প্রভেদ ও পরিবর্ত্তন অবশ্যই চোখে পড়ে। দেশের গভর্ণমেণ্ট, দেশের রাজনৈতিক সমাজ ও দেশের সাধারণ জনসমাজ—সকলেরই কথা কাজ ও মনোভাবের মধ্যে একটা পরিবর্ত্তনের সাড়া লেগেছে। কিন্তু কতটুকু পরিবর্ত্তন? তার পরিমাণ কতখানি এবং প্রকৃতিই বা কি?

দুঃখের বিষয়, দেশ ও জাতির মনস্তত্ত্বের স্বরূপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে-পরিবর্ত্তনের গতি ঊর্দ্ধমুখী এবং প্রকৃতি সৃষ্টিপ্রবণ, সে রকম পরিবর্ত্তনের প্রমাণ খুব কম। যে পরিবর্ত্তন নিছক অস্থিরতা, ক্ষোভপ্রবণ ও গঠনধর্মহীন, সেই পরিবর্ত্তনের প্রকোপ বেশী। জাতির ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন হঠাৎ বহুদূর এগিয়ে গেছে, কিন্তু জাতির মনোবল পিছিয়ে আছে।

স্বাধীন ভারতের শিল্প ব্যবসায় শিক্ষা কৃষি সাহিত্য ও আরও বহুবিধ কর্মক্ষেত্রে এমন কোন নতুনত্বের নিদর্শন আজও দেখা দেয়নি, যাকে সমূহ পরিবর্ত্তনের সূচনা ব'লে মনে করতে পারি। এ পরিবর্ত্তন এখনো জাতির মনে নিতান্ত একটা সদিচ্ছা রূপেই রয়েছে, ঘটনা রূপে দেখা দেয়নি। দেশের কোন সরকারী বিভাগ, কোন রাজনৈতিক দল, কোন প্রতিষ্ঠান, কোন সমাজ—এমন কোন নতুন কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন না, যার জোরে বলতে পারা যায় যে তাঁরা ১৫ই আগষ্টের পর সত্যিই বদ্‌লে গেছেন, জাতির নতুন ইতিহাসে নতুন ঘটনা দিয়ে তাঁদের নতুন চেতনাকে কীর্তিত করতে পেরেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মাত্র নতুনের সূচনা দেখা দিয়েছে, নতুন উদ্যোগের আভাষ মাত্র দেখা দিয়েছে এবং নতুন সংকল্পের পরিচয় পাওয়া গেছে।

শুধু একটি ক্ষেত্রে এই মন্তব্য প্রয়োগ করা চল্‌তে পারে না। ১৫ই আগষ্টের পর

ভারতের একটি সমাজ এমন করে বদলে গেছে যাকে প্রকৃত বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যায়। এই পরিবর্তন শুধু আশানুরূপ নয়, বরং আশাতিরিক্ত বলা যেতে পারে। অতি নিঃশব্দে এই বিরাট পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, ভারতের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। এই ঘটনা হলো, ভারতীয় ফৌজের রূপান্তর।

অথচ বিগত দু'শত বৎসরের ভারতীয় ইতিহাসের ব্রিটিশ শাসিত অধ্যায়টি স্মরণ করলে ভারতীয় ফৌজের প্রতি দেশের জনসাধারণের মনে কোন শ্রদ্ধা বা আশাবাদ পোষণ করার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ গঠিত ভারতীয় ফৌজ চিরকাল স্বদেশবাসীর প্রতি বিদেশী সৈনিকের মতই অনাত্মীয়সুলভ আচরণ ও রূঢ়তার প্রমাণ দিয়ে এসেছে। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ও আন্দোলনে এই ভারতীয় ফৌজ কোন কালেই জনসাধারণের সতীর্থ হয়নি, বরং সে আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য অগ্নিবর্ষী রাইফেল তুলে ধরতে কখনো তার দ্বিধা বা সংকোচ হয়নি। এ হেন ভারতীয় ফৌজ আগে কি ছিল এবং এখন কি হয়েছে, তার তুলনা করলে বিষয়টা একটা ধাঁধার মতই রূপ গ্রহণ করে, যা মনস্তাত্ত্বিকের পক্ষে বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে ওঠে এবং বিশ্লেষণ করেও তার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। সমগ্র ঘটনাকেই একটা বিস্ময়ের অধিক বিস্ময় বলে মনে হবে, অথচ ঘটনাটি বর্ণে বর্ণে সত্য।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্র দেখা গেছে যে, যখনই কোন রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব বদল হয়, তখনই সে রাষ্ট্রের ফৌজে একটা প্রতিক্রিয়া কম বা বেশী দেখা দেয়। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এরকম ঘটনা দেখা দিতে পারে, অনেকে এই আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশী আশঙ্কার কারণ ঘটিয়েছিল আর একটি ব্যাপার ; অর্থাৎ ভারতীয় ফৌজকে খণ্ডিত করার ব্যাপার। এত বিরাট একটি বাহিনী, দু'শো বছরের ঐতিহ্যে সুসংহত যার গঠনতন্ত্র, তাকে খণ্ডিত করতে গেলে কি পরিণাম দেখা দেবে, সে সম্বন্ধে অনেকের মনেই সংশয় ছিল। বহু ব্রিটিশ কূটনৈতিক ও ফৌজী তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই ধারণাই করেছিলেন যে, ভারতীয় ফৌজকে দ্বিখণ্ডিত করতে গেলে ফৌজটিই ছন্নছাড়া হয়ে যাবে।

কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্ব বদল হয়ে গেল, এবং ফৌজও দু'ভাগ করা হলো, তা'ও আবার অতি অশান্তি ও বিদ্বেষের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যে। ভারতীয় ইতিহাসের এই এক পরম সৌভাগ্যকর ঘটনা, সকল দুরূহতা অতিক্রম ক'রে, সকল আশঙ্কা ও সংশয়কে মিথ্যে ক'রে দিয়ে ভারতীয় ফৌজ ভাগ করার কাজটি সম্ভব হয়ে যায় এবং স্বাধীন ভারতের ফৌজও আবির্ভূত হয়। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা উপদ্রব এবং অশান্তির মধ্যে এই বিরাট পরিবর্ত্তন এবং পুনর্গঠন অত্যন্ত শান্তভাবে সম্পন্ন হয়। ফৌজকে এভাবে যাঁরা পুনর্গঠন করলেন, স্বাধীন ভারতের সেই রাষ্ট্রীয় প্রধানদের পক্ষে অবশ্যই এই সাফল্য খুবই গৌরবের বিষয় এবং এ গৌরব তাঁরা দাবী করতে পারেন, কিন্তু ভারতের সৈনিকের আচরণ ও মনোভাবই প্রকৃত প্রশংসার যোগ্য। কারণ দেশ প্রেমের ঐতিহ্যে যারা দীক্ষিত ছিল না, তাদেরই পক্ষে এইভাবে শান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেশ রক্ষার নতুন আদর্শকে বরণ ক'রে নেওয়া এত সহজে সম্ভব হলো।

ঠিক এর বিপরীত দৃশ্য দেখতে পাই দেশের অন্যান্য ক্ষেত্রে। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেশের শ্রমিক সমাজে ধর্মঘটের প্রাবল্য দেখা দেয়, উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পায়, মজুরীর দাবী বেশী হয়ে ওঠে। এর দ্বারা এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, ১৫ই আগষ্টের আগে

শ্রমিক সমাজের যে মনোভাব ছিল ১৫ই আগস্টের পরেও তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। বুদ্ধিজীবী ভদ্রলোক সমাজেরও সেই মনোভাব, দাবীর প্রাবল্য প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ। চোরাকারবারী ও সরকারী কর্মচারী সমাজের মনোভাবেও কোন পরিবর্ত্তন দেখা দিল না। সেই মুনাফা ও দুর্নীতি। ১৫ই আগস্টের পর যে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের একটা নতুন আহ্বান এসেছে, এই বোধ ব্যাপকভাবে দেখা দেয়নি, বরং লোভ ও আত্মপ্রাধান্যের অপপ্রেরণা বেশী মাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আর আমাদের ভারতীয় ফৌজ, ১৫ই আগস্টের'পর তার ভাতা হ্রাস পেয়েছে, বেতন বৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু জাতীয় পরিবর্ত্তনের অতি সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তারা বেতনবৃদ্ধি দাবী ক'রে ধর্মঘট করেনি। অথচ ১৫ই আগস্টের পর একমাত্র ভারতীয় ফৌজকেই দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়েছে। বক্তৃতা ক'রে নয়, প্রাণ দান ক'রে! স্বাধীন ভারতে বর্ত্তমানে কোন রাজনৈতিক দলও এমন কোন ব্রত গ্রহণ করেননি বা গ্রহণ করার কারণ ঘটেনি, যাকে আত্মোৎসর্গের আন্দোলন বলা যেতে পারে। সে ব্রত গ্রহণ করতে হয়েছে ভারতীয় ফৌজকে।

ভারতীয় ফৌজকে প্রথম দেশপ্রেমের পরীক্ষা দিতে হয়, পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থী অপসারণের দুরূহ ব্রতের মধ্যে। ভারতীয় সৈনিক যেভাবে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থীকে পাহারা দিয়ে পাকিস্থান অঞ্চল থেকে ভারতে এবং ভারত থেকে পাকিস্থানে নিয়ে গেছে, তার পূর্ণ ইতিহাস যেদিন প্রকাশিত হবে সেদিন ভারতীয় ফৌজের এক অতুলনীয় মহৎ শৌর্য্যের পরিচয় জনসমাজ জান্‌তে পার্‌বে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রের সৈনিককে এধরণের কাজ করতে হয়নি। হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী নরনারী ও শিশুর এক একটা চলমান মিছিলকে দিনরাত্রি নিদ্রাহীন চক্ষে পাহারা দিয়ে, আততায়ীর আক্রমণ থেকে রক্ষা ক'রে, দীর্ঘ পথ ও প্রান্তর অতিক্রম ক'রে ভারতীয় সৈনিক যে আত্মত্যাগ ও ক্লেশ বরণের নতুন ইতিহাস রচনা করেছে, কোন দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের স্বেচ্ছাসেবক তার চেয়ে বেশী মহৎ কোন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেননি।

দেশপ্রেমের দ্বিতীয় পরীক্ষা—কাশ্মীর রক্ষার যুদ্ধ। কাশ্মীরকে ধ্বংস থেকে বাঁচাবার জন্য ভারতীয় ফৌজ যেভাবে কাজ করেছে এবং করছে, সেটা নিছক বেতনভূক্‌ সৈনিকের কাজ নয়। 'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তারি লাগি তাড়াতাড়ি'—কাশ্মীর রক্ষার আহ্বান আসা মাত্র ভারতীয় ফৌজের মনে যেন দেশরক্ষার এই ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্যের প্রেরণা সাড়া দিয়ে উঠেছিল। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি উপত্যকায় ভারতীয় সৈনিকের শৌর্য্য ও আত্মদান দেশপ্রেমের এক অভিনব ইতিহাস রচনা করে চলেছে।

স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ যে বিশেষ একটা অভিশাপে আক্রান্ত হয়েছিল, তার পরিচয় ও বিবরণ সকলেই জানেন—সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িক আক্রমণের রূপ গ্রহণ করে এবং সেই হিংসার প্রমত্ততার মধ্যে বহু রাজনৈতিক দলের ও ব্যক্তিসাধারণের সদ্বিবেচনার শক্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সম্মুখে দেশের কোন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলও তাঁদের কৃতিত্বের প্রমাণ দিতে পারেননি, কোন প্রতিষেধক কর্মসূচী তাঁরা গ্রহণ করতে পারেননি। একমাত্র একজন, যিনি ছিলেন রাজনীতির উর্দ্ধে, সেই মহাত্মা ছাড়া আর কেউ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মত একটা সংকটকে বাধা দিয়ে ব্যর্থ করার উপযুক্ত প্রতিভা দেখাতে পারেননি।

এরই সঙ্গে তুলনা করা যায় ভারতীয় সৈনিকের মনোভাব। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়

ফৌজের দু' একটি দল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অভিভূত হ'লেও, সাধারণ ভাবে এটাই সত্য যে ভারতীয় সৈনিক তার মনকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লী অঞ্চল থেকে ভারতীয় সৈনিক লক্ষ লক্ষ মুসলিম আশ্রয়প্রার্থীকে পাহারা দিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাবে পৌঁছে দিয়েছে। চারদিকের শত উত্তেজনা ও প্ররোচনার মধ্যেও সে তার কর্ত্তব্যবোধকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা কলুষিত হতে দেয়নি। স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান সেনাপতি স্যার রব লকহার্ট ভারতীয় সৈনিকের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তার জন্য মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাও করেছেন।

স্বাধীনতালাভের পর ভারতে প্রাদেশিক বিদ্বেষ নামে আর একটা অশুভ আবির্ভাব চারদিকে প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতীয় ফৌজের শিবিরে এই মনোবিকার প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। হাজার হাজার জাঠ জোয়ান সাগ্রহ আনুগত্যের সঙ্গে বাঙালী অফিসারের পরিচালনায় নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ত্তব্য পালন করে চলেছে, ভারতীয় ফৌজে এরকম দৃশ্য খুবই সাধারণ ব্যাপার। শিখ ডোগ্‌রা মারাঠা মহর ও ভারতীয় মুসলমান সৈনিক এক লাইনে দাঁড়িয়ে এক ফ্রণ্টে হাসিমুখে পরস্পরের সুহৃদ্ হয়ে কাজ করে যায়। একমাত্র ভারতীয় সৈনিকের মনেই এই চেতনা সজীব এবং সক্রিয় যে, ভারতভূমিই তার কর্মক্ষেত্র। মারাঠা সৈনিক একমাত্র মহারাষ্ট্রকেই তার কর্মক্ষেত্র মনে করে না। কাশ্মীর রক্ষায় ডোগ্‌রা ও গাড়োয়ালীর মত মাদ্রাজী এবং মহর সৈনিক সমান আগ্রহে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে। নিজের কর্ত্তব্য দায়িত্ব ও আগ্রহকে প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখবার দাবী ভারতীয় সৈনিকের মধ্যে দেখা যায় না। ভারতীয়তাবোধ একমাত্র ভারতীয় সৈনিকের আচরণে সব চেয়ে স্পষ্ট ভাবে জাগ্রত হয়েছে দেখা যায়।

তারপর, দলীয় বা ব্যক্তিগত প্রাধান্যের প্রশ্ন। স্বাধীনতা লাভের পর এই আর একটি অশুভ মনোবিকার দেশের বহু ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে মন্ত্রিত্বপ্রয়াসী রাজনৈতিক সমাজ এবং পদোন্নতি প্রয়াসী রাজকর্মচারী সমাজের মধ্যে। এই প্রাধান্য ও পদোন্নতির জন্য একটা প্রগল্‌ভ আবেগ অনেকেরই চিত্ত গ্রাস ক'রে বসে আছে। ভারতীয় ফৌজেও এই ব্যাপার নিয়ে দলাদলির একটা অবকাশ ছিল, কারণ ব্রিটিশ অফিসার সমাজ বিদায় নেবার ফলে ভারতীয় ফৌজে শত শত উচ্চপদ শূন্য হয়। ভারতীয় ফৌজের অফিসার পদগুলিতে বর্ত্তমানে ভারতীয় অফিসারেরাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, এই সব নিয়োগ ও নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থের হানাহানি দেখা দেয়নি। ভারতীয় ফৌজকে যথার্থ জাতীয় ফৌজে পরিণত করা, অর্থাৎ সমুদয় অফিসার পদে ভারতীয় নিয়োগ করা এক বিরাট পরিবর্ত্তনমূলক কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিরাট কাজটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় সৈনিক এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বা দলীয় প্রাধান্যের দাবী নিয়ে কোন অবাঞ্ছিত উপদ্রব সৃষ্টি করেনি।

যারা এতদিন 'ভাড়াটিয়া' বা নিছক 'বেতনভুক' সমাজ বলে নিন্দিত ছিল, তাদের পক্ষে এই সংযম ও নিয়মানুগত্য আশাতিরিক্ত বলেই মনে হবে। আর দেশপ্রেমী নামে কথিত রাজনৈতিক সমাজের মনোভাবের সঙ্গে ভারতীয় সৈনিকের এই মনোভাবের পার্থক্যটাই বা কি কম তাৎপর্য্যপূর্ণ? প্রশ্ন উঠতে পারে, দেশপ্রেমিক কংগ্রেসী সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত পদ প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের আগ্রহ কেন এত তীব্র হয়ে উঠলো, আর নিছক্ ভাড়াটিয়া ঐতিহ্যের মানুষ ভারতীয় সৈনিক কেন এই সংযমের পরিচয় দিল?

মাত্র কয়েক বছর আগেই এই ভারতীয় ফৌজকেই দেখা গেছে, লিবিয়ার মরুস্থলে, আদ্রিয়াতিক উপকূলে ও বর্মার জঙ্গলে ব্যাগপাইপের বাজনার সঙ্গে এক দাস্য গজল গেয়ে মার্চ করে চলেছে—'কভি সুখ ওয় কভি দুখ, হম্‌ আংরেজকা নওকর।' কখনো সুখ এবং কখনো দুখ, আমি ইংরাজের চাকর। আর, আজ সেই ভারতীয় ফৌজকেই দেখা যাবে কাশ্মীরের বানিহাল গিরিপথে এক নতুন আদর্শের সুরময় প্রতিধ্বনি তুলে মার্চ করে চলেছে—জনগণমন অধিনায়ক জয় হে। যারা ছিল মনে প্রাণে রূপে ও গঠনে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যিক বাহিনী, তারাই কদিনের মধ্যে ভারতের জাতীয় দেশরক্ষা বাহিনীতে পরিণত হয়ে গেল। এর চেয়ে বড় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তুলনা আর নেই।

ভারতীয় ফৌজের গঠনতন্ত্রগত পরিবর্তনও কত বিরাট এবং ব্যাপক, এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এই কাজ সমাধা করা হয়েছে। ভারতের অন্যান্য জাতীয় উদ্যোগের ক্ষেত্রে, ছোট খাট প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ও পরিবর্তনের বিষয়ও আজ পর্য্যন্ত তেমন কিছু সফল করা সম্ভব হয়নি। একটা বিশ্ববিদ্যালয়, একটা মিউনিসিপ্যালিটি, একটা স্বাস্থ্য পরিকল্পনা, এই ধরণের নিতান্ত সাধারণ এবং ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও পরিবর্তন বা নতুন সংগঠনের কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'তে পারেনি। কিন্তু জাতীয় সংঘ বা বিভাগ হিসাবে যেটি বৃহত্তম, ভারতীয় ফৌজ নামে সেই সংঘ চার পাঁচ মাসের মধ্যে একেবারে নতুন ক'রে সংগঠিত হয়ে গেছে। দু'শত বছরের ঐতিহ্যে পুষ্ট প্যাটার্নকে ভেঙে দিয়ে একেবারে নতুন ক'রে সংগঠন। ইংরাজের উদ্যোগেই, এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত, ভারতীয় ফৌজ অনেকবার পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু এত দ্রুত এত বড় পুনর্গঠন কোনকালেই ইংরাজের প্রতিভার দ্বারাও সম্ভব হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতীয় ফৌজ পুনর্গঠন করার সময় ভারতীয় ফৌজের শ্বেতাঙ্গ সেনাগুলি বিদ্রোহ ক'রেছিল। এই ঘটনা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, দ্রুত পরিবর্তন করতে গেলে ফৌজের আনুগত্য ভেঙে যাবারও কতখানি আশঙ্কা থাকে।

কিন্তু ক'মাসের মধ্যেই ভারতীয় ফৌজ থেকে হাজার হাজার ব্রিটিশ অফিসারকে বিদায় দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি আর্মি কম্যাণ্ড, ডিভিসনের কম্যাণ্ড, সাব-এরিয়া কম্যাণ্ড ভারতীয় অফিসারের ওপরেই ন্যস্ত করা হয়। একমাত্র ট্রেনিং কেন্দ্রগুলিতে তিনশত ব্রিটিশ শিক্ষক ছাড়া ভারতীয় ফৌজে আর ব্রিটিশ-চিহ্ন ব'লে কিছু নেই। ভারতের সমুদ্রোপকূল, ভারতের আকাশ ও ভারতের স্থলসীমান্ত আজ ভারতীয় সেনা ও কম্যাণ্ডারদিগের সামরিক যোগ্যতা ও প্রতিভার দ্বারা সুরক্ষিত। দীর্ঘ দু'শত বছরের মধ্যে কোনদিনও ভারতীয় সৈনিককে যেসব উন্নত অস্ত্র ও শস্ত্র চর্চার সুযোগ দেওয়া হয়নি, আজ আকস্মিক ভাবে ভারতীয় সৈনিককে সেই সব আয়ুধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছে। ভারতীয় প্যারাসুট বাহিনী অতি দ্রুত গড়ে উঠছে, দ্রুত ট্রেনিং নিয়ে ভারতীয় নৌসেনা আজ এক একটি নতুন ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছে। ভারতীয় বৈমানিক আজ রাডার-বাহিত বিমান নিয়ে ভারতের অন্তরীক্ষে শত্রুবিমানের সন্ধান নিতে প্রস্তুত। রকেটযুক্ত যুদ্ধবিমান নিয়ে ভারতীয় বৈমানিক আজ শত্রুশিবির বিধ্বস্ত করবার যোগ্যতা রাখে।

দেশের মানচিত্র ভাগ ক'রে দেওয়ার কারণে সাম্প্রদায়িক হানাহানির একটা বীভৎস আলোড়ন দেশের শান্তি লুপ্ত ক'রে এনেছিল। দেশের ফৌজ ভাগ কর'লে হানাহানির পালা একেবারে ষোল-আনা পূর্ণ হয়ে উঠবে, সাম্রাজ্যিক কূটনৈতিকেরা অনেকেই এই বিশ্বাসে

খুবই প্রসন্ন হ'য়ে ছিলেন। কিন্তু ভারতীয় ফৌজ সুষ্ঠুভাবে পুনর্গঠিত হয়ে ভারত-বিরোধী রাজনৈতিক সমাজের জল্পনা ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি আজ বিশেষ কৌতূহল নিয়েই লক্ষ্য করছে যে, ১৫ই আগষ্টের পর কয়েকমাসের মধ্যেই স্বাধীন ভারতবর্ষে যে বাহিনী প্রায় আকস্মিক ভাবেই সংগঠিত হয়ে উঠেছে, সেটি হলো এসিয়ার (রুশিয়াকে বাদ দিয়ে) বৃহত্তম বাহিনী।*

স্বাধীনতা লাভের পর জাতির ঐতিহাসিক পটভূমিও বদ্‌লে গেছে এবং জাতীয় প্রয়োজনও বহুদূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু জাতির বিভিন্ন সমাজ ও বিভাগ এই প্রয়োজনের অনুরূপ সাড়া দিয়ে এগিয়ে যায়নি, বরং পিছিয়ে আছে। একমাত্র যে সমাজ জাতির এই নতুন ঐতিহাসিক প্রয়োজনের অনুরূপ বদ্‌লে গিয়ে নতুন মন রুচি আদর্শ সংগঠন নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে, সেই সমাজটি হলো ভারতীয় ফৌজ। ঘটনাটি তাই ধাঁধার মত মনে হয়, যারা পিছিয়ে ছিল তারাই এগিয়ে গেল এবং যারা এগিয়ে ছিল তারা রইল পড়ে।

কৃষক মজুর ও শ্রেণীতত্ত্ব

ভারতবর্ষে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ চলেছে। এই সম্পর্কে অনেক সঙ্ঘ সমিতি সভা ও ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে। যাঁরা এই সব ইউনিয়ন ও সঙ্ঘের উদ্যোক্তা সংগঠয়িতা বা কর্মী তাঁরা নিশ্চয় মনে করেন যে কৃষক ও শ্রমিকের জন্য এই রকম বিশিষ্ট এবং ভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই এই আয়োজন।

ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের এই উদ্যোগ ও সংগঠনের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। উদ্যোক্তারা প্রায় সকলেই অ-কৃষক এবং অ-শ্রমিক।

যাই হোক্, এইসব উদ্যোক্তাদের যদি প্রশ্ন করা যায়—কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য এই ধরণের ভিন্ন সংগঠনের প্রয়োজন কি? সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ (অথবা মঙ্গল) প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে যদি কোন সংগঠন থেকে থাকে বা করা হয়, তার সঙ্গে কৃষক ও শ্রমিকেরাও সামিল হয়ে থাকলে দোষ কোথায়? কি ক্ষতি?

সচরাচর একটি কথা দিয়ে তাঁরা উত্তর দেন—শ্রেণীস্বার্থ। অর্থাৎ কৃষক ও শ্রমিকদের শ্রেণীগত একটা ভিন্ন স্বার্থ আছে। সেইজন্য কৃষক ও শ্রমিক একান্তভাবে এমন কোন একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত হতে পারে না, যার মধ্যে তাদেরই শোষক ব্যক্তি বা দল আছে। একজন শোষক-ব্যক্তির স্বার্থের প্রশ্ন আর একজন শোষিত ব্যক্তির স্বার্থের প্রশ্ন একই সঙ্ঘের প্রকৃতির মধ্যে ঠাঁই পেতে পারে না, কেননা এই উভয় 'স্বার্থ' সহযোগী নয়, প্রতিযোগীও নয়—বলা যায়, পরস্পরবিরোধী।

কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘের উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের যুক্তি আমরা শুনলাম। এরপর, যে সকল প্রশ্ন একে একে আমাদের সম্মুখে আসে, সেগুলি আমরা বিবৃত করি। তারপর বিচার।

প্রশ্নগুলি সবই অতি সাধারণ ও প্রচলিত কতকগুলি কথা নিয়ে। কে শোষক? শোষিত কে? সমাজ কাকে বলি? শ্রেণী (class) কি?

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত প্রত্যেকটি কথার অর্থনৈতিক তাৎপর্যটাই বড়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই সর্ব্বসাধারণের জীবনে যে অবস্থাগত স্তরভেদ ও তারতম্য রয়েছে, এগুলি তারই সংজ্ঞাবাচক শব্দ। কৃষ্টিগত কুল গোত্র বর্ণ জাত ইত্যাদি ভেদ হিসাবে এই সব পর্য্যায় নির্ণীত হয়নি।

* এই রচনার সময়ে লাল চীনের পত্তন হয়নি।

শোষক কে? এই প্রশ্নকে বড় বেশী ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না। অপরের শ্রমের ওপর যিনি নিজে পুষ্ট ও সম্পন্ন হয়ে ওঠেন, তিনিই শোষক। অপরের শ্রমার্জিত সম্পদ যিনি আত্মস্থ করেন তিনিই শোষক। এই হিসাবে আমরা বলি—জমিদার প্রজার শোষক, মিল-মালিক মজুরের শোষক ইত্যাদি।

সমাজ ও রাষ্ট্রের আইনের সাহায্যেই জমিদার প্রজাকে শোষণ করেন, মিল-মালিক মজুরকে শোষণ করেন। সুতরাং এই সঙ্গে আর একটা সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—শোষণ ব্যবস্থা নামে একটা ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। এই ব্যবস্থারই দৈনন্দিন প্রসেস বা ক্রিয়া হিসাবে শোষক এবং শোষিত নিজ নিজ কাজ করে যায়, জীবন যাপন করে।

কৃষক এবং মজুর উভয়েই শোষিত, অতএব উভয়ে কি একই শ্রেণীর? যদি বলা যায় কৃষক ও মজুর উভয়ই একই শ্রেণীর, তবে উভয়ের ভিন্ন সংগঠন হবার প্রয়োজন কি?

উত্তর হতে পারে—এই উভয় শ্রেণীকে শোষণের রীতি ভিন্ন রকমের। সুতরাং দুই ভিন্ন ধরণের শোষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য দুই ভিন্ন ধরণের কর্মপন্থা নিয়ে দুই ভিন্ন সংগঠন প্রয়োজন। এই উত্তর মেনে নেওয়া যাক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি উদাহরণ সামনে দাঁড় করাই :

মহাজনেরা শোষক। মহাজনের দ্বারা যারা শোষিত তারা খাতক। মহাজন দ্বারা খাতকের শোষণের প্রক্রিয়া ও রীতি ভিন্ন ধরণের। সুতরাং 'খাতক' ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজন নেই কেন?

কিন্তু খাতকদের মধ্যে কৃষক ও মজুর উভয়ই আছে। কৃষক একটি শ্রেণী, মজুর একটি শ্রেণী, এবং উভয়ে মিলে খাতক নামে একটি শ্রেণী—তা'হলে কি এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করা উচিৎ? যদি তাই বলা হয়, তবে 'শ্রেণী'র বৈজ্ঞানিক অর্থ আর থাকে না।

এখানে কেউ একটা পাল্টা জবাবও দিতে পারেন ; খাতক-কৃষকের সমস্যা কৃষক-ইউনিয়ন বা সঙ্ঘেরই সমস্যা। খাতক-মজুরের সমস্যা মজুর ইউনিয়নেরই সমস্যা। কৃষক ও মজুরের নানা সমস্যার মধ্যে খাতকতার সমস্যাও একটি। সুতরাং এই সমস্যাকে ভিন্ন করে দেখার প্রয়োজন নেই। কৃষক সঙ্ঘ দেখবে খাতক-কৃষকের দুঃখ দূর করার পথ। মজুর সঙ্ঘ দেখবে খাতক-মজুরের দুঃখ দূর করার পথ।

আবার মেনে নেওয়া গেল, এই যুক্তি সত্য ও সঙ্গত। কিন্তু এই মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি সিদ্ধান্ত আপনা-আপনি সত্য হয়ে ওঠে—ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শোষণ রীতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। খাতকেরা তাই একটি 'শ্রেণী' নয়। খাতকেরা হয় মজুর, নয় কৃষক, অথবা অন্য কিছু।

যদি বলা হয়, যারা অপরকে আর্থিক শোষণ করে তারা একটা শ্রেণী, তাহলে জমিদার মিল-মালিক এবং মহাজন সবাই এক 'শ্রেণী'তে এসে পড়ে। কিন্তু এইভাবে বিচার করাই কি ঠিক? শোষণ রীতির পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণী-স্বরূপ নির্ণয় করা ঠিক নয়?

শোষণ রীতি বা ফর্মের (Form) পার্থক্য কে যদি আমরা আমল না দিই, তাহলে বলতে বাধ্য হব, শোষকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী নেই। শোষক নামে একটি 'সম্প্রদায়' আছে।

হ্যাঁ, এইখানেই অনেক জটিলতা ও অস্পষ্টতা এসে ঢুকেছে। কৃষক ও মজুরের সংগঠক নেতা ও কর্মীদের লেখা, কথা ও বিবৃতির মধ্যে আমরা সচরাচর এই অদ্ভুত অবৈজ্ঞানিক

একটা বিচার দেখতে পাই, তাঁরা একই নিশ্বাসে বলেন 'শোষক সম্প্রদায়' এবং 'শোষিত শ্রেণী'।

'শোষিত জনগণ' অথবা 'শোষিত সম্প্রদায়' কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। এইখানে যদি তাকে চ্যালেঞ্জ করা হয় শোষিত 'সম্প্রদায়' বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই সম্প্রদায়কে নিয়ে একটা সঙ্ঘ হোক না কেন? তিনি তখুনি উত্তর দেবেন—এই শোষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে যে।

তাঁকে আবার প্রশ্ন করুন—কি করে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হলো?

তিনি বলবেন—ভিন্ন ভিন্ন রকমের শোষণের ফলে ও রীতি অনুসারে।

জিজ্ঞাসা করুন তাঁকে—উদাহরণ দিন। তিনি তখনই উদাহরণ দেবেন—কৃষক ও মজুর। প্রশ্ন করুন—তাহলে খাতকেরা কি? একটি ভিন্ন শ্রেণী নয়?

বেচারা কৃষক নেতা বা মজুরকর্মী তখনি তার চিন্তার অপরিচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট কুহেলিকার আড়ালে সরে পড়বেন এবং উত্তর দেবেন—না, খাতকেরা শ্রেণী নয়।

সুতরাং, এঁদের শ্রেণীর সংজ্ঞা আমরা চেষ্টা করেও এঁদের কাছে পাই না। নিজের যুক্তিতে নিজেকে হারিয়ে দিয়ে এঁরা শেষ পর্যন্ত একটা বচন মাত্র আশ্রয় করেন। প্রথমে বলবেন, জমিদার, মিল-মালিক, মহাজন—এরা ভিন্নভিন্ন শ্রেণী। কিন্তু সেই যুক্তিতে কৃষক, মজুর ও খাতক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হলেও এঁরা তা স্বীকার করবেন না। এঁদেব যুক্তি 'কৃষক ও মজুর' পর্য্যন্ত পৌঁছে খাতকের বেলায় পিঠটান দেয়।

তারপরেই বলবেন—শোষকেরা হলো একটি 'সম্প্রদায়', কিন্তু সেই যুক্তিতে শোষিতরা একটি সম্প্রদায়, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।

কেন করেন না?

করেন না এই কারণে যে, তা'হলে শোষিত সম্প্রদায়কে নিয়েই একটা সংগঠন হতে পারে। কিষাণ আর মজুরদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংগঠনেব সার্থকতা বাতিল হয়ে যায়।

এইবার সম্ভবতঃ কোন পেশাদার মজুর-নেতা এগিয়ে এসে উত্তর দেবেন : জীবিকাগত শ্রম হিসাবেই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ গঠন করার জীবিকাব ভিত্তি ও পদ্ধতি ভিন্ন, মজুরের জীবিকার ভিত্তিও প্রয়োজন। কৃষকেব পদ্ধতি ভিন্ন। তাই এই ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘ। অর্থাৎ কৃষকেরা কৃষিজীবী এবং শ্রমিকেরা শ্রমজীবী।

এই ধরণের হাস্যকর ভাষা এবং ব্যাখ্যা, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। সমাজতন্ত্রের বিচারে, এই ধরণের শিথিল এবং লঘু এক একটা বচন নিয়েই মজুর ও কৃষকের মার্কামারা হিতৈষীরা সন্তুষ্ট আছেন। আবার অপরবে বুঝিয়ে বিজ্ঞ করে তোলারও দায়িত্ব এঁরা নিয়েছেন।

কৃষকেবা কৃষিজীবী, এব অর্থ আমরা কি বুঝবো যে কৃষকেরা শ্রমজীবী নয়? কৃষি কি শ্রম নয়? কৃষকেরা কি 'মজুর' নয়? সমাজ-বিজ্ঞানের সূত্রগত অর্থে কৃষক ও মজুরের পার্থক্য কি?

কোন বিজ্ঞ শ্রমিক-নেতা এখুনি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে উত্তর দেবেন—কি যে বলেন মশাই! Rent আর Wage-এর পার্থক্য বোঝেন না? কৃষকরা দেয় Rent আর মজুরেরা পায় Wage; উভয়েব জীবিকার আর্থিক প্যাটার্ন ভিন্ন।

তাঁকে প্রশ্ন করি : তুলনাটা কি রকম হলো? কৃষকেরা দেয় Rent আর মজুরেরা কি

দেয় বলুন? একজন যা 'দিল' আর একজন যা 'পেল' এই দুই ভিন্ন জিনিষকে একসঙ্গে আনছেন কেন? তিনি নিশ্চয় উত্তর দেবেন—মজুরেরা দেয় শ্রম বা লেবর।

আমরাও এইখানে স্বীকার করি, এইবার উত্তরটা ঠিক হয়েছে। সুতরাং আমরা এইবার অনুরোধ করবো শোষিতদের মধ্যে সংগঠনের কাজ এই নীতি হিসাবেই হোক। অর্থাৎ Rent Payers' Union এবং Wage-earners union, খাজনা দিয়ে যে ব্যক্তি (জমিতে) 'শ্রম' করে, এবং যে ব্যক্তি 'শ্রম' করে মজুরী পায়—এই দুই ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের গঠনে পার্থক্য আছে। সুতরাং, যদি 'শ্রেণী' বিচার করতে হয়, তবে এই ভাবেই করা হোক্।

কিন্তু কই, সে ভাবে বিচার তো হয় না। যদি তাই হতো, তবে দেখা যেতো যে, জমিতে শ্রম করে যে মজুরী পায় অর্থাৎ জমি মজুর বা ভূমিহীন কৃষক, তার স্থান হবে শ্রমিক সঙ্ঘে বা লেবর ইউনিয়নে। অপরদিকে, আমরা জানি, অকৃষি শ্রমেও রেণ্ট প্রথা আছে। যেমন একজন রিক্সা কুলি। সে রিক্সা মালিককে দৈনিক বা সাপ্তাহিক একটা নির্দিষ্ট রেণ্ট দিয়ে, তারপর রিক্সা নিয়ে শ্রম করে এবং উপার্জ্জন করে। অতএব এই রিক্সা-কুলির স্থান (রেণ্ট-দাতা) কৃষকদের সঙ্ঘে।

আজকের মজুর-হিতৈষী এবং কৃষক প্রেমিক কর্ম্মী ও নেতার দল আবার অ .ত্তি তুলবেন। এবং মাত্র এই একটি যুক্তি দিয়ে আমাদের থামিয়ে দেবেন—কৃষক হলো কৃষক আর মজুর হলো মজুর। ব্যস, দুই ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন চাই।

আমরাও স্বীকার করবো, হ্যাঁ, এই যুক্তি ছাড়া তাঁদের আর কোন যুক্তি নেই। সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে বা অর্থনৈতিক প্রকৃতি বিচারে তাঁরা কৃষক ও মজুরের সংজ্ঞা পরিষ্কার করে বুঝে নেননি। তাঁরা নিতান্ত স্থূল অর্থে কৃষক ও মজুর নামে দুই শ্রেণী ভাগ করে নিয়েছেন। অর্থাৎ—(১) যারা জমিতে কায়িক শ্রম করে এবং (২) যারা জমি ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে কায়িক শ্রম করে। উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে কায়িক শ্রমের যোগাযোগ বা সম্বন্ধটা কি ধরণের সেই দিক দিয়ে পার্থক্য নির্ণয় করে তাঁরা কৃষক ও মজুরকে বিচার করেন নি।

বেশ, তাঁরা যাকে ক্ষেত্র বলছেন, সেই ক্ষেত্রেই এসে আমরা এবার সওয়াল করি।

কৃষিজীবী বা কৃষক অর্থই কি একটা শোষিত সম্প্রদায়? ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ বিত্তশালী শোষক কৃষিজীবী যে আছেন, সেই বাস্তব সত্যকে এড়ানো যায় কি করে? অর্থনৈতিক দিক দিয়ে, নানা রকম কৃষক আছেন। (১) যিনি নিজের জমিতে চাষবাস করে বেশ দু'পয়সা করেছেন, অর্থাৎ স্বচ্ছল সত্যিকারের কৃষক। (২) যিনি নিজের জমিতে চাষ করেও দুঃস্থ হয়ে আছেন, (৩) যিনি নিজের জমিতে মজুর লাগিয়ে শস্য উৎপাদন করেন, (৪) যিনি নিজের জমিকে অপরের কাছে ঠিকা বাটাই বা বর্গা দিয়ে উৎপাদন ফসলের ভাগ গ্রহণ করেন এবং (৫) ভূমিহীন কৃষিমজুর।

জমিদারীর প্রদেশে, অথবা রায়তবারী প্রদেশে, উভয়ত্ত কৃষিজীবীরা এই কয়েকটি পর্য্যায়ে বিভক্ত।

উক্ত ৩নং প্রথাটি মূলতঃ ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বা Capitalist প্রথা। ৪ নং প্রথাটি হলো জমিদারী বা সাবেকী য়ুরোপের ফিউডাল প্রথা। রায়তবারী প্রদেশে যেখানে নামে জমিদারী নেই, সেখানে কাজে জমিদারগিরি আছে। অর্থাৎ একজন কৃষক তার নিজস্ব জমি অপরের কাছে বর্গা বা বাটাই দেয়।

এইবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা যাক— আমাদের দেশে কৃষক সঙ্ঘগুলির মধ্যে কোন ধরণের কৃষকের স্থান ? এগুলি কি কৃষক-সাধারণের সঙ্ঘ? যদি তাই হয়, তবে বুঝতে হবে, এর মধ্যে শোষক এবং শোষিত একসঙ্গে এসে ভীড় করেছে।

এবং, আমরা জানি বর্ত্তমান কৃষক সঙ্ঘগুলি এই রকম মাত্র ভূমিজীবী লোকের সঙ্ঘ। যে নিয়মে কৃষক সঙ্ঘে ৪ নম্বরের কৃষক স্থান পেয়েছে, সেই নিয়মে এর মধ্যে জমিদারদেরও স্থান হতে পারে। শুধু জমিদার কেন? ৩ নম্বরের কৃষকেরা যে সঙ্ঘে আছে সেই সঙ্ঘে তাদেরই অর্থনৈতিক মাসতুতো ভাই চা-করেরাও (Tea Planters) থাকতে পারেন।

পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে কৃষকেরাও মজুর। একদল কৃষক মাত্র কায়িক শ্রম অর্থে মজুর। আর একদল কৃষক অর্থনৈতিক অর্থে মজুর—তারা শ্রম বিক্রয় করে।

কিন্তু আর একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো—ভারতের মজুরেরাও কৃষকবর্গের মানুষ। অর্থাৎ গ্রামের মানুষ। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে ভারতের মজুরেরা সামাজিক ভাবে গ্রাম সংস্কৃতির মানুষ।

প্রকৃতিতে তারা পূর্ব্বলিখিত কৃষক সমাজের ১ থেকে ৫ নং পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ের মানুষ। বিশেষ করে কারখানার মজুরদের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। হুইটলি রিপোর্ট অর্থাৎ 'Royal Commission on Labour' এর সিদ্ধান্ত ও তথ্যগুলির মধ্যে আমরা এর সমর্থন পাই। ঐ রিপোর্টের কয়েকটি কথা ও মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

(১) ভারতের সহর ও কারখানার মজুরেরা প্রধানতঃ গ্রামের লোক। য়ুরোপের মজুরের মত তারা সহরজাত মানুষ নয়।

(২) ভারতের মজুরেরা কিছুদিনের জন্য সহরে ও কারখানার কাজ করে। তারপর স্বগ্রামে ফিরে যায়।

(৩) মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে অথবা মনেপ্রাণে কারখানার মজুরেরা গ্রামবাসী।

(৪) মজুরদের কিছু অংশ কৃষিজীবী।

(৫) ভারতীয় কারখানা মজুরের সামাজিক সত্তার ভিত্তি (Social root) গ্রামের মধ্যেই নিহিত।

(৬) জীবিকাভ্রষ্ট গ্রাম্য কারিগর ও কৃষকেরাই অধিকাংশ সহরের কারখানার মজুর। হুইটলি রিপোর্টে আর একটি মন্তব্য আছে : Our considered opinion is that, in present circumstances, the link with the village is a distinct asset and that the general aim should be, not to undermine it, but to encourage it and as far as possible, to regularise it.

হুইটলি রিপোর্টে তথ্য ও মন্তব্যর মধ্যে এই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে যে, ভারতের কারখানার ও সহরের মজুরেরা এখনো একটি 'ক্লাস' হিসাবে পরিণত হয়নি। আজ কৃষক, এক বছর পরে কারখানার মজুর এবং চার বছর পরে আবার কৃষক বা গ্রামবাসী—এই হলো কারখানা মজুরের জীবিকা অর্থনৈতিক জীবনের প্রকৃতি। কারখানা মজুরের সমাজ আজও গ্রাম-সমাজ। যদি তাকে শ্রেণী বলা হয়, তবে সে গ্রাম্য শ্রেণী মাত্র। তার মনস্তত্ত্ব, উৎসব, রুচি, পরিবার প্রীতি, ভূমিস্নেহ, সমাজের সংযোগ, শেষ জীবনের আশ্রয়—সবই গ্রামের মধ্যে নিহিত। সে কৃষক সংস্কৃতির মানুষ। ভারতের কারখানা মজুরের মধ্যে

শ্রেণীবোধ আছে বলার অর্থ জোর করে একটা মূঢ়তাকে ঘোষণা করা। সে মেশিনকে ও কারখানাকে ঘৃণা করে। সে জমিকে ভালোবাসে।

অতএব, কি হওয়া উচিৎ ছিল? উচিৎ ছিল মজুর সম্প্রদায়কে এবং কৃষক সম্প্রদায়কে একই সংগঠনের মধ্যে সমাবেশ করা। ভারতের কারখানা মজুরের ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক বৈষয়িক স্বরূপ হলো তার কৃষকত্ব। সে কৃষক সমাজের মানুষ।

কৃষক ও মজুরের মধ্যে অর্থনৈতিক লক্ষণ অনুসারে একটা স্পষ্ট পার্থক্যের দাঁড়ি টানা যায় না। চিত্তের পার্থক্য দিয়ে, কৃষ্টির পার্থক্য দিয়ে, শিক্ষার পার্থক্য দিয়ে, কোনভাবেই কৃষি ও মজুরকে দু'টি বিশিষ্ট বিভাগে ভাগ করা যায়না। তাছাড়া, যদি শুধু হাতের লাঙ্গল দেখেই কৃষক আখ্যা দিতে হয়, তবে বহু আধুনিক জনক রাজা কৃষকের পর্যায়ে ঢুকে পড়বেন। কিম্বা হাতের হাতুড়ি দেখেই যদি মজুর চিনতে হয়, তবে বহু ময়দানবকে মজুর বলে ভুল হবে।

তাছাড়া কয়েক কোটি ভারতবাসী আছেন, যাঁরা প্রতিদিনের জীবনেই অর্দ্ধেক কৃষক এবং অর্দ্ধেক মজুর।

আমরা সচরাচর একটা কথা শুনে থাকি—'চা বাগানের শ্রমিক'। চা বাগানের শ্রমিককে আমরা লেবারার কুলি বা মজুর বলে ডাকি। অন্ততঃ এই একটা ক্ষেত্রে দেখি, মজুরের সংজ্ঞা সম্বন্ধে ভুল করা হয়নি। মজুরীর বিনিময়ে কৃষিঘটিত কাজ করে, তাই চা বাগানের শ্রমিকেরা 'মজুর' হয়েছে, কৃষক হয়নি।

কিন্তু আর এক ক্ষেত্রে আমাদের ভাষার মধ্যে সংজ্ঞাগত ভুল হয়ে থাকে—'ভূমিহীন কৃষক' কথাটার মধ্যে। মজুরীর বিনিময়ে কৃষিঘটিত কাজ করে এরা, তবু এদের 'কৃষক' আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে এবং কৃষক সঙ্ঘের কর্ত্তারা এদের অভিভাবকত্ব করবার জন্য এগিয়ে আসেন।

কারখানার শ্রমিকদের সঙ্ঘেও নিতান্ত শ্রমিক ছাড়া, ফোরম্যান, টাণ্ডেল, মিস্ত্রী, সর্দ্দার ইত্যাদি ব্যক্তিরা স্থান পায়। কারখানার সমগ্র কাজের মধ্যে এই শেষোক্ত ধরণের ব্যক্তিদের কাজ হলো শ্রমিকদের ওপর শোষণের কাজ করা। অর্থাৎ এদের ভূমিকা শোষকের ভূমিকা। এরা শুধু সাপ্তাহিক বা মাসিক বেতন নিয়ে নয়, কমিশন প্রথায় এবং কন্ট্রাক্ট প্রথায় শ্রমিকদের ওপর এমন এক ধরণের প্রভুত্ব করেন, যার প্রকৃতি হলো শোষণ অর্থাৎ শ্রমিকদের ন্যায়ার্জিত প্রাপ্যের একটা অংশ এঁরা আত্মসাৎ করেন। কারখানা জীবন যাদের অর্থনৈতিক সত্তা শোষকরূপে প্রতিষ্ঠিত, তারাও মজুর ইউনিয়নে স্থান পায় এবং 'একই স্বার্থে'র জন্য মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে নাকি লড়াই করে।

এখানে আমরা আবার এক ধরণের শ্রেণীতত্ত্বের ব্যাখ্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াই। অনেকে বলবেন, মজুর ইউনিয়নের নেতারা বলে থাকেন, মার্ক্সের ব্যাখ্যা তুলেও অনেকে বলে থাকেন যে middle class বা মধ্য শ্রেণী নামে একটা শ্রেণী আছে। এই মধ্য শ্রেণীর কাজ হলো শোষণ ব্যবস্থার মধ্যে শোষকের পক্ষে দালালের কাজ করা। অর্থাৎ সে স্বয়ং শোষক নয়, শোষকের এজেন্ট।

যদি তাই হয়, তবে তারা শোষিত শ্রমিক সাধারণের ইউনিয়নে স্থান পায় কেন? এরা তো ভিন্ন শ্রেণীর লোক।

মধ্য শ্রেণীকে আবার অদ্ভুত একটা কথা দিয়ে প্রায়ই সংজ্ঞাত করা হয়—মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা সম্প্রদায়।

এই স্থথ সংজ্ঞা প্রমাণ করে যে শ্রেণী বা সম্প্রদায় ইত্যাদি কথাগুলির কোন বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য বক্তাদের উপলব্ধির মধ্যে নেই। কারণ—(১) মধ্যবিত্ত মাত্র মধ্যশ্রেণীর কাজ করে না (২) মধ্যশ্রেণীর বহু ব্যক্তি আছে যাঁরা বিত্ত হিসাবে শোষিতের চেয়েও নীচু।

একজন সৈনিক বা কেরাণী শোষকের এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণীর মানুষ। বিত্ত হিসাবে সে বহু মজুরের ও চাষীর চেয়ে নিকৃষ্ট এবং গরীব হতে পারে। কিন্তু তার অর্থনৈতিক ভূমিকা হলো শোষকের পক্ষে দালালি।

এইবার অনুমান করা যাক্ শোষণ ব্যবস্থার কাঠামোটা এই রকমের—প্রথম শোষক শ্রেণী, মাঝখানে তাদের এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণী এবং তারপর সবার অধম শোষিত শ্রেণী।

কিন্তু সত্যিই কি শোষণ ব্যবস্থার প্যাটার্নটা এই ধরণের তিনটি সুস্পষ্ট ডিপার্টমেন্ট বা ক্রমিক স্তরে ভাগ করা?

না মোটেই নয়। মধ্যশ্রেণী নামে একটা বিশিষ্ট পর্যায় আমরা দেখি না। মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই উর্দ্ধতন থেকে অধস্তন স্তর পর পর নেমে গেছে। মধ্যশ্রেণীর মানুষ স্বয়ং নিজে শোষিত; সে তার নীচের একটা দলকে শোষণ করে। এইভাবে এজেন্ট বা মধ্যশ্রেণীর মধ্যে একটা স্তর বিন্যাস আছে। ব্যবস্থাটা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। সর্বোচ্চ শোষক মালিক এবং সর্ব্বনিম্ন শোষিত শ্রমিকের মাঝখানে অনেকগুলি মধ্যশ্রেণী রয়েছে। এদের ওপর শোষণ কার্য্যের বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত আছে। বেতনরূপে বা মুনাফার অংশ রূপে এরা 'দালালি' পেয়ে থাকে।

শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রকেই ভুল করে মধ্যশ্রেণীর মানুষ বলা হয়ে থাকে। শিক্ষিত ভদ্রলোক অর্থাৎ বুদ্ধিশ্রমজীবীদের মধ্যে দুই ভিন্ন অর্থনৈতিক সত্তার মানুষ আছে। সমাজতন্ত্রের নিয়মে এরা দুই শ্রেণী—(ক) প্রথম হলো, যাঁরা বুদ্ধি শ্রম দিয়ে শোষকের পক্ষে দালালি করেন। এঁরা প্রকৃত মধ্যশ্রেণী (Middle class)। (খ) দ্বিতীয় যারা বুদ্ধিশ্রম দিয়ে নিছক একটা খাটুনি বা job খাটেন। বুদ্ধিশ্রমকে যদি 'শ্রম' বলতে বাধা না থাকে, তবে এঁরাও শ্রমিক, দৈনিক ৮/১০ ঘণ্টা ধরাবাঁধা নিয়মে এরা খাতা লেখেন, টাইপ করেন, হিসাব রাখেন।

বুদ্ধিশ্রম এবং কায়িক শ্রমকে অর্থনৈতিক বিচারে দুটি ভিন্ন বিষয় বলে মনে করা যায় কি? এই দুই শ্রমকে শোষণের রীতি নীতি ও প্রকৃতি কি ভিন্ন রকমের?

না, তা নয়। একই প্রসেস, একই পরিণাম, একই দুঃখ দাহনের ও অনাচারের সৃষ্টি এবং মনুষ্যত্ব খর্ব করার আয়োজন।

যদি প্রস্তাব করা যায় যে,—এক একটি জীবিকা হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হওয়া উচিৎ; প্রস্তাব করার দরকার নেই, বর্ত্তমানে আমরা দেখতে পাই, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এই ভাবে এক একটি জীবিকার ভিত্তিতে গঠিত। যথা রিক্সাচালক ইউনিয়ন, ক্ষৌরকার ইউনিয়ন, পাচক ইউনিয়ন, ভৃত্য ইউনিয়ন, দোকান-কর্ম্মচারী ইউনিয়ন, পোষ্টাল কেরাণী ইউনিয়ন ইত্যাদি।

কিন্তু এর মধ্যে এক স্বার্থের সূত্র কোথায়? কেরাণী ইউনিয়ন এবং ভৃত্য ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধের সম্পর্কটা বড়। ভৃত্যরা কেরাণীকে তাদের শোষক মনে করে। জীবিকা হিসাবে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি তাই এক একটি 'শ্রেণী'গত ইউনিয়ন বলা যায় না। যদি তাই বলা হয়, তবে বলতে হবে প্রত্যেক 'জীবিকা'ই এক একটি ভিন্ন শ্রেণীর ভিত্তি এবং

ভারতবর্ষে তাহলে কয়েক হাজার শ্রেণী আছে।

বলা বাহুল্য সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে এইভাবে 'শ্রেণী'কে সংজ্ঞাত করা হয়নি। এইভাবে বললে 'শ্রেণী'র কোন অর্থনৈতিক পরিচয় থাকে না।

ভারতবর্ষের মতো পররাষ্ট্র-শাসিত ঔপনিবেশিক দেশের মনুষ্যসমাজে মধ্যশ্রেণী অনেক আছে।

এখন প্রশ্ন, এই মধ্যশ্রেণীর প্রথম বর্গে কারা আছেন? ভারতীয় পুঁজিপতিরা কি মধ্যশ্রেণী? ভারতের শোষণ ব্যবস্থার প্রথম বর্গের শোষক কারা?

ভারতীয় পুঁজিপতিরা কোটীপতি হতে পারেন। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক— ঐতিহাসিক ভূমিকাটি কি?

আমাদের অবশ্যই বলতে হয়, এঁরা মধ্যশ্রেণী।

ভারতের শোষণ ব্যবস্থার মূল গুণ ধর্ম্ম ও প্যাটান হলো সাম্রাজ্যবাদী। এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থা যাঁরা চালু রাখছেন, তাঁরা সেইভাবে ভারতের রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে গড়ে নিয়েছেন। এই State বা রাষ্ট্রিক অধিকার যাঁদের হাতে, তাঁদের মধ্যে আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের স্থান নেই। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা ঐ রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার কর্ত্তাস্থানীয় নন। তাঁরা অনুগত আজ্ঞাবাহক, সুবিধা প্রাপ্ত একটি দল, রাষ্ট্রিক কর্ত্তৃপক্ষের কাছে দাবী দাওয়া করে কতগুলি সুবিধা আদায় করেন মাত্র। অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বড় বড় দায়িত্বগুলি এঁরা গ্রহণ করেন। এঁরা রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন শোষক নন। এঁরা নিছক এজেন্ট, Middle class মাত্র। ইংলণ্ডে যে অর্থে কোন ভদ্রলোক একজন ক্যাপিটালিষ্ট, এঁরা অর্থাৎ ভারতীয় পুঁজিপতিরা সেই অর্থে সাব-ক্যাপিটালিষ্ট। ভারতবর্ষের মত পরাধীন ঔপনিবেশিক অবস্থার দেশে প্রধান ও প্রথম শোষক হলেন তাঁরাই যাঁরা এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষ ও নিয়ন্তা। ভারতের 'দেশী রাজা' এবং জমিদার উভয়েই মধ্যশ্রেণী বা দালাল মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের রক্ষণাবেক্ষণে ও মুরুব্বিয়ানার আশ্রয়ে এঁদের উৎপত্তি ও স্থিতি। এঁরাও অনুভব করেন যে এঁদেরও শোষক আছে। এঁদের উপর অন্যায় করা হয়। এঁদের ওপরও আর্থিক বা সামাজিক অবিচার করা হয়।

এই পর্য্যন্ত প্রসঙ্গক্রমে আমরা যে সব বিষয় আলোচনা করলাম, তার মধ্যে একটা সত্যের ইঙ্গিত এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব ফুটে উঠেছে। এই বিষয়টিকে আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। পরাধীন ঔপনিবেশিক দেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদের প্রভাবে সমাজ ঠিক শ্রেণীগত শোষণের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে না। অবস্থার পরিণাম ও অবনতি আরও খারাপ এবং আর এক 'শ্রেণীকে' শোষণ করছে— ব্যাপারটা এত স্পষ্টাস্পষ্টি ও কাটাছাঁটা নয়। এ হেন দেশের সমাজে যে ভাঙ্গন দেখা দেয়, সে ভাঙ্গন ষোল-আনা ভাঙ্গন। শ্রেণীবদ্ধতা বা শ্রেণীচেতনা নামে কোন সু-সংস্কারের সৃষ্টির আশাও এর মধ্যে নেই। সমাজ নিতান্ত কয়েক কোটী ব্যক্তি হিসাবে চূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে, এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির শোষক। যে নিজে শোষিত, সে-ই আবার অপরের শোষক।

বাংলা ভাষায় 'সর্ব্বহারা' নামে একটা কাব্যিক কথা দিয়ে যে কি বোঝায়, তা আমাদের বোধগম্য হয় না। এদেশে each against each—সমগ্র শোষণ ব্যবস্থা অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এই ভিত্তির ওপর রয়েছে।

এবং এদেশেরই শ্রমিক ও কৃষক সঙ্ঘের সংগঠন ও রীতিনীতির মধ্যে এই বাস্তব

ঐতিহাসিক উপলব্ধির কোন স্বীকৃতি দেখতে পাই না। উদ্যোক্তারা পশ্চিমী শাস্ত্র থেকে বেছে বেছে কতগুলি কথা গ্রহণ করেছেন এবং পশ্চিমী আন্দোলনের পদ্ধতিগুলিকে হুবহু কেতাবী ধরণের অনুকরণ করছেন। ফলে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি প্রকৃতপক্ষে এক একটা সালিসী বোর্ড মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে বিতণ্ডা করে একটু মজুরী বৃদ্ধি করিয়ে দিতে পারলেই কাজ ফুরিয়ে গেল। শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মত শিক্ষা দীক্ষা প্রচারের এবং দেশ-জাতির-সমাজবোধ জাগ্রত করার কোন চেষ্টা শ্রমিক ও কৃষক নেতারা করেন না। নিছক একটা স্বার্থবাদের আদর্শ প্রচার করা হয়। 'শ্রেণী' বা 'সমাজ' বলতে কোন বৈজ্ঞানিক ধারণার প্রতি উদ্যোক্তাদের শ্রদ্ধা নেই।

'But a wide colonial policy has led to the European proleterial party falling into such a position that the whole of Society does not exist by its labour, but by the 'labour of the almost enslaved colonial slaves' (Lenin) অন্ততঃ লেনিনের মত মনস্বীর কথায় আস্থা রেখে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে য়ুরোপের সমগ্র সমাজ এবং সেখানকার 'সর্বহারা'র দলও আমাদের শোষক।

এই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ভারতীয় আন্দোলনের রূপ কি ধরণের হওয়া উচিৎ? 'শ্রেণী' বলে কোন জিনিষ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি। আমাদের সমাজে এখনও আমরা মার্ক্সকথিত অর্থনৈতিক 'শ্রেণী' পাইনি। জীবিকা হিসাবে এবং সম্প্রদায় হিসাবে সংগঠন হতে পারে এবং সেইভাবেই হয়েছে। কিন্তু এই সংগঠনের মধ্যেই গলদ রয়ে গেছে। এই ধরণের সঙ্ঘ 'এক লক্ষ্য' বা 'এক স্বার্থ' প্রণোদিত হতে পারে না। এর লক্ষ্য হবে—'Room after Room', We hunt the house through'। খণ্ড খণ্ড ভাবে স্বার্থ রক্ষার আয়োজনে পরস্পর বিরোধের দিকটাই প্রবল হয় এবং মূল লক্ষ্য পণ্ড হয়।

আমাদের সমাজ কয়েক কোটি 'ব্যক্তি'তে পরিণত হয়েছে। শ্রেণীগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থরক্ষার মত ঐক্যবোধও নেই। জীবনের পদ্ধতিও সেই রকমের নেই। এই বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে, সকল সংগঠনের আয়োজনকে চালিত করা উচিত। আমাদের বর্তমান কৃষক মজুর ও 'জীবিকাগত সঙ্ঘগুলির' রীতিনীতি প্রকৃতির মধ্যে একটা গলদ রয়ে গেছে। সর্বাগ্রে এই গলদ পরিহার করে, নতুন ভাবে সংগঠনের রূপ দিতে হবে।

প্রজাতন্ত্র ভারতের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনা হলো ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। সেই স্বাধীন ভারতই আজ থেকে দু'বছর আগের এক ছাব্বিশে জানুয়ারীতে তার রাষ্ট্রীয় কায়া প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ক'রে বিংশ শতাব্দীর রাজনীতিক ইতিহাসেই এক নতুন পরিণামের সূচনা করেছে। এই প্রজাতন্ত্রে পৃথিবীর ছত্রিশ কোটি মানুষের পরিণাম গঠনের এক নতুন অধ্যায় আহ্বান করে বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক জগতের রীতি-নীতি ও আদর্শে এক বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা জাগ্রত করেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়েছে।

দুই মহাযুদ্ধের উৎপীড়নে জর্জরিত বিংশ শতকের প্রথমার্ধ তার অন্তিমে বিশ্ব-রাজনীতিতে বোধ হয় এই একটিমাত্র অথবা শ্রেষ্ঠ মাঙ্গলিক উপহার রেখে দিয়ে বিদায়

নিয়েছে—ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের আরম্ভে পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রথম, বৃহত্তম এবং সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক গুরুত্বে পরিপূর্ণ যে ঘটনাকে দেখা যায়, সেই ঘটনা হলো ভারতের প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসেই প্রথম যে অভিনবত্বের উদাহরণ ভারতের এই প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সত্য হয়ে উঠলো, সেই কথাই আজ সবার আগে মনে পড়ে। পৃথিবীর তথা মানুষজাতির ইতিহাসেই প্রাচীনতম সভ্যতার দেশ বলতে যে কয়টি দেশকে বুঝায়, ভারত তাদের অন্যতম। মিশর, গ্রীস, মেসোপটেমিয়া ও ভারত, সভ্যতার প্রাচীনতম আধারভূমি হলো এই কয়টা দেশ। চীনের সভ্যতা বয়সে প্রাচীন হলেও এত প্রাচীন নয়। লক্ষ্য করার বিষয়, একমাত্র ভারত ও চীন ছাড়া আর কোন দেশে প্রাচীন সভ্যতার রূপ আর জনজীবনে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ফ্যারোয়ার মিশর হেলেনিক গ্রীস আর সুমেরীয় মেসোপটেমিয়ার মৃত্যু হয়ে গেছে অনেক কাল আগেই। আজকের মিশর গ্রীস ও মেসোপটেমিয়া সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা ও নতুন সংস্কৃতির দেশ। কিন্তু ভারতের জনজীবনে তার প্রাচীন সভ্যতারই রূপ আজও সজীব। ভাষা ধর্ম শিল্প সাহিত্য আচার সংস্কার ও রীতি-নীতির চার হাজার বছরের ঐতিহ্য আজও ভারতের জনজীবনে জাগ্রত রয়েছে। এ হেন প্রাচীনতম সভ্যতাবই এক দেশ এবং ছত্রিশ কোটি মানুষ তার চার সহস্রাধিক বৎসরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত থেকেও আধুনিকতম গণতন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সভ্যতারই ইতিহাসে এক নতুন পরীক্ষার সূত্রপাত হয়েছে বলা যায়। সভ্যতায় পৃথিবীর প্রাচীনতম এক মানবসমাজে এই প্রথম আধুনিকতম গণতন্ত্রে তার সমাজজীবন এবং রাষ্ট্রিক জীবন গঠনের সাধনা গ্রহণ করলো। প্রাচীন অতি নূতনের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে, এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন জাতির ইতিহাসে দেখা যায় নি। আধুনিক প্রজাতন্ত্রবাদ আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতারই সৃষ্টি। সুতরাং ভারতের প্রজাতন্ত্র যেন যুগ সমন্বয়েরই এক অভূতপূর্ব ঘটনার উদাহরণ। বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, যদি বলা যায় যে, প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভারত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যগরিমার স্তাবক সেই কিপলিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিয়েছে। 'Twain shall never meet'—পূর্ব হলো পূর্ব, এবং পশ্চিম হলো পশ্চিম। এই দুই বিপরীতের মধ্যে কখনই মিলন সম্ভব নয়। কিন্তু প্রাচ্যভূমির ভারত পাশ্চাত্যভূমির প্রতিভা প্রসূত রাজনীতিক গঠনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ রীতি তার রাষ্ট্রিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে এই সত্য প্রমাণিত করেছে যে, পূর্ব ও পশ্চিমের ঐতিহ্যের স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর মিলন সম্ভবপর। গণতন্ত্রের আদর্শ অতীতের ভারতের নিতান্ত অকল্পিত অথবা অপরিচিত ছিল না। শুক্র নীতিসারে বর্ণিত শাসন সংবিধানে, সমষ্টির ইচ্ছার অধিকার বিচার প্রণালী নির্বাচন প্রথা, শ্রম সমবায়, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি বহু এবং বিবিধ বিষয়ের মধ্যে প্রাচীন ভারতের যে চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, সে চিন্তা প্রজাসাধারণের অধিকারের তথা গণতন্ত্রেরই মর্যাদার স্বীকৃতি। ভারতের গ্রাম জনপদের অর্থনীতিক জীবনে এবং বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর জীবনে পঞ্চায়েত নামক শাসন রীতির যে নিদর্শন আজও দেখা যায়, তাকেও প্রাচীনকালের গ্রামীণ গণতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ বলা যায়। কিন্তু আধুনিক কালের প্রজাতন্ত্রের মত উন্নত ও সুপরিণত কোন রাষ্ট্রিক আদর্শ কোন কালে অতীতের ভারতের সমগ্র রাজনীতিক ও সামাজিক জীবনে সত্য হয়ে উঠেছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আধুনিক পশ্চিমেরই রাজনীতিক জীবনের বহু ঘটনা ও পরীক্ষার অভিজ্ঞতা হতে এই প্রজাতন্ত্রের আদর্শ উদ্ভাবিত হয়েছে।

ভারতের ঐতিহাসিক গৌরব এই যে এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতই সর্বপ্রথম এই রাষ্ট্রিক আদর্শ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমান চীন এবং এশিয়ার সোভিয়েট অঞ্চলেও 'যথার্থ' গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে ঐ দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ দাবী ক'রে থাকেন।

তাঁদের চিন্তা ও রুচি অনুযায়ী হয়তো চীন ও রুশীর গণতন্ত্রই যথার্থ গণতন্ত্র।

কিন্তু সে গণতন্ত্রে প্রজার ইচ্ছা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধির দ্বারা দেশের সরকার গঠনের কোন নিয়ম নেই, প্রজার সেই অধিকারও নেই, এবং একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ছাড়া নির্বাচন করবার মত দ্বিতীয় কোন দলের অস্তিত্বও নেই। সরকারী কোন কাজের সমালোচনা করার অধিকার জনসাধারণের নেই। এই ধরণের 'যথার্থ' গণতন্ত্র নয়, ভারত সাধারণ ও সহজ অর্থের গণতন্ত্রই গ্রহণ করেছে। এই গণতন্ত্রের সংবিধানে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও মার্কিনে প্রচলিত সংবিধানের যদিও অনুরূপ, কিন্তু হুবহু প্রতিরূপ নয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে এবং অবাধ ইচ্ছায় ও বিবেচনায় বহু দলের বহু ব্যক্তির ভেতর থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গই জনপ্রতিনিধি হয়ে বিরাট ভারত রাষ্ট্রের শাসনিক পরিচালক মণ্ডলী গঠন করে থাকেন। এই প্রজাতন্ত্র এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ভারতই গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতন্ত্র হলো ভারত, কারণ কোন গণতন্ত্রের দেশে ভারতের মত ছত্রিশ কোটি মানুষ এবং আঠার কোটি ভোটাধিকারী নেই।

ভারত প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাবের ইতিহাসও পৃথিবীর রাজনীতিক ক্ষেত্রে এক নৈতিক পরীক্ষার প্রথম সাফল্যের ইতিহাস। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রামের ফলেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। পৃথিবী জানে গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেস এক অভিনব পন্থায় সংগ্রাম করেছে। শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস পন্থা। জাতীয় কংগ্রেস যদিও পন্থা হিসাবে পূর্ণ অহিংসাকে তার গঠনতন্ত্রে স্থান দেন নি, কিন্তু সংগ্রাম আন্দোলনের সময় বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করে কংগ্রেস গান্ধীজীকেই সংগ্রামের পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করতেন, এবং গান্ধীজী তাঁর নিজের বিবেকসম্মত সেই অহিংস পন্থার মর্যাদা সংগ্রামের উত্তেজনায় সব সময় রাখতে পারেন নি।

কিন্তু এটা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য যে, মোটামুটিভাবে দেশের মানুষ গান্ধীর নেতৃত্বে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বে এবং অহিংস পন্থার সংগ্রাম করেছে। পৃথিবী অন্ততঃ এইটুকু দেখে বিস্মিত হয়েছে যে গান্ধীর নেতৃত্বে নিরস্ত্র ভারতবাসী এক সশস্ত্র সাম্রাজ্যিক বিরুদ্ধে লড়ছে। এবং লড়তে গিয়ে হাজারো হাজারো প্রাণ দিয়েছে।

কোথাও কোথাও, এবং কখনো কখনো হিংসার ঘটনা হয়ে থাকলেও* কংগ্রেস পরিচালিত সংগ্রাম কবে স্বাধীনতা লাভ করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতই তার একমাত্র সার্থক দৃষ্টান্ত। জীবন দর্শনের এক আদর্শগত সম্প্রীতি এইভাবে ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সফলতা লাভ করায় আন্তর্জাতিক মনস্তত্ত্বের এক শুভ রূপান্তরের ঐতিহাসিক সম্ভাবনা এখন আর নিতান্ত দুরাশা বলে কেউ মনে করবে না। বরং, এই ঘটনা আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীকে যে নতুন এক নৈতিক প্রেরণায় অহিংস পন্থার যৌক্তিকতা, শ্রেষ্ঠতা এবং মূল্যবোধ অনুপ্রাণিত করবে, এমন আশা বিশ্ববাসীর মনে এখন বাস্তবোচিত আশা বলেই মর্যাদা লাভ করতে সুরু করেছে। আন্তর্জাতিক মানসগগনে অবশ্য এই আশা

* ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলন, বিপ্লবীদের ভূমিকা ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অহিংস দেশপ্রেমের অবদান অনস্বীকার্য।

এখন অস্পষ্ট উষালোকের মত মাত্র দেখা দিয়েছে। কিন্তু কালক্রমে এই প্রথম আলোকাভাস যে পূর্ণ অরুণোদয়ের রূপ নিয়ে দেখা দেবে, মানুষের ইতিহাস এই আশাবাদ পোষণের এক ঐতিহাসিক অবলম্বন লাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের পথে নৈতিক শক্তির প্রতিষ্ঠারই প্রথম সার্থক দিগ্‌চিহ্ন।

ভারত যদি স্বাধীন না হতো, এবং প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত না হতো, তা হ'লে বর্তমানে বিশ্ববাসীর এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই শাসক সমাজের মনে শান্তির আগ্রহ এতটা স্পষ্টভাবে জাগ্রত এবং অভিব্যক্ত হতে পারতো কি না সন্দেহ। লেক সাকসেসে রাষ্ট্রপুঞ্জের আলোচনা-আসরের তর্ক তত্ত্বের মধ্যেও উষ্মা ও বিরোধ প্রবণতার যথেষ্ট চাঞ্চল্য থাকলেও তার অন্তরালে শান্তিবাদিতারই এক প্রচ্ছন্ন অথবা অস্পষ্ট রূপ লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের অন্যতম সদস্য স্বাধীন ভারত তার একটিমাত্র ভোটের শক্তিতেই ষাটটি রাষ্ট্রের মনোভাব প্রভাবিত করেছে, এটা নিশ্চয়ই সত্য নয়। সত্য হলো ভারত রাষ্ট্রের নৈতিক প্রভাব, এবং এই প্রভাব কখনই সত্য হয়ে উঠতে পারতো না, যদি স্বাধীন ভারত আজ কোন বিশেষ প্রকারের টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহণ করতো। প্রজাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ভারতই শান্তিপূর্ণ পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব এবং যুদ্ধবিরোধী মনোভাব তথা শান্তিবাদ আন্তর্জাতিক মতদ্বন্দ্বের আসরেও একটা মহৎ আদর্শরূপে উপস্থিত করবার এবং তার প্রতি রাষ্ট্রসমূহকে সচেতন করবার দায়িত্ব পালন করতে পারছে।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অলিখিত গঠনতন্ত্রও পরিবর্তিত হয়ে গেছে ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক প্রভাবে। ডোমিনিয়ন নয়, রিপাব্লিক হয়েও কমনওয়েলথে কোন রাষ্ট্রের সদস্যতা লাভের প্রথম দৃষ্টান্ত হলো ভারত। 'ব্রিটিশ কমনওয়েলথ'ও তার ব্রিটিশ নামটি বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে। কমনওয়েলথ এখন শুধু 'কমনওয়েলথ অব নেশনস্।' কমনওয়েলথ এখন আর শ্বেতাঙ্গের অথবা ইংরাজী ভাষীর সংখ্যা প্রাধান্যে গঠিত রাষ্ট্রসমবায় নয়। কমনওয়েলথে এখন অশ্বেতাঙ্গ মানবসমাজই হলো সংখ্যায় গরিষ্ঠ। ইংলণ্ডীয় রাজমুকুটের প্রতি আনুগত্যের সম্বন্ধ স্বীকার না ক'রে যে রাষ্ট্র সর্বপ্রথম কমনওয়েলথের সদস্য হয়েছে, সে রাষ্ট্র হলো ভারত।

এশিয়া ও আফ্রিকা হতে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অপসারণ পর্ব প্রথম সূচিত হয়েছে ভারতেরই স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। এশিয়াতে বর্মা সিংহল ইন্দোনেশিয়া, এবং আফ্রিকাতে লিবিয়া রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভ করেছে। পরশাসিত এইসব দেশ হতে সাম্রাজ্যিকের আধিপত্য যে সব ঐতিহাসিক কারণে অপসৃত হয়েছে, তার মধ্যে প্রধানতম কারণ হলো ভারতের ছত্রিশ কোটি মানুষের স্বাধিকার লাভের ঘটনা। এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনো যেখানে য়ুরোপীয় জাতি ও রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিদায় গ্রহণ করে নি, লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেইসব স্থানেও ঔপনিবেশিক আধিপত্য তার অন্তিম অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

প্রজাতন্ত্র ভারতের রাজধানী দিল্লীই আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম কূটনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের কেন্দ্র। বিশ্বের সমুদয় রাজ্যের দূত এবং কূটনীতিক প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে দিল্লী এক্ষণে পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক অভিমত সৃষ্টির দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রজাতন্ত্র ভারতই আজ বিশ্বের দুই বিরোধী শক্তি ব্লকের মধ্যে কাজে, নীতিতে এবং প্রভাবে বস্তুতঃ যোগসূত্রেরই মত পরস্পরের সংশয়ে বিব্রত রাজনৈতিক অপ্রাপ্তিকে সশস্ত্র

সংঘর্ষবাদের উত্তেজনায় ভয়াবহ হয়ে উঠতে দিচ্ছে না।

ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক, উভয় কারণেই প্রজাতন্ত্র ভারতকে আজ শক্তিদ্বন্দ্বের রূঢ়তাকে বিনম্র করবার এবং বিশ্বযুদ্ধ নামক এক বিরাট হঠকারিতার প্রকোপ থেকে আন্তর্জাতিক চিত্তকে মুক্ত করবার ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছে।

ইংলণ্ডের মত, মার্কিনের মত অথবা ফ্রান্সের মত ভারত এক ভাষা এক ধর্ম এবং একই সামাজিক রীতি-নীতি ও সংস্কারের দেশ নয়। ইংলণ্ডে ফ্রান্সে ও মার্কিনের রাষ্ট্রিক জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অধিবাসীর ভাষা ধর্ম ইত্যাদি সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা অথবা বৈচিত্র্য কোন সমস্যার কারণ ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করবার জন্য নেই। এইসব দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা তেমন কিছু দুরূহ নয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে বাইশটি ভাষা এবং শত শত বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের বিভিন্নতা নিয়ে কোন দুরূহ পরীক্ষায় পড়তে হয় নি। কিন্তু ভারতের প্রজাতন্ত্র ধর্ম-ভাষা-বর্ণ সংস্কারের এই বহু বিচিত্রকে সমন্বিত করবারই এক মহান পরীক্ষার প্রথম সার্থক নিদর্শন। বস্তুতঃ ক্ষুদ্র এক বিচিত্র পৃথিবীরই মত যাবতীয় ভাষা-ধর্ম-বর্ণের বৈচিত্র্যগত সমস্যাকে এক ভাবগত ঐক্যের সূত্রে সুসংযুক্ত করে প্রজাতন্ত্র ভারত মানব-ইতিহাসের এমন একটি ব্রত গ্রহণ করেছে, যে ব্রতকে ভবিষ্যতের পৃথিবীর সেই বাঞ্ছিত 'এক-বিশ্ব' আদর্শেরই প্রথম ভূমিকা রচনার শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার 'শ্বেতাঙ্গের উচ্চাধিকারবাদ' নাৎসীর 'হেরেনফোক' এবং আর্যামি ইত্যাদি জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কার,—এমন কি ফ্যাসিস্ট ও কমিউনিস্ট চিন্তার স্থূল সৃষ্টি একনায়কতন্ত্র নামক সামগ্রিক আধিপত্যবাদের সংস্কার এই প্রজাতন্ত্র ভারতেরই জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক পরীক্ষায় মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে চলেছে।

ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় জাতিসমূহ বৈজ্ঞানিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পৃথিবীতে য়ুরোপীয় শক্তি'র প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং এশিয়ার শক্তিগত এবং অর্থনীতিগত ক্রমাবনতির সূচনাও হয়েছিল সেই সঙ্গে। ইতিহাসের বিগত প্রায় তিনশত বৎসর হলো য়ুরোপীয় অভ্যুদয়ের ইতিহাস এবং এশিয়ার জীবনে দুর্বলতা ও অপমানের একটি অধ্যায়। ভারতের স্বাধীনতা এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা য়ুরোপ ও মার্কিনে বিশেষ ভাবেই সুজ্ঞাত। উভয় ভূখণ্ডের মধ্যে এই ব্যবধান বিগত তিন শত বৎসরে সৃষ্টি হয়েছে, এবং এই ব্যবধান তথা অসামঞ্জস্যই বিশ্বের সাম্রাজ্যিক দ্বন্দ্ব জাতিগত শোষণ এবং আরও বহু অশান্তি ও অনর্থের কারণ। ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা এশিয়ার জীবনে নতুন অভ্যুদয়ের সূচনা আহ্বান করেছে। অদূর ভবিষ্যতে দুই ভূখণ্ড যে ভাবে মিলিত হবে, সে মিলন হবে দুই সমানের এবং যোগ্যের মিলন, শক্তিমান ও দুর্বলের দুর্বল মিলন নয়। তারই সম্ভাবনার প্রথম সার্থক আভাস ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার মধ্যে ঐতিহাসিক লক্ষণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ভারতের প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সেই সব ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলিরই উল্লেখ করা হলো, যার প্রভাবে বিশ্বের জীবনই এক নতুন পরিণামের ধারা উৎসাহিত করবে। প্রজাতন্ত্র ভারতের আন্তর্জাতিক গুরুত্বের কয়েকটি দিক মাত্র সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভারতের জাতীয় জীবনেরই বহু শুভ সম্ভাবনার মধ্যে একটি সম্ভাবনার কথাই আজকের দিনে বেশি করে মনে পড়ে। প্রজাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে ভারতবাসীর যে নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে, সে পথে বহু পরীক্ষা এবং সঙ্কট আছে। অপরাহত সংকল্প সৎসাহসে এবং

সত্যনিষ্ঠাই ভারতের এই নবজীবন পথের পাথেয়। ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোন 'অভিযান'এর প্রয়োজন হয়, সে অভিযান হবে কল্যাণ লাভের অভিযান। ভারতের শান্তির জন্যই বিশ্বশান্তির প্রয়োজন, এবং বিশ্বশান্তির জন্যই ভারতজীবনে শান্তি প্রয়োজন।

এই শান্তিবাদ ঐতিহাসিক শক্তিতে পরিণত করতে পারে ভারতের সাধারণ মানুষের সাংস্কৃতিক শক্তি। প্রজাতন্ত্র ভারতে সাধারণ মানুষ তার মানবিক অধিকার লাভ করেছে।

সমাজবাদের পথে

এশিয়া ও ইউরোপের বর্তমান সোস্যালিস্ট তথা সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি যে বিপ্লবের সৃষ্টি, সেই বিপ্লবের নায়কগোষ্ঠী আজও জীবিত আছেন, যদিও কতিপয় প্রধান নায়ক তিরোহিত এবং অন্তর্হিত হয়েছেন। বিভিন্ন সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য যে বিপ্লব আহ্বান ও উদ্‌যাপন করা হয়েছিল, সে বিপ্লব ছিল সশস্ত্র সংগ্রাম বা বিপ্লব। সে সংগ্রাম ছিল শোণিতাক্ত সংগ্রাম।

বিস্ময়ের বিষয়, এশিয়া ও ইউরোপের প্রধান সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রগুলির সেই সশস্ত্র বিপ্লবের ঐতিহ্য অভিজ্ঞ নায়কগোষ্ঠীরই অভিমতে অধুনা আগের তুলনায় অনেক বেশী স্পষ্টতা ও বিশ্বাসের সুরে এমন এক উপলব্ধির তত্ত্ব প্রচারিত হতে দেখা যাচ্ছে, যাকে বিপ্লব-থিয়োরীরই একটি মৌলিক সংস্কার বলা যায়। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ-এর রিপোর্ট এই উপলব্ধির স্বীকৃতি বহন করে যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে সমাজবাদী ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের উপকরণ শান্তিপূর্ণ পন্থাতেও সম্ভব। বিপ্লবের রূপ সশস্ত্র ও সহিংস হবেই হবে, এমন নির্বিকল্প তত্ত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজন হয় না। চৌ এন লাই তাঁর সাম্প্রতিক অনেক বক্তৃতায় বিশেষ করে তাঁর এশিয়া ভ্রমণকালীন বক্তৃতায় ও পঞ্চশীলের ব্যাখ্যায় এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। যুগোস্লাভিয়াও সোস্যালিস্ট রাষ্ট্র এবং এই রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক টিটোও মনে করেন যে, শান্তিপূর্ণ পন্থাতেও সোস্যালিস্ট বিপ্লব সম্ভব।

সোভিয়েট রাশিয়া, চীন এবং যুগোস্লাভিয়া, এই তিন রাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থার প্রকার ও প্রকৃতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য সত্ত্বেও অসাদৃশ্য অথবা বিশেষত্ব আছে। এই তিন রাষ্ট্রের সমাজ ও অর্থনীতির সোস্যালিস্ট স্বরূপ হুবহু একই প্রকারের নয়। চীনের কৃষি ও সোভিয়েট রুশিয়ার কৃষিতে উৎপাদনী আয়োজনের যৌথিক পদ্ধতি একই রকমের নয়। রুশিয়ার কলেক্টিভ কৃষি ও চীনের কো-অপারেটিভ কৃষির মধ্যে প্রকৃতিগত ভিন্নতা আছে। শুধু অন্য দেশের অর্থনীতিক বা রাজনীতিক থিওরিস্টদের অভিমত নয়, এই সব প্রধান সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলির চিন্তা নায়কদেরই অভিমত যে, কোন দেশের সমাজে ও অর্থনীতিতে সোস্যালিস্ট বিধান সেই দেশের বিবিধ ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্যমান অবস্থার বৈশিষ্ট্য-এর কারণে অন্য দেশের সমাজবাদী ব্যবস্থার তুলনায় বিশেষ রূপ গ্রহণ না করে পারে না। এইসব অভিমতের দ্বারা আর একটি যে সত্য প্রমাণিত হয় তা এই যে, সোস্যালিজম্ সম্বন্ধে পুরাতন ডগমেটিক ধারণার অবসান ঘটেছে। ভারতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করবার প্রয়োজন হবে, সেটা ঠিক এবং হুবহু চীনের অনুসৃত পদ্ধতির অনুরূপ হবে না ; এটাই তো স্বাভাবিক। কারণ ভারতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠায় যে সকল ঐতিহ্যগত অন্তরায় আছে, সেগুলির সবই ঠিক অন্য দেশের অনুরূপ নয়। দৃষ্টান্ত, কাস্ট তথা জাত

নামক ভয়ানক মানবতা বিরোধী বৈষম্যবাদের প্রথাটি। যেমন বিশেষ বিশেষ কুসংস্কারের ঐতিহ্য তেমনই বিশেষ বিশেষ সুসংস্কারের ঐতিহ্যে জাতির প্রতিভা গঠিত হয়ে আছে। শুধু সমাজবাদ কেন, অন্য যে কোন বাদের প্রতিষ্ঠার জন্য কোন জাতির সমাজ ও অর্থনীতির ভাঙ্গন-গড়ন সম্পন্ন করতে হলে, পদ্ধতি নির্ণয়ের ব্যাপারে জাতির এই ঐতিহ্যগত প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থার বৈশিষ্ট্য বিচার করতে হয়। যেমন বলা যায়, ভারতে সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা আহ্বান করতে হলে ঐ অতি পুরাতন অভিশাপ জাতপ্রথার সঙ্গে কোন অর্ধ সহিষ্ণু নীতি অথবা আপোষ রক্ষা করা চলবে না, ঐ প্রথাকে সমূহভাবে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন। তেমনই ভারতের কৃষিকে সমূহভাবে রাষ্ট্রীয়করণ বোধহয় উচিত হবে না, কারণ পাঁচ লক্ষ গ্রাম এবং বিশ কোটি কৃষকের দেশ ভারতে কৃষির সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয়করণ করতে যাওয়ার অর্থ জাতির ঐতিহ্যগত একটা যোগ্যতার বিরুদ্ধে যাওয়া। দেশে দেশে এবং জাতিতে জাতিতে সমাজবাদিতার প্রয়োগ পদ্ধতির এবং স্বরূপও ভিন্নতর হবে। সমাজবাদের প্রবক্তা অদ্বৈতবাদী ব্রাহ্মণ নয়। সমাজবাদী অবস্থা ও ব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং উন্নয়ন আছে। ১৯২০ সালে সোভিয়েট রাশিয়াতে সমাজবাদের যে ব্যবস্থা ও স্বরূপ দেখা দিয়েছিল, তার তুলনায় আজকের ব্যবস্থা ও স্বরূপ অনেক উন্নত। এই ব্যবস্থাও অসম্পূর্ণতার স্তর থেকে ধীরে ধীরে অথবা দ্রুত অধিকতর পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হয়। একদিনে বা একবছরে পূর্ণ সমাজবাদী ব্যবস্থা পত্তন করে ফেলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মাও সে তুং বলেন, চীনের সামাজিক ব্যবস্থাকে প্রকৃত সমাজবাদী গঠন দান করতে চল্লিশ বছর সময় লাগবে।

আর একটি সাধারণ সত্য স্বীকার করতে হয়। শুধু আইনের দ্বারা সমাজবাদী ব্যবস্থার প্রবর্তন অথবা অবস্থার সৃষ্টি সম্ভব নয়। আইন নিষেধমূলক নির্দেশ মাত্র। কিন্তু সোস্যালিজমের মত গঠনমূলক আদর্শ সুপরিকল্পিত গঠনকর্মের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। চাই প্ল্যানিং তথা পরিকল্পনা।

এখানে রাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। জনজীবনের রক্ষা, শাসন, ও কল্যাণ এবং সমাজবাদসম্মত উন্নয়নের প্ল্যানিং কি ডেমোক্রেসির পন্থাতেও সম্ভব নয়? সমাজবাদ কি শুধু টোটালিটারিয়ান রাষ্ট্রিকতার দ্বারাই সম্ভব? জনসাধারণকে বাধ্য হতে বাধ্য না করে, তাকে স্বেচ্ছায় সাধ্যমত সহযোগিতা করবার অধিকার দিয়েও সমাজবাদের ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা সম্ভব, এই নীতির বাস্তবোচিত সত্যতা সম্বন্ধে ক্রুশ্চেভ-বুলগানিনও তাঁদের সংশয় অনেকখানি শিথিল করেছেন, যার প্রমাণ তাঁদের ভারত ভ্রমণকালীন উক্তি। চৌ-এন-লাই এবং টিটো সংশয়ের পরিবর্তে বিশ্বাসই প্রকাশ করেছেন, যদিও তাঁরা মনে করেন যে, তাঁদের দেশের বর্তমান অবস্থায় এবং বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে জনশ্রমের উপর রাষ্ট্রীয় আধিপত্য রক্ষা করবার জন্য কিছুটা ভিন্ন নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন আছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন যদিও তাঁদের নীতিকে ডেমোক্রেটিক বলে থাকেন, কিন্তু ভারতের নেহেরু যে নীতিকে গণতন্ত্রোচিত বলেন, সে নীতি অবশ্যই রাশিয়ার অথবা চীনের নীতির অনুরূপ নয়। শুধু নেহেরু নয়, ভারতীয় জাতিই মনে করে যে, জনসমাজের স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতার অধিকার প্রদান করাই প্রকৃত ডেমোক্রেসি : রাষ্ট্র জনসাধারণকে বাধ্য হতে বাধ্য না করেও জনসাধারণকে উন্নয়নের অথবা সমাজবাদী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী বলতেন, তিনি সোস্যালিজম সমর্থন করেন। তাঁর আপত্তি ছিল শুধু

পদ্ধতির বিষয়ে। সশস্ত্র পদ্ধতিতে হিংসাত্মক পন্থায় প্রতিষ্ঠিত সোস্যালিজম সুস্থায়ী অথবা সর্বতোভাবে শুভাবহ হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। যাই হোক শান্তিপূর্ণ পন্থাতে সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যখন এই সত্য আজ স্বীকৃত হয়েছে, তখন স্বীকার করতে হয়, বেচারা গান্ধীর ধারণাই সত্য হয়েছে। ডেমোক্রেটিক পন্থায় সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব, ভারতের নেহেরুর এই বিশ্বাস অন্য সমাজবাদী রাষ্ট্রে অস্পষ্টভাবে সমর্থিত হলেও আশা করা যেতে পারে যে, ভবিষ্যতের ঘটনায় নেহরুর ঘোষণাই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। পূর্ব ইউরোপের ঘটনা এবং সোভিয়েট রাশিয়ারও ভিতরের কিছু কিছু সংস্কারের আলোড়নে সেই সঙ্কেতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রিক নীতিতে এবং ব্যবস্থায় ডেমোক্রেটাইজেশনের নূতন ধ্বনি নূতনতর পরিবর্তনের আভাস।

ভারতও তার সমাজব্যবস্থায় 'সোস্যালিস্ট অর্ডার' তথা সমাজবাদী বিধান সত্য করে তুলতে চায়। এই সঙ্কল্প কংগ্রেসের অঙ্গীকার হিসাবে ঘোষিত হয়েছে যে কংগ্রেস ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচালনার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কংগ্রেসের ঐ ঘোষণাকে শুধু রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বিশেষের আকাঙ্ক্ষিত একটি আদর্শের ঘোষণা বলে মনে করা যায় না। তাৎপর্য্যের দিক দিয়ে ঐ ঘোষণাকে জাতীয় সঙ্কল্পের ঘোষণা বলে মনে করা যেতে পারে। এই ঘোষণা কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন রাজনীতিক দলগুলির কাছেও অভিনন্দন দাবী করতে পারে। কংগ্রেসের ঘোষণার আর এক তাৎপর্য এই যে, এইবার ভারতের জনজীবনে সোস্যালিজমের প্রতিষ্ঠা জাতীয় উদ্যোগের রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। সমাজবাদ এখন শুধু অনুভূত আদর্শর স্তরে নিবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষ কর্মে রূপায়িত হবে। ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাসে এই সঙ্কল্প ও কর্মায়োজনের সূচনাকে এক সুমহান বিপ্লবেরই সঙ্কেত বলে মেনে নিতে পারি।

ভারতের জনজীবন সমাজবাদ স্বীকার করবার জন্য যে প্রস্তুত হয়েই আছে, এই সত্য উপলব্ধি করবার প্রয়োজন ছিল। প্রায় দুই শত বৎসর ঔপনিবেশিক শাসনে শোষিত হবার পর এবং আজ জাতীয় সমৃদ্ধির উন্নয়নে ইণ্ডাস্ট্রির বৃহৎ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন স্বীকার করে নেবার পর কখনই এমন আশা করবার যুক্তি থাকতে পারে না যে, সমাজজীবনে পুরাতন বৈষম্যমূলক সম্বন্ধবোধ অটুট রেখে এবং সাধারণের অধিকার ও সুযোগ নিম্নতম দশায় অভিশপ্ত করে রেখে জাতীয় শক্তি ও সম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থাকে সোস্যালিস্ট পদ্ধতিতে গঠন করবার প্রয়োজন ভারত ইতিহাসের স্বাভাবিক প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে।

ভারতীয় সমাজজীবনের অতীত ইতিহাস থেকে এমন কোন ঘটনার পরিচয় পাওয়া যাবে না, যাকে সমাজবাদী আগ্রহের কীর্তি বলে মনে করা যায়। সমাজবাদ মূলতঃ পাশ্চাত্য চিন্তার সৃষ্টি। ইউরোপের উটোপিয়ান সোস্যালিস্টদের অনুরূপ ভাবমূলক নানা প্রকারের সাম্যের আদর্শ ভারতের পুরাতন সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যায়। টমাস মুর ও রবার্ট আওয়েন অথবা ফুরিয়ে ও সাঁতসিমঁ ইউরোপের চিন্তায় যে আগ্রহ অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেটা ছিল মূলত অবনতের প্রতি মমতাশীল মানবতাবাদ। সম্পত্তির অনৈকতা এবং ব্যক্তিক অধিকারের বৈষম্য সম্বন্ধে তীব্র আপত্তি বর্ষিত হলেও তার মধ্যে সমাজবাদী সংগঠনের বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়া যায় না। কার্ল মার্কসই প্রথম সোস্যালিজমের বৈজ্ঞানিক প্রকরণ ব্যাখ্যাত করেছিলেন। এবং তাঁরই ব্যাখ্যা উত্তরকালে বিশ্বের সমাজবাদী চিন্তাকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে। তারপর প্রায় একশত বৎসর বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনায়, বৈজ্ঞানিক

আবিষ্কার-এর নতুনত্বে, ধনতান্ত্রিক রীতির পরিবর্তনে, বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রতিক্রিয়ায়, পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রবল বৃদ্ধিজনিত অবস্থার তারতম্যে এবং এশিয়ার স্বাধীনতার অভ্যুত্থানে বিশ্বের সমাজরূপের আকার ও প্রকারে যে বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছে, তাতে সোস্যালিজম আদর্শের ধারণাও সুসংস্কৃত হয়েছে।

মানুষে মানুষে সমান অধিকার থাকবে, এই শুভেচ্ছা অন্য দেশের সাহিত্যের মতো ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যেও দেখা যায়। ঋষি কথিত সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী অথবা

'ওঁ সহ নাববতু
সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্যং করবাবহৈ'

(এই অংশটি তৈত্তিরীয় উপনিষৎ থেকে নেওয়া)

এই উপলব্ধির মহত্ত্ব স্বীকার করা যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই বলা যায় না যে, ভারতের ঋষি সমাজবাদের সার কথা কয়েক হাজার বছর আগেই বলে দিয়েছেন। প্রুধোঁ বলেছেন প্রপার্টি ইজ থেফ্‌ট। এ ধরণের কথা ভারতে শ্রীমদ্ভাগবতেও লক্ষ্য করা যায়—অধিবহতো যোহভিমন্যতে স স্তেনো মর্হতি।

তুলসীদাসের রামরাজ্যের আদর্শে এরকম উল্লেখের অভাব নেই—নহি দরি কোউ দুখীন দীনা, নহি কোউ অবলচ্ছনহীনা। কিন্তু আইডিয়া হিসাবে এইসব উক্তি সমাজবাদী আইডিয়া নিশ্চয়ই না। বলা যায়, মানবতাবাদ বিশ্বাসী সমাজবাদীর কাছে অতীতের এই সত্য উপলব্ধির বাণী ইতিহাসের ইঙ্গিত রূপে কম মূল্যবান নয়।

ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বিশেষ করে জাতীয় কংগ্রেসের সূচনাকালের পর থেকে ভারতের জাতীয় আগ্রহের যে-সকল আন্দোলন ও সংগ্রাম ভারতীয় জনজীবনের নূতন ইতিহাস রচনা করেছে, তার মধ্যে অস্পষ্টভাবে অথবা পরোক্ষভাবে বিশেষ একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যার মধ্যে প্রমাণিত হয় যে সমাজব্যবস্থার মধ্যে সমতামূলক একটি আদর্শ আহৃত করবার প্রয়োজন জাতীর চিত্তে অনুভূত হয়েছে।

নারীর অধিকার ও অস্পৃশ্যতা নিবারণ থেকে শুরু করে ট্রেনের থার্ড ক্লাস যাত্রীর দুর্গতি মোচনের জন্য গোটা জাতির আগ্রহের আন্দোলনে অন্তত এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, অধিকারসাম্য আদর্শ শুধু শুভেচ্ছামূলক একটা মতবাদে পরিণত না থেকে বাস্তবোচিত প্রকাশ লাভের প্রেরণায় পরিণত হয়েছে। আধুনিক ভারতে মানুষের সমমর্যাদার এই আদর্শ উদ্বোধনেও একটি অবিচ্ছিন্ন চিন্তা ও প্রয়াসের পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়—রামমোহন, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও নেহেরু। বিস্মিত হবার কারণ নাই যে, ভারতের ধর্ম প্রচারক কেশব-চন্দ্র সেনও প্রাচীন সোসালিস্ট আওয়েনের মত সমবায় পদ্ধতিতে কম্যুনিটি উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু ভাবমূলক ধারণা নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থাগত কীর্তিও দেখতে পাওয়া যায় যেখানে সমানাধিকার, সহযোগিতা ও সমবণ্টনের সমাজগত প্রয়াসের পঞ্চায়েত প্রথা একটি দৃষ্টান্ত। ভারতে অনেক শ্রেণীর মধ্যে, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের মধ্যে সম্পত্তির সমান অধিকার ও উপভোগের বিহিত ছিল। আজও কিছু কিছু অঞ্চলে এই সবই ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড ইতিবৃত্ত হিসাবে সত্য। ভারতের গণজীবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিক অধিকারে সাম্য কখনও সত্য হয়ে উঠতে পারেনি, বরং তার বিপরীতই হলো আসল কথা।

কংগ্রেসের ১৯৩১ সালের অধিবেশনে মৌলিক অধিকার প্রশ্নে নূতন সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রথম সুস্পষ্ট ঘোষণা দেখা যায়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির তিন বছর পরে নবরচিত সংবিধানে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের রাষ্ট্রিক লক্ষ্য সম্বন্ধে যে অনুজ্ঞা উল্লিখিত হয়েছে তার মধ্যে 'সমাজবাদ' প্রতিষ্ঠার উল্লেখ নেই। বরং খুবই স্পষ্ট ভাষায় বিশেষ রকম একটি সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য উল্লিখিত হয়েছে।—A social order in which social, economic and political justice remain এমন এক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ভারত রাষ্ট্রের প্রয়াসের লক্ষ্য যেখানে সামাজিক অর্থনীতিক ও রাজনীতিক ন্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। সংবিধানের রাষ্ট্রাদর্শের নিয়ামক আইনের ৩৯ ধারার উল্লেখগুলি আকাঙ্ক্ষিত সমাজব্যবস্থার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আরও বেশী স্পষ্ট এবং বিশদ। এখানে দেখতে পাই, সমাজবাদের মূল লক্ষ্য গুলিকেই দাবী করা হয়েছে। 'সমাজের সব বৈষয়িক সম্পদ ও সম্পদস্বত্ব এমনভাবে বণ্টন করা হবে, যার ফলে সাধারণের কল্যাণ সুসিদ্ধ হবে ও উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলি (Mode of production) এবং সম্পদস্বত্ব সাধারণের ক্ষতি করবার মত কোন অবস্থার মধ্যে গিয়ে পুঞ্জীভূত না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে অর্থনীতিক ব্যবস্থা পরিচালিত করতে হবে।' কয়েকটি অনুজ্ঞায় যে-সব লক্ষ্যের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে সাধারণভাবে বলা যায়, ব্যক্তির আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য সুযোগ রচনার অঙ্গীকার। সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার' অংশের ১৬ ধারায় সরকারী কর্মে 'সকলকে সমান সুযোগ' প্রতিশ্রুত হয়েছে। প্রকৃত সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শুধু সমান অধিকার অঙ্গীকৃত নয়, অধিকার উপভোগ করবার সুযোগও সৃষ্টি করা। কংগ্রেসের প্রস্তাব ও নানা অর্থনীতিক ঘোষণাতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য স্বীকৃত হওয়ায় বুঝতে হবে যে, জনসাধারণের পক্ষে উন্নয়নের সমান সুযোগ সম্ভব করার দায়িত্ব জাতির সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

এই দায়িত্ব স্বীকার করে সমগ্র জাতিকে যিনি সমাজবাদ আদর্শে অনুপ্রাণিত করছেন, ভারতের নেতা জহরলালেরও জীবনে সমাজবাদ চিন্তার প্রেরণার ও কর্মোদ্যোগের ঐতিহ্য আছে। ভারতে সমাজবাদ আদর্শের প্রচারে তিনিই পুরোধা। ভারতে পূর্বসৃচিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, ভারতের কিষাণ আন্দোলন তাঁরই নেতৃত্বের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছে একথা অনুমান করলে কোন ভুল হবে না। ভারতের ইতিহাসে নেহেরু নেতৃত্বের সবচেয়ে বিশিষ্ট কীর্তি হবে ভারতে সমাজবাদী সংগঠন।

এ যুগের ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ সিদ্ধান্ত করেছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই 'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' রূপে তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় ঘোষণা করবে। সম্ভবতঃ আগামী ১৫ই আগষ্ট এই ঘোষণা হবে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘোষণা যে কত বড় পরিণামের সূচনা করবে, তার বিরাট তাৎপর্য্য আমাদেরই অনেকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রজাতন্ত্র বা রিপাব্লিক রূপে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বরূপের আত্মপ্রকাশ, এর অর্থ হলো পৃথিবীর বৃহত্তম রিপাব্লিকের আবির্ভাব। বত্রিশ কোটি মানুষের নাগরিকতায় সমৃদ্ধ কোন প্রজাতন্ত্র আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে দেখা দেয়নি। এরপর দেখা দিতে চলেছে।

পৃথিবীর সভ্যতার ভূমি রূপে যে কয়টি দেশ ও জাতি আবির্ভূত হয়েছিল, ভারতবর্ষ তার অন্যতম, এবং বৃহত্তমও বলতে পারা যায়। বিগত কয়েক যুগের ইতিহাসে দেখা গেছে

যে, সভ্যতার আদি ভূমি হিসাবে বিখ্যাত দেশগুলিই জীবনীশক্তিতে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষমতায় ক্ষুদ্রতর এবং দীনতর হয়ে গেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ভারতবর্ষ।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম এক প্রাচীনতম সভ্যদেশের রাষ্ট্রীয় পুনরভ্যুত্থান সফল হতে দেখা গেল। বর্তমান গ্রীস, ব্যাবিলন ও মিশর সম্পূর্ণ নতুন দেশ, তাদের অতীত চিরকালের মতই অতীত হয়ে গেছে। এসব দেশের প্রথম সংস্কৃতি এখন মাত্র ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই সমাহিত হয়েছে, জনতার জীবনে তার কোন সাক্ষ্য নেই। একমাত্র ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই প্রবাহ ধর্ম অটুট হয়ে আছে। প্রাচীন সভ্যতার এক বৃহত্তম দেশ ভারতবর্ষ। বর্তমান যুগেই বৃহত্তম প্রজাতন্ত্ররূপে পরিণাম গ্রহণ করতে চলেছে। ঐতিহাসিক পরিবর্তনেরও একটি নূতন নিয়মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ভারতবর্ষ। প্রাচীনতম হয়েও আধুনিকতম হবার শক্তি, ভারতবর্ষ সমাজবিজ্ঞানেরই একটি নূতন মতবাদের বাস্তব প্রমাণরূপে চিহ্নিত হলো।

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে য়ুরোপীয় তথা পশ্চিমী সভ্যতার প্রসার এবং এশিয়ার রাজনৈতিক অবনতি অনেক মনীষীর চিন্তায় এই ধরণের একটি সংস্কার সৃষ্টি করেছিল যে, পশ্চিমী সভ্যতাই বুঝি যথার্থ সভ্যতা এবং এশিয়ার সভ্যতা মিথ্যা। সভ্যতার অর্থই ভুল বুঝেছিল পশ্চিম জগৎ। এশিয়ার সভ্যতা কয়েক হাজার বছরের চিন্তার দ্বারা গঠিত হয়েছিল। কয়েক হাজার বছর ধরে এশিয়াই পৃথিবীকে বিশিষ্ট এক ধরণের সভ্যতায় লালন করেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রভুত্বের নীতি দ্বারা গঠিত ও চালিত য়ুরোপীয় সভ্যতা মাত্র তিন-চার শত বছর পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে। এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে সে সভ্যতার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত গলদ আছে। সে সভ্যতার বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয়ের মধ্যে অনেক গুণ শক্তি ও সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও একটি মৌলিক ভ্রান্তি তাকে ভঙ্গুর করে রেখেছিল।

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রাপ্তিই ইতিহাসের সেই ইঙ্গিত, যার দ্বারা স্পষ্ট করে এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়ে গেল যে, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাধান্য সমাপ্ত হয়ে গেল। আবার এশিয়ার জাগরণের অধ্যায় আরম্ভ হলো নতুন করে। এই জাগৃতির দীক্ষা সব চেয়ে বেশী সফল হয়েছে আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনে ও সাধনায়। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সভ্যতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন নায়কত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই মানুষের ইতিহাসে কতকগুলি সার্থকতার সন্ধান সহজ করে দিচ্ছে। সেই সার্থকতাগুলি হলো বর্তমান যুগেরই কতগুলি বৃহৎ আকাঙ্ক্ষা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পৃথিবীতে যে সব পরিবর্তন সহজসাধ্য করে তুলবে, মোটামুটিভাবে তার একটা ছোট তালিকা করা যায়। (ক) এশিয়া ও য়ুরোপের সভ্যতার মৌলিক বিরোধ মিটে গিয়ে উভয়েই একটি সাধারণ সমন্বয়ের সূত্র লাভ করবে। (খ) এশিয়ার জাগৃতি আরম্ভ হলো। (গ) য়ুরোপ এবং এশিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির তারতম্য ঘুচে যাবে। (ঘ) যুদ্ধ দ্বারা রাষ্ট্রীয় বিবাদ নিষ্পত্তির পন্থা বর্জিত হবে। (ঙ) বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠা সহজ হবে। (চ) মৈত্রীর নীতি দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রগুলিই এক প্রকার 'এক-রাষ্ট্র' রূপে চলবার রীতি ও ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারবে।

'স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র' ভারতবর্ষ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা 'বিশেষ সম্পর্ক' রেখে চলবে, ভারতবর্ষ এই সিদ্ধান্তও করেছে। কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকে এই কথাটির মধ্যে ব্রিটিশ প্রভাবের অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ করেছেন। এই সন্দেহ কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষের কতিপয় ব্যক্তি এবং মস্কো বেতার ও পত্রিকাগুলির দ্বারাই

প্রচারিত হয়েছে। এ ছাড়া সমস্ত পৃথিবীর অভিমত হলো, ভারতবর্ষ এই সম্পর্ক দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ রাজনৈতিক মর্য্যাদা এবং প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। যে ঘটনা বস্তুতঃ ভারতের ঐতিহাসিক জয়, সেই ঘটনাকেই কতিপয় ব্যক্তি পরাজয় বলে প্রচারের চেষ্টা করছেন। কমনওয়েলথে সম্পর্কহীন স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে যথার্থ পরিচয় থাকলে, যুদ্ধোত্তর কালের বিশ্বরাজনীতির পরিবর্তিত অবস্থার তাৎপর্য্য ধরতে পারলে, এবং সত্যনিষ্ঠা থাকলে, তার পক্ষে এমন সন্দেহ ও বিভ্রমে পড়বার কোন কারণ থাকতে পারে না।

সংক্ষেপে বিষয়টিকে এইভাবে বর্ণনা করা যায় : ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র 'স্বেচ্ছায়' ভারতবর্ষকে সহ-সদস্যরূপে পেতে চেয়েছে। ভারতবর্ষও 'স্বেচ্ছায়' কমনওয়েলথের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে। একমাত্র ভারতবর্ষকেই প্রজাতন্ত্র হয়েও কমনওয়েলথে রাখতে অন্যান্য ডোমিনিয়ন সম্মত হয়েছে। অন্য কোন ডোমিনিয়নের পক্ষে এই বিশেষ অধিকার স্বীকার করার সিদ্ধান্ত লণ্ডন সম্মেলনে হয়নি। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডরাজের আনুগত্য স্বীকার করবে না। ইংলণ্ড-রাজ কমনওয়েলথের মাত্র প্রতীক-প্রধান হয়ে থাকবেন, কারণ কমনওয়েলথের সম্পর্কে রাজার কোন করণীয় কর্তব্য ক্ষমতা বা দায়িত্ব নেই। কমনওয়েলথেরই কোন নির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র নেই। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ডোমিনিয়ন পরস্পরের প্রতি একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে বাধ্য নয়। নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী সকলেই চলবার ক্ষমতা রাখে। উদাহরণ : গত মহাযুদ্ধে আয়র্ল্যাণ্ড (আয়ার) ডোমিনিয়ন হয়েও নিরপেক্ষ থেকেছিল। কানাডা ডোমিনিয়ন হয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সামরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ডোমিনিয়ন ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন হয়েও পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী চুক্তি অবাধে করে চলেছে। কমনওয়েলথ সম্পর্ক এই দিক দিয়ে কোন বাধা দেয় না, বাধা দেবার অধিকারও নেই।

বর্তমান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বিষয়ে যে নীতি অনুসরণ করে চলেছে, তার বৈশিষ্ট্য কি? বৈশিষ্ট্য হলো, এশিয়ার সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের দাবী। প্যালেস্টাইন, ইসরাইল, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদি দেশের সমস্যা সম্পর্কে ভারতবর্ষ কোন দিক দিয়েই ব্রিটিশ পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। ব্রিটিশ যেদিকে ভোট দিয়েছে, ভারতবর্ষ তার বিরুদ্ধ দিকে ভোট দিয়েছে।

আর একটা বিষয় কল্পনা করা যাক। প্রজাতন্ত্র ভারতবর্ষ যদি কমনওয়েলথে সম্পর্ক রাখতে সম্মত না হতো, তবে কি হতো? ব্রিটেনের সঙ্গে 'চুক্তির' দ্বারা একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রচনা করার প্রয়োজন হতো। এই সব 'চুক্তি' কি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বেশী স্বাধীনতার প্রমাণ? কদাপি নয়, বরং চুক্তির মধ্যেই বাধ্যবাধকতার চাপ থাকে বেশী।

পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন, বর্তমানে পৃথিবীতে কয়েকশত স্বাধীন রাষ্ট্র আছে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীন রাষ্ট্র বলতে মাত্র চার-পাঁচটি। এবং ভারতবর্ষ এই চার-পাঁচটির অন্যতম। যাঁরা বর্তমান যুগের নবতর পরিণামের লক্ষণগুলি বুঝতে পেরেছেন, তাঁরা পণ্ডিত নেহেরুর ঐ উক্তির তাৎপর্য বুঝছেন। ভারত রাষ্ট্র বর্তমানে পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় পাঁচটি রাষ্ট্রের অন্যতম। মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেছেন, এশিয়ার নেতৃত্ব করার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষের ওপর এসে পড়েছে। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কোন দিক দিয়েই সীমাবদ্ধ নয়। তাছাড়া

আর একটা কথা। সম্পূর্ণরূপে নিজের অধীন, এমন রাষ্ট্র পৃথিবীতে নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই বুঝে চলতে হয়। মার্কিন, রুশিয়া বা ইংলণ্ড, এর মধ্যে কেউ ইচ্ছে করলেই কিছু একটা করে উঠতে পারে না। অন্য রাষ্ট্রের সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতার ওপর নির্ভর অল্পবিস্তর সকলকেই করতে হয়। এই নির্ভরতাকে প্রভাবাধীনতা বলে না।

জাতীয় স্বার্থের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের পক্ষে জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য যে যে, বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন, সে প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য ইংলণ্ডের সঙ্গে যদি বিশেষ সম্পর্ক ভারতবর্ষ রাখে, তার অর্থ ব্রিটিশের কাছে বিকিয়ে যাওয়া বোঝায় না। অথবা মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করলে, মার্কিন ব্লকের মধ্যে আত্মসমর্পণ বোঝায় না। আসল কথা হলো, জাতির স্বার্থ, জাতির সুবিধা এবং স্বার্থের জন্য মৈত্রীর সম্পর্ক প্রসারিত করা প্রত্যেক সুস্থ জাতির স্বভাব।

কমনওয়েলথ সম্পর্ক রেখে ভারতবর্ষ লাভ করেছে সবই, অথচ ক্ষতি হয়নি কিছু। বাণিজ্যগত সুবিধার সবটুকুই ভারতবর্ষ পাবে, অথচ নিজের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এবং পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ ভাবে অব্যাহত থাকবে।

প্রাচীনতম সভ্য দেশে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, ইতিহাসে এ ঘটনা নতুন। যেভাবে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, তাও ইতিহাসে নতুন। অর্থাৎ অহিংস পন্থায় সংগ্রাম দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন, অভিনব ঐতিহাসিক ঘটনা বৈকি। ইংলণ্ডের ইতিহাসেও এই ঘটনা অভিনব ; শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার দ্বারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে এক বিরাট দেশ ও জাতিকে স্বরাষ্ট্র সম্পন্ন করে দেওয়া, ইতিহাসে এই ঘটনা ব্রিটিশের বৃহত্তম গৌরবের অধ্যায়। বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রের আবির্ভাব, পৃথিবীর ইতিহাসে এই ঘটনাও নতুন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথও যে তার পুরাতন নীতি বর্জন করে নতুন হয়ে গেল। বিরাট সংখ্যক এসিয়াবাসী আজ কমনওয়েলথের মধ্যে এসেছে। পূর্বে কমনওয়েলথ ছিল শ্বেতাঙ্গের কমনওয়েলথ। সিংহল, ভারত ও পাকিস্তানকে নিয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের শ্বেতাঙ্গত্বই বদলে গেছে। তার ওপর, প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রকেও কমনওয়েলথের সদস্য বলে স্বীকার করায় নতুন উদাহরণ দেখা দিল।

এতগুলি ঐতিহাসিক নতুন ঘটনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে। এর তাৎপর্য বুঝতে কি এখনো আমাদের দেরী হবে? ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে বর্তমান যুগকেই যে নতুন রূপ গ্রহণ করার পথে নিয়ে চলেছে। নিজেদের এই মহত্ত্ব অনুভব করতে যদি কুণ্ঠিত হই, তবে ভুল হবে। জাতির ইতিহাসকে অসম্মান করা হবে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীরশিল্প

ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া অনেকদিন হলো প্রকাশিত হয়েছে। পরিকল্পনায় উল্লিখিত নানা বিষয় নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষজ্ঞেরা আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মুখপাত্রেরা আলোচনা করেছেন। পরিকল্পনা সম্বন্ধে পুঁজিবাদী ধনিকসমাজের মনোভাবের পরিচয়ও পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, নেতা এবং বিশেষজ্ঞের অভিমত একরকমের হয় নি। তা ছাড়া, কোন কোন ক্ষেত্র হতে বিরুদ্ধ সমালোচনাও হয়েছে প্রবল রকমের। এই অবস্থার মধ্যেই পরিকল্পনার নানা বিষয় পুনর্বিবেচনা করবার এবং বিষয়বিশেষে পরিবর্তন অথবা নতুন কিছু সংযোজন করবার কাজও সরকারী কর্তৃপক্ষ করে এসেছেন। বহু এবং বিভিন্ন অভিমত ও পরামর্শগুলি বিবেচনা করে পরিকল্পনাটিকে প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধন করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে

ফেলেছেন পরিকল্পনা কমিশন। পণ্ডিত নেহেরুর উক্তি অনুসারে আশা করা যায় ; আর কয়েক দিন পরেই পরিকল্পনাটি চূড়ান্তরূপেই প্রকাশিত হবে।

খস্ড়া পরিকল্পনার বিরুদ্ধেই এ পর্যন্ত যেসব সমালোচনা হয়েছে, তার মধ্যে গান্ধীপন্থী নামে পরিচিত সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সমালোচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বোদয় ব্রতে নিযুক্ত আচার্য বিনোবা ভাবে, জে সি কুমারাপ্পা, শ্রীমননারায়ণ আগরওয়ালা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন যে, এ পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের প্রতি যথোচিত মর্যাদা বা গুরুত্ব দান করা হয়নি। পণ্ডিত নেহরুর একটি উক্তি হ'তে বোঝা গিয়েছিল যে, আচার্য বিনোবা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে মোটামুটি সমর্থনই করেছেন। কিন্তু আচার্যের কয়েকটি বক্তৃতা এবং উক্তি হতে মনে হয় যে, এ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ রয়েই গেছে। কুটীরশিল্পের গুরুত্ব অবজ্ঞাত হয়েছে, পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তিনি প্রত্যাহার করেন নি।

গান্ধীজীর প্রচারিত গঠনকর্মে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন এবং গান্ধী অর্থনীতির নৈষ্ঠিক অনুরাগী বলে যাঁরা পরিচিত, এমন অনেকের উক্তি ও বিবৃতিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ঘোষিত হয়েছে যে, এ পরিকল্পনা নিতান্তই গান্ধীনীতিবিরোধী পরিকল্পনা। ভারতের গ্রামজীবনেরই উন্নয়নের দাবীটি উপেক্ষিত হয়েছে। জাতীয় সরকার দেশকে যন্ত্রশিল্পে অলঙ্কৃত করতে চাইছেন। এ পরিকল্পনা শহরে সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মাত্র। এইরকম আরও বহু অভিযোগ উত্থাপন ক'রে সমালোচকেরা বলতে চেয়েছেন যে, এ পরিকল্পনা ভারতের প্রকৃত উন্নতির পরিপন্থী।

মহাত্মা গান্ধী আজ বেঁচে থাকলে এ পরিকল্পনা সম্বন্ধে কি বলতেন, সেটা অনুমান করতে চাই না, কারণ অনুমান করা সম্ভবপর নয়, উচিতও নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গান্ধীপন্থী নামে পরিচিত সমাজের যাঁরা পরিকল্পনা সম্বন্ধে যা বলছেন, সে সবই কি গান্ধীনীতিসম্মত অভিমত বলে মেনে নিতে হবে? কোন বিষয়ে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং গান্ধীবাদীর দৃষ্টিভঙ্গীকে একেবারে একই বস্তু বলে মনে করা সঙ্গত নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, গান্ধীবাদী নামে পরিচিত এবং জনশ্রদ্ধেয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উক্তি অধুনা সাধারণের মনে নানারকম ধারণার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করছে। গান্ধী-প্রবর্তিত গঠনকর্মের সঙ্গে বহুকাল থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেসব অভিমত ঘোষণা করছেন, সেই সব অভিমতকে জনসাধারণ সহজেই গান্ধীনীতিসম্মত অভিমত বলে মনে করেন এবং এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই রকম খুব স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মধ্যে যেসব ধারণা প্রচারিত হয়ে চলেছে, তা'তে গান্ধীনীতি সম্বন্ধে প্রকৃত এবং যথার্থ ধারণা খণ্ডিত হবারও একটা আশঙ্কা রয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধেও গান্ধীবাদী নামে পরিচিত কারও কারও অভিমত এই ধরনের বিভ্রান্তি জনসাধারণের চিন্তায় সৃষ্টি করছে বলে মনে হয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে এখনও প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু খসড়াতে যা আছে, তাই বিবেচনা ক'রে বলা যায় কি, এ পরিকল্পনায় দেশকে গান্ধীনীতিবিরোধী পন্থায় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করার ব্যবস্থা হয়েছে? এ অভিযোগ কতখানি সত্য? আদৌ সত্য কি না?

দেশে ইণ্ডাস্ট্রির পত্তন ও প্রসার গান্ধী চাননি, একথা আদৌ সত্য নয়। গান্ধীর উক্তি অনুসারেই বলা যায়—ইণ্ডাস্ট্রি চাই, কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম চাই না। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম বলতে যেসব অসামাজিক, বেকার বৃদ্ধিসূচক, বৈষম্যমূলক এবং পুঁজিবাদ পরিতোষক কেন্দ্রীভূত

উৎপাদন ব্যবস্থা বুঝায়, সেই অনর্থগুলিকে পরিহার ক'রে যন্ত্রশিল্পের পত্তন ও প্রসার চেয়েছিলেন গান্ধীজী, যাতে দেশের ইণ্ডাস্ট্রি সাধারণের কল্যাণের অনুকূল হতে পারে। সুতরাং, দেখতে হবে যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ইণ্ডাস্ট্রির পত্তন ও প্রসার সম্বন্ধে যেসব উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম্-সুলভ এই সব অনর্থগুলির বৃদ্ধির ও প্রসারের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা? পরিকল্পনার মধ্যে যে কয়টি মৌলিক শিল্প রাষ্ট্রাধীনে প্রতিষ্ঠিত করবার কথা বলা হয়েছে, সেগুলি কি দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নয়, অথবা অপরিহার্য নয়? না, গান্ধীজী এসব শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে নিষেধ করে দিয়ে গেছেন?

এই প্রসঙ্গে দু'টি পরিকল্পনার তুলনা ক'রে বুঝতে চাই, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে যথার্থ গান্ধীনীতিবিরোধী ব্যাপার কি আছে এবং কতটুকু আছে?

গান্ধীবাদী নামে পরিচিত এবং সর্বোদয় আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী শ্রীমন নারায়ণ আগরওয়ালার একটি পুস্তক হতে তাঁরই রচিত 'গান্ধী-পরিকল্পনা'র বক্তব্য এখানে উল্লেখ করছি। এই পুস্তকটি শ্রীআগরওয়ালা গান্ধীজীর জীবিতকালেই রচনা করেছিলেন এবং পুস্তকের ভূমিকা গান্ধীজীই লিখেছিলেন। ভূমিকায় গান্ধীজী বলেছেন—'পুস্তকটি যতখানি মনোযোগ দিয়ে পড়া দরকার ততখানি মনোযোগ দিয়ে, আমি পড়তে পারিনি। তথাপি, আমি এমনভাবে পড়েছি যে এবং একথা বলতে পারি যে, তিনি আমার মতামত কোথাও ভুলভাবে উপস্থিত করেন নি।'

সুতরাং, শ্রী আগরওয়ালা তাঁর গান্ধী পরিকল্পনায় দেশের জন্য কতখানি এবং কি ধরণের ইণ্ডাস্ট্রি চেয়েছিলেন, কুটীরশিল্প এবং কৃষি ইত্যাদি গ্রামোন্নয়নের দাবীও কতখানি করেছিলেন, তার পরিচয় জানলে বোঝা যাবে যে, বর্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কোথায় এবং কতটুকু গান্ধীনীতিবিরোধী ব্যাপার হয়েছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা খুবই কম হয়েছে বলে গান্ধীবাদী সমালোচকেরা মনে করেন। সুতরাং শ্রীমননারায়ণ আগরওয়ালার গান্ধী পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনা করলেই বোঝা যাবে, সত্য সত্যই কুটীরশিল্পের তথা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটা কোন পরিকল্পনায় কতখানি গুরুত্ব লাভ করেছে।

শ্রীমননারায়ণ আগরওয়ালার গান্ধী পরিকল্পনায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এইরকম আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে :

জমিদারী উচ্ছেদের জন্য জমিদারদের ক্ষতিপূরণ	২০০	কোটি	টাকা
কৃষি ও সেচ	৯৭৫	,,	,,
কুটীরশিল্প	৩৫০	,,	,,
বৃহৎ মৌলিক শিল্প	১০০০	,,	,,
যাতায়াত ব্যবস্থা	৪০০	,,	,,
জনস্বাস্থ্য	২৬০	,,	,,
শিক্ষা	২৯৫	,,	,,
গবেষণা	২০	,,	,,
মোট	৩৫০০	,,	,,

বর্তমান জাতীয় সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য এই রকম আর্থিক বরাদ্দ করা হয়েছে :

কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন	১৯১ ৭০	কোটি টাকা
সেচ ও শক্তি	৪৫০ ৩২	,, ,,
যাতায়াত ব্যবস্থা	৩৮৮ ১২	,, ,,
বৃহৎ শিল্প	৭৯.৫	,, ,,
কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	১৫ ৮	,, ,,
গবেষণা ইত্যাদি	৫ ৭	,, ,,
সমাজসেবা	২৫৪ ২২	,, ,,
পুনর্বাসন	৭৯	,, ,,
বিবিধ	২৮ ৫৪	,, ,,
মোট (প্রায়)	১৪৯৩	,, ,,

দু'টি পরিকল্পনা তুলনা করলে দেখা যায় যে, গান্ধী পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের জন্য অনেক বেশি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং মাত্র এই একটি অঙ্কের জোরে অবশ্যই বলা যায় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পকে খুবই অল্প টাকা দিয়ে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, দুই পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের অর্থগত বরাদ্দের আনুপাতিক হিসাব তুলনা করলে কি দেখা যায়? শ্রীআগরওয়ালার গান্ধী-পরিকল্পনায় বৃহৎশিল্পকে তুচ্ছ করা হয়েছে, না বেশ ভালরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই কি গ্রাম-জীবনের দাবী ঐ গান্ধী-পরিকল্পনার দাবীর তুলনায় কম ক'রে স্বীকার করা হয়েছে?

গান্ধী-পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৫০০ কোটি টাকা। এর কতটুকু অংশ গ্রাম-জীবনের সেই প্রধান দাবী কৃষি-উন্নয়নের জন্য ধরা হয়েছে? দেখা যাচ্ছে যে, মোট বরাদ্দের শতকরা ২৭.৮ ভাগ মাত্র কৃষি ও সেচের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেখতে পাই, কৃষি ও সেচের জন্য মোট বরাদ্দের শতকরা ৪৩ ভাগ ব্যয় করার কথা বলা হয়েছে।

অপর দিকে বৃহৎ শিল্পের জন্য দুই পরিকল্পনার বরাদ্দের আনুপাতিক পরিমাণটা কি?

শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়ালা পরিকল্পনার মোট বরাদ্দ অর্থের শতকরা ২৮ ৭ ভাগ বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠায় এবং প্রসারে ব্যয় করতে চাইছেন। কিন্তু জাতীয় সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দের মাত্র শতকরা ৫.৩ ভাগ বৃহৎ শিল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

কৃষি, বৃহৎ শিল্প এবং কুটীরশিল্প—এই তিন ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সমগ্র ব্যয়ের কত অংশ অর্থাৎ শতকরা কত ভাগ ব্যয় করার কথা দুই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে? সংক্ষেপে দাঁড়ায় এই :

গান্ধী পরিকল্পনা :

কৃষি	২৭.৮
বৃহৎ শিল্প	২৮ ৭
কুটীরশিল্প	১০ ৩

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা :

কৃষি	৪৩.০
বৃহৎ শিল্প	৫.৩
কুটীরশিল্প	১.০

এই হিসাবের দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন প্রশ্ন করতে পারি—দুই পরিকল্পনার মধ্যে কোনটির বিরুদ্ধে কি বলবার আছে?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের জন্য আর্থিক বরাদ্দের অনুপাত কম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অন্য বরাদ্দগুলির দিকে তাকিয়ে বলা যায় কি, এ পরিকল্পনায় গ্রাম জীবনের উন্নয়নের দিকটি অবজ্ঞাত হয়েছে? কৃষি ও সেচের প্রতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গান্ধী-পরিকল্পনার তুলনায়।

তারপর হলো ইণ্ডাস্ট্রি অথবা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমের কথা। বৃহৎ শিল্পের জন্য শ্রীআগরওয়ালা সমগ্র পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দীকৃত অর্থের শতকরা ২৮.৭ ভাগই ব্যয় করতে চান। আর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ব্যয় করতে চান শতকরা ৫.৩ ভাগ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্প ও কুটীরশিল্প, উভয়েরই জন্য অল্প পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে, এমন অভিযোগের ভিত্তি খুঁজে তো পাওয়া যায় না।

তবে যদি অভিযোগ খুঁজে বের করতেই হয়, তবে মাত্র এইটুকু বলতে পারা যায় যে শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়ালার গান্ধী-পরিকল্পনায় অর্থের বরাদ্দের দিক দিয়ে বৃহৎ শিল্পকে কুটীরশিল্পের তুলনায় তিন গুণ সমাদর করা হয়েছে, এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ শিল্পকে কুটীরশিল্পের তুলনায় পাঁচগুণ সমাদর করা হয়েছে। এইমাত্র পার্থক্য। অপরদিকে তেমনি বলা যায় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকে শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়ালার পরিকল্পনার তুলনায় কয়েক গুণ বেশি মর্যাদা দান করা হয়েছে।

সুতরাং শ্রীমন্নারায়ণ আগরওয়ালার 'গান্ধী-পরিকল্পনা'কেই যদি গান্ধীসমর্থিত পরিকল্পনা বলে ধরে নিই, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে গান্ধী-নীতিসম্মত বলে মনে করতে আপত্তি করবার কোন যুক্তি আছে কি?

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এইটুকু দেখতে পাচ্ছি যে, কৃষি ও কুটীরশিল্পের মধ্যে তুলনায় কৃষির প্রতিই বেশি আগ্রহ, উদ্যোগ, আর্থিক ব্যয়ের সঙ্কল্প করা হয়েছে। কিন্তু মাত্র এই কারণেই কি এ পরিকল্পনাকে গান্ধী-নীতিবিরোধী বলা সঙ্গত? আজ দেশের ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তিত পটভূমিকার বাস্তবতাটুকু লক্ষ্য করে বিচার করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ভারতের গ্রাম-জীবনের উন্নয়নের জন্য কুটীরশিল্পের চেয়েও কৃষির উন্নতিকেই আগের প্রয়োজন বলে মনে করা কর্তব্য। কুটীরশিল্পের উন্নয়নের প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করে না। কুটীরশিল্প উন্নত না হলে গ্রাম-ভারতের অর্থনীতিও স্বচ্ছল এবং কল্যাণকর হবে না, একথা সর্বাংশে সত্য। কিন্তু কৃষিকে অনুন্নত করে রেখে অথবা যথোচিত উন্নত না করে কি কুটীরশিল্পকে তার স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বনিয়াদ দিতে পারা যায়? তাছাড়া একথাও বলা যায়, কৃষিকে প্রধান মর্যাদা দান করে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা বস্তুত কুটীরশিল্পেরই স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বনিয়াদটুকু বাস্তবসম্মতভাবেই রচনা করতে বেশি সাহায্য করবে।

শ্রীমননারায়ণ আগরওয়ালার গান্ধী-পরিকল্পনায় কৃষির জন্য কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ইণ্ডাস্ট্রির জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে—এটা যদি গান্ধীপন্থীদের কাছে কোন ত্রুটি বলে না মনে হয়, তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কুটীরশিল্পের জন্য কম অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারটিকেও ভয়ংকর কোন ত্রুটি বলে মনে করা সঙ্গত হবে না। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে এই দুই পরিকল্পনার কোন্‌টিকে তিনি বেশি সঙ্গত বলে মনে করতেন, সেটা কেউ জোর করে বলতে পারেন না।

গণতন্ত্রের জিজ্ঞাসা

ন' বছরের স্বাধীনতার জীবনে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির হিসাব মিলাতে যদি মন রাজী হয়, তবে মনের কাছে কোন্ প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে? কি পেয়েছি? অথবা কি পাইনি? পেয়েছির সীমা আছে, কিন্তু পাইনির সীমা নেই। প্রাপ্তির হিসাব গুনে গুনে বলে শেষ করে দিতে পারা যায়, কিন্তু অপ্রাপ্তির সংখ্যা অনেক। তাই এই যুক্তিতে কোন ভুল নেই যে, বিগত ন' বছরের জাতীয় কৃতিত্বের পরিচয় পেতে হলে প্রাপ্তির কীর্তিগুলির দিকেই আগে তাকাতে হয়। এবং কোনই সন্দেহ নেই যে, ভারতের বিগত ন' বছরের স্বাধীনতা জীবন অজস্র কীর্তিকর সৃষ্টির ও প্রতিষ্ঠার জীবন। অনেক সঙ্কটের বিহ্বলতা দূরীভূত হয়েছে, বহু বাধা পরাভূত হয়েছে, এবং জ্ঞান ও কর্মের অনেক নতুন পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু শুধু এই কৃতিত্বের হিসাবের দিকে, অর্থাৎ পেয়েছির তালিকাটির দিকে তাকিয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যাওয়াও এক ধরণের মানসিক দৈন্যের সত্যতা প্রমাণিত করে। কৃতিত্বগুলিরই রূপ ও প্রকৃতির বিচার প্রয়োজন, শুধু তালিকার ও সংখ্যার বৃহত্ত্বটিই একটা বৃহৎ অথবা মহৎ সার্থকতা নয়। যে কোন জাতির জীবনে তার সব চেয়ে অবনত অকর্মণ্য ও গ্লানিকর যুগের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কীর্তি ও কৃতিত্বের দিক দিয়ে এমন দৈন্যের যুগও একেবারে শূন্যতা ও ব্যর্থতার যুগ নয়। জাতির সব চেয়ে বেশি দীনতার যুগের ইতিহাসও কিছু না কিছু কৃতিত্বের চিহ্ন রেখে যায়। এবং শুধু এই সব কৃতিত্বের চিহ্ন কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করলে হিসাবের মস্ত বড় পাতাও ভরে যাবে।

বিগত ন' বছরের স্বাধীনতার জীবনে কি পাইনি, তার হিসাবও করতে চাই না, কেন না এমন হিসাবের শেষ নেই; শেষ হয় না। কিন্তু একটি প্রশ্ন নিশ্চয়ই সঙ্গত প্রশ্ন। যা পাওয়া উচিৎ ছিল, তার কি সবই পাওয়া গিয়েছে? মধু আর দুধের বন্যায় দেশের নদনদী আর খাল কেন ভরে গেলনা, এই প্রশ্ন নয়। একটি সোজা ও সরল প্রশ্ন, বিগত ন' বছরের স্বাধীনতার জীবনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কতখানি সত্য হয়ে উঠতে পেরেছে?

সংবিধানের ভুল অথবা দোষ ধরতে চাই না। সংবিধানের প্রতিশ্রুতিগুলির মহত্ত্ব স্বীকার করি; এবং সেই কারণেই এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে—দেশের প্রশাসন কি নিষ্ঠার সঙ্গে সংবিধানের প্রতিশ্রুতিগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জনজীবনের প্রতি, তার কর্তব্য পালন করে চলেছে? সবারই সমান অধিকার, এই মহৎ গণতান্ত্রিক প্রতিশ্রুতি সংবিধানে আছে। কিন্তু শুধু এই প্রতিশ্রুতির থাকাটাই কি যথেষ্ট? পাঁজি নিঙড়ালে এক ফোঁটাও জল বের হয় না। সুতরাং শুধু সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি জনজীবনকে একটি মহৎ ও স্বচ্ছন্দ গণতান্ত্রিক অধিকারে প্রসন্ন করে তোলে না। সংবিধান বস্তুত রাষ্ট্রিক জীবনাদর্শের এক থিওরীর অধিক কোন বস্তু নয়। প্রশাসন সেই থিওরীর ফলিত অথবা ব্যবহারিক রূপ। এমন অভিযোগ

করবার যথেষ্ট হেতু আছে যে, বিগত ন' বছরে সুযোগ সত্ত্বেও দেশের প্রশাসন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করবার মত গতিশীলতার পরিচয় দিতে পারেনি। সাধারণ মানুষ জানে, অমুক ক্রোড়পতির মত তারও শুধু একটি ভোটের অধিকার আছে। কিন্তু এই জানাটুকুই সার, এবং শুধু এই ভোটের অধিকার এর আনন্দ উপলব্ধি করে সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনই এই সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয় যে, তার নাগরিক জীবন গণতান্ত্রিক গৌরবে প্রসন্ন হয়ে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে যেন গীতোক্ত কর্মযোগের মত এক ধরণের দার্শনিকতা মেনে নিতে হচ্ছে। শুধু কর্মেই অধিকার, মা ফলেষু কদাচন। গণতন্ত্রকে সম্ভব করবার জন্য যে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, শুধু তাই প্রয়োগ করা আর পালন করার কাজ। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাজনিত সুফলের শেয়ার? সাধারণ মানুষের মন রূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করে, অধিকার তো আছে, কিন্তু সুযোগ কই?

সংবিধান সমান অধিকারের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু শুধু অধিকারের সত্যতাই নাগরিক জীবনের গণতান্ত্রিক সার্থকতা পূর্ণ করে তোলে না। সকলেই সমান সুযোগ পাবে, এই প্রতিশ্রুতিও সংবিধানে আছে। কিন্তু সুযোগ রচনার কর্তব্যে ব্রতী হয়ে ন' বছরের মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের জন্য কি সত্যই এক একটি বৃহৎ সুযোগের সিংহদ্বার মুক্ত করে দিতে পেরেছে?

আক্ষেপ করে বলতে হয়, সুযোগ রচনার ক্ষেত্রে ভারতের গণতন্ত্র বিচিত্র এক কুণ্ঠায় অভিভূত হয়ে রয়েছে। দায়িত্ব আছে অথচ ক্ষমতা নেই, এমন কর্তৃত্বের পদ যেমন পঙ্গু, অধিকার আছে অথচ সুযোগ নেই, জনজীবনে এমন গণতন্ত্রও তেমনই পঙ্গু। হিসাব মিলালে এই শোচনীয় সত্যেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যে, ভারতের ন' বছরের গণতন্ত্রে জনজীবনের উন্নয়নের সুযোগ রচনার ক্ষেত্রে সর্বতোভদ্র রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। এই গণতন্ত্রের সকল দিক মুক্ত নয়। যেখানে সুযোগ প্রদানের প্রশ্ন, সেখানে প্রবেশপথ এখনও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য বিশেষভাবে মুক্ত, বিশেষ করে বিত্তবান শ্রেণীর জন্য। প্রিভিলেজড তথা সুযোগ সম্পন্ন শ্রেণী আরও বড় সুযোগের নাগাল পেয়েছে, কিন্তু সেই অনুপাতে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ এখনও নতুন সুযোগ বা বেশি সুযোগের নাগাল পায়নি বললেই চলে। ধনীর গবেট পুত্রের পক্ষে সরকারী বৃত্তি পাওয়া অথবা কর্মপদ পাওয়া যত সহজে সম্ভব, গরীব পরিবারের কোন প্রতিভাবান সন্তানের পক্ষে এমন প্রাপ্তি ঠিক সেই অনুপাতে অতি দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব।

সম্পদের তথা ভোগের সমতা ও সমবণ্টনের কথা ছেড়ে দিই। স্ট্যাটিস্টিক্স নাকি একটি বিজ্ঞান, কিন্তু মাঝে মাঝে এই স্ট্যাটিস্টিক্স যে কত বড় বিদ্রূপ, তার প্রমাণও ন' বছরের স্বাধীনতার জীবনে সাধারণ মানুষকে দেখতে ও ভুগতে হয়েছে। মাথা প্রতি কিংবা গড়পড়তা উন্নতির হিসাব যখন সরকারী বিবরণীতে উল্লিখিত হতে দেখি, তখনই এই বিদ্রূপের দংশন অনুভব করতে হয়। ভারতে মাখনের ব্যবহার হলো দৈনিক মাথা পিছু দেড় ছটাক। এই তথ্যের মধ্যে কোন বাস্তবতা আছে কি? এই তথ্যের দিকে অপলক চক্ষে তাকিয়ে থাকলেও ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে মাখন-খাওয়ার আনন্দ সত্য হয়ে উঠবে না, কিন্তু সরকারী হিসাববিশারদ বস্তুতঃ এই রকমেরই অলীকত্বকে একেবারে অঙ্ক করে ঘোষণা করে থাকেন। সুযোগের সমতা যেখানে খণ্ডিত সেখানে সেখানে এই রকম গড়পড়তা উন্নতির হিসাব অঙ্কের ছলনা না হয়ে পারে না। বিগত ন' বছরে দেশের সাধারণ

মানুষের গড়পড়তা আয় ও মাথাপিছু আয় কতখানি বৃদ্ধি লাভ করেছে, তার একটা আঙ্কিক তথ্য উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হয় বলেই এই আক্ষেপ করতে হচ্ছে।

জাতীয় জীবনের সব সৌষ্ঠব, শক্তি ও আনন্দ নষ্ট করে চলেছে যে দুটি প্রধান অভিশাপ—দুর্নীতির প্রকোপ এবং খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল, সেই দুই অভিশাপ কি ভারতের ন' বছরের প্রশাসনিক ইতিহাসে কখনো ভয় পেয়েছে বা কুণ্ঠিত হয়েছে? সরকারের যে-কোন কর্মদপ্তরের কাছে প্রয়োজনের সূত্রে যখন কোন গরীব মানুষকে যেতে হয়, তখন তাকে জীবনের নৈতিক মর্যাদাকেই বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়। উৎকোচ না দিয়ে একটি কর্মও সহজে পাওয়া যায় না। সরকার দুর্নীতিনিরোধক আইন করেন। কিন্তু এই রকম এক একটি আইনও বস্তুতঃ এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর পক্ষে নতুন উৎকোচের পথ খুলে দেয়। কল্যাণমূলক আইনও সাধারণের জীবনে নতুন পীড়নের অস্ত্রে পরিণত হয়। বিগত ন' বছরে সরকারী আচরণে মনোভাবে ও যুক্তিতে অতিবিচিত্র একটি দীর্ঘসূত্র ঔদাসীন্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, ভেজাল নিরোধক আইন প্রবর্তনের উদ্যোগে। জনজীবনকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছে যে অভিশাপ, তার সঙ্গে সরকারের গণতান্ত্রিক প্রশাসন যেন এক ধৈর্যের প্রতিযোগিতা করে চলেছেন ;বিচিত্র এক আপোষ। অথচ সরকার এমন অনেক আইন রচনায় অত্যন্ত পরিশ্রম ও উৎসাহের পরিচয় দিয়ে থাকেন, যেসব আইন দু-তিন বছর পরে প্রবর্তন করলেও নিরীহ মানুষের পক্ষে প্রাণান্তিক পীড়নের হেতু হতো না।

বলা হয়ে থাকে, কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হলো ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য। খুব সত্য কথা, ভারত পুলিশী রাষ্ট্র হতে চায় না। কিন্তু পুলিশী-রাষ্ট্রের একটি বড় লক্ষণ অথবা বৈশিষ্ট্য এই যে, এই রাষ্ট্র তার প্রশাসন পরিচালনার কার্যে নিযুক্ত কর্মী ও কর্মচারীর সুখ-সুবিধাকেই বড় করে দেখে থাকেন, থানা এবং ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িটিই সবচেয়ে ভালো হবে, ব্রিটিশ আমলের এই নীতির কোন ব্যতিক্রম আজও হয়েছে বলে মনে হয় না। জাতীয় সরকার কর্মচারী-সমাজের জন্য ভাল ভাল অট্টালিকা ও আবাস নির্মাণের উদ্যোগে যতটা আগ্রহ ও অর্থব্যয় সঙ্কল্পের পরিচয় দিয়ে থাকেন, দেশের সম্পদ-উৎপাদক কর্মী জনসমাজের গৃহাবাসের জন্য তার শতাংশের একাংশ আগ্রহেরও পরিচয় দিয়েছেন কি? অথচ আমরা জানি যে, কল্যাণ রাষ্ট্রে সাধারণ কর্মচারী সমাজ, অর্থাৎ যাদের পরিশ্রমে সম্পদ উৎপাদিত হয়, সেই চাষী ও শ্রমিকের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ সৃষ্টি করাই কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য। কিছুই করা হয়নি, একথা বলা উচিৎ নয়। কিন্তু ঝোঁকটা কোন্ দিকে? প্রশাসনিক প্রয়োজনের জন্য পাকা-পোক্ত ইমারত রচনার দিকে, অথবা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সুলভ গৃহনির্মাণের দিকে? যে-কোন উন্নয়নী পরিকল্পনার মধ্যে সেই নীতিগত আগ্রহটি সুস্পষ্ট নয়, যেটি স্পষ্ট হলে বুঝতে পারা যেত যে, ভারতের গণতন্ত্র ঠিক পথে আছে। কল্যাণ-রাষ্ট্র স্থাপনের সাংবিধানিক আদর্শের মধ্যে প্রশাসনের নীতিহীনতা মাঝে মাঝে অনেক বেশি জল মিশিয়ে দেয়, এই অভিযোগের মধ্যে বোধ হয় অতিশয়োক্তি নেই।

আদালতের সাহায্যে তথা সুবিচার আজও জনসাধারণের কাছে অগ্নিমূল্য দাবী করে, যার জন্য আদালতের সাহায্যও বস্তুতঃ বিত্তবান শ্রেণীর বিশেষ সুবিধায় পরিণত হয়ে রয়েছে। কুইক জাস্টিস, দ্রুত সুবিচার, জনজীবনে গণতান্ত্রিক সার্থকতা ও সততার একটি

বৃহৎ নিদর্শন। কিন্তু কে অস্বীকার করতে পারে যে, দেশের গরীব জনসাধারণ সুবিচারের সাহায্য গ্রহণে শুধু অক্ষম নয়, অনুৎসাহীও বটে। অন্যায়ের পীড়নে আক্রান্ত নিরীহ নাগরিক আদালতের সাহায্য ও উপকারকে অগ্নিমূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। এই অবস্থা পুলিশী রাষ্ট্রেরই লক্ষণ।

সরকার যখন জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন তখন শতকরা সাড়ে তিন অথবা চার হারে সুদ-এর প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। শুনেছি, মহাজনী কারবারে খাতকের কাছ থেকে আদায়যোগ্য সুদের মাত্রা সরকার আইন করে বেঁধে দিয়েছেন। কিন্তু সরকার যখন জনসাধারণকে ঋণ দান করেন, তখন সুদের হার মাত্রার বাইরে চলে যায়। দৃষ্টান্ত পশ্চিমবংগের কল্যাণী পরিকল্পনা। বাড়ি কিনলে সরকারকে শতকরা আট টাকা হারে সুদ দেবার নিয়ম করা হয়েছে। এই কি গণতন্ত্রোচিত নীতি? জনসাধারণকে দেবার সময় যে নীতি, নেবার সময় সেই নীতিরই ব্যতিক্রম?

সরকারী প্রধানেরা জনসাধারণকে জাতীয় ঐক্য এবং সাংবিধানিক আদর্শের মর্যাদা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত এই ন' বছরের ইতিহাসেও নিতান্ত বিরল নয়, যার মধ্যে দেখা যাবে যে রাজ্য সরকার প্রকাশ্যভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা করছেন। গভর্ণরেরা সংবিধানেরই ঘোষিত কোন নীতির বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে থাকেন। ডাঃ কাটজু ও শ্রী আনে রাজ্যপাল পদে প্রতিষ্ঠিত থাকাকালেই বক্তৃতা করতেন যে, সংস্কৃত ভারতের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিৎ। শ্রী হরেকৃষ্ণ মহতাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপদে থাকার কালেই মাদক বর্জনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন। রেলওয়ের পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে এই কলকাতা সহরের হরতালকে রাজ্য সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জনসাধারণের মতের অভিব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সরকার এবং সরকারীরাই যদি এই আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তবে অন্য পরে কা কথা? রাষ্ট্রপতি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বহু বিবৃতিতেই প্রকাশ্যভাবে কমিশন নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রচার করেছিলেন। গণতান্ত্রিক আদর্শের মর্যাদা রক্ষার জন্য মনোভাবে ও আচরণে যে নীতিসম্মত শৃঙ্খলা ও সংযম প্রয়োজন, সেটা রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালেরাও যদি ক্ষুণ্ণ করেন, তবে কোথায় বাঁধিব তাগা?

বিগত ন' বছরে রাষ্ট্রিক জীবনের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের পক্ষে ম্রিয়মান হবার এই একটি বড় কারণ যে, গণতন্ত্রের সুফল তার পক্ষে সহজলভ্য হয়ে উঠতে পারেনি। প্রশাসন যেন গণতন্ত্রের সঙ্গে অগণতন্ত্রের বিচিত্র এক ভেজাল রচনা করে চলেছে, যে-কারণে সাধারণ মানুষের মনোবলও ক্ষুণ্ণ হয়েছে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছা, অভিমত ও উৎপাতের প্রকোপ থেকে নিরীহ নাগরিককে সরকার রক্ষা করতে পারেন না, এই শোচনীয় সত্য এই কলকাতা সহরেও অনেক হরতালের ঘটনার সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে। অপরদিকে, অর্থাৎ রাজনীতিক পরিবেশের দিকে তাকিয়ে জনসাধারণ আর এক হতাশায় মনোবল হারাতে বসেছে। বিগত ন' বছরের মধ্যে দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে এমন কোন সুসংহত 'অপোজিশনের' আবির্ভাব হতে দেখা গেল না, যার দিকে তাকিয়ে সাধারণ মানুষ এই অবস্থায় আশান্বিত হতে পারে যে, সরকারের বিরোধী হয়েও একটি যোগ্য এবং দায়িত্ববোধপ্রবণ সংহতি আছে যার হাতে দেশের প্রশাসনিক কর্তব্য পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। স্বাধীন ভারতের ন' বছরের ইতিহাসের একটি বৃহৎ অগৌরব,

রাজনীতিক প্রতিভার একটি দুঃখকর ব্যর্থতার প্রমাণ এই যে, কোন যোগ্য 'অপোজিশন' সুসংহত রূপ নিয়ে এবং গঠন-কর্মকুশল মনোভাব, দায়িত্ববোধ ও আগ্রহ নিয়ে দেখা দিল না।

মৈত্রীভাবনা

ভারত ইতিহাসের শত ঘটনায় এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, মৈত্রীভাবনাই জাতিকে শক্তিদান করে। ধর্ম, ভাষা, শিল্প ও সাহিত্য এবং নিতান্ত একটি তত্ত্ব অথবা ভাবকল্পনাও বড় হয়ে ওঠে তার আহরণী গুণে। এবং ভিন্নকে আপন করার শক্তি মানুষের সেই মন ও বুদ্ধি অর্জন করতে পারে, যে মন এবং যে বুদ্ধি মৈত্রীভাবনায় গঠিত। শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় গঠিত পৃথিবীতে আজ পর্যান্ত কোন জাতি শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে পারেনি। অপর জাতিকে ঘৃণা করে কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত নিজেকে শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারেনি। শুধু জাতির জীবনে নয়, যে কোন সমাজ এবং ব্যক্তির জীবনেও নানা ঘটনায় এবং পরিণামে এই অমোঘ সত্যটিই প্রমাণিত হয়েছে যে, মৈত্রীভাবনার অভাবে তার সাংস্কৃতিক শক্তি কুণ্ঠিত হয়েছে। মানুষের ইতিহাস তো মৈত্রীভাবনারই প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আজ পৃথিবীতে বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমা ও সীমানায় চিহ্নিত এক একটি দেশের মানবসমাজ বিভিন্ন 'জাতি' পরিচয় গ্রহণ করেছে, তার জাতীয়তাও বহু বিভিন্ন সমবায়, সমষ্টি অথবা সম্মিলন। বহু বিভিন্ন গোষ্ঠীগত সংহতি তার আদিম অথবা প্রাচীন সম্বন্ধবোধের সীমা প্রসারিত করে বৃহত্তর সমাজ-আয়তন সৃষ্টি করেছে। শুধু সামাজিকতার ইতিহাস নয়, বিভিন্ন জাতির ধর্ম, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্কৃতিগত আধারও বহু বিভিন্নের আহরণে ও সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।

একথাও সত্য যে, অমৈত্রীভাবনাও মানুষের ইতিহাসকে চিরকাল বহু আঘাতে জর্জরিত করেছে। সমন্বয়ের প্রক্রিয়া অবরুদ্ধ করার জন্য বিরুদ্ধ একটা অপশক্তিও মানুষ জাতির জীবনে সর্বদাই সক্রিয়। কিন্তু মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়েছে মৈত্রীভাবনারই পথে অগ্রসর হয়ে, আর ঐ অপশক্তিকেই নিরোধ করে। নিতান্ত প্রিয়জনের প্রতি এবং স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির ভাব থাকলেই ভাবুকের মনে মৈত্রীভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। চিত্তবৃত্তি ও অনুভূতির আরও বৃহৎ প্রসারতা এবং গভীরতা চাই। অপর অপরিচিত এবং ভিন্নকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করার আগ্রহ মনোভাবে সত্য হয়ে উঠলেই তবে মৈত্রীভাবনার সঞ্চার সহজ এবং স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারে। 'টলারেন্স' তথা সহিষ্ণুতার আদর্শ অপরকে এবং অপরের মত মন ভাব ও নীতিকে, আর ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিল্পকে শুধু সহ্য করবারই শিক্ষা দিয়ে থাকে। এই 'টলারেন্স' অপরের অস্তিত্ব অধিকার এবং উন্নতির একটা আচরণগত স্বীকৃতি মাত্র ;কিন্তু মৈত্রীভাবনার প্রকৃত ভিত্তি নিছক আচরণগত সহিষ্ণুতার ওপর নির্ভর করে না। ভিত্তি হলো মনোগত ভাব, অভিলাষ ও অনুভূতি। চাই শ্রদ্ধা, নিছক সহিষ্ণুতা তথা টলারেন্স নয়। প্রকৃত মৈত্রীভাবিত চিত্তের শ্রদ্ধা কোন সীমা স্বীকার করে না। গৌতম বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য, মহাত্মা গান্ধী, এবং যুগে যুগে পৃথিবীর আরও কত মনীষী এই মৈত্রীভাবনার শ্রেষ্ঠতম পরিচয় ঘোষণা করে গেছেন, উদারতম এক নীতির বাণী প্রচার করে: শত্রুকেও ভালবাসতে হবে। মানুষের সামাজিক মনকে এত বড় নীতির দীক্ষা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে তাঁরা বস্তুতঃ মানুষকে আত্মিক উপলব্ধির সেই পরম

আদর্শের প্রথম কথাটি বলে দিয়ে গেছেন। যে মৈত্রীভাবনার গুণে শত্রুও ভালবাসার আস্পদে পরিণত হয়, সে ভাবনা নিখিল প্রাণের সঙ্গে, বস্তুতঃ নিখিল অস্তিত্বের সঙ্গেই ভাবুকের মনে এক দিব্য ঐক্যানুভূতি সার্থক করে তোলে। মৈত্রীভাবনাই অদ্বৈত-ভাবনায় পরিণত হয়।

মৈত্রীভাবনার নিগূঢ়ার্থ এবং আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন দার্শনিক। সে প্রসঙ্গ থাক। সমাজ এবং সংস্কৃতির রূপগত বিবর্তনের ইতিহাসে মৈত্রী-ভাবনারই সত্যতা যুগে যুগে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, অমৈত্রীভাবিত মন নিয়ে কোন দেশের কোন সমাজ বা জাতি কোনদিন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন উৎকর্ষ বা উন্নতির পরিচয় দিতে পারেনি। ভারতের ইতিহাসে মৈত্রী ও অমৈত্রী, দুই ভাবনারই প্রক্রিয়া দেখা যায়। ভারত সংস্কৃতি উভয়েরই দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। ভারতের সমাজজীবনে এবং সংস্কৃতিতে আজ সুন্দর সুস্থ ও কল্যাণকর যা কিছু আছে, তার সবই মৈত্রীভাবনার জয় এবং অমৈত্রীর পরাজয় হতে উদ্ভূত। পৃথিবীর সকল দেশের ও জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। মানুষের ইতিহাসে অথবা পৃথিবীতে একমাত্র ভারতই মৈত্রীভাবনার আদর্শ উপলব্ধি ও প্রচার করেছে, একথা বললে বস্তুতঃ অতিশয়োক্তি করা হয়। তবে ভারতকেই 'মৈত্রীভাবনার ভারত' বলে আখ্যা দেবার এই যুক্তি আছে যে, এই ভারতেই মৈত্রীভাবনার আদর্শ সর্বপ্রথম ঘোষিত হয়েছে, এবং ভারতের শত সহস্র সাধক, কবি, শিল্পী, সুধী ও মনীষী এই আদর্শ মানুষের কাছে তাঁদের জীবনের সাধনা ও বাণীর দ্বারা প্রচারিত করেছেন।

দু'-হাজার বছরেরও আগে এই ভারতেরই প্রিয়দর্শী অশোক মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাকে প্রচণ্ড অথচ সহজ এক ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবার জন্য যে নীতি তাঁর একটি শিলালেখে উৎকীর্ণ করে রেখে গিয়েছেন, সেই নীতি এই ভারতেই অনেকবার বিস্মৃত হয়েছে। সাহবাজ গড়ি়র শিলালিপি বলে, যে পরধর্ম সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধা করে সে সম্প্র-দায়ের এবং নিজ ধর্ম সম্প্রদায়কের কল্যাণ সাধন করে। যে পরধর্ম সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে, সে পরধর্ম সম্প্রদায়ের ক্ষতি তো করেই, নিজ ধর্ম সম্প্রদায়েরও ক্ষতি সাধন করে। অশোকের এই বাণীতে নিতান্ত একটি 'টলারেন্স'র আদর্শ নয়, পরসংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার আদর্শই প্রচারিত হয়েছে। জাতির রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে যথার্থ 'সেক্যুলার' আদর্শের মূলনীতিই অশোকের এই শিলাশাসনের বাণীতে নিহিত রয়েছে। জার্মান কবি গ্যেটে বলেছেন— যে ব্যক্তি একটি মাত্র ভাষা জানে, সে কোন ভাষাই জানে না। ইংরাজ কবিও বলেছেন— What does he know of England, who only England knows ? কবিদ্বয়ের এই উক্তির তাৎপর্য ঐ অশোকের বাণীর তাৎপর্যের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছে। পরসংস্কৃতির সঙ্গে নিছক 'পরিচয়' থাকলেও নিজ সংস্কৃতিকে বুঝবার এবং উন্নত করবার যোগ্যতা লাভ করা যায়। পরসংস্কৃতির প্রতি 'শ্রদ্ধা' থাকলে নিজেকেই শ্রেষ্ঠতম সাংস্কৃতিক যোগ্যতার অধিকারী করা যায়।

'রেনেসাঁস' নামে সাংস্কৃতিক নবজীবনের যে উন্মেষ য়ুরোপের জীবনে শিল্পকলা সাহিত্য ও সঙ্গীত এর এক নতুন ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা সত্য করে তুলেছিল, সে রকম ঘটনা পৃথিবীর বহু জাতির জীবনে যুগে যুগে ঘটতে দেখা গিয়েছে। এই 'রেনেসাঁস' এক সংস্কৃতির সঙ্গে আর এক সংস্কৃতির অন্তরঙ্গ সম্মেলনের সৃষ্টি। এক জাতির মন আর এক জাতির মনের,

এক যুগের মন আর এক যুগের মনের রূপ কল্পনা, ছন্দ এবং সুরের পরিচয় লাভ ক'রে এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে সমন্বিত আহৃত ও আত্মস্থ করেই সাংস্কৃতিক নবজীবন লাভ করেছে। ওয়াল্টার পেটার তাঁর লিখিত 'রেনেসাঁস' নামে এক গ্রন্থে একটি বিচিত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। জেরুসালেম থেকে জাহাজ বোঝাই করে 'পবিত্র মাটি' নিয়ে এসে ইটালীর পিসা নগরের কাছে এক গ্রামের মাটিতে মেশানো হয়েছিল, নতুন এক চ্যাপেল রচনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ঐ পবিত্রীকৃত ভূমির উপর। ঐ ভূমিতে ইটালীর পরিচিত পুষ্পতরুর বীজ বপন করা হয়েছিল :কিন্তু সেই বীজ থেকেই সেই ভূমিতে এক নতুন রকমের ফুলের ফসল দেখা দিল ; বর্ণে, সৌরভে ও গঠনে আরও সুন্দর নতুন এক শ্রেণীর ফুল।

পেটার কথিত এই কাহিনীর মধ্যে সাংস্কৃতিক তত্ত্বেরই একটি বাস্তব নীতিরই সার্থকতা যেন ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই নতুন ফুল, এই সুন্দরতর নূতনত্ব বস্তুতঃ দুই মাটির পরস্পরের শ্রদ্ধার ও মৈত্রীর সৃষ্টি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভিন্নজাতিকে অথবা ভিন্নদেশীয় রুচি রীতি ও মনকে অবাঞ্ছিত বলে দূরে সরিয়ে রাখাই সাংস্কৃতিক সজীবতার লক্ষণ নয়। পরসংস্কৃতিকে ভয় করা অথবা ঘৃণা করা জাতীয় মনের ভীরুতারই প্রমাণ। এবং এই ভীরুতা কোন জাতির নিজ সংস্কৃতিকেও বলিষ্ঠ করে তোলেনি, তুলতে পারেও না।

পরসংস্কৃতির মর্য্যাদা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুভব করতে গিয়ে নিজ দেশের সাংস্কৃতিক রুচি ও রীতির ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হওয়া বা তুচ্ছ করার কোন প্রয়োজন হয় না। আত্মবিলোপের কথা নয়, নিছক ভিন্ন সাজে সজ্জিত হবার কথাও নয় ; মৈত্রীভাবনার গুণে জাতি সেই শক্তি পায়, যে শক্তির বলে সে জাতি পরসংস্কৃতির কল্যাণকর সৌন্দর্যটি আহরণ করতে পারে এবং তার ফলে নিজেরই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অধিকতর বিচিত্রতায় ঐশ্বর্যে ও শক্তিতে অন্বিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুধু ঘৃণা, অশ্রদ্ধা এবং সংশয়গুলিই মৈত্রীভাবনার অন্তরায় নয়। অশ্রদ্ধার বশে পরজাতি, পরধর্ম, পরভাষা ও পরসংস্কৃতির ওপর লগুড়াঘাতের ঘটনা পৃথিবীতে অনেক হয়েছে, এবং আজও হয়ে চলেছে। কিন্তু পরজাতি ও পরসংস্কৃতির কল্যাণ করবার জন্যই বেশ নিষ্ঠাশীল আগ্রহের বহু মিশন এবং জেহাদও মানুষ জাতিকে ভয়ানক ভাবেই উৎপীড়িত করেছে এবং আজও করে চলেছে। নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধার ভাবও নিতান্ত অহমিকায় পরিণত হয়ে যায়, যদি তার মধ্যে মৈত্রীভাবনার স্পর্শটুকু না থাকে। বিশপ হিবার তার কবিতায় এশিয়া ও আফ্রিকার সমুদয় হিদেনের জীবনকে 'ভ্রান্তির শৃঙ্খল' হতে মুক্ত করার জন্যই খৃষ্টধর্ম-এর প্রচার-প্রেরণার জয়গান গেয়েছেন। অন্ধকারে নিমজ্জিত কোটি কোটি হিদেনকে আলোর পথ দেখাতে হবে, সুতরাং 'আমার এই ধর্ম্মের প্রদীপটি কি তাদের ঘরে ঘরে না পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকতে পারি?' বিশপ হিবার একটা সদুদ্দেশ্যেরই ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এই ঘোষণা অমৈত্রীভাবনায় দূষিত। এখানে নিজের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধ প্রদীপের আলোকে পরিণত না হয়ে জ্বালায় পরিণত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থে 'পূর্ণিমা' কবিতার মধ্যে কবি সম্ভবতঃ মানুষের এই বিশেষ ভ্রান্তির রহস্যটাই বিচার করেছেন। নিজের ঘরের দীপশিখাও অনেক সময় বৃহত্তর উপলব্ধির অন্তরায় হয়ে ওঠে। যে পূর্ণিমার আলোকে প্লাবিত হয়ে রয়েছে নিখিলজীবন, সে পূর্ণিমার আলোক ঐ দীপশিখারই বাধায় ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। মনে হয়, এই

দীপশিখাই বুঝি সব। আর এই কক্ষের বাহিরে সবই অন্ধকার। কিন্তু এই দীপ নিভে যেতেই কক্ষের অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো অবাধ জ্যোৎস্নার ধারায়।

'যেমনি নিখিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে চকিতে পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।'

পল্লীর কবিও আক্ষেপ করেছেন 'ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই'। তাঁর মৈত্রীভাবনার সহজ ও স্বচ্ছন্দ চলার পথ মন্দিরে ও মসজিদে ঢেকে রয়েছে এবং গুরু ও মুর্শেদ এসে রুখে দাঁড়াচ্ছেন। আজকের পৃথিবীর অবস্থা দেখলেও পল্লী কবি ঠিক এইরকমই আক্ষেপ করতেন। শ্রেষ্ঠত্ববোধজনিত অহমিকা এবং অপরকে মতান্তরিত করবার উপকারপ্রবণ স্পৃহাও আজও মানুষের ধর্মগত, সংস্কৃতিগত এবং রাজনীতিগত জীবনে শান্তি, উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের এক বিরাট এবং জটিল বিঘ্ন সৃষ্টি করে রেখেছে।

স্বাধীন ভারতের সামাজিক জীবনও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরোধী এক অমৈত্রীভাবনা প্রচার করছে হিন্দুরাষ্ট্রবাদ নামক এক পরধর্মদ্বেষী রাজনৈতিকতা। প্রাদেশিক শ্রেষ্ঠত্বাভিমানও ভারতের সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশের পথে আর এক অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ভাষার আধিপত্য নিয়েও দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। যে মৈত্রীভাবনা যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত ও সার্থক করে, স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের সামাজিক জীবনে তারই বিঘ্নগুলি নানা রাজনীতিক ছদ্মবেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধর্মের নাম করে একটা দুই-জাতি থিওরী ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্য খণ্ডিত করেছে। কিন্তু প্রাদেশিক শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা এবং ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ববোধের মধ্যে সর্বনাশা বহু জাতি থিওরীই প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে। এই কুসংস্কার আর বেশী প্রবল হয়ে উঠলে ভারতকে আর একদিন এবং আর একবার অবশ্যই বহু খণ্ডে খণ্ডিত হতে হবে, এমন আশঙ্কা অযৌক্তিক নয়।

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের এবং প্রদেশবাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাটী, তামিলী, বেহারী সকলেরই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু বৈশিষ্ট্যের অর্থ অবশ্যই শ্রেষ্ঠত্ব নয় এবং বৈশিষ্ট্যের অর্থ প্রভেদও নয়। সকল প্রদেশই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা নিয়ে একটি মৈত্রীভাবিত আপনত্ব ও একত্বের সম্পর্কে এই ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতিকে রূপ দান করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিরই সবচেয়ে বেশী হানি করবে নতুন ভারত যদি ভাষা, ধর্ম ও জাত-পাতের অহঙ্কারগুলিকেই বড় করে তুলবার চেষ্টা চলতে থাকে।

অতীতে ভারতের মুসলমান কবি হালি 'বহ দীনে হিজাজীকা বেবাক বেড়া'—আরবের সেই নির্ভীক অভিযানকে বিশ্বময় করে তুলবার স্বপ্ন দেখতেন। সাম্প্রতিক কালের ভারতীয় কবি ইকবালও বিশ্বব্যাপী ইসলামীয় প্রতিষ্ঠার প্রেরণা প্রচার করেছেন। কিন্তু ইতিহাসই সাক্ষী, এই মনোভাব ইসলামের সুপ্রতিষ্ঠার পথে সহায়ক হয়নি এবং এই মনোভাব বিভিন্ন দেশের মুসলিম সমাজের সংস্কৃতিগত উন্নতিরও সহায়ক হয়নি। ধর্ম হোক, সংস্কৃতি হোক, বা রাজনীতি হোক, মৈত্রীভাবনার পথ ছাড়া অন্য পথে তার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকতে পারে না। অপরের সংস্কৃতিকে লুপ্ত করে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার রূঢ় সঙ্কল্প শুধু অপরের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু নিজের কোন কল্যাণ করতে পারে না। বর্তমান কালে পৃথিবীতে মুসলিম-অধ্যুষিত দেশগুলির মধ্যে যে কটি দেশে আজও 'দীনে হিজাজীকা' অভিযান বিশ্বময়

করবার স্বপ্ন দেখবার মত লোক বেশি সংখ্যায় আছে সে কটি দেশই হলো জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিষয়ে বিশেষভাবে অবনত।

এক ধরণের হিন্দুত্ববাদও মাঝে মাঝে বেশ মুখর হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী আর্য প্রজ্ঞার অভিযান চালাবার এবং সকল দেশে যাজ্ঞিক কর্মকাণ্ড বিস্তারিত করবার এক বৃহৎ উদ্দেশ্য প্রচারিত হয়ে থাকে। সুখের বিষয়, এই শ্রেণীর প্রচারকের সংখ্যা নগণ্য এবং হিন্দু সমাজের জনসাধারণের মধ্যে এঁদের বিশেষ কোন প্রভাব নেই।

আধুনিক কালে আর এক ধরণের মতবাদ পৃথিবীতে মুখর হয়ে উঠেছে। ধর্মের নামে নয়, রাজনীতিক কতগুলি রীতিনীতির নামেই নতুন একটি আধিপত্যবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। কবি হালির মতোই এক শ্রেণীর প্রচারক এই নতুন আধিপত্যবাদ বিশ্বময় করে তোলবার প্রেরণা ছড়িয়ে থাকেন, যার মূল প্রেরণা যোগাচ্ছেন তথাকথিত কম্যুনিজম। কিছুদিন আগে আগনাস স্মেডলি নাম্নী জনৈকা নেত্রীস্থানীয়া এক কম্যুনিস্ট মহিলার মৃত্যু হয়েছে। তারই স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট নামে পরিচিত লেখক গোষ্ঠীর রচনার সঙ্কলনে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি কবিতায় বলেছেন—হে যীশুখৃষ্ট, তুমি এইবার সরে পড়। তোমার দিন এতদিনে ফুরিয়েছে। তোমার স্থান আজ অধিকার করেছে মার্ক্স, লেনিন, স্ট্যালিন এবং আমি। হে যীশু সরে পড় এবং যাবার সময় মহাপুরুষ গান্ধীকেও সঙ্গে নিয়ে যাও (And take Saint Gandhi with you)।

কবির হুমকিতে যীশু ও গান্ধীর পরিণাম কি হবে সে কথা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার দরকার হয় না। মোট কথা হলো এ ধরণের মনোবৃত্তি মানুষের ইতিহাসে উৎপীড়নই সৃষ্টি করতে পারে, কল্যাণ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রকৃত কল্যাণধর্মিতা আধিপত্যবাদের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খোঁজে না। মৈত্রীভাবনার ভাষাও এরকম হতে পারে না। সাঙ্গীতিক ও সুরকার এক ওস্তাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পেয়ে বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব বলেছিলেন—ওর কবরের গর্ত যেন বেশ গভীর হয় আর ওর মুখের ওপর বেশ ভাল করে মাটি চাপা দিও। কিন্তু সঙ্গীত বিদ্বেষী বাদশাহের এই রূঢ় আধিপত্যবাদের দাপটে ভারতের সঙ্গীত কবরস্থ হয়নি। ধর্মীয় গোঁড়ামীর সেই নির্দেশ তুচ্ছ করে ভারতের মুসলমানেরাই বরং আরও বেশি সঙ্গীত প্রিয় হয়ে উঠেছেন।

পৃথিবীর অন্য কোন জাতির রীতিনীতি ও মনোভাব সমালোচনা করবার আগে অবশ্য আমাদের নিজেদেরই বর্তমান জাতীয় জীবনের রীতিনীতিগুলিকে বিচার করা প্রয়োজন। সম্প্রদায়, প্রদেশ এবং জাতপাতের নাম করে নানা রকমের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এবং ভেদবুদ্ধি বস্তুতঃ এই রূঢ় আধিপত্যবাদেরই এক নতুন ভারতীয় সংস্করণ গড়ে তুলছে। বর্তমান বাঙ্গালী জনসমাজের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, রামমোহন থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিন্তার যে উত্তরাধিকার-এর বলে মৈত্রীভাবনার প্রকৃত পথ চিনতে ও বুঝতে তার কোন ভুল হবে না। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মৈত্রীভাবিত আদর্শ এবং আধুনিক ভেদবাদী প্রচারকের আদর্শ, এই দুয়ের মধ্যে কোন আদর্শকে সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতে স্বীকার করতে বাঙ্গালীর মন প্রস্তুত হয়ে উঠবে, সেটা আর অনুমান করবারও প্রয়োজন হয় না।

ভারতের সামাজিক নবনির্মাণ

এই বছরের ছাব্বিশে জানুয়ারীতে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্যে দেশবাসীর অনেকেরই মনে একটি নূতন ভাবনার সাড়া দেখা দিতে পারে। অনেকেরই মনে পড়বে, কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে এমন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যার লক্ষ্য হলো এই ভারতের সমগ্র জনজীবনেরই সামাজিক নব-নির্মাণ। সোস্যালিস্ট প্যাটার্নে, অর্থাৎ সমাজবাদী প্রকারে গঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। প্রস্তাবের মধ্যে এই লক্ষ্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যসম্মত পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলির উপর সামাজিক স্বত্বাধিকার প্রযুক্ত হবে, উৎপাদনের ক্রমোন্নত ও দ্রুততর বৃদ্ধি সাধন করা হবে এবং জনসাধারণের ভোগে জাতীয় সম্পদের বন্টনে সমতা রক্ষা করা হবে।

'কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ' তথা সামবায়িক স্বরাজ্য স্থাপন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদের এই উল্লেখ পরিবর্তন হয়নি। ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধানের 'কল্যাণ-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করাই সংবিধানের লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হয়েছে। এই দুই লক্ষ্যই রাষ্ট্র ও সমাজের একটা আদর্শোচিত অবস্থা জ্ঞাপন করে। নামবাচক হলেও ঐ দুটি কথা বস্তুত ভাববাচক। কথা দুটির মধ্যে রাষ্ট্রিক বা সামাজিক প্রকারের পরিচয় সুস্পষ্ট নয়। লক্ষ্যের সঙ্গে পদ্ধতির পরিচয় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট না হলে লক্ষ্যের পরিচয় সম্বন্ধেও ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। আবাদী কংগ্রেসের প্রস্তাব আদর্শ সম্বন্ধেই স্পষ্টতর ও পূর্ণতর পরিচয়ের প্রকাশ, যার মধ্যে কল্যাণরাষ্ট্রের অথবা সামবায়িক স্বরাজ্যের পরিচয় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'সোস্যালিস্ট' কথাটির তাৎপর্য নিয়েই নানা মুনির নানা মত আছে। সোস্যালিজম তথা সমাজবাদও বিশেষ একটি সামাজিক আদর্শবাদরূপে ঘোষিত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই আদর্শবাদের কোনও সর্ববাদিসম্মত রূপ নেই। ভাষ্যকারদের মধ্যে মতের ভেদ আছে এবং এমনকি যাঁরা সোস্যালিস্ট চিন্তার প্রবর্তক, তাঁদেরও একজনের চিন্তার সঙ্গে অপরজনের চিন্তার মিল নেই। সোস্যালিস্ট সাঁত-সির্মঁ, ফুরিয়ে, লুই ব্লাঁক ও প্রুধোঁ, ফরাসী ঘরানার এইসব বিখ্যাত সোস্যালিস্ট মনীষীদের চিন্তাধারা একই প্রকারের নয়, মতও এক রকমের নয়।

পরস্পরের অভিমতে বিষয়-বিশেষে মিল থাকলেও আবার অনেক মৌলিক বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা যায়। আবার, ইংরেজ ঘরানার সোস্যালিস্ট রবার্ট ওয়েন যে অভিমত পোষণ করেন, সেটা ফরাসী সোস্যালিস্ট চিন্তার অনুরূপ নয়। তা ছাড়া ক্রিশ্চান সোস্যালিস্টরাও আছেন। মরিস, কিংসলি ও ল্যাডলো খৃষ্টীয় ধর্মনীতিসম্মত পন্থায় সাধারণ সামাজিক সংস্কার ও হিতবাদকেই সমাজবাদ বলে প্রচার করে গিয়েছিলেন। ফেবিয়ান সোস্যালিস্টরাও সোস্যালিস্ট, যাঁদের চিন্তাকে অনেকেই প্রাচীনপন্থী লিবারালিজমেরই রকমফের বলে মনে করেন। কার্ল মার্ক্সও সোস্যালিস্ট, তিনি সমাজবাদের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও সৃষ্টি করে গিয়েছেন এবং এই মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাও বিভিন্ন সোস্যালিস্ট ভাষ্যকারের বিচারে বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু এইসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সোস্যালিজম তথা সমাজবাদের নানা পরিচয়ের মধ্যেও বিশেষ একটি পদ্ধতিগত বিষয়ে সর্বসম্মত সমর্থন দেখা যায়। সেই বিষয়টি হলো, উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির উপর রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত অধিকারের

বিলোপ সাধন। পুঁজিবাদী চিন্তাই উদারনীতিক আবরণ গ্রহণ ক'রে অনেকদিন থেকেই লেসে ফার, ফ্রী এণ্টারপ্রাইজ, ন্যাচারাল হার্মনি ইত্যাদি কথার মহিমা প্রচার করে এসেছেন। এইসব কথার ভিতরে ব্যক্তির অবাধ ব্যক্তিগত অধিকারেরই প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার আগ্রহ নিহিত রয়েছে।

সোস্যালিজমকে তাই ব্যক্তিপ্রাধান্যবাদ এবং তথাকথিত লিবারালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগ্রহ বলা যায়।

সোস্যালিজম চায় সার্বিক সহযোগিতা, 'কো-অপারেটিভ' কর্মবিজ্ঞান। সোস্যালিজম্ চায় পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং, স্বেচ্ছায় উৎসাহিত উদ্যোগ নয়। সমাজবাদ চায় সর্বসাধারণের অধিকারেব স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও অবস্থা। সম্পদ বণ্টনে সমতার নীতি এবং ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সমান সুযোগের নীতি।

ভারতের সংবিধানে সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপনের লক্ষ্য ঘোষিত না থাকলেও মুখবন্ধে যে সকল মৌল নীতির নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে সমাজবাদী প্রকারের রাষ্ট্রিকতা ও সামাজিকতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। কংগ্রেসের অর্থনীতিক লক্ষ্যের প্রস্তাবগুলিও এযাবৎ ভারতের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন দাবী করে এসেছে, তার মধ্যেও সমাজবাদী আগ্রহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কংগ্রেসের প্রথম সুস্পষ্ট ভাষার ঘোষণা হলো বিগত জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে প্রথম 'সোস্যালিস্ট অর্থনীতি' অনুসরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে এই প্রস্তাব কংগ্রেসের চূড়ান্ত সমর্থন আনুষ্ঠানিকভাবে লাভ করেছে ; কিন্তু তার আগে দেশবাসী এই নূতন লক্ষ্যকে কতকটা সরকারী ঘোষণার রূপেও অভিব্যক্ত হতে দেখেছে। সংসদে এবং পরিকল্পনা কমিশনের কাউন্সিলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু সোস্যালিস্ট প্রকারের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকেই পরিকল্পনার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্মরণ করতে হয়, ব্যক্তি জওহরলালই ভারতের স্লোস্যালিস্ট চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রচারক। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিক ও সামাজিক গঠন সমাজবাদী প্যাটার্ন বা প্রকারে রূপায়িত করা উচিত। তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিমত তিনি অনেকদিন আগেই এবং তারপর থেকে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে এসেছেন।

জাতীয় কংগ্রেস ভারতকে সমাজবাদী প্রকারে গঠন করতে উদ্যোগী হবেন, এই প্রস্তাব নিছক একটি প্রস্তাব নয়। ভারতের ইতিহাসই যে বিপুল একটি পরিবর্তন বরণ করতে চলেছে, তারই অবশ্যম্ভাবিতা ও আসন্নতা এই প্রস্তাবের মধ্যে সঙ্কেতিত হয়েছে। ভারতের অর্থনীতিক জীবনে শিল্পবিপ্লবের সংঘটন যতখানি দূর ভবিষ্যতের ঘটনা বলে মনে করা হয়েছিল, আজ উপলব্ধি করা যায়, সেই ঘটনা ততখানি দূরবর্তী নয়। শিল্পবিপ্লব প্রায় আসন্ন এবং ভারতীয় শিল্পবিপ্লবও যে দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হবে, তার লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার, কারিগরি উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সুবৃহৎ আয়োজন, এই সবই শিল্পবিপ্লবের পথ মুক্ত করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের দুটি বৃহৎ প্রয়োজনের তাগিদও ঐতিহাসিক কারণের চাপে চরিতার্থতা খুঁজছে।

জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপাদনে 'প্রাচুর্য সম্পাদনার অর্থনীতি' গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সর্বজনের জীবিকাকর্মের সংস্থান রচনা। এই দুটি উদ্দেশ্য ত্বরিত শিল্পপ্রসারকে শিল্পবিপ্লব বলতে বাধা নেই।

এখানেই ভারতীয় জাতিকে সতর্ক হতে হচ্ছে। কংগ্রেসের নতুন প্রস্তাব জাতির সেই সতর্ক মনের পরিচয়।

ইউরোপের শিল্পবিপ্লবও সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই শিল্পবিপ্লব ক্যাপিটালিজম্ তথা পুঁজিবাদেরই উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছিল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের বৈঠকে শ্রীনেহেরু তাঁর বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের স্বাভাবিক পরিণামরূপেই আজ দেখা দিয়েছে হাইড্রোজেন বোমা। শ্রীনেহেরুর মন্তব্যে ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের নৈতিক সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়েছে। সেই ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবে যন্ত্রের মর্যাদা মানুষের মর্যাদার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল।

সাধারণের কল্যাণ এবং সবাকার প্রয়োজনের দিকে যতটা লক্ষ্য ছিল, তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য ছিল, ব্যক্তিগত লাভ ও পুঁজির গৌরব পুঞ্জীভূত করার দিকে। সেই শিল্পবিপ্লব হতে প্রসূত যান্ত্রিকতা যেন ধীরে ধীরে নিজেই একটি লক্ষ্য হয়ে উঠলো। যেন মানুষের জন্য যন্ত্র নয়, যন্ত্রের সুবিধার ও প্রয়োজনের জন্য মানুষ। নৈতিক দায়িত্ব ও বাধ্যতা হতে বিচ্যুত এমন পরিবর্তন যে মানুষের মনোবৃত্তিকেও অসহায়ের মত অধীন করে নিয়ে নিজের রুদ্রত্ব বিপুল করে তুলবে, এই অভিযোগ যুক্তিহীন নয়। ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লব মানুষের অনেক কল্যাণের সহায়ক হয়েও সেই সঙ্গে অনেক কল্যাণের সংহারক হতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরণের স্ববিরোধী শক্তির পরস্পরঘাতী দ্বন্দ্বে আবিল শিল্পবিপ্লব ভারতের কাম্য নয়। সেই কারণে আসন্ন শিল্পবিপ্লব যেন সমাজের সর্বের কল্যাণকারক হয়, সেই জন্যই আসন্ন পরিবর্তনকে সমাজবাদী অর্থনীতিক প্রকার দান করার জন্য প্রস্তুত হবার প্রয়োজন ছিল।

সংবিধানে সমাজবাদসম্মত লক্ষ্যের ঘোষণা করলে, অথবা সমাজবাদসম্মত কোন রাষ্ট্রিক অর্থনীতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী আইন প্রণয়ন করলেই ভারতের সামাজিক নব নির্মাণ দ্রুত সম্ভব হবে, এমন ধারণা কেউ সমর্থন করবেন না। ঐ ভাবে শুধু কতকগুলি আইন প্রবর্তন অথবা সাংবিধানিক সদুদ্দেশ্য ঘোষণা করে রাখাও প্রগল্ভ 'লেসে ফার' রীতি। বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিপুল গঠনমূলক উদ্যোগের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে। সেই জন্যই প্ল্যানিং বা পরিকল্পনা জনজীবনের বৈপ্লবিক আগ্রহেরই পরিচয় এবং অবলম্বনও। ভারতকে সমাজবাদী প্রকার লাভ করতে হলে পরিকল্পনার দ্বারাই জনশক্তিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। পরিকল্পনা বস্তুত কর্মকে বৈজ্ঞানিক সংগঠন দান করার ব্যাপার।

প্ল্যানিং-এর মধ্যে সমাজবাদী দর্শনের আর একটি বৃহৎ সত্য নিহিত রয়েছে, সহযোগিতার নীতি। সর্বসাধারণের অধিকার জাতীয় সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠা করলেই সমাজবাদী প্রকারের স্থায়িত্ব সত্য হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রেও 'সবার পরশে পবিত্র করা' নীতিই সত্য। সমাজবাদী জীবন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সহযোগিতার জীবন। ট্রেড ইউনিয়ন নামক শ্রমিক সংহতির পদ্ধতি সমাজবাদী চিন্তারই সৃষ্টি। কিন্তু এই সংহতিও মূলত সামবায়িক অথবা সহযোগিতামূলক অর্থাৎ কো-অপারেটিভ সংহতির উদাহরণ। শ্রেণীর উপর শোষণ আছে এবং সমাজ-স্বার্থ বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থে খণ্ডিত হয়ে আছে বলেই বর্তমানকালের ট্রেড ইউনিয়নকে সংগ্রামের রীতি গ্রহণ করতে হয়। যদি শোষণ না থাকে এবং যেদিন শোষণ থাকবে না, সেদিন এই ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য কো-অপারেটিভ উৎপাদন সংহতির মধ্যে প্রকৃতিগত কোন প্রভেদও থাকবে না। কংগ্রেসের পুরাতন প্রস্তাবেই

'শ্রেণীহীন' ও 'জাতহীন' সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়ে আছে। সংবিধানেও ভারতের নাগরিক সাধারণের মধ্যে শ্রেণীগত ও ব্যক্তিগত অধিকারের পার্থক্য করা হয়নি। ভারতের আইন ও ন্যায়ালয়ও এই পার্থক্য স্বীকার করে না। আইনের চক্ষে সকলেই নাকি সমান।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় শুধু প্রমাণিত হয় যে আইনের এবং সংবিধানের চক্ষু উদার হয়েছে, সকলকেই সমান দেখতে পারছে। কিন্তু মাত্র আইনের ও সংবিধানের এই উদার দৃষ্টিপাতের জন্যই ভারতের জনজীবন শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ হতে মুক্ত হয়ে যায়নি। শ্রেণীভেদ ও জাতিভেদ নামক দুই বিষবৃক্ষ যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাটি হলো সমাজের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অর্থনীতিক যোগ্যতার বৈষম্য। আইন মূলত নিরোধমূলক প্রয়াস। আইন বড় জোর অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করতে পারে এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু, স্পৃশ্যতা সৃষ্টি করতে পারে কি? স্পৃশ্যতা সৃষ্টি গঠনমূলক প্রয়াসের দ্বারাই সাধ্য এবং আইন প্রত্যক্ষভাবে গঠনধর্মী হতে পারে না বলেই নিরোধমূলক পন্থায় সমাজবিরোধী শক্তির বিলোপ অন্বেষণ করে। সমাজবাদী প্রকার লাভ করতে চায় যে সমাজ, সেই সমাজ শুধু আইন প্রকরণের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। সেই সমাজ পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং-এর দ্বারা জাতির জনশক্তিকে এবং জনমানসকে গঠনমূলক কীর্তিকারিতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।

পরিকল্পনার দ্বারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে হয়। কিন্তু পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করবার রাষ্ট্রিক নীতিই বা কি হওয়া উচিত? সোভিয়েট রাশিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালকেরা এক্ষেত্রে অবাধ ও অখণ্ড কর্তৃত্ববাদ গ্রহণ করেছেন। চীনও তাই। রাষ্ট্রের পরিচালক সংঘ যে সিদ্ধান্ত করলেন, সেই সিদ্ধান্তই অমোঘ এবং জনসাধারণ সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। এখানে সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করার আগে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিচয় জানবার জন্য রীতির বাধা নেই। একটি আইনের খসড়া তিনবার সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ, দুই প্রতিনিধিসভায় তিনবার রিডিং দান করা, তারপর বিতর্ক, ডিভিসন ও ভোট গ্রহণের বালাই নেই।

কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনের প্রস্তাব সমাজবাদী রাষ্ট্রিকতা লাভের জন্য এক নূতন পন্থার পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব। প্রজাতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচালনার টোটালিটারিয়ান নীতির কোন স্থান নেই। ভারতে রাষ্ট্রিক পরিচালনায় 'পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসী'কেই অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের জাতীয় জীবনকে সমাজবাদী প্রকারে গঠন করতে হবে, এই উদ্দেশ্য পৃথিবীর রাষ্ট্রিক গঠনের ইতিহাসেই অভিনব। পরিকল্পিত পন্থায় সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনের, সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টির এবং শিল্পবিপ্লবের সংঘটন ত্বরান্বিত করতে হবে, কিন্তু তার জন্য ভারত নিশ্চয়ই জনসাধারণকে কোন কাজে বাধ্য করবার আইন প্রবর্তন করবে না। আজ পর্যন্ত সেরকম কোন আইন প্রবর্তিত হয়নি, যদিও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চার বছর প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের বিচার বিবেচনা ও ইচ্ছাকে পরিকল্পনার সহযোগী হতে বাধ্য করার অবাধ কর্তৃত্ববাদ সত্যই প্রকৃত সমাজবাদী আদর্শের সহায়ক কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট যুক্তি আছে। ভারত তার পরিকল্পিত উদ্যোগে জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রবণ সহযোগিতাকেই প্রকৃত শক্তি এবং স্থায়ী শক্তি মনে করে। ভারতের ইতিহাসেই পৃথিবীর মানুষ একটি বিস্ময়কর নূতন সত্য লক্ষ্য করেছে যে, সংগ্রামও শান্তিপূর্ণ হতে পারে, এবং সে সংগ্রামের দ্বারা নিরস্ত্র জাতি পৃথিবীর এক প্রবল

সশস্ত্র সাম্রাজ্যিক শক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা জয় করে নিতে পারে। পুঁথিবাদী সমালোচক ইতিহাসের বাস্তব ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি থেকে শিক্ষা আহরণ করতে পারেন না এবং কংগ্রেসের এই নূতন সিদ্ধান্তের মর্যাদা উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁদের চিন্তায় পোষা কয়েকটি ধরা-বাঁধা পুরনো বুলি হয়তো নূতন করে মুখর হয়ে উঠবে। রেভল্যুশন বাই কনসেন্ট।

কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনের প্রস্তাব কংগ্রেসেরই আত্মার নবীকরণের পরিচয়। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসের সংকল্প ও প্রয়াস জয়যুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শত সমস্যায় নিপীড়িত ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অস্থিরতার অবসান ঘটেছে। স্বাধীন ভারতের বিগত সাত বৎসরকে বস্তুত স্টেবিলাইজেশন তথা সুস্থিতি লাভের অধ্যায় বলা যেতে পারে। এইবার সামাজিক নবনির্মাণের জন্য সমাজবাদী পন্থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ। ভারতের সমাজবাদ নিশ্চয় অন্য কোন দেশের প্রচলিত সমাজবাদের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে না, কারণ সম্পূর্ণ অনুরূপ হতে পারে না। ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভারতের জনজীবনের প্রয়োজন ও সমস্যার বৈশিষ্ট্য, এবং বিশেষ করে জাতির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ভারতের সমাজবাদী প্রকরণের রূপও বিশিষ্ট হবে।

কংগ্রেসের নূতন ঘোষণার তাৎপর্য এবং মর্যাদা কংগ্রেসীদের মধ্যেই বা ক'জন উপলব্ধি করবেন এবং অনুপ্রাণিত হবেন? শ্রীনেহেরু বলেছেন, কংগ্রেসের চিন্তাও অনড় হয়ে থাকবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং কংগ্রেসের এই নূতন সংকল্পের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপ্রকাশের পথে বাধা আছে কংগ্রেসীদেরই মনের ভিতর এবং সেই বাধাই হলো আসল বাধা। কংগ্রেসবিরোধী ও সরকারবিরোধী সমালোচকের প্রচার বা ক্রিয়াকলাপের বাধা আসল বাধা নয়। শ্রেণীহীন ও জাতহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অনেক কংগ্রেসীর কাছে একটি বচন মাত্র, মনের এবং অনুভবের ক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রতি আনুগত্যের যথেষ্ট অভাব আছে। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিদ্বেষবাদে অনেক কংগ্রেসী অন্য অনেক অকংগ্রেসী বিদ্বেষবাদীর তুলনায় অনেক বেশী নিপুণ ও জবরদস্ত। সমাজকে সমাজবাদী প্রকার দানের জন্য কংগ্রেসের নূতন সংকল্প অনেক কংগ্রেসীরই মনের গভীরে অভিনন্দিত হবে না। তেমনই আর একটি নূতন সুসম্ভাবনাও আছে। কংগ্রেস এই নূতন সংকল্প গ্রহণ করে অনেক বিরোধীকে হয়তো সহযোগীরূপেই কাছে দেখতে পাবেন। মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্তে এইরকম সম্ভাবনারই সত্যতা প্রমাণিত হয়।

কংগ্রেসের নূতন প্রস্তাবের প্রকৃত গুরুত্ব এই কারণে স্বীকার করতে হয় যে, ঐ প্রস্তাব শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরই কর্মসূচীর নিয়ামক হয়ে থাকবে না। যেহেতু কংগ্রেস রাষ্ট্রের শাসকদল, সেইহেতু কংগ্রেসের প্রস্তাবকে ভারত সরকারেরই আসন্ন কর্মক্রমের পরিচয় বলে মনে করা যায়। প্ল্যানিং করবেন দেশের সরকার এবং সেই প্ল্যানিং সফল করবে জাতির সুসংহত জনশক্তি।

সেই কারণে কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী প্রত্যেকেরই পক্ষে মনের দিক দিয়ে বিশেষ একটি প্রস্তুতি সৃষ্টির প্রয়োজনও স্বীকার করতে হবে। পরিবর্তন আসছে, অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন। শিল্পবিপ্লব আসন্ন। জাতির সমগ্র সাংস্কৃতিক রূপ ও প্রকৃতির উপরেই সেই পরিবর্তনের আবেগ এসে পড়বে। এই পরিবর্তনকে গ্রহণের পন্থা উদারনীতিকের 'লেসে ফার' বা 'ফ্রি

এন্টারপ্রাইজ' হতে পারে না। পন্থা হলো সমাজবাদী প্রকার দানের পরিকল্পনা। 'সমানী প্রপা' অথবা 'সহবোহন্নথা'—প্রাচীন ঋষিবাক্যে ঘোষিত সমতা ও সহৃতার নীতি মাত্র আদর্শরূপে লিখিত ও ঘোষিত থাকলেই সমাজ সেই আদর্শোচিত রূপ গ্রহণ করে না। কর্মে, কর্মবিজ্ঞানে, সুপরিকল্পিতভাবে এবং ব্যবহারিক রূপে সেই নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল। প্রজাতন্ত্র ভারত, প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যে প্রতিভান্বিত ভারত যে সামাজিক নবনির্মাণের পথে অগ্রসর হবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, সেই নবনির্মাণ এবং উদ্যোগ উভয়েরই মহত্ত্ব দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। তা না হলে জাতি এগিয়ে যাবে, কিন্তু জাতির সাহিত্য ও শিল্প সেই অগ্রসৃত জাতীয় জীবনের আনন্দের অবলম্বন হবার যোগ্যতা হতে বঞ্চিত হবে।

সংস্কৃতির অগ্রগতি

শ্রীজওহরলাল নেহেরু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে এক রিপোর্ট পেশ করেছেন। রিপোর্টে বর্তমান ভারতের জাতীয় স্বরূপ মর্ম ও প্রকৃতির বিচার করা হয়েছে। এই রিপোর্ট বস্তুত একটি থিসিস, নিছক রিপোর্ট নয়। ঐতিহাসিকের সন্ধিৎসা নিয়ে শ্রীনেহেরু বর্তমান ভারতের পরিবর্তন ও প্রয়োজনের গতি-প্রকৃতিকে সমীক্ষা করেছেন। জাতির আকাঙ্ক্ষা ও পরিণামের রূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এবং সেই আকাঙ্ক্ষিত পরিণামকে ত্বরান্বিত করার জন্য ভারতীয় জাতিকে যে কর্তব্য গ্রহণ করতে হবে, তার নীতিও সন্ধান করেছেন।

শ্রীনেহেরু রিপোর্টের একুশ অনুচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান ভারতের সাংস্কৃতিক উন্মেষ সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। সাত বছরের রাজনীতিক স্বাধীনতা উপভোগের পর জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক স্বরূপ কি পরিবর্তন ও নবোন্মেষ লাভ করতে পেরেছে, এই প্রশ্ন প্রকৃত ঐতিহাসিকসুলভ মনেরই প্রশ্ন। সরকারের কোন বাৎসরিক কার্যবিবরণীতে সাংস্কৃতিক উন্নতির হিসাব থাকে না। সাংস্কৃতিক উন্নতি নির্ণয়ের বা পরিমাপ করবার কোন বৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান রাখার চেষ্টা হয়েছে কিনা জানি না, যদিও শিক্ষা কৃষি শিল্প ভূমি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্যের পরিসংখ্যান গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। অথচ একটি ঐতিহাসিক সত্য এই যে, জাতির রাজনীতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আন্দোলন ও নব পরিণামের সত্যতা সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ লাভ করে, জাতীয় জীবনের বিশেষ একটি কীর্তির মধ্যে ; সেই কীর্তি হলো সাংস্কৃতিক কীর্তি। সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠব হলো জাতির সামাজিক রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক সৌষ্ঠবের বাস্তব সত্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাই এই প্রশ্ন আজ স্বীকার করার প্রয়োজন আছে, বর্তমানের প্রজাতন্ত্র ভারত, বিগত সাত বছরের স্বাধীন ভারতের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন কোন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি সম্ভব করতে পেরেছে কিনা?

শ্রীনেহেরু মন্তব্য করেছেন :

'Perhaps the most heartening feature in India today is the revival of our arts and sciences, the new spirit in the literatures of our national languages and the wide spread interest in music, song and dance.'

শ্রীনেহেরু বলতে চান, বর্তমান ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে নবভাবের প্রেরণা দেখা দিয়েছে। সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে দেশে প্রভূত আগ্রহ বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের বিভিন্ন রম্যকলা এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুনরায় প্রাণের স্ফুরণ দেখা দিয়েছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন অভ্যুদয়-এর এই ঘটনাকে শ্রীনেহেরু দেশের পক্ষে সবচেয়ে আস্থা সূচক ও উৎসাহব্যঞ্জক অবস্থার পরিচয় বলে মনে করেছেন।

দেশের প্রশাসন পরিচালনার কাজে নানারকমের বিভাগ আর দপ্তর আছে। কিন্তু সংস্কৃতি* সম্বন্ধে কোন বিভাগ বা দপ্তর নেই। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের তেমন বিভিন্ন রাজ্য সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উৎসাহে কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ব্যাপার ঘটে থাকে। স্বাধীন ভারতের সরকার দেশের সাহিত্য ও রম্যকলার সম্বন্ধে কিছু ভালো কাজ করবার, অথবা ভালো কাজে সহায়তা করবার আগ্রহ দেখিয়েছেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মাত্র এই ঘটনাই সাহিত্য ও রম্যকলার ক্ষেত্রে নতুন কোন সঞ্জীবনের সত্যতা প্রমাণ করে না। শ্রীনেহেরু নিশ্চয়ই শুধু এই কারণেই দেশে সাংস্কৃতিক নবোন্মেষের সত্যতা দাবী করছেন না। এই দাবী করতে হলে, বাস্তব তথ্যাগত এবং প্রত্যক্ষ সৃষ্টির ঘটনার অথবা নিদর্শনের সমর্থন চাই। দেশের সরকারী শিক্ষাদপ্তরগুলি সংস্কৃতি সম্বন্ধে যেটুকু আগ্রহের ও দায়িত্বের পরিচয় দিচ্ছেন, সেটা সুনির্দিষ্ট কোন দায়িত্বের পালনকর্ম নয়। বাজেটে কোন সাংস্কৃতিক বরাদ্দ থাকে না। কোন সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ও অবশ্য পালনীয় সাংস্কৃতিক কর্তব্যের জন্য দেশের সরকার জনসাধারণের কাছে আইনত দায়ী নয়, এবং আইনসভায় কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে জবাব দেবার জন্য কোন বাধ্যতাও সরকারের উপর নেই। সংস্কৃতি সম্বন্ধে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের রীতি এবং নীতিও হলো এয়েচারসুলভ রীতিনীতি। এক্ষেত্রে আইন নিরপেক্ষ সদিচ্ছা এবং স্বেচ্ছাকৃত অনুগ্রহই সরকারের কর্মনিয়ামক নীতি। দেশের সাংস্কৃতিক উন্নতি বা অবনতির তথ্যমূলক কোন হিসাব অথবা বিবরণ সরকার রাখেন না, এবং সরকার এই ধরণের হিসাব ও বিবরণ সংগ্রহের জন্য কোন আবশ্যিক রীতির অধীনও নন। স্বাধীন ভারতের বিগত সাত বৎসরের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বা পরিবর্তনের কোন তাথ্যিক রিপোর্ট নেই।

তবুও দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে একটি অভিমত ঘোষণা করেছেন। অনেকেরই মনে শ্রীনেহেরুর অভিমত সম্বন্ধেও নানা রকমের এবং পরস্পর বিভিন্ন অভিমত দেখা দেবে। অনেকেই মনে করেন, শ্রীনেহেরুর ধারণা সাধারণভাবে সত্য হলেও বিশেষভাবে সত্য নয়। এমন ভ্রূকুটিখিন্ন সমালোচকেরও অভাব নেই যিনি শ্রীনেহেরুর উক্তিকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করবেন। আবার অনেকের কাছে মনে হবে, শ্রীনেহেরু একটু অতিশয়োক্তি করেছেন।

অন্ততঃ একটি বিষয়ে শ্রীনেহেরুর মন্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলবার সংগত হেতু আছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যে 'নিউ স্পিরিট' তথা নতুন ভাবের প্রেরণা দেখা দিয়েছে, এই ধারণা কি সংশয়াতীতভাবে সত্য? নূতনভাবে প্রেরণা বলতে শ্রীনেহেরু ঠিক কি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায় না। যদি বলা হয় যে, নূতন উৎসাহ দেখা দিয়েছে, তবে বাড়িয়ে বলা হয়না, এবং এই উক্তির সত্যতা স্বীকারযোগ্য বলে মনে করতে আপত্তিও হবে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবভারতের প্রেরণা সৃষ্টিকর নিদর্শনেই প্রত্যক্ষ হয়, ভাবের প্রেরণার অস্তিত্ব নূতনত্ব বা সমৃদ্ধি বিচার করবার এবং বিশ্বাস করবার হেতু পাওয়া যায় সৃষ্টিকর নিদর্শনের অস্তিত্ব নূতনত্ব ও সমৃদ্ধির মধ্যেই, অন্য কোনভাবে প্রত্যক্ষ করবার কোন উপায় নেই। সুতরাং প্রশ্ন হলো, বিগত সাত বৎসরের মধ্যে ভারতের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে এমন কোন সৃষ্টিকারিতার নিদর্শন পাওয়া যায় কিনা, যার মধ্যে নবভাবের প্রেরণার সাক্ষ্য

* রচনাকালে সরকারে 'সংস্কৃতি' দপ্তর/বিভাগ ছিল না।

পাওয়া যায়?

মনে হয় শ্রীনেহেরু সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ একটা উৎসাহের ভাবকেই নবভাবের প্রেরণা বলে মনে করেছেন। কিন্তু নতুন করে উৎসাহিত উদ্বোধিত হলেই যে, সাহিত্যেরই নতুন রূপান্তর হচ্ছে, এমন ধারণা করবার যুক্তি নেই। সঙ্গীত নাটক এবং নৃত্য সম্বন্ধে আগের তুলনায় বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে, রাজধানী দিল্লীতেও, উৎসাহের মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপও বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন আছে। এই উৎসাহ কি সত্যই বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক উৎসাহ? অথবা আমোদ-প্রমোদের আধিক্য? ঠিক কথা সাংস্কৃতিক অভিরুচিই মানুষের মনে যে তৃষ্ণা সঞ্চারিত করে, সেই তৃষ্ণা নৃত্য নাট্য ও সংগীতের রম্যতার মধ্যে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু এই অপ্রিয় সত্যও সত্য যে, নিতান্ত সংস্কৃতিহীন মনের মাত্র একটি স্নায়বিক সুখ চরিতার্থ করবার জন্য অনেকের কাছে নৃত্য সংগীত ও নাচের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন নিছক দু'দণ্ডের আমোদ ও স্নায়বিক মত্ততা সৃষ্টির প্রয়োজন। অপকৃষ্ট নৃত্য সংগীত ও নাটকের জনপ্রিয়তা বা প্রসার আদৌ সাংস্কৃতিক উৎসাহের প্রসার নয়, সেটা সাংস্কৃতিক বিপন্নতাই প্রমাণিত করে। সুতরাং নৃত্য সংগীত ও নাট্য সম্বন্ধে উৎসাহের বৃদ্ধি মাত্রই সাংস্কৃতিক উৎসাহ নয়। বিচার করা উচিত, নৃত্য সংগীত ও নাট্যের রূপ ও প্রকৃতি কেমন, এবং নিছক আমোদ আহরণ করা ছাড়া বুদ্ধিজ চিত্তবৃত্তির কোন আগ্রহ সেই উৎসাহের মধ্যে আছে কিনা। প্রকৃত রম্যকলার প্রকৃতি কখনওই শিক্ষাবিহীন হতে পারে না। যদিও রম্যকলার রূপ পাঠ্যের বিষয় ও বস্তুর অনুরূপ হবে না। রম্যকলার আবেদনই হলো রম্যকলার শ্রেষ্ঠ উপহার, সে আবেদনের স্পর্শে শ্রোতার বা দর্শকের মন এক দিব্য অনুভবের সাড়া উপভোগ করে। জীবনের মাধুর্য্য ঐক্য বৈচিত্র্য ও বিপুলতা, সবার উপর জীবন ও নিখিল নিসর্গের মহিমা সম্বন্ধে প্রত্যয় শ্রদ্ধা ও মমতার বোধ অনুভবের সঞ্চারিত করে বলেই রম্য কলা হলো রম্যকলা।

সাহিত্য ও রম্যকলার এই সব তাত্ত্বিক লক্ষণের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, সাধারণ তথ্যগত লক্ষণই-বা এমন কি আছে, যা দেখে বলা যেতে পারে যে বর্তমান ভারতে সাহিত্য ও রম্যকলার নূতন উৎসাহ প্রেরণা অথবা উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে? কত সংখ্যক নূতন গ্রন্থাগার দেশে স্থাপিত হয়েছে? খুব বেশি কি? কিংবা এমন কিছু বেশি কি? যার জন্য ধারণা করতে হবে যে দেশের সাহিত্যগত আগ্রহ বৃদ্ধি লাভ করেছে? গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠকেরা কি ধরণের সাহিত্য সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দিয়ে পাঠ করেন? পুস্তক প্রকাশ বেড়ে থাকলে, তার মধ্যে দেশীয় ও বিদেশীয় ক্লাসিক-এর এবং আধুনিক বৈদেশিক মনীষীদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির প্রকাশ সম্বন্ধে কতজন উৎসাহিত হয়েছেন? গবেষণার জন্য নতুন করে কত সংখ্যক সংস্কৃতি-উৎসাহী প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারগুলির সুবিধা ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন? শিল্পকলা সামগ্রীর সংরক্ষণের ও উন্নয়নের জন্য কটি নতুন মিউজিয়ম দেশে স্থাপিত হয়েছে? চিত্রশিল্পীদের চিত্রের প্রদর্শনীতে দর্শকের অভ্যাগম বেড়েছে কি? ছবি বিক্রয় বেশি হয়েছে কি? শিল্পী সাংগীতিক সুরকার অভিনেতা কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে বেকার সমস্যা, অর্থাৎ উপার্জনহীন অবস্থা আগের তুলনায় অনেক বেশি হ্রাস পেয়েছে, এমন কোন প্রমাণ দেশের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ করার চেষ্টা কি হয়েছে? শিল্পী ও সাহিত্যিকের গুণের আর্থিক মূল্য বিগত সাত বছরে কতখানি উন্নততর হয়েছে? এই ধরণের প্রশ্ন পুঞ্জীভূত করা যায়, কিন্তু এই সব প্রশ্নের উত্তর সরকারী দপ্তর দিতে পারবেন না। কিন্তু দেশের মানুষ জানে

বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় বিগত সাত বৎসরে অবস্থার এমন কোন উন্নতিকর পরিবর্তন হয়নি, যাকে উন্নতি বলা যেতে পারে।

সাহিত্যে ও শিল্পে দেশের নবভাবের প্রেরণা সামাজিক ও অর্থনৈতিক নবত্বের সংগেও কারণ সূত্রে সম্পৃক্ত। শ্রীনেহেরু ভারতীয় জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের যে সকল বাস্তব লক্ষণ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেই সব লক্ষণ বর্তমান সাহিত্য ও শিল্পের রূপের মধ্যে তিনি দেখতে পেয়েছেন কি? তিনিই একাধিকবার বলেছেন ভারতবাসীর জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রাজনীতিক ভাবে যদিও সত্য হয়েছে কিন্তু এখনও জনসাধারণের মনের ভাবনায় সত্য হয়ে উঠতে পারেনি। জাতীয় ঐক্য, ভারতীয়তাবোধ, সর্ব মানুষের মানবিক সমমর্যাদা, এই সব সামাজিক নীতিগুলি এখনও জনমনে স্বাভাবিক প্রত্যয়ের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি। শ্রীনেহেরুর ভাষায় এ বিষয়ে 'Emotional awareness'-এর অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ কিংবা হৃদয়সংবেদ্য প্রত্যয় কোনরকম সরকারি পরিকল্পনার দ্বারাই অর্জিত হবার নয়। এই কাজ হলো সাহিত্যের ও রম্যকলার কাজ। শ্রীনেহেরুর অজানা থাকবার কথা নয় যে, ভারতের রাষ্ট্রিক ও জাতীয় পরিণাম যে সব অনিবার্য পরিণামান্তর গ্রহণের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, সেই পরিণামান্তরের আসন্নতার উপলব্ধি বর্তমানে সাহিত্যে এখনো জাগৃতি লাভ করেনি। বর্তমানে ভারতের শিক্ষিতের রচিত শহুরে সাহিত্য বিরাট পল্লী ভারতের মনের কাছে আপনত্ব লাভ করেনি। তার কারণ সাহিত্যের ক্ষেত্রেই বিশেষ একটি কৃত্রিমতার উপাসনা প্রবল হয়ে রয়েছে। নতুন ভারতের গণতন্ত্রেও সাহিত্য এখনো ভাবগত হতে পারেনি। বিশ্বের শান্তিরক্ষা, এবং এশিয়া মহাদেশের অভ্যুদয় এর সূচনা, এই দুই ঘটনা ভারত জীবনের নূতন পরিণামের সংগে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত ঘটনা এবং ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এই দিকে ভারতজীবনের এক নতুন গৌরবের অঙ্গীকার এনেছে। কিন্তু এই সব বিপুল পরিণামপ্রবণ ও সম্ভাবনাময় ঘটনার ভাবগত পরিচয় সাহিত্য ও রম্যকলার মধ্যে এখনো সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠেনি। নবভাবের প্রেরণা এই সব ঘটনারই অন্তরে নিহিত রয়েছে, কিন্তু সাহিত্যে ও রম্যকলায় সঞ্চারিত হতে পারছে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দেশের সরকারকে করে লাভ নেই। কারণ এই প্রশ্ন বিশেষ করে তাঁদেরই দৃষ্টিভঙ্গী, কর্তব্যবুদ্ধি চেতনা, প্রস্তুতি ও প্রয়াসের প্রয়োজন স্মরণ করিয়ে দেয়, যাঁরা সাহিত্য ও রম্যকলার সাধনায় নিযুক্ত রয়েছেন। দেশের সরকার কোন অনুগ্রহকর পরিকল্পনার সাহায্যে সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারবে না। সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়গুলি বিগত সাত বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতির জন্য যে সব কাজ করেছেন সে সব কাজ দেশের সাহিত্য প্রতিভাকে বা রম্যকলাকে কোন নবভাবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেনি। কতগুলি গ্রন্থকে পুরস্কার দান করা, কিংবা চিত্র নাট্য নৃত্য-এর প্রদর্শনী উদ্যোগকে আর্থিক সাহায্য দান করা বস্তুতঃ প্রদর্শনী কর্মকেই সাহায্য করা। এসবের দ্বারা সাহিত্যের ও রম্যকলার সৃষ্টিশীলতা অথবা নূতনত্ব বৃদ্ধি করা হয় না। হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনকে কয়েক লক্ষ টাকা দান করা, কিংবা তামিল অভিধান রচনার জন্য কয়েক লক্ষ টাকার সাহায্য করা, সাহিত্য ও ভাষাকে সাহায্য করার সরকারী দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু করবার মত উদ্ভাবনী যোগ্যতা সরকারের আচরণে বা দৃষ্টিভঙ্গীতে এযাবৎ দেখা যায়নি। সাহিত্যের ও শিল্পের আকাদমিগুলিই বা দেশের সাহিত্য ও রম্যকলার উন্নয়নে কি কাজ করতে

পারবেন কে জানে! সরকারী বা আধাসরকারী সাহায্যের পেট্রনেজ যাই করুক না কেন এবং যত সাহায্যই করুন না কেন, শ্রীনেহেরু সাহিত্যে যে নবভাবের স্ফূরণ দেখে খুশি হতে চান, সেই নবভাবের আধার হলো দেশের বর্তমানের সাহিত্যকর্মী, কলাকার ও শিল্পীর মন। বিগত সাত বৎসরের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বরং এই সত্যই স্বীকার করতে হয় যে, বাস্তব ঘটনা ও ইতিহাস জাতির জীবনকে এক নতুন পরিণামের দিকে যতদূর টেনে নিয়ে গিয়েছে, সাহিত্যের ও রম্যকলার অগ্রগতি তার সংগে সামঞ্জস্য রাখতে পারেনি, অনেকখানি পিছিয়েই আছে।

সমন্বয়ের ভারতভূমি

সিন্ধু নদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদাড়ো নামে যে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সে নগরের চারদিকে কোন প্রাকার বা পরিখার বেষ্টনী নেই। কোন কোন ঐতিহাসিক এই মন্তব্য করেছেন যে, চারদিকে প্রাকার বা পরিখা না থাকার কারণেই বহিঃশত্রুর আক্রমণে ঐ নগরকে সহজেই বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু এটা নিছক অনুমাননির্ভর মন্তব্য। এই ধরণের অনুমানেরও ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। মহেঞ্জোদাড়ো হলো একই স্থানে স্তরক্রমে বিন্যস্ত সাতটি বিভিন্ন যুগের সভ্য জনজীবনের নিকেতন সাতটি নগরের ধ্বংসাবশেষ। সুতরাং এ সত্য স্বীকার করতে হয় যে, প্রাকার না থাকা সত্ত্বেও সিন্ধু উপত্যকার ক্রোড়ে অবস্থিত ঐ মহেঞ্জোদাড়োর ভূমিতে শিল্পকুশল এক মানবসমাজ কয়েক শত অথবা সহস্রাধিক বৎসর ধরে বিশেষ এক সংস্কৃতি রচনা করেছিল এবং সে সংস্কৃতিকে সুরক্ষিত করেও রাখতে পেরেছিল। হয় সহস্রাধিক বৎসরের মধ্যে মহেঞ্জোদাড়ো নগরের প্রাণ কোন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, নয় আক্রান্ত হয়েও আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল মহেঞ্জোদাড়ো।

যাই হোক, প্রাকার থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে এমন শত শত ঘটনাও তো হতে দেখা গিয়েছে যে, কঠিনতম পাষাণের প্রাকার দিয়ে সুরক্ষিত নগর বহিঃশত্রুর রণোল্লাসের শব্দেই চূর্ণ হয়ে গেছে। সু-উচ্চ চীনা প্রাচীরও শেষ পর্যন্ত সুশ্যামল ইয়াংসি উপত্যকার মানুষের শান্তিকে বহিঃশত্রুর অস্ত্রের পীড়ন হতে রক্ষা করতে পারেনি। ভারতের অদ্রিবহুল উত্তর সীমান্তের কোন গিরিসঙ্কট ভারতাভিমুখী শত্রুব্যূহের পথে তেমন কোন সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রাচীন কথা ছেড়ে দিই, এই বিংশ শতাব্দীতেও কোন মাজিনো লাইন একটি জাতিকে পরাক্রান্ত অপর জাতির আক্রমণ হতে রক্ষা করতে পারেনি। ইতিহাসের ঘটনায় এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, জনপদের প্রাণ, জাতির প্রাণ ও সংস্কৃতির প্রাণ কোন রকমের প্রাকার দিয়ে ঘিরে রেখে নিরাপদ করা যায় না।

যে কোন জাতির জনজীবনে প্রাকারের দৃঢ়তা নয়, ভিত্তিভূমির দৃঢ়তাই তার নিরাপত্তার, শক্তির ও আত্মরক্ষার সব চেয়ে বড় অবলম্বন। প্রাচীন ভারতে জনপদ রচনার বিবিধ স্থাপত্যগত রীতির মধ্যে প্রাকার ও পরিখা দিয়ে জনপদ সুরক্ষিত করার নানা রীতি ছিল। কিন্তু একটি রীতি ছিল ; যার মধ্যে পরিখা ও প্রাচীরের তেমন কোন গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল না। এবং এই রীতিরই নাম হলো সর্বতোভদ্র। সর্বতোভদ্র জনপদের চার দিক অবারিত। প্রাচীর কিংবা পরিখা নয়, দিগ্‌দেবতার মূর্তি সে জনপদের সীমান্ত রক্ষা করে। সর্বতোভদ্র

গৃহ হলো—অনিবিদ্ধালিন্দভেদং চতুর্দ্বারঞ্চ যদ্‌গৃহম।

জনপদের মত জনমনেরও একটা স্থাপত্য আছে। এবং প্রাকারের বেষ্টনী জনপদের সুরক্ষায় যে পরিমাণ ব্যর্থ হয়েছে, জনমনের সুরক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে তার চেয়ে বেশি। জনমনের ক্ষেত্রে প্রাকারের বেষ্টনী সব চেয়ে বেশি ভয়াবহ বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সুরক্ষা নয়, উন্নতিও নয়, প্রাকারবদ্ধতা জনমনের মৃত্যুকেই সহজতর করে।

ভারতীয় সংস্কৃতিরও একটা সর্বতোভদ্র রূপ অথবা গঠন আছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সর্বতোভদ্রের প্রাকার নেই সত্য, কিন্তু তার ভিত্তি অতি দৃঢ়। ভারতীয় জাতি তার সাংস্কৃতিক জীবনে এই সর্বতোভদ্রতার আদর্শ যে পরিমাণে রক্ষা করেছে, তার জাতীয় জীবনও সেই পরিমাণে উন্নত হয়েছে। যখন এবং যে যুগে ভারতের জীবনে ও চিন্তায় এই রীতির অন্যথা হয়েছে, তখনই এবং সে যুগে ভারতের জনজীবন দুর্বল ও অবনত হতে বাধ্য হয়েছে। ভারতের ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষী।

ভারত এবং ভারতীয় সংস্কৃতি এই সর্বতোভদ্র পদ্ধতিরই পরীক্ষার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র। এক কথায় এই আদর্শকে বলা যায়, সমন্বয়ের আদর্শ। মনের চারদিকে কোন প্রাকার তুলতে চায় নি ভারতের আদর্শ ; যদিও আদর্শের বহু ব্যতিক্রমও ভারতীয় ইতিহাসে হতে দেখা গিয়েছে। ঘর এবং বাহির উভয়ের সম্পর্কেই ভারতীয় জাতি সমন্বয়ের যে সদ্ধর্ম আবিষ্কার করেছে, তাই হলো তার সাংস্কৃতিক শক্তির শ্রেষ্ঠ আধার। 'কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া'—ভারতীয় জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই ধরণের নিদারুণ জাতীয়তাবাদ কখনো সম্মানিত হয়েছে বলে মনে হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গী যথার্থ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যতিক্রম। প্রকৃত ভারতের প্রকৃত কবিবাণীতে এই সত্যই স্বীকৃত হয়েছে যে, বিশ্বের সঙ্গে যেখানে হৃদয় যুক্ত হয়, 'সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।' এই হলো ভারতের সর্বতোভদ্র আত্মার সঙ্গীত। ভাষা, ভূগোল, ধর্ম, সংস্কার, সংস্কৃতি ও গাত্রবর্ণ—বিশ্বজীবনের এই সব সৃষ্টি মানুষে-মানুষে বিরোধের হেতু হয়ে ওঠে, এ এক দুঃখকর বাস্তবতা। এই সব সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে বৈচিত্র্য বলে স্বীকার না করে 'প্রভেদ' বলে মনে করলে ভুল করা হয়। এই ভুলই বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভারতবাসী হয়ে এই গর্ব না করে পারি না যে, মানবতার এই দুরূহ সমস্যাকে সমাধান করার এক রীতি এই ভারতই আবিষ্কার করেছে এবং ভারত তার সংস্কৃতির ইতিহাসে সে রীতির সাফল্যও প্রমাণ করে দেখিয়েছে। গ্রহণ, আহরণ ও সমন্বয়—কোনই সন্দেহ নেই, ভারতীয় চিন্তা-রীতির এই ত্রিধারা ভারতকে মহামানবের পুণ্যতীর্থে পরিণত করেছে।

ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনের এই সমন্বয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা মহাত্মা গান্ধীর উক্তিতে যেভাবে পাই, তাতে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে যেন সেই সর্বতোভদ্র রীতিরই পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে।

'আমি আমার ঘরের চতুর্দিকে প্রাচীর তুলে রাখতে চাই না, ঘরের জানালাও অবরুদ্ধ করে রাখতে চাই না। আমি চাই, প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে বাতাসের মত আমার ঘরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হোক। কিন্তু, এই বাতাসের ঝাপটায় আমি আমার ঘরের ভিতর থেকে উৎক্ষিপ্ত হতে রাজী নই।'

বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে যে মনোভাব যথার্থ ভারতীয় মনোভাব, মহাত্মা গান্ধীর উক্তিতে তারই সত্যতা সমর্থিত হয়েছে। বিশ্বের জন্য ঘরের প্রতি প্রীতির পরিমাণ কম করতে হবে, এমন

কোন কথা নেই। মহাত্মা গান্ধী নিজের ঘরের ভিত্তি থেকে দূরে সরে যেতে রাজী নন। এই প্রাচীরহীন অথচ দৃঢ়ভিত্তি জাতীয় সংস্কৃতিই হলো সমন্বয়ধর্মী সংস্কৃতি।

শুধু বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আচরণে নয়, ঘরের রূপেও যে সর্বতোভদ্রতার প্রয়োজন আছে, মহাত্মা গান্ধীর উক্তিতে তারও এক সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বর্তমান পৃথিবীর সমগ্র মানবতার পক্ষে আর একটি ক্ষতিকর সমস্যা এই যে, এক একটি ভৌগোলিক পরিধির মধ্যে জাতি নামে আখ্যাত এক একটি জনসমাজ আবার বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। ধর্মগত শ্রেণী, বর্ণগত শ্রেণী, জীবিকাগত শ্রেণী ইত্যাদি। আরও দুঃখের বিষয়, একই জাতি বা সমাজে অন্তর্ভুক্ত এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থের ও মর্যাদার বিরোধ আছে। সমাজে শ্রেণীগত বৈচিত্র্যও যে স্বাভাবিক এবং সেই বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত, নিখিল মানবজীবনের এই সহজ সত্যকে বিবেচনা করে বুঝতে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে, যেহেতু শ্রেণীগতভাবে শোষণ ও ঘৃণার ব্যাপার চলছে। তাই জাতির সমাজদেহের এবং সমাজমনের স্থাপত্যেও মহাত্মা গান্ধী বস্তুতঃ সেই সর্বতোভদ্র রীতির সার্থকতাই উপলব্ধি করেছেন। প্রাচীর চাই না। শ্রেণীবৈচিত্র্য থাকবে অথচ শ্রেণীশোষণ থাকবে না, এই রকম সুসমন্বয়ের পন্থা আছে। মহাত্মা গান্ধী সত্য সত্যই স্থাপত্যশিল্পের জ্যামিতিক রীতির উপমা দিয়েই বলেছেন :

'সমাজের শ্রেণীবিভাগ থাকবে, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব তথা অবস্থান পরস্পরের সমান্তরাল হবে, পরস্পরের সম্মুখে প্রাকারবৎ নয় ; [Class divisions there will be, but this will then be horizontal, not vertical.]

পরস্পরের সম্মুখে প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান বাধার রূপ নিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান বাঞ্ছনীয় নয়। তাদের কর্ম অধিকার লক্ষ্য ও স্বার্থ হবে পরস্পরের সমান্তরাল, যে অবস্থায় কারও সঙ্গে কারও সংঘর্ষের অবকাশ অথবা প্রয়োজনও থাকবে না।

ভারতের ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, ভাষা এবং সামাজিকতার ইতিহাস বস্তুতঃ বহুযুগব্যাপী এক বিরাট সমন্বয়ের ইতিহাস। বাহিরকে, বিরোধীকে, নতুনকে এবং অপরিচিতকে আহরণ ক'রে এসেছে ভারত, অথচ তার সভ্যতার মূলভিত্তি পরিবর্তনের কোনই প্রয়োজন হয়নি। সমন্বয় সাধনের এই শক্তি ভারত সহজে লাভ করেনি। এর পেছনে দীর্ঘকালের চিন্তার অন্বেষণের ও পরীক্ষার ইতিহাস আছে। যার ফলে সাংস্কৃতিক জীবনের কতগুলি নৈতিক সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সমগ্র মানুষ জাতির পক্ষেই সত্য।

সকল ধর্মই সত্য, এই বাণী একান্তভাবে ভারতেরই বাণী। আড়াই হাজার বছর পূর্বের ভারতের গিরিগাত্রে খোদিত অশোকের অনুশাসন হতে সুরু ক'রে সেদিনের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর রামকৃষ্ণ পর্যন্ত, সকল মনীষী সাধক ও মহাপুরুষের বাণীতে ঐ তত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে। তাই ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণীতে এমন আবেদন সহজেই ধ্বনিত হয়—

'I see in my mind's eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible, with Vedanta brain and Islam body'.

নানা মত নানা ভাষা ও নানা পরিধান, কিন্তু এই বিবিধের মধ্যেও এক মহান্ মিলনের রূপ ভারতের জীবনে সত্য হয়েছে তার সমন্বয়সাধিনী শক্তির গুণে। ভাষার ভেদ ভারতে জাতীয় ঐক্যের বাধা না হয়ে বরং মিলনেরই সূত্র হয়ে উঠেছে, এ সত্যের স্বীকৃতি ভাষাতাত্ত্বিকের বিবরণীতেই পাই—

'A man could almost walk for 1500 miles, from Dibrugarh to Goa, without being able to point to a single stage where he had passed from one language to another' [Linguistic Survey of India, Report]

এ তো সত্যই 'এক দেহে লীন' হয়ে থাকারই মত সার্থক সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত। ভারতের এই সব বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রাচীর খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং মনে হয়, ভারতের ভাষা যেন একই গঙ্গার জলধারা। একটি প্রবাহ সারাদেশের মনোভূমির ওপর দিয়ে চলেছে। কোথাও পাথর, কোথাও মাটি, তাই শুধু কলধ্বনির বৈচিত্র্য।

নৃতাত্ত্বিক সার্ভের রিপোর্টও এই সাক্ষ্য দান করে যে, 'কত মানুষের ধারা' এই ভারত-ভূমিতে এক দেহে লীন হয়েছে। এ ইতিহাসও নরকবোটি এবং দেহশোণিতের এক সমন্বয়ের ইতিহাস। জাত-পাতের অনেক সংস্কার ও প্রথার সাহায্যে একটা দেহবর্ণগত ভেদবাদ প্রচলিত রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের সমন্বয়মুখী আগ্রহই জয়ী হয়ে এসেছে। কোন জাতগরবী গোষ্ঠীর পক্ষে মাথার খুলির মাপ অনুসারে আভিজাত্য ও কৌলীন্য অটুট রাখা সম্ভবপব হয়নি।

পৃথিবীর দশটি প্রধান ধর্মের মধ্যে তিনটির উৎপত্তি ভারতে। তা ছাড়া জরথুস্ত্রীয় ধর্ম এখন ভারতেরই আশ্রিত। পৃথিবীর মধ্যে অন্যান্য দেশের তুলনায় সব চেয়ে বেশি সংখ্যক ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ভারতেই (অখণ্ড) বাস করে। এই হিসাবে ভারত বস্তুতঃ পৃথিবীব পাঁচটি প্রধান ধর্মেব আবাসভূমি। শুধু হিন্দুমন্দিরেব শিখর এবং মসজিদের মিনার নয়, ভারতেব পথে প্রান্তরে শত শত গির্জার চূড়াও আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রটেস্ট্যাণ্ট এবং রোমান ক্যাথলিক, খৃষ্টীয় ধর্মমতের এই দুই প্রধান সংহতির অনুগামী ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, ডাচ, আর্মানী, ইতালীয়, পর্তুগাল, গ্রীক, মার্কিন ও সিরীয় গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীত এই ভারতেরই বাতাসে প্রতিদিন ধ্বনিত হয়। তাছাড়া ইহুদীর সিনাগগও আছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এ দৃশ্য দেখা যায় না। এ দৃশ্য শুধু সমন্বয়েব ভূমি ভাবতেই সম্ভবপব।

সাঙ্গীতিক বিশেষজ্ঞরা জানেন, ভাবতেব সঙ্গীতকলায় সুরকাব খুসরৌ কোন্ দেশের রীতি সমন্বিত করে 'খেয়াল' সৃষ্টি করলেন। ভারতেই হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিভার সৃষ্টি হলো উর্দু নামক এক ভাষা। অল্পাধিক ৩ শত বৎসরের মধ্যে এমন শক্তিশালী ও সাহিত্যগুণপ্রধান একটি নতুন ভাষা পৃথিবীর অন্য কোন কোথাও সৃষ্টি হয়েছে, এমন উদাহরণ পাই না।

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শ্রীজওহরলাল নেহেরু ভাবতের হৃদয় সন্ধান করতে গিয়ে এই সত্যেরই সন্ধান পেয়েছেন যে, ভারতের হৃদয় এলিফ্যাণ্টা দ্বীপের ত্রিমূর্তি সদাশিবেব মতই উদার আগ্রহে কল্যাণদৃষ্টি তুলে সমুদ্র ও দিগন্তের মিলনরেখার দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি অবারিত ও অবাধ। 'মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে'—ত্রিমূর্তির ভাবদৃষ্টিতে এই আবেদন যেন ফুটে রয়েছে। এই ভারত হলো সেই সর্বতোভদ্র ভারত, যে ভাবত অচল-সংস্কারের প্রাচীরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখে না। এ ভারত 'ডগ্‌মা'র উপাসক নয়, এ ভারত কাউকেই ঘৃণা ক'রে দূরে সরিয়ে রাখার ধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে না। এ ভাবত বহুর মধ্যে এবং বৈচিত্র্যের মধ্যেই একত্বের প্রতিষ্ঠা করে। এ ভারতেব ভাব ভাষা শিল্প ও সঙ্গীতে পৃথিবীর সুর ছন্দ ভঙ্গী এসে আপন হয়ে মিশে যায়।

ভাবতীয় জনজীবনের ঐতিহাসিক রূপের মধ্যে তিনটি সত্যের প্রমাণ পেয়ে বিস্মিত

হয়েছেন জওহরলাল—ঐক্য (Oneness), কালসহতা (Endurance) এবং অবিচ্ছিন্নতা (Continuity). ভারতীয় জনজীবনের সহস্র বিভিন্নতার মধ্যেও অতি কঠিন এক ঐক্যের ছাপ ('Tremendous impress of oneness') জওহরলালের সন্ধানী চক্ষে ধরা পড়েছে। সহস্র সহস্র বৎসরের পরিবর্তনের ধারায় আপ্লুত ভারতীয় জনজীবনের বিস্ময়কর একটি সুচিরস্থায়ী রূপ। কেমন ক'রে ভারত পেল এই সুস্থায়িত্বের শক্তি? এই ভারতেরই নদীতটে, উপত্যকায় ও পল্লীপথে আজও অজন্তার মেয়ে'কে দেখতে পাওয়া যায়। সেই রূপ, সেই বেশ, সেই অলঙ্কার ও গ্রীবাভঙ্গী। এক-একটি উৎসব কত হাজার বছরের প্রাচীন আনন্দের সাক্ষ্য! ভারতীয় জনজীবনে বহু সহস্র বৎসরের সাংস্কৃতিক ধারার এই অবিচ্ছিন্নতা স্পষ্টভাবেই জওহরলাল দেখতে পেয়েছেন এবং সারা ভারতের জনজীবনের রূপ এক তীর্থপথিকের মতই পর্যবেক্ষণ করে তিনি এই ঐতিহাসিক সত্যেরই সাক্ষাৎ পেয়েছেন যে, সমন্বয়ের নীতিই ভারতের এই সাংস্কৃতিক শক্তির উৎস।

ব্যক্তির চেয়ে সমাজ বড়। ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমষ্টির স্বার্থই শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় প্রতিভার আবিষ্কার এই সমাজনীতি ভারতের সংস্কৃতিকে সমন্বয়ধর্মী হয়ে উঠবার আর এক শক্তি দান করেছে। ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে স্বার্থের বিরোধ মানুষের সামাজিক স্থিতি ও উন্নতির বোধ হয় সবচেয়ে বেশি পুরাতন জটিল ও দুরূহ এক অন্তরায়। ব্যক্তির জীবনযাপনের রীতি এমন হবে যে, সে রীতি বৃহত্তর সমষ্টির কল্যাণের বিঘ্ন হবে না। ব্যক্তির জীবনকে সমষ্টির জীবনের সঙ্গে সমন্বিত করবার এই নীতি অথবা রীতির মর্যাদা ঘোষণা করে ভারত মানব-জীবনেরই ঐক্যের মহত্ত্ব ঘোষণা করেছে। ভারতীয় ক্লাসিক সাহিত্যের মর্মনিহিত প্রধান তত্ত্ব হলো, সমষ্টির কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব। পারিবারিক নিয়মতন্ত্রের একান্ন-বর্তিতার প্রথা, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ শাসনপ্রথা, এবং এমনকি স্পৃশ্যাস্পৃশ্য ভেদবাদ ও ঘৃণাবাদের দ্বারা বিকৃত জাতপ্রথার মূল কাঠামোর মধ্যেও দেখা যায় যে, তার মধ্যেও ব্যক্তিকে সমষ্টিগত স্বার্থের সেবকরূপেই প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্য ছিল।

ভারতের শিল্পকলার বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। শত শত বিভিন্ন রীতি স্টাইল ও ঐতিহ্যে শিল্পী-ভারতের রূপ আকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এক অঞ্চলের কারুকলা আর এক অঞ্চলের কারুকলা হতে ভিন্নতর দেখে মনে হতে পারে, বিভিন্ন অঞ্চলে যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক একটি জাতি তার স্বতন্ত্র রুচি অনুসারে শিল্পসৃষ্টি ক'রে চলেছে। কিন্তু এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো, সেই সমন্বয়ের সত্যতা। ভারতের এই বহু বিভিন্ন শিল্পরীতিও একটি ঐক্যের সূত্রে সম্পৃক্ত। সে ঐক্য একেবারে অন্তরে নিহিত ঐক্য, চোখে দেখেও অনুভব করা যায়। ইংরাজ শিল্প সমালোচক এবং ঐতিহাসিক জর্জ বার্ডউডও অনুভব করতে পেরেছেন যে, হিমালয় হতে আরম্ভ করে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত এই বিশাল ভারতে :

'Yet all arts, whether savage, Brahmanical or Mohomedan, are essentially of one generic style' ['Industrial arts of India']

ভারতের চিত্রকলা হলো পৌরাণিক যুগ, গুপ্তযুগ, মোগল, রাজপুত এবং পাহাড়ী রীতির সমন্বয়েরই এক একটি বাস্তব সাক্ষ্য। ভারতীয় কারুকলায়, তৈজসশিল্পে, বয়নশিল্পে, মৃৎশিল্পে এবং ধাতু-কাষ্ঠ-গজদন্তের শিল্পে এশিয়া মহাদেশের প্রায় সকল দেশেরই রীতির ধারা সমন্বিত হয়েছে। সমন্বয়ের সাধনক্ষেত্র এই ভারতভূমিকেই আধুনিক কালের মুসলমান কবি ইকবালও একদিন সশ্রদ্ধ বন্দনা জানিয়েছিলেন—

'চিশতিনে জিস্ জমিন মে
পয়গামে হক সুনায়া
নানকনে জিস্ চমনমে
ওহ্দৎকা গীত গায়া।'

যে দেশের ভূমিতে সাধক চিশতি একদিন সত্যের বাণী প্রচার করেছিলেন, যে দেশের কুঞ্জে নানক একদিন ঐক্যের গান গেয়েছিলেন, সেই দেশকে চিনেও অবশ্য শেষ পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন ইক্‌বাল।

'মিলে গেছে ওগো বিশ্বদেবতা, মোর সনাতন স্বদেশ'—রবীন্দ্রনাথের এই বাণীতে ভারতের সেই সর্বতোভদ্র চিত্তেরই সুর শোনা যায়। কবি তাঁর স্বদেশভূমি ভারতের এক 'সনাতন' রূপ লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করেছেন, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও নেহেরু। কিন্তু এই সনাতন সর্বতোভদ্র ভারতের হৃদয়ে তাঁরা সমগ্র বিশ্বের বাতাস আহ্বান করেছেন। প্রাচীরের অবরোধ সহ্য করতে পারে না ভারতের আত্মা। ভারতের চিত্ত হলো সাধক কবীরেরই গানের মত, যে চিত্ত আকুল হয়ে প্রার্থনা করে—ঐ অবগুণ্ঠনের পট সরিয়ে দাও, নইলে প্রিয়ের সাক্ষাৎ পাবে না।

আজও আছে সেই বিতস্তা

আজও আছে সেই বিতস্তা, আজকের কাশ্মীরের যে নদীর নাম ঝিলম। কলহন তাঁর রাজতরঙ্গিণীতে লিখেছেন, ঋষি কশ্যপ এক গিরি-হ্রদের জল প্রবাহিত করে এই বিতস্তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। নিতান্ত কল্পনার কথা বটে ; কিন্তু কল্পনাটা অসুন্দর নয়। নদী বিতস্তা, তথা ঝিলম কাশ্মীরের ভৌমপ্রকৃতির একটি চমৎকার বিস্ময়। এই ঝিলমের চিরপ্রবাহিত স্রোতের মত কাশ্মীরের উপত্যকার মানুষের জীবনের ইতিহাসও প্রবাহিত হয়েছে। সেই ইতিহাস নিতান্ত ভারতেরই জীবনের একটি স্থানিক বৈচিত্র্যের ইতিহাস।

এই কাশ্মীর কি সত্যই একটা সমস্যা? আজকের রাষ্ট্রপুঞ্জের আসরে আন্তর্জাতিক মুখরতার এক অদ্ভুত কলরবের মধ্যে কথাটা বার বার শুনতে পাওয়া যায়, কাশ্মীর সমস্যা! কিন্তু কিসের সমস্যা? কার কাছে কাশ্মীর একটা সমস্যা?

বলতে পারা যায়, কাশ্মীর তাদেরই দ্বারা একটা সমস্যা বলে প্রচারিত হয়েছে, যাদের মনে সাম্রাজ্যিক সুখের আশা এখনও একটা পুরাতন স্বপ্নের উদ্ধত লালসার মত জেগে রয়েছে।

কাশ্মীর উপত্যকার যারা অধিবাসী, তাদের বেশির ভাগই মুসলমান। হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা খুবই কম ; শতকরা পাঁচের বেশি নয়। লাদাকের অধিবাসীরা বৌদ্ধ। জম্মুর অধিবাসীরা বেশির ভাগ হিন্দু ; মুসলিমের সংখ্যা খুবই কম। ধর্মগতভাবে এই তিন ভিন্ন জনসমাজের তিনটি ভিন্ন বাসভূমি নিয়ে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য। কিন্তু এই কারণে কারও পক্ষে এমন ধারণা করবার যুক্তি নেই যে, এটা একটা সমস্যা ; এবং বিশেষ করে কাশ্মীরেরই একটা সমস্যা। ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই ছোট-বড় বহু অঞ্চল আছে, তালুক জেলা মহকুমা গ্রাম ও মহল্লা, যেগুলি বিশেষ বিশেষ আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মানুগত জনসমাজের বাসভূমি। কিন্তু সেজন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ধর্মগত কোন সমস্যার রাজ্য হয়ে ওঠেনি। আরও একটা বড় সত্য এই যে, কাশ্মীর উপত্যকার মুসলিম অধিবাসীর

জীবনে ধর্মগত স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার কোনই সমস্যা নেই। মওলানা মাসুদি, মৌলবী ফারুক আর জনাব মহিউদ্দিন কারা ; কিংবা শেখ আবদুল্লা ও মির্জা আফজল বেগ ; এঁরাও কেউই আজ পর্যন্ত এমন অভিযোগের কথা মুখরিত করেননি যে, কাশ্মীরী মুসলিমের ধর্মাচরণের সুবিধা ও স্বাধীনতার কোন সমস্যা আছে।

ভাষা নিয়েও কোন সমস্যা নেই। কাশ্মীরী হিন্দু-মুসলিমের ঘরোয়া ভাষা কাশ্মীরী ; জম্মুর ঘরোয়া ভাষা ডোগরী ; আর লাদাকের ঘরোয়া ভাষা লাদকী। কিন্তু এটাও কি নিতান্ত একটা কাশ্মীরী সমস্যা? নিশ্চয়ই নয়। ভারতের অনেক রাজ্যে এখনও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগত অঞ্চল আছে। এই পশ্চিমবঙ্গেরই দার্জিলিং ভাষাগত অঞ্চল হিসাবে রাজ্যের অন্য অঞ্চল হতে ভিন্নতর। তাছাড়া ভারতের প্রত্যেক রাজ্য বস্তুত কম-বেশি বহুভাষী, সেখানে ভিন্নভাষী অন্য রাজ্যের জনসমাজও বসবাস করে।

পরিচ্ছদের কথাই ধরা যাক। কাশ্মীরের একটি প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়েছে, মাথার টুপিটি সরিয়ে দিলে কে-ই বা হিন্দু আর কে-ই বা মুসলিম? পরিচ্ছদে সাধারণ কাশ্মীরী হিন্দু-মুসলিমের প্রভেদ খুবই সামান্য ; নেই বললেও চলে। এক্ষেত্রে দুই সমাজের ভেদ স্পষ্ট করে তোলার মত কোন ভিন্নতা নেই। যেটুকু আছে সেটা কোন সমস্যাই নয়। যদি সমস্যা বলা হয়, তবে একথাও বলতে হবে যে, এটা নিতান্ত অথবা বিশেষ করে কাশ্মীরী সমস্যা নয়। ভারতের সব রাজ্যেই এই সমস্যা আছে।

আসল সত্য অবশ্য এই যে, এগুলি সমস্যাই নয়। যেটা বৈচিত্র্য সেটা ঠিক প্রভেদ নয়। এবং ভারতের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এই যে, বৈচিত্র্যই তার একটি সৌন্দর্য। এই সংস্কৃতি আকারে ও প্রকারে একটি কঠোর 'মনোলিথ' নয়। 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান্'-- কবির উক্তি বাড়িয়ে বলা কল্পনার কথা নয় ; ভারতীয় সংস্কৃতির একটি বাস্তব ঐতিহাসিক সত্য।

তাই বুঝতে পারা যায় না, আধুনিক কাশ্মীরের কিছু মুসলিম কেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের কথা তুলে রাজনীতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলেছেন। কাশ্মীরী মুসলিমের সমাজ ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনে কোন স্বচ্ছন্দতার অভাব নেই। শুধু ধর্মের নাম করে যদি পাকিস্তানীর সঙ্গে কাশ্মীরী মুসলিমের আত্মীয়তার একটা দাবি দাঁড় করানো হয় তবে সেটাও ভুল যুক্তির দাবি হবে। পাঁচ কোটি ভারতীয় মুসলিমের সঙ্গে কি চল্লিশ লক্ষ কাশ্মীরী মুসলিমের ধর্মগত আত্মীয়তা নেই?

এসব সবারই জানা কথা। সাধারণ সহজ ও সরল এবং বাস্তব সত্যের কথা। কিন্তু একটা বিস্ময়ের বিষয় বলতে হবে, কাশ্মীরের কিছু মুসলিম তবু আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করেন, কেউ কেউ একেবারে পাকিস্তানের সঙ্গে রাষ্ট্রিক সাযুজ্য লাভ করতে চান। কিন্তু এই অদ্ভুত মনোবৃত্তির কাণ্ড দেখে ব্যাপারটাকে নিতান্ত একটা কাশ্মীরী সমস্যা বলে ধারণা করা উচিত নয়। এ ধরণের স্থূল ও রূঢ় বিচ্ছেদের দাবি ভারতের অন্য কয়েকটি অঞ্চলেরও এক শ্রেণীর উদ্‌ভ্রান্তের দ্বারা আন্দোলিত হয়েছে। দ্রাবিড়, কাজাগম, মাস্টার তারা সিং এর অনুগামী অকালী আর পূর্ব প্রান্তের ফিজো-নাগা ; এঁরাও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠা দাবি করতে সঙ্কোচ বোধ করেননি। সুতরাং কাশ্মীরের কিছু মুসলিমের 'স্বাধীন-কাশ্মীর' অথবা পাকভুক্তির উৎসাহ দেখে কাশ্মীর সম্পর্কে ধারণা বিষণ্ণ করবার কোন কারণ নেই, কোন অর্থও হয় না।

কবি সার মহম্মদ ইকবাল যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত, তখন জওহরলাল নেহেরু একদিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। নেহেরু লিখেছেন, কবি ইকবাল এই বলে আক্ষেপ করলেন যে, পাকিস্তান দাবির কোন অর্থ হয় না। কবি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের চিন্তাতে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সে সত্য লীগ-নেতৃত্বে বিভ্রান্ত ভারতীয় মুসলিম সমাজের অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু কাশ্মীরী মুসলিম সমাজ উপলব্ধি করেছিলেন। কবি ইকবালের পূর্বপুরুষেরা কাশ্মীরী। অনুমান করলে ভুল হবে না, কাশ্মীরী মুসলিমের মনের গভীরে কোথাও এই উপলব্ধি নিহিত আছে যে, পাকিস্তান বস্তুত একটা বিভ্রান্তিরই দাবির সৃষ্টি। যেটা কাশ্মীরী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য সেটা বৃহত্তর ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যেরই একটি অন্তরঙ্গ অংশ। উদ্বেগের একমাত্র হেতু এই যে কাশ্মীরী মুসলিমের এই স্বভাবজ বা ঐতিহ্যগত ভারতীয়তার বোধ আহত ও বিচলিত করবার জন্য বাইরের এক ভয়ানক অভিসন্ধি ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মগত জাতিত্ব ; যে মতবাদ বর্তমান যুগে বাতিল হয়ে গিয়েছে, অচলও হয়েছে, সেই মতবাদ ব্রিটেনের রাজনীতিক ইচ্ছার একটি অপপ্রসূত সৃষ্টি। এই কপট মতবাদ পাকিস্তানের জীবনের এক করুণ অথচ হীন প্রমত্ততা হয়ে কাশ্মীরী মুসলিমের সহজ বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, এটা সিসিফাসের পণ্ডশ্রম মাত্র। কাশ্মীর ভূখণ্ডের ঝিলমের মত আরও একটি ঝিলমের প্রবাহ কাশ্মীরবাসীর অন্তরেও আছে। এই ঝিলম যুগোচিত উপলব্ধিরই এক অন্তঃসলিলা নদী। সমাজ সংস্কৃতি ও অর্থনীতিক সম্বন্ধের বৃহত্তর ঐক্যে যে জাতীয়তা সম্বদ্ধ, তারই প্রতি কাশ্মীরবাসীর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি প্রবল না হয়ে পারে না।

কথিত আছে, মহারাজা সার গোলাব সিং-এর রাজত্বের কালে কাশ্মীরের বহু মুসলমান হিন্দু হবার জন্য আবেদন করেছিলেন। কাশীর পণ্ডিতেরা অনুমোদন করেননি বলেই তাঁদের হিন্দুত্ব লাভের সেই দাবি সফল হয়নি। এই ঘটনা কিন্তু আধুনিক কালের কোন জাতির সমাজজীবনের পক্ষে কোন শিক্ষা নয়। এভাবে একজাতিক সমন্বয় সম্ভব করবার কল্পনা নিতান্ত ভ্রান্তিবিলাস। এমন ধারণাও করা উচিত নয় যে, ধর্মবোধের জীবনক্রমের মধ্যে জীবজগতের প্রকৃতির মত অ্যাটাভিজম্ সম্ভব। পূর্বপুরুষের ধর্ম ফিরে পাওয়ার জন্য সত্যই কোন জনসমাজ আন্তরিক আগ্রহে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, এমন ঘটনা পৃথিবীতে কোথাও কখনও সম্ভব হয়নি। জাতি ও ব্যক্তির অভিজ্ঞতার জীবনে বরং এই সত্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার বর্তমানের ধর্মই তার আন্তরিক বিশ্বাসের মহনীয় আস্পদ। পূর্বপুরুষের ধর্মের কাছে ফিরে যাবার জন্য তার চিন্তায় কোন অস্বস্তির তাড়না থাকে না। আর ফিরে যেতে না পারার জন্যে কোন বেদনাও থাকে না। গণ-ধর্মান্তর বস্তুত কোন না কোন অর্থনীতিক দুর্ভাগ্যের চাপ, কিংবা অত্যাচারী রাজনীতির দাপটে ক্লিষ্ট জনতার অসহায় অবস্থার কীর্তি। আধুনিককালের কাণ্ডজ্ঞানের কাছে এ ধরণের ধর্মগত ঐক্য সম্ভব করবার কথা নিতান্ত হাস্যকর দিবাস্বপ্নের বাচালতা।

অনেকে বলেন—সিনথেসিস : সংস্কৃতির এবং ধর্মেরও সুষ্ঠু সমন্বয়ের কথা। ভারতীয় ঐক্যের কথা উঠলেই এই সমন্বয়ের কথাটিও বড় বেশি মুখরিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সিনথেসিস ব্যাপারটা অত্যন্ত দীর্ঘকালীন একটা ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম কাজ। এটা আইনের সাধ্য কাজ নয়। ভারতের সাংস্কৃতিক সংগঠনের সবচেয়ে বড়

সত্য এই যে, নানা ভাষা নানা মত ও নানা পরিধানের স্বচ্ছন্দ সহ-অবস্থানের জন্যই বিবিধের মাঝে এক মহান্ মিলন সম্ভব হয়েছে। সিনথেসিস অনেক পরের ও দূরের সত্য ; বর্তমানের দাবি সহ-অবস্থান। এই আদর্শ ভারতজীবনে একটা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য বলেই কাশ্মীর একান্তভাবে ভারতভূমিরই কাশ্মীর। আশা করা যায়, কবি ইকবালের [illegible] যে সত্য শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছিল আজকের কাশ্মীরের আবদুল্লা-[illegible] ফারুকের প্রাণে শেষ পর্যন্ত সেই সত্যেরই উপলব্ধি সুস্পষ্ট হয়ে দেখা [illegible]

তারাই কাশ্মীরকে একটা সমস্যা বলে প্রচার করেছে, যারা ধর্মকে জাতি[illegible] বিশেষ[illegible] বলে প্রচার করেছে। আধুনিক জগতে ব্রিটেন নামে পরিচিত দেশটির নিজের [illegible] রাজনীতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে ধর্মগত জাতিবাদের মত একটা ইতিহাসবিরোধী অসত্যের ও কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। কিন্তু এহেন ব্রিটেনেই পরদেশ ও পরজাতির জীবনের উপরে এই অসত্য ও কুসংস্কারের প্রয়োগ চেয়েছে। হিটলার বলেছিলেন, জাপানও আর্যদেশ। রাজনীতিক আধিপত্যবাদের অভিসন্ধি কত সহজে ইতিহাসের সত্যকে পরিহাস করতে পারে, হিটলার-প্রচারিত এই অদ্ভুত আর্যতত্ত্ব তারই একটি প্রমাণ। [illegible] সাম্রাজ্যিক স্বার্থের স্বপ্নও এ ধরণের একটি উদ্ভট তত্ত্ব সৃষ্টি করেছে, ধর্ম[illegible] এহেন ভয়ানক মিথ্যার তত্ত্বের কাছে কাশ্মীর অবশ্যই একটা সমস্যা। এবং [illegible] ও অনুগ্রহ যার রাজনীতিক জীবনের একটি কাম্য বন্ধন, পাকিস্তান নামে [illegible] দেশের সরকারী মন প্রাণের কাছে কাশ্মীর অবশ্যই একটি সমস্যা। কিন্তু কাশ্মীরবাসীর কাছে ও ভারতের কাছে কাশ্মীর কোন সমস্যাই নয়।

বিখ্যাত মোগল, বাবর বাদশাহের কাছে কাশ্মীর-মদিরা খুবই প্রিয় ছিল। কাশ্মীরকে একটা সমস্যা বলে প্রচার করে পশ্চিমের কয়েকটি রাষ্ট্র যে ধরণের মত্ততা প্রকাশ করেছে ও করে চলেছে, তাতে মনে হতে পারে, আধুনিক কাশ্মীরই তাদের রাজনীতিক উপভোগের এক চমৎকার মদিরা। ওই মত্ততা বস্তুত একটি রাজনীতিক স্বার্থেরই নেশার কাণ্ড।

কিন্তু কারও রাজনীতিক স্বার্থবোধ নেশাগ্রস্ত হলেই কাশ্মীর একটা সমস্যা হয়ে [illegible] হয়ে যায়নি, যাবেও না। কাশ্মীরের ভিতরের কোন কোন দল ও ব্যক্তির কণ্ঠে গণভোটের দাবি অথবা পাক-প্রীতি প্রচারিত হয়েছে বটে ; কিন্তু সেটাই কাশ্মীরী জীবনের আসল সত্য নয়। এবং এই কারণে কাশ্মীরকে একটা সমস্যা বলে মনে করা চলে না। একজন শেখ আবদুল্লার ইচ্ছা ও চিন্তার রকম-সকম দেখে কোন ঐক্যনিষ্ঠ ভারতীয়ের পক্ষে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, রাষ্ট্রিক বিচ্ছেদ শুধু একজন কাশ্মীরী মুসলিমের আগ্রহের বিষয় হিসাবে সম্ভব হতে পারে। ঘটনার শিক্ষা এই যে, এমন শোচনীয় দাবি একজন হিন্দু ভারতীয়েরও আগ্রহের বিষয় হতে পারে। আজকের ভারতের সি পি রামস্বামী আয়ার জাতীয় সংহতির একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক ও প্রচারক। কিন্তু একদিন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যকে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলে দাবি করে তিনি জিন্না ও সাভারকর উভয়েরই প্রশস্তির টেলিগ্রামের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধে নেই, ধর্মগত জাতিবাদ ভারতকে বহুভাবে খণ্ডিত করে সুখী হতে চেয়েছে, আজও চায়। কিন্তু এই ভয়ানক কুসংস্কারের অভিভাবক ব্রিটিশরাজ আজ ভারতের অভিভাবক নয় ; সুতরাং কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ইচ্ছায় আপ্রাণ ব্যাকুল ও ব্যস্ত হয়ে উঠলেও ব্রিটিশের কিংবা সব্রিটিশ অন্য কোন রাষ্ট্র-সরকারের কোন প্রচণ্ড কেরামতির পক্ষেও সেটা সম্ভব হবে না। বরং কালক্রমে দেখা যাবে যে, আবদুল্লা

মাসাদি ও ফারুকেরাই তাঁদের ভারতীয়তার গৌরব ও সার্থকতা উপলব্ধি করে সুখী হয়েছেন। কাশ্মীরবাসীর জীবনের আগ্রহের কাছে ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রগতিশীল আবেদনও এক অলক্ষ্য ঝিলমের প্রবাহ। ভারতেরই সেই বিতস্তা আজকের এই ঝিলম।

ভারত-ইতিহাসে কংগ্রেস

ভারতের বিগত ছেষট্টি বৎসরের ইতিহাস হলো কংগ্রেসেরই ইতিহাস—একথা বলেছেন কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। একথা বলেছেন বিদেশের সুধী মনীষী এবং ইতিহাসপ্রণেতা রাজনীতিবিদ। এশিয়া মহাদেশের যেসব জাতি পরশাসনের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, তাঁদের নেতা এবং সাধারণ মানুষ উভয়েই একটি ঐতিহাসিক উপলব্ধির কথা অকুণ্ঠভাবেই ঘোষণা করে থাকেন···ভারতের কংগ্রেসের ইতিহাস হলো এশিয়ারই মুক্তিসাধনার ইতিহাস। মহাত্মা গান্ধী তাঁর মহামৃত্যু বরণের তিনদিন আগে হরিজন পত্রিকায় 'কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও চিন্তার যে পরিচয় লিখে রেখে গেছেন, তার মধ্যে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, মূল্য, গুরুত্ব এবং প্রয়োজনের তত্ত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বহু অহিংসা সংগ্রামের ভিতর দিয়া কংগ্রেস মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে, আজ তাহার মরণ ঘটিতে দেওয়া যায় না। জাতির যখন মৃত্যু ঘটিবে, শুধু তখনই কংগ্রেসের অবসান ঘটিতে পারে।'

জাতির মৃত্যু হ'লে তবেই কংগ্রেসের মৃত্যু হবে, মহাত্মার এই উক্তির মধ্যেই কংগ্রেসের ঐতিহাসিক পরিচয়ের মর্মকথাটিই অভিব্যক্ত হয়েছে। কংগ্রেস এমনই এক প্রতিষ্ঠান যা আজ জাতির সঙ্গে একাত্মা হয়ে গেছে। জাতীয় সত্তার মধ্যেই কংগ্রেসের সত্তা নিহিত। জাতির ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা হর্ষ ও বেদনার তত্ত্ব দিয়ে কংগ্রেসের অবয়ব রচিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণে আঘাত পড়লে জাতির প্রাণেই আঘাত পড়ে। এ প্রতিষ্ঠান যদি বিভ্রান্ত হয়, তবে জাতি বিভ্রান্ত না হয়ে পারে না। কংগ্রেস জীর্ণ হলে জাতি জীর্ণ হয়। কংগ্রেস ভুল করলে সারা জাতি সে ভুলের প্রকোপে পীড়িত হয়।

বিগত ছেষট্টি বৎসরের ঘটনা দিয়ে রচিত হয়েছে কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক সত্তা। এ প্রতিষ্ঠা প্রপাগ্যাণ্ডার কীর্তি নয়। কংগ্রেস ভারতীয় জীবনের স্বভাবজ তথা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। জাতিদেহ হতে কংগ্রেসকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, অন্ততঃ এখনো তো করা যায় না, যদি কোন অতিরূঢ় আঘাতে এমন বিচ্ছেদ ঘটানো সম্ভবপরও হয়, তবে সেটা সমগ্র জাতির প্রাণশক্তিকেই দীর্ণ করা হবে এবং তার ফলে হবে জাতির মৃত্যু। ভারতের নদনদী ও পর্বত-মালা যেমন ভারতীয় ভূমির যুগব্যাপী আগ্রহের সৃষ্টি, কংগ্রেসও তেমনি ভারতীয় মনোভূমির শতাব্দী ব্যাপী আগ্রহের সৃষ্টি। জাতির আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার যজ্ঞ থেকে আবির্ভূত কংগ্রেস। এ প্রতিষ্ঠানের প্রাণপদার্থ বাইরে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসা ঐশ্বর্য নয়, কোন প্রবল নরপতির রাজসূয় আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টিও নয়। সারা ভারত নিজেকে প্রকাশ করেছে কংগ্রেস রূপে, আপন বেদনায় এবং আপন আগ্রহে। কংগ্রেসের আবির্ভাব এবং অভ্যুদয়ের ঘটনাকে বলা যায় ভারতীয় জীবনের পুনরাবিষ্কার, পুনসৃষ্টি বা নবজন্ম। ভারত ইতিহাসের ১৮৫৭ সন স্মরণ করলেই বোঝা যায়, কি অবস্থায় এবং কি ভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের

জীবনে কংগ্রেস নামে এক অভিনব সংঘশক্তির অঙ্কুর দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ শক্তিকে পরাভূত ও বিতাড়িত করবার সশস্ত্র উদ্যোগ ব্যর্থ হলো। পেশোয়ার থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত ভারতের সেদিনের জীবন ব্রিটিশের প্রচণ্ড প্রতিশোধের আঘাতে রক্তাক্ত ও অশ্রুসিক্ত। তার পরের অধ্যায় হলো, ভারতে ব্রিটিশ প্রতাপের বনিয়াদ অতি কঠিন শাসনের গাঁথুনি দিয়ে সুদৃঢ় করার অধ্যায়। প্রতিবাদহীন, রুদ্ধকণ্ঠ ও নিরস্ত্র ভারত। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী সে সময় ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের অনুগ্রহ বলে স্তুতি করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। রাজা রাণীর স্তবগানে এবং ব্রিটিশ রাজপুরুষের প্রশংসাতে দেশের সাহিত্য ভারাক্রান্ত। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল, এর মধ্যে ভারতের এখানে ওখানে শিক্ষিত সমাজে ধর্মসমাজ ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটা নতুন আকাঙ্ক্ষার আন্দোলন কিছু কিছু জেগে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আন্দোলন সংঘবদ্ধ-ভাবে কোথাও আত্মপ্রকাশ করেনি।

১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৮৫ সাল—উনবিংশ শতাব্দীর এই অধ্যায়টি ভারতীয় জীবনের আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতারও অধ্যায়। এই ব্যাকুলতারই সৃষ্টি জাতীয় কংগ্রেস। নবজন্ম লাভের জন্যে ভারতের প্রাণ নিজের বেদনায় ও আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারই প্রকাশ কংগ্রেস। এ আবির্ভাব ভারতেরই বহু আগ্রহে মন্থিত চিত্তসাগর হতে উদ্ভূত এক শক্তির আবির্ভাব। কংগ্রেসই ভারতের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেসই ভারতের প্রথম প্রতিবাদ ও প্রথম সমালোচনা। ভারত রাষ্ট্রের শাসনকার্যে ভারতীয়ের আত্মাধিকার লাভের প্রথম দাবী কংগ্রেস।

কংগ্রেস ভারতের প্রকৃতি থেকে আবির্ভূত। পরাধীনতার অবমাননায় পীড়িত ভারতের মনোভূমিতে মুক্তি কামনার প্রথম অঙ্কুর কংগ্রেস। এর পরিণতি ও দেবদারু মহীরুহের মত সহজ ও স্বাভাবিক। ভারতে আরও অনেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু এইসব রাজনৈতিক দলের উৎপত্তি ও পরিণতি বস্তুতঃ প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস ছাড়া আর কিছু নয়। এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোন না কোন আক্ষেপ অভিযোগ বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের ঘটনা থেকে উদ্ভূত। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনায় অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গুণে ধর্মে ও স্বভাবে এখানেই একটি ঐতিহাসিক পার্থক্য রয়েছে।

বহুদিন আগে বাঙলাদেশের এক পরিহাসনিপুণ কবি কংগ্রেসকে 'কঙ্গরস' আখ্যা দিয়ে রসিকতা করেছিলেন। কিন্তু সে-সময়েই বাঙলাদেশের আর এক কবি প্রতিবাদ করে যে কথা বলেছিলেন তা'তে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক তাৎপর্যেরই একটি ভাবময় ব্যাখ্যা পাই। শুধু তাই নয়, কবির ভাবনায় ভবিষ্যতের রূপ কতখানি নির্ভুল হয়ে দেখা দিতে পারে, তারও একটি সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র বার বৎসর বয়স্ক সেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং ভবিষ্যৎ উপলব্ধি ক'রে কবি গোবিন্দদাস সেই সময় কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন :

'এ মহান্ প্রজাহোমে
কবোষ্ণ শোণিত সোমে
সদা প্রীত প্রজাপতি সহস্র শিরস্!'

অর্ধশত বৎসরেরও আগে বাঙ্গলারই এক কবি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতের জনতা জীবনের এক বিরাট অভ্যুত্থানের সংকেত নিয়ে দেখা দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের বাণীতে ভারতে প্রজাতন্ত্রেরই 'আগুন কি আওয়াজ' সেদিন শুনতে পেয়েছিলেন যে কবি, ধন্য তাঁর অনুভব, দিব্য তাঁর কল্পনা। আজ দেখা যায়, অর্ধশত বৎসর পূর্বের বিদ্রূপই ব্যর্থ হয়ে গেছে, সত্য হয়েছে শুধু কবির উপলব্ধি—ভারতের প্রজাহোম। কংগ্রেস স্বয়ং ভারতের প্রজাসাধারণের সংঘে পরিণত হয়েছে এবং সেই সংঘই ভারতকে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করেছে।

কংগ্রেস নামে যে সংঘ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তার গঠন পদ্ধতি অবশ্যই পশ্চিমের কাছ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতের অতীত ইতিহাসে ঠিক এই ধরণের সংঘ কখনো ছিল না। বৌদ্ধযুগে অবশ্য কয়েকবার 'মহাসঙ্গীতি' আহূত হয়েছিল। দেশের সর্বপ্রান্ত এবং এমন কি বিদেশ হতে আগত বৌদ্ধসুধীদের সেইসব সম্মেলন ভারতীয় জীবনে সঙ্ঘ গঠনের একটি ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু সেই মহা[illegible] ধর্মশাস্ত্রের [illegible] এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান পদ্ধতি সুপ্রতিষ্ঠ করবার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার [illegible]। ভারতের ইতিহাসে [illegible] রাজনৈতিক উদ্যমের প্রথম সংঘ স্থাপনার [illegible] কংগ্রেস। এর আগে ভারতের ইতিহাসে রাজা নামে এক ব্যক্তির ইচ্ছা আগ্রহ ও [illegible] রাজনৈতিক[illegible] ক্রিয়া প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। ভারতের রাজনীতিকে [illegible] থেকে প্রজা[illegible] নেতৃত্বে প্রথম এনেছে জাতীয় কংগ্রেস। ভারতের রাষ্ট্রজীবনে [illegible] সমাপ্তের পর, কবিবর্ণিত 'প্রজাহোমে'র প্রথম অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছে কংগ্রেস।

আধুনিক পশ্চিমের কাছ থেকে রাজনৈতিক তত্ত্বের শিক্ষা গ্রহণ করেই কংগ্রেসের [illegible] জীবনের [illegible] সুরু হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, কংগ্রেস বিগত [illegible] ও পরীক্ষায় এমন রূপান্তর লাভ করেছে যেটা এখন সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় প্রতিভার একটি নূতন এবং বিশিষ্ট সৃষ্টি বলে মনে হয় এবং বস্তুতঃ তাই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ কোন সংঘ পৃথিবীর কোন দেশে নেই। এতবড় সংঘ [illegible] এত প্রাচীন সংঘ পৃথিবীর কোন দেশে নেই। পৃথিবীর কোন রাজনৈতিক সংঘকে [illegible] মত এত বিবিধ ও ব্যাপক সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়নি। এ ভারতভূমি [illegible] সমস্যার বৈচিত্র্যে একটি পৃথিবীর মতই। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান[illegible]দের মধ্যেই এক মহান্ মিলন রচনার যে প্রয়াসে কংগ্রেসের জীবন [illegible] প্রয়াস পৃথিবীর কোন রাজনৈতিক সংঘকে গ্রহণ করতে হয়নি। এ বিষয়ে [illegible] পৃথিবীর রাজনৈতিক সংঘসমূহের মধ্যেই প্রকৃতিতে, রূপে, গঠনে এবং কৃতিত্বে অভিনব এবং অতুলনীয়। এ কাজ ভারতকে পুনর্গঠন করার কাজ। এ-কাজে ভারতের কোন [illegible] সমাজকে অনাহূত করে রাখেনি কংগ্রেস। বিরাট ভারতভূমির সকল সমাজের [illegible] একত্রিত করে, সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীড়ের দ্বারাই পরিপূর্ণ [illegible] প্রথম স্থাপনা করেছে কংগ্রেস। ভাবের ক্ষেত্রে পৌরাণিক কবি যে ভারত কল্পনা [illegible]ছিলেন, কর্মের ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভারতের জনশক্তির প্রথম [illegible] কংগ্রেস। শেষ পর্যন্ত ভারতের কংগ্রেসই সংঘশক্তির নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, [illegible] বর্তমান সভ্যতার ক্ষেত্রেই ভারতীয় প্রতিভার এক নতুন দান বলা যায়। আফ্রিকা এবং

এশিয়া মহাদেশের প্রত্যেক পরশাসন পীড়িত জাতি ভারতের কংগ্রেসের মধ্যেই সংঘগঠনের এক নতুন ও সার্থক আদর্শের সন্ধান পেয়েছে। বিংশ শতাব্দীর জাতিমুক্তির বৃত্তান্ত লিখবেন ভবিষ্যতের যে ঐতিহাসিক, তাঁর কাছে এ সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়েই দেখা দেবে যে, পরশাসিত জাতির মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণাদাতা ও পদ্ধতিপ্রদর্শক হলো ভারতের কংগ্রেস।

কংগ্রেসের সংগ্রাম পদ্ধতিতে বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে একটি মানবীয় নীতির ও সত্যের প্রথম পরীক্ষা হয়েছে। নিরস্ত্র দেশ স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে এবং সে সংগ্রাম সফল হয়—এই আশ্বাসের ঐশ্বর্য লাভ করেছে বিশ্বের মানুষ। সংগ্রামের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ হতে পারে, প্রবলের হিংসার বিরুদ্ধে একটি জাতি অহিংস প্রথায় বিদ্রোহ করতে পারে, এই শিক্ষা ভারতের কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করেছে পৃথিবী।

চল্লিশ কোটি মানুষের দেশ নিরস্ত্র সংগ্রামে স্বাধীনতা লাভ করেছে, এ ঘটনা ভারতের রাজনৈতিক জীবনেই প্রথম সত্য হয়েছে এবং ভারতের সে রাজনৈতিক জীবনের অধিনায়ক হয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস ভারতের অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধ। অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে দিয়ে অনেক জাতি একেবারে নতুন তথা আধুনিক হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সে জাতি তার জাতীয় সংস্কৃতিকেই বর্জন করতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসের গৌরব এই যে, ভারতের সকল জ্ঞান ও মনীষা এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সকল ঐতিহ্যকে রক্ষা করে বিজ্ঞান প্রসন্ন বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান, কর্ম ও চেতনাকে ভারতীয় জীবনে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছে। রাজনৈতিক সংঘগঠনে পাশ্চাত্যের রীতি গ্রহণ করেও কংগ্রেস রাজনৈতিক সংগ্রামে পাশ্চাত্যের রীতি গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে কংগ্রেস একেবারে নির্ভুলভাবে ভারতীয় মানসের মর্যাদা রক্ষা করেছে এবং এর ফলেই কংগ্রেস যথার্থ ঐতিহাসিক শক্তি লাভ করেছে। সমন্বয়ের পথে চলা, বহুর মধ্যে ঐক্যের সূত্র সন্ধান করা, প্রভেদকে বৈচিত্র্যবাদে পরিণত করা—ভারতীয় মনীষায় আবিষ্কৃত এই সূচির নীতিগুলিকেই আশ্রয় করে কংগ্রেস তার রাজনৈতিক কর্মবাদের রূপ ও পদ্ধতি গঠন করেছে। এ সত্ত্বেও কংগ্রেস নিতান্তই অতীতের পোষাক নয়, ভারত জীবনের বহু ঐতিহ্যগত অন্যায়কেও ধ্বংস করতে কংগ্রেস কুণ্ঠিত হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে সামাজিক বৈষম্যের বিলোপসাধনের অনেক প্রয়াস অত্যন্ত রূঢ় পন্থায় অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে। সমাজবিপ্লবের যে পন্থা হত্যার বীভৎসতায় এবং মানুষের রুধিরে সিক্ত হয়েছে এবং এত বড় সংহারপর্বের পরেও দেখা গেছে যে, বৈষম্যের বিনাশ হয়নি। ভারতের কংগ্রেসও সমাজবিপ্লবের অনুষ্ঠাতা। 'অস্পৃশ্যতা' নামক ভারতীয় জীবনের এক বহু ব্যাপক এবং বহুযুগ প্রচলিত অমানবীয় সংস্কারকে উচ্ছেদের সংগ্রাম গান্ধীর নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেসই করেছে। শুধু অস্পৃশ্যতা নামে ভারতীয় জীবনের এক অতি পুরাতন বৈষম্যবাদের পাপকেই নয়, অন্যান্য প্রত্যেকটি সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে কংগ্রেস।

নারী পুরুষের সমানাধিকার, চাষী শ্রমিকের মর্যাদার অধিকার, আরণ্য আদিবাসীর নাগরিক অধিকার—এইসব সামাজিক সাম্যের নীতিগুলি বহু ভারতীয় সুধী ও মনস্বীদের চিন্তায় দেখা দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এই নীতিকে আইডিয়ার ক্ষেত্র থেকে কর্মের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সারা দেশে সক্রিয় উদ্যমের সূচনা করেছে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে জাতির সামাজিক আত্মসংস্কারের এক বৃহৎ কর্মসূচীও সর্বদা প্রতিপালিত হয়েছে। সেই কারণে কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতি তার রাজনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে এক মহান সমাজ বিপ্লবেরও অনুষ্ঠান সুসম্পূর্ণ করতে পেরেছে। ধর্মমত এবং জাতের পার্থক্য ভারতীয় ঐক্যের এক প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। ভারতের অতি প্রাচীন যুগের ঋষি থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্যন্ত, ভারতীয় সাধক সমাজের চিন্তায় কর্মে ও বাণীতে সমন্বয়ের এবং মিলনের ধর্মই প্রচারিত হয়েছে। অথচ, এই ভারতেই জাত এবং ধর্মমতের প্রভেদে ভারতীয় জীবনের শান্তি ও সৌষ্ঠব বহুকাল ধরে ক্ষুণ্ণ হয়েই এসেছে। এই প্রভেদবাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতির আত্মসংস্কারের এই আন্দোলনও ভারতব্যাপী আন্দোলন রূপে জেগে উঠেছে। ভারতীয় সাধকের সমন্বয়বাদের আদর্শকে জাতীয় জীবনে প্রথম মর্যাদা দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের এ সংগ্রাম অবশ্য আজও ক্ষান্ত হয়নি।

ভারত ইতিহাসে অবনতির এক একটি অধ্যায়ের কারণ অনুসন্ধান করলে দু'টি ভ্রান্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যে যে কালে ভারত বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগ ছিন্ন করেছে এবং যে যে কালে ভারত সামাজিক ভেদবাদে নিজেকে অসংহত করেছে, সেই সেই কালেই ভারত বৈদেশিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। এই দুটি ভ্রান্তিই ভারতীয় জীবনকে দুর্বল ও অভিশপ্ত করেছে। অথচ ভেদবিরোধী সমন্বয়ের নীতি এবং 'বিশ্বতোমুখী' ভাবনাই হলো ভারতীয় মনীষার বৈশিষ্ট্য। সাধারণ ভারতীয়ের প্রাত্যহিক প্রার্থনার জন্য বিশ্বকল্যাণ মন্ত্র রচনা করে গিয়েছেন ভারতের কোবিদ ও সাধক। বিস্ময়ের বিষয় যে, সে ভারতবাসীও এক এক সময় বিশ্বের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ক্ষুদ্র আত্মশ্লাঘা অথবা সংস্কারগত ভীরুতার মধ্যে কর্মঠ বৃত্তি অবলম্বন করেছে। ভারতের কংগ্রেস জাতির এই কর্মঠ সংস্কার ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বের সুখ দুঃখের সঙ্গে ভারতীয় মানুষের হৃদয়ের যোগ স্থাপনে সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে। ভারতীয় জাতির মর্যাদা অভ্যুত্থানের এই ব্রত আরম্ভ করেছে কংগ্রেস তার সূচনাকাল থেকেই। ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে দেখা যায় যে, তিব্বতে ব্রিটিশের সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছে। এশিয়াতে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসারের বিরুদ্ধে এই বোধ হয় এশিয়ার প্রথম প্রতিবাদ এবং সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কংগ্রেসের কণ্ঠে। বহির্বিশ্বকে ভারতীয় জাতির হৃদয়ের সঙ্গে প্রীতির সূত্রে সংযুক্ত করবার প্রয়াস চিরকালই করেছে কংগ্রেস এবং আজকের স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি কংগ্রেসের সেই ঐতিহ্যগত প্রয়াসেরই পরিণত রূপ।

ভারতের জাতীয় সত্তার সঙ্গে কিভাবে কংগ্রেস নিজেকে একেবারে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল, তার প্রমাণ কংগ্রেসেরই এক একটি সংগ্রামের মধ্যে দেখা গিয়েছে। কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতের গ্রামে ও সহরে, বন্দরে ও গঞ্জে, মরুজনপদে এবং উপত্যকায় সহস্র সহস্র মানুষ সাড়া দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অকুণ্ঠভাবে কারাগার, শাস্তি ও মৃত্যুবরণ করেছে। কংগ্রেসের এইসব সৈনিক কিন্তু প্রতিষ্ঠানের শিবিরে পালিত সৈনিক নয়। এরা তালিকাভুক্ত সদস্য নয়, তবু এরা কংগ্রেসের কথায় প্রাণ দিয়েছে। জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তারের এমন শক্তি পৃথিবীর কোন রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে দেখা যায় না। এর

কারণ এই যে, গান্ধী নেতৃত্বে চালিত কংগ্রেস ভারতের সাধারণ মানুষকে এমন একটা ধর্মের দীক্ষা দান করেছিল যা অতীতের ভারতে বা ভারতের বাইরে অন্য কোথাও হতে দেখা যায়নি। সে ধর্ম হলো নির্ভয়ের ধর্ম। ভারতীয় জনতার জীবনের বস্তুতঃ ভয়-ভাঙার উৎসব এনেছিল কংগ্রেস। ভারতের নিরস্ত্র মানুষ যেভাবে প্রভুশক্তির অস্ত্রকে তুচ্ছ করেছে, সে ঘটনা সভ্যতারই ইতিহাসে অভিনব। ভারতের নারী এবং শিশু রাইফেল ও মেশিনগানের সম্মুখে অকুণ্ঠভাবে বুক পেতে দিয়েছে। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিলেও, গরু-বাছুর নীলাম করে দিলেও ভারতীয় পল্লীর দীনতম চাষী বৈদেশিক সরকারের আজ্ঞা পালনে সম্মত হয়নি। এই নির্ভয়ের জাগরণে ভারতীয় জাতির সত্তাই নতুন হয়ে গেছে। ভারতের সাধারণ মানুষের চেতনার এই বিপ্লব ঘটিয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের ইতিহাসও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইতিহাস। জাতির চেতনাকে এক একটি নতুন স্তরে উন্নীত করেছে কংগ্রেস এবং পরিবর্তিত জাতীয় চেতনার উপযোগী হয়ে কংগ্রেস নিজেই আবার পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের এক অংশের প্রতিনিধিত্বে শোভিত প্রথম কংগ্রেস আর আজকের কংগ্রেসে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যারিস্টারদের কংগ্রেস, বাবু কংগ্রেস এবং আবেদন-নিবেদনের সেই কংগ্রেসই ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্বে গঠিত এক জনশক্তি পীঠে পরিণত হয়েছে।

কংগ্রেসের ছেষট্টি বৎসরের জীবন স্বচ্ছন্দযাত্রার জীবন নয়। প্রতি পদক্ষেপে বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কংগ্রেসকে। শুধু বৈদেশিক শক্তির বৈরিতা নয়, কংগ্রেসকে তার দেশবাসীর একাংশের কাছ থেকেও বাধা পেতে হয়েছে।

বাস্তব সত্য এই যে, দেশ ও সমাজের একাংশের এই বৈরিতাই কংগ্রেসকে যতটা বিব্রত করেছে, বৈদেশিক শক্তির আঘাত ততটা করতে পারেনি। কংগ্রেসের ছেষট্টি বৎসরের ইতিহাসে এমন কোন দিন যায়নি, যখন দেশের কোন না কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সমাজ কংগ্রেসকে বিড়ম্বিত করেনি। কালক্রমে দেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমাজের কংগ্রেস বিরোধী সংকল্প ও নানাপ্রকার ছোট বড় সংঘবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে।

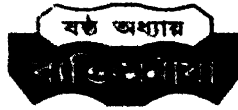
কংগ্রেসের ব্যাপ্তি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বিরোধিতাও ব্যাপ্তি লাভ করেছে, বস্তুর আকার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার ছায়াও যেমন বৃদ্ধি লাভ করে, কিন্তু ভারতের অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেস বিচলিত হয়নি। ছায়া ছায়াই আছে এবং কায়া কায়াই আছে। জাতির প্রয়োজনে কংগ্রেস নতুন হয়ে যেতে পারে, বহুবার নতুন হয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাধা, নিজের দেশের লোকের বাধাও কংগ্রেসের যাত্রাপথের চিরকালের সাথী। বর্তমানের নানারকম কংগ্রেস বিরোধী সংঘবদ্ধতা কিছু একটা অভিনব ব্যাপার নয়। দেশের অভ্যন্তরে এক অংশের এই বাধার ইতিহাসও কংগ্রেসের পক্ষে শক্তি লাভের ইতিহাস, দুর্বলতা লাভের ইতিহাস নয়। আজ পর্যন্ত কোন বিরুদ্ধ শক্তির আঘাতে কংগ্রেস দুর্বল হয়নি বরং সেই আঘাতে বারবার আরও বলিষ্ঠ হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছে কংগ্রেস। মহাত্মা গান্ধী তাঁর লিখিত শেষ প্রবন্ধে এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, বর্তমানে কংগ্রেস বিরোধীদের প্রতিযোগিতা কংগ্রেসের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ।

কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয়, তখন মনে হয় এ সংঘের প্রকৃতিতে যেন গঙ্গাপ্রবাহের শক্তি রয়েছে। কংগ্রেস যখন বাধা সহ্য করে, তখন মনে হয় এ সংঘের কায়া যেন হিমাদ্রিসদৃশ

দৃঢ়তার দ্বারা গঠিত। সাম্প্রতিক সাধারণ নির্বাচনে আর একবার নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে যে, কংগ্রেসকে প্রপাগ্যাণ্ডার আঘাতে দীর্ণ করা যায় না, কারণ কংগ্রেস কোন ধনীর সৃষ্টি নয়। কংগ্রেস জাতির নিজের সৃষ্টি। সাধারণ নির্বাচনে ভারতের কয়েক কোটি গরিবের ভোট কংগ্রেসকেই বিজয়ী করেছে। কংগ্রেসের জয়লাভ কংগ্রেসের পক্ষে যতটা গৌরবের বিষয়, তার চেয়ে বেশি গৌরবের বিষয় হলো জাতির পক্ষে। কংগ্রেসের জয় জাতির সুবিচারের ফল। ভারতের জাতীয় জীবনের এক পরিণামপ্রবণ মুহূর্তে, বহু সঙ্কটে অভিভূত এক অবস্থার মধ্যে জনসাধারণ যে সংঘের হাতে দেশের শাসন ভার অর্পণ করেছে, তাতে বোঝা গেল যে জাতি তার নিজের ইতিহাসকেই বিশ্বাস করে। সে ইতিহাসের পথের ধূলি ভারতের কংগ্রেসেরই শত কর্মের পুণ্যে শুচিতা লাভ করেছে। এই বিশ্বাসের সম্পদ শূন্য করে দিতে জাতি কখনো চাইবে না। কংগ্রেস ইচ্ছে করলেও আজ নিজেকে ভেঙ্গে দিতে পারে না। জাতির বিশ্বাসই কংগ্রেসকে উত্তরোত্তর বৃহত্তর কর্ম সাধনার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য করবে।

জাতীয় আশা এবং বিশ্বাসের এই অনুপ্রেরণাই কংগ্রেসকে আজ এমন এক দায়িত্বের ক্ষেত্রে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেখান থেকে সরে যাবার সাধ্য নেই কংগ্রেসের। জাতীয় স্বাধীনতার পর জাতীয় ঋদ্ধির নূতন অধ্যায় আরম্ভ হলো। ছেষট্টি বৎসরেব কর্মধারা সার্থক্ পরিণাম লাভের পব আজ আবার নতুন এক লক্ষ্যের অভিমুখী হয়েছে। সমৃদ্ধ-ভারত গঠনের লক্ষ্য। কংগ্রেসেরই শক্তির নতুন পরীক্ষার দিন সমাগত। জাতির জীবনে সহযোগিতার এক নতুন স্বরাজ্য গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। ভারতীয় জাতির সম্মুখেই এক নতুন ব্রতের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছে। মাত্র বর্তমানের প্রয়োজনের জন্য নয়, সন্তানরূপী ভবিষ্যতের মানুষের জন্য সমৃদ্ধির পরিকল্পনা। ভবিষ্যতের ভারতের মানুষ, আজকের ভারতীয়ের সন্ততি কেমন ক'রে সুখী জীবনের অধিকার ও প্রসন্নতা লাভ করবে, এই জিজ্ঞাসার প্রেরণা থেকেই পঞ্চবার্ষিকী উদ্যোগের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে কংগ্রেস। অতি দুরূহ ব্রতের অঙ্গীকার। এ ব্রতেও জাতির আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে। সারা জাতির পরিশ্রমের সমবায়ে ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির ভিত্তি রচনা করতে হবে। আজকের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলাই এ কর্মব্রতের উদ্দেশ্য নয়, ভবিষ্যতের প্রয়োজনকে সিদ্ধির পথে এগিয়ে দেবার ব্রত। তাই এই ব্রত দুরূহতর।

আজ পৌরাণিক ভগীরথের সাধনার কথা স্মরণ করতে হয়। ভগীরথের তপস্যায় মর্ত্যভূমিতে সরিদ্বরা গঙ্গা অবতরণ করেছিলেন। লোকপাবণী গঙ্গার ঋদ্ধিদায়ী পুণ্যোদকে ধরণী সুতৃপ্তা ও সরসা হয়েছিল, ভবিষ্যৎ ভারতের ঋদ্ধি আবাহন করছে যে কংগ্রেস, তার কাজও ভগীরথের তপস্যার মতই দুরূহ ও দুশ্চর।



কেন তিনি মহাত্মা

'তিনি যে বাতাস থেকে নিশ্বাস গ্রহণ করছেন, আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরাও সেই বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছি'—এই কথা বলে গেছেন বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ।

'ভবিষ্যতের পৃথিবীর মানুষ হয়তো আশ্চর্য হয়ে বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, পৃথিবীতে এমন একটি মানুষ একদিন হেঁটে বেড়িয়েছেন'—বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন আজ এই কথাই ভাবছেন।

আনন্দমেলার হাজার হাজার কিশোর পাঠক ও পাঠিকা, তোমরা কি বুঝতে পারছো এতখানি শ্রদ্ধা দিয়ে কার কথা বলেছেন আইনস্টাইন?

বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়, তিনি আমাদের মহাত্মা গান্ধী। আজ তাঁকে স্মরণ করার দিন, যিনি ভারতের মাটিতে আবির্ভূত হয়ে এক দুঃখ বেদনায় পীড়িত জাতিকে মহা অভ্যুত্থানের পথ দেখিয়েছেন, যিনি মানুষ জাতির মনে এক নতুন বিশ্বাস এনেছেন।

'মালাঙ্গ বাবা জিন্দাবাদ'

তোমরা মনে রেখ, আজ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে এবং সীমান্তের বাইরেও বীর পাঠানের দেশের শত শত উপত্যকায় এই ধ্বনি জেগে উঠেছে—মালাঙ্গ বাবা জিন্দাবাদ। হাজার হাজার পাঠানেরা গান্ধীজীকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। পাঠানেরা গান্ধীজীকে ভালবেসে এই নাম দিয়েছে—মালাঙ্গ বাবা।

'অল্ মহাত্মা গান্ধী'

দূর মিশর দেশের নরনারী আজ স্মরণ করছে আমাদের গান্ধীজীকে। অল্ মহাত্মা গান্ধী—মিশরের নাহাস পাশা গান্ধীজীকে এই নামে সম্বোধন করেন। আমাদের দেশের মত আজ মিশর দেশেও বহু পত্রিকায় তাদের পরম শ্রদ্ধেয় অল্ মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধার নিবেদন প্রকাশিত হবে।

নতুন সভ্যতার প্রবর্তক

গরীব ভারতবর্ষের এই কৃষকবেশী নেতার প্রতি পৃথিবীবাসীর এত শ্রদ্ধার কারণ কি?

তার কারণ পৃথিবীবাসী আজ বুঝতে পেরেছে ভারতের গান্ধীজী সমস্ত মানুষ জাতির জন্য এক নতুন সভ্যতার আদর্শ এনেছেন। একমাত্র যারা অত্যাচারের উপাসক এবং অত্যাচারীর ভৃত্য তারা শুধু গান্ধীজীকে বুঝতে পারে না।

সবার আগে ভারতের স্বাধীনতা

সেই কারণেই গান্ধীজী সবার আগে ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন। কারণ, তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন যে, ভারতবর্ষের মত এত বড় একটি সুসভ্য দেশ, এই ৪০ কোটি মানুষ যদি পরাধীন থাকে, তবে মানুষের সভ্যতার সব দিক দিয়েই ক্ষতি হবে। ভারতের ৪০কোটি মানুষ অমানুষ হয়ে যাবে, এবং যে বিদেশী জাতি ভারতকে শাসন করছে, তারাও অমানুষ হবে। তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে লোভ ও হিংসার বীজ ছড়াবে।

'নতুন যীশুখৃষ্টের চোখে জল'

হ্যাঁ, এই বিশ্বাসই আজ দুঃখী পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মনে সত্য হয়ে উঠেছে। শুধু এশিয়া নয়, য়ুরোপের নরনারী, যার কানে গান্ধীজীর নাম পৌঁছেছে, সেই যেন নতুন ভরসা লাভ করেছে। পৃথিবীতে শান্তি আসবে, মানুষ হিংসা ভুলে যাবে, মানুষ সুখী হবে।

রোমের ধর্মোপনিবেশ ভ্যাটিকানে একটি প্রসিদ্ধ গির্জা আছে—সিস্‌টাইন চ্যাপেল। ইটালীর বনেদী শিল্পীদের আঁকা বহু ছবি এই গির্জায় আছে। মহাত্মা গান্ধী সিস্‌টাইন চ্যাপেল দেখতে গিয়েছিলেন। নানা ছবি দেখতে দেখতে শেষে যীশুখৃষ্টের একটি অতি সুন্দর ছবির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুগ্ধ হয়ে গান্ধীজী ছবি দেখছিলেন, তাঁর চোখে জল দেখা দিল।

ইতালীয়েরা বললে—'নতুন যীশুখৃষ্টের চোখে জল।'

সংগ্রামের নতুন অস্ত্র—অহিংসা

সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে গান্ধীজী লড়ছেন।

আমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়েই তিনি লড়ছেন। তাঁর অস্ত্র অহিংসা। তিনি অত্যাচারীকে বা অন্যায়কারীকে মেরে ফেলতে চান না, আঘাত করতে চান না।

লড়াই করবার এক নতুন পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি অত্যাচারীর লাঠির কাছে মাথা পেতে দেবেন, বন্দুকের সামনে বুক পেতে দেবেন। অত্যাচারী যখন আঘাত করবে সে বুঝবে শুধু আঘাত করাই সার হলো। পরাভূত করতে পারলো না। অত্যাচারীর দাপট ও দম্ভকে অপমান করবার এর চেয়ে বড় উপায় আর নেই। এই অপমান অত্যাচারীর জেদকে শেষে একেবারে ব্যর্থ করে দেয়।

তারপর কি হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, প্রত্যেক মানুষের অন্তঃকরণ অশুদ্ধ নয়। সবারই মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, কিন্তু অবস্থার বিপাকে মানুষ নিষ্ঠুর হয়, পাপী হয়। গান্ধীজীর অহিংস লড়াইয়ের সার্থকতা এইখানে। নিষ্ঠুরের নিষ্ঠুরতাকে উপেক্ষা কর, দেখবে তার দরদী হৃদয়টি দেখা দিয়েছে।

অসহযোগ সাধনা

লড়াই করার এই আর একটি পদ্ধতি। গান্ধীজী বলেন—অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তারা উভয়েই অন্যায়ের জন্য সমান দায়ী।* সহ্য করা মানেই সহযোগ করা। অত্যাচারীর নির্দেশ ও নিয়ম মেনে আমরা চলি বলেই অত্যাচারের ব্যবস্থাটা চালু থাকে। সুতরাং এই ব্যবস্থা যদি ভাঙ্গতে হয়, তবে দুটো পথ আছে। এক অত্যাচারীকে আঘাত দিয়ে লুপ্ত করা (এটা হিংসার পথ)। দ্বিতীয়, সহযোগিতা বন্ধ করে দেওয়া (এটা অহিংসার পথ)। গান্ধীজী এই দ্বিতীয় পথের পথিক।

ক্ষুধার্তের কবিতা—খাদ্য

গান্ধীজী সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত খুবই ভালবাসেন। কিন্তু তাঁর চোখ পড়ে রয়েছে ভারতবর্ষের সাত লক্ষ গ্রামের কোটি কোটি ক্ষুধার্তের বিষণ্ণ মুখের দিকে। সবার আগে চাই খাদ্য। গান্ধীজী বলেন, ভারতবর্ষের ক্ষুধার্তের কাছে খাদ্যই আজকের দিনের কবিতা।

ভারতশিল্পের সূর্য চরকা

কিন্তু এই কোটি কোটি নিরন্ন গ্রামবাসীর মুখে এক মুঠো ভাত ও এক টুকরো রুটি যোগাড়

* রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার লাইন স্মর্তব্য।

করবার উপায় কি? বিদেশী গভর্ণমেন্ট ভাতের যোগাড় করে দেবে না, দেশের বড়লোক দেবে না। তবে কি করে হবে?

ভারতের ইতিহাসের হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টি দিয়ে গান্ধীজী এক উদ্ধারের মন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, চরকা।

এক চরকার উন্নতি হলে, গ্রামের আরও নয়টি শিল্পের উন্নতি হয়। গ্রামের সব শিল্প চরকার ভালমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। চরকার মধ্যে ভারতের কোটি কোটি কুটীরের সুখ ও হাসির গুঞ্জন। তাই গান্ধীজী বলেন,—চরকা হলো শিল্পের সূর্য, তার চারদিকে গ্রামের অন্য সব শিল্প গ্রহের মত ছড়িয়ে রয়েছে।

সবচেয়ে সুন্দর খেলনা—তক্‌লি

তক্‌লিতে সুতো কাটা যায়। 'আনন্দমেলা'র হাজার হাজার কিশোর বন্ধুরা, তোমরাই বল, এই তকলি কি লাট্টুর চেয়ে খারাপ খেলনা? মোটেই নয়। তক্‌লি তোমাদের খেল্‌না। আবার এই তক্‌লিই তো একটা আর্ট। তোমার শিল্পীর মত সুন্দর আঙুলে তক্‌লি নাচছে, সাদা সুতো তৈরী হচ্ছে। তুমি খেলার সঙ্গে সঙ্গে একটি শিল্প সৃষ্টি করছো। সেই সঙ্গে একবার ভাব, তুমি তোমার মনুষ্যত্বের জন্য একটি সবচেয়ে শুভ্র সাজ তৈরী করছো— তোমাব খদ্দর। এত অল্প বয়সে এর চেয়ে বড় সম্মানের কীর্তি তুমি আর কি করতে পার?

'মৌমাছির মত পরিশ্রম'

কাজ করতে হবে, নিজের অন্ন ও বস্ত্রের জন্য। কিন্তু কি রকম কাজ? কারখানার কুলিরা যে ভাবে খাটে সেই ভাবে? অফিসে কেরাণীরা যেভাবে কাজ করে সেভাবে?

না, জীবনের কাজ কখনই এত রুক্ষ আনন্দহীন খাটুনি নয়। গান্ধীজী তাই কাজের একটা আদর্শ এনেছেন। পরিশ্রমের এই নতুন বিজ্ঞান গান্ধীজীর একটি দান।

তিনি বলেন, মানুষের সকল পরিশ্রম হবে শিল্পীর মত। হেসে হেসে গান গেয়ে, আনন্দের সঙ্গে। কাজে ক্লান্তি আসা উচিত নয়। নিশ্চয় আমরা ভুল ভেবে কাজ করি, তাই কাজের পরে আমোদ চাই। গান্ধীজী বলেন—কাজ ও আমোদ একই সঙ্গে মিশে থাকবে। দেখছো না মৌমাছির ব্যস্ততা? সারাদিন কত পরিশ্রম, কিন্তু ক্লান্তি নেই। সারাদিন গুঞ্জন।

'নির্দোষ মধু'

শিল্প পণ্য যা কিছুই তৈরী কর, কিন্তু সাবধান যেন কারও ক্ষতি করে নয়। মজুরকে বঞ্চিত করে কৃষককে ঠকিয়ে পৃথিবীর লোভীরা নানা পণ্য তৈরী করছে। একটা জিনিষ করতে গিয়ে আর একটা জিনিষের ক্ষতি করে। আমাদের দেশে একটা চালের কল দশজনকে কাজ দেয়, কিন্তু আবার গ্রামের একশো জন ধান-ভানা চাষী মেয়েকে কর্মহীন করে। এ ভাবে পণ্য তৈরী করা উচিত নয়। গান্ধীজী বলেন, পণ্য হবে 'নির্দোষ মধু'র মত। ফুলের কোন ক্ষতি না করেও মৌমাছি যদি মধুর মত এত সুস্বাদু সৃষ্টি সম্ভব করতে পারে তবে মানুষই বা পারবে না কেন?

'মায়াময় কবিতা—গোজাতি'

গরু আমাদের কাছে পশু মাত্র। কিন্তু গান্ধীজী বলেন গরু হলো একটি মায়াময় কবিতা।

কারণ, গরুর উন্নতি মানে ভারতের ঘরে ঘরে সুখ স্বাস্থ্যের উন্নতি, ভারতের মাটির

উর্বরতার উন্নতি। গরুর যত্ন নিলে বছরে দেড় হাজার কোটি টাকা আয় হতে পারে। এই পয়স্বিনী স্নেহাতুর জীবটির দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মানুষের স্বাস্থ্য জীর্ণ হয়ে গেছে।

প্রকৃতির স্কুল—বনিয়াদী শিক্ষা

গান্ধীজী সংগ্রামের নতুন পথ দেখিয়েছেন, সংগঠন করবার নতুন পথ দেখিয়েছেন। আর একটি নতুন পথ তিনি দেখিয়েছেন—শিক্ষার ব্যাপারে।

ভারতবর্ষে আমরা এখন যেভাবে লেখাপড়া শিখছি এবং যা শিখছি, সেটা একটা মারাত্মক ভুল শিখবার ব্যবস্থা। কোটি কোটি গরীব ভারতবাসীকে নিজেকেই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তারও পথ দেখিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী। এরই নাম বনিয়াদী শিক্ষা। চরকা, তাঁত, কৃষি, ফুলের বাগান বা ছুতোর কামার কুমোরের কাজ—তারই সঙ্গে শিক্ষকের উপদেশ নিয়ে অঙ্ক ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞান সবই শিখবে। টেক্সট বই বা পাঠ্য পুস্তকের বদলে গান্ধীজী সেইখানে একটি কারুশিল্পকে এনেছেন। গাছপালা পশুপাখী আকাশ মাঠ নদী বনের গায়ে সব জ্ঞানের পাঠ লেখা রয়েছে। তারই সঙ্গে মন মিশিয়ে, চোখ দিয়ে দেখে সব শিখতে হবে।

এই সঙ্গে বনিয়াদী শিক্ষার ছাত্র বা ছাত্রী জীবিকা অর্জন করার মত একটা শিক্ষা লাভ থাকবে।

তাই এই শিক্ষাকে স্বাবলম্বী শিক্ষা বলা হয়ে থাকে।

হরিজন সেবা

সংগ্রাম সংগঠন শিক্ষা—তারপর সেবা।

মানুষের জীবনের নীতিকে পূর্ণ করে তুললেন গান্ধীজী। কিন্তু কার সেবা করবো?

মহাত্মা গান্ধী দেখিয়ে দিলেন—ঐ কয়েক কোটি হরিজন। যারা ভারতেরই ভূমিজ সন্তান। অথচ তাদের অন্ত্যজ করে রাখা হয়েছে। ভুল জাতের সংস্কারে তাদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছে।

মন্দিরের দেবতার কাছে তাদের যেতে দেওয়া হয় না, তার ছায়া অশুচি, তার স্পর্শে কূপের জলও নাকি অপবিত্র হয়ে যায়। ভারতের সমাজ থেকে এই গ্লানিকে গান্ধীজী মুছে ফেলবার আয়োজন করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, সেবা কর, সেবা কর এই কোটি কোটি দুঃখী পতিত হরিজনকে। যাদের একদিন না ছুঁয়ে পাপ করে ছিলে, আজ তাদের সেবা করে ধন্য হও।

শবরীর প্রতীক্ষা—আদিবাসীর দাবী

শুধু হরিজন নয়, ভারতের আরণ্য অঞ্চলে তিন কোটী আদিম ভারতের সন্তান রয়েছে। ঘৃণা করে তাদের জংলী বললে চলবে না। তারা ভারতেই মানুষ, তোমার আমার সুহৃদ। হাজার বছর ধরে তারা শবরীর মত যেন প্রতীক্ষায় রয়েছে, কবে জাগ্রত ভারতের হৃদয় উদার হয়ে তাদের কাছে পৌঁছবে। আজ সেই আশা সফল হয়েছে। গান্ধীজী আদিবাসীর কাছেও সেবার অর্ঘ্য নিয়ে পৌঁছে গেছেন।

গোর্কির 'মা' ও হাবুর মা

গান্ধীজী তাঁর সব সাহিত্য মানুষের চেহারার মধ্যেই দেখতে পান। বাঙ্গলা দেশের এক পল্লীগ্রামে হাবুর মা নামক এক মহিলাকে তিনি দেখেছিলেন। ঐ মহিলা কংগ্রেসকর্মী

ছেলেদের খুব যত্নের সঙ্গে রান্নাবান্না করে খাওয়াতেন। এই ছিল তার কাজ। হাবুর মা যখন মারা যান, তখন গান্ধীজী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকা'য় শোক প্রকাশ করে লিখেছিলেন—ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা' কে, আমি বাঙলা দেশের পাড়াগাঁয়ে দেখেছিলাম। গোর্কির বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'মা'। এইরকম সাহিত্যিক হলেন আমাদের গান্ধীজী। আগে তিনি মনুষ্যত্বকে চিনে নিয়েছেন, তাই সব সাহিত্য ও শিল্পকে তিনি সবার চাইতে ভাল করে বুঝতে পারেন।

গান্ধীজী আমাদের সত্যাগ্রহী জেনারেল। ভারতের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে, গান্ধীজী লড়াই করে স্বরাজ আনবেন। এই স্বরাজ শুধু খাওয়া পরার সুখ নয়। 'স্বরাজ' একটি নতুন জীবন এবং নতুন সভ্যতা। পৃথিবীতে অনেক স্বাধীন দেশ আছে, কিন্তু সেখানে স্বরাজ নেই। 'স্বরাজ' কথাটির মধ্যে ভারতবর্ষের আদর্শ প্রতিভা ও পরিকল্পনা মন্ত্রের রূপ গ্রহণ করেছে।

পোরবন্দর থেকে রাজঘাট

'মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে'—সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রয়াস ক'রে থাকেন। 'যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ'—আবার এরূপ যত্নবান সিদ্ধগণের বহু সহস্রের মধ্যে কেহ বা আমাকে পরমাত্মস্বরূপে উপলব্ধি কবতে পারেন। গীতার এই বাণী যাঁর জীবনে সফলতা লাভ করেছিল, দুইটি বছর আগে ৩০শে জানুযারী তা্িখে রাজধানী দিল্লীর এক প্রার্থনা ভূমিতে ভারতের সেই মহাত্মার প্রাণ ঘাতকের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল চিরকালের মত। পৃথিবী হারালো তার সভ্যতার দীক্ষাদাতাকে, বিংশ শতাব্দী হারালো তার মহামানবকে, মর্ত্ত্যলোক হাবালো এক অমৃতের সন্ধানীকে, ভারত হারালো তার জাতির পিতাকে। বর্ত্তমান যুগের সহস্র সহস্রের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন একক শুদ্ধসাধক পরন্তপ। বহু মিথ্যায় আক্রান্ত বর্তমান শতাব্দীর মধ্যে যে মানুষটির জীবন সত্যের পরীক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্য পবিত্র যজ্ঞের মত জাগ্রত ছিল. তিরোহিত হল সেই মানুষ। শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে রাম নাম ধ্বনিত ক'রে তিনি চলে গেলেন। মানুষের ইতিহাসে অভূতপূর্ব আত্মবলির ঘটনা উপহার দিয়ে সর্বমানবের আত্মীয় সেই মহান প্রাণ পার্থিবজনের গোচরের বাইরে চলে গেলেন।

পোরবন্দর হতে যমুনার রাজঘাট, এক তীর্থ পথিকের পথ পরিক্রমার ইতিহাস সমাপ্ত হয়ে গেছে। পথিক আর নেই, তাঁর পথ চলার সকল পুণ্য পৃথিবাসীকে উপহার দিয়ে সত্যাগ্রহীর আত্মা রামময় অনুভবের মধ্যে লীন হয়ে গেছেন। আত্মজয় কা'কে বলে, মানুষেব ইতিহাস বহুদিন তার 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধ' রূপ প্রত্যক্ষ করেনি। ধ্যানীর মূর্ত্তি, কর্মযোগীর রূপ, ঈশ্বরনির্ভর জীবনের প্রসন্নতা ও হিংসাহীন জীবনেব শক্তি, পৃথিবীর সভ্যতা হতে এইসব মহিমার দৃশ্য বিরল হতে বিরলতর হয়ে আসছিল। ভাবতের মহাত্মা মর্ত্ত্যবাসীকে নতুন করে যেন তার আত্মপরিচয়ের সত্যস্বরূপটুকু প্রত্যক্ষ করিয়ে আর স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন।

'সম্ভবামি যুগে যুগে,' আমি যুগে যুগে আসি, এই কথাটি যে দার্শনিক সংস্কার মাত্র নয়, মহাত্মা গান্ধীর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবে তাই প্রমাণিত হয়েছে। কল্পনাবাদীর অলীক বিশ্বাসের ফল বা অবতারবাদের কথা নয়, সমাজবিজ্ঞানের নিয়মরূপেই দেখা গেছে যে যুগের প্রয়োজনে শক্তিধর ও যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়ে থাকেন। বলতে পারা যায়,

উদ্ভূত হয়ে থাকেন। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী তার আত্মপ্রকাশের সৃষ্টিকর বেদনা থেকেই গান্ধী-ব্যক্তিত্বকে সৃষ্টি করেছে। সমাজবিজ্ঞানের এই সত্য দর্শন ক'রেই মানুষজাতির কল্পনা এই বিশ্বাস লাভ করেছে যে, ধরণীর বেদনা পুঞ্জীভূত হলে ইতিহাসের বিধাতা দূত প্রেরণ করে থাকেন। প্রেমময় খৃষ্টের সত্তা সমাধিভূমি থেকে আবার অভ্যুত্থিত হবে, এই কল্পনা মানুষের বিশ্বাসকে তাই লালিত করেছে। তাই দেখতে পেয়েছিল মরুচারী পথিক, জেরুসালেমের সান্ধ্য আকাশে এক নতুন তারকা আবির্ভূত হয়েছে। ঘোর দুর্যোগে, ঝঞ্ঝার আঘাতে যখন নিশীথ রাত্রি পীড়িত হয়ে উঠেছে, তখনি দুঃখলাভ করেছে মানুষের দেবত্ব তার কংসনিসূদন প্রতিশ্রুতি নিয়ে। পুরাণকার বলেছেন, দানবের অহমিকা স্ফীত হয়ে উঠলে পীড়িতের পরিত্রাণের জন্য এই পৃথিবীতেই মানুষের ঘরে দেবতা ভূমিষ্ঠ হন। সমাজবিজ্ঞান বলে, মানুষের মধ্যেই প্রতিরোধের শক্তি জাগ্রত হয়। কলুষের ভার দুর্বিসহ হ'লে কলি-সংহার শিব আবির্ভূত হন সংসারে।

যুগে যুগে মানুষের ইতিহাসে এই ভাবেই 'চিরকালের রাম' আসা-যাওয়া করছেন।

মানুষের আত্মার এই অভ্যুত্থানের ইতিহাসই তো মানুষের ইতিহাস। 'নূতনের জন্ম লাগি' মানুষের চেতনা নিজে থেকেই নিজেকে প্রস্তুত করেছে।

এই নিয়ম অনুসারেই বিংশ শতাব্দীর চিত্ত শুদ্ধ করার জন্য ভারতভূমিতে গান্ধীজীর আবির্ভাব। কী ঐশ্বর্য্য দান ক'রে তিনি যুগের দীনতা ঘুচিয়ে গেছেন! আজ যিনি নিজেকে মনে-প্রাণে গান্ধী বিরোধী বলে মনে করেন, তিনি নিজেও উপলব্ধি করতে পারেন না, তাঁরও চিত্তের গভীরে গান্ধীর বাণী তাঁর অগোচরে যে দিব্য স্পর্শ দিয়ে গেছে! গান্ধীজীর এই পরম স্পর্শের প্রভাব বর্তমান শতাব্দীর মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চলতেই থাক্‌বে। মানুষের সভ্যতার এক বৃহৎ পরিবর্ত্তনের সূচনা তিনি ক'রে দিয়ে গেছেন। ইতিহাসের এক মহৎ পরিণতির সূত্রটি তিনি ধরিয়ে দিয়ে গেছেন।

মহাত্মা গান্ধীকে এবং তার আদর্শকে বর্তমানের সমাজ সমগ্রভাবে বুঝতে পেরেছে, একথা বলা চলে না। মহাগগনের মত যাঁর ব্যক্তিত্ব প্রসারিত যাঁর জীবননীতি ও লক্ষ্য অতি বৃহৎ, তার পরিমাপ স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু যা সত্য তাই দুরূহ, যা শ্রেয় তার পথেই সব চেয়ে বেশী বিঘ্ন। মানুষকে তিনি সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন। সহজ পথের সন্ধান নয়।

আজ ভারতে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় পরিচালনার ব্যাপারে যে অধিকার লাভ করলো, ভারতের ইতিহাস তাই এক অভিনব ঘটনা। 'সমষ্টি'র অধিকার এতদিনে ভারতে মর্যাদা লাভ করলো। গণতন্ত্রের এই নীতি মানুষেরই প্রতিভার এক বিরাট অধিকার। গণতন্ত্রের এক একটি নীতির উদ্ভব ও ক্রম-বিকাশের মধ্যে আমরা একটি সামাজিক সত্যের ক্রমোপলব্ধির ইতিহাস দেখতে পাই। 'যে কোন ভাল পরশাসনের চেয়ে যে কোন খারাপ আত্মশাসন ভাল' ইংরাজ সমাজবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যাত এই গণতান্ত্রিক নীতি পৃথিবীতে মর্যাদা লাভ করেছে। এই নীতি অনুসারে যে কোন ভাল বৈদেশিক শাসনের চেয়ে স্বাধীনভাবে চালিত খারাপ শাসনও ভাল। গণতন্ত্রবাদের দ্বিতীয় আবিষ্কার হলো—'সর্বাধিক সংখ্যকের কল্যাণের জন্য সর্বাধিক কল্যাণ' (Greatest good of the greatest number) এই তত্ত্বও পৃথিবীর সভ্যতায় মর্যাদা লাভ করেছে। গণতান্ত্রিক তত্ত্বের এই স্বাভাবিক এবং উত্তরোত্তর ক্রমবিকাশের পরবর্তী অধ্যায়ে দেখতে পাই যে নীতি আরও স্পষ্টতা লাভ করেছে—'সাধারণের জন্য সাধারণের দ্বারা শাসন'

(Government for the people by the people). ভারতের প্রজাতন্ত্রে এই শেষোক্ত নীতিকে সার্থক প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। শুধু সাধারণের কল্যাণের উপাসনা করে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে চলে না, এই শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্বও হবে জনসাধারণের। 'জনসাধারণের দ্বারা' চালিত শাসনব্যবস্থা।

পশ্চিমের আবিষ্কৃত গণতন্ত্রের নীতি এইখানেই শেষ হয়েছে। কিন্তু এই কি গণতন্ত্রের চরম? সমষ্টির কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে সমষ্টির ক্ষমতায় চালিত হলেই কি ব্যবস্থাটা কল্যাণপ্রসূ হবেই হবে? ঐ কয়টি নীতির মধ্যেই কি গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে বলা যায়!

বলা যায় না, এবং ভারতের প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রের বিধান রচয়িতাগণ তা বলেন নি। ভারতের রাষ্ট্রনায়কগণ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ-নেহরু-প্যাটেল কেউ তা বলেননি। যে সমষ্টি বা সাধারণের হাতে এই কল্যাণ রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রের জীবন চালিত হবে, সেই সমষ্টিকে শুদ্ধ ও উন্নত হতে হবে। ব্যবস্থার-সার্থকতা নির্ভর করছে ব্যবস্থা-বিচারীর চরিত্রের ওপর। ডাঃ আম্বেদকর যা বলেছেন তার মর্মার্থ হলো 'সমষ্টির দ্বারা চালিত সমষ্টির কল্যাণের জন্য উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা অকল্যাণকর হতে পারে, যদি সমষ্টির মন ও চরিত্র কল্যাণপন্থী না হয়।'

সুতরাং প্রশ্ন উঠবে, গণতন্ত্রের প্রকৃত দায়িত্ব কোথায় এবং কিসের উপর নির্ভর করে? সমষ্টির কল্যাণ সাধনার সম্ভাবনাটি সুনিশ্চিত করবার পন্থা কি? এই পন্থায় ধর্মই আবিষ্কার করে ভারতের গান্ধী সমাজবিজ্ঞানের একটি মৌলিক সত্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। শুদ্ধ পন্থা ('Means') ছাড়া শুদ্ধ লক্ষ্যে ('Ends') পৌঁছতে পারা যায় না। সমষ্টি বা গণসাধারণ সকলের আগে শুদ্ধ পন্থার উপাসক ও আচরক হবে, তবেই তার পক্ষে শুদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছবার সম্ভাবনা সুনিশ্চিত হতে পারে। 'ব্যক্তি-মানবকে' উন্নত হতে হবে ব্যক্তিগত চরিত্রের উন্নতির দ্বারা। সমষ্টিগত চরিত্র নামে স্বতন্ত্রভাবে কোন চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না। প্রতি ব্যক্তির চরিত্র নিয়েই সমষ্টির চরিত্র। সকল কল্যাণের মূলে রয়েছে ব্যক্তি-মানবের কল্যাণমুখীন রুচি ধর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ।

এরপরও প্রশ্ন উঠবে ব্যক্তি-মানব নিজেকে কল্যাণমুখীন করবে কি উপায়ে? এর একটি মাত্র বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নির্দেশ করে গেছেন গান্ধীজী—সৎপন্থা। পন্থার সততা থাকলে আর কোন বাধা নেই। কর্মফলে কারও অধিকার নেই। কর্মপথে সবারই অধিকার আছে। 'সৎ পন্থা'ই একটি আদর্শ, একটি সার্থক ধর্ম। এবং মাত্র এই সৎ-পথে প্রয়াস করেই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পন্থায় সততা ও শ্রেষ্ঠত্ব—মানবতন্ত্রের এই নীতি যতদিন না সমাজব্যবস্থায় বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃত হবে ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত গণতন্ত্র অপূর্ণ হয়েই থাকবে।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের মূল কথাই হলো—প্রয়াস। একমাত্র প্রয়াসেই মানুষের অধিকার আছে। এবং প্রয়াসটা সৎ-পথে-চালিত করাই মানুষের সত্যধর্ম। সফলতা, আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য লাভ এসব বিষয়ে মানুষ ইচ্ছা মাত্র করতে পারে। কিন্তু কখনই জোর করে বলতে পারে না বা বিশ্বাস করতে পারে না যে সে লক্ষ্যে পৌঁছবেই। মহাত্মা গান্ধীও বলেছেন যে, তাঁর আকাঙ্ক্ষিত 'রামরাজ্য' বাস্তবে কখনই সম্ভব নয়। 'রামরাজ্য' মানবীয় কল্যাণের এক আদর্শ রূপ। তা লাভ করা যাবে না কোনদিন। কিন্তু তা লাভ করার জন্য চির প্রয়াসই হলো মানুষের কার্য্য। এই প্রয়াসের দ্বারাই মানুষ নিজেকে শুদ্ধ হতে শুদ্ধতর করে। কল্যাণ হতে অধিকতর কল্যাণের দিকে টেনে নিয়ে চলবে। আদর্শ হবে নিখুঁত এবং পন্থা হবে সৎ—

সেই সঙ্গে শুধু 'প্রয়াসই' হবে একমাত্র ধর্ম। আদর্শ যদি কোন দিনই সফল না হয় তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ সৎ প্রয়াসই মানুষের একটি সুন্দর কল্যাণের রূপ।

আজ মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণ দিবসে সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রজাতন্ত্র ভারতভূমির নূতন জীবনের বাতাসে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে সাধারণতন্ত্রের এই পরম নীতিকেই আমরা স্মরণ করবো। মহত্তের প্রতি নিরন্তর প্রয়াসই জীবনের শ্রেষ্ঠ নীতি। সে নীতি প্রতিষ্ঠা লাভ করুক ভারতের কোটি কোটি মানবচিত্তের গভীরে নিহিত অলিখিত শাসনতন্ত্রে। ব্যক্তিগত সমাজগত ও জাতিগত চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন হয়েছে। সর্বোদয়ের আলোকে সকল তমিস্রা দূরীভূত হোক। ৩০শে জানুয়ারীর জাতীয় শোক কোটি কোটি চিত্তের প্রার্থনা রূপে উদ্‌গীত হোক—

হিত্বায়বদ্য পুনরস্তমেহি
সংগচ্ছস্ব তন্বাসুবর্চাঃ

যাহা কিছু মলিন তাহা ত্যাগ করে তিনি শোভনদীপ্ত পুণ্যতনু নিয়ে স্বর্গলোকে আশ্রিত হয়েছেন। তাই

হ্বয়ামি তে মনসা মন
ইহেমান গৃহান্ উপযুযুদান এহি

'আজ আমাদের মনের দ্বারা তাঁহার মনকে আহ্বান করি। আমাদের গৃহজীবনের সঙ্গে তুমি প্রীতিরূপে যুক্ত হও।'

সাধারণ মানুষ 'আত্মিক' মানুষ রূপে পরিণাম লাভ করবে, এই হলো ইতিহাসের সর্বকালের দাবী। ভারতের গান্ধী মানুষের সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পরিণামের উপরে সেই আত্মিক পরিণামের ভূমিকাটি রচনা করে দিয়ে গিয়েছেন। জীবন ও মরণে তিনি এই তপস্যারই পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন। মর্ত্যভূমির সুখ-দুঃখের ইতিহাসে সেই অপরাহত সত্যমের সর্বোদয় বাণী নিত্য প্রেরণা সঞ্চার করবে। তাঁর অস্থিভস্ম কোটি কোটি পুণ্যের পরমাণুর মত সলিল ধারার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে গিয়েছে। বিশ্বের সভ্যতায় কবে সর্বোদয়ের বাণী পরিব্যাপ্তি লাভ করবে তা আমরা জানি না। হয়তো সেই বাণীর বীজ অংকুরিত হতে শত বৎসর লাগবে, পল্লবিত হ'তে লাগবে আরও শত বৎসর। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ভারতের মহাত্মার জীবন-মরণের সদাচারে বিশ্বের সভ্যতা উর্দ্ধমুখীন গতি লাভ করলো, তাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় আশার কথা।

একমুঠো লবণ

গুজরাটের সমুদ্রতটের একটি ক্ষুদ্র ও অখ্যাত গ্রামের প্রান্তস্থানে, যেখানে আরব সাগরের লোনা জলের ঢেউ নিজেরই আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে মাটির উপর লবণের প্রলেপ ছড়িয়ে দেয়, সেখানে দাঁড়িয়ে শীর্ণকায় একটি মানুষ একদিন একমুঠো লবণাক্ত মাটি হাতে তুলে নিলেন, আর সারা ভারতে সংগ্রামের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে গেল। বিস্মিত বৃটিশ রাজনীতিক ব্রেলসফোর্ড, বিস্মিত মার্কিন সাংবাদিক মিলার লিখলেন, এ এক অভিনব সংগ্রাম। এ এক অভিনব সাংগ্রামিক নেতৃত্ব। জাদুকরের হাতের জাদুকাঠি ক্ষণকালের সঙ্কেতে অনেক বিচিত্র বিস্ময়ের চমক ঘটিয়ে দিতে পারে বটে, এবং সেটা ছলনারই চমৎকার খেলা। কিন্তু সেদিনের ভারতীয় জীবনের ঘটনাকীর্ণ দৃশ্যটা ছিল কঠোর বাস্তবতায় আকীর্ণ একটি ঐতিহাসিক সত্যের দৃশ্য। ডাণ্ডি-অভিযান বলে আখ্যাত সেই অভিযান ছিল একটি শান্ত

ও অনাড়ম্বর ঘটনা, কিন্তু কী বিশাল এক পরিণামের আবেগ তারই মধ্যে নিহিত ছিল।

এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের ঘটনার সঙ্গে যে নিরীহ একটি বস্তুর নাম সংশ্লিষ্ট ছিল, সে বস্তুটির নাম, লবণ। গান্ধীজী চেয়েছেন, কংগ্রেস চেয়েছে, দেশবাসীও চেয়েছে—লবণের মুক্তি। লবণের উৎপাদনে সরকারের একচেটিয়া অধিকারের অবসান। লবণের উপর আরোপিত ট্যাক্সের প্রত্যাহার। প্রচলিত লবণ আইনের বিলোপ। কিন্তু ঐতিহাসিক সমালোচক এমন ধারণা করলে ভুল করবেন যে, লবণ সেদিন আইন-অমান্যের নিতান্ত একটি উপলক্ষ্য অজুহাত অথবা প্রতীক হিসাবে স্বদেশীওয়ালা মেজাজের শাস্ত্রে ঠাঁই পেয়েছিল। গরীব ভারতের ও ভারতীয়ের অর্থনীতিক জীবনের একটি বিশেষ ক্লেশের হেতু ছিল সরকারী ট্যাক্স এবং মনোপলির উৎপীড়ক বন্ধনে আবদ্ধ এই লবণ। জল বাতাস ও সূর্যালোকের উপর যেমন ট্যাক্স হয় না, চলেও না, গান্ধীজীর মতে লবণও মানুষের পক্ষে সেইরকম সাধারণ জৈব প্রয়োজনের বস্তু, যার উপর ট্যাক্সের ও মনোপলির শাসন বস্তুত মানবিক নীতির নির্মম অনাথাচরণ। এইরকম বিচার থোরো এবং টলস্টয়ও করেছেন। প্রাচীনকালেরও মনস্বিতার অনেক উক্তিতে লবণের সম্পর্কে এইরকম নৈতিক জিজ্ঞাসার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যথিত মানুষের অশ্রুজলে লবণ আছে, সুখী ও দুঃখী সব মানুষের ধমনীর শোণিতে লবণ আছে। প্রকৃতিদত্ত জল বাতাস ও সূর্যালোক যেমন মানুষের জৈব অস্তিত্বের সম্বল, লবণও সেইরকম একটি সম্বল। তত্ত্বটিকে মানবতাবাদী মনস্বীদের একটা দার্শনিক ব্যায়াম বলে তুচ্ছ করা নিছক বুদ্ধিবাদী কোন বিবেচকের পক্ষে সহজ হলেও তাঁর পক্ষে এই তত্ত্বের যৌক্তিক সারবত্তা খণ্ডন করা সম্ভব হবে না।

আরব বেদুইনদের সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গৃহাগত অতিথিকে খাদ্য-পানীয় দিয়ে পরিতুষ্ট করা বেদুইনের নীতিধর্মসম্মত একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। গৃহস্থ তাঁর ঘরের অতিথিকে যে খাদ্য খেতে দিলেন, তার মধ্যে নুন আছে। অতিথির দেহের ভিতরে যতদিন এবং যতক্ষণ এই নুন থাকবে, ততক্ষণ সে বিশুদ্ধ অতিথি, তার প্রতি কোন অপ্রিয় আচরণ করা চলে না। বেদুইনের বিশ্বাস, খাদ্যগ্রহীতা অতিথির দেহে এই নুন তিনদিন থাকে, তারপর উবে যায়। তাই অতিথি যখন বিদায় নিয়ে চলে যায়, তখন গৃহস্থও আর একটুও কালবিলম্ব না করে বহির্গত অতিথিকে অনুসরণ করে চলতে থাকে। এইভাবে তিনদিন অনুসরণ করার পর, যখন অনুসরণকারী গৃহস্থ বেদুইন বুঝতে পারে যে, সম্মুখচারী ওই লোকটি এখন আর বিশুদ্ধ অতিথি নয়, কারণ তার দেহস্থ নুন এখন উবে গিয়েছে, সে এখন বিশুদ্ধ একজন পথচারী মাত্র, তখন অনুসরণকারী গৃহস্থ তার অভ্যস্ত দস্যুতার বৃত্তি চরিতার্থ করে। ব্যক্তিটিকে হত্যা করে তার সঙ্গের যথাসর্বস্ব আত্মস্থ করে নেয়। গল্পটি নিতান্ত একটা নিন্দামোদের সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু দস্যু বেদুইনের মনে যদি লবণ সম্পর্কে এরকমের সংস্কার থেকেও থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, এক্ষেত্রেও লবণের বিশেষ গৌরব ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, যদিও সংস্কারের প্রভাবটা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। ভারতীয় লোকপ্রবাদের কথায় নীতিটা ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যে নুন খায়, সে গুণ গায়। এক্ষেত্রে নুন কৃতজ্ঞতা নামক নৈতিক সংস্কারের স্রষ্টা বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু হায়, মানবীয় অভিজ্ঞতার অনেক দীর্ঘশ্বাসে এই নিদারুণ বাস্তব সত্যের প্রমাণ শ্বসিত হয়েছে যে, অনেকে নুন খেয়েও গুণ গায় না। বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত উক্তিটি প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারা যায়—'সে কেন আমার নিন্দা করে, আমি তো তার কোন উপকার করিনি।' শুধু দস্যু বেদুইনের

সংস্কারকে নিন্দা-ঠাট্টা করা চলে না। এই লোক প্রবাদটিকেও ঠাট্টা করা চলে। নুন-খাওয়া উপকার সব সময় এবং সব ক্ষেত্রে গুণ গাওয়া কৃতজ্ঞতায় পরিণত হয় না।

কিন্তু এই ভুল অথবা এই দোষ নুন নামক বস্তুটির দেহাশ্রিত কোন অগুণের ক্রিয়া নয়। বরং বলা চলে যে, মানবীয় অকৃতজ্ঞতাটাই নিরীহ নুনকে অপমানিত করেছে। নুন মানবীয় শোণিতের স্নেহরসিত উপাদান। নুন ছাড়া মানুষের জৈব অস্তিত্বের সুরক্ষা সম্ভব নয়। বাঘেরাও জঙ্গল ছেড়ে চলে যায়, যদি সেই জঙ্গলের কোথাও তার 'সল্ট-লিক' অর্থাৎ চেটে খাওয়ার উপযোগী নোনা-মাটি না থাকে।

ভেরিয়েব এল্যুইন তাঁর গ্রন্থে নেফার (অধুনা অরুণাচল) পার্বত্য উপজাতির ভাষায় ব্যবহৃত একটি অর্থগূঢ় কথার উল্লেখ করেছেন—'নুন আনতে যাওয়া'। অমুক ব্যক্তি আজ নুন আনতে গিয়েছে ; কথাটির অর্থ এই যে, অমুক ব্যক্তির আজ মৃত্যু হয়েছে। কথাটির মধ্যে উপজাতীয় দফলা ও মিশমির জীবনের দীর্ঘকালের এক দুঃখের ইতিবৃত্ত নিহিত রয়েছে। পার্বত্য গ্রামের আশ্রয় থেকে বের হয়ে, দীর্ঘ কঠোর ও দুর্গম পথযাত্রার ক্লেশ স্বীকার করে যারা সদিয়া কিংবা তেজপুরের বাজারে নুন কিনতে যেতো তাদের অনেকে ইহজীবনে আর গ্রামের আশ্রয়ে ফিরে আসতো না। পথক্লেশেই তাদের মৃত্যু হতো। সুতরাং মৃত্যু কথাটিরই দ্বিতীয় পরিভাষা হয়ে উঠেছে ওই কথাটি—নুন কিনতে যাওয়া। জানি না, বাংলা ভাষার 'শিঙে ফোঁকা' ও 'পটল তোলা' এইরকম কোন ভয়ানক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি কি না। মনে হয়, এই দুটি কথা নিতান্ত কৌতুকরসিত কোন কাহিনীর দান।

নুনের অস্বাভাবিক দুর্মূল্যতা আজকের দেশবাসীর জীবনে একটি উদ্বেগময় আলোচনার বিষয়। এক টাকায় এক কিলোগ্রাম নুন। উপজাতীয় দফলা ও মিশমির জীবনের অভিজ্ঞতার অনুরূপ না হোক, আজকের কলকাতার গৃহস্থের পক্ষে নুন কিনতে যাওয়া বস্তুত একটি দুঃসহ বিপত্তিময় উৎপীড়ন স্বীকার করা। সন্দেহ করতে হয়, দেশের শাসন-প্রশাসনের রীতি-নীতি এবং অর্থনৈতিক নেতৃত্বের নাতিসবল মেরুদণ্ডেরই কোথাও না কোথাও ভয়ানক এক অস্থিভঙ্গ ঘটেছে। নইলে লবণের প্রাপ্যতা ও পণ্যতার এমন দশা হবে কেন? আরও একটি সন্দেহময় প্রশ্ন এসে তর্ক তুলতে পারে : ভারতের যে লবণ একদিন জনজীবনের এক বিরাট সংগ্রাম অনুপ্রাণিত করে স্বয়ং ট্যাক্স ও সরকারী মনোপলির বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করেছিল, সেই লবণ আজ আবার কেন দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে যাবে, যদি কোন প্রতিবিপ্লবী অনাচারের প্রত্যাঘাতে সেই সংগ্রামের সুফল জীর্ণ না হয়ে গিয়ে থাকে?

নেহরু-মনীষার একটি দিক

রাজধানী নয়াদিল্লীর রাজকীয় আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস হতে নয়, ভারতের জনহৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস হতে যিনি তাঁর শক্তি ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অর্জন করেছেন, সেই জওহরলাল নেহরুই আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

রাজ্যের অধিপতি তাঁর হৃদয়বত্তার বলে প্রজাপ্রিয় হয়েছেন, ভারত ইতিহাসে এমন উদার ও সদাশয় শাসন দণ্ডধারী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের উদাহরণ অবশ্যই পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তিত্বের ও সেবকতার গুণে প্রথমে জনহৃদয় জয় করেছেন, এবং পরে তারই বলে শাসনিক ক্ষমতাদণ্ড ধারণের অধিকার লাভ করেছেন, এমন কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ ভারতের অতীত ইতিহাসে পাই না।

জনমনের যিনি প্রতিনিধি তিনিই রাজধানীর ক্ষমতাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এ ঘটনা ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সত্য হতে দেখা গেল, এবং এই অভিনব ঘটনার ঐতিহাসিক প্রতীকরূপে প্রথম যাঁকে দেখতে পাই, তিনি হলেন ভারত জীবনের বিগত ত্রিশ বৎসরাধিক কালের সেবক ও সংগ্রামী জওহরলাল।

রাজধানী নয়াদিল্লী আজ তাঁকে সহস্র কর্মকঠোর সরকারী দায়িত্বের তাড়নায় ব্যস্ত করে রেখেছে, কিন্তু প্রকৃত কর্মযোগীসুলভ সেই মনের অধিকারীও তিনি হয়েছেন, যে মন সংসার ও সমাজ কল্যাণের জন্য দায়িত্ববোধের সহস্র তাড়নাকে বস্তুতঃ জীবনের প্রেরণা বলেই গ্রহণ করতে পারে। কর্মে অনাসক্তির তত্ত্বে তাঁর মন সায় দেয় না, যদিও জীবনে 'প্রশান্তির মূল্য ও প্রয়োজন' অতি তীব্রভাবেই তিনি অনুভব করে থাকেন।

'হিমালয় আমাকে আহ্বান করে এবং এই আহ্বান চিরকাল আমাকে ব্যাকুল করেও এসেছে'—নেহরুর মুখে এই উক্তি শুনে হঠাৎ মনে হতে পারে, তাঁর নিজেরই এতদিনের প্রচারিত জীবনবাদ ও কর্মবাদের সঙ্গে হিমালয়ের এই আহ্বানে যেন সুরসম্মত মিল নেই। কিন্তু এই উক্তির সহজ অর্থটি সহজভাবেই গ্রহণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হিমালয়ের এই আহ্বানের কথা শুনিয়ে নেহরু তাঁর জীবনবাদ সম্বন্ধেই তাঁর ধারণার একটি পূর্ণতর পরিণামের বাণী ঘোষণা করছেন। কর্মব্রতের ক্ষেত্র হতে জীবনকে সরিয়ে নিয়ে তিনি হিমালয়ের নিভৃতে আশ্রয় নিতে নিশ্চয়ই চান না। তিনি তাঁর চিত্তের নিভৃতেই হিমালয়ের প্রশান্তিকে পেতে চাইছেন, যে প্রশান্তি না থাকলে জীবন অপূর্ণ অতৃপ্ত ও ছন্দোহীন হয়ে থাকে বলে তিনি মনে করেন। নেহরুচিত্তের জিজ্ঞাসার অভিযান আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে, কি খুঁজছে, এবং কি পেতে চাইছে, তারই আভাস তাঁর এই উক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'রাজযোগ' গ্রন্থে লিখেছেন, প্রকৃত যোগীর মন সহস্র কর্মবহুলতার মধ্যেও এক পরম স্থৈর্য অনুভব করেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনের শত ব্যস্ততা ও কোলাহলের মধ্যেও জনহীন মরুভূমির নৈঃশব্দ্য এবং প্রশান্তি অনুভব করেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নেহরু নামে বর্তমান ভারতের বিরাট কর্মপ্রাণ এই মানুষটির মন কি তাঁর যুক্তিবাদ জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের সূত্র ধরে আজ সেই বিরাটতর প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে বুঝতে চাইছে, কি সেই পরম প্রাপ্তব্য, যার প্রাপ্তি জীবনকে দিব্য প্রশান্তি দান করে?

নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে আক্ষেপ করেছেন, তুষারতীর্থ অমরনাথ তাঁর অদেখা হয়েই রয়ে গেছে, অমরনাথ যাবার পথে গ্লেসিয়ারের আক্রমণ থেকে দৈবাৎ তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল এবং যাত্রা অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কৈলাস ও মানস সরোবর স্বচক্ষে দেখবার জন্য তাঁর তরুণ বয়সের ইচ্ছা ও আগ্রহ আজও স্বপ্ন হয়েই রয়েছে, দেখা হয়ে ওঠেনি। প্রণবানন্দ লিখিত মানস ও কৈলাসের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের গ্রন্থে নেহরু সম্প্রতি যে ভূমিকা লিখেছেন, তার মধ্যে তাঁর এই বিফল স্বপ্নের বেদনা তিনি ব্যক্ত করেছেন। লিখেছেন কৈলাস ও মানস এখনো যেন এক স্বপ্নলোকের ভেতর থেকে আমাকে ডাকছে। নেহরুর এই উক্তির মধ্যে তাঁর মন ও মনীষারই একটি বিশিষ্ট পরিণতির ইঙ্গিতটুকু পাই।

ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নেহরুর মনোভাবে সংশয়বাদ কত প্রবল, তার পরিচয় তাঁর 'আত্মজীবনী' গ্রন্থে খুবই স্পষ্ট ক'রে এবং বেশি ক'রে পাওয়া যায়। আত্মজীবনীতে তিনি নিজেকে বিজ্ঞানবাদীরূপে, অর্থাৎ আধুনিক সায়েন্সের উপাসকরূপেই বর্ণিত করেছেন। কিন্তু

পরবর্তীকালে তাঁর 'ভারত-আবিষ্কার-এর চিন্তাপর্যায়ে এসে তিনি তাঁর যে সব অভিমত ও ভাবনার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে দেখতে পাই যে, তিনি সংশয়বাদের স্তর অতিক্রম ক'রে যুক্তিবাদের স্তরে উপনীত হয়েছেন। সংশয়বাদ ও যুক্তিবাদ অবশ্যই একই বস্তু নয়, কিন্তু নেহরু সম্ভবতঃ তাঁর তরুণ বয়সের চিন্তানিহিত সংশয়বাদকে যুক্তিবাদ বলে মনে করতেন। 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে তিনি অকপট ভাবে স্বীকার ক'রে বলেছেন—'আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।' এমন কি, তিনি তাঁর যে 'বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী'র কথা আত্ম-জীবনীতে অতি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও পরবর্তী লেখায় মন্তব্য করে বস্তুতঃ তাঁর প্রাক্তন ধারণাকেই সমালোচনা করেছেন।

'My early approach to life's problems had been more or less scientific, with something of the easy optimism of the Science of the nineteenth and early twentieth century.'

বিজ্ঞানের প্রতি নেহরুর শ্রদ্ধা আজও এক তিলও কম হয়ে যায়নি।

ভারতে এগারটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করে তিনি ভারতে এগারটি জ্ঞানতীর্থের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু যে চিন্তারীতিকে তিনি জীবনের প্রতি যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভঙ্গী বলে পূর্বে ধারণা করেছিলেন, সেই চিন্তারীতির অবৈজ্ঞানিকতাটুকু তিনি পরে বিচার করে বুঝতে পেরেছেন। তিনি বৈজ্ঞানিক স্পিরিট ও অভিরুচিকেই বর্তমান যুগের জীবনবাদে সুপ্রতিষ্ঠ দেখবার আগ্রহ পোষণ করেন। এ বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্যের সঙ্গে নেহরুর বক্তব্যের বিশেষ একটি সাদৃশ্য দেখা যায়। বিবেকানন্দ বর্তমানের ভারত জীবনে রজঃ গুণের স্ফুরণ কামনা করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করতেন যে, রাজসিক আগ্রহের উদ্দীপনা বস্তুতঃ এ যুগের ভারতীয় জীবনকে সত্ত্ব গুণের আশ্রয়ী হবার অধিকার লাভেই অধিকতর যোগ্য করে তুলবে। লক্ষ্য করবার বিষয়, নেহরু তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত স্মরণ করে লিখেছেন যে—'পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বিবেকানন্দও আধুনিক বিজ্ঞানকে প্রকৃত ধর্মীয় 'জিজ্ঞাসারই প্রকাশ রূপে অনুভব করেছিলেন, কারণ তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানও বিশুদ্ধ আগ্রহের দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করবারই প্রয়াস।' রোঁমা রোঁলা সংশয়বাদীদেরও ধর্মীয় জিজ্ঞাসার মানুষ বলে মনে করতেন, কারণ সংশয়বাদীর অন্তরের প্রশ্ন প্রকারান্তরে প্রমাণার্থী সত্যসন্ধানীর মনের প্রশ্ন। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে যদি সংশয়বাদও ধর্মীয় জিজ্ঞাসারই ব্যাপার হয়ে থাকে, তবে তিনি রোঁমা রোঁলা বর্ণিত সংশয়বাদীদের দলেরই একজন বলে নিজেকে গণ্য করতে রাজী আছেন। কিন্তু 'ভারত আবিষ্কার' এর পর্যায়ে এসে যে নেহরুকে দেখতে পাই, তাঁর মধ্যে বিশুদ্ধ সংশয়বাদিতার প্রশ্রয় খুব অল্পই লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞানই জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে বলে তিনি মনে করেন না। আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনে বিশুদ্ধ কল্যাণ সৃষ্টি করছে বলেও তিনি স্বীকার করেন না। 'ধর্মে'র ত্রুটির মত 'বিজ্ঞানে'র-ও ত্রুটি তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিস্ময়ের বিষয়, বিজ্ঞান হতেও পরতর কিছু আছে বলে একটা বিশ্বাস কালক্রমে তাঁর মনে অধিকতর স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে।

নেহরু মানুষের এক অন্তর্বর্তী জীবনের (Inner life) অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং এ কথাও বলেন যে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের এই আন্তরিক জীবনের দাবী ও ক্ষুধা মেটাতে অসমর্থ হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানকে উদ্দেশ্যহীন (Purposeless) বলে তিনি অভিযোগও

করেছেন। সুতরাং জিজ্ঞাসু নেহরুর মন শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেই পৌঁছেছে যে, ঐ দুই সন্ধান-তত্ত্বের সমন্বয় প্রয়োজন। অধ্যাত্মজ্ঞানীর সন্ধান এবং জড়বিজ্ঞানীর সন্ধান দুই ভিন্ন সত্যের অভিমুখী হয়ে রয়েছে বলে মনে করেন না নেহরু। উভয়ই একই সত্যের সন্ধান। পদার্থবিদ্ বিজ্ঞানীর আধুনিকতম আবিষ্কারে সর্ববস্তুর মূলাধার রূপে একটি মাত্র শক্তি বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত এই আবিষ্কার যে কোন অদ্বৈত দার্শনিকের মত নেহরুকেও প্রভাবিত করেছে। নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে মহাত্মা গান্ধীর চিন্তারীতি ও অভিমতের অনেক কিছুই তীব্র প্রশ্নের দ্বারা বিচার করেছেন। গান্ধীকে অনেক বিষয়ে দুর্বোধ্য হেঁয়ালি তথা প্যারাডক্স বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এমন কি গান্ধী কথিত 'শুদ্ধ-পন্থা' তত্ত্বকে নেহরু তখন যুক্তি-সিদ্ধ-তত্ত্ব বলে বিশ্বাস করতে পারেন নি। লক্ষ্য করবার বিষয় নেহরু স্বয়ং আজ 'শুদ্ধ-পন্থা' তথ্যের শ্রেষ্ঠ সমর্থক। তখন যে তত্ত্ব তাঁর কাছে অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল, তিনি সে তত্ত্বের বাস্তবতায় ও সত্যতায় আজ পূর্ণ বিশ্বাসী।

পৃথিবী আজ নেহরুকেই গান্ধী-শিষ্য বলে জানে। অথচ গান্ধীর অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মধ্যে একমাত্র নেহরুই গান্ধী প্রচারিত নীতি অভিমত ও কর্মবিধির সবচেয়ে বেশি সমালোচনা করেছেন। সময় সময় গান্ধী-নীতির বিরুদ্ধে প্রবল সংশয় অকুণ্ঠভাবেই ঘোষণা করেছিলেন নেহরু। গান্ধী কথিত চরকা, অহিংসা ব্রহ্মচর্য, উপবাস প্রভৃতি ইত্যাদির তাৎপর্য সম্বন্ধে নেহরু গান্ধীর সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। আজও এসব বিষয়ে নেহরু বিশুদ্ধ গান্ধীবাদী হয়ে উঠতে পারেন নি। এসব বিষয়ে বরং আশ্রমিক গঠনকর্মীরাই বেশি নৈষ্ঠিক অথবা আনুষ্ঠানিক গান্ধীবাদের ব্রতী। কিন্তু স্বয়ং গান্ধী তাঁর আদর্শের সাধনার ক্ষেত্রে নেহরুকেই তাঁর যোগ্যতম প্রতিনিধি বলে মনে করেছিলেন, এবং সে কথা স্পষ্টতম ভাষায় ঘোষণাও করে গিয়েছেন।

"আমার পরে আমার আরব্ধ ও অনারব্ধ কাজের ভার বহন করবে জওহরলাল।" গান্ধীত্বের অথবা গান্ধীবাদের বহিরঙ্গ অনুসরণ করে চলবার মত মানুষ অনেক আছে, কিন্তু তার মূলীভূত সত্য অনুসরণ করে চলবার মত মানুষ কমই আছে। যারা আছে তাদের মধ্যে নেহরুই যোগ্যতম।

মানবপ্রেমই হলো সেই পরশমণি, যার ছোঁয়া পেলে জীবনের ও চিত্তবৃত্তির সব লোহা সোনা হয়ে যায়।

গান্ধী-আদর্শের দায় তাই স্বাভাবিক ভাবেই মানব প্রেমিক নেহরুর ওপর ন্যস্ত হয়েছে। ভারতের ইতিহাস তাঁর ওপর এই দায় ন্যস্ত করেছে। শান্তিকামী বিশ্ব জানে, শান্তির জন্য যথার্থ ও প্রকৃত আগ্রহ বর্তমান কালে সবচেয়ে বেশি সত্য হয়ে উঠেছে যাঁর চিত্তে, তিনি হলেন ভারতের নেহরু। বিশ্ববাসী জানে, নেহরুর শান্তিবাদের মধ্যে কোন রাজনীতি নেই। এ শান্তিবাদ শুদ্ধ মানবপ্রেম প্রসূত আগ্রহ। পৃথিবীর মানুষ জানে, বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ডেমোক্র্যাট হলেন ভারতের নেহরু। এশিয়াবাসী জানে, অবনত এশিয়ার মর্যাদা রক্ষার জন্য সব চেয়ে বেশি চিন্তাপরায়ণ হয়ে রয়েছেন যিনি, তিনি হলেন ভারতের নেহরু। পরদেশী শক্তিমানের দ্বারা নিগৃহীত জাতিসমূহ জানে, ভারতের নেহরুই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবসান সাধনের নীতিকে বর্তমানকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক কর্তব্যরূপে বিশ্বসমক্ষে উপস্থিত করেছেন।

নেহরু বিশ্বাস করেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বৈষম্য পৃথিবীর

অশান্তি ও যুদ্ধবাদের একটি প্রধান হেতু। এই বৈষম্য বিলোপের বাণী তিনিই সর্বাধিক প্রচার করে থাকেন। আজ, পৃথিবীর কোন দেশের কোন প্রান্তে গিয়ে যিনি দাঁড়ালে, যাঁকে দেখবার জন্য বৃহত্তম জনসমাবেশ দেখা দেবে, তিনি হলেন ভারতের নেহরু।

ভারত যখন স্বাধীন হয়নি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে অতিরিক্ত কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব যখন নেহরু লাভ করেন নি এবং যখন তিনি একজন কংগ্রেস নেতা মাত্র ছিলেন, তখনই ভারতের বাইরে মালয়ে তিনি ভারতীয়দের অবস্থা দেখবার জন্য গিয়েছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন তখন সেখানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কম্যাণ্ডের অধিনায়ক রূপে উপস্থিত ছিলেন। দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন মাউন্টব্যাটেন, মালয়ের গ্রামবাসী লক্ষ নরনারী কাতারে কাতারে পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে এই ভারতীয় ব্যক্তির দর্শন লাভের জন্য। মালয়ী জনতার এই আগ্রহের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু অনুমান করতে পারা যায়, ভারতীয় নেহরু যে এশিয়াবাসীর আপনজন, এই সত্য যেন অলক্ষ্য এক ঐতিহাসিক ভাবেদনের মত এশিয়াবাসীর অন্তরে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

ঐতিহ্যের 'বন্ধন' স্বীকার করেন না, কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি কি বিরাট শ্রদ্ধা পোষণ করেন নেহরু। নিজেকে ভারতীয় বলতে তিনি গৌরব অনুভব করেন।

ভারত থেমে থাকবে না, ভারতের চিত্ত গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকবে না, চিরযাত্রীর মত ভারত নূতন হতে নূতনতরের সন্ধানে এগিয়ে যেতে থাকবে। গতিবাদের পূর্ণ সমর্থক নেহরু তবু ভারতের প্রকৃত ভারতীয় রূপটিকে ভিন্নতর করে দিতে রাজী নন। তিনি বলেন, ভারতকে তার নিজের ভিত্তির ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

'Though her attire may change, she will continue as of old, and her store of wisdom will help her to hold on to what is true and beautiful and good in this harsh, vindictive and grasping world.'

নেহরুর ভারত, এই সুন্দর প্রাচীন ভারত, বহু যুগের চিন্তার মাধুরী দিয়ে গঠিত ভারত নবত্বের সন্ধানে তার অভিযান কখনো ক্ষান্ত করবে না ঠিকই কিন্তু যুগলব্ধ প্রজ্ঞার বলে যে সত্য শিব ও সুন্দর এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে ভারত, তাকে পৃথিবীর সকল রূঢ়তার মধ্যেও সযত্নে রক্ষা করতে হবে।

জীবনে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নেহরু। 'কোন কিছুতে বিশ্বাস না করে থাকা একেবারেই অসম্ভবপর।' বিশ্বাসহীন জীবন বস্তুতঃ অসম্পূর্ণ জীবন। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেবে, কিসের প্রতি বিশ্বাস?

নেহরু বলেন, –'কোন না কোন প্রকারের ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া পৃথিবীর মানুষের জীবন চলতে পারে না।'

সত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন উপদেশ প্রদান করেন না নেহরু। কিন্তু একথা তাঁর মনে হয়েছে যে নিছক বস্তুতের ও প্রত্যক্ষের বাইরে আর কিছু নেই, এমন ধারণা করবার কোন যুক্তি নেই।

'And yet some faith seems necessary in things of the spirit which are beyond the scope of our physical world, some reliance on moral, spiritual and idealistic conceptions, or else we have no anchorage, no objectives or purposes of life.'

বস্তুজগতের বাইরে কোন আত্মিক অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া মানুষের জীবন প্রকৃত স্থিতি ও ছন্দ লাভ করতে পারে না। এ বিশ্বাস না থাকলে জীবনেরই কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে কিছু থাকে না। নেহরুর এই স্বীকৃতির পর তাঁর যুক্তিবাদের অথবা সংশয়বাদের আর বিশেষ কিছু বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই তাঁর সংশয়বাদের উত্তর দিয়েছেন। যে জিজ্ঞাসার অভিযান তাঁর চিত্তকে সহস্র প্রশ্নে আকীর্ণ করে তুলেছিল, সেই অভিযানও স্বাভাবিক সন্ধানের পথেই বৃহৎ এক সদুত্তরের সম্মুখে এসে পৌঁছেছে।

এ আক্ষেপ নেহরুর মনের মধ্যে আছে যে, বিজ্ঞানে বলীয়ান মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবার এত ক্ষমতা লাভ করেও করেনি। সুতরাং নিছক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ মানুষকে আদর্শ শক্তির মানুষ বলে তিনি মনে করতে পারেননি। বাইরের বস্তু হতে বা বস্তুতন্ত্র হতে নয়, মানুষের অন্তরের ভেতর হতেই আহৃত হতে পারে সেই শক্তি, যে শক্তি জীবনকে পূর্ণতা, সামঞ্জস্য, রূপ ও সৌষ্ঠব দান করে।

এই প্রসঙ্গে ১৯৫১ সালের জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে প্রদত্ত নেহরু বেতার বক্তৃতা হতে একটি অংশ উদ্ধৃত করতে পারি। নেহরু বলেছিলেন—

'Ultimately, culture and civilisation rest in the mind and behaviour of men and not in the material evidence of it that we see around us.'

—সংস্কৃতি ও সভ্যতা মানুষের মন ও আচরণের ওপর নির্ভর করে রয়েছে।

সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে সব বস্তুগত নিদর্শন আমরা প্রত্যক্ষ করি, সে সব বস্তুর ওপর সংস্কৃতি বা সভ্যতা নির্ভর করে না। নেহরু উপলব্ধি করেছেন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রধান আশ্রয় হলো মানুষের মন, কারণ, এটা প্রধানতঃ মানুষের মনেরই সৃষ্টি।

সাম্প্রতিক কালে আধুনিক সায়েন্স, মেসিন ও ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমের সম্পর্কে নেহরুর অভিমত পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি কঠোর হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এসব বিষয়ে তাঁর সমালোচনা আরও প্রখর এবং অন্তর্দৃষ্টি আরও প্রসারিত হয়েছে। বিজ্ঞান উন্নত হলেও জীবনচর্চার বর্তমান যুগকে তিনি অতীতের তুলনায় অধিকতর উন্নত বলে স্বীকার করেন না। শুধু তাই নয়, নেহরু অতীতযুগকেই অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, বর্তমানের মানুষের তুলনায় অতীতযুগের মানুষের জীবনে 'ব্যালান্স' বা সুষমা ছিল বেশি। বিজ্ঞানীদের এক সাম্প্রতিক সম্মেলনেও তিনি তাঁর এই অভিমত অকুণ্ঠিতভাবে ঘোষণা করেছেন যে, অতীতযুগের মানুষেরা তুলনায় অধিকতর সুষ্ঠু (More integrated) ছিল, যদিও বৈষয়িক ঐশ্বর্যে অতীতের মানুষ আজকের তুলনায় বেশি অনুন্নত ছিল।

নেহরুর এই সব উক্তি ও মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, নেহরুর চিত্ত একটি পরম জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না, মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্যের সন্ধানেই তাঁর অন্তর তৎপর হয়ে রয়েছে। তিনি নিজেকে ঈশ্বর বিশ্বাসী বলে কখনো ঘোষণা করেন নি। লিয়াকৎ আলি খাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি বেগম লিয়াকৎ আলির প্রতি যে সমবেদনার বার্তা প্রেরণ করেছিলেন, তার মধ্যে লক্ষ্য করবার মত একটি শব্দ আছে, যেটা নেহরুর মুখের বা লেখার ভাষায় পূর্বে কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

'God grant you strength to bear your great bereavement.'

—'ঈশ্বর আপনাকে এই নিদারুণ শোক সহ্য করবার শক্তি দান করুন।' সুতরাং প্রশ্ন দেখা দেয়, সন্ধানী নেহরুর মন কি সেই 'আলটিমেট' বা পরমের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে

গেছে? জানি না, নেহরুর সন্ধানের অভিযান কোথায় এসে পৌছেছে। একটি টেলিগ্রামের বার্তার ভাষা থেকে নেহরুর সাম্প্রতিক চিন্তারীতি সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা সম্ভবতঃ যুক্তিযুক্ত হবে না। নেহরু 'প্রার্থনা' করছেন, এমন সংবাদও আজকাল অবশ্য শোনা যায়।

'যা-কিছু দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অনুভব-গ্রাহ্য একমাত্র তাই নিয়েই জীবন নয়'

—একথা বলে নেহরু তাঁর অজ্ঞেয়তাবাদী ও 'মিষ্টিক' মনের পরিচয়ই ব্যক্ত করেছেন। তিনি স্বীকার করেন, জীবনে দুর্বোধ্য রহস্যের মত কিছু আছে, যার পরিমাপ করা যায় না। এমন কি তিনি প্রত্যক্ষের এবং অনুভবের অতিরিক্ত এক 'অদৃশ্য জগতে'র কথাও বলেন।

Life is continually touching an invisible world of other.....and no thinking person can ignore this invisible world.'

বিজ্ঞানবাদী নেহরুই জীবনে অন্তঃপ্রজ্ঞার (Intuition) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের সার্থকতার জন্যই অন্তঃপ্রজ্ঞার প্রয়োজন।

কাব্য ও রম্যকলার রস উপলব্ধি করবার জন্য কোন বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি বা যন্ত্র তৈরী করা সম্ভবপর নয়।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত স্ট্যাটিস্টিক্যাল কনফারেন্সে উপস্থিত বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য করে নেহরু সত্যই এই প্রশ্ন করেছিলেন—আপনারা কি সৌন্দর্যকে পরিমাপ করবার কোন গাণিতিক ফরমুলা রচনা করতে পারেন? এমন ফরমুলা সম্ভবপর নয় বলেই নেহরু জানেন।

জীবনকে নিয়ত প্রবহমান এক পরিবর্তনশীলতার ধারা বলে মনে হয়েছে নেহরুর। তিনি গতিবাদের এক বিশ্বাসী সমর্থক। কিন্তু কালোত্তর ধ্রুব সত্যের অস্তিত্বের স্বীকার করেন নেহরু, যে সত্য কালের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয় না। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নেহরু তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, 'মূলীভূত সত্য' (Basic truth) নামে সত্য অবশ্যই আছে, যা ধ্রুব, অক্ষয় ও অপরিবর্তনীয়।

সুতরাং নেহরু যখন মানুষেরই জীবনসত্তার নিহিত এক 'অমৃতত্ব'এর অস্তিত্বও স্বীকার করেন তখন আর বেশি বিস্মিত হতে হয় না। মানুষের জীবনের আয়ু সীমিত, ভ্রান্তি ও দুর্বলতা আছে এই মানুষের, তথাপি এই মানুষেরই মধ্যে 'অমর দেবতাতুল্য একটি বস্তু আছে 'yet there is something of the stuff of immortal Gods in us.'

মেসিনের প্রতি নেহরুর মনে কোন বিরূপ ভাব নেই। কিন্তু এ সন্দেহ আজ তাঁর মনে দেখা দিয়েছে যে, মেসিন যেন মানুষকেই মেসিনে পরিণত করে চলেছে। এ দোষ অবশ্য মেসিনের নয়। নেহরু মনে করেন, মানুষই তাঁর মনকে মেসিনে পরিণত করে ফেলছে, মেসিনের প্রতি উদ্ভট এক দাস্যতার কারণে। য়ুরোপের যে শিল্পবিপ্লবকে নেহরু মানুষের ইতিহাসের প্রগতিমূলক ঘটনা বলে মনে করতেন, সেই শিল্পবিপ্লবের অন্তর্নিহিত বিশেষ কয়েকটি ভয়ানক অনর্থের কথাও তিনি আজকাল বলে থাকেন। মানুষের আত্মিক সত্তাকে ক্ষুদ্রতর করে দেবার বীজও নিহিত ছিল ঐ শিল্পবিপ্লবের মধ্যে।

বর্তমান যুগ হলো টেকনলজির যুগ এবং টেকনলজির উৎকর্ষ ও প্রগতি নেহরুও কামনা করেন। কিন্তু গত বৎসরে ভারতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সংস্কৃতি সংস্থায় এক সম্মেলনে নেহরু এ কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি, টেকনলজির যুগ মানুষ জাতির বিশুদ্ধ কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। বরং কল্যাণের তুলনায় বিড়ম্বনা সৃষ্টি করেছে বেশি।

সায়েন্স, টেকনলজি ও মেসিনের সম্পর্কে নেহরুর এই সমালোচনা ও আক্ষেপ এই

সত্যই প্রমাণিত করে যে তিনি বর্তমান যুগের বিশেষ একটি আন্তরিক দীনতা ও নিঃস্বতা লক্ষ্য করেছেন। এমন কোন বস্তু এ যুগের চিন্তা ও চিত্ত হতে দূরে সরে গিয়েছে, অথবা হারিয়ে গিয়েছে যার জন্য মানুষেরই মনের ও জ্ঞানের সৃষ্টি এই সায়েন্স টেকনলজি ও মেসিন মানুষের সত্তাকে পরাভূত ও পীড়িত করবার মত এক অপশক্তির রূপ গ্রহণ করেছে। নিজের জ্ঞানকেই নিজের অধিকারে রাখবার জ্ঞান নেই, সমস্যাটা প্রায় এই রকমের হয়ে উঠছে।

'Man can do what he wills but he can not will what he will do.'

দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের এই নৈরাশ্যবাদ যেন আজকের যুগের চিত্তদৈন্যের দ্বারা সত্য বলেই প্রমাণিত হতে চলেছে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের বলে তার মনের অধিকার এবং ইচ্ছা সৃষ্টির অধিকার লাভ করবে, সেই বিজ্ঞানই হলো শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান। এবং এই বিজ্ঞানেরই প্রতিষ্ঠা কামনা করেন নেহরু। এই বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানবাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। শোপেনহাওয়ারের নৈরাশ্যকে সত্য বলে স্বীকার করেন না ভারতের জ্ঞানী। লক্ষ্য করা যায় নেহরুও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিন্তারীতির পথ অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত ভারতীয় জ্ঞানবাদের কাছে এসেই পৌঁছেছেন।

নেহরু-মনীষার ইতিহাস এই বিজ্ঞানমুখী সন্ধানেরই ইতিহাস। জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার অভিযান নেহরুচিত্তকে উপলব্ধির এক নতুন পরিণাম ক্ষেত্রে এনে উপস্থিত করেছে, যেখানে এখন তিনি এক কৌতূহলের পথিক রূপেই দাঁড়িয়ে আছেন। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের আশাবাদের বাণী মনে পড়ে :

—'বিশ্ব সৃষ্টির নাট্যকারই তাঁর এই সৃষ্টির তাৎপর্যকে এক রহস্যে দুর্বোধ্য করে রেখেছেন। বোধহয় এই সৃষ্টি নাট্যেরই এক পঞ্চম অঙ্কে এই রহস্য আপনা হতেই অপাবৃত হয়ে তার তাৎপর্য প্রকাশ করে দেবে।' অনুমান করা যায়, নেহরু চিত্তের জীবনজিজ্ঞাসাও যেন পরিণামের এক পঞ্চম অঙ্কের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়িয়েছে। যে বিশ্বাস ও উপলব্ধির ঐশ্বর্য কর্মকঠোর জীবনে হিমালয়ের প্রশান্তি দান করে সেই বিশ্বাস ও উপলব্ধিরই আবির্ভাব নেহরু-জীবনে আসন্ন হয়ে উঠেছে বলে মনে করলে বোধ হয় ভুল করা হবে না।

সাংস্কৃতিক জওহরলাল

শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতের শ্রেষ্ঠ নেতা, এশিয়াবাসীর আকাঙ্ক্ষার অন্যতম নায়ক এবং বিশ্বের শান্তিকামী জনতার আশা ও প্রেরণার আস্পদ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনার পর আন্তর্জাতিক চিন্তার নেতৃত্বের ক্ষেত্রে যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে, তিনি হলেন ভারতের জওহরলাল। তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় জাতির প্রতিনিধি, শুধু এই কারণে তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল্য আন্তর্জাতিক আসরে স্বীকৃত হয়েছে, একথা সত্য নয়। তিনি ভারতীয় জনমতের প্রবক্তা, এই সত্য তাঁর রাজনীতিক গুরুত্ব ও মর্যাদার একটি হেতু বটে। কিন্তু অতিরিক্ত একটি হেতুও আছে। তিনি স্বয়ং সেই হেতু অর্থাৎ ব্যক্তি জওহরলাল, তথা সাংস্কৃতিক জওহরলাল।

ব্যক্তিত্বকে যদি চরিত্রেরই অভিব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়, তবে সেই সঙ্গে এই সত্যও স্বীকার করতে হয় যে, সেই চরিত্র হলো সাংস্কৃতিক জওহরলাল।

ব্যক্তিত্বকে যদি চরিত্রেরই অভিব্যক্ত স্বরূপ বলা হয়, তবে সেই সঙ্গে এই সত্যও

স্বীকার করতে হয় যে, সেই চরিত্র হলো সাংস্কৃতিক চরিত্র। শুধু রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠাই যথেষ্ট নয়, সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসি সত্য না হলেও জাতির চরিত্র কখনই সৌষ্ঠবান্বিত হতে পারে না।

ব্যক্তির জীবনেও এই সত্যের ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক জওহরলাল এই সত্যের প্রতীক। তাঁর জীবন বস্তুত ডেমোক্রেসির আদর্শের একটি পূর্ণতর ব্যাখ্যা।

আধুনিক ভারতের যে মনীষার ঐতিহ্য রামমোহন-বিবেকানন্দ-গান্ধীর চিন্তা-সাধনার বিশেষ প্রকৃতির আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে, সাংস্কৃতিক জওহরলাল সেই মনীষার ধারক হলেও অভিনব যুগোচিত প্রয়োজনের আহ্বানই তাঁর মনের কাছে সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা। রামমোহন, বিবেকানন্দ ও গান্ধীর বাণীতে সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসির উদাত্ত ঘোষণা থাকলেও লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতের জনচিত্তে সেই ঘোষণাকেই নীরব করে দেবার জন্য এক ধরণের অনুদার মনোভাব ভারতের সাংস্কৃতিক জাতীয়তার নাম নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বেশ ভালো প্রচার লাভ করে এসেছে। এই কাণ্ড যাঁরা করেছেন, তাঁরাও ঋষি আর মনীষী বলে আখ্যাত হয়েছেন। আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যাঁরাই ভারতীয় চিন্তার শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসিকে সম্মানিত করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরই বিজাতীয় ও অ-ভারতীয় মনোবৃত্তির মানুষ বলে নিন্দিত হবার দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হয়েছে। সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসি বড়, না সাংস্কৃতিক জাতীয়তা বড়? এই প্রশ্নের অবশ্য কোন অর্থ হয় না। সংস্কৃতিকে ডেমোক্রেটিক হতে হলে জাতীয়তার বিশেষ স্বরূপটি বর্জন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাংস্কৃতিক জাতীয়তার নামে যে তত্ত্বের প্রচার হয়ে থাকে, সেটা পরজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা প্রচারের প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়।

ভারতীয় সংবিধানে যে 'কম্পোজিট কালচার' তথা সমন্বিত সংস্কৃতির আদর্শ ঘোষণা করা হয়েছে, তার প্রতিও এক শ্রেণীর ভারতীয়তাবাদীর সমালোচনায় বিদ্রূপ ধ্বনিত হতে শোনা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য এই যে, রামমোহন-বিবেকানন্দ-গান্ধীর বাণী ভারতীয় জীবনে এই কম্পোজিট কালচারের প্রতিষ্ঠাই দাবী করে এসেছে।

ভারত ইতিহাসের পক্ষে বর্তমানের অধ্যায়টিও এই বিশেষ গৌরবের স্মারক হয়ে থাকবে যে ভারতের জন-জীবনে সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠা বহু দুরূহ বাধা সত্ত্বেও সত্য হতে চলেছে। এর জন্য যাঁর নাম ভারতের সাংস্কৃতিক সংগঠয়িতারূপে ভারত ইতিহাসে প্রকীর্তিত হবে, তিনি হলেন জওহরলাল।

অনেকে মনে করেন, জাতীয় জীবনে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সত্য হলে সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রও আপনি সত্য হয়ে উঠবে। এই ধারণার মধ্যে যুক্তির ভুল আছে। বরং মনে করা উচিত যে, সাংস্কৃতিক গণতন্ত্রই রাজনীতিক ও অর্থনীতিক গণতন্ত্রের পথ সুগম ও স্বচ্ছন্দ করে। বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় অনেক স্থানে এই শোচনীয় সত্যই অভিজ্ঞাত হয়েছে যে, রাজনীতিক দলের সদস্য তাঁর জাতের নামের জোরে ভোট পেয়েছেন, রাজনীতিক মতবাদের জোরে নয়। ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, ভারতের জাতীয় জীবনে এখনো সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। শুধু ধর্ম, ভাষা জাত ও শ্রেণীগত পরিচয়ের প্রতি এই আনুগত্য জাতীয়তার প্রতি আনুগত্য নয়, এবং এই রূপ আচরণ সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসির অভাবই প্রমাণিত করে। ক্ষুদ্র রাজনীতিকেরা এই ঘটনাকে

সামান্য ব্যাপার বলে মনে করেন। কিন্তু দেখা যায় যে, জওহরলালের কাছে এই ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং তিনি তাঁর প্রচার বক্তৃতায় অক্লান্তভাবে এই ধরণের মনোবৃত্তি ও আচরণের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করে চলেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক সত্য ও মহত্ত্ব এবং ভবিষ্যতের প্রগতি সম্বন্ধে যাঁর মনে উপলব্ধির ভুল নেই, তাঁর পক্ষে এই রকম ঘটনাকে তুচ্ছ করা সম্ভব নয়। ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাত এর নামে সঙ্কীর্ণতা ও অনাচার ভারতের জাতীয় জীবনকে যতখানি অপমান ও অবনতির গভীরে নামিয়ে দিয়েছিল, ভারতের ইতিহাসে জাতীয় আচরণের আর কোন ভুল বা গ্লানি ততখানি অবনতির হেতু হতে পারে নি। সাংস্কৃতিক জওহরলাল আজ রাষ্ট্রশক্তিকে জাতির সেই পুরাতন ভ্রান্তিবিলাস লুপ্ত করে দেবার জন্য কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে প্রস্তুত হয়েছেন।

সামাজিক সম্বন্ধবোধের নীতিটিকে পুরাতন গোঁড়ামির বন্ধন থেকে মুক্ত করে সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসির প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে দেরি করেন নি জওহরলাল, দৃষ্টান্ত হিন্দু কোড বিল। এক্ষেত্রে অ-জনপ্রিয় হবার দুর্ভাগ্য স্বীকার করে নিয়েও তিনি ভারতের প্রগতিশীল মনোভাবের দাবীকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দান করেছেন। বিবাহ ও উত্তরাধিকার, এই দুই বিষয়ে ভারতের নূতন আইনে নারীসমাজের মর্যাদা যে স্বীকৃতি লাভ করেছে, তার ফলে ভারতের জনজীবনে সামাজিক ডেমোক্রেসির এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে।

সংস্কৃতি বলতে ভাষা সাহিত্য শিল্পকলাও বোঝায়। এক্ষেত্রে জওহরলাল কোন্ অভিনব সম্পদের উপহার দিয়ে ভারতের জাতীয় জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন, এই প্রশ্ন অবান্তর। সাহিত্য, নাটক ও শিল্পকলাকে উৎসাহিত করবার জন্য দেশের সরকার যে প্রচেষ্টা ও আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন, সেটাও বৃহৎ এবং মূলগত কোন সাংস্কৃতিক উন্নতির কীর্তি নয়। এই ধরণের উদ্যমের সার্থকতা স্বীকার করেও বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে এই রূপ উদ্যম এমন কিছু অভিনব নয়। মোগল দরবারও এরকমের অনেক কীর্তি করেছিলেন এবং ব্রিটিশরাজও ভারতের চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ঐতিহ্য রক্ষায় অনেক কিছু করেছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রের নেতা জওহরলালকেও এর জন্য বিশেষ কোন প্রশংসা করবার প্রয়োজন হয় না। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব এই যে, তিনি সাংস্কৃতিক অধিকারকে জনসাধারণের জীবনে সত্য করে তুলবার নীতি অনুসরণ করছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক নীতিতে যেমন, তেমনি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সাধারণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হোক। সাহিত্য চিত্রকলায়, নাট্যে সঙ্গীতে নৃত্যে ও অন্যান্য রম্যকলার সৃষ্টির সাধনায় সাধারণ মানুষের অধিকার সত্য হলে তবেই ভারতের সংস্কৃতি বর্তমানের একপেশে এবং খণ্ডিত উন্নতির পরিবর্তে সামগ্রিক উন্নতি লাভের সুযোগ পাবে এবং সেটাই হবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত জাতীয় অভ্যুদয়।

জওহরলালের নীতিতে কোন ভুল নেই, কিন্তু ঠিক এই বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগের পদ্ধতিগত বিষয়ে সমালোচনার অবকাশ আছে। ভারত সরকারের সংস্কৃতি আন্দোলন জনসমাজের সাধারণ স্তরের কাছে এখনও পৌঁছতে পারেনি। সে ধরণের উদ্যোগ চলেছে, সেটা কতকটা শ্রেণী বিশেষের আচরণে সাংস্কৃতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। উপরতলার শ্রেণীর অংশবিশেষ এই সাংস্কৃতিক প্রসাদের উল্লাসটুকু উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেই সুযোগ সরকারী কর্মচারীর অনুগ্রহের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কম্যুনিটি প্রজেক্ট তথা সমাজ পরিকল্পনার সাফল্য সম্বন্ধে জওহরলাল খুবই বেশী আশা

পোষণ করেন। তিনি একাধিকবার এই বিশ্বাসও ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের নূতন রূপান্তর সাধন করবে যে উদ্যোগ, সেটি হলো ঐ কম্যুনিটি প্রজেক্ট। সত্য কথা, কম্যুনিটি প্রজেক্ট গ্রামীণ ভারতের রূপ দ্রুত বদলে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনের বিশেষ স্বরূপটি নিতান্তই অর্থনীতিক।

কৃষি, স্বাস্থ্য, পথঘাট ইত্যাদির সুসংস্কার ও উন্নয়নে গ্রামীণ ভারতের বৈষয়িক চেহারাটি সুষ্ঠু হয়ে যাবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু লক্ষ্য করতে হয় যে, কম্যুনিটি প্রজেক্ট সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব আরোপ করে না। শিক্ষালয় স্থাপনের কার্যক্রম আছে বটে, কিন্তু তার মধ্যে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের সব প্রতিশ্রুতি থাকতে পারে না। শহর এবং গ্রামের জনসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক অধিকার ও সুযোগের পার্থক্য থাকা সাংস্কৃতিক ডেমোক্রেসির সহায়ক নয়।

যদি বলা হয় যে, ব্যক্তি জওহরলালই হলেন ভারতীয় সংস্কৃতির আদর্শ প্রতীক তাহলে অত্যুক্তি করা হবে না। ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করেন, কিন্তু অভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ কম নয়। তাঁর মনের এই প্রকৃতিই প্রমাণিত করে যে, সংস্কৃতি কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধি সম্পূর্ণ নির্ভুল। সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ কম নয়। স্বরূপে জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও জাতীয়তা তার বন্ধন হতে পারে না। হলেই সেই সংস্কৃতি শ্রীহীন হতে বাধ্য, কারণ বিশ্বের ইতিহাসই প্রমাণিত করে যে, প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতি এক একটি কম্পোজিট সৃষ্টি, বহু বিভিন্ন দেশ ও জাতির কাছ থেকে সাংস্কৃতিক আহরণের দ্বারা দেশ বিশেষের সংস্কৃতি ক্রমোন্নত উৎকর্ষ লাভের উপযোগী প্রাণবত্তা পেয়ে থাকে। ভাষা, সঙ্গীতের সুর, শিল্পের রীতি, নৃত্যের ছন্দ সবই দেশ হতে দেশান্তরে নীত হয়ে থাকে।

প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষী। পণ্ডিচেরীর লোকনৃত্য মূলত ফরাসী নৃত্য; জওহরলাল পণ্ডিচেরীর লোকনৃত্যকে ভারতীয় লোকনৃত্য হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। এখানেই সাংস্কৃতিক জওহরলালের মনের প্রকৃতিটি স্পষ্ট করে বুঝতে পারা যায় এবং কোনই সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক ভারতীয়র পক্ষে তাঁর মনের ঐ প্রকৃতির অনুরূপ প্রকৃতি লাভ যুগোচিত সাংস্কৃতিক শক্তি ও সৌন্দর্য উপার্জনের একমাত্র পন্থা।

বহুর মধ্যে একত্বের উপলব্ধি : বৈচিত্র্যের মধ্যে সমতার সম্বন্ধ অনুভব, ভারতের প্রাচীন জ্ঞানীর উপলব্ধিজাত এই নীতিকে ভারতের সাংস্কৃতিক সংগঠনে প্রয়োগ করেছেন জওহরলাল। অতীত তাঁর কাছে বন্ধন হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি 'কন্টিনুয়িটি'র ঐতিহাসিক সত্যতা স্বীকার করেন। ঐতিহ্য হতে সমূহভাবে বিচ্যুত হওয়াই শক্তির লক্ষণ নয় এবং অভিনবত্ব লাভের পন্থাও নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর শক্তি অর্জনই ব্যক্তিগত এবং জাতীয় প্রয়াসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। এই প্রয়াসে অতীতের প্রেরণাও প্রেরণা বটে এবং নূতনের আহ্বানও আহ্বান বটে। জওহরলাল অজন্তার ছবি দেখে মুগ্ধ হন, ইংরাজী কবিতা ভালবাসেন, চীনা চিত্রকলার প্রতি অনুরাগী। হিমালয়ের তুহিনাবৃত সৌন্দর্যের রহস্য তাঁকে আহ্বান করে।

একটি গোলাপ ফুল সর্বদা যার বুকের উপর শোভা পায়, সেই ব্যক্তিটিই ভারতের মত বিপুল সমস্যাক্রান্ত রাষ্ট্রের সকল দায়িত্বভার বহন করেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সৌভাগ্য, এইরকম একটি শিল্পী সুলভ অভিরুচির মানুষই বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনেতার পদে অধিষ্ঠিত

আছেন। রাষ্ট্রীয় কর্মের প্রবল উদ্বেগ ও বিড়ম্বনার মধ্যেও যিনি সময় করে নিয়ে ইহুদী মেনুহিনের সঙ্গে এক নিভৃতে বসে বেহালার সুরের জাদু উপভোগ করতে ভুলে যান না, সেই সাংস্কৃতিক জওহরলালের ব্যক্তিত্বের রহস্যটিও বুঝতে পারা যায়। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁর প্রকৃতির এই সত্যটিই তাঁর শিল্পীসুলভ অভিরুচির হেতু। সাংস্কৃতিক জওহরলালের ব্যক্তিত্ব এই নীতিরই সৃষ্টি। তাঁর প্রচারিত ডেমোক্রেসির আদর্শ এবং জাতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত সকল উদ্যোগ এই নীতির প্রেরণাতেই অনুপ্রাণিত। পঞ্চশীল সাংস্কৃতিক জওহরলালেরই মনের স্বভাবজ আগ্রহের সৃষ্টি।

শান্তি ও সহাবস্থান যে বিশ্বগণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভিত্তি, এই সহজ সত্যকে তিনিই বর্তমান কালে সমধিক প্রচারের দ্বারা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সহাবস্থান আদর্শ বিশ্বের জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ সহায়। বিশ্ব জনজীবনে গণতন্ত্রের রাজনীতিক আদর্শ বিশ্বের জাতিসমূহের সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ সহায়। ঐ আদর্শে যে একটি অপূর্ণতা ছিল, জওহরলালের প্রচারিত পঞ্চশীল বস্তুত সেই অপূর্ণতা দূরীভূত করার প্রথম সার্থক প্রয়াস। পরজাতীয় ও পরদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, এই নীতি বাস্তবে সত্য হয়ে উঠতে পারলে পরজাতি ও পরদেশের প্রতি রাজনৈতিক মনোভাবও যে শ্রদ্ধায়িত হয়ে উঠবে, এই নীতিতে ইউনেসকোরও বিশ্বাস আছে। সুতরাং জওহরলালের প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে শুধু প্রগতিশীল ভারতীয় আদর্শের অভিব্যক্তি নয়, আন্তর্জাতিক আগ্রহের সব চেয়ে সুষ্ঠু ও উদার স্বরূপটিরও প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। যে মানুষ চিৎকার করে কথা বলে, তার মধ্যে জওহরলাল কালচারের অভাব লক্ষ্য করে পীড়া বোধ করেন।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও জাতিবিশেষের মনোভাবের রূঢ়তা তাঁকে পীড়িত করে। এই দুই-ই একই সাংস্কৃতিক জওহরলালের সুষ্ঠু, শিল্পীসুলভ, গণতন্ত্রনিষ্ঠ ও মমত্বধর্মী ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন। ভারত ইতিহাসের সৌভাগ্য, শান্তি ও সৌন্দর্যের উপাসক এক কর্মযোগী মানুষই স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগঠনের দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনের ভার গ্রহণ করেছেন।

ভারত আবিষ্কারে

ভারতে অদ্বৈতবাদেব প্রতিষ্ঠাতা জ্ঞানী শঙ্করের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পরিচয় জওহরলাল নেহরু এইভাবে বর্ণনা করেছেন :

'বিস্ময়কর অধ্যবসায়ের ও বিপুল কর্মপ্রবণ জীবনের মানুষ ছিলেন শঙ্কর। সংসারের আর সকলের ভালমন্দ পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তাশূন্য হ'য়ে থাকার মত বৈরাগ্য তিনি গ্রহণ কবেননি। নিজের পারমার্থিক জীবনেব পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি নিজেকে কঠিন নির্লিপ্ততার আবরণে আচ্ছাদিত ক'রে রাখেননি, অথবা অরণ্যের কোণে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণও করেননি। দক্ষিণ ভারতের মালাবারে তাঁর জন্ম, কিন্তু তিনি ভারতের সর্বত্র অবিরাম পর্যটন করেছিলেন। অসংখ্য ব্যক্তির সান্নিধ্যে তিনি নিজেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আলোচনা ক'রে, তর্ক করে, যুক্তি দেখিয়ে এবং বিশ্বাস সৃষ্টি ক'রে তিনি অসংখ্য ব্যক্তির মনে তাঁর নিজেরই বিপুল কর্মদ্যোতনার ও প্রেরণার কিছুটা সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভারতভূমিকে তিনি তাঁর কর্মের ক্ষেত্ররূপে এবং বিশেষ এক ঐক্যের সূত্রে সংযুক্ত একটি

অখণ্ড সংস্কৃতি ভূমি রূপেও উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, কন্যাকুমারী থেকে হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত এই ভারতভূমির অন্তর একটি ভাবানুভূতির দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে রয়েছে, তার বাইরের রূপে ও প্রকাশে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন। তাঁর সময়ে ভারতে যে-সব বহু ও বিভিন্ন ধারার চিন্তা পন্থা ও মতের দ্বন্দ্বে ভারতীয় মানুষের মন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল, তিনি সেই সব বিভিন্ন ধারাকে সমন্বিত করার জন্য প্রবল প্রয়াস করেছিলেন, যা'তে ভারতের এই বহুবৈচিত্র্যের তথা বিভিন্নতার মধ্যেও জীবনদর্শনের একটি ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বহুমুখী প্রতিভার বিস্ময়কর সমন্বয় দেখা গিয়েছিল শঙ্করের ব্যক্তিত্বে। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও শাস্ত্রজ্ঞ সুধী, অজ্ঞেয়বাদী ও মিস্টিক, কবি ও সাধক এবং সেই সঙ্গে একজন কর্মিষ্ঠ সংস্কারক ও সুদক্ষ সংগঠক।'

শঙ্করের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নেহরু যে মন্তব্য করেছেন, তার অনেকখানিই তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সত্য। দশম শতকের ভারত ও বিংশ শতকের ভারত, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক, অমিলও অনেক। তেমনি তুলনা করলে সেদিনের জ্ঞানী শঙ্কর ও আজকের রাজনৈতিক নেহরুর মধ্যে অনেক ব্যবধান এবং অনেক অমিলও খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে আবার মিলও আছে, এবং নৈকট্যও দেখা যায়। উভয়ের ব্যক্তিত্বে ও প্রকৃতিতে বিস্ময়কর একটি সাদৃশ্যই বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে, যদিও দুই যুগের পার্থক্যের মত উভয়ের ভাবনা এবং লক্ষ্যের মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। ধর্মনৈতিক আদর্শের প্রচারক, সংগঠয়িতা ও স্থাপয়িতা শঙ্কর, এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক আদর্শের প্রচারক ও সংগঠয়িতা নেহরু। উভয়ের কর্তব্যক্ষেত্রের এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের ব্যক্তিত্বের প্রক্রিয়া যেন ভারত ইতিহাসের একই গূঢ় প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে এবং করে চলেছে। নেহরু আজও আমাদের অতি নিকটে, সুতরাং তাঁর কর্মসাধনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য হয়তো ততটা সহজে এবং স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে অসুবিধা আছে, যতটা সহজে ও স্পষ্ট করে সুদূর অতীত কালের কোন জ্ঞানী কর্মী ও মনীষীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করা, পরিমাপ করা ও উপলব্ধি করা যায়। নেহরু শঙ্কর নন, ঠিকই, কিন্তু দলীয় রাজনীতিও প্রচার সংবাদের ক্ষুদ্রার্থতা হ'তে দৃষ্টি মুক্ত ক'রে আজকের নেহরুর দিকে তাকালে এ সত্য সহজেই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে যে, তাঁর মধ্যে সেই শঙ্করতুল্য প্রকৃতি ও ব্যক্তিত্বই সর্বমহিমা নিয়ে প্রকট হ'য়ে রয়েছে। এই ভারতের বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে এক ঐক্যে বিধায়ক ভাবনার অস্তিত্বের সন্ধান নেহরুও পেয়েছেন। শঙ্করের মত তিনিও ভারত জীবনকে সেই মহান ঐক্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য হিমাচল হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত নিরন্তর প্রচারে ও পরিব্রজ্যায় জীবনের দীর্ঘকাল অতিপাত করেছেন। মহাকবির মন, শিল্পীর দৃষ্টি, বিজ্ঞানীর সন্ধিৎসা এবং সেবকের নিষ্ঠা নিয়ে ভারতের জওহর আজ বিংশ শতকের ভারতের চিন্তায় এক বলিষ্ঠ কর্মবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য সহস্র উদ্যম ও আয়োজনের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং আজ ভারতের ঐক্যের প্রতীক, তিনি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগসূত্রের প্রতীক, সংস্কৃতির জগতে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয়ের প্রতীক। তাঁর চিন্তারীতির মধ্যে ভবিষ্যতের ভারতের মানুষ জাতিরই অন্তরের আভাস পাই।

বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় নয় সপ্তাহের মধ্যে নেহরুকে ভারতে পঁচিশ হাজার মাইল ভ্রমণ করতে হয়েছিল, বিমানে, মোটর যানে, ট্রেনে এবং জলযানে। যাত্রা শুরু হয়েছিল হিমাচল থেকে এবং সারা ভারত পরিক্রমার পর তাঁর যাত্রা ক্ষান্ত হয়েছিল

হিমালয়েরই গুহানিঃসৃত স্রোতঃধারা রামগঙ্গার তটে ফিরে এসে। প্রায় তিনশত বৃহৎ জনসমাবেশের এবং অজস্র সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমাবেশের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। তা ছাড়া পথের দু'পাশে প্রতীক্ষমান হাজার হাজার জনসমাবেশের সম্মুখে এসে শুধু তিনি দর্শন দান করেছিলেন। মাত্র এই নির্বাচনী পরিক্রমা উপলক্ষেই তাঁকে ছত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় সাত কোটি ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসতে হয়েছিল। পৃথিবীর রাজনীতির ইতিহাসেও এই ঘটনাকে একটা 'রেকর্ড' বলা যায়, কারণ পৃথিবীর কোন কালে কোন রাজনীতিক নেতার পক্ষে জনজীবনের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভের এমন কৃতিত্বের নিদর্শন দ্বিতীয় আর পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ঘটনাকে কি নিতান্তই রাজনীতিকও বলা উচিত? নেহরু স্বয়ং এই ঘটনাকে তাঁর জীবনের একতীর্থ পরিক্রমার ঘটনা ব'লে বর্ণনা করেছেন। নয় সপ্তাহের মধ্যে দেশের সাত কোটি মানুষ নেহরুকে দেখেছেন এবং নেহরু দেশের সাত কোটি লোকের জীবনের রূপ দেখেছেন। নির্বাচন উপলক্ষে এইসব জনসমাবেশ হ'য়ে থাকলেও, এইসব জনসমাবেশের অন্তরের মধ্যে নির্বাচন অথবা রাজনীতির কথাগুলিই অবশ্য প্রধান কথা ছিল না। নির্বাচন এবং রাজনীতির অতিরিক্ত কিছু এর মধ্যে ছিল। নেহরু বলেন, তিনি ভারতীয় জনচিত্তের পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। এবং জনতার মনের কথা আমরা অনুমান করে নিতে পারি। জনতা নেহরুকে 'দর্শন' করে ধন্য হয়েছে। ভোটের ব্যাপার থাকলেও, ভারতের এই সাত কোটি নরনারী ও শিশুর চিত্তে নেহরুকে দেখবার স্পৃহাই যেন একটা ধর্মীয় স্পৃহার মত প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। নেহরুকে যাঁরা দেখেননি, তাঁদের অনেকেই নেহরু সমর্থিত কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছেন; তেমনি আবার যাঁরা নেহরুকে দেখে মুগ্ধ ও ধন্য হয়েছিলেন, তাদের অনেকে নেহরুর পক্ষে ভোট দেননি। ভোটতত্ত্ব ছিল গৌণ ব্যাপার, এবং মুখ্য ব্যাপার ছিল নেহরুর দর্শন।

সুতরাং প্রশ্ন ওঠে, নেহরুকে দর্শনের এই আগ্রহ ভারতের জনজীবনে বস্তুতঃ একটা পুণ্যকর্ম স্পৃহার মত স্বভাবসঞ্জাত আবেগে পরিণত হয়েছে কেন এবং কেমন করে? এই ঘটনা থেকে আমরা দুটি বস্তুর পরিচয় পাই। ভারতীয় জনচিত্তের প্রকৃতির এবং নেহরুর ব্যক্তিত্বের, উভয়েরই পরিচয় তথা স্বরূপ এই বিস্ময়কর 'দর্শন' তত্ত্বের মধ্যে নিহিত রয়েছে। মহাত্মা গান্ধীকে দর্শন করবার জন্যও এইভাবে জনতা ব্যাকুল হয়ে ছুটে আসতো। কিন্তু যিনি মহাত্মা নামে পরিচিত নন, যিনি রাজনৈতিক নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নামে পরিচিত, ধর্মজীবনের রীতি নীতি সম্বন্ধে যিনি কোন দিন উপদেশ প্রচার করেন নি, সেই নেহরুকে দর্শন করবার জন্য হিমাচল হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতীয় জনতার মনে এ হেন প্রবল অভিলাষের রহস্য কি?

ভিনসেন্ট শীয়ান জনৈক মার্কিন লেখক মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে একটা গ্রন্থ লিখেছেন ('লীড কাইণ্ডলি লাইট')। এই গ্রন্থে তিনি এই 'দর্শন' রহস্যের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। লেখক শীয়ানের মতে, ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে এই ভাবে দেশের এক ব্যক্তিকে শুধু ক্ষণিকের জন্য দর্শন লাভ করে ধন্য হবার জন্য ছুটে আসে, এই আগ্রহ বস্তুত একটা 'স্পিরিচুয়াল অ্যাক্ট' তথা আত্মিক পুণ্যকর্মের মত অনুষ্ঠান, যার ফলে দর্শকের চিত্ত অত্যদ্ভুত এক শান্তিরসে অভিষিক্ত হয়ে ওঠে। নেহরুর ভাষা যে বোঝে না, তার প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য বুঝে উঠবার মত শিক্ষা দীক্ষাও যার নেই, এমন ব্যক্তিও অন্তরের কি যেন কিসের

একটা ক্ষুধা মিটিয়ে নেবার জন্য তাঁর দর্শনের জন্য ছুটে আসেন। শীয়ানের ব্যাখ্যাত তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সত্যতা সম্বন্ধে বিচার করতে চাই না। রাজনীতিক নেতা নেহরুকে 'দর্শন' করে কোন দর্শকের চিত্ত দিব্য আশ্বাসে প্রসন্ন হয়ে ওঠে কি না, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে চাই না। বাস্তব ঘটনার দিকে তাকিয়ে শুধু এই সত্যই স্বীকার করবো যে, যেমন মহাত্মা গান্ধীকে দেখবার জন্য ভারতের জনতা ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে আসতো, তেমনি আজ দেখা যায় যে, নেহরুকে দেখবার জন্য জনতা ছুটে আসে। এই আগ্রহটাই বাস্তব ও সত্য, তার মূলে যা-ই থাক্। ভারতের পূর্ব সীমান্তের উপজাতীয় আরব ও মিশমি বৃদ্ধ দশদিন ধরে দুর্গম অরণ্য পথ অতিক্রম করে কেন যে নেহরুকে শুধু দেখবার জন্য বিমানক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েছিল এর উত্তর সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে একটা দুর্বোধ্যতা ও রহস্যের কিছু আছে, যার সহজ ব্যাখ্যাও এক কথায় হয় না। এই ঘটনার মধ্যে একটা সত্য অবশ্য খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা নেই। ভারতের জনতা নেহরুকে ভালবাসে, কারণ ভারতীয় জনতার মনে এই বিশ্বাস আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, নেহরু ভারতের জনতাকে ভালবাসেন এবং সেই ভালবাসার মধ্যে কোন খাদ নেই। তাই নেহরুকে দেখবার জন্য জনতার এই ব্যাকুলতাকে বস্তুত এক আপনজনকে দেখবার ব্যাকুলতা বলা যায়। এই হলো নেহরুর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠার আসল রহস্য। তিনি কার স্বার্থ কতটুকু উন্নত করতে পারলেন, তারই হিসাব দিয়ে আজ ভারতীয় জনতা তাঁকে বিচার করছে না। তাঁর মন ভারতের সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। জনগণের এই বিশ্বাসই আজ নেহরুকে ভারতের ইতিহাসে এক পথিকৃৎ লোকনায়কের ভূমিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্যক্তিগতভাবে নেহরুজীবনের শ্রেষ্ঠ সফলতাও এখানে। নেহরু তাঁর শক্তির সন্ধানও পেয়েছেন জনহৃদয়ের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রীতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগের মধ্যেই। এ বিষয়ে নেহরুর চিন্তার মধ্যেও কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি জানেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সরকারী মন্ত্রের চেয়ে জনচিত্তের এই সেই হার্দ্য পূরিত শ্রদ্ধা যা একটি জাতিকে আদর্শের পথে পরিচালিত করবার পক্ষে বেশি সহায়ক।

সমষ্টি-নেতৃত্বের প্রতিভূ : শাস্ত্রীজী

ভারতের রাজনীতিক আকাশপট হ'তে নেহরুর অন্তর্ধান ; এ ঘটনা নিশ্চয়ই এক জ্যোতিষ্কের অস্তগমন। নেহরুর চিন্তা, প্রতিভা ও যোগ্যতার প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব ভারতজীবনের ঐতিহাসিক পরিণামের একটি অধ্যায় রচনা করে চিরকালের বিদায় গ্রহণ করেছে।

অস্তাচলের দিকে তাকানার পর পূর্বাচলের দিকে তাকাতে পারা যায়। স্বাধীন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে যিনি আজ রাষ্ট্রিক নেতৃত্বের প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছেন, তাঁকে আজ অবশ্যই নেহরুর মত একটি জ্যোতিষ্ক বলে মনে হবে না। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, যিনি আমাদের নতুন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, তাঁর জীবনের ঘটনার ছবিটির দিকে একবার দৃক্‌পাত করলে মনে হবে, এ যেন 'ফ্রম লগ কেবিন টু হোয়াইট হাউস' ধরনের একটি গতি, প্রকৃতি ও পরিণামের ছবি। নিতান্ত নিম্নবিত্ত গরীবের ঘরের মানুষ লালবাহাদুর, রাজনীতির কাজের কাছে শুধু কর্মী হয়েই যাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে, বড়রকমের নেতৃত্বের পদে কিংবা মন্ত্রিত্বের পদে যাঁর আবির্ভাব বেশি দিনের ঘটনা নয়, এবং যিনি তাঁর চিন্তা প্রতিভা ও প্রকৃতিতে নেহরুর অনুরূপও নন, তিনিই নেহরুর

শূন্য আসন পূর্ণ করবার যোগ্যতম জন বলে বিবেচিত হয়েছেন। এই বিবেচনা কিন্তু কংগ্রেস নামক সেই রাজনীতিক দলেরই বিবেচনা, যে-দল ভারতীয় জনতার সর্ববৃহৎ নির্বাচনী সমর্থন লাভ করেছে।

নেহরুর শূন্য আসন পূর্ণ করা, ঘটনাকে এভাবে কল্পনা করলে কিন্তু ভুল করা হবে। কারণ, নেহরু ভারতীয় জনজীবনে শুধু প্রধানমন্ত্রীই ছিলেন না ; আরও কিছু ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর আসন ছাড়া আরও বৃহৎ একটি আসন তিনি শূন্য করে চলে গিয়েছেন। সুতরাং, এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সেই বৃহৎ আসনের শূন্যতাও পূর্ণ করেছেন। শ্রীনেহরুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এমন বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রেরণার নেতৃত্ব অন্তর্হিত হয়েছে, যেটা শাস্ত্রীজীর প্রতিভার কাছ থেকে আশা করবার কোন যুক্তি নেই, কারণও নেই। মনে হয়, শাস্ত্রীজীর প্রতিভার শক্তি, প্রভাব ও যোগ্যতা মোটের উপর ভারতের রাষ্ট্রিক কর্মপ্রবণতার মধ্যেই সীমিত হয়ে থাকবে।

যাই হোক, শাস্ত্রীজী যে দ্বিতীয় নেহরু নন, এটা আক্ষেপ করবার মত কিংবা হতাশ হবার মত কোন কারণ সৃষ্টি করছে না। বরং, এই ধারণাই করা উচিত হবে যে, শাস্ত্রীজীর নেতৃত্ব একটি নূতনত্বের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। নেহরু-ঐতিহ্য অটুট রাখবো এমন সংকল্প ও ঘোষণার একটা নৈতিক সার্থকতা অবশ্য আছে। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবে সম্ভব নয়। যে প্রতিভা বিশেষভাবে নেহরু-প্রতিভার অনুরূপ নয়, যে-ব্যক্তিত্ব বিশেষভাবে নেহরু ব্যক্তিত্বের অনুরূপ নয় ;তাদের কারও পক্ষে হুবহু নেহরু-ঐতিহ্য সঞ্জীবিত ও প্রচলিত করে রাখা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে একটা যোগসূত্র রাখা অবশ্য অসম্ভব নয়। তবু, এই যোগসূত্র সত্ত্বেও ঘটনা ও পরিবেশ ভিন্নতর রূপ গ্রহণ না করে পারবে না। শাস্ত্রীজীর নেতৃত্বের আবির্ভাব ভারতের রাষ্ট্রিক জীবনের চেষ্টা, কাজ ও চিন্তার মধ্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সঙ্কেত হয়ে দেখা দিয়েছে, বরং এই ধারণা করাই ঠিক।

কল্পনা করতে ইচ্ছা করে, কেমন হবে এই নতুন অধ্যায়ের রূপ? নেতারা কেউ কেউ বলছেন, ভারতের রাষ্ট্রিক জীবন এইবার সমষ্টিগত প্রতিভার নেতৃত্ব লাভ করতে চলেছে। যুক্তিটা এই যে, এতদিন নেহরু-প্রতিভার একক বিরাটত্ব নেতৃত্বের সব প্রয়োজনের দাবি পূর্ণ করে রেখেছিল। এখন সেটা আর সম্ভব নয়। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজী এখন সমষ্টিগত-নেতৃত্বের প্রধান।

এটা একটা ইচ্ছা কিংবা আশার দাবি হতে পারে। সদিচ্ছা এবং ভাল আশার দাবি। কিন্তু এর মধ্যে কিছুটা ভাবের ঘরে চুরির ব্যাপারও থাকতে পারে। গান্ধী-নেতৃত্ব ও নেহরু-নেতৃত্ব উভয়ই ছিল উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিনায়কতার ব্যাপার। কংগ্রেস দলের পক্ষে সমষ্টিগত বিজ্ঞতা ও বিবেচনা নিয়ে নেতৃত্ব করবার অভিজ্ঞতা নেই, যদিও একথা সত্য নয় যে, গান্ধী ও নেহরু প্রতিভা ষোল-আনা ডিক্টেটর হয়ে নেতৃত্ব করেছে। কিন্তু পুরোপুরি সমষ্টিগত যোগ্যতা ও বিজ্ঞতার পরীক্ষা হয়ে কংগ্রেসী সাধারণ্যের সম্মুখে কোন ঘটনা বা পরীক্ষা দেখা দেয়নি। ঐতিহ্য এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সহায়ক নয় ; সংস্কারও অভ্যস্ত নয়।

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই, এই পরীক্ষাকে স্বাগত করে নেবারই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মনস্তত্ত্বের পরিভাষাতে মেগালোমেনিয়া (Megalomania) নামে একটা কথা আছে। আকারে ও প্রকারে নিছক বৃহত্ত্ব যেন সবচেয়ে বড় গুণের প্রমাণ। যে দেশের মানুষ ডিক্টেটরী শাসন মেনে নেয়, তাদের মানসিক চরিত্রটি এই মেগালোমেনিয়ার দাস। ভারত-

ইতিহাসের পক্ষে নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের ব্যাপার হবে, যদি নিছক বৃহত্ত্বের প্রতি একটা পূজকতার ভাব জনতার মনোভাব অভিভূত না করে। উপনিষদের কথা আছে—সমষ্টিমহৎ হিরণ্যগর্ভ। এই কথার গভীর তাত্ত্বিক তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, সাধারণ যুক্তির বিচার নিশ্চয় বুঝে নিতে পারবে যে, জ্ঞানেরও একটি সমষ্টিমহৎ রূপ আছে। আশা করতে অসুবিধে নেই যে, ভারতের গণতন্ত্র সমষ্টিমহৎ নেতৃত্বের পরিচালনা লাভ করলে তার পরিণাম ভারত-জীবনের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভাবহ হবে।

আশা করতে ইচ্ছা করে, সমষ্টিমহৎ হবার নামে বৃহত্তম রাজনীতিক দল কংগ্রেস নিজেকে নিছক কলোসাস করে তুলতে চাইবে না। পৃথিবীর রাজনীতিক ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়, যেখানে দেখা গিয়েছে যে, দলীয় আধিপত্য ও শক্তিকে কলোসাসে পরিণত করবার জন্যেই দলের ভিতরে চমৎকার ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দলের পক্ষেই জনজীবনের নিরঙ্কুশ ডিক্টেটর হবার, আর গণতন্ত্রকে বিকল করে দেবার ভয় থাকে। চেম্বারলেন ইতালীয় ফার্সিস্তির প্রশংসা করেছিলেন। মুসোলিনীর ডিক্টেটরী শাসনের সুফল সম্পর্কে প্রশস্তি করতে গিয়ে এমন কথাও বলা হয়েছিল : ইতালীর জীবনে এই প্রথম দেখা গেল যে, ট্রেনগুলি ঠিক সময়ের অনুবর্তী হয়ে যাওয়া-আসা করছে। ক্ষমতার কলোসাস জনকল্যাণের কাজও করে থাকে ; কিন্তু সে জন্য নিশ্চয় মনে করা উচিত হবে না যে, ফার্সিস্তির মত নিরেট দলীয় সংহতির দ্বারা ক্ষমতার কলোসাস হওয়া মানেই সমষ্টিমহৎ হওয়া। কংগ্রেসের সুসংহতি ও সমষ্টিপ্রধান নেতৃত্বের মধ্যে ভয়ানক কিছু সন্দেহ করবার মত কোন কারণ দেখা দেবে না বলেই মনে হয়, যদিও নেপথ্যে কিছু শঙ্কাময় সম্ভাবনার ছায়া দেখা দিতে পারে।

তাই আক্ষেপ করবার কোন মানে হয় না যে, আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিত্বের একজন টাইটান নন। তিনি গরীব-ভারতের একটি সাধারণ ঘরের মানুষ। দুঃখের ও অভাবের রূপ, দুঃখী হবার দুঃখ, কোনটিই তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতার বাইরের সত্য নয়। কিন্তু তবু শুধু এই অভিজ্ঞতাই নিশ্চয় তাঁর নেতৃত্বের শক্তি হয়ে উঠতে পারে না। তিনি যে চরিত্রের অধিকার লাভ করেছেন, সেটাই হবে তাঁর নেতৃত্বের শক্তি। জন বানিয়ান তাঁর 'পিলগ্রিমস্ প্রগ্রেস' গ্রন্থে যে-সব চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে নিষ্ঠাশীল তথা সিনসিয়ার (Sincere) হলেন একটি ব্যক্তি। শ্রীসিনসিয়ার একজন মেষপালক। শ্রীসিনসিয়ার, জীবনের রূপে তিনি একটি সামান্য ও শান্ত দীনজন মাত্র, কিন্তু চরিত্রে শ্রেষ্ঠ শক্তিমান। আমাদের নতুন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীকে জন বানিয়ানের কল্পনার 'সিনসিয়ার' ব্যক্তিটির সঙ্গে তুলনা করা যায়। আন্তরিকতার মানুষ, নিষ্ঠার মানুষ শাস্ত্রীজী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি নূতন শক্তির ব্যক্তিত্ব হয়ে দেখা দেবেন, এটা আশা করা যায়। তা না হলে তাঁর পক্ষে সমষ্টি প্রভাবের একটি ক্রীড়নক হয়ে পড়তে হবে, এবং সেটাও নিশ্চয় নেতৃত্বের সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে একটা কাম্য অবস্থা নয়।

সমষ্টিনেতৃত্বের প্রতিভূ হওয়া, মনে হয়, এটাই নতুন প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর প্রতিভার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা। ভারতের রাজনীতিক জীবন ব্যক্তিপ্রধান নেতৃত্বের অধ্যায় থেকে সমষ্টিপ্রধান নেতৃত্বের অধ্যায়ে উত্তীর্ণ হতে চলেছে। এই পরিবর্তন জাতির পক্ষেও একটি দুরূহ ঐতিহাসিক পরীক্ষা।

পথ রথ ও সারথি

(শাস্ত্রীজির মৃত্যু ও ভবিষ্যৎ ভারত)

চল-জীবনের যাত্রা নিশ্চয় ছন্দ হারাবে, পদে পদে বাধা পেয়ে ব্যাহত হবে ; এবং অচল হয়ে যেতেও পারে, যদি পথ রথ ও সারথির কোন একটির রূপ গুণ ও প্রকৃতিতে ত্রুটি থাকে। পথ ভাল, কিন্তু রথ ভাল নয় ; অবস্থাটা সফল যাত্রার অঙ্গীকার বহন করে না। রথ ভাল কিন্তু পথ খারাপ, এই অবস্থার মধ্যেও কোন ভরসার সুস্পষ্ট সঙ্কেত নেই। এবং সারথি যদি অযোগ্য হন, তবে তো কথাই নেই। ভাল পথ ও ভাল রথ সত্ত্বেও যাত্রা সফল হবার সম্ভাবনা ক্লিষ্ট হয়ে যায়। কোন জাতির পক্ষে ঘটনাকে অবশ্যই অতিবিরল সৌভাগ্যের কীর্তি বলে মনে করতে হবে, যদি দেখা যায় যে, সে জাতি তার জীবনের যাত্রায় যোগ্য পথ রথ ও সারথিকে পেয়েছে। মানুষের ইতিহাস কিন্তু বিশেষ একটি দুঃখের ক্ষতচিহ্ন যুগ যুগ ধরে বহন করেছে। একই সঙ্গে ওই তিন শুভ সংঘটনার সমাবেশ কোন জাতির অদৃষ্টে সম্ভব হয়নি। আশার নবযুগ, কৃতিত্বের রেনেসাঁস আর বৈপ্লবিক অভ্যুদয় বলে আখ্যাত হয়ে যে সব ঐতিহাসিক রূপান্তর বহু জাতির জীবনের যাত্রার কোন না কোন অধ্যায়ে সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যেও অজস্র রিক্ততার দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে আছে। পথ রথ ও সারথি সবই সুষ্ঠু সুযোগ্য ও নির্ভুল হয়েছে, ইতিহাসে এমন নিখুঁত প্রাপ্তির ঘটনা পাওয়া যাবে না। কিন্তু দেখা যায়, সারথিকে, তথা নেতৃত্বকে একটি সুষ্ঠু পূর্ণতার রূপে জাতি ও সমাজের জীবনে আহ্বান করবার জন্যে মানবিক সংসারের আকাঙ্ক্ষা ম্রিয়মান হয়ে যায় নি। রাজনৈতিক সামাজিক ও দার্শনিক বিজ্ঞেরা যোগ্য নেতৃত্বের সংজ্ঞা ও পরিচয় নির্মাণ করেছেন। ব্যক্তির বা সমষ্টির সেই কৃতিত্বই মহৎ নেতৃত্ব বলে স্বীকৃত হয়েছে, যার অধ্যবসায়ের কাছে পথ ও রথের ত্রুটি কোন বাধা হয়ে উঠতে পারেনি। পথ কঠিন ও রথ দুর্বল, তবু সারথি তাঁর প্রতিভার গুণে চলজীবনের অভিযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন ; সামাজিক মানবের এই আশাই অনেক যুক্তি-তর্ক দিয়ে লীডারশিপের একটি পরিচয় সৃষ্টি করেছে। প্রাচীনের চিন্তা অবতার কল্পনা করে যে নেতৃত্বের প্রকাশ আশা করেছিল, আধুনিকের ধারণার লীডারশিপও কতকটা সেই ধরণের চিন্তার দাবি। কিন্তু এই চিন্তার ভুল ধরে লাভ নেই। জাতি তাকেই নেতা বলে মনে করবে, যাঁর কাছে পথের কঠিনতা অথবা রথের দুর্বলতা কোন অভিযোগ নয়। নেতৃত্ব বস্তুত আশা ও প্রতিজ্ঞার একটি মূর্ত শক্তি। ঐতিহাসিক ডক্টর যদুনাথ সরকার শিবাজীর নেতৃত্বের উদ্ভব ও বিকাশের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই সত্যেরই সন্ধান পেয়েছেন—পরিবেশ যেখানে বাধা ও বিরুদ্ধতায় পরিকীর্ণ ; উপচার ও উপকরণ যেখানে সামান্য ঠিক সেখানেই প্রেরণা শক্তি ও বিশ্বাসের জাগৃতি সম্ভব করাই প্রকৃত নেতৃত্বের কীর্তি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর মৃত্যুতে জাতির মন ব্যথিত হয়ে এই কথাই ভেবেছে, সত্যিকারের একজন নেতা চলে গেলেন। কেন এবং কিসের গুণে তিনি সত্যিকারের নেতা বলে স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছেন, এই প্রশ্নে সকলের জবাব একই কথা নিশ্চয় বলবে না। প্রধান বিচারপতি বলেছেন, একজন খাঁটি প্লেবিয়ান সাধারণের প্রতিনিধি মানুষ, যাঁর সততা সম্পর্কে সামান্য সন্দেহের ফিসফাসও কোথাও শোনা যায়নি, এহেন একজন নেতাকে আমরা হারিয়েছি। প্রধান বিচারপতির কথাগুলি বস্তুত শ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব-গুণের পরিচয় প্রকাশ

করেছে। বলা বাহুল্য, কথাগুলি নেতৃত্বের কীর্তির পরিচয় নহে। এবং কোন সন্দেহ নেই; জাতির পক্ষে আশ্বস্ত হবার সব চেয়ে বড় বিষয় : নেতার সততা। এবং জাতির পক্ষে নেতাকে আপন-জন বলে মনে করতে পারা আরও একটি সৌভাগ্য। দেশের সাধারণ মানুষ শাস্ত্রীজীকে সাধারণেরই মত একজন বলে বিশ্বাস করতে পেরেছে, এটা ভারতীয় জাতির পক্ষে নিশ্চয় একটি নূতন প্রেরণা। পাইথাগোরাসের মতে, অ্যারিস্টোক্রেসির প্রকৃত অর্থ শ্রেষ্ঠের শাসন। কিন্তু পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, অ্যারিস্টোক্রেসির নামে নিতান্ত অশ্রেষ্ঠজনের ক্ষমতা ও আধিপত্যে জনজীবন শাসিত হয়েছে। সাধারণের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মমতার সম্পর্ক নেই, এহেন অভিজাতের শাসন বড় বড় নৈতিক আদর্শের আগ্রহ নিয়েও জাতির পক্ষে ঠিক আপনজনের শাসন বলে বোধ হয়নি। পাইথাগোরাসের কল্পিত অ্যারিস্টোক্রেসী যদি সত্যই শ্রেষ্ঠের সমাবেশ হতে পারেও, তবু তার মধ্যে জনসাধারণের আত্মসম্মানের কোন প্রতিশ্রুতি নেই। শাস্ত্রীজীর নেতৃত্বের মধ্যে জাতি ঠিক এই প্রতিশ্রুতির আভাস পেয়ে সুখী হয়েছিল। এই বুঝতে অসুবিধে নেই, তাঁর মৃত্যুতে ভারতের সাধারণ মানুষের বেদনা কেন এত অশ্রুসজল হয়েছে।

নেপলিয়ন সম্পর্কে ইংলণ্ডের পিট-এর উক্তিটি নিশ্চয় প্রশস্তি নয়। 'এক কলোসাস পৃথিবীর বুক মাড়িয়ে দিয়ে চলেছে'—এই উক্তি নেপলিয়নের নেতৃত্বের অভিনন্দন নয়। বরং বলা যায়, নিরেট এক শক্তিধরের পরাক্রমের প্রতি অসহায় বিস্ময়ের বিলাপ। কিন্তু আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ইংলণ্ড তার নিজের দেশের শূর ও বীরের কাছ থেকে ঠিক এই ধরনের পরাক্রমের প্রকাশ আশা করেছে। নেতৃত্বকে নিছক শক্তির দাপট ও চমৎকারিতা বলে মনে করতে পাশ্চাত্য ডেমোক্রেসীর চিন্তাও কম প্রলুব্ধ হয়নি। আধুনিক ভারতের পক্ষে এ ধরণের নেতৃত্ব আশা করবার দরকার হয়নি। এমন ভুল আশাও ভারতের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করেনি। শাস্ত্রীজীর জনপ্রিয়তা বরং প্রমাণিত করে যে, নেতৃত্বের মধ্যে উদ্ধত শক্তির চমৎকারিতা দেখবার জন্য ভারতের জনচিত্তে কোন আগ্রহ নেই। শাস্ত্রীজী কোন কিছুরই কলোসাস ছিলেন না; এবং সে জন্যে ভারত এতটুকুও দুঃখিত হয়নি। ওই ছোট্ট মানুষটিরই প্রকৃতিতে অসাধারণ এক শান্ত শৌর্যের যে পরিচয় দেশবাসী পেয়েছিল, সেটাই দেশবাসীর পক্ষে তার আত্মসম্মানের দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি হয়ে দেখা দিয়েছিল। এইচ জি ওয়েলস তাঁর বিশ্ব-ইতিহাস গ্রন্থে ফ্রান্সের জোয়ান অব আর্কের সমকালীন এক লেখকের লেখা থেকে একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন : জোয়ানের নেতৃত্ব দেখা দেবার আগে ফ্রান্সের অবস্থা এই ছিল যে, এক হাজার ফরাসী সৈনিক একশত ইংরাজ সৈনিককে দেখলে পিছনে হটে যেত। জোয়ানের পরের ফ্রান্সে অবস্থাটা এই যে, একশত ফরাসী সৈনিককে দেখতে পেলে এক হাজার ইংরাজ সৈনিক পালিয়ে যায়। ফরাসীর আত্মশক্তিতে তার প্রত্যয়ের এই নতুন জাগৃতিই সেই জোয়ান অব আর্কের নেতৃত্বের একটি সফলতা। তুলনার প্রয়োজন হয় না; শুধু বলা যেতে পারে শাস্ত্রীজীর দেড় বছরের নেতৃত্বের একটি দুর্লভ সুফল এই যে, সাধারণ ভারতীয়ের মন নিজের শক্তির কিছু পরিচয় পেয়েছে। সে শক্তির রূপ ও মাত্রা যাই হোক না কেন, দেশবাসী নিজের সম্পর্কে আর সেই ভয়ানক বিষণ্ণতায় অভিভূত নয়, যে বিষণ্ণতা স্বাধীনতার পরেও দীর্ঘকাল ধরে জাতিকে পীড়িত করে চলেছিল।

কাথত আছে, স্পার্টার বীর লিওনিডাস তাঁর সৈনিকদের মাঝখানে থাকতেন, আগে নয়, পিছনেও নয়। হয়তো বিশেষ কারণে ও বিশেষ অবস্থায় রণক্ষেত্রের ঘটনার দাবি সেই বীর নেতার নেতৃত্বকে সেনা-জনতার মাঝখানে ঠাঁই নিতে বাধ্য করেছিল। জাতির গণতন্ত্রের

জীবনও এই দাবি করে ; নেতা বস্তুত জাতির জীবনের মাঝখানে থাকবেন। কারণ মানব-সভ্যতার সেদিন আর নেই, যেদিন রাজা ছিলেন নরোত্তম ; শিক্ষা দীক্ষা ও প্রতিভায় প্রজা-জনতার চেয়ে অনেক আগে। আজকের নেতার পক্ষে তাই ঠিক শুধু আদেশের ঈশ্বর হয়ে এবং অতি প্রভু হয়ে জনতার আগে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। আধুনিক সাধারণ মানুষও শিক্ষিত, এবং সকল কাজে জাতির সাধারণের ইচ্ছা আগ্রহ এবং পরামর্শ নেতার ও নেতৃত্বের প্রয়োজন। কোন কোন ঘটনায় দেশবাসীর মনে হয়েছে, শাস্ত্রীজী নেতা হয়েও যেন জনতার মাঝখানে থাকতে চান। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণের সৌজন্য ও নম্রতা লক্ষ্য করে অনেকেরই মনে হয়েছে—তিনি আমাদেরই লোক এবং আমাদেরই সবাকার মাঝখানে আছেন।

একটা সমালোচনার কথা শোনা যায়, ভারতীয় নেতাদের অনেকের প্রকৃতিতে যেন মিশনারী-ভাব একটু বেশী মাত্রায় বিদ্যমান। নেতৃত্ব করতে গিয়ে, অনেকে দেশের মানুষের কাছ থেকে বড় বেশী শুচিতা দাবি করে থাকেন। এটা দেশপ্রীতি বটে ; কিন্তু নেতৃত্বের পক্ষে এ ধরণের দাবিটাই প্রধান হয়ে উঠলে সেটা একটা করুণ ও কুষ্ঠিত নেতৃত্বের শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। শাস্ত্রীজীর অল্পকালীন নেতৃত্বের মধ্যে অন্তত এটুকু লক্ষ্য করতে হয়েছে যে, তিনি সাধারণ দেশবাসীর চেতনা কল্পনা ও অভিরুচির একটা পরিশুদ্ধি সম্ভব করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেননি। রিফরমিস্টের তাগিদ নিয়ে তাঁর নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করতে চায়নি। তিনি জাতির সাধারণ অভাব দৈন্য ও অপূর্ণতার প্রতিকার আগে চেয়েছেন।

জার্মানীর পৌরাণিক কাহিনীতে সিগফ্রিড নামে এক বীর যোদ্ধা আছেন। নাৎসীর যুদ্ধবাদ অবশ্য এই নামটিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সামরিকতার দুর্ধর্ষ ব্যূহরেখার নাম রেখেছিল। কিন্তু এটা ওই নামের অপব্যবহার বলা যায়। সিগফ্রিড বস্তুত শান্তির যোদ্ধা। শাস্ত্রীজীর সম্পর্কেও বলা যেতে পারে তিনি ছিলেন, শান্তিরই যোদ্ধা। তিনি শান্তির সম্মানকেই পরাভব থেকে রক্ষা করতে চেয়েছেন। এবং সেই কর্তব্যে তিনি মিথ্যা কুণ্ঠাকে তুচ্ছ করে শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। নেতৃত্বের এক কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এই নেতৃত্বের মূল্য ও মর্যাদা দেশের মানুষ উপলব্ধি করেছে।

শিল্পী শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিচার করবার আগে মনের ভেতর একটা অভাবের বেদনা যেন নিজের থেকে ডাক দিয়ে বলে যায় যে, আধুনিক যুগের বাংলা দেশে যদি 'আপন ঘরের' কথাশিল্পী কেউ ছিলেন, তবে একমাত্র তিনিই ছিলেন। শরৎচন্দ্রই প্রথম কথাশিল্পী যিনি দেশীয় বাংলার অন্তরের ভাঙাগড়ার রূপ, গ্লানি ও মহিমার রূপ, বন্ধন ও মুক্তির রূপকে নিতান্ত বাস্তব কাহিনীর মাত্রার মধ্যে রেখেও বিশ্বাত্মিক জীবনের রূপেকাবোধ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ইংরাজী সভ্যতা ও শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার যে সুযোগ অথবা দুর্যোগ আমাদের হয়েছে, তার ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের সকল প্রয়াসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে এবং কোথাও বা প্রকটভাবে একটা কৃত্রিমতা থেকে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আমরা খানিকটা বক্তব্যভ্রষ্ট হয়ে এবং লক্ষ্যহীন ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে থাকি। যা বলবার দরকার ছিল না, তাই বলি। যে সমস্যা আমাদের মধ্যে নেই, সেই সমস্যার অকথ্য বিস্তার ও বিবরণ আমাদের হালের যুগের কথাসাহিত্যে পাওয়া যায়। ঠিক তেমনিভাবে, যেকথা

সব চেয়ে বেশী বলার ছিল, যে সমস্যা ও দ্বন্দ্ব অহরহ আমাদের চেতনাকে বিব্রত করছে, এবং যে চেতনা আমাদের মধ্যে প্রকাশ ও মুক্তি খুঁজছে, সেই সব জীবন্ত প্রশ্নকে আমরা ভুলক্রমে এড়িয়ে যাই। আমাদের মন অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ না হয়ে তর্জমাপ্রবণ হয়েছে। কথাসাহিত্যের নামে আমরা যেন কতগুলি বিবরণ নানা ঢঙে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টার ব্যর্থতা চোখের সামনে দেখেও হয়তো আমরা সাবধান হই না।

শরৎচন্দ্র প্রথম আমাদের দাবী পূর্ণ করলেন সত্যিকারের ঘরের গল্প ও কাহিনী বলে। তাঁর লেখা পড়লেই প্রথমেই এই বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। জীবনের আঙিনায় এসে তিনি সবার আগে কাহিনীকেই দেখতে পেয়েছেন এবং আইডিয়া পরে। তিনি নিছক মন হাতড়ে কাহিনী টেনে আনার চেষ্টা করেন নি। বাইরের আলো-অন্ধকারের মধ্যে, জীবনের সকল দ্বন্দ্ব ও সৃষ্টির হর্ষ শোক ও বেদনাকে তিনি আগে চোখ মেলে দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে বুঝেছেন, তারপর সেই পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গ ইতিহাসের এক একটি খণ্ডকে তিনি ব্যক্ত করেছেন। শিল্প-সৃষ্টির এই সকল ও স্বাভাবিক পদ্ধতি শরৎচন্দ্রের মধ্যে যতখানি সফল হয়েছিল, আধুনিক কালের কোন লেখকের মধ্যে ততটা হয়নি। জীবনের সত্যকে উদ্দেশ্য করে আমাদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্রই বলতে পারেন—'ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি পশেছে জীবনমূলে।'

হ্যাঁ, এই কথাই ঠিক। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের চশমা দিয়ে নয়, ভ্রাম্যমান রিপোর্টারের হৃদয়হীন নিরপেক্ষতা দিয়ে নয়, কোন সমাজ সংস্কারকের জেদ বা গোঁড়ামি দিয়ে নয়, প্রকাণ্ড আদর্শবাদের সুউচ্চ ঘোষণা দিয়ে নয়, শরৎচন্দ্র জীবনকে উপলব্ধি করেছিলেন সুরকারের মত। তাঁর চারদিকের সুখ-দুঃখের পৃথিবী ও মানুষের যে সুর ও ছন্দ তিনি অনুভব দিয়ে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, তাকেই তিনি কাহিনী সঙ্গীতের মত পরিবেশণ করেছেন। তিনি কখনো জোর করে বলতে পারেননি এবং বলেন নি যে, এটা সৎ, ওটা অসৎ। এই বিশুদ্ধ তাত্ত্বিকতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর নায়ক নায়িকারা রূপেগুণে আমাদের অতিপরিচিত দশজনের মতই, যাদের আমরা অন্তঃপুরে পাই, পুকুরঘাটে পাই, ক্ষেতে খামারে আফিসে মন্দিরে ও মঠে দেখতে পাই। আমাদের মত দশজনের দিনরাত্রির ঘরোয়া জীবনকে তিনি শুধু কাহিনীর পটে সাজিয়েছেন। এই সাজাবার গুণে তার মধ্যে যে সমগ্রতার বৈভব জেগে উঠেছে, সেটাই সব চেয়ে বড় সৃষ্টি। এক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র কৃতী শিল্পী।

আগে আইডিয়া পরে কাহিনী, আগে তত্ত্ব পরে তার রূপ, আগে চিন্তা পরে তার অনুষঙ্গ সৃষ্টি—এই ধরণের উল্টোপথে শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন চালিত হয়নি। কাহিনীর প্রাচুর্যে জীবন ভরপুর হয়ে, বিচিত্র অস্থিরতায় কোটি কোটি পরিদৃশ্য সৃষ্টি করে, জন্ম লয় উত্থান মিলন ও রূপান্তরের এক নিত্য বহমান স্রোতের মত চলেছে। এর সমগ্রতার বিবরণ দেওয়া কোন শিল্পী বা পণ্ডিতের পক্ষে সম্ভব নয়। তত্ত্বের ক্ষেত্র তাই সীমাবদ্ধ। তাত্ত্বিকের শক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু শিল্পীর শক্তি সীমাবদ্ধ নয়, কারণ শিল্পী বিবরণ দেন না। সমগ্র জীবনের একটি খণ্ড রূপের যে-ছবি শিল্পী সৃষ্টি করেন, তার তাৎপর্য্যটি খণ্ড নয়, সেটা সমগ্রতারই আভাষ। শ্বশুরবাড়ী যাত্রায় পাল্‌কির জানালা দিয়ে নববধূর চোখে একফোঁটা জলের যে রূপ দেখা দিল, সেই রূপটাই আমাদের বাস্তব সম্পদ, শিল্প ও সাহিত্যের রং। এর তত্ত্ব, এর ক্লাসিক মাহাত্ম্য থাকুক গবেষকের মস্তিষ্কে, সেটা বুদ্ধিবাদের অন্তর্গত জিনিষ, শিল্পের আঙিনায় তার স্থান নেই : বুদ্ধি দিয়ে শিল্পকে বিচার করা যায়, কিন্তু উপভোগ করা যায় মাত্র হৃদয় দিয়ে।

একটি খণ্ডরূপকে যিনি রসোগুণে পূত করে সাজিয়ে দিলেন, তিনি জীবনের অখণ্ড রূপকেই ব্যক্ত করলেন। এই জীবনের অখণ্ডতা উপলব্ধি করা যায় একমাত্র হৃদয় দিয়ে, শিল্পীর সৃষ্টির প্রসাদে।

শরৎচন্দ্র আমাদের সেই শিল্পের ডালি দিয়েছেন, যা সর্বজন উপভোগ্য। তাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে আমরা 'আপন ঘরের' সাহিত্য বলেছি! এই দিক দিয়ে তিনিই প্রথম।

শরৎচন্দ্রের সমস্ত লেখার দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ করা যায়। প্রথম দিকের রচনা এবং শেষ দিকের রচনা। এই দুই বিভাগের রচনার রীতিনীতি ও বক্তব্য এবং কলাগত রূপ লক্ষ্য করলে মনে হয়—দুই ভিন্ন লেখকের রচনা। উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়ে গেছে। পল্লী সমাজ ও গৃহদাহের মধ্যে যে আর্টিষ্টের কৃতিত্ব সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় বিভাগের রচনায় তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে শরৎচন্দ্র আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেছেন। অবশ্য কাহিনীকার এবং চরিত্রস্রষ্টা হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব এখানেও অটুট আছে। এখানে সামাজিক উপদেষ্টা এবং বিচারক শরৎচন্দ্রই বড়, সেই সুরকার ও আবিষ্কারক শরৎচন্দ্র আড়ালে সরে রয়েছেন। কাহিনীর মধ্যেও পূর্ব্বেকার মত ঘটনাপ্রধান সৃষ্টি নেই, আখ্যানভাগ সংলাপে প্রবল হয়ে উঠেছে। এই টেকনিকের হাত বদল হওয়ায় আমরা তাঁর কাছ থেকে নতুন কতগুলি উপহার পেয়েছি, কিন্তু সম্পদ পাইনি। ভাষা কত প্রাঞ্জল হয়েও ঐশ্বর্য্য পূর্ণ হতে পারে, শরৎচন্দ্রের শেষ দিকের রচনা তার প্রমাণ। স্রোতস্বতীর মত তাঁর ভাষা যেন নানা রোল ছড়িয়ে, ছন্দে বিভঙ্গে গড়িয়ে চলে, মাঝে মাঝে এক একটি ঘটনার বাঁকে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, প্রপাত সৃষ্টি করে। কিন্তু আগের মত কাহিনীও সঙ্গে সঙ্গে তট সৌন্দর্য্যের বৈচিত্র্য নিয়ে এখানে সগৌরবে বিস্তারিত হতে পারেনি।

এর কারণ, শেষের দিকে এসে শরৎচন্দ্র তাঁর পরিণত চিন্তার কিছু প্রসাদ বা আইডিয়া আমাদের দিতে চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্য স্থির করেছিলেন। বহু অভিজ্ঞতায়, প্রত্যক্ষ পরিচয়ে, জীবনের সমস্যা বহুলতার মধ্যে তিনি শেষ প্রশ্ন বেছে নিয়ে উত্তর দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নায়ক-নায়িকার জীবনের রূপের মধ্যে শরৎচন্দ্র তাঁর আইডিয়াকে উৎকীর্ণ করেননি, নায়ক-নায়িকার মুখ দিয়ে আইডিয়ার কথা বলিয়েছেন। তিনি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে, তাঁর এই দ্বিতীয় প্রয়াস হয়তো নতুন শিল্পগৌরবে এবং রসপ্রাণ হয়ে অতুলনীয় একখানি উপন্যাসের রূপে দেখা দিত।

শরৎচন্দ্রের মন সংস্কারক না বৈপ্লবিক?

শিল্পী হিসাবে তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন। কতগুলি সমাজব্যবস্থার তিনি প্রতিবাদ করেছেন, শুধু এই জন্যই তিনি বৈপ্লবিক নন। সমাজব্যবস্থার রদ-বদল অনেকেই কামনা করেন, সেই কারণে তাঁরা সকলেই বিপ্লবী মনের মানুষ নন।

শুধু সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নয়, সামাজিক সদ্বস্তু (Values) বলতে আমরা যা বুঝি, সেই সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের মন কিভাবে সাড়া দিয়েছিল, আসল বিচার্য্য তাই। বর্ত্তমান সামাজিক নীতিতে আমরা প্রেম নিষ্ঠা মহত্ত্ব ইত্যাদি বলতে যা বুঝি শরৎচন্দ্র তা মানতেন কি না? এইসব সদ্বস্তুর একটা চিরকেলে রূপ তিনি মানতেন কি না? যদি না মেনে থাকেন, তবেই তিনি বৈপ্লবিক।

স্বীকার করতেই হয়, তিনি তাঁর চিন্তায় ও হৃদয়ে এই বড় বিপ্লবী শক্তি লাভ করেছিলেন। নরনারীর প্রেমের এত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে কোনটা ভাল

কোন্‌টা মন্দ, নিঃসন্দেহ হয়ে কেউ জোর গলায় বলতে পারে না। অভয়া দিদির সিঁথির সিঁদুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি টেনে নিয়ে গেলেন, এক মুহূর্তে দেখিয়ে দিলেন প্রেম ও প্রণয়ের এক নতুন সংজ্ঞা। যে ভূমিকার ওপর আমাদের সকল প্রত্যয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তিনি মাঝে মাঝে সেই স্থিরতাকে রূঢ়ভাবে চম্‌কে দিয়েছেন। তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, এই স্থিরতার কোন মূল্য নেই। 'এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবই'—সমাজ ও সামাজিকতা বন্ধনের মধ্যে সার্থক নয়, প্রেম প্রণয় শোক ও কামনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, সেবা ও নিষ্ঠার কোন একটা কথা দিয়ে বাঁধা রূপ নেই। এরা পরিবর্ত্তনের ধর্ম্মে দীক্ষিত। সেই পরিবর্ত্তনকে মেনে নেওয়াই সুস্থ জীবনের নিয়ম।

শিল্পী শরৎচন্দ্রের রচনায় আমরা বার বার এই সত্যের সাক্ষাৎ পাই।

শরৎ-মানস

মাঝে মাঝে দেখতে পাই, কোন এক সমালোচক শরৎ-সাহিত্যের জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক কথা বলছেন। জানি না, কোন সমালোচক শরৎ-সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশুদ্ধ ও আদর্শোচিত প্রতিচ্ছবি বলে অভিহিত করেছেন কিনা। একদা সমালোচনার ক্ষেত্রে এই ধারণার প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল যে, দেশ ও জাতির সামাজিক অথবা রাজনীতিক কিংবা অর্থনীতিক কোন অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসের ভাবানুপ্রাণিত প্রতিবেদন হলো সার্থক 'জাতীয়' সাহিত্যের পরিচয়। আজও বোধ হয় সমালোচক অথবা সাহিত্যরসিক সমাজের সকলে মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর ব্যাখ্যাত নীতি অনুযায়ী 'জাতীয়' সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে চাইবেন না। কিন্তু মনে হয়, মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর বিচারিত অভিমত মান্য করে নিয়ে এই সাধারণ সত্যটি স্বীকার করা যায় যে, দেশপ্রেমের প্রেরণা সঞ্চারিত করবার কাব্য-কাহিনীই সার্থক 'জাতীয়' সাহিত্যের নমুনা নয়। অন্য লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনা না করে শরৎচন্দ্রের নিজেরই রচনার দুই নমুনার মধ্যে তুলনা করে বলা চলে যে, 'পথের দাবী'র তুলনায় 'পল্লীসমাজ' জাতীয় সাহিত্যের গুণ লক্ষণ ও তাৎপর্য বেশী বহন করে। কিন্তু প্রশ্ন করে ও বিচার করে বুঝবার প্রয়োজন হয়, শরৎচন্দ্রের মন ও কালিকলমের কোন্ কৃতিত্বে তাঁর রচিত সাহিত্যকে সত্যিকারের এবং সার্থক 'জাতীয়' সাহিত্য হিসাবে গুণান্বিত করেছে।

একটি সত্য স্বীকার না করলে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কথা-সাহিত্যের আঙ্গিক সৌকর্য এবং মর্মগত অনুবেদনার যথার্থ নির্ণয় সম্ভব হতে পারে না। স্বীকার করতে হয় যে, ঐ কালের মধ্যে বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে এমন কিছু অতি সুফলপ্রসূ প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাদের পক্ষে যথার্থ 'জাতীয়' সাহিত্যের মহৎ দৃষ্টান্ত বলে দাবি করবার কোন যুক্তি নেই, অথচ সাহিত্য হিসাবে তাদের অন্য আবেদন ও মনোজ্ঞতার যথেষ্ট চমৎকারিতা আছে। মনস্তাত্ত্বিক বলবেন, এটা বিদেশীয় সাহিত্যের রূপ ও রীতির ঐশ্বর্য আত্মস্থ করবার চমৎকার সফলতার উদাহরণ। এই কৃতিত্ব নিতান্ত পরানুকৃত ভাবনার ক্রিয়াফল বলে নিন্দিত হতে পারে না। মনোজ্ঞতার কারণে, কিংবা আঙ্গিক সৌষ্ঠবের অভিনবতার কারণে জনসমাদরে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, এহেন সাহিত্য যে কোন দেশের কিংবা জাতির সাংস্কৃতিক পরিতৃপ্তির একটি বড় সম্বল বটে, কিন্তু জাতির যথার্থ হৃদয়সংবেদ্য সম্বল নয়। শরৎ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় মহত্ত্ব নিশ্চয় এই যে, এ সাহিত্যের ভাব অনুভব ও প্রসাদ বৈষ্ণব

কবির প্রিয় শ্যামনামের মতো কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ লাভ করে। মাথা ঘামিয়ে কিংবা বুদ্ধি-বিচার ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞতা নিয়ে এ কাহিনীর তাৎপর্য বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হয় না। শরৎ-রচিত গল্প ও উপন্যাসের আবেগ ঝরণার জলের মতো আপন মর্মরোলে উদ্বেলিত। পিপাসী জনের পক্ষে স্বচ্ছ-শীতল তৃপ্তির অঙ্গীকার।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের প্রতিভা ও কৃতিত্বের প্রশংসাময় অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন যে, শরৎ বাঙালীর হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন, তাই তাঁর গল্প-উপন্যাস (বাঙালী) পাঠকজনের মনের পক্ষে প্রিয়তার আস্পদ এবং সহজগ্রাহ্যতার ও সমাদরের বস্তু। কবির উক্তির সত্যতা স্বীকার করে নিয়েও এক্ষেত্রে ব্যক্তির পক্ষে শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে ধারণা গ্রহণ করবার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হবার দরকার হবে। অনুমান করতে হয়, কবি নিশ্চয় একথা বলতে চাননি যে, শরৎচন্দ্র বাঙালীয়ানার হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন। সাহিত্যের সৃষ্টি ও নির্মাণের ইতিহাসে একটি নিয়ম বস্তুতঃ সার্থক ও সফল কৃতিত্বের চিরায়ত অভিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞান এই যে, তথ্য-সাহিত্যের কথা বাদ দিয়ে প্রত্যেকটি ভাব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বড় স্রষ্টার প্রতিভা ও মেধার বড় লক্ষণ এই যে, তিনি জনজীবনের হৃদয়ে ডুব দিয়ে রূপ অন্বেষণ করে থাকেন। সামাজিক পরিবেশ, স্থানিক ঘটনা, অর্থনীতিক জনসমস্যার আবর্ত, সবই কথাশিল্পীর দরকারের উপচার বটে, কিন্তু সৃষ্টি নিশ্চয়ই নয়। সৃষ্টি একান্ত ভাবে এবং নিতান্ত রূপে হৃদয়ের যাবতীয় ইচ্ছা কামনা ও আবেগের পরাগে সমাকীর্ণ একটি ফুলবন। বিস্তারিত করে বললে বলতে হয়, হৃদয়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গও একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনের উপচার। তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা নিবেদিত উপন্যাস এবং আঙ্গিক অভিনবতার আতিশয্যে সমুৎকীর্ণ কোন কাহিনীময় আলেখ্য কখনই জনসাধারণের কাছে এবং বৃহত্তর কালের কাছে হৃদয়ের জিনিষ বলে অনুভূত হতে পারে না। আদর্শিক মহত্ত্বের বিপুল বিস্তার এবং বিবাদ থাকলেও চিত্তবিনোদক রমাতায় উত্তীর্ণ না হয়ে কোন গল্প-উপন্যাস সাধারণের মর্মগত পরিতৃপ্তির সম্বল বলে বিবেচিত ও স্বীকৃত হবে না।

শরৎচন্দ্রকে এজন্য বাংলা সাহিত্যের আঙিনাতে একটি সার্থক পুষ্পমালঞ্চের রচয়িতা বলে মনে করা যায়, এবং এক্ষেত্রে তিনি অন্য মহান্ কৃতীদের তুলনায় বর্ণ-সৌরভের অনেক বেশী সুষমা সঞ্চারিত করেছেন। একথা বিশ্বাস করবার যুক্তি আছে যে, বাঙালীর হৃদয়ে যিনি ডুব দিয়েছিলেন, সেই শরৎচন্দ্র মানবীয় জীবনের বিশ্বজনীন প্রকৃতির উদাত্ত সমতা ও ঐক্য সম্পর্কে কিছু কম রূপের ঐশ্বর্য পরিবেশন করেননি। রুশ হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন টুর্গেনিভ ও ডস্টয়ভস্কি, ফরাসী হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন ভিকটর হিউগো, ইংরাজ হৃদয়ে ডুব দিয়েছিলেন চার্লস্ ডিকেন্স—কিন্তু কেউ কি অস্বীকার করতে পারবেন যে, এঁদের রচিত উপন্যাস বিশ্বজনেরও হৃদয়ে ভাব-অনুভবের ব্যাকুলতা উদ্বেলিত করে তুলেছিল? হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে ডুব দিলে মণি-মাণিক্যই পাওয়া যায়। এবং সেটা বিশ্বজনীন আনন্দ ও প্রসন্নতারই একটি রূপময় সম্বল। বরং বলা চলে, এবং বিখ্যাত ইউরোপীয় সমালোচকদের অভিমত সংকলিত করলেও প্রমাণিত হবে যে, তাঁরা 'সিনসিয়ার' তথা উপলব্ধির অনুগত নিষ্ঠাশীল সাহিত্য বলতে সেই সাহিত্যকেই বুঝেছেন, যে-সাহিত্য মানবীয় হৃদয়বত্তার সমগ্র বিস্ময় বেদনা ও সৌন্দর্যের পুষ্পমালঞ্চ। স্বদেশ ও স্বজাতির হৃদয় ছাড়া এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে হৃদয়বত্তার শিল্পী হওয়া সম্ভব নয়। এবং কোন সন্দেহ নেই যে, ঐতিহাসিক রূপে ও প্রকৃতিতে হৃদয়বত্তা বিশেষ কোন একটি ভৌগোলিক

সীমায়তনের মধ্যে বিশেষ কোন জনজীবনের আত্যন্তিক পরিচর্যার সম্পদ নয়। বিশ্বজনীন অনুভবের যত বিস্ময়ের অথবা ব্যাকুলতার স্বাদ ব্যক্তির আপন সমাজজীবনেরই মানুষগুলির হৃদয়ে নিহিত আছে।

মনস্বী রাজনারায়ণ বসুর অভিমতের একটি কথা আর-একবার স্মরণ করে নিয়ে বলা যায়, আমাদের বাংলা সাহিত্যের অনেক সুন্দর ও সুনির্মিত স্থাপত্য বস্তুতঃ সুন্দর ও সুনির্মিত পরানুকরণ। অর্থাৎ বিদেশীয় তথা পাশ্চাত্য ভাব-সাহিত্যের কায়া অনুকরণ করে নবরূপের গল্প এবং উপন্যাসের রচনা। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে একটি বৃহৎ নীতির অনুমোদন এই যে, শুধু তালিকা ও বর্ণিকাভঙ্গের সাফল্যের দ্বারা ছবি এবং মূর্তির রূপন্যাস সম্পূর্ণ হয় না। চাই 'লাবণ্য যোজনা'। শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের বিচারে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের এই নীতিটিকে প্রযুক্ত করলে এই সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক সূত্রে এসে পড়ে যে, শরৎচন্দ্র ছিলেন কাহিনীতে এই 'লাবণ্য যোজনা'র কৃতিত্বে সবচেয়ে বড় সফলতার অধিকারী। সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসাবে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস নিখুঁত বাস্তবতানিষ্ঠ কৃতিত্বের নিদর্শন। সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের সংঘাত এবং নরনারীর প্রণয় ও পরিণয়ের নানা মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণও তাঁর উপন্যাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এহ বাহ্য, এর আগে এগিয়ে যেয়ে বলতে হয়, তিনি নিতান্ত সামাজিক ভাবনার মানচিত্রের মধ্যে বর্ণসম্পাত করে তাঁর কাহিনীর আয়তন নির্মাণ করেননি। তিনি মানবতার বিশ্বজনীন আবেদন রূপায়িত করেছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসের রচনা ও নির্মাণের রীতি-নীতি সম্পর্কে কোন বিজ্ঞ সমালোচকের কোন বিস্ময়ের কথা কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না। বরং এটাই সাধারণ ধারণা হিসাবে প্রচারিত হয়েছে যে, শরৎচন্দ্রের লিখনভঙ্গীর মধ্যে বিশেষ কোন অভিনবতার প্রমাণ পরিস্ফুট নয়। খুবই সরল ও প্রাঞ্জল বলে শরৎচন্দ্রের লিখনভঙ্গীর প্রশস্তি করা হয়ে থাকে। বলতে হয়, এই প্রশস্তি বস্তুত লেখকীয় প্রতিভার পক্ষে সর্বোচ্চ অভিনন্দন। এই প্রশস্তি নিম্নকণ্ঠে উচ্চারিত হলেও বুঝতে হবে যে, শরৎচন্দ্র কোন বিদেশীয় সাহিত্য কৃতিত্বের তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা একটুও প্রভাবিত হননি। তাঁর প্রতিভা যেন স্বতঃ-উৎসারিত আবেগে কল্লোলিত হয়ে জীবনের সঙ্গীত শুনিয়েছে। জীবনের সত্যকে ধরে রাখে, মমতাকে মধুময় করে রাখে এবং প্রীতিকে ত্যাগযুত করে রাখে মানবীয় হৃদয়বৃত্তির যে অণু-পরমাণু, শিল্পী শরৎচন্দ্র তাই নিয়ে ও তাই দিয়ে কাহিনীর প্রাণ মন কায়া ও আত্মার প্রধান রূপণা সুসম্ভব করেছেন। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্যের বিষয় এবং সম্মানের বিষয় এই যে, শরৎচন্দ্রকে বাংলার ডিকেন্স কিংবা হিউগো বলে আখ্যাত হবার বিড়ম্বনায় আক্রান্ত হতে হয়নি। তিনি 'সিনসিয়ার' সাহিত্যের, যথার্থ জাতীয় সাহিত্যের এক মহান্ শক্তিধর স্রষ্টা। শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব ও জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তিতে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে শুধু একজন আদর্শোচিত 'দরদী' কথাশিল্পী নন, তিনি তাঁর ভাবে অনুভবে কল্পনায় ও উপলব্ধিতে একজন, এবং সম্ভবত একমাত্র, আত্মপ্রতিভায় আশ্রিত এবং স্ব-মহিমান্বিত সাহিত্যিক।

সামাজিক চেতনা সত্যিই মানবিক চেতনার একটি আনুষঙ্গিক প্রকার। তাই খুবই স্বাভাবিক আকর্ষণে কথাশিল্পীর মন সমাজের ভাল-মন্দ অবস্থা এবং পরিণামের বিচার করেছেন। সামাজিক সমস্যা অবলম্বন করে সার্থক উপন্যাস রচিত হয়েছে, একথাও

সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যও স্মরণ করতে হয় যে, যুগের জীবন এক জায়গায় এবং একই সমস্যার ভারে মন্থর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না। সমস্যার শেষ সীমা অতিক্রম করে মানবীয় জীবনের আগ্রহ নূতন অন্বেষার পথে এগিয়ে যায়। সমস্যাটি আর থাকে না। কিন্তু জীবন নামক নির্বিশেষ সত্যটি থেকে যায়। সার্থক কাহিনী-সাহিত্যের গুণ-লক্ষণের সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সমস্যার চমৎকার ভূষণ অপসারিত হয়ে গেলেও কাহিনীর ভূষণ থেকে যায়। সমস্যার গুরুত্ব শূন্য করে দিয়েও কাহিনীতে নিহিত জীবনের রম্য নিবেদন একটি সুচিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে কাহিনীকে অমরতা প্রদান করে, এবং সেই অমরতা চন্দ্র সূর্যের মতো চিরায়ু না হয়েও যুগ থেকে অন্য যুগের প্রদীপ হয়ে সাংস্কৃতিক জীবন ভাস্বরিত করে তোলে। শরৎচন্দ্রের কাহিনী-সাহিত্য সম্পর্কেও বলা যায়, যুগ-জীবনের সমস্যাগুলি যখন আর থাকবে না, তখনও নতুন দিনের ভোরে শরৎচন্দ্রের রচিত কাহিনীর অন্তর্নিহিত মানবতার শাশ্বত আবেদনের প্রভাবে পাঠকজনের অনুভবের আকাশ অরুণিত করে রাখবে।

শরৎ-সাহিত্যের সমীক্ষাতে আরও একটি সত্য ধরা পড়ে, যাকে একটি শিক্ষার সত্য বলে আখ্যাত করা চলে। বিশেষ করে ভারতীয় কথাশিল্পের পরিচর্যা ও প্রয়োজনের বিষয়টি স্মরণে রেখে এই সিদ্ধান্ত মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করা চলে যে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ভারতীয় সুধী ও শিল্পীর প্রতিভাকে বাইরের কোন বিশাল কৃতিত্বের প্রতি উদাসীন না হয়েও একটি 'বৈধ অহংকারে' ঋজু হয়ে থাকবার শিক্ষা দিয়েছে। শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাধরের সাংস্কৃতিক চিন্তা এবং আচার-বিচারে অ্যারিস্টটল যে বৈধ অহংকারের প্রশ্রয় অনুমোদন করেছেন, সেই অহংকার। সাহিত্য অবশ্যই নিকৃষ্ট পরিণামের আবর্তে পড়ে মিথ্যার সম্ভারে পরিণত হবে, যদি স্রষ্টা লেখক ও শিল্পীর আন্তরিক স্বভাবের মধ্যে আত্মিক স্বাধীনতার প্রকর্ষ না থাকে। কবি কামিনী রায় হেমচন্দ্রের কাব্যকলার আলোচনা করতে গিয়ে আক্ষেপের সুরে এক ধরণের আধুনিক রীতিশীলতার প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর অভিমতের কথা : আধুনিককালে কাব্যের বিচার করতে ভাব রূপ ও তাৎপর্যের সৌষ্ঠব ততটা বিবেচিত হয় না, যতটা বিবেচিত হয় কাব্যের আঙ্গিক রীতির অভিনবতা। এক্ষেত্রে রীতির শাব্দিক মুখরতা, যেটা শুধু কানের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তারই সমাদর বেশী। শরৎচন্দ্রের রচিত কাহিনী-সাহিত্য মহিলা কবি কামিনী রায়ের প্রস্তাবিত তত্ত্বটিরই একটি সার্থক সত্যতার নিদর্শন। শরৎচন্দ্রের কাহিনী-সাহিত্য ভাষাতে ও ভঙ্গীতে অচ্ছোদ-সরসী-নীরের মতো নিগূঢ় অথচ স্বচ্ছতায় প্রাঞ্জল। তিনি টেকনিকের বৈভব প্রদর্শিত করবার জন্য চেষ্টাকৃত কোন সাধনা স্বীকার করেছিলেন বলে মনে হয় না। এমন বিখ্যাত গল্প ও উপন্যাসের সংখ্যা কম নয়, যারা নিতান্ত ভঙ্গী তথা টেকনিকের বৈভব সম্ভব করবার ইচ্ছাকৃত অধ্যবসায়ের বড় নমুনা। সন্দেহ করতে হয়, খ্যাতির সম্বল থাকলেও এ ধরণের কারিগরী কারুতায় সমৃদ্ধ কাহিনীগুলির ভাগ্য বড়ই নশ্বর। আমাদের সৌভাগ্য, আমাদেরই ঘরের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঘরোয়া হৃদয়ের সহস্র বর্ণসুষমা দিয়ে সরল ও প্রাঞ্জল যে কাহিনী-সাহিত্য রচনা করেছেন সেটা ভারতীয় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নগর নির্মাণের আদর্শোচিত স্থাপত্যের মতো রূপে ও গুণে সর্বতোভদ্র, বাংলার সমাজ জীবনের সুখদুঃখ প্রতিচ্ছবিত করেও বিশ্বজনীন আবেদনে চিরপ্রসন্ন।

কবি অতুলপ্রসাদ

সঙ্গীতের রাজধানী লক্ষ্ণৌ শহরের একটি রাস্তার নাম 'এ পি সেন রোড'। এই রাস্তাকেই বক্ষে ধারণ ক'রে লক্ষ্ণৌ শহর তার এক শ্রদ্ধেয় ও সজ্জন নাগরিকের স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে। লক্ষ্ণৌবাসীর শ্রদ্ধার আস্পদ সেই এ পি সেন আজ আর নেই, আজ থেকে আঠার বছর আগে এক ২৬শে আগস্ট লক্ষ্ণৌ-এর রাত্রি সর্বজনপ্রিয় সজ্জন ও ব্যারিস্টার শ্রীঅতুল প্রসাদ সেনের মৃত্যু সংবাদে ব্যথিত ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্ণৌ-এর এই প্রিয় নাগরিকের শবাধার বহন করেছিলেন হিন্দু ও মুসলমান। বোঝা যায়, বাঙালী এ পি সেনকে লক্ষ্ণৌ শহর তার চিত্তের গভীরে কি শ্রদ্ধায় কত আপন করে নিয়েছিল। বাঙালী-অবাঙালী এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে লক্ষ্ণৌ-এর সকল মানুষ সমভাবে ব্যথিত হয়ে সেদিন উপলব্ধি করেছিলেন, লক্ষ্ণৌ শহরেই নাগরিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে একটি শূন্যতা সৃষ্টি ক'রে দিয়ে কৃতী আইনব্যবসায়ী, লিবারেল নেতা, সমাজসেবক এবং সঙ্গীতসাধক এ পি সেন নরধাম ত্যাগ করে চলে গেলেন।

আজকের ২৬শে আগস্টে সেই আঠার বছর আগের শোকার্ত দিবসটিকে স্মরণ করতে গিয়ে সবচেয়ে আগে এবং সহজেই মনে পড়ে, সেদিন লক্ষ্ণৌ-এর ক্ষতির চেয়ে বেশি ক্ষতির বেদনা সহ্য করতে হয়েছিল বাঙালী অতুলপ্রসাদের বাঙলা সাহিত্যকেই, বিশেষ করে বাঙলার কাব্য-সাহিত্যকে। 'মোদের গরব' ও 'মোদের আশা' বাঙলা ভাষাকে সুমধুর করার জন্য যিনি ভাব ও সুরের সাধনায় ব্রতী ছিলেন, তাঁর অভাব আজ আঠার বছর পরে আরও বেশি করে অনুভব করা যায়। কারণ, বাঙলা ভাষাকে সুরন্বিত করার এবং সুরকে ভাষান্বিত করার সে প্রতিভা বাঙলারই গুণীজীবনে আজ বিরলতর হয়ে এসেছে।

ঢাকা শহরে ১৮৭১ সালের ২০শে অক্টোবর অতুলপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তের বৎসর বয়সে পিতৃহীন হবার পর অতুলপ্রসাদ তাঁর মাতামহ শ্রীকালীনারায়ণ গুপ্তের গৃহে লালিত হতে থাকেন। এই গুপ্ত পরিবার বাঙলাদেশের এক বিশিষ্ট সুসংস্কৃতি সম্পন্ন পরিবার। ভগবদ্ভক্ত, সুকবি ও সুকণ্ঠ কালীনারায়ণের শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব কিশোর অতুলপ্রসাদের অন্তরে অবশ্যই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত করেছিল, যে প্রেরণা উত্তরকালের অতুলপ্রসাদের প্রতিভা ও ভাব জীবনের বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের ছাত্র জীবনকাল কলকাতাতেই অতিবাহিত। ১৮৯৪ সালে বিলাত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে বাঙলাদেশেই ফিরে এলেন। কিন্তু আইনব্যবসায় আরম্ভ করলেন লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে।

গানের রাজ্য লক্ষ্ণৌ, এ রাজ্যের সুরময় হৃদয়টির সঙ্গে গুণী অতুলপ্রসাদের হৃদয়ের মিলন হতে বেশী দেরী হয়নি। সঙ্গীতচর্চার উপযুক্ত সুযোগ এবং পরিবেশ অতুলপ্রসাদের প্রতিভাকেও এক সার্থক পরিণামের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী অতুলপ্রসাদের ভাব ও চিন্তার অন্তরঙ্গতা বাঙলার গীত সাহিত্যেরই এক নবরূপ সৃষ্টির হেতু হয়ে ওঠে। অতুলপ্রসাদের গান বাঙালীর মন ও বাঙলা ভাষাকে ভাবে ও সুরে কল্লোলিত করে তোলে।

লক্ষ্ণৌ প্রবাসী অতুলপ্রসাদ বাঙলা সাহিত্যকে আরও নানাভাবে সেবা করেছেন। 'উত্তরা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগে এবং 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' আহ্বানের পরিকল্পনায় সাহিত্যসেবক অতুলপ্রসাদের নিষ্ঠাশীল কর্মিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায়। উত্তর

প্রদেশের লিবারেল সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। একাধিকবার জাতীয় লিবারেল তথা উদারনৈতিক সম্মেলনের সভাপতির পদও গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি 'আউধ বার এসোসিয়েশনের' সভাপতি ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশেষ' কাব্য অতুলপ্রসাদের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। 'অতুলনীয় অতুল'কে আশীর্বাদ করে কবি লিখলেন :

'আজি পূর্ববায়ে
বঙ্গের অম্বর হ'তে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা গিয়াছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে ;
ছিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।'

অতুলপ্রসাদের রচনা পরিমাণে বড় নয়, গুণে বড়। 'কাকলী', 'গীতিগুচ্ছ' ও 'কয়েকটি গান'—এই তিনটি পুস্তকে অতুলপ্রসাদের প্রায় সবই রচনা সঙ্কলিত হয়েছে।

'সামান্য কথন' নামে একটি কথা আছে। সম্ভবত ভারতীয় রসশাস্ত্রে ব্যবহৃত একটি কথা। কথাটির ঠিক আলঙ্কারিক অর্থ যে কি, তা জানি না। কিন্তু, অন্তত কবিতার উৎকর্ষ বিচারে এ সত্য স্বীকার করতে হয় যে, অল্পকথায় অধিকতম ভাব প্রকাশের রীতিই শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকতা। এই ধরণের সামান্য কথন কবিতার অসামান্যতাই প্রতিষ্ঠিত করে। রম্য-কলার ক্ষেত্রে সরলতাই বস্তুত একটি ঐশ্বর্য। সমালোচক রাস্কিন স্থাপত্যকলার মত একটি কঠিন অবয়বপ্রধান শিল্পেরও আকৃতি তত্ত্বের বিচারে যে সাতটি প্রদীপের (সেভেন ল্যাম্প্‌স্ অব্ আর্কিটেক্‌চার) উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটা হল সরলতা। শুধু স্থাপত্যকলায় কেন, কবিতার মত একটি ভাষিক রম্যকলার ধ্বনি, ছন্দ, কথা ও ভাবের গঠন সৌকর্যেও সরলতাই হল ঐশ্বর্য। নিসর্গের রূপের দিকে তাকিয়েও সহজেই উপলব্ধি করা যায়, এক সহজ ও সাবলীল ছন্দে যেন সকল বর্ণ ও গতির রূপ বিধৃত হয়ে রয়েছে। সূর্যোদয়ের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। প্রতি প্রভাতে পূর্বাকাশের এই জ্যোতির্ময় বিরাটত্ব নিজেকে প্রকাশ করে কি সরল স্বাচ্ছন্দ্যে! যে বর্ণ সুষমার সমারোহে আকাশের রূপ পাল্টে যায়, তার ছন্দোসজ্জাও কত সরল। মহাম্বুধির তরঙ্গের আন্দোলন, গিরি-নদীর ক্ষুদ্র স্রোতধারায় চটুলগামিতা, পবনধৃত অরণ্যের কায়া হিল্লোল, দূরাগত কালবৈশাখীর বিলাপ ধ্বনি, অথবা কোমলবৃন্ত এক শস্যমঞ্জরীর নৃত্যভঙ্গী—স্থির ও অস্থির এই সব রূপে তো মহিমার কোনই অভাব নেই। অথচ এই রূপ রিক্ত নয়, নিরাভরণও নয়। বরং বলা যায়, এই সবই হলো পদার্থের এক পরম বৈভবের রূপ। কিন্তু এ রূপের প্রকাশ রীতিতে কোথাও আত্যন্তিকতাও নেই, অস্পষ্টতা নেই, অর্থগুপ্তিও নেই।

কাব্যস্য আত্মা নিশ্চয়ই 'রীতি' নয়। কিন্তু রীতির আত্মা যে সরলতা, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। রীতি সম্বন্ধে এই সব কথা মনে পড়ছে এই কারণে যে, অতুলপ্রসাদের কবিত্বের পরিচয় সন্ধান করতে গিয়ে তাঁর রচনার রীতিগত সারল্যই সব চেয়ে আগে চোখে পড়ে। সামান্য কথনের দ্বারা অসামান্যতা সৃষ্টি করেছেন অতুলপ্রসাদ। অক্ষর ডম্বর রীতি নয়, 'বৈদগ্ধ্য ভঙ্গী ভনিতি'ও নয়। অতুলপ্রসাদ অতুলনীয় হয়েছেন তাঁর 'সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য'

রীতির সারল্য গুণে। অল্পকথায় এবং সরল কথায় ভাবগূঢ়তা সৃষ্টির এমন উদাহরণ বিরল। কবিত্বের তুলনায় যে শক্তিকে 'সুদুর্লভা' বলা হয়ে থাকে, সেই শক্তি বোধ হয় সামান্য কথনের দ্বারা অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টির এই শক্তি।

জানতে ইচ্ছে করে, কোথা থেকে এই শক্তি পেলেন অতুলপ্রসাদ? রীতি বা ভঙ্গীর এই গুণ কেমন ক'রে তিনি অর্জন করলেন? রীতি ও ভঙ্গীর মধ্যেও অন্তরের পরিচয় থাকে। সমুদ্র তরঙ্গের ভঙ্গীর মধ্যেই তো সমুদ্রত্ব ফুটে ওঠে। হ্রদের জল শত আলোড়নেও ঐ ভঙ্গী ফুটিয়ে তুলতে পারে না। সমালোচক হ্যাবল্ড মানরো ভারতের আলঙ্কারিক ভামহ ও দণ্ডীর মতই বলেছেন যে, রীতিই হলো কাব্যের আত্মা। ('Style is the Soul')। এ তত্ত্ব কবিরাই স্বীকার করতে চাইবেন না। রীতির চেয়ে নিগূঢ়তর কোন বস্তু আছে, যে বস্তু কাব্যের প্রাণবস্তু। বরং ফরাসী সমালোচক বার্কোর উক্তিকেই সাধারণ ভাবে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়—'রীতি হলো মানুষটি' ('The style is the Man')। প্রতি মানুষের চিত্তে একটি 'ভাবের ঘর' আছে, এই ভাবের ঘরের মানুষই হল আসল মানুষ। এই ভাবের ঘর এমনিতেই তৈরী হয় না, তাকে তৈরী করতে হয়। অতুলপ্রসাদের সকল রচনার অন্তরগত রহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পাই, ভক্তি দিয়ে গড়া এক ভাবের ঘরে একটি মানুষ বসে রয়েছেন। মানুষ হিসাবেও তাঁর যথার্থ পরিচয় পাই এইখানেই। এ হেন মানুষ তাঁর চিত্তধর্মের সহজ আবেগে কবিতা রচনায় যে রীতি গ্রহণ করতে পারেন, সেই রীতিই গ্রহণ করেছেন অতুলপ্রসাদ। এক ঈশ্বরানুরাগী বিশ্বাসীর চিত্তের সকল আকুলতা, আবেদন, আক্ষেপ ও আনন্দ সার্থক প্রকাশ লাভ করতে পারে যে বিশেষ রীতি ও ভঙ্গীর আশ্রয়ে, সেই রীতিই অনুসরণ করেছেন অতুলপ্রসাদ। এখানে কবি অতুলপ্রসাদকে ভারতীয় সাধক কবিদেরই ঐতিহ্যগত আত্মীয় রূপে দেখতে পাই। ভক্তিময় ভাবনা দিয়ে নিজেকে গঠিত করতে পেরেছিলেন বলেই অতুলপ্রসাদ সহজেই সেই সুদুর্লভা শক্তি লাভ করেছিলেন।

কিন্তু রীতির চেয়ে নিগূঢ়তর যে বস্তুটি কাব্যের যথার্থ প্রাণ, অতুলপ্রসাদের কাব্যে সে বস্তুটির সামান্যতা নয়, তার প্রাচুর্যই আর এক বিস্ময়ের বিষয়। কবিত্বের ক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদের এই কৃতিত্বের প্রধান কারণ হলো তাঁর জীবনের বিশ্বাসবাদ। কবিত্বেরও নানা রূপ আছে। শব্দালঙ্কার সর্বস্ব কবিত্বও জনপ্রিয়তা লাভ করে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। জীবনবিদ্বেষী কবিতাও স্তাবকের করতালির অভিনন্দন লাভ করে, এমন ঘটনাও সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক দেখা গিয়েছে। বদলেয়ারও কবি ছিলেন এবং বদলেয়ারের কবিতা পড়ে হিউগো বেদনাক্ষুব্ধভাবে বলেছিলেন— 'তিনি নতুন এক ভয়াল শিহরণ সৃষ্টি করেছেন।' ('...He has created a new shudder')। বলা বাহুল্য জীবনের বিরুদ্ধে নতুন 'শাডার' তথা ভয়াল শিহরণ সৃষ্টি করাই কবিত্বের লক্ষ্য নয়, লক্ষণ নয়। কবিত্বের লক্ষ্য হলো—

'অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসারধূলি জালে।'

সংসার মাঝে কয়েকটি সুর মধুর করে রাখা, দু' একটি কাঁটা দূর করা, সাগরের জল ও অরণ্যের ছায়াকে আর একটুখানি নবীন আভায় রঙীন করে দেওয়াই কবিত্বের লক্ষ্য। এমন কি 'কবিতার জন্যই কবিতা' নয়। দেবী ভারতীর অপর এক নাম প্রজ্ঞা। যে প্রজ্ঞা

নিখিল কল্যাণের প্রতি মমত্ববোধ উদ্বোধিত করে. সেই প্রজ্ঞারই বাণীমূর্তি হলো কবিতা। কবিতা মানুষী সত্তারই এক বন্দনা মূর্তি। আজ নয়, কত হাজার বছর আগে কে জানে, ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য, জানিয়ে গিয়েছেন যে, নিছক আর্টের জন্য কোন আর্ট হতে পারে না। ন বা অরে শিল্পকামায় শিল্পং প্রিয়ংভবতি, আত্মনস্তু কামায় শিল্পং প্রিয়ং ভবতি। আর্টের তথা কবিতার উদ্দেশ্য আছে—'আত্মস্তু কামায়', আত্মন-এর অভিপ্রায় সাধনের উদ্দেশ্যে।

কবি অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনার রূপ এই পরম অভিপ্রায়ের বন্দনাবাণীর মত। কবিত্বের এই শ্রেষ্ঠ তত্ত্বে সমাশ্রিত অতুলপ্রসাদ তাঁর অন্তর হতে বাণী আহরণ করেছেন। সে বাণী সীমিতপ্রাণ মানুষের অনন্ততামুখীন আগ্রহের বাণী। এই মর মর্ত্যের মানুষ মাত্রই নিজের অজ্ঞাতসারে অসীম হতে চাইছে। এই আকাঙ্ক্ষাই সকল কবিত্বের উৎস। এই আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ণ বা প্রতিহত হলে যে বেদনা আক্ষেপ ও হতাশ্বাস দেখা দেয়, তাও কবিত্ব, সকল কাব্য প্রেরণার হেতুই হলো অনন্তের জন্য মানবীয় চিত্তের আকুলতা।

অতুলপ্রসাদের সমগ্র রচনাই এই আকুলতায় অভিষিক্ত। কবিতারও যদি 'রসেন্দ্রসুন্দর' নামে কোন রূপ কল্পনা করা যায়, তবে ভারতীয় সাধক কবিদের রচিত কবিতার মত অতুলপ্রসাদের কবিতাকেও রসেন্দ্রসুন্দর বলা যায়। রসই কবিতার প্রাণ। অতুলপ্রসাদের কবিতা তাই প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল। এ কবিতা সুরের স্পর্শ পেলেই যেন সুদূর এক অমর্ত্য-লোকের বংশীস্বর জাগরিত ক'রে তোলে। অতি প্রবল তার আকর্ষণ, অতি গভীর তার আবেদন। ক্ষণিকের আবেশে শ্রোতা অনুভব করে, বিশ্বব্যাপ্ত এই প্রাণের সঙ্গে সেও এক সহযাত্রী পথিকের মত এক পরম সীমাহীনতার শান্তরসাস্পদ আশ্রয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। অতুলপ্রসাদের কণ্ঠ হলো ভক্তের কণ্ঠ, অতুলপ্রসাদের কবিতার ভাষা ভক্ত-হৃদয়েরই তন্তু দিয়ে রচিত ভাষা।

লক্ষ্য করার বিষয়, অতুলপ্রসাদ তাঁর কবিত্ব শক্তিকে 'আর্টের জন্য আর্টে'র সমারোহ সৃষ্টি করার কাজে নিয়োজিত করেননি, তাঁর আর্টের উদ্দেশ্য এবং অবলম্বন ও কত মহৎ। কবিত্ব প্রকাশের জন্য তিনি মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বিষয়টিকেই নির্বাচিত করেছিলেন এই জীবনের এক পরমার্থের সন্ধান; ঈশ্বরের জন্য আকুলতা প্রকাশ। পণ্ডিতেরাই বলেন, এই তো শ্রেষ্ঠ কবির স্বভাব ও লক্ষণ।

'We may write little things well, but never will any be justly called a great poet, unless he has treated a great subject worthily''—Landor.

বাক্‌বৈদগ্ধী প্রধানেহেপি রস এবাত্র জীবতম।—অগ্নিপুরাণের প্রচারিত এই তত্ত্বটি সমালোচক ল্যাণ্ডরের উক্তিতে প্রায় বর্ণে বর্ণে সমর্থিত হয়েছে। কবির কবিত্বের অবলম্বন, তথা রচনার বিষয়বস্তু 'সামান্য' হলে কবিত্ব সার্থক হতে পারে না, তার মধ্যে যতই বাক্‌বৈদগ্ধ্য থাকুক না কেন। 'রস' নামক কাব্যের প্রাণবস্তুটি কথাশ্রিত কোন সৃষ্টি নয়, ঐ বস্তু হলো বিষয়াশ্রিত। মহৎ বিষয়ে আশ্রিত না হলে কবিত্বও মহৎ রূপ লাভ করতে পারে না। ধন্য অতুলপ্রসাদ, তিনি মানবজীবনের মহত্তম বিষয়টিকেই তাঁর কাব্যের প্রধান অবলম্বন করেছিলেন।

কবিত্বের ক্ষেত্রে বদলেয়ারী রিয়েলিজমের কোন স্থান নেই। কবিত্বের ক্ষেত্রে আইডিয়্যালই হলো রীয়্যাল। ভাবগত সত্যই শ্রেষ্ঠ বাস্তব সত্য। অতুলপ্রসাদ মনে-প্রাণে আইডিয়্যালের উপাসক, তাই তাঁর কবিতার আবেদনও এত বাস্তব।

অতুলপ্রসাদের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য খুবই স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। তাঁর সকল কবিতাই গায়নী রীতিতে রচিত। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা এই রীতিরই সাক্ষ্য দান করে। সুর এসেছে আগে, পরে কবিতা। অতুলপ্রসাদের কতগুলি রচনাতে এই পদ্ধতির প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ রচনার সৃষ্টিক্রম হলো—প্রথমে ভাব, পরে সুর, তারপর ভাষা। গায়নী রীতির প্রভাবে বিশুদ্ধ কাব্যরূপের কতগুলি উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে কতগুলি ত্রুটি ঘটবারও আশঙ্কা অবশ্য থাকে। ভারতীয় স্তবসাহিত্যেও দেখা যায়, কবি যেন ভাস্করের তক্ষণপদ্ধতি অনুসারে শব্দ চয়ন কল্পনা ও রূপণা করেছেন। এর থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, বিভিন্ন সকল শিল্পের প্রাণও একটি পরম ঐক্যের সূত্রে যুক্ত হয়ে রয়েছে। সকল রম্যকলাই একটি অখণ্ড প্রাণের আধারে সংরক্ষিত, কেউ কারও পর নয়। একই ভাবমূর্তি স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে ও কবিতায় প্রতিমূর্ত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কলাগত রূপের এই পদ্ধতিগত বৈচিত্র্যের কথা ছেড়ে দিই। কবিত্বের ক্ষেত্রেও একই ভাবমূর্তি বিভিন্ন রূপে প্রতিমূর্ত হতে পারে, হয়ে থাকে এবং এটাও কবিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। অতুলপ্রসাদের কবিতাবলীর এই রূপ বৈচিত্র্যের পরিচয়ও বিস্ময়কর। ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত অতুলপ্রসাদ তাঁর অন্তরের আকুলতাকে যেন ভারতীয় এষণার এক একটি যুগের এক একটি ঐতিহ্যগত তীর্থে নিয়ে গিয়েছেন। কোথাও দেখা যায়, সহজের সাধক এক বাউল তাঁর একতারা হাতে নিয়ে আপন মনে গান গেয়ে চলেছেন। কোথাও দেখা যায়, বিস্ময়ে আত্মহারা এক পথিক বিশ্বরহস্যের প্রতি মন্ত্রময় আরাধনার সঙ্গীত নিবেদন করছেন। হঠাৎ ভেসে আসে অপরাহ্ণের বাতাসে রাখালিয়া বাঁশির মেঠো সুর। কোথাও গাঙের মাঝির কণ্ঠ হতে উৎসারিত ভাটিয়ালীর সঙ্গে ঢেউভাঙ্গা জলকলস্বরের রেশ। আবার দেখা যায়, যেন এক নিরালার সুফী সাধকের আকুলতা বিরহ বেদনার গজল হয়ে প্রিয়ের সান্নিধ্য কামনা করছে। কখনো মনে হবে, কবীর ও মীরাবাঈয়ের মত একই ভাবের পান্থশালায় নতুন এক পথিক এসে বসেছেন। সে পান্থশালার কক্ষ মধুময় হয়ে উঠেছে ভক্তহৃদয়ের ভজন গানে।

কীর্তনীয়া বাঙলার মিঠা মৃদঙ্গের ধ্বনিও বাজে। রামপ্রসাদী ব্যাকুলতার সুরও শোনা যায়। অতুলপ্রসাদ এই ভারতেরই নানা যুগের সাধক চিত্তের মন্দিরে মন্দিরে অন্বেষণ ক'রে যেন রীতি অন্বেষণ করেছেন এবং তাঁর ভাবমূর্তিকে রূপবৈচিত্র্য দান করেছেন।

ওগো নিঠুর দরদী, একি খেলছ অনুক্ষণ? সত্য সত্যই প্রেমবিধুর কোন সুফী কবির আক্ষেপ নয়। কবি অতুলপ্রসাদের ভক্তহৃদয় অভিযোগ করেছে—

'ডাকিলে কও না কথা
কি নিষ্ঠুর নীরবতা!'

এস নিঠুর দরদী, মিছে কাঁটার ব্যথা আর কেন দাও, আমি ব্যথিত হলে তুমি কি তা সহ্য করতে পারবে? আমি জানি, আমার আঁখি জল তোমাকে চঞ্চল করে, তাই বিশ্বাস করি, 'আমার এই অশ্রু বরিষণ বিফল হবে না।

কিংবা :

প্রকৃতির ঘোম্‌টাখানি খোল, গো বধূ
ঘোম্‌টাখানি খোল্।

আমি আজ পরাণ মেলি দেখ্‌ব বলি
তোর নয়ন সুনিটোল গো বধূ
নয়ন সুনিটোল।

কী দুঃসহ এই আঁখির পিপাসা। স্ফুট গোলাপের মত সাকীর মুখচ্ছবি এ কোন্ মায়াবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে আছে। সহ্য হয় না ঐ অবগুণ্ঠন। বধূর নয়ন সুনিটোলের দৃষ্টিমদিরা পিপাসী এই দুই নয়নের পেয়ালায় ঢেলে পান করতে চাই। মরূদ্যানের নিরালায় সাধনারত কবির সাকীকেই এক নতুন মূর্তিতে দেখতে পাই অতুলপ্রসাদের কবিতার 'বধূ'র রূপের মধ্যে। এ প্রকৃতির ওপর যেন একটি মায়ারূপের আবরণ রয়েছে। সে আবরণ যদি সরিয়ে দিতে পারা যায়, তবেই তো দেখা যাবে, এ জীবনকে বরণ করে নেবার জন্য সে বধূ রয়েছেন বসে, এক মিলন লগ্নের প্রতীক্ষায়।

যখন, মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে, তখন প্রশ্ন মনে জাগে—ওরা কি সেই শ্যামপ্রেমে অনুরঞ্জিত গোপীচিত্তের বাসনার দল? কোন্ যমুনার নীরে গাগরী ভরবে বলে ওরা ধেয়ে চলেছে? কার বাঁশী শুনছে ওরা? কবির চিত্ত মিনতি করছে—ও আকাশ বল্ আমারে। আমার আঁখি জল তাদের মত আমার এই জীবনখানি করবে কি শ্যামল? আমার বঁধুর সনে মধুর মেলা খেলব কি দিনের শেষে?

রাগাত্মিকা ভক্তির ভাব ও ভাষা সহজ আবেগে উৎসারিত হয়েছে কবিতার প্রতি পংক্তিতে। শুক্লা যামিনীর ভাষাও বুঝতে পারেন কবি। এ জ্যোৎস্নায় বেদনা রয়েছে। কারণ, 'আকাশের গ্রহ-তারা শ্যাম ভিখারী'। শ্যামহীন যামিনীজীবন শত চাঁদের জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেও, তার অন্তরে যে আনন্দহীন অন্ধকার।

কিন্তু শ্যামহীন এই দুঃখের জীবন নীরব অভিমানে শুধু সহ্য করারও কোন অর্থ হয় না। যখন, 'পরাণে লেগেছে রং কালোর পরে', এবং 'বাহির করেছে পাগল মোরে' তখন ঘরে থাকা দায়। হৃদয়ের নেপথ্যে আভাসে শোনা যায়—'এস বঁধু বলে ডাকে মোহন সুরে'। আশা জাগে মনে, বিশ্বাস হয়, মিথ্যে হবে না এ জীবনের অভিসার, যদি সব লাজ ভয়ের বাধা তুচ্ছ করে চলে যাবার সাহস থাকে।

বিশ্বপ্রকৃতির বহু সজল ধারাবর্ষণের হর্ষে পুলকিত হয়, সে হর্ষের ভাষা শুনতে পান কবি :

জল বলে চল্ মোর সাথে চল্
তোর আঁখিজল হবে না বিফল।

আশ্বাসবাণী হবে না বিফল, আরও এগিয়ে যেতে হবে। বসন্তের আবির্ভাবে প্রকৃতি সুন্দর হয়ে উঠেছে। কবি দেখেছেন—

আনিছে সুন্দরী শূন্য গাগরী
সুখে লহে প্রেমবারি ভরি ভরি

কবি উপলব্ধি করেছেন, ঋতুরঙ্গের এই পূর্ণতার মধ্যে যেন পূর্ণ হলো প্রেমাকুল গোপীচিত্তের সকল আকাঙ্ক্ষা। মানুষেরই জীবনদর্শনের, মহামিলনমুখী পরিণামের এক নাট্যশালার মত এই বিশ্বপ্রকৃতিকে চিনতে পেরেছেন কবি।

কখনো শুনতে পাওয়া যায়, যেন বাঙলা ভূমির এক প্রান্তর প্রান্তে বটের ছায়ায় ক্ষণিকের মনে বসেছেন এক শ্রান্ত বৈরাগী। নিজেরই যত ভুল, ফাঁকি ও অপরাধগুলিকে

ধিক্কার দিয়ে গান গাইছেন :

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর
কোন মুখে।
* * *
সুখের পিছে মরি ঘুরে
তাই তো রে সুখ পালায় দূরে
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ
বন্ধ মনের সিন্দুকে।

কবে খুলবে এই বন্ধ মনের সিন্দুক? দীনবন্ধুকে পেয়ে দৈন্য ঘুচবে কবে? এক বৈরাগীর প্রাণ আকুল হয়ে প্রশ্ন করেছেন, অতুলপ্রসাদের কবিতার প্রশ্নে।

অভিমানী মায়ের ছেলে রামপ্রসাদেরই প্রাণ নতুন ক'রে অনুযোগ করছে :

আর দে দে বল্‌ব না তোরে
যা দিলি তুই কাঙালরাণী
তাইতো আবার নিলি হ'রে।
দুঃখ বিপদ যদি দিতে চাও মা,
দাও তবে সে বোঝা মাথার ওপর তুলে।
যখন বোঝা ভারী হবে
তুই নাবাবি আপন করে।

বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়েব প্রশ্ন প্রতিধ্বনিত ক'রে কবি অতুলপ্রসাদও প্রশ্ন করেছেন—

হরি হে,
তুমি আমাব সকল হবে কবে?
* * *
আমার সকল সুখে সকল দুখে
তোমাব চরণ ধরবো বুকে
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই কবে।

যেন চিতোরগড়ের রণছোড়জীর মন্দির হতে সাধিকা মীরাবাঈয়ের হৃদয়ের ভাষা পাঁচশত বৎসর পরে নতুন করে সুরমধুর হয়ে ভেসে আসছে।

এস গো একা ঘরে একার সাথী
সজল নয়নে বল রব কত রাতি?
* * *
তব সঙ্গ লাগি আছি আমি জাগি
সরব তেয়াগী
তব চরণ লাগি আছি কান পাতি।

বিশ্বৈক্যবোধ সার্থক প্রকাশলাভ করেছে কবি অতুলপ্রসাদের বাণীতে :

সবারে বাসরে ভাল
নইলে (মনের) কালো ঘুচবে না রে।

আছে তোর যাহা ভাল
ফুলের মত দে সবারে।

জীবনচর্যারই এক আদর্শ সংজ্ঞা ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। 'ফুলের মতন', এ পৃথিবীর সকলকেই ভালোবেসে ধন্য সে জীবন।

সাধক ভক্তেরা অবশ্যই কল্পনা করে থাকেন, যার জন্য এত আকুলতা সে যদি প্রশ্ন করে—বল, কি চাও? কি চাইবেন ভক্ত? ভক্তের জীবনে এ বড় দুরূহ সঙ্কট।

কবি বিল্বমঙ্গল চাইলেন :

সদা যেন দেখু তোরে।

ভক্তের তথা প্রতি মানুষের এই চাওয়ার বাণীর মধ্যেই তার সমগ্র জীবনবাদ নিহিত। কবি অতুলপ্রসাদের জীবনবাদের পরিচয় পাই তাঁর একটি কবিতায় এবং বিস্মিত হতে হয় ব্যারিস্টার এ পি সেন কেমন করে এবং কি করে এত বড় তত্ত্বানুভূতির অধিকারী হয়েছিলেন।

বলিব না রেখ সুখে
চাহ যদি রেখ দুখে
(শুধু) তুমি যে শিব তাহা
বুঝিতে দিও।

আর কিছু চাহি না, শুধু এই বিশ্বাস পেতে চাই যে, তুমি কল্যাণময়। কবিতার এই সামান্য কথিত একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যে মানবজীবনের পরম-চাওয়ার বা ী ধ্বনিত হয়েছে।

উপনিষদ বলেছেন—সো মধুরূপ। বল্লভাচার্যের মধুরাষ্টক বলে—

বেণুর্মধুবো রেণুর্মধুরঃ
পাপর্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌঃ
ধৃত্যং মধুবং সম্যম মধুরম্
মধুরাধি পতেরাখিলং মধুরম্।

আর শুনতে পাই মধুরূপের কল্পনায় নন্দিত চিত্ত অতুলপ্রসাদ গাইছেন :

তুমি দিবসে মধুর
নিশীথে মধুর
মধুর তুমি স্বপনে।
তুমি সজনে মধুর
বিজনে মধুর
মধুর তুমি গোপনে।

নিখিলব্যাপ্ত মধুরতার সঙ্গে সর্ব বিরাজিত সেই সুন্দরকেও চিনতে বুঝতে ও অভিনন্দন জানাতে ভোলেননি অতুলপ্রসাদ। প্রাচীন ভারতীয় সাধকেরই স্তব সংগীতের মত ভাব ও ভাষার ভাস্করীয় রীতিতে যে মন্দির রূপ রচনা করেছেন অতুলপ্রসাদ, তার পরিচয় পাই :

কভু নির্মল নীল প্রান্তে
কনককিরীট মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছে অতিসুন্দর।

আবাহন করেছেন কবি :

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী ;
উঠ আদি জগদ্জনপূজ্যা ,

এই বন্দনাবাণী উচ্চারণ করে যিনি ভারতলক্ষ্মীর জাগৃতি কামনা করেছিলেন, সে কবি ভারততত্ত্বেরই এক ঐতিহাসিক পরিচয় তাঁর কবিতায় রেখে গিয়েছিলেন, ধর্মে মহান্ এবং কর্মে মহান্ এক ভারতবর্ষ। 'এক জাতি প্রেম বন্ধনে' এক বিরাট ও মহান ভারতের অভ্যুদয় কবির কল্পনায় রূপ লাভ করেছিল।

ধর্মভেদের লড়াই দুঃখ দিয়েছিল কবিকে। সন্ত কবীরের মতই বাঙালী কবি অতুলপ্রসাদ ভারতবাসীকে মিলনবাদের তত্ত্ব নতুন করে শুনিয়ে গিয়েছেন :

মন্দিরে মসজিদে লড়াই
প্রবেশ ক'রে দেখ্‌রে দু'ভাই
অন্দরে যে এক জনাই।

শুধু কবিত্বই নয়, অতুলপ্রসাদ তাঁর রচনায় মানব জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ বিষয়কে ভাবরূপ দান করেছেন। আজ এই বাঙলাদেশেই শোনা যায়, ভোরের আলো দেখা দেবার আগে ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে বাঙালী চাষী গাইতে গাইতে চলেছে—

সংসারেতে উঠল হাসি
তুই শুনিস, রে ব্রজের বাঁশী
ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল
সবই কালাচাঁদ?

বুঝতে পারি, কাকে বলে সেই কবিতা ও সেই গান, যে কবিতা ও যে গান একেবারে লোকমনের গভীরে গিয়ে তার আত্মার সাথী হয়ে যায়। অতুলপ্রসাদের কবিতা ও গান দেশের লোক চিত্তকে সুরে ও মাধুর্যে অভিষিক্ত করেছে। অতুলপ্রসাদের গান এক ভক্তহৃদয়ের সুরময় উপহার, বাঙলারই সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের এক নতুন সাক্ষ্য।

আজ থেকে আঠার বছর আগে, এক ২৬শে আগষ্টে সত্য হয়ে উঠেছিল কবি অতুলপ্রসাদের গানের আর এক আবেদন।

কত গান তো হ'লো গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও?
* * *
বড় ব্যথা তোমায় চাওয়া
আরও ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী নাহি আসিবে
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?

ব্যথা হরণের মমতা মাখা বাহু কবির আত্মাকে হাত ধ'রে নিয়ে চলে গেল। এক ভক্তের জীবন সঙ্গীতের শেষ কলি শেষ হলো ২৬শে আগষ্টের রাত্রিতে।

দেশবাসীর সান্ত্বনা—

ছিল বঙ্গ বীণাপাণি অতুলপ্রসাদ।
তব জাগরণী গানে নিত্য আশীর্বাদ।

স্যার অরেল স্টাইন

কিছুদিন হলো অরেলস্টাইন মারা গেছেন। কাবুল থেকে প্রাপ্ত তিন-চার লাইনের এই ক্ষুদ্র সংবাদটিকে ভারতের কয়েকটি পত্রিকার প্রশস্ত স্তম্ভগুলির এক কোণে অত্যন্ত কার্পণ্যে ও সঙ্কোচে ছাপা হয়েছিল। পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠাব্যাপী রণ-নির্ঘোষ এবং মোটাদরের বিজ্ঞাপনের ভীড়ের মধ্যে অরেল স্টাইনের মৃত্যু-সংবাদ নগণ্যতায় চাপা পড়ে গেছে। আমাদের পক্ষে এই আচরণ একটা আশ্চর্যের বিষয়। বর্তমান কালে ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক সুহৃদ অরেল স্টাইন মারা গেলেন, এই অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের মনে কোন শোকের বেদনা জাগিয়ে তোলেনি। এর কারণ কি? আমাদের মতিগতি তো কখনো এরকম অকৃতজ্ঞতায় উদাস ছিল না। ম্যাক্সমূলরের প্রতিভাকে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর দানকে আমরা একদিন অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি। কিন্তু অরেল স্টাইনকে আমরা কেন নিঃশব্দে বিদায় দিলাম?

এর একমাত্র কারণ, হয়তো আমরা এই ক্ষতিটাই বুঝতে পারিনি। কিন্তু এটাও আশ্চর্যের বিষয়। ভারতের লিখিয়ে-পড়িয়ে ও বুদ্ধিজীবিরা আজকাল সংস্কৃতির ব্যাপার নিয়ে একটু বেশী গলাবাজি করে থাকেন। সংস্কৃতি-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার কোন কমতি দেখতে পাই না। এতই যদি সংস্কৃতি-পরায়ণ হয়ে থাকি, তবে অরেল স্টাইন সম্বন্ধে এই অজ্ঞতার কি কারণ থাকতে পারে? স্বভাবতঃ সন্দেহ জাগে, আমাদের এই সাংস্কৃতিকতার পিছনে সত্যিই কোন আন্তরিক নিষ্ঠা আছে কিনা? হয়তো এই সাংস্কৃতিকতা নিছক কতগুলি কলমের সুড়সুড়ি মাত্র, কতগুলি অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক অপতত্ত্ব দিয়ে মোটা মোটা বই লিখে ইনটেলকচুয়াল সাজবার সস্তা চেষ্টা।

ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বহুবিধ শাসন শিলালেখ ও মুদ্রালিপির পাঠোদ্ধার, পুরাতন পুঁথি আবিষ্কার ও প্রত্নতাত্ত্বিক খনন— প্রত্যেকটি বিষয়ে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের গবেষণার ফলে আজ ভারতের ইতিহাসকে নতুন করে লিখবার যে প্রচুর উপকরণ আমাদের হাতের কাছে জমে উঠেছে, তার প্রত্যেকটি বিষয়ে অরেল স্টাইনের দান রয়েছে।

অরেল স্টাইনের মত ভারতীয় সংস্কৃতির এত আন্তরিক সুহৃদ আর কেউ ছিল না। শুধু ভারত নয়, তিনি এশিয়ার সাংস্কৃতিক বন্ধু। ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বহু প্রচলিত সিদ্ধান্তকে তাঁর আবিষ্কার উল্টেপাল্টে দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসের ভেতর দিয়ে তিনি সভ্যতার ইতিহাস খুঁজে বেড়িয়েছেন। ইতিহাসের সীমা পার হয়ে তিনি ভারতের প্রাক্-ইতিহাসের ভাঙা ভাঙা পাথরের কুঠার, শিলীভূত কংকাল আর প্রথম ভারতবাসীর কপালের লিখন খুঁজে বার করেছেন। প্রাক্-ইতিহাসের মানবীয় সংসারের সীমা পার হয়ে তিনি ভারতের প্রথম প্রাণময় যুগের রহস্য খুঁজেছেন, ভারতের মাটির জৈবযুগের নিদর্শন—পাথরের সমাধিতে প্রচ্ছন্ন অতিপুরাতন ভারতের গাছের পাতার ফসিল আর কীটদেহের চূর্ণ। এখানে এসেও তাঁর প্রতিভার অভিযান থেমে যায়নি। আরও অতীতে তাঁর জ্ঞানের মশাল নিয়ে তিনি চলে গেছেন—ঐ হিমালয়ের উদ্ধত শিখরের ইতিহাস খুঁজতে, ভারতের ভৌমগঠনের স্বরূপ নির্ণয় করতে।

প্রাচীন ভারতের একটি মাটীর পুতুলের মর্ম খুঁজতে তিনি ইজিপ্ট, ক্রীট, উর ও কিশ-

এর মূর্তিতত্ত্বের ভাণ্ডার তছনছ করেছেন। ভারতের ধর্ম, ভারতের সমাজতত্ত্ব ও ভাষার ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে তিনি ইজিপ্ট, বাবিলন দার্দিস্তান, মধ্য-এশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার হৃদয় অন্বেষণ করেছেন। নির্জলা মরুভূমি, হিমনদ, তুষার প্রান্তর, গিরিকন্দর ও অরণ্য—দুঃসাহসী অভিযাত্রী অরেল স্টাইনের কম্পাস আর কোদাল সর্বত্র খুঁজে আর খুঁড়ে বেড়িয়েছে। মার্কো পোলো যে-পথে পৃথিবী ভ্রমণ করে গেলেন, সেই পুরাতন পথের চিহ্ন আবিষ্কার করেছেন স্টাইন। চেঙ্গিসের রণদুর্মদ মঙ্গোল বাহিনী যে পথে জয়পতাকা নিয়ে পদভরে পৃথ্বী টলমল করে দিয়ে গেল, সেই বিস্মৃত মাটীর পথের ধুলো-কাঁটা সরিয়ে দিয়েছেন স্টাইন। পামীর উপত্যকার আবহাওয়া আর গ্রেসিয়াদের কীর্তিকথা অরেল স্টাইন আবিষ্কার করেছেন। দূর মঙ্গোলিয়ার নিভৃত হতে 'সহস্র বুদ্ধের গুহা'র কোল থেকে বিচিত্র সব আলেখ্য ও শিল্পসামগ্রী উদ্ধার করে এনেছেন অরেল স্টাইন। দিল্লীতে 'মধ্য-এশিয়ার প্রত্নশালা'তে (Central Asian Antiquity Museum) রেশমী যবনিকাপটে আঁকা এই সব রঙীন চিত্র রাখা হয়েছে। এই মিউজিয়ামও অরেল স্টাইনের উদ্যমের দান।

মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর ভারতের ইতিহাসের মূল ভিত্তি বদলে গেছে। এই সিন্ধু সভ্যতা যে প্রাগার্য সভ্যতা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সভ্যতার পুরো তথ্য এখনো সঠিক নিণীত হয়নি। এর লিপির পাঠোদ্ধার হয়নি। অরেল স্টাইন এই সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন খুঁজতে গিয়ে আরও বিস্তীর্ণ এক ভূভাগের সন্ধান দিয়ে গেছেন। সিন্ধু, বেলুচিস্তান আফগানিস্তান এবং কাথিয়াবাড়ে এই প্রাগার্য সভ্যতার অজস্র স্থান তিনি সার্ভে করে চিহ্নিত করেছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রাগার্য সভ্যতার নিদর্শন গাঙ্গেয় প্রদেশেও পাওয়া গেছে। সুতরাং এইসব স্থানের খনন কার্য শেষ হলে ঐ 'সিন্ধু সভ্যতা' নামটিও হয়তো বদলে যাবে। গঙ্গার উপত্যকায়ও এই প্রাগার্য সভ্যতার চিহ্ন রয়েছে, অরেল স্টাইনের এই বিবরণ আমাদের থিওরী পাল্টে দিয়েছে।

আদিবাসী ভারতীয়ের ভাষা নিয়ে পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্ত করে বসেছিলেন, অরেল স্টাইন (এবং অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত) সেই সিদ্ধান্তের ভ্রান্তি ধরিয়ে দিয়েছেন। ছোটনাগপুরে মুণ্ডা জাতির ভাষা ও নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আগে যা বলতেন এখন তা বলার আর উপায় নেই। মুণ্ডারা একদিন ভারতের পশ্চিম দ্বার দিয়ে ভারতে এসেছিল। মুণ্ডাদের ভাষা মূলতঃ ফিনো-উগ্রিয়ান (Fino-Ugrian— ফিনল্যাণ্ড, উরাল, হাঙ্গেরীয় ম্যাগিয়ার ভোকোল প্রভৃতির) ভাষা। এর আগে পণ্ডিতেরা মুণ্ডারী ভাষাকে 'অষ্ট্রিক' ভাষা আখ্যা দিয়েছিলেন এবং তারা পূর্ব দিক থেকে ভারতে এসেছে এই ধারণা প্রচলিত ছিল।

স্যার অরেল স্টাইন চার বার মধ্য এশিয়া অভিযানে বের হয়েছিলেন। মধ্য এশিয়ার আবহাওয়া-তত্ত্ব ও ইতিহাস তাঁর কাছে নতুন ব্যাখ্যা পেয়েছে। আমরা জানতাম, কোন কারণে একদিন মধ্য এশিয়ায় আবহাওয়ার বিপ্লব হয়েছিল। সুজলা সুফলা মধ্য এশিয়া ও মঙ্গোলিয়া ধীরে ধীরে মেঘহীন, জলহীন ও শস্যহীন হয়ে পড়লো। জনতা সরে গেল, শুধু জনপদের কতগুলি শ্মশান পড়ে রইল বালুকাস্তুপের সমাধির আড়ালে। অরেল স্টাইন ঠিক এর উল্টো কথা বলেছেন। তিনি প্রমাণ দেখিয়েছেন যে কোন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের কারণে আগে জনতা চলে গেছে। সেই পরিত্যক্ত জনপদগুলি আজও একেবারে টাটকা অবস্থায় আছে। লোকের গৃহস্থালীর আবর্জনার স্তুপগুলি পর্যন্ত রয়েছে, যেন কদিন আগে তারা অন্যত্র চলে গিয়েছে। স্টাইন বলেন, এই রাষ্ট্রীয় কারণের অনেক পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ছাত্রের কাছে সব চেয়ে বড় জ্ঞাতব্য বিষয় হলো অরেল স্টাইনের প্রত্যেক অভিযান প্রকারান্তরে ভারতীয় সভ্যতার একটি না একটি রহস্য ভেদ করেছে। সেই প্রাচীন চীন-ভারতের মৈত্রীর পথটি পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করেছেন, যে পথে হিউয়েন সাঙ দেশভ্রমণ করে গেল, যে স্থলপথে চীন ভারতের সদাগরেরা য়ুরোপে ও মিশরে যাতায়াত করতো।

অরেল স্টাইন তাঁর নিজের সম্বন্ধে একটি মজার কথা লিখে গেছেন। তাঁর ঘ্রাণশক্তির কথা। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময় প্রাচীন আবর্জনার স্তূপের গন্ধ থেকেই তিনি প্রথমে আন্দাজ করে নিতেন, কোন্ যুগের এবং কোন্ সংস্কৃতির আবর্জনা। একদিন খোটানের উত্তরে এক মরুপ্রান্তরে একটি পুরাতন দুর্গের ভগ্নস্তূপ খননের সময় তিনি কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম খননের পরই বাতাসে নতুন আবর্জনার গন্ধ থেকেই তিনি বুঝে ফেললেন তিব্বতী আবর্জনা। পরে বুঝলেন যে তাঁর ঘ্রাণশক্তি ভুল করেনি।

একদিন তুনহুয়াং-মরূদ্যানে একা চুপ করে বসেছিলেন অরেল স্টাইন। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অরেল স্টাইনের পায়ের কাছে বালুর ওপর প্রাচীন সহরবাসীর গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী ছড়িয়ে পড়ে আছে। কাঠি দিয়ে এক একটি জিনিষ নেড়ে চেড়ে নিজের মনে খেলা করছিলেন স্টাইন। তিনি শুধু ভাবছিলেন—এই জিনিষগুলি ঠিক এইখানে আজ দুহাজার বছর পরে মানুষের হাতের স্পর্শ পেল। দুহাজার বছর আগে এক মানুষ এই জিনিষটি ফেলে চলে গেছে। আজ আবার দুহাজার বছর পরে বিংশ শতাব্দীর একটি মানুষ তাকে হাতে তুলে নিচ্ছে। এর মাঝে কেউ তাকে আর ছোঁয়নি। আশ্চর্য, দুহাজার বছরের ব্যবধান যেন আজ আর কালের ব্যবধান।

হঠাৎ চোখে পড়লো সূর্য অস্ত গেছে। সেই শূন্য প্রান্তরের দশ মাইল দূরের প্রাচীন প্রাচীরের টাওয়ারগুলিকেও স্পষ্ট দেখা যায়। সাদা সাদা টাওয়ারগুলির গায়ে ছোট ছোট ঘুলঘুলি কালো চোখের মত দেখাচ্ছে। অরেল স্টাইন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হলো, দু হাজার বছর আগের এক মঙ্গোল প্রহরী ঐ ঘুলঘুলি দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। প্রহরী হয়তো ভাবছে, কে এই নতুন হুন, আমাদের ঘরের সম্পদ চুরি করতে এসেছে।

স্যর অরেল স্টাইন বহুদিন আগে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে কিছুদিন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর সাধনার আহ্বান তাঁর কর্মক্ষেত্রকে এশিয়া মহাদেশের উপর প্রসারিত করে দেয়।

ভারতের সংস্কৃতির এত বড় বন্ধু দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। ভারতবর্ষের ইতিহাস নতুন করে লেখার সময় প্রত্যেকটি বিষয়ে স্যর অরেল স্টাইনের আবিষ্কার ও দান গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই।

চৈতন্যের ভাবধর্ম

'জনজীবনে মহৎ ভাবনা সঞ্চারিত করবার যোগ্যতায় ও নেতৃত্বে শ্রীচৈতন্যের তুলনায় রামমোহন রায়ের মতো একজন বিরাট কৃতিত্বের মানুষও বস্তুত একজন পিগমি (ক্ষুদ্র খর্বকায়) মানুষ. আমি তো কোন্ ছাড়!' এই মন্তব্য করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজীর এই মন্তব্যের কথা শুনতে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই অপ্রসন্ন হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে,

গান্ধীজীর এই উক্তি রাজা রামমোহনের প্রতি অশ্রদ্ধার আঘাত। গান্ধীজী তাঁর দ্বিতীয় মন্তব্যে রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর অত্যুচ্চ শ্রদ্ধার উল্লেখ করে তাঁর অভিমতের এই সরল ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রাজা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের মহত্ত্বকে একটুও ছোট করে দেখাবার মতো মনোবৃত্তি তাঁর নেই। 'আমি শুধু দুই নেতৃত্বের দুই প্রকৃতির কথা বলেছি।'

প্রকৃত জননেতা বলতে কী বোঝায় এবং সেই নেতৃত্বের প্রকৃতি ব্যাপ্তি ও বিশিষ্টতা কী রূপে ও প্রকাশে অভিব্যক্ত হয়, তারই পরিচয় সরল করে বলবার জন্য গান্ধীজী ওই মন্তব্য করেছিলেন। জনজীবন ও জনতার মনে চৈতন্যদেবের যে প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছিল, তার প্রশস্ত সীমায়তন লক্ষ্য করেই গান্ধীজী ওই উক্তি করেছিলেন। রামমোহনের মহোচ্চ ব্যক্তিত্বের সব সত্য উপলব্ধি ক'রেও বলতে হয় যে, তাঁর মনস্বিতার ও ভাবনার প্রভাব জনজীবনের এমনতর প্রশস্ত কোন অংশের উপর প্রেরণা বিস্তারিত করেনি। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি বাংলা সমাজজীবনে ঐতিহ্য ও ইতিবৃত্তের বহু বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, তিনি একটি সমীক্ষালব্ধ তথ্যের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, বাংলার কামার-কুমোর-তন্তুবায় প্রভৃতি বিভিন্ন কারুশ্রমিক সমাজের প্রায় সমুদয় অংশ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষিত। ডঃ দত্তের মতে, এই প্রত্যক্ষ সত্যটিই নিঃসংশয়ে অন্য একটি সামাজিক সত্যের পরিচয় বহন করছে। সেই বৃহৎ ও বিশিষ্ট এবং সৌভাগ্যকর সামাজিক সত্যটি এই যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মমত সেদিনের হিন্দু সমাজের অন্তর্গত এই কারু-শ্রমিক সমাজকে ইসলামে দীক্ষিত হবার পরিণাম থেকে রক্ষা করেছে। পরবর্তীকালের আরও একটি বিলক্ষণ সত্য এই যে, খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকটি তাঁদের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মভাবে পরিতুষ্ট হিন্দু কারুশ্রমিক জনসমাজের অভ্যস্ত ধর্মনিষ্ঠা একটুও বিচলিত করতে পারেনি। এই জনসমাজের কোন বৃহৎ অংশ খ্রীষ্টান হয়ে যায়নি, যদিও হিন্দুসমাজের অন্য অনেক অংশের জনজীবনে ঢালাও প্রকারে খ্রীষ্টান হবার দৃশ্য দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

ঐতিহাসিক ডঃ যদুনাথ সরকার তাঁর লিখিত 'শ্রীচৈতন্য অ্যাণ্ড হিজ টাইম্‌স্' গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের ভাব ও প্রভাবের কিছু তথ্য সমাহার করে অনুরূপ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার কথা লিখেছেন। শ্রীচৈতন্যকে ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য অনুযায়ী বাংলার একটি প্রধান রেনেসাঁস তথা নবোন্মেষের প্রবর্তক বলে ধারণা করতে হয়। তাঁর আগে, পালযুগের সেই বৌদ্ধ ভাবনায় অনুপ্রাণিত বঙ্গীয় উত্তর খণ্ডের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নবোন্মেষ দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু জনজীবনের বিরাট ও বৃহৎ অংশের হৃদয় স্পর্শ করে একটি মহান্ অনুভবের অভ্যুদয় সেই নবোন্মেষের মধ্যে সম্ভব হতে দেখা যায়নি, যদিও রাজনীতিক সামরিক শক্তিমত্তায় সেই পালযুগের বাংলার কিছু উন্নততর প্রতিষ্ঠার কথা ঐতিহাসিকেরা প্রশস্তির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। পালযুগের মূর্তিকলার নবোন্নতিও একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্বের সত্য। কিন্তু জনজীবনে সাংস্কৃতিক আগ্রহের একটি পূর্ণ রূপের প্রথম অভ্যুদয় চৈতন্যপ্রভাবিত যুগেরই ঘটনা। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিবিধ অনুশীলনের নতুন রম্যতা প্রকট করে চৈতন্য প্রভাবিত যুগ বস্তুত বাংলার একটি প্রাণময় আত্মবিকাশের নবযুগ বলে অভিহিত হতে পারে।

সাহিত্যের নববিকাশ চৈতন্যপ্রভাবিত যুগের একটি প্রধান সাংস্কৃতিক উপহার। বাংলা ভাষাতে সত্যই বৈষ্ণবীয় চিত্তের ফুলবনমধু লয়ে গীতিময় আনন্দের সুরস যেন সর্বজনীন পরিতৃপ্তির অভিষেক সম্ভব করেছিল। এই পরিতৃপ্তি নিতান্ত উল্লেখমূলক একটা সন্তুষ্টির

ব্যাপার নয়। একটি দিব্য অনুভবের পরিতৃপ্তি। জনজীবনে ভক্তিময় ভাবনা ও অনুভবের অভিসিঞ্চন। বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক বলেন, এরকমের ভক্তিভাব প্রধান চিন্তারীতিই জাতির নূতন প্রতিভার সৃষ্টি সম্ভব করে। এবং সেই প্রতিভা সাহিত্যের সৃষ্টিতে সবচেয়ে সার্থক শক্তি হয়ে কাজ করে। বাংলার বৈষ্ণব গীতি ও কাব্যের সাহিত্য তারই প্রমাণ। এই সাহিত্য আজও প্রাণের অপরাহত আবেগে একটি বিস্ময়ের কল্লোল জাগ্রত করে রেখেছে। অন্যভাবে বলা যায়, এই বিস্ময়ের কল্লোল বাংলা সাহিত্যের জীবনে একটি অফুরাণ প্রেরণা। বিখ্যাত ঐতিহাসিকের উক্তিটিকে আজও পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে বিশ্বাস করতে হয়—চৈতন্যযুগের কাল ফুরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু চৈতন্যযুগের প্রেরণা কখনও ফুরিয়ে যেতে পারে না।

বৈষ্ণবীয় ভাবনার দান

ভারতে খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচারক মিশনারীদের দুই শত বৎসরের অভিজ্ঞতার একটি বিস্ময়ের কথা তাঁদের অনেকের লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। বিস্ময় এই যে, খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের প্রচার ভারতের উপজাতীয় আদিবাসী জনসমাজের এবং হরিজন সমাজের মধ্যে সফল হতে পেরেছে বটে,কিন্তু বৈষ্ণবীয় ভক্তি ও বিশ্বাসে দীক্ষিত জনসমাজের মধ্যে সামান্য সফলতাও লাভ করতে পারেনি। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-প্রচারকের মুখে তাঁদের অভিজ্ঞতার এই সত্যটি স্বীকৃত হলেও তাঁরা এর কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি। তাঁদের পক্ষে এটাও স্বাভাবিক, কারণ তাঁরা বৈষ্ণবের সমাজ-ভাবনার ঐতিহাসিক শক্তির পরিচয় কিছুই উপলব্ধি করতে পারেনি, এবং সেই শক্তির পরিমাপ করবার মতো কোন যুক্তিসিদ্ধ বিচারও তাঁদের চিন্তাতে সম্ভব হয়নি। যদি সম্ভব হতো তবে তাঁরা তাঁদের ওই বিস্ময়ের ব্যাখ্যা অবশ্যই খুঁজে পেতেন।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের কৃতী পণ্ডিত ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সামাজিক আদর্শের বিচার ও বিশ্লেষণ করে আরও একটি ঐতিহাসিক বিস্ময়ের সত্য আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে, মুসলিম রাজশক্তির সমর্থন ও সাহায্য নিয়েও ইসলামের প্রচার বঙ্গদেশের বৈষ্ণব জনসমাজের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে ব্যাপক আকার ও প্রকারের কোন ধর্মান্তরিত পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। ইসলামের প্রচার মাঝে মাঝে কঠোর আবেগে উৎসাহিত হয়ে হিন্দুর সামাজিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে প্লাবনের মতো প্রবেশ করেছিল বটে, কিন্তু বিনীত বৈষ্ণবের ঘরের আঙ্গিনাতে প্রবেশ করতে পারেনি। অনুমান করলে ভুল হবে না যে, বিনীত বৈষ্ণবের অবিচল সামাজিক শক্তি ইসলামীয় প্রচারের সেই প্লাবনকে প্রতিহত করেছিল। বৌদ্ধ, অর্ধ-বৌদ্ধ এবং অ-বৈষ্ণব হিন্দুর নিম্নসাধারণ শ্রেণীর বেশীর ভাগই ইসলামের কাছে বস্তুত খুবই সহজে আত্মসমর্পণ করেছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব তার নিজের ধর্ম-বিশ্বাসে অবিচল নিষ্ঠা রক্ষা করে তার সামাজিক সংহতিকেও অটুট রেখেছিল। ঘটনার মধ্যে এই সত্যেরই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বিশ্বাস ও ধর্ম ভাবনার মধ্যে সামাজিক উদারতার এমন এক সংগঠনের তত্ত্ব নিহিত আছে, যা চিরকালীন সত্যে সমাশ্রিত।

আধুনিক গণতন্ত্র সামাজিক উদারতার ও সামাজিক শক্তির একটি বনিয়াদ বলে অভিহিত হয়ে থাকে। মনীষী বেন্থাম প্রচার করেছেন—সমাজের সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সর্বাধিক পরিমাণের কল্যাণ সম্ভব করাই সার্থক গণতন্ত্রের আদর্শ। ভারতের গান্ধী এই আদর্শের মহত্ত্ব

স্বীকার করেও উপলব্ধি করেছেন যে, প্রকৃত গণতন্ত্রের কাজ হবে সকলের কল্যাণ-সাধনা, নিতান্ত সর্বাধিক সংখ্যকের (গ্রেটেষ্ট নাম্বার) কল্যাণসাধনা নয়। গান্ধীজীর সর্বোদয় আদর্শ এই নীতি থেকে উদ্ভূত। ধারণা করলে ভুল হবে না যে, বৈষ্ণবের 'জীবে দয়া' আদর্শ এই সর্বোদয় তথা সর্বহিত আদর্শের প্রথম ঘোষণা।

সামাজিক সংগঠন ও সমাজহিতের প্রকৃতি এবং পদ্ধতির নির্মাণের যে যে রীতি-নীতি বৈষ্ণবের প্রতিভার দান, তার ঐতিহাসিক মূল্য ও মর্যাদা আজকের গণতন্ত্রের পক্ষে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। বলতে পারা যায়, জীবনের প্রসন্নতা ও আনন্দের সকল বিষয় ও বস্তুকে লোকগত করবার আদর্শটি আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বৎসর আগের নবদ্বীপের নূতন ভক্তিবাদে অভিষিক্ত হৃদয়ের দান হয়ে দেখা দিয়েছিল। ধর্ম শিল্প সঙ্গীত সভ্য মানবতার যাবতীয় ঐশ্বর্যকে সাধারণ জনতাব অধিকারের আধারে স্থাপিত করবার শিক্ষা এবং রীতি-নীতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রতিভা ও কৃতিত্বেরই সৃষ্টি। মুক্তকণ্ঠে বলতে পারা যায়, আধুনিক গণতন্ত্রের পক্ষে বিনীত হয়ে আজ বৈষ্ণবের আদর্শ থেকে প্রকৃত সমাজহিতের পদ্ধতিটিকে চিনে নেবার ও বুঝে নেবার প্রয়োজন আছে।

প্রথম ভারত-পথিক : শ্রীচৈতন্য

কেমন ছিল সেদিনের ভারতজীবন? আপনাকে সেই লুকিয়ে বাখা ও ধুলোয় ঢাকা জীবন? অনুমান করবার দরকার হয় না ; ইতিহাসের অজস্র তথ্যে সেদিনের ভারতের যে রূপ চিত্রিত হয়ে ফুটে ওঠে, সে এক হতমান ভাগ্যের ধূমজ্বালার রূপ। দেশ জাতি সংস্কৃতি ও ধর্ম, সবই আগন্তুক এক বৈরিতার প্রবল অনাচারে ব্যথিত ও অবমানিত। যারা দেশের মানুষ, তাদের কাছে ভারত তখন একটি মূক আর্তনাদ মাত্র। এবং, যাঁরা দেশের রাজশক্তি ও শাসক, তাঁদের কাছে, তাঁদের ধারণা কল্পনা ও অনুভবে ভারত নামে কোন বোধ অথবা সংস্কারের সামান্য ছায়ার আভাসও তখন ছিল না। প্রায় তিনশত বৎসরকাল এদেশের আলোছায়ার মধ্যে বসবাস করেও তাঁদের কাছে এদেশ তখনও ছিল দারউল-হার্ব ; শত্রুর দেশ। তাঁদের স্বপ্নে তখন প্রতিজ্ঞা ছিল, দেশটিকে মুসলিমের দেশে পরিণত করতে হবে। তার অর্থ, এতদিনের ভারত-পরিচয়, দু হাজার বছর ধরে ধর্ম ও সংস্কৃতির যে রূপ বহন ধারণ ও লালন করেছে ভারত, সেই রূপ মুছে দিতে হবে। অপর দিকে, কোন হিন্দুর কবিত্বে ভারতের নাম করে সামান্য একটা বন্দনার নতুন শ্লোক মুখরিত করবার মত সাড়া ও সাহস ছিল না। সেদিনের হিন্দুর কোন মনীষার বাণীতে ভারতবোধ অথবা ভারতচিন্তা প্রসন্ন করে রাখবার প্রয়াস ছিল না। সন্দেহ করলে বোধহয় ভুল হবে না যে, রাজনীতিক আঘাতের বেদনায় অভিভূত হিন্দুর মনে স্বাদেশিকতার বোধও স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে, মুসলিম আগমনের আগেও হিন্দুর জীবনে রাজনীতিক বোধে সত্য হয়ে কোন অখণ্ড স্বাদেশিক ভারত ছিল না। কিন্তু ধর্মবোধে সত্য হয়ে একটি অখণ্ড সাংস্কৃতিক ও স্বাদেশিক ভারত চিরকাল ছিল। পনের শতকের ভারতে হিন্দুর ভক্তিসাধনা এবং ঐশ্বরিক নাম রূপ ও সংস্কারের নূতন অভ্যুদয়ের মধ্যে নবচেতনার অনেক প্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু ভারতবোধের দীপ্ত প্রকাশ ছিল না।

এ হেন একটি যুগে, ধূলিক্লিন্ন অবসাদ ও স্তব্ধতার মধ্যেই দেশবোধের বিস্ময়কর এক বাণী ধ্বনিত হয়েছিল। বিস্মৃত ঐতিহ্যেরই নূতন জাগরণী বাণী। রুদ্ধ দুয়ারের কপাটে

সামান্য ঢোকার শব্দ নয়, সে ধ্বনি ছিল তিমির-বিদারক এক উদার অভ্যুদয়ের মহানাদ, যদিও তার সঙ্গে মৃদঙ্গের মিষ্টি রোল ও কৃষ্ণপ্রেমের আকুলতা মিশেছিল। আর কেউ নয়, বঙ্গভূমির শ্রীচৈতন্যের জীবনই সেই বাণী ধ্বনিত করেছিল।

ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'চৈতন্যচরিতামৃত'-য় যে ভাষায় ভারত-বোধের একটি আদর্শ পরিচয় প্রকাশ করেছেন, সেটা নিশ্চয় নিতান্ত তাঁরই ব্যক্তিগত বিশ্বাসের একটি সাহিত্যিক প্রবচন নয়। তিনি শ্রীচৈতন্যেরই বিশ্বাস উপলব্ধি ও অনুভূতির কথা বলেছেন। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থের রচনাকাল যদি ১৫৬৫ থেকে ১৫৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যেও হয়, তবু বলতে হবে যে, চৈতন্যের তিরোভাবের পর পঞ্চাশটি বৎসরও পার হবার আগে চৈতন্যেরই ভাবনার ভক্ত এক বাঙালী কবির লেখায় ভারতবোধের ওই উদাত্ত বাণী প্রচারিত হয়েছিল। কবির উক্তিকে তথ্যের দলিলের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার দরকার হয় না ; এবং কোন সন্দেহ নেই যে, কবিরাজ কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের উপলব্ধির ধ্বনিকেই প্রতিধ্বনিত করেছেন। ষোল শতকের ভারতীয় সাহিত্যে অন্য কোন কবি মনীষী ও সাধকের বাণীতে ভারতবোধের এত স্পষ্ট অভিব্যক্তি ও এরকম মুক্তকণ্ঠ ঘোষণায় দ্বিতীয় কোন উদাহরণ পাওয়া যাবে না।

খুবই অর্থগূঢ় ওই উক্তি। ভারত এখানে নিতান্ত একটি আইডিয়া তথা ভাবমাত্র নয়, ভারত একটি তত্ত্ব। বিশ্বাসে সংস্কারে ও ঐতিহ্যে গঠিত একটি সত্তা। ওই উক্তিতে যেমন গরীয়সী জন্মভূমির বন্দনা আছে, তেমনই আছে নাগরিক ধর্মের একটি আদর্শের পরিচয়। জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা এখানে সেবাব্রতে দীক্ষিত হয়ে মানবীয় সর্বহিত ও মমতার সাধনায় সার্থক হতে চেয়েছে। দেশপ্রেম ও জাতীয়তার অনেক উদার সংগঠন ও সংজ্ঞা বিশ্বের প্রাচীন ও নবীন অনেক মনীষীর চিন্তায় নির্মিত হয়েছে। কিন্তু মনে হয়, চৈতন্য-প্রচারিত ভারত-তত্ত্বের চেয়ে উদারতার কোন দেশ-তত্ত্ব কোনদিন প্রচারিত হয়নি। এ-যুগের যে সব মনীষী জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে বৃহত্তর মানবতার পরিপোষক একটি উদার সংস্কাররূপে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, তাঁরা অনেক ভাল কথা বলেও সাড়ে চারশত বৎসর আগের বঙ্গভূমির ওই শ্রীচৈতন্যের অভিমতের কথার চেয়ে একটিও বেশি নতুন কথা বলতে পারেননি।

কবি বলেছেন—'বাঙালীর হিয়া মথিত করিয়া নিমাই ধরেছে কায়া'। তার চেয়ে আরও বেশি গর্বের কথা এই যে, এই বাঙালী শ্রীচৈতন্য, যিনি ভক্তির নূতন ধারা সঞ্চারিত করে সেদিনের ভারতের ধর্ম ভাবনাকে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছিলেন, তিনিই হলেন প্রথম ভারত-পথিক, যাঁর চিন্তা শিক্ষা জীবন ও আচরণে ভারতের জাতীয় চেতনার একটি ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের বিরাট অঙ্গীকার ছিল। সেই অভ্যুত্থানের সূচনাও তিনি করেছিলেন।

যে-কালে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব, সে-কালে ভারতের উত্তরাপথের পথ-প্রান্তর ও নদীতট মন্দির ও মূর্তির অবমানিত ও বিধ্বস্ত অদৃষ্ট ধূলিক্লিন্ন ভগ্নস্তূপ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দিল্লীর মসনদে তখন লোদি সুলতানেরা উঠছেন ও বসছেন। চৈতন্যের আবির্ভাবের তিন বৎসর পর সিকান্দর লোদি দিল্লীর মসনদে আসীন হয়ে আটাশ বৎসর রাজত্ব উপভোগ করেন। তারপর ইব্রাহিম লোদি। দিল্লীর কাছে হিন্দুর প্রিয় মথুরাপুরীতে তখন একটিও মন্দির আর দাঁড়িয়ে ছিল না। সবই আগন্তুক ধর্মবিদ্বেষের আঘাতে বিধ্বস্ত

হয়ে অতিকরুণ এক শ্মশানশয্যায় লুটিয়ে পড়েছিল। শ্রীচৈতন্য সেদিনের ভারতের ওই নিদারুণ দিল্লীর পাশে, এবং মথুরার হুয়ার কাছে বৃন্দাবনেই তাঁর প্রচারের পীঠভূমির স্থাপনা করেছিলেন। মনে হতে পারে, কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীচৈতন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতের কৃষ্ণলীলার সেই বৃন্দাবনের জন্য তাঁর স্বাভাবিক শ্রদ্ধার প্রেরণায় বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন, যেমন পরমবৈষ্ণব বল্লভাচার্য গিয়েছিলেন। খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেই সঙ্গে অনুমান করলে কি ভুল হবে যে, বৃন্দাবনে গিয়ে নতুন ভক্তিবাদ প্রচারিত করবার সংঘ গঠন ও স্থাপন করে শ্রীচৈতন্য সেদিনের রাজশক্তির ধর্মবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ ও প্রতিবাদের আগ্রহ উদ্বোধিত করেছিলেন? সেদিনের নানক, রামানন্দ ও কবীর, সকলেই তাঁদের নিজ নিজ প্রদেশের বিশেষ একটি খণ্ডে তাঁদের ধর্ম ও ভক্তির প্রচার সীমায়িত করে রেখেছিলেন। একমাত্র শ্রীচৈতন্যই একটি মহিমময় ব্যতিক্রম। নবদ্বীপ, নীলাচল, বৃন্দাবন ও বারাণসী—শ্রীচৈতন্যের সংঘ যেন সমগ্র ভারতের হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করবার মূর্ত কল্পনা ও প্রয়াস, যার অন্য অর্থ, জাতিক একতার একটি মনোময় পরিবেশের রচনা।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে অবস্থানকালের শেষ দিকে প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয়, এবং মোগল বাবর দিল্লীর মসনদ অধিকার করেন। কিন্তু এই রাজনীতিক পরিবর্তনের ফলে মন্দির ও মূর্তির ভাগ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। ভারতবোধ ও ভারত-পরিচয়ের বিপদের ঘোর একটুও কাটেনি। এবং শ্রীচৈতন্যের সংঘও বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, বরং আরও বেশি উৎসাহিত হয়ে প্রচার আরও বেশি পরিব্যাপ্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের সুলতান হোসেন শাহ্‌ ও নসরত শাহ্‌ যে শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত ভক্তিবাদের উপর প্রসন্ন ছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হোসেন শাহের উদারতার কিছু গল্প অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা রাজনীতিক বুদ্ধির সতর্কতা মাত্র। এবং দেখা যায় যে, স্বয়ং মহাপ্রভুও গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহের সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। গৌড়ের কাছে রামকেলি পর্যন্ত এসে শ্রীচৈতন্য ফিরে গিয়েছিলেন। রূপ ও সনাতন যে হোসেন শাহের কর্মচারিত্বের মোহবন্ধন ছিন্ন করে শ্রীচৈতন্যের সংঘে প্রবেশ করেছিলেন, সে ঘটনা শ্রীচৈতন্যের রাজনীতিক অভীষ্টেরও একটি ইঙ্গিত। গৌড়ের সুলতানী শক্তির প্রতি শ্রীচৈতন্যের মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেটাও অবিদ্রোহ নয়, আপোষও নয়। হোসেন শাহের বন্দী সনাতন কারাগার থেকে পলাতক হয়ে বারাণসীতে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন।

শ্রী কে এম মুন্সী তাঁর 'জয় সোমনাথ' উপন্যাসে গজনীর সুলতান মামুদের ভারত-আক্রমণ কালের ভারতীয় জাতিবোধের নিদারুণ দুরবস্থার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন করেছেন। মূলতানের রাজা অজয় পাল এবং ঝালোরের রাজা বাক্‌পতি গজনীর সুলতানেরই সুগ্রীব সুহৃদ্‌ হয়ে সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করবার পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিলেন। নারকীয় বৈতরণীর শোণিতজলের ধারার মত ভারতীয়ের রাজনীতিক মনোবৃত্তির এই হীনতার ধারা লোদি-রাজত্বের কাল পর্যন্ত গড়িয়ে এসেও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। লক্ষ্য করতে হয়, বঙ্গভূমির কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীচৈতন্য সেই হীনতার ঐতিহ্যকে বাধা দিয়ে স্তব্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং তাঁর সেই চেষ্টা ছিল খুবই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

হোসেন শাহ্‌ উড়িষ্যার হিন্দু-রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, সে পরিকল্পনার প্রতিবাদ করে 'অসহযোগ' ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হননি

সনাতন, হোসেন শাহেরই মন্ত্রী সনাতন। এবং এই সনাতন সেদিন শ্রীচৈতন্যেরই ভক্তি ও ভাবনার এক অনুগামী ও অনুরাগী শিষ্য। ঘটনাটি শ্রীচৈতন্যের রাজনীতিক ধারণা ও উদ্দেশ্যের একটি দিগ্‌দর্শক বলে মনে করলে নিশ্চয় ভুল হবে না।

নবদ্বীপের কাজীর নির্দেশের বিরুদ্ধে জনতার যে অভ্যুত্থান শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছিল, সে ঘটনাও শ্রীচৈতন্যের চিন্তার একটি দিগ্‌দর্শক। সেদিনের ভারতে ধর্মদ্বেষী রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মনোবল স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। সেই স্তিমিত মনোবলের প্রদীপটিকে নতুন করে শিখায়িত করবার চেষ্টা সেদিন কেউ যদি করে থাকেন, তবে একমাত্র শ্রীচৈতন্যই করেছিলেন। কিংবা বলা যায় ; তাঁর মত এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ দিয়ে সেদিনের হিন্দু-ভারতের কোন ধর্মনেতা দিল্লী ও গৌড়ের রাজশক্তির রূঢ় ঔদ্ধত্যকে অমান্য করতে চেষ্টা করেননি। সুবুদ্ধি রায় সুলতান হোসেন শাহের দ্বারা অপমানিত ও উৎপীড়িত হবার পর শ্রীচৈতন্যের আশ্রয়ে এসে শান্তি ও সুস্থিতি লাভ করেছিলেন। এই ঘটনাও প্রমাণিত করে যে, গৌড়ের সুলতানের বিদ্বেষ ও কঠোরতার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্যের প্রতিবাদও ছিল স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

বাড়িয়ে বলেন নি কবিরাজ কৃষ্ণদাস—আসিন্ধুনদীতীর আর হিমালয়, বৃন্দাবন-মথুরাদি যত দেশ হয়—শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধারার প্লাবন ভারতের সকল অঞ্চলের চিত্তভূমিকে কম-বেশি কিছু-না-কিছু রসিত করেছিল। পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্যের ভারত পর্যটন বস্তুত এক বিশাল ভারত-প্রেমিকের পথ-পরিক্রমা। এই পরিভ্রমণ এক ভক্তের তীর্থাটন বটে, এবং নূতন ভক্তির প্রচারও বটে ; কিন্তু ধারণা করলে ভুল হবে না যে, শ্রীচৈতন্য যেন ভারতের পূর্ব-পশ্চিম এবং উত্তর-দক্ষিণের জনচিত্তে ভারতবোধের নূতন সঞ্চার সৃষ্টি করে দেশ ও জাতিকে একটি মহৎ ঐক্যবোধে সমন্বিত করবার চেষ্টা করেছিলেন।

নগরে নগরে আজি করিব কীর্তন।
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগরমণ্ডন॥
সন্ধ্যাতে দেউটি সব জ্বাল ঘরে ঘরে।
দেখোঁ কোন কাজী আসি মোরে মানা করে॥

এই বাণী শুধু ধর্মনিষ্ঠার বাণী নিশ্চয় নয়, রূঢ় রাজপ্রতাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরও বাণী। এবং সকলেই জানেন যে, ওই বাণীতে সংগ্রামের যে পদ্ধতির পরিচয় আছে, বিংশ শতাব্দীর ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সেই পদ্ধতিকে বিপুলভাবে গ্রহণ করবার প্রয়োজন হয়েছিল। যাঁরা একালের ভারতের বারডোলি সত্যাগ্রহের বিবরণ পাঠ করেছেন, তাঁরা জেনে আশ্চর্য হবেন যে, শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ ঠিক যে-ভাবে ঘরে ঘরে দেউটি জ্বালিয়ে বিপুল এক সংকল্পময় প্রতিবাদের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছিল, বারডোলির জনতা প্রায় হুবহু সেইভাবে ও সেই প্রকারে এবং সত্যিই 'ঘরে ঘরে দেউটি জ্বালিয়ে, সরকারী অনাচারের নির্দেশ তুচ্ছ করেছিল।

কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা-প্রবর্তন।
লুপ্ততীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ।

বিশেষ লক্ষ করবার বিষয়, শ্রীচৈতন্যের জীবনের সংকল্পিত ও আচরিত ওই পাঁচটি প্রিয় ব্রতের মধ্যে লুপ্ততীর্থের উদ্ধারও একটি ব্রত। এবং স্মরণ করাও দরকার যে, শ্রীচৈতন্য যে-কালে বৈষ্ণবের ধর্মসাধনার একটি পরিচর্যা হিসাবে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের ব্রত বিহিত

করেছিলেন, সে-কালে মূর্তি ও মন্দিরের ধ্বংসে মুসলিম রাজশক্তির একটি ধর্মীয় ব্রত ছিল। এহেন যুগে যে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ও প্রেরণায় নূতন ভক্তির অভ্যুদিত উৎসাহ লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের প্রয়াসে সার্থক হতে চেয়েছিল, তাঁকে অসাধারণ এক নির্ভয়ের সাধক বলে মনে করতে হবে। আরও মনে করতে হয়, সেদিন তাঁরই নেতৃত্বে মূর্তি ও মন্দিরের ঘাতক সেই ভয়ানক বিদ্বেষের প্রতিরোধ জাগ্রত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্য ছাড়া সেকালে অন্যান্য নব অভ্যুদিত ভক্তির ও ধর্মমতের কোন নেতা লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন বলে শোনা যায় না। এর একটি কারণ বোধহয় এই যে, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করতে হলে মুসলিম রাজশক্তির কোপভাজন হবার পরিণামও স্বীকার করে নিতে হতো। দেবতার নামে নূতন ভক্তির বাণী উদ্গীত করেছেন, এমন ভক্তও দেবতার পীঠভূমিকে ভগ্নস্তূপের ও অরণ্যের আবরণ সরিয়ে উদ্ধার করবার চেষ্টা ও আগ্রহ পরিহার করে দুরন্ত উপদ্রবের আঘাত পরিহার করাই ভাল বলে বুঝেছিলেন। বাংলার নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের অধিকার ওভাবে পরিহার করে চলবার পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেন নি। তিনি অধিকারের প্রতিষ্ঠারই পথ বেছে নিয়েছিলেন। এবং সেই পথে চলতে গেলে যে রাজশক্তির কোপভাজন হতে হবে, এই কঠোর ও বাস্তব সত্যটুকু তাঁর নিশ্চয় অজানা ছিল না। ভারতের ইতিহাস-রচয়িতা পণ্ডিতদের অনেকেই শ্রীচৈতন্যের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার পরিকল্পনার বৃহত্তর তাৎপর্য ঠিক বিচার করে বুঝতে পারেন নি, কিংবা বিচার করতে ভুলেই গিয়েছেন। তা না হলে তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতেন যে, শ্রীচৈতন্যের পরিকল্পিত লুপ্ততীর্থের উদ্ধার ভক্ত বৈষ্ণবের ধর্মনিষ্ঠ আগ্রহের দাবি হয়েও ঐতিহাসিক অর্থে নিগৃহীত জাতির আন্তরিক অভ্যুত্থানের এবং হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধারের দাবি।

কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, মাধবেন্দ্রপুরী কেন এবং কেমন করে বৃন্দাবনের গিরি গোবর্ধনের গোপালমূর্তিকে অরণ্যের গোপন নিভৃতের নির্বাসন থেকে উদ্ধার করেছিলেন। 'শৈল উপর হইতে আমা কুঞ্জে লুকাইঞা, ম্লেচ্ছভয়ে সেবক আমার গেল পলাইঞা।' মাধবেন্দ্রপুরী এই নির্বাসিত গোপাল-মূর্তিকে উদ্ধার করবার জন্য গ্রামের মানুষকে আহ্বান করলেন—গ্রামের উপরে তোমার গোবর্ধনকারী, কুঞ্জে আছেন তাঁরে চল বাহির যে করি। কুঠার ও কোদাল হাতে নিয়ে গ্রামের মানুষ মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে এগিয়ে গেল। 'শুনি তাঁর সঙ্গে লোক চলিল হরষে, কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিল প্রবেশে।' 'মাটি-তৃণে আচ্ছন্ন অঙ্গ' আবরণ অপসারিত করে গোপাল-মূর্তিকে তিনি তুলে নিলেন। বিপুল উৎসবের সঙ্গে মূর্তির অভিষেক অনুষ্ঠান এবং নূতন প্রতিষ্ঠাও সম্পন্ন করা হলো। ঘটনাটি নিশ্চয় প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহলের কীর্তি নয়। ধর্মভাবনার অধিকার ও স্বাধীনতাকে ভয় ও অপমানের ধূলিশয্যা থেকে তুলে নিয়ে নতুন প্রতিষ্ঠার গৌরবে অভিষিক্ত করবার কীর্তি।

প্রখ্যাত হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীরামধারী সিং দিনকর ভারত-সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ের আলোচনায় প্রসঙ্গত পনের-ষোল শতকের নূতন ভক্তি ও ধর্মসাধনার অভ্যুদয়ের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : কোন কোন সন্ত ও ভক্ত মহাজনের মুখে প্রতিমা-পূজার যে নিন্দার ঘোষণা শোনা যায়, সেটা ভারতের রাজনীতিক বিজয়ী মুসলিমের প্রভাবের ফল। এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কোন কোন সন্ত মহাজন দেবতার বন্দনা করেও মূর্তির নিন্দা করেছেন।

তবে কি এই ধারণা করতে হবে যে, কোন কোন ভক্তিবাদী মহাজনের জীবন ও প্রচার

যে সাকার ঈশ্বরের পরিবর্তে নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা গ্রহণ করেছিল, সেটা পরিবেশ ও অবস্থার একটা কঠোর প্রভাবের ফল? অথবা তুগলক ও লোদি সুলতানের পছন্দের অনুগত একটি ধর্মমতের নির্মাণ? এরকমের প্রশ্ন করলে বস্তুত খুবই কঠোর একটি সন্দেহ ও অভিযোগ প্ররোচিত করা হয়। এবং বিশ্বাস করবার যুক্তিও আছে যে, সে-কালের ভক্তিবাদী মহাজনদের মধ্যে যাঁরা নিরাকার এক-ঈশ্বরের ভজনা প্রচারিত করেছিলেন, তাঁরা আন্তরিক উপলব্ধির সঙ্কেতেই গ্রহণ করেছিলেন। ইংরাজ হাণ্টার সাহেব ও তাঁর ধারণার অনুরূপ ধারণার প্রচারক একশ্রেণীর ঐতিহাসিকের অভিমতের প্রতিবাদ করে ডক্টর যদুনাথ সরকার তাঁর 'ইণ্ডিয়া থ্রু দি এজেস' গ্রন্থে লিখেছেন যে, ভারতীয় হিন্দুর একেশ্বর-বিশ্বাস আদৌ মুসলিম চিন্তার উপহার নয়। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রাচীন ভারতেরই জ্ঞানীর উপল[illegible]থা। যাই হোক, শ্রীচৈতন্যের জীবনের বিশেষ সত্য এই যে, বাহিরের কোন প্রভাবের প্রশ্ন ও বিচার তাঁর ছায়ার কাছেও আসতে পারে না। তাঁর ভক্তি ও ধর্মমতের মধ্যে মুসলিম রাজশক্তির পছন্দের অনুগত হবার কোন চেষ্টা ও আগ্রহের চিহ্নও নেই। ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে তিনি কোন প্রতাপের ইচ্ছা ও পছন্দের সঙ্গে আপোষ করেন নি। বর্ণাশ্রমী, সাকার ঈশ্বরের পূজক ও মূর্তি-অনুরাগী সেই শ্রীচৈতন্যই সামাজিক জীবনের উদার সাম্য এবং মানবীয় সেবা ও মমতার নূতন স্রষ্টা হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকের অভিমতের কথাই ধরা যাক। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের একটি মন্তব্য : কবি বিজয় গুপ্ত গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহকে আদর্শ প্রজারঞ্জক নৃপতি বলে বর্ণনা করেছেন। সুলতানকে মহাভারতের বীর অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আর-একজন হিন্দুকবি সুলতানের স্তাবকতায় আরও এগিয়ে গিয়েছেন। যে সুলতান হিন্দুর মন্দির চূর্ণ করেছিলেন, সেই সুলতানকেই কলিযুগের কৃষ্ণাবতার বলে তিনি স্তুতি করেছেন। এই সবই প্রমাণিত করে তিনশত বৎসরের রাজনীতিক দাসত্ব এবং ধর্মীয় নির্যাতন বাংলার হিন্দুর কী নিদারুণ নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়েছিল! এই অবস্থায় শ্রীচৈতন্য এসে বাঙালী হিন্দুর প্রাণে নূতন চৈতন্য সঞ্চারিত করলেন।

শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের এই বিশেষ পরিচয় অন্য অনেক ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে শুধু একজন 'রিফরমার' বলে চিনেছেন ও বুঝেছেন। তাঁর জীবনের ঘটনা ও বৃত্তান্ত, তাঁর প্রচার প্রয়াস ও পরীক্ষা, তাঁর ভাবনা ও কল্পনা—সবই কিন্তু প্রমাণিত করে যে, তিনি ছিলেন ভারতীয় জাগৃতির এক মহান্ স্রষ্টা। রাজনীতিক দাসত্বের প্রকোপে জাতি সেদিন মনোবল হারিয়ে যে হীনদশা স্বীকার করে নিয়েছিল, তিনি ছিলেন সেই হীনদশারই অপনোদন ও অপসারণের এক মহান্ সাধক। তিনি সেদিনের ভারত-ভাবনাকে বিরুদ্ধ রাজশক্তির আঘাত থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রতিরোধের সংকল্প ও আগ্রহ সঞ্চারিত ও সংগঠিত করেছিলেন। কবি তুলসীদাস (চৈতন্যের পরবর্তী কালের) বলেছেন—'কোই নৃপ হোয়, হমহি কা হানি'। দেশের রাজা যে-কেউ হোন না কেন, তাতে আমার কী ক্ষতি? ভারত-জীবনে তুলসীদাসের রামভক্তির দান গৌরব ও গুরুত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেও বলা যায়, দেশের রাজশক্তির ভাল-মন্দ চরিত্র সম্বন্ধে এ-ধরণের ঔদাসীন্য জাতির অদৃষ্টের ভয়ানক বিপদ হয়ে ওঠে। এই ঔদাসীন্য শ্রীচৈতন্যের ছিল না ; বরং বলা যায়, যা ছিল সেটা ঔদাসীন্যের ঠিক বিপরীত এক স্পৃহা, একটি সুস্পষ্ট সংকল্প ও কর্মময় পরিকল্পনা। রাজশক্তির বিরুদ্ধতার প্রকোপ প্রতিহত করে ভারতবোধের জাগৃতি সম্ভব

করবার প্রেরণা। তর্ক করার জন্য বলা চলে, শ্রীচৈতন্য তো নিতান্ত হিন্দু-জীবনেরই জাগৃতি চেয়েছিলেন। খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেদিনের হিন্দু ভারতই ছিল একমাত্র ভারত। মুসলিম রাজশক্তি ও সমাজের চিন্তায় ভারতবোধের কোন উন্মেষ তখনও সম্ভব হয়নি। হ্যাঁ, মুসলিম কবি আমীর খসরু, হিন্দু পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের ষাট বৎসর পরে মুসলিম সুলতানের রাজত্বকালে যাঁর জন্ম, তাঁর মত দেশপ্রশস্তি সেদিনের কোন হিন্দুকবির কণ্ঠেও শোনা যায়নি। তিনি এই দেশের (ভারতের) গুণগান করে এমন কথাও বলেছেন যে, এই দেশ স্বর্গের চেয়েও সুন্দর। এবং আদম ও ইভ স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হবার পর এই ভারতে এসে ঠাঁই নিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, আমীর খসরুর এই দেশবোধ ঠিক ভারতবোধ ছিল না। অথবা বলা যায় তাঁর ভারতবোধ সম্পূর্ণ ছিল না। মন্দির মূর্তি ও ধর্মের ভারতের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ না থাকুক, সহিষ্ণুতাও ছিল না। তিনি শিল্পীর চোখ নিয়ে ভারত নামক একটি সুন্দর দেশকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তায় ভারত ঐতিহ্যকে মমতা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রেরণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

বঙ্গভূমির শ্রীচৈতন্যেরই অনুভব ও উপলব্ধির কাছে প্রতীত হয়েছিল যে, ভারতের বিশেষ একটি সাত্ত্বিক রূপ আছে ; ভারত একটি তত্ত্ব। তাঁর আগে শ্রীশঙ্করাচার্যের চিন্তায় ভারতবোধের নব সংগঠনের কিছু স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবং এই ভারতবোধ প্রথম যেদিন নিদারুণ আঘাতে বিপন্ন ম্রিয়মান ও লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, সেদিন সেই ভারতবোধের জাগৃতি সম্ভব করবার জন্য প্রথম চেষ্টা যিনি করেছিলেন, তিনি বঙ্গভূমির শ্রীচৈতন্য। তাই তিনি প্রথম ভারত-পথিক।

সুরেশচন্দ্র

পরম আকস্মিকের উপহারের মত জীবনে হঠাৎ একদিন এমন এক মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম, যাঁর প্রথম কথাতেই পেয়েছিলাম শুভাকাঙক্ষার পরিচয় আর স্নেহ। তখন কল্পনা করতে পারিনি যে, সেই হঠাৎ সান্নিধ্যই নিবিড়তর এক সম্পর্ক হয়ে উঠবে এবং ভবিষ্যতের কাজের জীবনে সেই মানুষটিকেই গুরু সুহৃদ ও আপনজন বলে মেনে নিতে হবে। দেশের মানুষ অনেকদিন আগেই তাঁকে জেনেছিল, আমি জেনেছি অনেক পরে। আজ তাঁর তিরোধানে সারা দেশের নায়ক গুণী জ্ঞানী ও সুধী ব্যক্তির শোকবেদনার ভাষাতে সেই মানুষটির জীবনের গৌরব ও সম্মানের পরিচয় আরও ভাল করে জানতে ও বুঝতে পারছে দেশের মানুষ। সুরেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত সান্নিধ্য ও সম্পর্কের স্নেহে যারা প্রীত ও কৃতজ্ঞ, আজ তাদের মনের বেদনা ঠিক সেই পথিকমনের বেদনারই মত, পথের পাশের ছায়াতরুটি হঠাৎ অন্তর্হিত হলে যে শূন্যতার বেদনা জাগে পথিকের মনে। তিনি নেই, তাঁকে আজ শুধু চিত্ত ভরে স্মরণ করবার সুযোগটুকু আছে, এই স্মরণে বেদনা আছে আনন্দও আছে এবং স্মরণ করলেই ব্যক্তিগত কথা এসে পড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত কথা থাক, আজ শুধু ঐ মানুষটির জীবনের রূপ আরও স্পষ্ট করে বুঝতে ইচ্ছা করে, যে জীবনের গৌরব দেশের ও দশের কাছেই এক বিস্ময়কর কীর্তি ইতিহাসের গৌরবের মতই অনুভূত ও স্বীকৃত হয়েছে।

লগ কেবিন থেকে হোয়াইট হাউসে পৌঁছবার ইতিহাস ভাগ্যবলে বলীয়ানের পথ পরিক্রমার ইতিহাস বললে ভুল বলা হয়, আসলে সেটা হলো কর্মবলে বলীয়ানের পথ

পরিক্রমার ইতিহাস। দুরূহ পরীক্ষায় আকীর্ণ সেই পথে অগ্রসর হবার সব চেয়ে বড় সহায় হলো চরিত্র এবং ধন্য তাঁরা ও সার্থক তাঁদেরই জীবন, যাঁরা সেই চরিত্র অর্জনে সকল শ্রম নিষ্ঠা ও পরীক্ষা স্বীকার করেন। সুরেশচন্দ্রের জীবনের কাহিনী দেশের প্রত্যেক যুবকের কাছে শিক্ষা ও প্রেরণার কাহিনী। কর্ম ও কৃতিত্বের ক্ষেত্রে অতি সাধারণ সূচনা থেকে অসাধারণ পরিণামে উন্নীত হবার কাহিনী। সুযোগ ও সম্পদের পুষ্পে আকীর্ণ কোমলপথে সুরেশচন্দ্রের জীবনের যাত্রা আরম্ভ হয়নি। বরং ঠিক তার বিপরীত। কিশোর কালেই তাঁকে জীবনের পথে প্রথম অভিবাদন জানিয়েছিল বিঘ্ন, অভাব ও অসহায়তা। আশা তাঁকে অনায়াসের বাঁশির সুরের মত আহ্বান করেনি, বজ্রনাদব্যথিত কঠোর প্রয়াসের পথেই আহ্বান করেছিল। দুরূহতার ভ্রূকুটি এবং কর্মের কঠোরতাকে জীবন দেবতার দানের মতই স্বীকার করে নিয়ে সেই তরুণের চরিত্র যে শক্তির অধিকার অর্জন করেছিল, সেই অধিকারের বলেই শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্ত অভিযাত্রীর মত বিপুল বাধা অতিক্রম করে কীর্তিকের সাফল্যের সিংহদ্বারে তিনি উপনীত হয়েছিলেন।

বৈষয়িক ঐশ্বর্যের মত ক্ষমতা এবং সফলতার মধ্যেও নাকি মাদকতা আছে, যার স্পর্শে ক্ষমতাবান ও কৃতীর মনে অহমিকার মত্ততা জাগে। কিন্তু এই অবাঞ্ছিত সত্যটিই নিতান্ত মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল সুরেশচন্দ্রের জীবনে। জীবনে সফলতা ও ক্ষমতা, উভয়ই অজস্র পরিমাণে অর্জন করতে পেরেছিলেন সুরেশচন্দ্র, কিন্তু কি আশ্চর্য, সেই সফলতা ও ক্ষমতার স্পর্শেও তাঁর জীবন মৃদুল বিনয়ের অভিষেক লাভ করেছিল। বুঝতে হবে, আধার সুন্দর ছিল বলেই আধেয় সুন্দর হতে পেরেছিল। ঠিক কথা, বৈষয়িক সম্পদেও তিনি সম্পন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু কে না জানে, অতি নির্ধন নগণ্য এক কর্মপ্রার্থীর প্রতিও তিনি কতখানি সম্মান রেখে কথা বলতেন। এর চেয়েও বড় এক পরীক্ষাতেও তিনি প্রমাণিত করেছিলেন যে, ক্ষমতা, সম্পদ ও সফলতা তাঁর মনে কোন কৃতিত্বচেতন অহমিকা সঞ্চার করতে পারেনি। শুধু রাজনীতিক কর্মক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য কর্মের ক্ষেত্রেও তিনি অন্য পক্ষের, প্রতিপক্ষের, এমনকি রূঢ় সমালোচকের প্রতি আচরণে যে ধৈর্যের ও সহ্যের পরিচয় দিয়ে এসেছেন, তার তুলনা বিরল। শক্তিমান তার শক্তিকে অসাধারণ সংযমে বিনম্র করে রাখতে পেরেছিলেন। বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তপ্ত ধূলিঝঞ্ঝা সৃষ্টি করা তাঁর রীতি ছিল না এবং মতভেদের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন বিস্ময়কর সহিষ্ণুতায় শান্ত। বিশেষ ঘটনা, বিশেষ অভিমতের ও বিশেষ মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁর মনে ও আচরণে অবশ্যই প্রতিবাদ ছিল এবং তার জন্য তাঁকে সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হতে দেখেছি, এবং আরও দেখেছি, সংগ্রামে তিনি কী দুর্জেয় প্রতিজ্ঞায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু মানুষের প্রতি আচরণে তিনি নির্বিশেষে সুহৃদ শান্ত ও মমতাপ্রবণ। মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা প্রীতি ও বান্ধবতা কোনরকম কঠিন মতবাদের সর্তে বাঁধা ছিল না। বোধ হয় মানুষকে ঘৃণা করবার শক্তিই ছিল না সুরেশচন্দ্রের। নইলে অপকারীও এসে তাঁর কাছে অকুণ্ঠ আগ্রহে উপকার চাইতে পারতো কেমন করে? সুরেশচন্দ্রের কর্মজীবনের সাফল্যের মর্মলোক অন্বেষণ করলে এই সত্যেরই নিদর্শন দেখা যাবে যে, চরিত্রের ক্ষমাপ্রবণ মৃদুতাই একটি শক্তি এবং যে শক্তি রুদ্রতায় আত্মপ্রকাশ না করে শান্ত শীলতায় সুস্থিত, সেই শক্তিই যথার্থ শক্তি।

বলা বাহুল্য, গঠন প্রতিভার এক বিরাট উদাহরণ হিসাবে দেশের মানুষের বিচারে ও চিন্তায় কীর্তিত ও স্বীকৃত হবে সুরেশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাস। দেশের দুটি শ্রেষ্ঠ

সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি, মাত্র এই কয়েকটি কথার মধ্যে সুরেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিষ্ঠার পরিচয় ব্যক্ত হয় না। আধুনিক কালে সংবাদপত্রকে জাতীয় জীবনের সংগ্রামে ও সংগঠনে একটি ঐতিহাসিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠাদানের এক নূতন আদর্শ সুরেশচন্দ্রের কৃতিত্বে প্রথম সার্থকতা লাভ করেছে। বাংলা মুদ্রণশিল্পের কারুগত উন্নয়নে যিনি বস্তুত আবিষ্কারকের কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁকেই দেখতে পাই যে পরিণত জীবনে তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্কটে ও সমস্যায় প্রধানতম রাষ্ট্রনায়কদের উপদেষ্টারূপে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন, ভারতের মত বিরাট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হতে শুরু করে অন্যান্য প্রধানেরা আজ যাঁর পরামর্শ, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের মূল্য স্মরণ করে তাঁর অভাব অনুভব করছেন, সেই সুরেশচন্দ্র লোকলোচনের সম্মুখে ভাষণমুখর উচ্চমঞ্চের পরিবেশ পরিহার করেই চলতেন। সেই অক্লান্তকর্মা ছিলেন অন্তরালের সাধক এবং সেই সাধনার রূপে প্রকৃতিতে ও ব্যাপ্তিতে কী বিপুলতা এবং কতখানি সমগ্রগ্রাহিতা ছিল, তার পরিমাপ অনুমান করা যায় রাষ্ট্রিক জীবনে তাঁর ব্যক্তিত্বের ও গুরুত্বের ঐ স্বীকৃতি থেকেই। সুকঠোর কর্মিত্বের দ্বারাই তিনি নেতৃত্বের গৌরব অর্জন করেছিলেন। রাষ্ট্রিক কর্তব্যের ক্ষেত্রে তিনি শুধু একজন জনপ্রতিনিধি রূপেই নিজেকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করে রেখেছিলেন, কোন রকম উচ্চ পদস্থতার জন্য তিনি আকাঙ্ক্ষার তাড়না অনুভব করেন নি। মন্ত্রী না হয়েও তিনি মন্ত্রীর অধিক ছিলেন, এবং পদাধিকারী না হয়েও দায়িত্বের ভার স্বীকার করেছিলেন। আসরে দাঁড়িয়ে প্রতিষ্ঠার সত্যতা অনুভব করতে তিনি চাননি, তিনি অন্তরালে তাঁর কর্মিত্বের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তার কর্তব্যময় জীবনের আনন্দ অনুভব করেছেন।

এমার্সনের উক্তি—'An institution is the lengthened shadow of a person; ব্যক্তিরই প্রসারিত ছায়া হলো প্রতিষ্ঠান। সুরেশচন্দ্র কয়েকটি কীর্তিকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। সুরেশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বেরই ছায়াতে এই সব প্রতিষ্ঠানের রীতি-নীতি লালিত ও গঠিত। বৈষয়িক বৈভবের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের রীতি নীতির ঐশ্বর্যের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের যথার্থ ঐশ্বর্য নিহিত থাকে। যাঁরা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাতিষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত তাঁরাই আরও ভাল করে সুরেশচন্দ্রের চিত্তের আর এক ঐশ্বর্যের পরিচয় জানেন। ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাস অনেককাল ধরে বস্তুতঃ ইংরাজী পত্রিকার প্রাধান্যেরই ইতিহাস রূপে গড়ে উঠেছিল। ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার প্রাধান্য অপূর্ব সফলতায় প্রতিষ্ঠিত করে সুরেশচন্দ্র বস্তুতঃ নূতন ঐতিহ্যের সূত্রপাত করে গিয়েছেন। মাতৃভাষা প্রিয় বাঙালী সুরেশচন্দ্রের কাছে এই ঋণ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করবে, এবং সারা ভারতেরই মন আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকে ভারতীয় ভাষারই জয়ের ঘটনা বলে গ্রহণ করেছে। তিনি ইংরাজী ভাষাতেও পত্রিকা প্রকাশ করবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন, এবং করেছেনও, এর মধ্যে শুধু লক্ষ্য করতে হয় যে, সুরেশচন্দ্রের বিচারে দুই পত্রিকার কর্মিজনের মর্যাদা ও গুরুত্বের বৈষয়িক মূল্য সম্বন্ধে তিনি জাতিভেদ সমূহ ভাবেই অস্বীকার করেছেন। মাতৃভাষাকে সুরেশচন্দ্র যখন এই মর্যাদা দিয়েছেন, তখনো দেশের রাষ্ট্রিক জীবনে এক এমনকি দেশের শিক্ষা বিভাগের নীতিতেও মাতৃভাষাকে ইংরাজী ভাষার সমান মর্যাদা দেবার কর্তব্য একরকমের উপেক্ষিত অবস্থাতেই ছিল। ইংরাজী ভাষাকে কৌলীন্যের সম্মান দানের রীতিটি যে আজও দেশের সকল ক্ষেত্র হতে অন্তর্হিত হয়েছে, তা নয়। দেশের সরকারের মনে এখনো ইংরাজী ভাষার প্রতি যে ভয়

মিশ্রিত সমাদরের ভাব এবং মাতৃভাষার প্রতি যে ভয় মিশ্রিত কুণ্ঠার ভাব আছে তার পরিচয় সরকারী কর্মের নানাপ্রকার বিভাগীয় নিয়োগের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সুরেশচন্দ্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাইওনিয়ার বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হয় না।

মুদ্রণশিল্পে এবং সংবাদশিল্পে সুরেশচন্দ্রের কৃতিত্ব অবশ্যই আর্থিক উপার্জনেও সার্থকতা লাভ করেছে। কিন্তু কে অস্বীকার করবে, আর্থিকতাই সুরেশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষার পরমার্থ ছিল না। অর্জিত অর্থ অকাতরে দেশের রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে তিনি বিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেকই আছে এবং অধুনা আরও বেশি করে দেখা যায় যে, ঐশ্বর্যবান ব্যবসায়িকেরা তাঁদের বিবিধ ব্যবসায়িক উদ্যোগের মত সংবাদপত্রকেও ব্যবসায়িক আকাঙ্ক্ষায় প্রকাশ করেছেন। সুরেশচন্দ্রের পত্রিকাও ব্যবসায়িক শিল্পরূপে সার্থকতা লাভ করেছে ঠিকই, কিন্তু দেশের মানুষ জানে যে নিতান্তই জাতীয় মুক্তির বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে সুরেশচন্দ্রের পত্রিকা আবির্ভূত হয়েছিল। নিতান্তই অব্যবসায়িকের সেই উদ্যোগ কালক্রমে ব্যবসায়িক সার্থকতা লাভ করার পরেও সুরেশ-চন্দ্রের মনে এই ধারণার ধ্রুবতা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয়নি যে, আদর্শবাদিতাই তাঁর পত্রিকার সকল সাফল্যের কারণ। পুস্তক প্রকাশনার উদ্যোগেও হাত দিয়েছিলেন সুরেশচন্দ্র, এবং পুস্তক প্রকাশনা লাভের ব্যবসায় নিশ্চয়। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের পুস্তক প্রকাশনার উদ্যমের মধ্যে তাঁর মনের সাংস্কৃতিক আগ্রহের পরিচয়টিই ব্যক্ত হয়েছে, অর্থকরিতার পরিচয় নয়। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনীর পুস্তকগুলি জাতির মনস্বিতার পরিচয়, বিরাট প্রকাশনী উদ্যোগের চেয়ে মহৎ প্রকাশনীর উদ্যোগে যে মানুষ উৎসাহিত ছিলেন, সে মানুষের সাংস্কৃতিক অভিরুচির পরিচয়ই আগে চোখে পড়ে। ব্যবসায়িক উদ্যমকে সাংস্কৃতিক অভিরুচি দিয়ে সংযত ও সুন্দর করে রাখতে পেরেছিলেন যিনি, তাঁকে দেশের মানুষ সংস্কৃতিরই হিতকারী বান্ধব বলে অভিনন্দিত না করে পারে না। সুরুচিশীল মুদ্রণকার্যের জন্য তাঁর শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস এবং উচ্চ সাংস্কৃতিক চিন্তার পরিচায়ক সুনির্বাচিত গ্রন্থ প্রকাশে তাঁর 'আনন্দ হিন্দুস্থান প্রকাশনী' সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেছে।

বিস্মৃত হবার নয়, কিছুকাল আগে সুরেশচন্দ্রই সারা দেশে এক সাহিত্য আন্দোলনের যে সূত্রপাত করেছিলেন, তার প্রভাব দেশের জনচিত্তে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারেও অঙ্কিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের আন্দোলন পরোক্ষভাবে সাহিত্য-আন্দোলনরূপেই জনসাধারণের চেতনাকে সঞ্জীবিত করেছিল। কবির স্মৃতির প্রতি দেশবাসীকে সচেতন করার আয়োজন ক'রে সুরেশচন্দ্র সাধারণ মানুষকে সাহিত্য সচেতন হতেই সাহায্য ও উদ্বুদ্ধ করেছেন। জাতীয় মনীষার ঐতিহ্যকে বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচার করা সুরেশচন্দ্র বস্তুত দৈনন্দিন সাংবাদিকতার বিশেষ কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পত্রিকা এ বিষয়ে জাতীয় সংস্কৃতির ধারকতায় শ্রেষ্ঠ কর্তব্য পালন করেছে। সাহিত্যকেও দৈনিক বার্তা পত্রিকার সৌষ্ঠব হিসাবে স্থান দানের রীতি তিনিই আধুনিককালে সর্বাধিক আগ্রহে ও প্রযত্নে প্রবর্তন করেছেন। বর্তমানে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পত্রিকা 'দেশ' সুরেশচন্দ্রেরই কীর্তি। বাঙ্গলা গদ্যকে রাজনীতিক সাহিত্যের উপযোগী গঠন লাভে সুরেশচন্দ্রের সহায়তা ও প্রচেষ্টা তাঁর আর এক মহৎ কর্মের উদাহরণ বলে স্বীকৃত হবে। আজ মনে পড়ে, স্বাধীনতা লাভের অল্পকাল পরে তিনিই নূতন পরিভাষা রচনার বিষয়ে

কত আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং উত্তরপ্রদেশের পরিভাষা কমিটিকে আহ্বান করে এবং অভ্যর্থনা জানিয়ে কলকাতাতে তাঁরই পত্রিকার কার্যালয়ে পরিভাষা রচনার বিষয় আলোচনা করেছিলেন।

তরুণ জীবনেই দেশমুক্তির জন্য সশস্ত্র অভ্যুদয় ও বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে বিপদ বিঘ্ন ও ক্লেশের কণ্টকিত পথে যিনি পথিক হয়েছিলেন, সে-মানুষের মনে দেশেরই কল্যাণ চিরকালের স্বপ্ন হয়েইছিল। জাতির জীবনের প্রয়োজনে যখনই যে পরীক্ষার আহ্বান এসেছে, তখনই সে পরীক্ষার সম্মুখে অগ্রসর হতে তিনি দ্বিধা করেননি। পত্রিকার বৈষয়িক স্বার্থকে বার বার বিঘ্নিত করে তিনি রাজরোষ পীড়িত জন-অভ্যুত্থানের সহযোগী হয়েছিলেন। সেই সৌম্যদর্শন মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছি, যেন দেশের ও জাতীয় জীবনের প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের ছায়া সেই মুখের ওপর মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। সকলেই জানে সেই ইতিহাসে কত বেদনার ঘটনা আছে, কত আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মহত্ত্ব আছে। এই মানুষটির ব্যক্তিগত জীবন দেশের সেই ঘটনাবহুল ইতিহাসের সব আঘাত ও প্রেরণার ঢেউ বরণ করেছিল। কিন্তু তবু সেই মুখে ক্লান্তির ছায়া পড়েনি, বরং সেই চিরকালের কর্মীপ্রাণেরই ঔজ্জ্বল্য এবং প্রশান্তি অবিকার ছিল। তাঁর কাজ শেষ হয়েছে, এই রকমের কোন ব্রতসমাপ্তির অবসাদ তাঁর চিত্তে প্রশ্রয় পায়নি। বরং জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর চক্ষে এক নূতন ব্রতের আগ্রহ আরও স্বপ্নময় হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনায় তিনি তাঁর পত্রিকার জীবনের সাফল্য বলে অনুভব করেছিলেন এবং বুঝেছিলেন যে, জাতি গঠনের আর এক দুরূহ অথচ মহৎ আনন্দকর সাধনায় তাঁর আনন্দবাজার পত্রিকার জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

দেখেছি তাঁকে, মহাযুদ্ধের অভিশাপে পীড়িত দেশের আকাশে যখন জাপানী বোমারু বিমানের রুষ্ট গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছে, বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে সাইরেনে বিলাপ বাজছে, তখনো তিনি শান্ত ও গম্ভীর। দেখেছি তাঁকে উনিশশো বেয়াল্লিশের এক সকাল বেলায়, ব্রিটিশ রাজ্যের পাহারাদার যখন তাঁকে কারাগারের দিকে নিয়ে গেল, শান্তচিত্তেই পুলিশ প্রহরীর সঙ্গে চলে গেলেন সুরেশচন্দ্র। মনে হয়েছিল, মানুষটির চিত্তের গভীরে যেন এক বৈরাগী প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে, যার জন্য ব্যক্তিগত স্বাচ্ছল্য ও বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষার টান পিছনে ফেলে রেখে নির্বাসনের দুঃখের ভিতরেও স্বচ্ছন্দে ও শান্তচিত্তে চলে যাবার শক্তি তিনি পেয়েছেন।

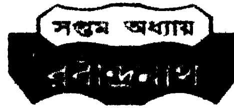
মনে পড়ে, ভারতজীবনেরই আর একটি ভয়ঙ্কর অভিশপ্ত ঘটনায় অভিভূত দিবসে যে উদাস ও ব্যথিত মূর্তি নিয়ে তিনি পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য-বিভাগের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই দিনটি ছিল মহাত্মার চিতাভস্ম বিসর্জন দিবস, তার ক'দিন আগেই দিল্লীর এক প্রার্থনাস্থলীতে মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ হরণ করেছে এক আততায়ী। দেখেই মনে হলো, দুঃসহ এক বেদনায় বিচলিত হয়েছে এত ধীর ও স্থির সুরেশচন্দ্রের মনের শান্তি। যেন অসহায় এক শিশুর মুখের মতই করুণ একটি মুখ। দেখলাম, দ্বিধা কুণ্ঠিত হস্তে কি একটি জিনিস রবিবাসরীয় সম্পাদকের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন সুরেশচন্দ্র। সেই মুহূর্তে সেই মানুষটির অন্তরের আর এক পরিচয় পেয়ে গেলাম এবং বুঝলাম, এই মানুষ তাঁর কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা খ্যাতি ক্ষমতা ও সম্পদের অধীন নয়, নিতান্তই হৃদয়ের ধর্মে গঠিত একটি মানুষ।

ঠিক জিনিস নয়, সুরেশচন্দ্র তাঁর নিজেরই হাতের রচনা একটি চার লাইনের কবিতা

রবিবাসরীয় সম্পাদকের হাতে তুলে দিলেন। ঐ কবিতাকে প্রকাশ করতে তিনি বলেননি, বলতেও পারেননি। শুধু জলভরা চোখ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর চলে গেলেন।

চিতাভস্ম তব, গান্ধী, ঈশ্বর ইচ্ছায়
বিসর্জিত আজি, প্রভো, পূত গঙ্গাজলে ;
পিতৃঘাতী হইয়াছে আত্মঘাতী জাতি
ক্ষমা করো নিজগুণে, ডুবিছে অতলে।

আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত নামহীন চার লাইনের একটি কবিতার মধ্যে সুরেশচন্দ্রের সেই চোখের জলের কাহিনীই লুকিয়ে রয়েছে এবং সেই কাহিনী স্মরণ করে আজ তাঁরই উদ্দেশ্যে এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।'



বিজ্ঞানী-কবি রবীন্দ্রনাথ

কবি রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নন। তিনি আসলে কবি ও দার্শনিক। কিন্তু তাঁর দর্শনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বনিষ্ঠার অভাব নেই। বিষয়-বিচারের ক্ষেত্র থেকে তিনি বিজ্ঞানগত যুক্তিকে বর্জ্জন করেননি। কবিকে শুধু কল্পনাশ্রয়ী যাঁরা বলেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তাঁদের ধারণার সমর্থন তাঁরা পাবেন না এইটাই বড় কথা। সায়েন্সের খুঁটিনাটি, ফরমুলার ঘনঘটা ও টেষ্টটিউবের কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে স্থান পায়নি ঠিকই। কিন্তু তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধে, বা নিছক সাহিত্য নামে পরিচিত, তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিশ্লেষণ পদ্ধতি, তথ্য সন্নিবেশ অজস্রভাবে ছড়িয়ে আছে।

অল্পদিন হলো রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে 'বিশ্ব পরিচয়' লিখেছেন। এখানে তিনি স্পষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণনা করবার প্রয়াস করেছেন এবং তার জন্যে প্রামাণ্য সব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। 'বিশ্বপরিচয়' বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ। এই পুস্তক লেখার পেছনে কবির যে উদ্দেশ্য, তা আরও মহৎ। তিনি বাংলাভাষী পাঠকের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা উজ্জ্বলতর ও আরও প্রখর করবার সদুদ্দেশ্য নিয়েই 'বিশ্ব পরিচয়'-এ তাঁর উপক্রমণিকা লিখেছেন। সেইদিক দিয়ে বইখানি সার্থক হয়েছে।

শুধু 'বিশ্বপরিচয়' লেখার জন্য নয়, রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে ৪০-৫০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত কতকগুলি বিষয়াংশ উদ্ধৃত করা যায়, যার মধ্যে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়। প্রথম, রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক চিন্তার অগ্রগামিতা। দ্বিতীয়, কত প্রাঞ্জল ভাষায় বৈজ্ঞানিক থিওরিগুলিকে তিনি অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যে গেঁথেছেন। সেদিনকার লেখা 'বিশ্বপরিচয়'-এর এক একটি অংশ উদ্ধৃত করে দেখাতে পারা যায় যে, তার ভাষা রবীন্দ্রনাথের এই পূর্ব্বতন প্রবন্ধের ভাষাকে প্রাঞ্জলতার গুণে খুব বেশী ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। কবি স্বয়ং নিজের স্বভাবসুলভ সৌজন্যে 'বিশ্বপরিচয়'-এর ভূমিকায় তাঁর 'অক্ষমতার' কথা তুলেছেন। কিন্তু অক্ষমতার কথা দূরে থাক, তিনি ৪০-৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কবিতার চেয়েও মধুর ও মনোজ্ঞ করে লিখে গেছেন, তা পৃথিবীর সাহিত্যে বিরল।

আধুনিককালে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান ও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অথবা নব্য সময়বাদ মানুষের চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইভলিউসন তত্ত্ব ও নব্য পরমাণুবাদ আধুনিক বিজ্ঞানীর গবেষণায় নূতন ভাবে পরিপুষ্ট হয়েছে ; অনেক বিচিত্র তত্ত্বের রহস্য প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্য-সমুদ্রে জাল ফেললে কৌতূহলী পাঠক এখন অনেক জ্ঞানশক্তির সাক্ষাৎ পাবেন, যা তাঁকে বিস্ময়ে অভিভূত করবে। যে সব দুরূহ নূতন বৈজ্ঞানিক মতবাদ, অল্পদিন আগে সুধীমহলের গোচরীভূত ও গ্রাহ্য হয়েছে, অনাবিল গদ্যে ও পদ্যে তারই পরিপ্রকাশ রবীন্দ্রসাহিত্যের এক একটি অধ্যায়কে জ্যোতির্লিপ্ত করে রেখেছে। পরিভাষার বাহুল্য হয়তো তার মধ্যে নেই, গাণিতিক সংহতির অভাব হয়তো তার মধ্যে আছে ; কিন্তু থিওরিগুলির বৈজ্ঞানিক রূপ অভ্রান্তভাবে তাতে ফুটে উঠেছে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে নির্জ্জান মনের থিওরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডাঃ ফ্রয়েড ও তাঁর

সমসাময়িক আরও কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর গবেষণাই এ থিওরীকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছে। মনের গঠন সম্বন্ধে অনেক নূতন রহস্য আজ আমরা জানতে পারছি। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্ধৃত হলো, যাকে 'অজ্ঞাত' মনের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হিসাবে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিশেষ প্রণিধানের বিষয় যে, এই প্রবন্ধ ৪৭ বৎসর আগে লেখা।*

'স্বভাবতঃ আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শিকড়, পৃথিবীর বাষ্প—এই আবর্ত্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ সকল সর্ব্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে ; আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ, সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ কত কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাষ কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থসকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

'যখন আমরা সচেতনভাবে কোন একটা বিশেষ দিকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করি, তখন এই সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে অপসারিত হয়, আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে, তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জ্জগতের এবং বহির্জ্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়—তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে তাহারই কথায়, তাহারই অনুচর পরিচয়ে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখো, আকাশে পাখীর ডাক, পাতার মর্ম্মর জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোট বড়ো কত সহস্র প্রকার কলশব্দে নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, এবং আমাদের চতুর্দ্দিকে কত কম্পন, কত আন্দোলন, কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে—অথচ তাহার মধ্যে যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে ; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকী সমস্তটাই তাহাকে এড়াইয়া যায়। সে যখন দেখে তখন ভাল করিয়া শোনে না, যখন শোনে তখন ভাল করিয়া দেখে না, এবং সে যখন চিন্তা করে, তখন ভাল করিয়া দেখেও না, শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। আমাদের মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছা-বধিরতার শক্তি আছে ; এই শক্তি তাহাকে প্রতি পদেই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জগতের অধিকাংশই তাহার চেতনার বহির্ভাগ দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া যাহা গ্রহণ করে এবং নিজের আবশ্যক ও প্রকৃতি অনুসারে গঠিত করিয়া লয় তাহাই সে উপলব্ধি করে, চতুর্দিকে এমন কি মানসপ্রদেশেও যাহা ঘটিতেছে, যাহা উঠিতেছে, তাহার যে ভালরূপ খোঁজ রাখে না।' *ছেলে ভুলান ছড়া (১৩০১)।*

আইনষ্টাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বস্তুর চতুর্থ আয়তন ও নব্য সময়বাদ এবং আধুনিক

*এই নিবন্ধ রচনার ৪৭ বছর আগে, অর্থাৎ প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে।

পরমাণু তত্ত্বের কথা অনেকেই পড়েছেন। প্রায় সাতাত্তর বৎসর পূর্বে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ তার-সঙ্গে তুলনা করা যায়।

'এ জগতে সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ, এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়! কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর এক প্রকার আয়তন আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহার অসীমায়তনতা, বা আয়তনের অসীম অভাব।'

'আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রতা বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে, আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর, ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতা ত আর কোথাও শেষ হয় নাই ; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্বতের মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে ছোট বড় আর কোথায় রহিল? একটি পর্বতও যা পর্বতের ক্ষুদ্রতম অংশও তাই কেহই ছোট নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত, ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে ; তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকণা অসীম দেশ, অসীম শক্তি, সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকামাত্র। চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছুমাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে, বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে, হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল, সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।'

'যাহা কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে
ছোট বড় কিছু নাই সকলি মহৎ।'

(ভারতী, ১২৯১ বৈশাখ)

বস্তুর আয়তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ৫৭ বৎসর পূর্বে এই কথা লিখে গেছেন।* তুলনামূলক বিচারের জন্য বিশ্বপরিচয়ের ভাষার নমুনা দেওয়া হল :

'একদা জগতের সকলের চেয়ে মহাশ্চর্য্য বার্ত্তা বহন করে করে বহু কোটি বৎসর পূর্ব্বে তরুণ পৃথিবীতে দেখা দিল আমাদের চক্ষুর অদৃশ্য একটি জীব কোষের কণা। কী মহিমার ইতিহাস সে এনে ছিল কত গোপনে! দেহে দেহে অপরূপ শিল্পসম্পদশালী তার সৃষ্টি-কর্ম নব নব পরীক্ষার ভিতর দিয়ে অনবরত চলে আসছে।'

'নক্ষত্র জগতের দেশকালের পরিমাপ পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি আবর্ত্তের চিন্তানাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি, একথা মানতে হবে বিশ্বে সকলের চেয়ে বড়ো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জানছে এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে।'

---

*এই নিবন্ধ রচনার ৫৭ বছর আগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে।

প্রাণের উৎপত্তি সম্বন্ধে 'বিশ্বপরিচয়'-এ রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, পুরাতন রচনা থেকে উদ্ধৃত করা গেল। ইভল্যুশন মতবাদও এ প্রসঙ্গে তুলনা করে দেখতে পারা যায়।

(সোনার তরী, ১৭ই চৈত্র)

'এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলুম, যখন আমার সবুজ ঘাস উঠতো, শরতে আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত···আমার এই মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্য্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে সমস্ত শস্য ক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।' (ছিন্ন.প্র)

বিশ্বপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ মাত্র প্রবন্ধকারের কর্ত্তব্য নিয়ে নেমেছেন। নিঃসন্দেহে সাফল্য অর্জ্জন করেছেন। কিন্তু যে অন্তর্দৃষ্টির বলে, সুসূক্ষ্ম চিন্তাপরায়ণতার বলে তিনি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব উপলব্ধি করে অত্যদ্ভুত প্রাঞ্জল ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে পরিবেশন করে গেছেন, তাকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণতার ও পরম সাহিত্যিকতার নিদর্শন বলে মনে করি। এর তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী-কবি।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ

আজ থেকে প্রায় একশত বছর* আগে বিখ্যাত ভারতশাস্ত্রজ্ঞ ম্যাক্সমুলার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছে লিখিত এক পত্রে জানিয়েছিলেন, 'আপনাকে আমি এমন একটি দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে-দেশে মানুষের জ্ঞানের প্রথম উষা দেখা দিয়েছিল। সে দেশের নাম ভারত।'

ম্যাক্সমুলার যে সময়ে এ উক্তি করেছিলেন সে সময়ে ভারত সম্বন্ধে অন্যান্য দেশের মানুষের মনের ধারণা স্পষ্ট ছিল না এবং অস্পষ্টভাবে যা ছিল সেটা ভারতের পক্ষে গৌরবজনক নয় এবং ঐতিহাসিকভাবে নির্ভুলও নয়। বাইরের মানুষের ধারণার কথা ছেড়ে দিই ; ভারতীয় জনসাধারণেরই মনে নিজের দেশের সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে ধারণার অভাব ছিল। ভারতের জীবনে সাংস্কৃতিক তত্ত্বের চর্চা এবং চেতনা অবনতির কোন্ স্তরে নেমে গিয়েছিল, সেটা অনুমান করতে পারি, যখন শুনি যে, ব্রিটিশ আগমনের পূর্বের কয়েক শত বৎসরে ভারতে এমন একজনও ব্যক্তিকে দেখা যায়নি, যিনি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠি অক্ষরে উৎকীর্ণ ভারতীয় শিলালিপিগুলি পড়তে পারেন। ভারত ইতিহাসের এটা একটা দুঃখকর অথচ বাস্তব সত্য যে, ভারতবাসী অনেকবার তার নিজের ঐতিহাসিক পরিচয় ভুলেছে, রাজনৈতিক দুর্বিপাকের কারণেই হোক বা নিজেরই অন্য কোনও সামাজিক ও মানসিক হানির কারণেই হোক। ভূ-তত্ত্বের ইতিহাসে এমন এক একটি অধ্যায় দেখা গিয়েছে যখন বিগত লক্ষ বৎসরের সৃষ্টি প্রাণীজীবন বা উদ্ভিদজীবন এক কঠিন তুষারের আবরণে চাপা পড়ে গিয়েছে। প্রাণের উৎসব স্তব্ধ করে দেয় এ রকম এক একটা তুষার যুগ এই পৃথিবীর ভূ-তত্ত্বে যেমন দেখা গেছে তেমনি এক একটি দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেও দেখা দিয়েছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনও যেন এক একবার সাময়িক তুষার যুগের প্রকোপে

*এই নিবন্ধ রচনার একশো বছর আগে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

অভিভূত হয়েছিল। বিস্মৃতির সমাধিতে স্তব্ধীভূত হয়েছিল জাতির চিন্তাগত প্রাণের স্পন্দন।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বের শতাব্দীকে বিশেষ ক'রে প্রাগ্-রামমোহন একটি শতাব্দীকে, ভারতীয় সংস্কৃতির একটি তুষার-যুগ বললে খুব বেশী অত্যুক্তি করা হবে না। ম্যাক্সমুলার যেদিন জ্ঞানের প্রথম উষার কথা বলেছিলেন প্রায় ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। এবং সেই রবীন্দ্রনাথেরই এক ভারত-বন্দনায় ম্যাক্সমুলারের সেই উপলব্ধিরই নূতন প্রতিধ্বনি একদিন শুনতে পাওয়া গেল। ভুবনমনমোহিনী ভারতভূমিকে উদ্দেশ্য করে কবি বললেন :

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে।

কবির এই বাণীতে যেন ভারতভূমিরই আদিম ইতিহাসের পরিচয় ধ্বনিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, সুদূর অতীতে টেথিস্ সমুদ্র নামে আদিম সমুদ্রের বক্ষে মৃত্তিকার যে প্রথম অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল, তাই বোধ হয় আদি ভূমি। অভ্রভেদী হিমালয়ের পাষাণপঞ্জরে আজও সেই আদিম সমুদ্রের শঙ্খশুক্তির অস্থি সমাহিত রয়েছে দেখা যায়। সুতরাং অনুমান করতে বাধা নেই যে, এই প্রথমা ভূমির বক্ষেই প্রাণী জীবনের প্রথম অভ্যুদয় এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের সংসারলীলা সম্পন্ন হয়েছে। আজও শিবালিক গিরিভূমিতে যে প্রাচীন প্রাণীদেহের এক মহাশ্মশান দেখা যায় সেই সব প্রাণী জীবদেহের বিবর্তন এক অত্যুন্নত পরিণামের সাক্ষ্য। বৈজ্ঞানিকেরা এখানে আরও এক বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন—প্রাচীনতম নরদেহের নিদর্শন। নৃতাত্ত্বিকের ভাষায় তার নাম 'শিবপেথিকাস'। নামটি তাৎপর্যময়। 'নমি নরদেবতারে'—যে ভারতকবির বাণীতে এ ঘোষণা আমরা শুনেছি তাঁরই মাতৃভূমি ভারতের মাটিই কি নরদেবতার কায়ালাভের আদি পীঠস্থান? শিবকে আমরা 'মহাকাল' আখ্যা দিয়েছি। এই মহাকালই হলেন এক যোগী যিনি কল্পাতীত যুগ হতে এই জড় ও প্রাণের পৃথিবীতে বস্তুর যোগসাধন করে আসছেন,—অঙ্গে অঙ্গে, অস্থিতে অস্থিতে, তন্তুতে তন্তুতে সম্মিলিত ও সমন্বিত হয়ে জড় ও জীবনের রূপ এক অবিরাম এভল্যুশনের প্রবাহে রূপান্তরিত হয়ে আসছে। সেই রূপান্তরের এক বিরাট ইতিহাসের আধার এই ভারতভূমি, যার আদিকালের সাক্ষ্য এ-ভূমির শিলায়, উদ্ভিদে ও প্রাণীজীবনে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যই হোক আর কল্পনাই হোক, ভারতের ভূমির ইতিহাসের একটা অতিদূর অতীত আছে। অতীতের সে ভূমিতে রূপ রস গন্ধ স্পর্শের বৈচিত্র্যকে আহ্বান করে, চেতনার রঙে রাঙা করে দিয়ে দেখা দিয়েছিল একটি প্রভাত : সে প্রভাতকে পৃথিবীর 'প্রথম প্রভাত' বললে ভুল হয় না।

কিন্তু 'ভারতবর্ষ' তখন দেখা দেয়নি। এ শুধু ভারতের ভৌম কায়ার পরিচয়। আমাদের প্রশ্ন হলো, কবে পেলাম ভারতবর্ষকে? এবং সেই ভারতবর্ষ বলতেই বা কী বুঝি? এই হিমালয়ের কোলে লালিত ভূমিই তো শুধু ভারতবর্ষ নয়। কলনাদিনী গঙ্গার সলিলধৌত উপত্যকাভূমিই তো শুধু ভারতবর্ষ নয়। ব্রহ্মপুত্র থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম মরুপ্রান্তর পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের সুখ-দুঃখের এই আঙিনাটি তো শুধু ভারতবর্ষ নয়। এর ওপরেও আছে ভারতবর্ষ, এর গভীরে আছে ভারতবর্ষ এবং সেই ভারতবর্ষকেই কবির ভাষায় বলা যায়—আমাদের 'সনাতন স্বদেশ'। ভূমির রূপ বদলাতে পারে, কিন্তু সনাতন উপলব্ধির সত্যটি নিয়ে মানুষের যে অন্তর্জগৎ গড়ে উঠেছে সেই জগৎ বদলায় না। ভারত নামে এই

ভূমির যে মানুষটির মনে মানবীয় জীবনেরই এক পরম সত্যোপলব্ধির প্রসন্নতা প্রথম দেখা দিয়েছিল, তিনিই প্রথম ভারতীয় এবং তারই চিত্তভূমিতে ভারতবর্ষের সৃষ্টি।

আজিকার অথবা অতীতের ভারতবাসীর চিন্তায় আচরণে এবং আগ্রহে যা কিছু দেখা গিয়েছে, তার সবই যথার্থ 'ভারতীয়' ব্যাপার, এমন ধারণাকে কবি রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি। ভারতবাসীর আচরণে অভারতীয়তা বহুবার ঘটেছে, এবং আজও ঘটছে। পণ্ডিত নেহরু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলেছেন—পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই হলো সেই দেশ, যে দেশে মানবজীবনের সর্বোত্তম আদর্শ ঘোষিত হয়েছে। এবং ভারতবর্ষই হলো একমাত্র দেশ, যেখানে আদর্শ ও আচরণের মধ্যে বৃহত্তম পার্থক্যও ঘটতে দেখা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম কক্ষে যে ভারতবর্ষ রহিয়াছেন···।' এই উক্তি হতেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষ বলতে তিনি আন্তরিক কোন বস্তুকে বুঝেছিলেন। অন্যভাবে বলা যায়, কবি যাকে ভারতবর্ষ বলেছেন সে হলো একটি তত্ত্ব। কবিরই আর এক বাণীতে যখন শুনি—'মিশেছ মোর দেহের সনে—মিলেছ মোর প্রাণে মনে' তখন স্পষ্টই বোঝা যায় ভারতবর্ষ একটি দেশমাত্র নয়, ভারতবর্ষ একটি 'আইডিয়া'। এই আইডিয়ারও একটি ইতিহাস আছে ; বহু শত বৎসরের সন্ধানের ইতিহাস। ভারতশাস্ত্রজ্ঞ স্যার জন উডরফের উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে—'ভারত একটা ভৌগোলিক সত্তা নয়, ভারত হলো জ্ঞানের প্রতীক।'

প্রাচীন ঋষিকবি এই ভারতভূমিকেই ধরিত্রীরূপে বন্দনা করেছিলেন। ভারতকবি রবীন্দ্রনাথও বিংশ শতাব্দীর ভারতভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশ করলেন—'হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে'। বেদের বসুন্ধরা সূক্ত হতে শুরু ক'রে বিংশ শতাব্দীর 'ভারততীর্থ' কবিতা পর্যন্ত কয়েক সহস্রব্যাপী ভাবনার যুগ একই উপলব্ধির সূত্রে যেন যুক্ত হয়ে রয়েছে। কল্পনা করতে পারি, সরস্বতীর তীরে যাযাবর জীবন হতে কৃষকজীবনে প্রথম দীক্ষিত যে মানুষ পর্ণকুটীরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে এই বিরাট ভারতীয় নিসর্গের রূপ এবং বৈচিত্র্য দেখে বলে উঠলেন, "কুতো ইয়ং বিসৃষ্টিঃ,' কোথা থেকে এল এই সৃষ্টি, তিনিই হলেন পৃথিবীর প্রথম জিজ্ঞাসু। সেই মানুষেরই মনে এক পরম জিজ্ঞাসার সূত্রপাত। এই জিজ্ঞাসাই মানুষের মনের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার। প্রথম বিস্ময় এই জিজ্ঞাসারূপেই মানুষকে এক উপলব্ধি থেকে আর এক উপলব্ধিতে এগিয়ে নিয়ে এসেছে এবং সরস্বতী তীরের সেই আর্য একদিন আর এক বিস্ময়কর সত্য আবিষ্কার করলেন, এই আকাশ এক মহাপ্রাণে বিধৃত। সকল জড় ও জীবনের বাহির ও অন্তর ছাপিয়ে রয়েছে এক প্রাণ, সে প্রাণও অখণ্ড। বিশ্বের সকল প্রাণ এক দিব্য প্রাণ হতে উদ্ভূত, এই তত্ত্বের সাক্ষাৎ সেই আর্য ভারতের চিত্তভূমিকে যে উর্বরতা দান করেছিল তার সুফল ফলতে বেশী দেরী হয়নি। জিজ্ঞাসার অভিযান একদিন এক অতি মহৎ উত্তরলাভের সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠলো :

'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আ যে দিব্যানি ধামানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥'

শোনো বিশ্ব, দিব্যধামবাসী আমরা অমৃতের পুত্র। তমিস্রার ওপারে আদিত্যবর্ণ যিনি

বিরাজমান সেই মহান পুরুষকে আমরা জেনেছি। এই উপলব্ধির মধ্যে এতকালের সেই জিজ্ঞাসার একটা পরিসমাপ্তি দেখা যায়। ভারতের আবির্ভাব এই উপলব্ধির মধ্যেই। 'প্রকৃতির অন্তরতম কক্ষে' যে ভারত সেই ভারতকে প্রথম পাওয়া গেল এই অমৃততত্ত্বের মধ্যে। এখানেই ভারতের সূচনা, ভারতের পথ পরিক্রমার ইতিহাসের আরম্ভ, তার নূতন সন্ধানের যাত্রা সুরু। আমরা কে, এই পরিচয় পেয়ে গেলেন ভারতের প্রথম ব্রহ্মবিদ্। মানবজীবনের সঙ্গে সেই অনন্ত মহাপ্রাণতার সম্পর্কই বা কি, তারও রহস্য জানা হয়ে গেল।

ভারতবর্ষের মানুষের ইতিহাসে একটি বৈশিষ্ট্য বেশী করেই চোখে পড়ে। ভারতীয় মানুষের প্রথম প্রয়াস হলো তার অন্তর্গঠনের দিকে। প্রথম জিজ্ঞাসাও অন্তরতম রহস্যেরই দিকে। সে যুগের আর্য ভারত বৈষয়িক সম্পদে এমন কিছু অগ্রসর ছিল না। বরং জানা যায় যে, কোনও কোনও আর্যেতর সমাজের মানুষ নগর-প্রতিষ্ঠায় বা অন্যান্য বৈষয়িক কৃতিত্বে আর্যের তুলনায় বেশী অগ্রসর ছিল। কিন্তু আর্যের প্রতিভা প্রথম হতেই ছিল অন্তর্মুখী। এবং এই অন্তর্মুখী সাধনার ফলে সে আর্য যে ঐশ্বর্য লাভ করেছিল, সে ঐশ্বর্যকে আজকের পৃথিবীও মানবীয় প্রজ্ঞার চরমোৎকর্ষ বলেই মনে করে।

ভারতের আন্তরিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আগে, বৈষয়িক ঐশ্বর্যের প্রতিষ্ঠা পরে। ভারতীয় ইতিহাসের এই এক বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা জাতির প্রকৃতি প্রভাবিত হয়ে থাকে, এ সত্য তিনি অন্য জাতির ইতিহাসেও লক্ষ্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা জিও-পলিটিক্স এর আলোচনা করেছিলেন। দ্বীপবাসী মানুষ সহজেই সমুদ্রযাত্রায় অভ্যস্ত হয় এবং বাণিজ্যিক প্রবণতা লাভ করে। মরুবাসী মানুষের মনেও তেমনি দিগ্বিজয়ের আগ্রহ দেখা গেছে। ভৌগোলিক কারণে প্রাচীন ভারতের মানুষ এমন এক নিরাপদ জীবনের আশ্রয়লাভ করেছিল, যেটা তার চিত্তকে অন্তর্মুখী করে তুলবার সহায়ক হয়েছে। দীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন ও নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় লালিত প্রাচীন ভারতীয় তার চিত্তের নিভৃতলোকে জিজ্ঞাসার অভিযান চালিত করে মানবজীবনেরই দুরূহ আত্মিক তত্ত্বের সন্ধান লাভ করতে পেরেছিল। সেই উপলব্ধিকে বলতে পারি 'চিন্ময়' ভারতের আবিষ্কার।

কিন্তু একথা সত্য নয় যে, ভারতবাসী চিরকাল তার জীবনযাত্রার, সামাজিক জীবনের অথবা সংস্কৃতির ক্ষেত্রের এই উপলব্ধির মর্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে। আজকের ভারতের দিকে তাকিয়েও একথা বলতে পারি না যে, এ ভারত তার ঐতিহাসিক আত্মিক উপলব্ধির মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। ভারতীয় ইতিহাসে সেইসব যুগ ও যুগের অধ্যায়গুলিকে আমরা গৌরবের যুগ বলে মনে করি, যে যুগে ভারতীয় জীবনে তার উপলব্ধিগত সত্যকে মর্যাদা দেবার প্রয়াস সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ইতিহাসের এবং ভারতীয় জাতীয় জীবনের বহু ভ্রান্তির, ত্রুটির এবং তত্ত্বহীনতার দুঃখকর পরিণাম লক্ষ্য করেও একটি সত্য উপলব্ধি করা যায় যে, সে আত্মিক উপলব্ধির কিছুটা প্রভাব জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ভারত-জীবনে সফল হয়েছে। দৃষ্টান্ত, ভারতীয় মানুষ কোনওদিন পরদেশ আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়নি এবং পররাজ্যকে রূঢ় শক্তির দ্বারা প্রপীড়িত করে নি। পররাজ্যে ভারতীয় প্রভাব বলতে বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক প্রভাবই বোঝায়।

অমৃত তথা অনন্ততার সত্য উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয়ের উপলব্ধির আকাশ শত শত তত্ত্বের জ্যোতিষ্কে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সেই ভারতীয় উপলব্ধি করলেন, একং

সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি। তিনি এক, কিন্তু জ্ঞানীরা তাঁর বহু পরিচয় প্রচার করেন। আরও মহৎ উপলব্ধি এই যে, সেই এক হলেন সর্বানুভূ, তিনি জলেও আছেন, অগ্নিতেও আছেন। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যু—যাঁর ছায়া অমৃত, তাঁরই ছায়া হলো মৃত্যু। তিনি আনন্দস্বরূপ, সর্বপদার্থ সেই আনন্দ হতে উদ্ভূত। 'ভূমা', রূপবহুল এক পরম প্রকাশ, বিরাট এক পরমেষ্ঠী ইচ্ছার তরঙ্গ যেন নিখিল সৃষ্টিকে অভিষিক্ত ক'রে রেখেছে। এই সব উপলব্ধির সম্মিলিত সুরকে বলতে পারি মানবহৃদয়ের মহান্ ওঙ্কার এবং কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তার স্বীকৃতি শোনা যায়—'হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি।' একদিন সত্যসত্যই ভারতীয় জ্ঞানের উপলব্ধির জগতে পরম সত্যের পরিচয় আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল— 'ওঁ পিতা নোহসি, ওঁ পিতা নোবোধি।' পিতা, তুমি আছো ; পিতা, তুমি আমাদিগকে এই বোধি দাও যে, তুমি আছো। অনন্ত স্বরূপকে 'পিতা'রূপে উপলব্ধি করা ভারতীয় ঋষির আর এক বিরাট ভাবের আবিষ্কার। বোধি তথা অধ্যাত্ম সত্যের উপলব্ধির দ্বারা মণ্ডিত হয়ে অতি শ্রেয়স্কর এক হিউম্যানিজ্‌মের উদ্ভব। এখানে মানবীয় অনুভবের সিংহদ্বার যেন হঠাৎ খুলে গেল। 'পিতা' কল্পনায় তত্ত্বও সহজ মানবিকতায় পরিণতি লাভ করেছে। এখানেই ভারতীয় হৃদয়ে প্রার্থনার সূত্রপাত। 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা', এই সরল ভক্তিবাদ, প্রেম সম্পর্ক ও সত্যের সঙ্গে আপন হবার আকুলতার প্রথম দীক্ষা। কি চাই? কি চাই? মানবজীবনেরই পরম প্রাপ্তব্যের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল। চাই বোধি।

এই অনুভব ভারতের শিল্পকলা ও কাব্য-সঙ্গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক সাধনার উৎস হয়ে উঠল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক সৃষ্টির সকল অনুশীলন এই দিব্য অনুভবেই অনুপ্রাণিত হয়েছে। তাই ভারতীয় শিল্পের যা প্রকৃত লক্ষ্য, সেই 'রস' বস্তুত ব্রহ্মাস্বাদসহোদর। ভারতীয় স্থাপত্য ভাস্কর্যের মত শিলাশিল্পেও যে রূপতত্ত্ব ভারতের হাতে ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে হাতের চেয়েও মনের পরিচয় বেশী করেই পাওয়া যায়, সে পরিচয় হলো রসসৃষ্টির প্রয়াস।

দিকে দিকে দেখা যায়, বিদর্ভ, বিরাট—ভারতীয় ইতিহাসে বৈষয়িক ঐশ্বর্যেও উন্নত কত রাজ্য দেখা দিল, আর অন্তর্হিত হলো। শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয়ের কর্মবহুল সাধনায় বহু সফল কীর্তির সাক্ষাৎ পেলাম। এই বৈষয়িক জীবনকেও ভারতীয় জ্ঞানী কয়েকটি মূলমন্ত্রে গঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। সহ নৌ ভুনক্তু, সহ নাববতু, সহ বীর্যং কারবাবহৈ। অথবা, সমানো মন্ত্রঃ সমিতিং সমান সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম্। সহযোগিতাই সমাজের ধারক এবং সমান প্রাপ্তিই সামাজিক মর‍্যালিটির শ্রেষ্ঠ সূত্র। সামাজিক আচরণে এই মূল মর‍্যালিটির প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জ্ঞানীর আর এক মহৎ কীর্তি। আজ ভেদবাদে ও বৈষম্যে মানুষের প্রীতির জীবন কুণ্ঠিত ও শান্তি বিড়ম্বিত। এই অপ্রীতির ও সামাজিক অসূয়ার প্রধান কারণ যে বৈষম্য ও 'প্রতিযোগিতা' হতে উদ্ভূত, সেই কারণ অপসারণের প্রথম নীতিটি ভারতীয় মনীষার প্রাচীন ঐতিহ্য থেকেই আমরা পেয়েছি, যদিও সব সময় কিংবা সর্বক্ষেত্রে তার মর্যাদা ভারতবাসী রাখতে পারেনি। ভারতের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা ক'রে ডাঃ হাটনের মত বৈদেশিকও বুঝতে পেরেছেন যে, ভারত জীবনে—'Individualism is a later-day growth. Ancient India was more socialistic.'

আজকাল কো-একজিসটেন্স নামে একটা কথার চল হয়েছে। কথাটা কিন্তু ভারতীয় চিন্তাশীলের কাছে কিছুই অভিনব নয়। ভারত যে একত্বের সাধনার কথা বলে থাকে, সে একত্ব হলো বৈচিত্র্যকে সমন্বিত করা, বৈচিত্র্যকে বিনাশ করা নয়। 'তারা সবাই বিরাজে'।

পশ্চিমী ঐক্যের তুলনায় ভারতীয় ঐক্যবাদের বৈশিষ্ট্য এখানেই। সহনাববতু, এই নির্দেশের মধ্যেই অপরকে স্বীকার করা, অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করা এবং অপরকে সহযোগিতা দান করার সামাজিক ধর্ম ব্যক্ত হয়েছে। সেই সামাজিক ধর্মেরই জয় ঘোষিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মনীষার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথেরই বাণীতে—'কেহ নহে নহে দূর' অথবা 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' কিংবা 'ধরো হাত সবাকার' এবং 'হেথায় সবারে হবে মিলিবারে'। ভারত সেই সত্যকে (?) স্বীকার করে না যে-সত্য খণ্ডকালের পরিধির মধ্যেই সত্য অথবা, যে নীতি মানুষে মানুষে ভেদের প্রাচীর বড় করে তোলে। বহু জাতি, বহু ভাষা, বহু সাহিত্য ও বহু ধর্ম—মানব-সংসারের জীবনচর্যার এই বহুত্বকে জীবনেরই বৈচিত্র্যরূপে স্বীকার করেছে ভারত। তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নতুন করে ভারতের মর্মবাণীর ঘোষণা শুনতে পাই—'বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।' বিশ্বের সঙ্গে যোগ, ভারতীয় ভাবনার এই এক বৈশিষ্ট্য এবং চিন্তার ক্ষেত্রে এই বিশ্বতোমুখী দৃষ্টি অথবা অনুভবকে ভারতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথ বলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ 'নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।' রবীন্দ্রনাথের সকল চিন্তা ও বাণীর মধ্যে এই বিশ্বভারতীয়তার সুর নতুন করে ধ্বনিত হয়েছে। তাই কবি সহজেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এ ভারত মহামানবের সাগরতীরের এক পুণ্যতীর্থ। এ ভারত মিলনধর্মেরই জয়গান করে। সমগ্র জড় ও জীবনের আধার প্রকৃতিকে এক মহামিলনের রঙ্গভূমি বলে মনে করতে পারে ; ইংরেজ কবি শেলীর চোখেও এই প্রাকৃতিক সত্যটিও ধরা পড়েছিল যে—'All things by a law divine in one another being mingle.'

সৃষ্টির সমগ্র পদার্থই এক মহামিলনের অথবা যৌগিক সমন্বয়ের পরিণাম। বিভেদটাই এ জগতে অস্বাভাবিক, স্বাভাবিক হলো মিলন। ভারতে একটি অভিনব শিল্প দেখা যায়, যেটা অন্য কোনও দেশে দেখা যায় না অথবা তার অল্পই পরিচয় পাওয়া যায়। ছন্দোবদ্ধ কাব্য অথবা মহানাট্য রচনার মতই ভারতের শিল্পী-মন ভারতভূমির সর্বত্র এক একটি তীর্থ স্থাপন করেছে, যেগুলিকে বলা যায় প্রকৃতির সাহায্যে কাব্যসৃষ্টি। যেখানে চিরন্তনতার সাক্ষ্য বেশী স্পষ্ট, যেখানেই মিলনের ধর্ম সার্থক, সেইখানেই ভারতীয়ের তীর্থ। বিশাল হিমালয়ের ক্রোড়ে স্থাপিত হয়েছে ভারতের বদরী বিশালের বিগ্রহ। জাহ্নবী যেখানে মহাসাগরের সঙ্গে মিলেছে, সেখানে ভারতীয়ের তীর্থ। মহাসমুদ্রের কল্লোল যেখানে অনন্তের ঢেউ পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে স্থাপিত হয়েছে জগন্নাথ। এই মিলনধর্মেরই প্রেরণায় ভারতীয় ধার্মিক এবং ভারতীয় সামাজিক এমন পেট্রিয়টিজমের সূত্র ঘোষণা করেছেন, যার তুলনা পাওয়া যায় না। ভারতীয়ের এই জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতার সংজ্ঞা বিশ্বজনীন তাৎপর্য ও মহত্ত্ব লাভ করেছে। এমন উপলব্ধি ছিল বলেই ভারতীয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলতে পেরেছেন—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। ভাগবৎ পুরাণ বলেছেন—এ-ভারত হলো বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ, ঋষি বলেছেন—দিব্যধাম এবং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মহামানবের পুণ্যতীর্থ।

এই ভারততত্ত্ব এমনইভাবে কবি রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতে সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, ভারতীয় নিসর্গের রূপের ভেতর দিয়েই তিনি অনন্ততার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই ভারতের আকাশের দিকে তাকিয়েই সাধিকা মীরাবাঈ বলেছিলেন—গগনমণ্ডল সেজ পিয়া কি। এ আকাশ যে প্রিয়ের বাসরশয্যা। সাধক নানকজী এই ভারতের আকাশের

দিকেই তাকিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন, ঐ গগনের থালায় সাজানো রবিচন্দ্রদীপক ভবখণ্ডনের আরতি করে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই সাধকোচিত কাব্যস্ফূর্তির পরিচয় পাই। ভারতের যমুনা কবিরই হৃদয়-যমুনা হয়ে গিয়েছিল। অভ্রভেদী হিমগিরির মধ্যে তিনি দেখেছিলেন—'অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত ভারতের অনন্তসঞ্চিত তপস্যার মত।' এবং এই হিমবান পর্বতের 'মৌনীশৃঙ্গে শান্তম শিবম ও অদ্বৈতম-এর সন্ধান' করেছিলেন। ভারতীয় প্রকৃতির ষড়-ঋতুর বিচিত্র রঙ্গলীলার মধ্যে তিনি এক মহাসুন্দরের আসা যাওয়ার পদধ্বনি শুনেছিলেন। ভারতের বৈশাখ যেন এক দীপ্তচক্ষু সন্ন্যাসী, বিশাল বৈরাগ্যের গৈরিক ছড়িয়ে দিয়ে তপস্যায় মগ্ন হয়ে রয়েছেন। ঈশানের পুঞ্জমেঘের উদাত্তধ্বনিকে তিনি 'বেদগাথা-মন্ত্রসম' বোধ করেছিলেন।'

এ ভারতবর্ষে রাজসিকতারও চরম বিকাশ দেখা গিয়েছে। ঐশ্বর্যের বিলাস, রাজশক্তির বৈভব এবং আড়ম্বর ও সমারোহও ভারতজীবনে দেখা দিয়েছিল। রোম্যান্টিক ভারতেরও পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই শ্যামজম্বুবনচ্ছায়ে দশার্ণ গ্রাম, প্রস্ফুটিত কেতকীর বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঐশ্বর্যের ভারতবর্ষকে দেখেছি,—যেথা শিপ্রা নদীনীরে হেরে উজ্জয়িনী স্ব-মহিমচ্ছায়া। প্রতাপী নরপতির রণাশ্বের হ্রেষা শোনা গেছে। শোনা গেছে দৃপ্তহস্তের অস্ত্রের ঝনঝনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত এ-ভারত ভারতের প্রকৃত রূপ নয়, প্রকৃতিও নয়, প্রকাশও নয়। কবির মতে প্রকৃত ভারত রয়েছেন এই রাজসিক সমারোহ এবং বৈষয়িক বৈভবের নেপথ্যে। ভারতীয়ত্বের সন্ধান পাই সেখানে, যেখানে নৃপতিদল রাজ্যের ভাঙা গড়ার খেলায় প্রমত্ত হয়ে ওঠেননি, বরং মুকুটদণ্ড ও সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, চীর ধারণ করে সন্ন্যাসীর বেশে দাঁড়িয়েছেন রাজধানীর প্রাসাদের শিলাসোপানে, মানবকল্যাণের প্রেরণায়। এইখানে প্রকৃত ভারত এবং এই ভারত-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিষ্ঠতম ব্যাখ্যা লাভ করেছে। এই সব শক্তি ও ঐশ্বর্যের স্পর্শমোহ হতে দূরে ও একান্তে যে 'ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছেন,' সেই ভারত হলো কবি বর্ণিত সনাতন স্বদেশ, তত্ত্বের ভারত, ত্যাগের ভারত, মানবতার ভারত, বিশ্বৈকবোধের ভারত এবং অনন্ততার সন্ধানী ভারত।

তাই দেখতে পাই ভারতের সমগ্র শিল্প, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এক বিরাট অন্বেষণের সুর। ভারতের মন যেন চিরতীর্থযাত্রী এক সন্ধানী। সন্ধানের এবং পথচলারও এক ধর্ম আবিষ্কার করেছে ভারত। লক্ষ্য ও পন্থার নৈতিক সমন্বয়। সৎ পথেই সৎ লক্ষ্য লাভ করতে হয়। এই নীতিটি ভারতীয় মনীষার গঠনতন্ত্রেরই মূলনীতি। এ বিষয়ে ভারতীয় চিন্তার উৎকর্ষ লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। ভারতীয় মন শেষ পর্যন্ত পন্থায় ও লক্ষ্যের কোনও প্রভেদ স্বীকার করেনি। পন্থাও লক্ষ্যেরই মতন মহৎ এবং পথিক হয়ে থাকাই লক্ষ্যলাভ।

'যাওয়া সে যে তোমার পথেই যাওয়া
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া।'

ভারতীয় চিন্তার সৃষ্টি এই 'পথের ধর্ম', ভারতীয়তারই একটি প্রধান অবলম্বন। ভারতে আগত ইরাণী কবিও একদিন এই ভারতীয় উপলব্ধির পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর আনন্দ ঘোষণা করেছিলেন—

'বুবদ বিসালে খুদা, দর বিসালে নামে খুদা।'

পথ চলার শেষ নেই। এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়াও যায় না। মানবজীবনকে এইভাবে

চিরচলার এবং চির-সন্ধানীর জীবন বলেই গ্রহণ করেছে ভারত। ভারতীয় প্রজ্ঞার এই এক মহৎ আবিষ্কার। 'কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ?' উত্তর হলো, কোনদিনই না। 'শেষ'কে কখনই পাওয়া যাবে না। কারণ এই শেষের যে সত্যিই শেষ নেই। তাই চিরকালের অন্বেষণ, চিরপ্রতীক্ষা, চিরপ্রার্থনা এবং চির-আকুলতাই মানব-সত্তাকে এক অফুরাণ প্রেরণা দিয়ে যেন এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কবি এই সত্য উপলব্ধি করেই ভারতীয় জীবন-তত্ত্বের আর এক পরিচয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় ব্যাখ্যা করেছেন সবচেয়ে সরলভাবে, অক্সফোর্ডে প্রদত্ত তাঁর হিবার্ট-বক্তৃতায়। 'হওয়া'ই (to be) মানুষের ধর্ম। সন্ধানের পথে যাঁরা চিরপথিক, যাঁরা তমিস্রার পরপারে মহান পুরুষের সান্নিধ্যপ্রয়াসী, তাঁদের প্রয়াসই হলো সেই পরমের সান্নিধ্য লাভ, অথবা পরমের সঙ্গে একাত্ম হওয়া। ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই সরল তত্ত্বই অপূর্ণ মানুষকে পূর্ণতার অভিমুখী আগ্রহ দান করেছে। কর্মযোগের মূলসূত্রটি এরই মধ্যে পেয়েছে ভারত। আমরা বলিতে পারি, ভারত-তত্ত্বেরও তথা ভারতীয়তারও সংজ্ঞা এখানে পূর্ণত্ব লাভ করেছে।

সন্ধান ও অন্বেষণই হলো ভারত-জীবনের প্রকৃতি। 'বলাকার পাখার বাণী' জীবনকে এক অন্তহীন লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। প্রত্যেক জড় ও জীবনে এই সীমার বাঁধন ছিন্ন করে নিরন্তর অসীম হতে চাইছে। হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। তৃণদল মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা। অন্বেষণ ও চলার আবেগে সবই অস্থির। ভারতীয় ঋষির, ভারতীয় কবির চিন্তলোক হতে এই যে পরম প্রগ্রেসের তত্ত্ব উৎসারিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী বাস্তব ও মহৎ কোনও প্রগ্রেসের তত্ত্ব আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। এ-তত্ত্ব ভারতের সাধারণ লোকজীবনেও বিস্ময়কর প্রভাব সৃষ্টি করেছে। তাই দেখতে পাই, ভারতীয় সাধক হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে ডুবে কিসের যেন সন্ধান করেন। ভারতের গ্রাম্য বাউল দেশবিদেশে 'তার উদ্দিশে' ঘুরে বেড়ান, যে তাঁর 'মনের মানুষ'। ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর। যুগে যুগে অভিসার পাগলিনী রাধিকার। ক্লান্তিহীন সন্ধানই ভারতীয় সাহিত্যকে প্রকৃত ক্ল্যাসিক রূপদান করেছে এবং তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রসাহিত্য। ব্রহ্মা ব্যাসদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার রচিত মহাভারতে আপনি কি তত্ত্ব প্রতিপাদিত করেছেন?—ব্যাসদেবের উত্তর হলো,—যত্তু সর্বগতং বস্তুঃ তচ্চৈব প্রতিপাদিতম্। সমস্ত ঘটনা ও কাহিনীর ভিতর দিয়ে আমি সেই বস্তুকেই প্রতিপাদিত করেছি যে বস্তু সর্ববস্তুর মধ্যে রয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যকেও বলতে পারি ভারতের দ্বিতীয় 'মহাভারত'। রবীন্দ্র সাহিত্যের অজস্র বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি মহাসঙ্গীতেরই সুর রয়েছে, অনন্তের সন্ধানী মানুষের বিশ্বৈকবোধের সুর।

প্রাচীন হিন্দী কবি নিশ্চল দাস বস্তুতত্ত্বের আলোচনা করে শেষে নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলেন—কাকু করু প্রণাম? কাকে প্রণাম করি? শেষ পর্যন্ত তিনি প্রণাম করলেন সেই ভারত-তত্ত্বকে যে তত্ত্বে এমন বাণীও সহজে ধ্বনিত হয়েছিল—'বিশ্ব ভরণ-পোষণ কর জোই, তাকর নাম ভারত অস হোই।' বিশ্বকে যে ভরণপোষণ করে তারই নাম ভারত।

বিংশ শতাব্দীর ভারতে এই তত্ত্বের আধার হলো রবীন্দ্রসাহিত্য। তাই আমরা আজ পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় বলতে পারি, প্রণাম করি সেই বিশ্বময়ীর আঁচল পাতা ভারতকে, বিশ্ব-জাগতিক সত্যের ধারয়িত্রী ভারতভূমিকে। প্রণাম করি রবীন্দ্র-ভারতকে।

ভারততীর্থ

'ভারত-তীর্থ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নতুন ভারতবর্ষকে আমরা দেখিতে পাই। তিনি দেখিয়াছেন পুণ্যতীর্থ ভারতবর্ষ মহামানবের সাধনার ক্ষেত্র ; কাহাকে তিনি ভারতবর্ষ বলিয়াছেন—নিজেদের ধারণা ও ভাবনা দ্বারা আমরা তাহা জানিতে চেষ্টা করিব।

শতবর্ষ পূর্বে ম্যাক্সমুলার ভারতের আত্মার যে বাণীর কথা বলিয়াছেন তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রসাহিত্যের ভিতর দিয়া ভারতের সহস্র বৎসরের সাধনাকে আমরা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি। রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা ভারতের সত্তার অন্তরতম বাণীর পরিচয় পাই। বেদব্যাস যেমন মানুষের জীবনের সুখ দুঃখ স্নেহ ভাল-বাসাকে এক চিরস্থায়ী সত্যের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন ও সেইভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে আমরা সেই একই দৃষ্টি দেখিতে পাই। ভারতের মর্মের সন্ধান করিতে গিয়া তিনি বিশ্বজগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই ভারতভূমিকে তপোবন কল্পনা করিয়াছেন। ঋষি বলিয়াছেন— তমসার পরপারে মহান পুরুষকে আমি চিনিয়াছি। ভারতের চিন্তাধারা এই খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই তাহার প্রতি ছন্দে সেই একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

সেই সঙ্গে আমরা আর একটি মন্ত্র পাই—সাম্য মন্ত্র। এখানে বৈষম্যের স্থান নাই। আজ বিশ্বে সাম্য আনিবার চেষ্টা চলিয়াছে। হাজার বৎসর আগে ভারতের ঋষিরা সেই সাম্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন। সেই মন্ত্রে একদিন ভারতের সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই ভাবধারা আমরা হারাইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে সেই সত্যকে আমরা নতুন করিয়া উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে'—ইহাই হইল ভারতের মর্মবাণী। ভারতবর্ষ খণ্ডের প্রতীক নয়—বিশ্ব প্রাণের সঙ্গে সে এক—এই সুর রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে আদ্যোপান্ত ধ্বনিত হইয়াছে।

মৃত্যুংত্তীর্তা -

ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। ৩২শে শ্রাবণের অশান্ত বাতাসে তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের তরুলতা গুল্ম বীথিকা হঠাৎ এক আক্ষেপে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সমস্ত রাত্রি ধরে আকাশজোড়া মেঘ গলে গলে পড়েছে অশ্রান্ত ধারায়। সুপ্তি শেষে যেন কোন বিগলিত বেদনায় সজলা পৃথিবীর এক প্রত্যুষে আধা আলো অন্ধকারের মধ্যে শুনলাম—'ভেঙেছো দুয়ার, এসেছো জ্যোতির্ময় !' সমস্ত নিসর্গ যেন মন্ত্রপূত হয়েছে। আশ্রমের বাতাসে এই আর্ত আলোড়ন, বৃষ্টির শব্দ ও জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ, তার সঙ্গে বৈতালিক দলের সুস্বর। মনে পড়লো, এক মহাকবি মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় করে কালের যাত্রায় বিদায় নিয়েছেন। 'মৃত্যুং তীর্ত্বা' যে কবিসত্তা যাত্রীর বেশে অদৃশ্য হয়েছে, তাঁরই যাত্রাপথে মর্ত্যবাসীর অভিনন্দন।

'হে কবি দিবে না সাড়া'—এ দুঃখ অবশ্য আজ আমাদের কাছে সত্য। কিন্তু আজ আর শোকের বাসর নয়। আজ এক স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বুদ্ধ মহাকবির শ্রাদ্ধবাসর, যিনি অন্তরে মহা

অজানার নির্ভয় পরিচয় পেয়েছেন, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলে তাঁকে নিয়ে গেছে আপন কক্ষে।

পূর্ণকুম্ভ, আম্রপল্লব ও কদলীবৃক্ষে সজ্জিত শ্রাদ্ধমণ্ডপ। প্রজ্বলিত ঘৃতপ্রদীপের সারি। ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত বাতাস। কাষ্ঠমঞ্চের ওপর অজস্র শ্বেতপুষ্পের স্তবক। পুরোহিতের প্রার্থনায় ধ্বনিত হলো—'মনের দ্বারা আজ তোমার মনকে আহ্বান করি।' সহস্র নরনারীর হৃদয়ের নীরব শ্রদ্ধার আবেশে সেই ক্ষণে পরম অনুভবের মধ্যে কবি যেন নতুন রূপে মূর্ত হলেন।

পুরোহিত আবার উচ্চারণ করলেন—'সকলেই আজ তৃপ্ত হউক। দেব যক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া দীনহীন সর্বপ্রাণী আজ তৃপ্তিলাভ করুক। ক্ষুধিত তৃষিত পাপরত ধর্মরত সবারই আজ তৃপ্তি লাভ হউক।' এই বাণীর আশ্রয়ে কবির জীবনের সাধনা অগ্রসর হয়েছিল, এই বাণী তাঁর জীবনে সকল রূপেতে ও ধ্বনিতে সার্থকতায় প্রসারিত হয়েছিল।

আমরা উপলব্ধি করেছি কবির লোকোত্তর রূপ। তাই এখন আর শোক করবার কিছু নেই। অজস্র দানে তিনি ভরে দিয়ে গিয়েছেন জাতির ভাণ্ডার। পৃথিবীকে তিনি মধুর করে গিয়েছেন সুরের সুরধুনীর প্রবাহে। মানবতাকে সকল অপমানের ঊর্ধ্বে তুলে রেখে গেছেন অমিত মমতার শক্তিতে।

আমরা কবির জীবনের ভাববৈভব দেখে বিস্মিত হয়েছি। শতাব্দীর দুঃখ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর জীবনে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় প্রকাশ পেয়েছে বাণী রূপে। 'ছোট ছোট জন্মমৃত্যুর সীমানায়, নানা রবীন্দ্রনাথের একখানি মালা।' জীবনকে তিনি এইভাবে দেখেছেন, নিত্যবহমান এই অনিত্যের স্রোতে তিনি চঞ্চল জীবনের সদ্যঃ মুহূর্তের দানে সত্যকে দেখেছেন। তাই সব চেয়ে আগে মনে পড়ে বিচিত্রের উপাসক কবির বাণী। তাঁর ভাববাদের এই নির্বিশেষত্বে তাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রূপকথার শিল্পী করে তুলেছিল। তিনি বিশেষ কোন জাতীয় সংস্কৃতি, বিশেষ কোন যুগসংস্কৃতি, বিশেষ কোন সমাজ বা রাজনীতিঘটিত মতবাদের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। ভাবের দিক দিয়ে, চিন্তানুশীলনের দিক দিয়ে তাঁর প্রতিভা বিশেষ কোন পরিধির ভিতর সমাহিত ছিল না। মানুষের প্রত্যেক মোহকে, লোভ ও নিষ্ঠুরতাকে তিনি সতর্কবাণী শুনিয়ে গেছেন।

জীবনের বন্ধনের সহস্র দুঃখ, আচারের সঙ্কীর্ণতা, মূঢ়তা ও 'বিরাট মৃত্যুর গুপ্তসঞ্চার' তাঁর কাছে অপ্রত্যক্ষ ছিল না। তিনি জানতেন, সুখদুঃখের সমস্ত পরিণাম রেখে যেতে হবে এই নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল পরিচয়গ্রাসী নিঃশব্দ ধূলিরাশির মধ্যে। তবু শুভে অশুভে স্থাপিত জীবনের এই পাদপীঠে, জীবনের এই প্রচণ্ড মহিমার উদ্দেশ্যে তিনি প্রণতি রেখে গেছেন। এ সত্ত্বেও কবির চক্ষে জীবনের জয়ন্ত রূপ সকল মোহ নিরাশার বাষ্প যবনিকা ভেদ করে এক একবার প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এই সৃষ্টিমঞ্চে নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর ক্রোড়ে জীবনের নিত্য প্রসারতাকে তিনি অভিনন্দন করে গেছেন।

সতত গতিময় এই জীবনের গানই তাঁর কাব্যের প্রাণ। তিনি দেখেছেন আকাশ পাথারে আলোক ও আঁধারের মধ্যে অবিরাম জোয়ার ভাঁটা চলেছে। দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী ছুটে চলেছে সহস্র ধারায়।

* * *

মহাকবির অধ্যাত্মকৃত্য। আশ্রমের গায়ক গায়িকার মিলিত কণ্ঠের সংগীতে শুনলাম—'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে, যত দূরে আমি ধাই।' সেখানে বিচ্ছেদ বলে কোনও কিছু

নেই ; আজ আর বিচ্ছেদের শোক নয়, কবির বাণী মনে মনে উচ্চারণ করে আজ আশ্বস্ত হতে হবে—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে, রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

মধুসূদনের দান

কলিকাতার রাজপথ সার্কুলার রোড ; তার এক পাশে একটি ছায়াশীতল শান্ত খৃষ্টীয় সমাধি-উদ্যান। সারি সারি শ্বেত মর্মরে গড়া বেদিকা ফলক ও স্তম্ভ— ক্রুশচিহ্ন আঁকা সব মৃতের নিশানা। আইভিলতা ক্রোটনকুঞ্জ ও হলদে গোলাপের ভীড় ঠেলে হঠাৎ চোখে পড়বে একটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ এই নিবেদন—দাঁড়াও পথিকবর! বাঙালী পথিককে দাঁড়াতে হবে ক্ষণকাল। এইখানে মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছে বাংলার মহাকবি শ্রীমধুসূদনের দেহাস্থি। প্রায় সত্তর বছর আগে ২৯শে জুন তারিখে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্তের শেষ নিঃশ্বাস আলিপুরের এক দাতব্য হাসপাতালের বাতাসে মিলিয়ে যায়।

মধুসূদন প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'কাল প্রসন্ন, ইউরোপ সহায়, সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও ; তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।' এই হ'ল এক কথায় মধুসূদনের পরিচয়। কাশী কৃত্তিবাস ও গুপ্ত-গুণাকর-দাশরথি রসে জারিত বাংলার কাব্য-সাহিত্য যে পরমক্ষণে য়ুরোপীয় কাব্যিক সাধনার সঙ্গে পরিচিত হয়, সেই অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য ও অপূর্ব ভাবরসায়নের প্রথম সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হলেন মধুসূদন।

* * *

আমাদের বাংলা কবি-বিরল দেশ নয়। সেকেলে ভক্ত ও সাধক কবিদের কথা বাদ দিলে এমন কবি কিন্তু সহজে মেলে না, যাঁরা কবিতাকে জীবন দিয়ে যাপন করেন। কাগজে কলমে অনেক কবির আমরা যে পরিচয় পাই, তাদের নিত্য দিনের চলাফেরা, হাসি অভিমান ও বেদনার মধ্যে সে পরিচয় পাই না। বাস্তব জীবনে তারা নিছক বাজারের লোক— সহস্র নগণ্যতায় বাঁধা। কিন্তু মধুসূদন? তিনি এ অভিযোগের বাইরে, বহু উর্ধ্বে। মানুষ মধুসূদন, কবি মধুসূদনের কাছে বাঁধা। মানুষ ও কবি—দুজন দুরকম, এটা তাঁর মধ্যে হয়নি। একই সত্তায় একই ব্যক্তিত্বে মিলিয়ে ছিল মানুষ ও কবি মধুসূদন। মধুকরী কল্পনার গুঞ্জনে সতত মাতোয়ারা মধুসূদনের চিত্তফুলবন। বৈষয়িক ব্যাপারে এই ত্রুটির জন্য তাঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। মানুষ মধুসূদনের হিসাব নিকাশ কখনো সঠিক হতে পারতো না—এই কাব্যপ্রমত্তার দরুণ, তাঁকে পদে পদে বিভ্রান্ত হতে হয়েছে। মধুসূদন তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই রেখে গিয়েছেন এক অলিখিত মহাকাব্য।

২৯শে জুন তাই স্মরণীয়। স্মরণ করা উচিত আধুনিক বাংলা সাহিত্য কত ভাবে মধুসূদনের কাছে ঋণী। এই স্মরণ করার মধ্যেই আমরা সেই সত্যের হদিস পাব—সত্যিকারের প্রতিভা কি? কি কারণে—কেমন করে যুগে যুগে কোন দুর্ভাগা দেশের রিক্ত নভঃ অঙ্গনে হঠাৎ একটা বড় জ্যোতিষ্কের উদয় সম্ভব হয়। এর পেছনে থাকে কিসের প্রেরণা? কোন কালোচিত প্রয়োজন সিদ্ধি, না কোন নবতর শক্তির ব্যঞ্জনা, না ভাববিপ্লব?

এই সত্যই আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে অমূল্য পাথেয়।

* * *

বাংলা গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রেও এমনি এক বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় হয়েছিল—বিদ্যাসাগর। মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের প্রবেশ উৎসবে কবি রবীন্দ্রনাথ যে বাণী পাঠ করেন, তার মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের উল্লেখ ও নিন্দা করা হয়েছে। —মাইকেল মধুসূদন ধ্বনি-হিল্লোলের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিস্তর নতুন সংস্কৃত শব্দ অভিধান থেকে সংকলন করেছিলেন। অসামান্য কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও সেগুলি তাঁর নিজের কাব্যের অলংকৃত রূপেই রয়ে গেল, বাংলা ভাষার জৈব উপাদানরূপে স্বীকৃতি হলো না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বাংলা ভাষার প্রাণ-পদার্থের সঙ্গে চিরকালের মতো মিলে মিশে গেছে, কিছু ব্যর্থ হয়নি। বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় মাইকেলকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁর সাহিত্য সাধনার কোন একটা ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে। মধুসূদনের স্মৃতিদিবসে তাই এই অভিযোগের বাস্তবতা সম্বন্ধে একটা আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

* * *

প্রথমে স্বতই প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদন ও বিদ্যাসাগরের কীর্তির তুলনা কেমন করে সম্ভব? মধুসূদন লিখেছেন কাব্য ও নাটক, তিনি প্রবন্ধ ও আখ্যায়িকা লেখেননি। বিদ্যাসাগর লিখেছেন প্রবন্ধ ও আখ্যায়িকা; কাব্য ও নাটক লেখেননি। মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই অভিধান থেকে বিস্তর নতুন সংস্কৃত শব্দ সংকলন করেছিলেন। মধুসূদনের এই প্রচেষ্টার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর কাব্য ও পদ্যকে সমৃদ্ধ করা। বিদ্যাসাগর প্রণোদিত হয়েছিলেন, তাঁর গদ্যকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে।

অতএব এঁদের দুজনের সঙ্কলিত শব্দ বাংলা ভাষার প্রাণপদার্থের মত মিলে মিশে গেছে কি না বুঝতে হলে, একজনের বিচার হবে পদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রে—আর একজনের গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রে। দেখতে হবে মধুসূদনের সঙ্কলিত নতুন শব্দ কি সবই আজও আমাদের কাব্য-সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়ে আছে? দেখতে হবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্কলিত নতুন শব্দ সবই কি 'প্রাণপদার্থের' মত আমাদের গদ্যসাহিত্যে দেহীভূত হয়ে গেছে?

মধুসূদনের চয়িত নতুন শব্দ অনেক আছে, যা ভাষায় চালু হতে পারেনি। চালু অর্থে অবশ্য এই বোঝায় যে সমসাময়িক ও কিয়ৎপরবর্তীকালের লেখার মধ্যে উক্ত শব্দগুলির ব্যবহার। মধুসূদনের ইরম্মদ, মদকল, কাকোদর, প্রক্ষেড়ন, তৈঁই, হায়রে যেমতি, হর্য্যক্ষ ও কর্ব্বুর ইত্যাদি শব্দ একান্তভাবে তাঁরি কাব্যের পাতায় আবদ্ধ। কাব্যের বা পদ্যসাহিত্যের দরবারী ভাষার মধ্যে মাইকেলের সঙ্কলিত এই শব্দগুলি ঠাই পায়নি।

* * *

এই সঙ্গে প্রশ্ন উঠবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংকলিত চয়িত ও গঠিত নতুন শব্দগুলি কি সত্যিই প্রাণপদার্থের মত গদ্যভাষায় মিশে গেছে, 'কিছুই ব্যর্থ হয়নি'? বিদ্যাসাগরের খড়কী, নবোঢ়াচেষ্টিত সমুদয়, অহে! হা হতোহস্মি, নিবেদিল, জিজ্ঞাসিল, বিচেতন ইত্যাদি শব্দ আজ বাংলা গদ্যের ত্রিসীমানায় আসবার সম্ভাবনা নেই। কোন চক্ষুষ্মান একথা বলতে পারবেন না যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চয়িত নতুন শব্দ সবই বাংলা গদ্যভাষায় চালু হতে পেরেছে।

বস্তুত তা হয় না এবং হতে পারে না। প্রত্যেক বড় প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যেই এ দৃশ্য দেখা

যায়, এটা ঐতিহাসিক সত্য। কোন বড় প্রতিভা তার সৃষ্টির আবেগে অজস্রভাবে দান করে যায়, কিন্তু গ্রহীতা তার সবটাই বিন্দু-বিসর্গ সমেত গ্রহণ করে না। কিছুটা প্রয়োজনের বাইরে পড়ে থাকেই এবং সেটাই হয় অবজ্ঞাত। সাহিত্যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। বিদ্যাসাগর অজস্র নতুন শব্দ পরিবেষণ করে গেছেন, তার কতক গেছে কতক আছে।

কবি মধুসূদনের ক্ষেত্রেও এই অভিমত গ্রাহ্য। এ কখনই সত্য নয় যে, তাঁর আমদানী শব্দ সবই ঝাড়েবংশে বহিষ্কৃত হয়েছে সাহিত্যের আসর থেকে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রথম পাতায় পাই তিনটি শব্দ, যা সত্যি বাংলা পদ্য বা গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই একেবারে অচল। যথা—যেমতি, তেমতি, উর।

'সীতার বনবাস'-এর প্রথম পাতায় পাই এই ক'টি শব্দ, যা বাংলা গদ্যে বর্তমানে কোথাও সমর্থন পায়নি—যথা প্রার্থয়িতব্য, ভুয়োভুয়ঃ, অনিষ্টাপাত, ত্বরায়, যাদৃশ, তাদৃশ।

এই কটি শব্দ সমর্থন পায় নি ঠিক, কিন্তু এছাড়া অন্য কত শত শব্দ যে সমর্থন পেয়েছে তাকে অস্বীকার করবে কে? আমরা মধুসূদনের সপক্ষে কোন অতিশ্রদ্ধার বিহ্বলতার অবকাশ না দিয়েও এই কথা বলতে পারি যে, তাঁর চয়িত শত শত নতুন শব্দ ও সমাসগঠন বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে ধনী শক্তিপ্রবণ ও প্রকাশকুশল করেছে!

* * *

মাইকেল মধুসূদন পদ্যের টেকনিক, ভাষার কারুকলা, সমাসগঠনের বৈচিত্র্য ও শব্দ চয়নের যে আদর্শ প্রথম ভিত্তিজাত করেন তা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়নি। যে বস্তু প্রকৃতই প্রতিভাসঞ্জাত তার ধর্ম এই যে সে যুগের চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠা করে নেবে এবং তার জের পরবর্তীকালের ভাবধারার মধ্যে বর্তিয়ে থাকবে। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিভা বহু সাধারণ প্রতিভার পরিস্ফুরণের পথ সুগম করে দেয়, নব সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সহজ ও আশু সাধ্য করে, যতদিন না সেই নবলব্ধ বস্তুটি লোকময়তা পায়।

মাইকেলের প্রতিভার সমগ্রগ্রাহিতার উদাহরণস্বরূপ তাঁর কাব্যের একটি টুকরা ও আধুনিক মহাকবির একটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা যাক।

যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে!

—*বীরাঙ্গনা কাব্য।*

যেদিন প্রথমে তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণ প্রায়—
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তি ঢালা
চন্দনে চর্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা
পরিহিত পট্টবাস, অধর নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি।

—*কচ ও দেবযানী।*

বিনাইনু যত্নে বেণী, তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে।

চির পরিধান মম বাকল ; ঘৃণিনু
তাহায়! চাহিনু কাঁদি বনদেবী পদে
দুকূল কাঁচলি সিঁতি কঙ্কণ কিঙ্কিণী
কুন্তল মুকুতাহার কাঞ্চী কটিদেশে।

—বীরাঙ্গনা কাব্য।

পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে দিনু
পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চী। অনভ্যস্ত সাজ—
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসংকোচে।

—চিত্রাঙ্গদা।

কুশাসন তলে
হে বিধু সুরভিফুল কভু কি দেখিতে?
পূজাহেতু ফুলজালে তুলিবারে যবে
প্রবেশিতে ফুলবনে, পাইতে চৌদিকে
তোলা ফুল।...
নিশীথে ত্যজিয়া শয্যা পশিত কাননে
এ কিঙ্করী, ফুলরাশি তুলি চারিদিকে
রাখিত তোমার জন্য। নীরবিন্দু যত
দেখিতে কুসুমদলে, হে সুধাংশুনিধি
অভাগীর অশ্রুবিন্দু।

—বীরাঙ্গনা কাব্য।

ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে—গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মতো!
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতাম হাসি
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে
প্রফুল্ল শিশির-সিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা?

—কচ ও দেবযানী।

১৮৬০ খৃঃ অব্দে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যের শব্দ ও ছন্দের রূপ অনাহত প্রবাহে চল্লিশ বৎসর পরে আর-এক মহাকবির লেখনীমুখে উৎসারিত হয়েছে। মাইকেলের উষা বন্দনায় পাই—

'কনক উদয়াচলে, তুমি দেখা দিলে হে সুরসুন্দরি!'

'মুকুতামণ্ডলে তুমি সাজাও ললনে কুসুম কামিনী।'
'ভালে তব জ্বলে দেখি আভাময় মণি বিমল কিরণ।'

'উর্বশী'র শব্দ-লালিত্য ও ছন্দ-গরিমার পূর্বাভাষ উক্ত পদগুলিতে পাওয়া যায় না কি?

* * *

নাটকে মাইকেলের কীর্তি অসাধারণ। তার প্রথম নিদর্শন নাটকীয় চরিত্রগুলির মুখে সংলাপের ভাষায়। কথিত অর্থাৎ চল্‌তি ভাষা তখনো কোন কুলীনরূপ পায়নি। প্রতিভাবান্ সাহিত্যরথীদের কয়েকজনের হাতে সবেমাত্র তার পরীক্ষা সুরু হয়েছে। ভাব-প্রকাশের বাহন হিসাবে অ-সাধু বা চলতি ভাষা তখন গ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু মধুসূদন নিঃসঙ্কোচে চলতি ভাষাকেই বরণ করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর হাতে সে ভাষা যেমন খেলেছিল, তাও একদিক দিয়ে তাঁর অদ্ভুত সৃষ্টিকুশলী প্রতিভার প্রমাণ। মাইকেলের গদ্যের একটি নমুনা উদ্ধৃত করা গেল, পাঠক এর প্রাঞ্জলতা ও সরল কারুমিতি লক্ষ্য করবেন।

—'দেবি! দেখুন দেখি! এই যে সুগন্ধ গন্ধবহের সহকারে আকাশে ভাসছে, এর যে কোন্ ফুলে জন্ম, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমাদের বিলক্ষণই প্রতীতি হচ্চে যে, ফুলটি অতীব সুন্দর। এ যেন নীরবে আমাদের কাছে আপন জন্মদাতা কুসুমের সুচারুতার ব্যাখ্যা কচ্চে।'

নাটকের ভাষার আর একটি ভঙ্গীর আদি প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন। মাইকেলোত্তর কালে গিরিশ প্রমুখ বহু নাট্যকার এই ভঙ্গীর রচনার উপর ভিত্তি করে তাঁদের রচনার সৌষ্ঠব বিধান করেছেন। ভাঙ্গাচোরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটকের নরনারীর মুখে ভাষা দিয়েছেন তিনি। যথা পদ্মাবতী নাটকে—

'আমি কলি!
এ বিপুল বিশ্বে কে না কাঁপে
শুনিয়া আমার নাম?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজনে বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজ বলে।'

আমরা ২৯শে জুনের দিনে আবার স্মরণ করি সেই বাঙ্গলার কবীশ শ্রীমধুসূদনকে—বঙ্গীয় রেণেসাঁসের প্রথম মহাকবিকে ; যিনি ছিলেন নতুনত্বের মন্ত্রগুরু, যিনি বাংলা ভাষার তৃণাদপি সুনীচ কমনীয়তাকে উন্নীত করেছিলেন শ্রী ও শক্তির সংযুক্ত ভূমিকায়।

কবিকথায় চতুর্থ আয়তন

আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গণিতে ও পদার্থতত্ত্বে যে বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন, তাতে বিজ্ঞান ও দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিপ্লব ঘটে গেছে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ—বস্তুর আয়তনের এই তিনটি মাত্রার সঙ্গেই আমরা পরিচিত ছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেই বস্তুধর্মের বা আয়তনের সবটুকু পরিচয় নেই। আইনস্টাইনের আবিষ্কৃত উপহার হলো—চতুর্থ একটি আয়তন অর্থাৎ কাল।

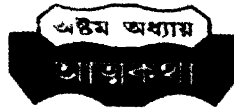
আইনস্টাইনের এই আবিষ্কারের কিছুদিন আগে এইচ্ জি ওয়েলস্ তাঁর এক উপন্যাসে

'টাইম মেশিন' নামে একটি বিষয়কল্পনার উল্লেখ করেন। এটা অবশ্য গল্পকারের কল্পনাপ্রসূত আখ্যায়িকা মাত্র। কিন্তু কেউ কেউ এমন কথাও বলে ফেলেছেন যে, সময়কে আয়তনের চতুর্থ মাত্রা হিসাবে প্রথম ওয়েলস্ সাহেব কতকটা আঁচ করেছিলেন।

কার্লাইলের মতো কবি ও শিল্পীরা স্রষ্টা ; সহজ অনুভূতির জোরে তাঁরা সময় সময় দিব্য তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করে ফেলেন। এবার দেখা যাক্ বাংলা সাহিত্য। বর্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবির রচনার কিয়দংশে উদ্ধৃত করা হলো। ১২৯১ সালে ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের লেখা,—

'এ জগতে সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ—এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর এক প্রকার আয়তন আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা বা আয়তনের অসীম অভাব। একটি বালু কণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতগুলি পরমাণুর সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই?...তাহা কি অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে?'

এর মধ্যে কাব্যোচ্ছ্বাস নেই, হেঁয়ালী নেই। যেকোন বিজ্ঞানী আজও এই ভাষাতেই সময়-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করবেন। তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, একজন কবি এই কথা এত স্পষ্ট লিখে গেছেন ৫৬ বৎসর আগে।



সেদিনের আলোছায়া

লোকের কাছে আজ আমার পরিচয় এই যে, আমি একজন লেখক। কিন্তু লেখক হওয়ার জন্য আমার জীবনে কোন আকাঙ্ক্ষার তাগিদ কোনদিনও ছিল না। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে, যখন আমার বয়স ত্রিশ-একত্রিশ, তখন আমি প্রথম একটি গল্প লিখেছিলাম। সেই গল্প পত্রিকাতে প্রকাশিতও হয়েছিল। তার আগে আমি কোনদিন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি। হঠাৎ দরকার হয়েছিল, তাই হঠাৎ লিখে ফেলেছিলাম। এছাড়া আমার গল্প লেখার ঘটনা অন্য কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধের ক্রিয়াফল নয়। ঘটনাটা বস্তুত আকস্মিক, কোন অনুশীলিত প্রয়াসের পরিণাম নয়। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত দরকারে বাংলা ভাষায় চিঠি-পত্র লিখতে হতো ; এছাড়া বাংলা-লেখার কোন চেষ্টা ও চর্চার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সদাগরী অফিসের কেরাণী হিসাবে ইংরেজী ভাষায় অনেক কারবারী চিঠি অবশ্য লিখতে হয়েছে। বলাবাহুল্য, এধরনের বাংলা ও ইংরেজী চিঠি লেখবার সামান্য সাধারণ বৃত্তির মধ্যে ভাষার ও লেখার কোন সৌকর্যের ছায়াও ছিল না, সুযোগও ছিল না। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের হাতের কলমের যে অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, আমার অভিজ্ঞতা তার চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। তাই আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম একটি গল্প লিখে আমি নিজেই প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম এবং বিস্মিত হয়েছিলাম যে, আমি সেই লেখাও লিখতে পারি, যাকে সাহিত্যের রূপ ও রীতির অনুমোদিত লেখা বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। আমার প্রথম লেখা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ছোট নিবন্ধ। দ্বিতীয় লেখা, একটি গল্প ; নাম 'অযান্ত্রিক'। পাঠক ও সমালোচক অনেকেরই এই প্রশংসার গুঞ্জন শোনা গেল, 'অযান্ত্রিক' গল্পে বিলক্ষণ অভিনবতার স্বাদ আছে। আমার লেখা দ্বিতীয় গল্পটির নাম 'ফসিল'। 'ফসিল' গল্প প্রকাশিত হবার পর পাঠকের প্রশংসার কলরোল শোনা গেল। আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় 'অযান্ত্রিক' প্রকাশিত হয়েছিল। 'অগ্রণী' নামের একটি মাসিক পত্রিকায় 'ফসিল' প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটি পত্রিকায় 'ফসিল' গল্পটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছিল। গণনাট্যের ব্রতী তরুণদল ফসিল গল্পটিকে নাটকরূপে প্রচারিত করে ও 'অঞ্জনগড়' নাম দিয়ে অভিনীত করলেন। সেই অভিনয় আমি দেখিনি। শুনেছি ওভারটুন হলে 'অঞ্জনগড়' নাটকের উদ্বোধন করেছিলেন প্রবীণ সুধী শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত। লেখক হিসাবে আমার সেদিনের বিস্ময়ের স্মৃতি আজ অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও একেবারে মুছে যায়নি। পাঠকজনের পরিতৃপ্ত মনের বিপুল সমাদরের হর্ষে ফসিল গল্পের যে সুখ্যাতি উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, সেটা যেন স্থিরনীর নদীর আকস্মিক উচ্ছলতার মতো একটা ঘটনা। চিন্তাতে কল্পনাতে ও আকাঙ্ক্ষাতে আমি এমন ঘটনা দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাছাড়া, প্রথম প্রয়াসের ফল একটি-দু'টি গল্প পাঠকজন ও সমালোচকের কাছ থেকে বড় রকমের কোন অভ্যর্থনা পাবে, এটাও নিতান্ত বিরল, বস্তুত প্রায় অসম্ভব ঘটনা বলে ধারণা ছিল। কিন্তু যেটা আশা করতে পারিনি, সেটাই পেলাম। বেশ-একটু বেশী করেই পেলাম। সেদিনের স্মৃতির মধ্যে আমার নিজের মনের প্রসন্নতার ছোট একটি ছবি দেখতে পাই। সেই প্রসন্নতার মধ্যে যেন একটা ভয়ও মুখঢাকা দিয়ে লুকিয়েছিল। ভয়টা দুরু-দুরু একটা প্রশ্নের

ভয়। তবে কি আমি সত্যিই একজন লেখক হয়ে গেলাম? আরও লিখতে হবে? সাহিত্যকে যদি একটি মন্দির বলে কল্পনা করি, তবে বলতে পারি, মন্দিরের খোলা দ্বার দেখতে পেয়েই সেদিন ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, দ্বার বন্ধ দেখতে পেলেই ভাল ছিল। ভিতরে প্রবেশ করলেই তো ধূপ-দীপ জ্বালতে হবে। সেটা আমার যোগ্যতায় সম্ভব হবে কি হবে না, কে জানে!

ভেবেছিলাম, না, আর নয়। এই প্রথম সোপান থেকেই ফিরে চলে যাওয়া উচিত। আর কখনও কোন গল্প লিখবো না। কিন্তু আমার এই সংকল্পের জোর ভেঙে দিলেন আমারই পরিচিত ও অন্তরঙ্গ কয়েকজন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু। এক স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ছাড়া সেই বন্ধুদের সবাই আজও আছেন। মন্মথনাথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিনয় ঘোষ, পুলকেশ দে সরকার, সাগরময় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য। আমার লেখা গল্পের সুখ্যাতিতে আমি আর কী এমন খুশি হয়েছিলাম। আমার চেয়ে শতগুণ বেশী খুশি হয়েছিলেন তাঁরা, আমার ওই ছয়-সাত জন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার লেখা গল্পের সুখ্যাতি যেন তাঁদেরই একটি প্রিয় আকাঙ্ক্ষার সফল কৃতিত্বের পরিণাম। কারণ তাঁদেরই ইচ্ছা ও অনুরোধের নির্দেশে আমি গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। বাধ্য হওয়ার ছোট একটি ইতিবৃত্ত আছে, যা উল্লেখ না করলে আমার গল্প লেখার প্রথম চেষ্টার ইতিকথাটি অনুক্ত থেকে যায়। বন্ধুরা প্রতি মাসের দুই রবিবারে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে সমবেত হতেন। উদ্দেশ্য, সাহিত্যের আলোচনা ও নিজের নিজের লেখা পাঠ করা। সেই লেখার ভাল-মন্দ গুণের বিচার করা হতো। এই সমাবেশের একটা নাম ছিল, অনামী সংঘ। আলোচনা শেষ হলে অনামীরা আর একটি আনন্দের স্বাদে পরিতুষ্ট হতেন, ভোজনানন্দ। পালা করে বন্ধুদের বাড়িতে অনামী সংঘের বৈঠকী সমাবেশ হতো। অনামী সংঘের সদস্য হয়েও আমার আচরণে রীতিগত একটি ব্যতিক্রমের ব্যাপার ছিল। বৈঠকে আমার উপস্থিতি ছিল নিতান্ত একটা উপস্থিতি, শুধু অপরের লেখা মন দিয়ে শোনা, ও মন দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ গ্রহণ করা। আমি কোনদিনও সাহিত্যের মতো করে কোন লেখা লিখিনি, সুতরাং অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আমার নিজের কোন রচনা পড়বার প্রশ্ন থাকতে পারে না। আমার এই অভিমতের যুক্তিকে আমল না দিয়ে স্বর্ণকমলবাবু প্রথম একটি কড়া অনুরোধের চাপ দিলেন : সাহিত্যের মতো করে লিখতে পারুন বা না পারুন যা ইচ্ছা হয় এবং যা পারেন, যেমন-তেমন কোন একটা নিজের লেখা অনামী সঙ্ঘের বৈঠকে আপনাকে পড়তেই হবে। নইলে ভাল দেখায় না। বুঝতে দেরি হয়নি আমার, নিজের কোন লেখা পাঠ না করে শুধু খাওয়া-দাওয়া করা ভাল দেখায় না। বুঝেছিলাম, যেটা অনুরোধের চাপ সেটা বস্তুত একটা অভিযোগের চাপ। সুতরাং অনামী সংঘের পরবর্তী দুই বৈঠকে নিজের লেখা দুটি গল্প পড়লাম। দুটিই গল্প, অযান্ত্রিক ও ফসিল। সন্ধ্যাবেলাতে বৈঠক, আমি দুপুর বেলাতে অর্থাৎ বিকেল হবার আগেই মরিয়া হয়ে সাত তাড়াতাড়ি গল্প দুটি লিখে ফেলেছিলাম। আশা ছিল, এইবার অনামীদের কেউ আর আমার সম্পর্কে রীতিভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারবেন না। কিন্তু একটুও আশা করিনি যে, বন্ধু অনামীরা আমার লেখা ওই দুই গল্প শুনে প্রীত হতে পারবেন। পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘটনা হলেও, অনামী বন্ধুদের সুপ্রীত চিত্তের সেই হর্ষধ্বনি আমি আজও শুনতে পাই, তাঁদের দুই চোখের সেই উজ্জ্বল পরিতৃপ্তির দৃষ্টি আজও আমার স্মৃতির মধ্যে যেন একটি দ্যুতিজ্জ্ববির মতো মাঝে-মাঝে জেগে ওঠে। অনামী বন্ধুদের আন্তরিক

আনন্দের প্রকাশ ও উৎসাহবাণী আমার সাহিত্যিক কৃতার্থতার প্রথম মাঙ্গলিক ধান-দুর্বা। আমার নিজের অনুভবের মধ্যেও সেদিন অনেক বিস্ময় গুঞ্জরিত হয়েছিল, সে বিস্ময়ের মধ্যে একটি বড় প্রশ্নও নিহিত ছিল। আমার মতো অনভিজ্ঞ এক আনাড়ীর পক্ষে এক চেষ্টাতেই গল্প লেখা সম্ভব হলো কী করে? ব্যক্তির জীবনে যোগ্যতাও কি একটা আকস্মিক আবেগের সৃষ্টি?

সেদিন আমার মনের বিস্ময়ের মধ্যে যে প্রশ্ন ছিল, আমার গল্প লেখার এই ইতিবৃত্ত পাঠ করে অনেকের মনে সেই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কোন ব্যক্তির আকস্মিক কৃতিত্বের ব্যাপারটা কি বিনা চেষ্টার একটা ম্যাজিক? সেদিন যে বাস্তব সত্যতার নিয়মটাকে স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পারিনি, আজ সেটা খুব স্পষ্ট করে ধরতে ও বুঝতে পেরেছি বলেই বলতে পারি, না আমার গল্প লেখার কৃতিত্বটা বিশুদ্ধ আকস্মিকতার একটা ইন্দ্রজালের জাল নয়। ভাবনা কল্পনা ও অনুভবের মধ্যে জীবন-বৈচিত্র্যের যে ছবি আগেই রূপান্বিত হয়েছিল, তারই প্রতিচ্ছবি একদিন গল্পরূপে বিমূর্ত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আর-একটি ঘটনার খুব ছোট একটি ইতিবৃত্ত স্মরণ করতে পারি, সেটা আমার প্রথম গল্প লেখার দু'তিন মাস আগের একটি অভিজ্ঞতার। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগের একজন কর্মী হয়ে কাজ করতে গিয়ে বহুজনের প্রেরিত গল্পের ফাইল হাতড়ে একটি যোগ্য গল্প বাছতে হতো। যে-সব লেখকের কম-বেশী নাম-ডাক ছিল, শুধু তাদের লেখা নয়, অখ্যাত লেখকের গল্পও রবিবাসরের আনন্দবাজারের সাহিত্য-পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হতো। অখ্যাত লেখকের গল্পকে আমার বুদ্ধিবিচার অনুযায়ী মাজা-ঘষা ও ওলট-পালট করে, এমন কী গল্পের মধ্যে নতুন বর্ণনা ও নতুন সংলাপও যুক্ত করে দিতাম। এই রকম কয়েকটি গল্প প্রকাশিত করবার পর লেখকের ধন্যবাদ এবং পাঠকজনের প্রশংসার চিঠিও এসেছিল। লেখকের ধন্যবাদের চিঠিতে মন্তব্য থাকতো : আপনারা আমার লেখা গল্পটির চমৎকার সংশোধন করেছেন। পাঠকদের প্রশংসাও চিঠিতে মন্তব্য থাকতো : এই রবিবারের আনন্দবাজারে প্রকাশিত গল্পটি খুবই সুন্দর হয়েছে। এই রকম আরও গল্প ছাপুন। ব্যাপার দেখে আমার মনে একটি দুঃসাহসিক বাসনার প্রশ্ন কয়েকবার ঝিলিক দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। ইচ্ছে করলে ও চেষ্টা করলে আমিও কি একটা আস্ত ভাল গল্প লিখে ফেলতে পারি না? বাস্, ওই পর্যন্ত, প্রশ্নটা এর বেশী কোন মানসিক চঞ্চলতা সৃষ্টি করতে পারেনি। অনামী বন্ধুদের তাগিদে বাধ্য না হবার আগে আমি কোন গল্প লিখতে চেষ্টা করিনি।

কবি বলেছেন—ছিন্ন তুষারের প্রায়, বাল্য বাঞ্ছা দূরে যায়। এটা কিন্তু মনোবিজ্ঞানের মনঃপূত ধারণার কথা নয়। বাল্য বাঞ্ছার আবেদন ব্যক্তির অন্তশ্চেতনায় সঞ্চিত হয়ে থাকে। ব্যক্তির কল্পনা ভাবনা ও অনুভবের স্বভাব তৈরী করে দেবার ব্যাপারে বাল্য বাঞ্ছারও হাত থাকে। কবি কালিদাস 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যা'র কথা বলেছেন। পূর্বজন্মের অধিগত বিদ্যা পরজন্মের ব্যক্তির জীবনে সঞ্চারিত হয়ে সহজ প্রতিভা সৃষ্টি করে কি না, সেটা নিগূঢ় এক বিবাদীয় দার্শনিক তত্ত্বের প্রশ্ন। জন্মান্তরবাদও বাদ-প্রতিবাদের সংঘাতে অভিভূত একটি তত্ত্ব। ওই প্রশ্নের জবাবে আমার বিশ্বাস ও ধারণার কথার মধ্যে হ্যাঁ কিংবা না, দু'য়ের কোনটিই নেই। আমার বিশ্বাস এই যে, শুধু বাল্য বাঞ্ছা নয়, কৈশোর ও যৌবনেরও ভাবসঞ্চয় ব্যক্তির চিন্তার সৃষ্টিশীল প্রকৃতি নির্মাণ করে। এটা কবি কলাশিল্পী ও কথাশিল্পীদের

সম্পর্কে আরও বেশী প্রযোজ্য একটি সত্য। জীবনের বিচিত্র রূপ রহস্য ও বিস্ময়ের সঙ্গে যার যেমনতর মায়িক সম্বন্ধ ঘটে, তার মনের বৃত্তি ও প্রকৃতি ঠিক তেমনতর মায়িক সৌকর্য লাভ করে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আকস্মিক প্রকারে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু নির্ঝর স্বয়ং একটি আকস্মিক সৃষ্টি নয়। তার ইতিহাস আছে। খুব সরল করে বলা চলে, সেটা অভিজ্ঞতারই ইতিহাস। লেখক হবার আগে জীবনের আলো-ছায়া ও অন্ধকারের অনেক রূপ ও অনেক ঘটনা দেখবার অভিজ্ঞতা আমারও ছিল। শ্মশানের ভয়ানক ধোঁয়ার কুজ্ঝটিকা ও শালবনের মাথার উপর পূর্ণ চাঁদের জ্যোৎস্নাবিস্তার, দুইই দেখবার অভিজ্ঞতা। পনেরো বছর বয়সের জীবনে রোজ সকালে এক মাইল পথ হেঁটে উকিলবাবুর বাচ্চা ছেলেদের পড়াতে গিয়ে কঠোর এক সাংসারিক সত্যের স্বাদ পেতে হয়েছে। দশ টাকা মাইনের মাস্টারের একদিনের গরহাজিরার ক্ষমা করতে পারলেন না বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত উকিলবাবু। পাঁচ আনা কেটে রেখে ন' টাকা এগার আনা দিলেন। আবার অন্য ঘটনায় এর বিপরীত সত্যের প্রকাশও দেখতে হয়েছে। ক্ষুদ্র এক ধর্মশালার পাঁচ টাকা মাইনের দারোয়ান তার দুপুরবেলার আহারের দু'টি মোটা-মোটা বজরা রুটির একটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেল—'আপনি আজ এখনও কিছু খাননি বলে মনে হচ্ছে, তাই আমিও খেতে পারছি না। রুটিটা এখনই খেয়ে নিন।' আমার বিশ্বাস, এ রকম অনেক ঘটনার ভিতরে ও নিকটে থাকবার অভিজ্ঞতা আমার অনুভব ও প্রত্যয়ের সম্বল সৃষ্টি করেছে। কৈশোর কালের আর একটি প্রাপ্ত সম্বলের কথা মনে পড়ে, যার রূপটা বস্তুত রূপকথারই মতো একটি আবেশ দিয়ে গড়া। পিতামহের বন্ধু রায়বাহাদুর পার্বতীনাথ দত্ত, যিনি ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভের প্রথম ভারতীয় ডিরেক্টর, তিনি নদী পাহাড় সমুদ্র ও পাথরের অনেক মজার-মজার গল্প বলতেন, বড়-বড় প্রাণীর হাড় পাথর-চাপা পড়ে ফসিল হয়ে যায়। মহিলা কবি কামিনী রায় আমাদের বাড়িতে আসতেন। তিনি তাঁর লেখা দু'টি বই, 'গুঞ্জন' ও 'অশোক সঙ্গীত' উপহার দিয়েছিলেন। অর্থ বুঝতে পারিনি, কিন্তু কবিতার কথাগুলি মনের মধ্যে যে ঝংকার জাগিয়ে তুলতো, তার মধুরতা অনুভব করতে কোনই অসুবিধা হতো না। আমরা দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হলেও আমাদের বাড়িতে ব্রহ্মোপাসনা প্রায়ই হতো। আচার্যের প্রার্থনার ভাব ও ভাষার অনেক কিছু বুঝতে না পেরেও মুগ্ধ হতাম। পিতামহের টেবিলের উপরে রাখা একখণ্ড 'ব্রহ্মসঙ্গীত' আদ্যোপান্ত বারবার পড়েছি। বয়সটা তখন যদিও সেইসব সঙ্গীতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য বুঝবার মতো যোগ্যতার বয়স নয়, তবু একটা নতুন রকমের তৃপ্তি বোধ করতাম। আমার ধারণা, আচার্যদের প্রার্থনার ভাষা ও ব্রহ্মসঙ্গীতের ভাষা আমার সেই কিশোর মনের মধ্যে একটি সুষ্ঠু ভাষার সম্বল তৈরী করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে দার্শনিক মহেশচন্দ্র ঘোষের লাইব্রেরি ছিল আমার নিজের ইচ্ছানুচালিত শিক্ষার একটি বড় সহায়। আমার এই আত্মনির্ভর শিক্ষার সিলেবাসে কাহিনী-সাহিত্যের কোন স্থান একরকম ছিলই না বললেই চলে। ইতিহাস ও দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের বই পড়বার দিকে আমার বেশী ঝোঁক ছিল। রাঁচী নিবাসী বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার কোন সুযোগ হয়ে ওঠেনি, তাঁর লেখা আদিবাসী-জীবনের বৃত্তান্ত পাঠ করে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কৌতূহল উদ্বোধিত হয়েছিল। আমি তখন হাজারিবাগ সেণ্ট কলম্বাস কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। নৃতাত্ত্বিক শরৎচন্দ্র রায়ের ছেলে রমেশ ছিল আমার সহপাঠী কলেজ-বন্ধু। রমেশের মুখ থেকে তার পিতার গবেষণা ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনের সংগ্রহ সম্পর্কে কিছু পরিচয়ের কথা শুনেছিলাম।

যে-টুকু শুনেছিলাম তারই মধ্যে যেন আবেদনময় একটি সঙ্কেত ছিল। কৃতী নৃতাত্ত্বিক হবার একটি আকাঙ্ক্ষার সঙ্কেত। যা-ই হোক, আকাঙ্ক্ষা থাকলেও নৃতাত্ত্বিক হতে পারিনি। ভূতাত্ত্বিক কিংবা সঙ্গীত-রচয়িতা কবি হতেও পারিনি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি, সেদিনের সেইসব আবেগ আগ্রহ ও কৌতূহলের সঞ্চয় আমার গল্প-লেখা ও উপন্যাস লেখা প্রয়াসেরই একটি সহায়ক সম্বলে পরিণত হয়েছে।

মাইকেল মধুসূদনের একটি কবিতার বাণীর মধ্যে কান্ত সাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক নির্মাণের রীতি সংজ্ঞায়িত হয়েছে বলে মনে করা চলে। 'ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে মা যথা ফলে, মধুময় তামরস…।' ভৌগোলিক মানস হ্রদের সঙ্গে তুলনা না করে বলা চলে যে, মানুষের মনের রূপায়তনও একটি হ্রদ, এবং স্মৃতি তার জল। কান্ত সাহিত্যের প্রত্যেকটি সৃষ্টি, কবিতা ও কাহিনী, বস্তুত স্মৃতিজলে ফুটে ওঠা তামরস। গল্পলেখক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতারও আবিষ্কার এই যে, স্মৃতি যেন আপন আগ্রহের বেদনায় একটি কান্তি সৃষ্টি করে পরিতৃপ্ত হয়। গল্প-লেখা তাই সাহিত্যিক জীবন নামে স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর একটা জীবনের কাজ নয়। এবং কান্ত সাহিত্য সৃষ্টি করবার যোগ্যতা নিছক পাণ্ডিত্যের অধিগম্য কোন কৃতিত্ব নয়। এই যোগ্যতার ষোল-আনা ভাগের বারো-আনা ভাগই বস্তুত আন্তরিক সংবেদনার কোন জিজ্ঞাসার সৃষ্টি, বুদ্ধিবৃত্তির কোন তাগিদের সৃষ্টি নয়। নিজের ইচ্ছার তাগিদে হোক, কিংবা পত্র-পত্রিকার সম্পাদকের অনুরোধের চাপে হোক, যখনই গল্প লিখেছি তখনই বুঝতে পেরেছি যে, বিশেষ একটি জিজ্ঞাসার প্রেরণা ছাড়া গল্প লেখা সম্ভবই নয়, যদিও গল্পের মতো চেহারাব একটা বাক্-সামগ্রী নির্মাণ করা সম্ভব। আমি জানি, এবং আমার স্বীকার করতে একটুও আপত্তি নেই যে, আমার লেখা কিছু গল্পও বস্তুত গল্পের মতো চেহারার বাক্-সামগ্রী মাত্র, বিশেষ কোন আন্তরিক জিজ্ঞাসার রূপ নয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার লেখা এ ধরণের কয়েকটি অযথার্থ গল্প বিজ্ঞ সমালোচকের উচ্চকণ্ঠ প্রশস্তি লাভ করেছে, যদিও সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির ভাষাতে তার আশাভঙ্গের দুঃখ বিবৃত হয়েছে যে: আপনার লেখা এই গল্পটিকে পড়ে কোন সুখ পেলাম না। গল্পটি কেমন যেন খাপছাড়া।

আমার গল্পের গুণাগুণ নির্ণয় করবার যে পদ্ধতিকে আমি সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল বলে মনে করি, সেটা হলো সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া অজস্র চিঠির অভিমত। সাধারণ পাঠকের অভিমতের উপর আমার এই আস্থার একটি বড় কারণ হলো বারো বছর বয়সের একটি বালকের প্রশ্ন—আপনার 'ঠগিনী', আর 'পরীক্ষিৎ ও সুশোভনা' কিন্তু একই গল্প, দু'রকম করে লিখেছেন, তাই না? এ রকম প্রশ্ন, বিশেষ করে এত অল্প বয়সের এক বালক পাঠকের মুখে উচ্চারিত হতে পারে বলে ধারণা ছিল না। শুনে চমকে উঠেছিলাম, কারণ আমি লেখক হয়েও কোনদিন ভেবে দেখিনি কিম্বা বুঝতেই পারিনি যে, ওই দুই গল্প জীবনের একই অনুভব ও হৃদয়বৃত্তির দুই ভিন্ন সাজের দুই রূপ। সেদিন থেকে আমার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে, পাণ্ডিত্যময় প্রবীণতার দুই চোখের দৃষ্টিতে স্বচ্ছতার অভাব থাকে, ভাব অনুভব ও রসের সহজ সত্যের প্রতিভাস সেই চোখে ফুটে উঠতে পারে না। কিন্তু যাদের আন্তরিক বৃত্তির সহজ সৌষ্ঠবের কোন বিকার ঘটেনি, কান্তকলার যথার্থ রূপের বিচার করবার মানসিক যোগ্যতা তাদেরই বেশী। এটা আমার দীর্ঘকালের তথাকথিত সাহিত্যিক-জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা। সাহিত্যের সমালোচক

বলে পরিচিত ও খ্যাত তিন গুণী ব্যক্তির ভিন্ন-ভিন্ন তিন নিবন্ধে আমার লেখা একটি গল্পের তিন রকম অদ্ভুত তাৎপর্যের পরিবেষণ দেখে আতঙ্কিত হয়েছিলাম, যেন তিনটি ভয়াবহ কুজ্‌ঝটিকা কথা বলছে। একদিন প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষিকার চিঠি পেলাম : আপনার গল্পটির অর্থ কি এই নয় যে, মানুষের জীবন একবিবাহের (মনোগামি) সম্বন্ধের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুখী হয়? ঠিক প্রশ্ন, মনোগামি অর্থাৎ একবিবাহ প্রথা বলে আখ্যাত সামাজিক শীলাচারের মনস্তত্ত্ব এই গল্পে মর্মায়িত হয়েছে। এই চিঠির প্রশ্নে এক মুহূর্তেই আমার সেই আতঙ্কের ঘোর কেটে গিয়েছিল।

সমালোচনার এইসব বিচিত্র ও অদ্ভুত রকম-সকমের অনেক নমুনার উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু না, অলমতি বিস্তরেণ। শুধু বলতে হয় যে, অক্ষম ও স্থূল প্রকারের সমালোচনা, প্রশস্তি হোক বা ভর্ৎসনা হোক, সাহিত্যের পরিবেশ আবিল করে। আমার উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার স্মৃতি যদি কথা বলে, তবে এই কথাই বলবে যে, অক্ষম সমালোচনা হলো ক্লিন্ন এক জঞ্জাল, সাহিত্যের সুস্থতার একটি বড় ভয়। সমালোচনার দীনতা রিক্ততা ও কৌতুককর প্রগল্‌ভতার এই রকম কয়েকটি নমুনা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকারের গুণান্বিত সমালোচনার অনেক নমুনা আমার স্মৃতিলোকের প্রসন্নতার মধ্যে শুভাবহ সংকেতের মতো মুদ্রিত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যের সুহৃদ হবার মতো গুণ ও শক্তি এমন অনেক সমালোচনার সাক্ষাৎ পেয়েছি।

এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মাঝে-মাঝে একটানা অনেক বৎসর এবং অনেক মাস বাদ গিয়েছে, গল্প লেখবার ইচ্ছা ও চেষ্টা দুই-ই স্তব্ধ হয়ে যেন সাময়িক বিরাম উপভোগ করছে। একবার একটানা পুরো চার বছর, এবং একবার একটানা পুরো দু'বছর একটিও গল্প লিখিনি। কিন্তু সেই সময় সমালোচকের নিবন্ধে খিন্ন মেজাজের মন্তব্য ধ্বনিত হয়েছে : সুবোধ ঘোষ আজকাল বড় বেশী লিখছেন। এত বেশী লেখালেখি ভাল নয়, এতে লেখার উৎকর্ষের হানি হয়।

সাহিত্যের লেখক হিসাবে আমার বিশেষ একটি সৌভাগ্যের সত্য এই যে, আমাকে কোনদিনও নিজের ইচ্ছার তাগিদে কোন পত্রিকা-সম্পাদকের বরাবরেষু আমার কোন লেখা পাঠাতে হয়নি। নিজের লেখা গল্প ও উপন্যাস বই করে বের করবার ইচ্ছায় আমাকে কোন দিন কোন প্রকাশকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়নি। প্রকাশক স্বয়ং আগ্রহী হয়ে আমার গল্পগ্রন্থ অথবা উপন্যাস প্রকাশ করবার প্রস্তাব করেছেন, তবেই আমি সাড়া দিয়েছি কিংবা দিইনি। কিন্তু উপযাচক হয়ে কোন প্রকাশকের কাছে বই ছাপাবার কোন অনুরোধ আমাকে কখনও করতে হয়নি। বন্ধু সাহিত্যিক খুশি হয়ে বলেছেন : আপনিই ভাল আছেন। আপনার বই বিক্রী হোক বা না হোক, বইয়ের বাজারের ধুলো আপনাকে গায়ে মাখতে হয়নি। জানবেন, এটা আপনার সাহিত্যিক জীবনের একটি বিশেষ পুরস্কার। বলা বাহুল্য, বন্ধু সাহিত্যিকের এই ধারণার সঙ্গে আমার নিজের ধারণার একটুও অমিল নেই।

আমার স্মৃতিকথার এই প্রসঙ্গটি কারও কারও কাছে অহমিকার প্রকাশ বলে বোধ হতে পারে। আমার কাছে এটা স্নিগ্ধ একটি উপলব্ধির বিনীত নিবেদন। ভাবতে সত্যিই আনন্দ পাই যে, বাজারের ধুলো গায়ে মাখবার দুর্ভাগ্য আমার হয়নি। অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য একদিন বলেছিলেন—আপনার দাম্ভিক বলে দুর্নাম আছে। থাকতে পারে। সেদিন যেমন ছিল আজও বোধহয় তেমনই আছে। কলমলে আসরের মধ্যে প্রবেশ না করে এক পাশে

একটু আবছায়ার মধ্যে আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা ভিড়ের চক্র দেখে দূরে সরে থাকা যদিও বস্তুত একপ্রকারের নিরীহ নির্লেপ তবু সেটা দম্ভ বলে অপবাদিত হয়ে থাকে। শুনেছিলাম, যে ব্যক্তি কোন দলে থাকে না, যে ব্যক্তি কোন সঙ্ঘবদ্ধ স্বার্থের পক্ষভুক্ত নয়, তাকে সকলেই পছন্দ করে। আমার অভিজ্ঞতার যে-কথা আজও স্মৃতির ঘারে একটি অদ্ভুত ও অভাবিত বিস্ময়ের কলরবের মতো বাজে, সেটা এই যে, এহেন দলহীন ও অপক্ষভুক্ত ব্যক্তিকে সবাই অপছন্দ করে, তার সম্পর্কে কারও কোন মমতার কণ্ঠ নেই, তার সম্পর্কে যথেচ্ছ অপবাদ রটনা করাই একটা লোকাচার। এ ধরণের লৌকিক অমান্যতার অপঘাতে আমার সাহিত্যিক জীবনের শান্তি মাঝে মধ্যে ব্যথিত হলেও বিচলিত হয়নি। শুধু বিস্মিত হয়েছি কিন্তু বিদ্বিষ্ট হতে পারিনি। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একবার আমার সম্পর্কে এক ব্যক্তির উদ্দীপ্ত রোষের কথা জানিয়ে দিয়ে আমাকে সভয় একটু সতর্ক হতে বলেছিলেন। উচ্চপদস্থতার বিক্রমে মোহান্বিত সেই ব্যক্তির প্রতিজ্ঞা, তিনি আমার চাকরি খাবেন এবং আমার সাহিত্যিক আকাঙ্ক্ষার ছটফটানি একেবারে ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবেন। প্রমথবাবুকে আমি বলেছিলাম, তিনি ক্ষতি করুন, সেজন্য আমি ভীত নই। কেন? জিজ্ঞাসা করেছিলেন প্রমথবাবু। আমি বলেছিলাম, জীবনে আমি কোনদিনও কারও ক্ষতি করিনি, তাই আমি ক্ষতিচারী কোন ক্ষমতাবানকেও ভয় করি না। কারও কারও মনে হতে পারে যে, স্মৃতিকথা লেখবার ছলে আমি বেশ কিছুটা আত্মগরিমার কথা বলে নিচ্ছি। না, তা নয়। আমি আমার এই পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকতার জীবনে কোনদিনও আমিত্বে চিহ্নিত করে কিংবা আমিত্ব প্রসারিত করে কোন নিবন্ধ লিখিনি। নির্ভয়ের এই তত্ত্ব আমার একটি অভিজ্ঞতার উপহার, একটি ঘটনার শিক্ষা। সেই ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে আজও স্পষ্ট করে দেখতে পাই, ধবধবে ফর্সা ও অত্যন্ত রোগা চেহারার এক পাঠকজী ঘন-সন্ধ্যার অন্ধকারে তুলসী মণ্ডপের চাতালের উপর একটি বাতি রেখে রামায়ণ পড়ছেন। সহসা এক ব্যক্তি ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠলো, ভাগিয়ে পাঠকজী, ওরা রওনা হয়েছে, ওরা আজ রাত্রেই আপনাকে খুন করবে। ওরা মানে, পাঠকজীর দেশ-গাঁয়ের তিন জ্ঞাতি-ব্যক্তি, যারা পাঠকজীকে তাদের ভূসম্পত্তির একটি সমস্যা বলে মনে করে। পাঠকজী বললেন, শোন বাবা, আমি জীবনে কারও কোন ক্ষতি করিনি। তাই আমি কাউকে ভয় করি না। হ্যাঁ, শুধু এক ভগবানকে ভয় করি ; যদিও ভালবাসি। তোমারও কোনদিন কাউকে ভয় করবার দরকার হবে না, যদি জীবনে কারও কোন ক্ষতি না কর। মনে পড়ে, পাঠকজীর কথার আবেশ যেন আমার প্রাণের উপর সঞ্চারিত হয়ে সেদিন আমাকে একটি পরম বিশ্বাসে দীক্ষিত করে দিয়েছিল। চোখ নিষ্পলক হয়েছিল, গা শিউরে উঠেছিল, যেন একটা আলোর স্রোত বুকের ভিতরে সঞ্চারিত হয়েছে। আমার লেখা একটি উপন্যাসে এই পরম সন্তুষ্ট ও পরম নির্ভয় পাঠকজী আছেন। শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় একদিন খুশী হয়ে বললেন —উপন্যাসটি পড়েছি ; প্রার্থনা করি, পাঠকজীর মতো মানুষের সন্তোষ ও নির্ভয়ের পুণ্যকথা শোনাবার জন্য ভগবান আপনাকে দীর্ঘকাল বাঁচিয়ে রাখুন।

জীবনে বহু ঘটনা যেমন আপনি দেখা দিয়ে সত্য-মিথ্যার নির্ণয় স্পষ্টতর করে দিয়েছে, তেমনই মাঝে-মাঝে যেন প্রাণের এক-একটি জিজ্ঞাসার আহ্বানে ঘটনা এসেছে ও শিক্ষা দিয়ে গিয়েছে। মনুষ্যত্ব মহত্ত্ব ও মরালিটি, এই তিনটি সুকৃতি একই সূত্রে গাঁথা, কোনটিও কারও সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিছক এককতায় সত্য হয়ে উঠতে পারে না। দর্শন ও

ধর্মতত্ত্বের প্রত্যেকটি মৃদু অথবা কঠিন অনুজ্ঞা এই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আমিও গুরু চিন্তার অনেক বই শুধু প্রকারে পাঠ করেও এই সুদৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেছিলাম যে, হ্যাঁ, ওই মরালিটি ও মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব একই সম্বন্ধিত ত্রিভুজের তিন বাহু। একটি ছাড়া অন্য দু'টির কেউই সত্য হতে পারে না। মরালিটি বলতে সাধারণ অর্থে চারিত্রিক শুচিতা বোঝায়, সেটা অজ্ঞ অদার্শনিক জনেরও অজানা নয়। চল্লিশ বছর আগের একটি ঘটনার স্মৃতিচ্ছবির মধ্যে হাজারিবাগের যে সুরেশদাকে আজও দেখতে পাই, তাঁর মাথায় টাক ছিল, আর গায়ে ছিল আধ-ময়লা একটি টুইল কাপড়ের কামিজ। কামিজের দুই আস্তিন গোটানো থাকতো বলেই স্পষ্ট করে দেখতে পেতাম, ত্রিশ বছর বয়সের সুরেশদার হাত দুটি একটু রোগা হলেও বেশ মজবুত। চলতি মতের সাধারণ অর্থে যাকে চারিত্রিক শুচিতা বলে, তার সামান্যতম খ্যাতিও সুরেশদার জীবনে ছিল না। মদের একটি পাঁইট বোতলের ভারে তাঁর কামিজের একটা পকেট ঝুলে থাকতো। রাতের পাহারাদার পুলিশ সুরেশদাকে প্রায়ই পতিতা-পল্লীর আনাচে-কানাচে হল্লা করে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পেত আর ধরে নিয়ে গিয়ে থানার হাজত ঘরে ঢুকিয়ে দিত। এহেন সুরেশদার চিমড়ে মুখটাকেই একদিন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর পুরুষের মুখ বলে মনে হয়েছিল। সে-রাতে কুমোরপাড়ার একটা বাড়ির চালাতে আগুন লেগেছিল। বাঁশের চাটি দিয়ে তৈরী চালাটা দাউ-দাউ করে জ্বলছিল। কুমোরপাড়ার আর্ত চিৎকারে মাঝরাতের ঘুম আর স্তব্ধতা ভেঙে গিয়েছিল বলেই শহরের অনেক মানুষ ছুটে এসে কুমোরপাড়ার আগুন-লাগা বাড়িটার কাছে, তার মানে নিরাপদ ব্যবধান রেখে একটু দূরে এসে ভিড় করেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে কে না ছিলেন? বিদ্বান অধ্যাপক, সেবা মিশনের সন্ন্যাসী, উকিলবাবু ও ডাক্তারবাবু, কলেজের ছাত্র, লাঠিয়াল বলে সুখ্যাত ডোম ও গয়লা, এবং থানার দারোগা ও সাত আটজন পুলিশ কনেস্টবল। নৈষ্ঠিক ভক্তি ও সাত্ত্বিক বিশ্বাসের জন্য শহরের সবাকার শ্রদ্ধান্বিত তিন যুবক-ভদ্রলোকও ছিলেন। আমিও ছিলাম। সকলেরই মনে ও মুখে একটি প্রশ্ন হায় হায় বিলাপের রব তুলে ছটফট করছিল, আগুন লাগা ওই বাড়ির একটা ঘরের ভিতরে সব্জীওয়ালা সেই বুড়ো ও তার বুড়িকে পুড়ে মরবার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করবে কে? আগুন যে কুমোরপাড়াকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। উদ্বিগ্ন অথচ অলস সেই বিলাপমুখর জনতার বিলাপ আরও একটু প্রবল হতেই দেখা গেল, এক ব্যক্তি দুরন্ত বেগে ছুটে এসে আর চেঁচিয়ে হাঁক দিচ্ছে—আমার হাতে একটি টাঙি দাও। আর-কিছু চাই না, শুধু একটা টাঙি। ভিড়ের একটি লোক দৌড়ে গিয়ে, ভিন্‌পাড়ার এক বাড়ি থেকে একটি টাঙি যোগাড় করে আবার ফিরে এলো। সুরেশদা সেই টাঙির তিন কোপে জ্বলন্ত ঘরের দরজার কপাট তিন টুকরো করে ভেঙে দিলেন। ধোঁয়া-ভরা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন সুরেশদা; বেহুঁস এক বুড়ো ও তার বুড়ির দুই দেহভার দুই কাঁধের উপর তুলে নিয়ে সুরেশদা আবার বের হয়ে এলেন। বেহুঁস বুড়ো-বুড়িকে খাটিয়াতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল পুলিশ। আর সুরেশদা সড়কের পাশে নালার কিনারার ঠাণ্ডা ঘাসের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে রইলেন অনেকক্ষণ। আমরা ডাক দিলাম—সুরেশদা বলুন, আপনার কি কোন কষ্ট হচ্ছে? সুরেশদা উঠে বসলেন আর বললেন—ওরে তোরা আমার জন্যে ভাবছিস কেন? আগে বল, বুড়োটা আর বুড়িটা বেঁচে আছে কিনা। আমরা বললাম, হাঁ, ডাক্তারবাবু বললেন, বেঁচে আছে। সুরেশদা বললেন, বাস্, তাহলেই হলো।

আমার লেখা গল্প ও উপন্যাসের অনেক ঘটনাতে এই সুরেশদা সামান্যভাবে কিংবা

বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন জেগেছে মনে, মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের গৌরবে সুরেশদাকে ছাড়িয়ে যেতে পারেন, এমন পূতচরিত্র মানুষ এই সাধারণ মানবতার সংসারে কতজন আছেন? সেই প্রশ্নের এই উত্তর পেয়েছি যে, ওই মরালিটি, অর্থাৎ তথাকথিত ওই চারিত্রিক শুচিতা সত্যিই একটি শুচিতা এবং ব্যক্তিত্বের একটি বৈভব বটে, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব অন্য কোন সত্যের দান।

সুরেশদাকে যেমন মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের একটি গূঢ় রহস্যের প্রতিনিধি-পুরুষ বলে মনে হয়েছে, তেমনই জীবনের নানা ঘটনার পথে এমন কিছু চোখের জলের ও স্মিতহাসির সাক্ষাৎ পেতে হয়েছে, যার রূপ ও বিচিত্রতা নিয়মের শাসনবন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি রহস্যের প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে প্রখ্যাত ট্রাঙ্ক রোডের উপর ডুমরির ডাক বাংলার সামনে গিরিডি ধানবাদ সার্ভিস বাস ক্ষণবিরামের জন্য থেমেছে; বিশ বছর বয়সের বাস-কণ্ডাক্টর জেলা-বোর্ডের ছোট্ট হাসপাতাল ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবুর মেয়ের কাছে এক গ্লাস জল চেয়েছে। ডাক্তারবাবুর মেয়ে পাটনার কলেজে পড়ে, এখন গ্রীষ্মের ছুটি, তাই সে এখন ডুমরিতে আছে। দু'জনের কেউই আগে কখনও কাউকে দেখেনি। আজ এই প্রথম সাক্ষাৎ। জল খেয়ে নিয়ে বিশ বছর বয়সের বাস কণ্ডাক্টর আরও পাঁচটা মিনিট চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আর, ডাক্তারবাবুর সেই কলেজে পড়া মেয়েও পাঁচ মিনিটকাল শূন্য গেলাস হাতে নিয়ে, কিন্তু নীরব হয়ে ও অন্যদিকে তাকিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। সার্ভিস বাসের হর্ন বেজে ওঠে; চলে যাবার সময় হয়েছে। কাজেই বিশ বছর বয়সের সেই বাস কণ্ডাক্টরকেও তখন হাসপাতালের বারান্দা ছেড়ে ও ব্যস্ত হয়ে চলে যেতে হলো। কী আশ্চর্য, ডাক্তারবাবুর মেয়ের দুই চোখ জলে ভরে গিয়ে ঝাপসা হয়ে গেল। না, এটা তো নিয়ম নয়, নিতান্ত অনিয়ম। কিন্তু স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মানুষের অন্তর সত্যিই একটি রহস্যের জগৎ, তার হাসি অশ্রু বিষাদ ও উল্লাস সব সময় নিয়ম মেনে চলে না।

জীবনে এ রকম অনিয়মের বিস্ময় অনেক দেখেছি বলেই আমার লেখা অনেক গল্পের মধ্যে সেই বিস্ময়ের আবেগ খুবই সহজে সঞ্চারিত হয়েছে। ডাক্তারবাবুর সেই মেয়েকে হৃদয়বৃত্তির যে বিস্ময় বলে মনে করা চলে, সে বিস্ময় আমি আমার গল্পের অনেক নায়িকার ভালবাসার প্রাণে সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেছি। অনিয়মের বিস্ময় অথবা বিস্ময়কর এই অনিয়ম অদ্ভুত হয়েও জীবনের যত নিয়মিত মধুরতার চেয়ে অনেক বেশী মধুর। জঙ্গলের মাথার উপর চাঁদ হাসছে, জঙ্গলের ভিতরে গাছের পাতার ফাঁকে-ফাঁকে ছেঁড়া-ছেঁড়া জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে, মাঝ রাতের নিরেট নীরবতার মধ্যে বাতাসের শব্দ যেন জঙ্গলের বুকের ভিতরে লুকিয়ে-থাকা একটা অপার্থিব মায়ার মর্মবিহ্বল ইচ্ছার উচ্ছ্বাস। এহেন পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিন বুঝতে হয়েছিল, হ্যাঁ, এও এক অনিয়মের বিস্ময়। মানুষের গা ঘেঁষে আর স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বাঘ, চেনা-জানা একটি পোষা বাঘ। জঙ্গলের মায়ার আহ্বান তাকে টেনে নিতে পারলো না। শিকল-বাঁধা ও খাঁচা-বন্দী জীবনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্ত করে দেবার ইচ্ছায় সেই পোষা বাঘকে জঙ্গলের ভিতরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই মুক্তি মেনে নিতে পারলো না বাঘ, বলিষ্ঠ এক প্যান্থার। তার গায়ের উষ্ণ স্পর্শটা আমার স্মৃতির বুকে আজও লেগে আছে। একটি গল্প লিখে এই অনুভূতির তর্পণ করেছি।

নবীনচন্দ্র লিখেছেন—ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়, অদ্ভুত মানবচক্র ঘোরে নিরবধি। কবির উক্তি বস্তুত বিষাদ বিজড়িত একটি দার্শনিক উপলব্ধির প্রতিধ্বনি। কিন্তু সামান্য রকমের একটা আর্থিক রোজগার ঘটিয়ে দিতে পারে, এ রকম একটি জীবিকার আশাও যে কী ভয়ানক কুহকিনী হতে পারে, সেটা ত্রিশ বছর বয়সের কোঠায় পা দেবার আগেই হাড়ে-হাড়ে বুঝতে হয়েছিল। কিন্তু দেখে নিজেই আশ্চর্য হয়েছি, হাড়গুলি ভাঙেনি: কর্মভাগ্যটা যেন নিদারুণ এক হেঁয়ালির আহ্বানে চঞ্চলিত হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ও দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরেছে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার মতো কোন স্থিতি পায়নি। সেই দুরন্ত জীবিকা-সংগ্রামের মধ্যে অনেক জ্বালাকর দুঃখ ক্লেশ আর কষ্ট ছিল, কিন্তু খুবই স্নিগ্ধ একটি শিক্ষাও ছিল। ভাগবতের অবধূতের সাতাশ গুরু ছিল, সাতাশটি মানবেতর প্রাণী। সেই সব মানবেতর প্রাণীর সহজ প্রবৃত্তি ও জৈবিক আচরণের রূপ থেকে নৈতিক সত্যের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন অবধূত। আমিও নিতান্ত সাধারণ মানুষের সহজ মহত্ত্বের এক একটি আকস্মিক পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। উপমা দিয়ে বলা চলে, বৈশাখ মাসের জঙ্গলের পথে ক্লান্ত কাঠুরিয়ার তেষ্টা হঠাৎ একটা ঝরণা দেখতে পেয়ে যেমন [illegible] শত শত যে সব মানুষের সংসর্গে আমার নানা রূপের ও রকমের জীবিকা-[illegible] এসেছে, যারা সমাজবিজ্ঞ পণ্ডিতের ভাষায়, নিম্ন সাধারণ মানুষ। আমার [illegible] বলে, তারা উচ্চ-সাধারণ মানুষ।

[illegible] গল্প সুখ্যাত হলেও কোন প্রকাশক ফসিল ও অন্য কয়েকটি গল্পকে [illegible] ছাপতে ও প্রকাশ করতে আগ্রহ বোধ করেননি। তাঁদের অনাগ্রহের যুক্তি এই যে, [illegible] 'ফসিল' গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন একজন অ-প্রকাশক। ভদ্রলোক [illegible] বন্ধু রবীন্দ্রনাথ পাল। অ-প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত 'ফসিল' বইটির প্রথম সংস্করণ [illegible] দু'তিন মাসের মধ্যেই বিকিয়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকে শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরণা-নদীর সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আমার জীবনের একটি মহৎ সঞ্চয়। সে আনন্দের মধ্যে যে কঠিন একটি জিজ্ঞাসা নিহিত ছিল, তার পরিচয় [illegible] না বাড়বার আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। শালবন পাহাড় আর জংলী ঝরণা নদীকে চমৎকার এক রহস্যের মায়াচ্ছবি বলে বোধ হতো। এ কিসের মায়া? বয়স বাড়লে এই জিজ্ঞাসার কথাটা ভাবনার ঘরে মাঝে মাঝে একটু বেশী সরব হয়ে উঠতো। [illegible] পাঠ করবার ও তার অর্থ বোঝবার অনেক আগেই অনেকদিন ও [illegible] হয়েছিল, শালবনের বাতাসে আর ঝরণার নদীর শব্দ যেন কথা বলছে। কে জানে [illegible] সেদিনের অনুভবের আবেশ কিন্তু বয়স বাড়তেই ঠিক তেমন করে ফুরিয়ে [illegible] রোদ বাড়লে ঘাসের শিশির যেমন শুকিয়ে যায়। তন্ত্রের গ্রন্থে এই জিজ্ঞাসা ও [illegible] সরল অর্থ পরিচয় পাওয়া যায় : সৃষ্টির বিস্ময় অনুভব করে স্রষ্টাকে জানবার ইচ্ছা। কিন্তু [illegible] এইটুকু বুঝেই জীবনের কৌতূহল যেন লুকিয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মোপাসনা ও হরিসংকীর্তন শুনতে অভ্যস্ত ছেলেবেলার জীবনে যে ঈশ্বর বিশ্বাস খুবই সহজ ও স্বাভাবিক একটি প্রাপ্তি হয়ে কাছে এসেছিল, সেই ঈশ্বরবিশ্বাসকে একটা যুক্তিহীন প্রত্যয় বলে [illegible] খুশি হয়েছিল জীবনের যৌবনকাল। বিবেকানন্দ-সাহিত্য অতি আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে পাঠ করবে কবে যে ঈশ্বর বিশ্বাস আবার অন্তরতর ভাবনায় বিমূর্ত হয়েছিল, [illegible] নানা সন্দেহে ভঙ্গুর হয়ে শেষে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই গিয়েছিল। বিশ্বাসের

এরকম সঙ্কট অথবা বিপর্যয়ের ঘটনা অন্য অনেকের জীবনেও দেখতে পেয়েছি। নানা মুনির নানা মতের তত্ত্ব থেকে শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সত্য বলে প্রমাণিত করবার যুক্তি, আর মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবার যুক্তি, দুই-ই সমান ভারী। না, যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তি-নাস্তি করা সম্ভব নয়। সংশয়াপন্ন মনটা দীর্ঘকাল এই সিদ্ধান্ত পুষে রেখেছিল যে, যদি কোন অলৌকিক ঘটনা দেখতে পাই তবেই বুঝবো যে, লৌকিক প্রত্যয়ের ওপারে সত্যিই কেউ একজন নিশ্চয়ই আছেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আমার ইচ্ছার এই দাবিটা যেন নিজেরই অট্টহাসির ঠাট্টায় চূর্ণ হয়ে গেল। ঠাট্টা করেছিল একটা ঘটনা, ঝড়ের হাওয়ায় যেমন বন্ধ কপাটের কড়া নেড়ে ঠাট্টা করে। বিখ্যাত দার্শনিক যেমন বলেছেন, আমার নতুন উপলব্ধির বিস্ময়টাও প্রায় তেমনই করে বলেছিল মিরাকেল কাকে বলে? তোমার তুচ্ছতার ঠেলায় কেঁদে ফেলেও শিশুটি দুই হাত বাড়িয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে, আর অন্ধকারের পথে তোমার পায়ের কাছ থেকে সাপটা নিজেই সরে যায়—এইসব নিতান্ত লৌকিক ঘটনা কি বিস্ময় হিসাবে কম অলৌকিক? ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ভালবাসার আবেগ ওষ্ঠপুটের রক্তিমা আরও নিবিড় করে তোলে, এইসব নিতান্ত লৌকিক সত্যের রূপ দেখে কেউ মুগ্ধ হতে পারতো না, যদি এর মধ্যে অলৌকিক বিস্ময়ের প্রকাশ না থাকতো।

সাহিত্যিক জীবনের স্মৃতিকথার মধ্যে ঈশ্বর-বিশ্বাসে পুনর্বাসিত হবার কথা কেন? পাঠকজনের এই প্রশ্নের জবাবে আমার কথা এই যে, আমার সাহিত্যকর্মের সাধ আজ ঈশ্বর-বিশ্বাসের নতুন প্রদীপের কাছে এসে নতুন আলোর অভিষেক খুঁজছে। তাই থমকে থাকতে হচ্ছে। যদি সেই অভিষেক পাই, তবেই রূপে গুণে ভাবে ও প্রকারে নতুন বলে বোধ হবে, এমন গল্প ও উপন্যাস লিখতে পারবো, নইলে পারবো না। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আনন্দের সম্বল যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, তার সুমহিম প্রেরণার অনুগত বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের পরিচয় রূপায়িত করে এতদিন কেন অনেক গল্প ও উপন্যাস লিখিনি, নিজের সম্পর্কে এই অভিযোগ আজ একটি কষ্টকর আক্ষেপ হয়ে মনের ভিতর বাজে। গল্প ও উপন্যাস লেখার সাহিত্যিক কর্ম এক ধরণের রিচুয়াল তথা বিশ্বাসের তর্পণ বলে মনে হয়েছে। গল্প উপন্যাস ও কবিতা, জীবনের অভিজ্ঞাত সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাময় বিশ্বাসের নৈবেদ্য। কল্পনা করতে পারি, ঈশ্বর-বিশ্বাসের অনুগত প্রেরণার সৃষ্টি হয়ে আগামীকালের কান্তসাহিত্য ও রম্যকলা কী বিপুল আনন্দের নিবেদন সত্য করে তুলবে!

আমার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'র ইতিকথার মধ্যে আকস্মিকতার কোন বিস্ময় নেই। বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং বিশেষ অবস্থার একটি দুর্বার প্রয়োজনের তাগিদে তিলাঞ্জলি লিখতে হয়েছিল। তিলাঞ্জলি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সেটা ছিল বিকট নিন্দা ও বিপুল প্রশস্তির সংঘাতে উদ্বেলিত একটা উত্তেজনার আবর্ত। ব্রিটিশের শাসকীয় প্রভুত্ব তখন ভারত-রক্ষা আইনের তূণীর থেকে প্রায় একশো অর্ডিন্যান্সের বাণ বের করে ভারতীয় জনজীবনের ক্লিষ্ট কপালটাকে আরও ক্ষতাক্ত করে চলেছে। ডিনায়াল পলিসি, অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে কোন সুবিধার সম্বল সংগ্রহ করবার সুযোগ না দেবার নীতি অনুযায়ী ধান-চাল অপসারিত করে বাংলার পূব ও দক্ষিণ প্রান্তের জেলায় জেলায় একটা দুঃসহ রিক্ততা সৃষ্টি করা হয়েছে। মুনাফাখোর এক শ্রেণীর দেশীয় ব্যবসায়িক সুযোগ বুঝে ধান-চাল মজুদ করে দরের ফাটকা খেলতে মেতে উঠেছে। ধান-চালের এই অবরোধের ফলে

দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেস বে-আইনী বলে ঘোষিত ও নিষিদ্ধ হয়েছে। জাতির রাজনীতিক স্বাধীনতা দাবি করে সংগ্রাম করবার পরিকল্পনা করেছিলেন যাঁরা, জননেতা এবং আরও কয়েক লক্ষ কর্মী সাধারণ, তাঁরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। ব্রিটিশরাজ বলছেন, এ সময় কেউ স্বাধীনতার দাবি করো না। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মন প্রাণ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য কর। এই সময় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টিও বললেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিতে নেই, বরং সাহায্য করাই উচিত। কারণ এটা হলো জনযুদ্ধ। স্বাধীনতার দাবি করে ব্রিটিশরাজকে বিড়ম্বিত করা উচিত নয়। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা, যার সম্যক্ অর্থ হলো, সেদিনের স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের বিরোধিতা করা, এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবার জন্য একটি নৈষ্ঠিক আনুগত্যের তত্ত্ব প্রচার করা।

আগস্ট সংগ্রামের জ্বালামুখীর আগুন তখন নিবু-নিবু হলেও তার ধোঁয়াতে যথেষ্ট জ্বালা ছিল। সেই সময়ে লেখা আমার প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি' হলো জাতির জীবনের বেদনাক্রান্ত রূপ ও অবস্থার একটি প্রতিচ্ছবিত পরিচয়। উপন্যাসে ব্রিটিশরাজ ও কম্যুনিস্ট পার্টির কথা কাজ ও নীতির প্রতিবাদ আছে। জাতির স্বাধীনতার দাবি ও সংগ্রামের সমর্থন এবং প্রশস্তি আছে। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির মানুষ এবং যাঁরা পার্টির অনুগতজন, তাঁরা তিলাঞ্জলির প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এঁরা ছাড়া আর সকলেই 'তিলাঞ্জলি'কে বিপুল আগ্রহে অভিনন্দিত করেছিলেন।

'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসের লেখা শুরু করবার কয়েক মাস আগে আমার লেখা 'নতুন শালিক' নামের একটি গল্পের প্রতিবাদ করেছিলেন শ্রীমানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদের পদ্ধতিতে অভিনবত্ব ছিল। মানিকবাবু পাল্টা জবাব কিংবা প্রতিবাদ হিসাবে একটি গল্প লিখলেন—হাঁদা। কবির লড়াইয়ের মতো এধরনের গাল্পিকের লড়াইয়ের দ্বিতীয় কোন ঘটনার নমুনা আছে কি না, জানি না। যা-ই হোক, আমি বুঝতে পারিনি এবং আজও বুঝতে পারি না, আমার 'নতুন শালিক' গল্পের প্রতিবাদ কেন করেছিলেন মানিকবাবু। 'নতুন শালিক' গল্পটি দীন সাধারণের শ্রেণীস্বার্থের একতাযুক্ত সংহতির সমর্থন, এবং সংগ্রামের পুরোভাগে কপট-বিপ্লবী বুর্জোয়ার চতুর অনুপ্রবেশের প্রতিবাদ। এমন বক্তব্যের গল্প মানিকবাবুর পক্ষে ভাল না লাগবার কথা নয়। জানি না, তিনি কী ভেবে ও কী কারণে আমার লেখা ওই গল্পটির প্রতিবাদ করেছিলেন।

যেমন আমার প্রথম লেখা গল্পের বই 'ফসিল' (ও অন্যান্য) প্রকাশ করেছিলেন অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, তেমনই আমার লেখা প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'ও প্রকাশ করেছিলেন এক অ-প্রকাশক ভদ্রলোক, বন্ধুবর সাগরময় ঘোষ। কিন্তু একই প্রকারের দুই ঘটনার মধ্যে দুই ভিন্ন কারণ নিহিত ছিল। ইংরাজের ভারত-রক্ষা আইন তিলাঞ্জলির ইংরাজ-বিরোধী আর যুদ্ধবিরোধী মুখরতা সহ্য করবে না এবং কড়া রকমের শাস্তি দেবে, এই ভয়ের কারণে উদ্যোগী প্রকাশকের উৎসাহ বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই উপন্যাসটি সাগরবাবুকে প্রকাশক বলে ঘোষণা করে প্রকাশিত হয়েছিল। তিলাঞ্জলির ইতিকথা এখানেই সমাপ্ত করে দিয়ে লেখকের অদৃষ্টের একটি সমস্যার কথা উল্লেখ করতে হয়। আনন্দবাজার পত্রিকার স্বত্বাধিকারী, আমার বিশেষ শ্রদ্ধার আস্পদ সুরেশবাবু একদিন হঠাৎ আমাকে ডাকলেন, বিষণ্ণভাবে কয়েকটি মুহূর্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তুমি এক্ষুনই গিয়ে মিস্টার রাওয়ের সঙ্গে দেখা কর। মিস্টার রাও আই সি এস, তাঁর পুরো নামটা

আজ আর স্মরণে নেই। আলিপুরে গিয়ে তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য উপস্থিত হতেই, তিনি একটি ফাইল হাতে নিয়ে ও কাছে এসে বসলেন। তাঁর স্ত্রী, বাঙালী মহিলা মনোরমাও একটি চেয়ার নিয়ে কাছে বসলেন।

মিস্টার রাও বললেন—আপনার সম্পর্কে সরকারের কাছে অভিযোগ এসেছে, আপনি আসামে গিয়ে শত্রুপক্ষ জাপানের সামরিক গোয়েন্দাদের সাহায্য করেছেন, অনেক খবর যুগিয়েছেন। সত্যিই যদি এরকম কাজ করে থাকেন, তবে···।

আমি বললাম—আমি জীবনে কোনদিনও আসামে যাইনি।

মিস্টার রাও—অ্যাঁ? ঠিক বলছেন?

আমি—হ্যাঁ, ঠিক বলছি। আমি প্রমাণ দিতে পারি যে, আমি আসামে কোনদিনও যাইনি।

উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিস্টার রাও, তার চেয়ে বেশী উৎফুল্ল হলেন মনোরমা। ফাইলের কাগজে তখনি মন্তব্য লিখে দিলেন মিস্টার রাও, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ।

মনোরমা উঠে গিয়ে চা নিয়ে এলেন, আমার লেখা কয়েকটি গল্পের প্রশংসা করলেন। বললেন : আমি ওকে অনেকবার বলেছি যে, ওই ফাইলের সবই মিথ্যে কথা।

রাও বললেন—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তবু···যাক্, এখন আর আপনার ভয় করবার কিছু নেই।

মনোরমা বললেন—নিশ্চয় আপনার কোন ভয়ানক শত্রু আপনার বিরুদ্ধে এরকম সাংঘাতিক একটা চুগলি করেছে।

চা খেয়ে নিয়ে ও রাও-দম্পতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আবার পথের উপর এসে দাঁড়ালাম, তখন আলিপুরের গাছের মাথার উপর বিকেলের রোদ মিইয়ে এসেছে। কার্জন পার্কের কাছে এসে একটি নিরালার ঠাণ্ডা ঘাসের উপর অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠলো। তিলাঞ্জলিরই মন্তব্যের কয়েকটি কথা বারবার মনের ভিতরে যেন চেঁচিয়ে উঠছে—ওই যে, ওই তো, সন্ধ্যার অন্ধকারে লালবাজার থানার ফটকের কাছে যেন নতুন এক জুডাসের প্রেতাত্মার ছায়া ঘুরঘুর করছে। শত্রুচরকে হাতে পেলে সামরিক কম্যাণ্ড কী করে, সেটা জানা ছিল। চটপট সংক্ষিপ্ত বিচার, আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফাঁসি। কাজেই মনের চিন্তাটা উত্তপ্ত হয়ে মাথাটাকেও বেশ উত্তপ্ত করে তুলছিল। বুঝতে দেরি হয়নি, এটা দুঃসহ একটা অস্বস্তির উত্তাপ। ছা-পোষা একটা সংসার আছে, বুড়ো বাপ-মা আছে, এহেন এক মানুষের ভাবনাতে দুঃসহ রকমের একটা অস্বস্তি এভাবে উত্তপ্ত না হয়ে পারে না। বোধ হচ্ছিল চুগলিটা শুধু একা আমাকে নয়, এদেরও সবাইকে ফাঁসি দিতে চাইছে। এই উত্তপ্ত অস্বস্তির প্রকোপ ক্রমশ শান্ত হতে হতে যেদিন ঘুম-ভাঙা দুঃস্বপ্নের মতো মরে গিয়ে একেবারে বাতাসে মিশিয়ে গেল, সেই দিনটা হলো ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট।

—